



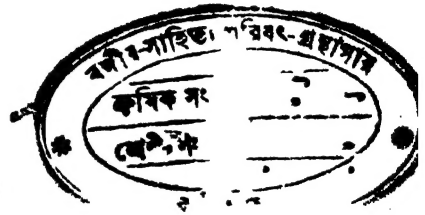








‘আর্য্যশাস্ত্রগহন’রূপক-  
শ্চেতস্তুত্ত্বিবিবাবাবকঃ ।  
জ্যোতস্বিজয়তাং বিপশিতা  
যচ্চিবা হৃদয়ম্‌আর্য্যদর্পণঃ ।



আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্ত্বাধ্যক্ষ বিজ্ঞানয় হইতে

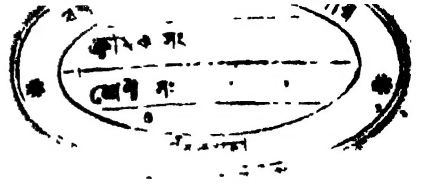
ব্রহ্মচারীগণ দ্বারা পরিচালিত



১৯শ বর্ষ—১৩৩৩

সম্পাদক—শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী,

মুদ্রাকৰ—সতীশ ব্ৰহ্মচাৰী  
যোগমায়া-প্ৰিণ্টিং-ওফাৰ্‌কস  
সুৰেন্দ্ৰ মঠ, যোৰহাট, অসম

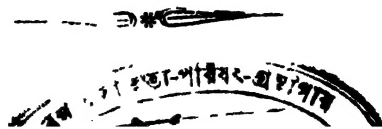


# সূচী

—:০:—

অগ্নয়ে	৪১, ৮৫	ছাত্র রামতীর্থ	৩৪, ৬৩, ১১৭, ১২১, ২২৫
অজ্ঞানের স্বরূপ	২১	জন্মান্তর	৪৪৪
অতীন্দ্রিয়ার উপলক্ষি	৩২৫	জ্ঞান ও ভক্তি	৩০৩
অপ্রমাদ	৬৯	তিনের মাসা	৪৩১
অতিনব শিশুশিক্ষা	৩৬	দম্পতী জীবন	৩৭৫
অভিভাষণ	৩৪৩	দানপ্রাপ্তি স্বীকার ৮৩, ১২০, ১৬২, ২০৩, ২৪৩	
অরূপে স্বরূপ	৩৩২	৩২১, ৩৬০, ৫২১, ৪৩৮, ৪৭৮	
অসাধনের ধন	২৮৬	দিগ্‌নির্দেশ	১৫৬
আগমনী	৩৫৭	দেশের ও দেশের কথা	৪৬২
আত্মরক্ষা	৪০৪	দেহধর্ম	১৫৪
আত্মাহুতব	৪০৯	দৈব ও পুরুষকার	১২৭
আনন্দলহরী	২০৫, ৪৪১	জ্ঞানার্থপ্রার্থি	৪০১
আরণ্যক	৩৯, ৭৯, ১২১, ১৫৬, ১৯৮	ধরা পড়া	২০
	২৩৭, ২৭৮, ৩১৫, ৩৯৮, ৪৩৬	ধ্যানযোগ	২১
ইচ্চার স্বাভাব্য	১৫০	নববর্ষে	৪
ইন্দ্র: সোমপ:	২৮৩	নাগিলা	৯৬
ইন্দ্রায়	১২৫, ১৬৫, ২৪৫	নারদীয়া ভক্তি	১২৮
ইন্দ্রিয়সংযম	১৫১	নিবেদন	১২৩
উড়ী চিঠি	৪৩৩	প্রকৃতি পূজা	২৪৮
উৎসর্গ সাহায্যপ্রাপ্তি	৮২	প্রেম ও কাম	২১২
কর্মযোগ	২৩০	প্রেম ও মহিমাজ্ঞান	১৭২
কর্ম, যোগ ও ভক্তি	২৬৩	প্রেমের অদৈত	৩৪৩
কর্মশেষ	৪১৪	বৃন্দনা	৩৫২
কর্মসঙ্কেত	৪৭	বর্তমান হিন্দু সমাজ	১৭১
কামনার সিদ্ধি	২৭৪	বর্ষশেষে নিবেদন	৪৮০
কোন পথ শ্রেষ্ঠ ?	১৬৪	বাক্য সংযম	১০৬
গুরু ও গীতা	৮৮	বিপরীত	১০৮
গুরু কেন ?	২২৪	বিশেষ দ্রষ্টব্য	৩১৮, ৪৭৫
গৌরী বাজ	১৮১	বীজমন্ত্র ও তগবদ্ভাব	২২২
ছাত্রগণের প্রতি	২১		

বুদ্ধির মরণ	৩৮০	শ্রদ্ধাবীর্ষ্য	১৪৬
বেদান্তীর ধ্যান	১২৪	শ্রবণ-কীর্তন	৪৬৫
বেদান্তের অধিকার	১৪৩	শ্রুতিস্মৃতি	২৫৭, ২৯০, ৩২২, ৩৮৩, ৪২৫, ৪৬২
বেদের কথা	১৩৮		
বৈরাগীর মন	২২২	সংবাদ ও মন্তব্য	৪০, ৮১, ১২৪, ১৬২, ২০২, ২৪৩, ২৭২, ৩২২, ৩৬২, ৪০২, ৪৪০
বৈরাগ্যমেবাত্মম্	২৫২		৪৭৬
ব্রহ্মচর্যা	১১৫	সঙ্কটমোচন	৩৬৬
ভক্তিসম্মিলনী	৩২০, ৩৫৬	সুখসাধন	৪৭১
ভক্তি ও মিরোধ	৭৫	সন্ন্যাসী	৩০
ভক্তির লক্ষণ ভেদ	১০১	সন্ন্যাসী আৰু নির্লিপ্ত গৃহী	৫২
ভক্তির শ্রেষ্ঠতা	২১৫	সম্যক্ দর্শন	৭
ভক্তির সাধন	৩৯০	সহজ সাধন	২৬
ভক্তির স্বরূপ	১০	সহজ স্থিতি ও ভূতহিত	৩২৬
ভাব ও বস্তুর সমন্বয়	১৩১, ১৬৮, ২১২, ২৬০	সাংখ্যতত্ত্ব কোমুদী	৩৯৫
ভো, ও যোগ	৩৩৯	সাংখ্যের প্রমাণবিচার	২৫৪, ৩৩২
মঙ্গলাচরণম্	১	সাক্ষী চৈতন্য	৪৪
মনঃস্থৈর্য্য	৬২	সাধনা ও আত্মাহুতী	৫৮
মা !	২০৮	সাধুত্বের সাধনা	৪১৭
মায়ের দেখা	২৩৩	সাধুত্বের নৈসর্গিক বৃহিসাধ	৩৫২
মুক্ত কে ?	১০৪	সিদ্ধির সঙ্কেত	৩৩৫
মুক্তাবাস্তি	৭১	সুখ-দুঃখ	১৮৬
“যচ্চ কামসুখং লোকে !”	৩৮৬	সেবক জীবন	৩৭২
ধর্ম ও নিয়ম	৬৬	সেবার সহজ উপায়	১১২
রাস	২৪	“সোহম্ !”	৩০৮
রূপান্তর	১১৫		
শক্তিতত্ত্ব	৫৫	হরিশ্বরে কুন্তয়োগ	৪৫৬
শিক্ষায় স্যাদি	৩৬৯	হরিশ্বরঃ	৩২৩, ৩৩৬
শিক্ষার টোটিকা	২২	হিন্দু-মুসলমান	১৭
শিক্ষা সংস্কার	২৬৭	হিমালয়ের পত্র	১৪, ৪৯, ১০৯



৩৩ তৎ সং

# আর্ষ-দর্পণ

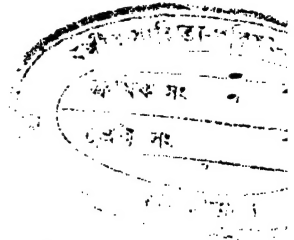
১২শ বর্ষ  
সমষ্টি সং ১৯০

বৈশাখ

প্রথম খণ্ড  
প্রথম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণম্

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৫।৮



[ বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—উগো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ]

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতা

স্তোমং জুশস্ব গৃণতোঃ সমবোনি ।

পুরাণী দেসি যুবতিঃ পুরাক্ষি-

রনুব্রতং চরসি বিপ্লবান্নে ॥

ওগো উষা, অন্নপূর্ণা, হোমশিখা জ্ঞানবেদিকার—

কবি-চিত্ত-উজ্জ্বলিত, গরবিলী, ময় উপহাস!

পুরাণী তরুণী তুমি, লীলাময়ী, ওগো কমনীয়—

বহিতেছ ব্রত নিত্য অকুণ্ঠিতা বিশ্ববরণীয়া !

উষো দেব্যান্তরা নি ভাহি

চন্দ্রবধা সূর্য্যতা ইরয়ন্তী।

আ জ্ঞা বহন্ত সূর্য্যমাসো অশ্রা

হিরণ্যবর্ণা পৃথুপাকসো য়ে ॥

হে অমৃত, 'দীপ্তিময়ী, রোদমীরে কর গো ভাস্বর,  
জলুক সোণার রথ---দিকে দিকে কেঁপে যাক সূর!  
আছে যত ভীমভেদে অশ্ব তব হিরণ-বরণ,  
আজিকে তোমারে তারা, সমুপগে করুক বহন।

উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বা

উর্দ্ধা তিষ্ঠস্যাতস্য কেতুঃ।

সম্মানমর্থঃ চরণীহ্যমাণা

চক্ষুর্নিব নবম্যা বস্বতস ॥

এ বিশ্বভুবন পানে টপি-টপি আসিতে নাগিয়া  
অগ্নি-সঙ্কতে বহি—উর্দ্ধপথে রহিলে গাঁমিয়া!  
এক-ই পথ বাতি তুমি, ওগো উষা, যেতে বুঝি চাও!  
নবীনে নন্দিয়া নিতি চক্ৰ হেন আবর্তিয়া যাও!

অব সূর্য্যেন চিত্রতী মঘোনি

উষা ষাতি অসব্রস্য পত্নী।

স্বরূপন্তী সুভগা সুদংসা

আন্তাদিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ ॥

আধার-স্থলখানি বিশ্বতনু হতে চয়নিয়া  
ওই বুঝি যাক্স 'উষা—গরবিনী সবিতার প্রিয়া!  
সুভাগিনী, সুনিপুণা, সুরলোক ছিল উজলিয়া—  
নীলিমা-আঁচল ছাড়ি শ্যামা অঙ্গে পড়িল ঢলিয়া।

অচ্ছা যো দেবীমুখসং বিভাতীঃ  
 প্র বা ভরস্বং নমসা সুবুদ্ধিম্ ।  
 উর্দ্ধং নমুশা দিবি পার্জো অশ্রেং  
 . প্র রোচনা রুচুচে রুগ্ধসংদৃক্ ॥

তোমাদেরি আঁখি পরে পড়ে ওই দেবতার আলো,  
 প্রণমিয়া পায় তাঁর হৃদয়ের আকুলতা ঢালো ।  
 বুকভরা মধু তাঁর—কিবা রুচি, আহা মরি মরি !—  
 ত্র্যলোক-আলোকে ছানি তনুখানি নিল বুঝি গড়ি ।

ঋতাবন্তী দিবো অর্কৈরবোধ্যা  
 রেবতী রোদসী চিত্রমশ্বাং ।  
 আশ্বতীমগ্ন উষসং বিভাতীং  
 বামমেষি দ্রবিনঃ ভিক্ষমাণঃ ॥

অমৃতরীক্ষে ঋতরূপা জাগে উষা সবিভা-কিরণে,  
 তারি সনে রোদসীর ফোটে মায়া কত না বরণে ।  
 আসে, অগ্নি, উষা ওই—তনুছায়, উজলি ধরায়—  
 নাও চেয়ে তার কাছে চিত্ত তব বাহা আজি চায় ।

ঋতস্য বুধ উষসামিষণ্যন্  
 স্বষা মহী রোদসী আঁ শিবেশ ।  
 মহী মিত্রস্য বরুণস্য নাস্বা  
 চন্দ্রেব তানুঃ বিদধে পুংকরা ॥

হের ঋতপ্রবর্তক, কল্লতরু—উষা দূতী তাঁর—  
 সুবিশাল রোদসীর মাঝে হের সবিভা-মহারি !  
 হের উষা—মিত্র আর বরুণের অংগরূপ মায়া—  
 নিখিল ভুবনখানি দীপিয়াছে তাঁরি স্বর্ণ কায়া ।



## নববর্ষে

—:({}):—

বলং ধেহি তনুসু নোবলমিদানডুংসু নঃ ।

বলং তোকায তনয়ায জীবসে

হং হি বলদা অঙ্গি ॥

—হে ইন্দ্র, আমাদের তত্ত্বতে তুমি বলাধান কর, আমাদের ব্রাহ্মণ্যমূহে বলাধান কর, আমাদের সন্তানসন্ততিতে বলাধান কর, বাহাতে তাহার। বীৰ্য্যশালী হইয়া বাচিয়া থাকে; তুমিই তো আমাদের বলদাতা ।

নব বর্ষ বিশ্বের নিকট মধুময় হউক । কাল অনন্ত, বর্ষভেদ লাহাতে করনা • মাত্র । করনা মারা ; কিন্তু মারার মাদকতা আছে, শক্তি আছে । নিরঞ্জন সহ্যে করনার যোথাপাত হটল—ইহাই সৃষ্টি । সৃষ্টি চির নূন—তাই তাহা পরম বিশ্বের সামগ্রী । বাহারা সৃষ্টির কুক্ষিগত, তাহার। আশায়, বিশ্বয়ে, প্রকার নূতনকে অভিনবিত করে—তাহারা ঘোবনের জাগান করে । সৃষ্টির যিনি প্রবর্তক, বিশ্বায় আনন্দে তিনিও নূতন সৃষ্টিকে অভিনবিত করেন—কিন্তু তিনি জানেন, ইহা তাঁহারই পুরাণী প্রতিভা । ঋষি উভয়কে দর্শন করিয়া সৃষ্টির উদালোকে গাহিলেন—  
“পুরাণী দেবি যুবাঃ পুর্বেকঃ”—হে জ্যোতির্গমী লীলাময়ী মারা—তুমি পুরাতনী, আবার তুমি নবযৌবন—অতএব তুমি চিরস্থায়ী ; বর্ষারস্ত্রে আমবা সেট রহস্যময় চিরসৌন্দর্য্যকেই নমস্কার করি—আমাদের শুদ্ধ হৃদয়ের করুণা সত্যের অভিসুপে প্রত্যোদিত হউক ।

আমরা দুর্বল, ইহাই আমাদের পাপ ।

অধ্যাত্মসাধনাই যদি জাতীয় সাধনার প্রতীক

হয়, তাহা হইলে সেহে, ইঞ্জিয়ে, মনে দুর্বল থাকিতে তাহা সিদ্ধ হইবে, সে আশা বিভ্রম । “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”—অসং রূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ করিতেছি, অগচ পাঠিতেছি না—ইহাই তো দুর্বলতা । আপনাকে পাওয়ার অর্থ কি?—আপনাকে মহাবীৰ্য্যবন্ত, অদীনসত্ত্ব, বজ্রসংহত ইচ্ছায় প্রবর্তক বলিয়া অনুভব করা—ইহাই আপনাকে পাওয়া । আমি দেহে থাকি, মনে থাকি, বুদ্ধিতে থাকি—সর্বত্রই আপনাকে বীৰ্য্যশালী বলিয়া অনুভব করিতে হইবে—ইহাই আত্মলাভ—আপনাকে পাওয়া ।

বীৰ্য্য প্রকাশিত হয় স্বভাবের ক্ষুণ্ণিতে, সংরক্ষিত হয় আচারের সংযমে ; সংযম প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞানে । আমরা চাই বীৰ্য্যশালী পুত্রকন্তা—আচারের নিষ্পেষণে, কদাচারের সম্ভাডনে বাহাদের স্বভাব বিকৃত হয় নাই—অতএব বাহাদের অদীন প্রাণ, অসীম উৎসাহ, অনাবিল আনন্দ । সে প্রাণ, সে আনন্দ সংযমের বেঠনীতে সুযমান্বিত হইয়া দেখা দিবে—দেহে তুচ্ছ আনিবে লাভণ্য, মনে ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড সুরভ । পরোপরি জ্ঞানের প্রোক্ষণ দীপ্তিতে তাহাদের অন্তর বাহির সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে । নববর্ষে এমনি পুত্রকন্তায় পরিবৃত্ত ভারতবর্ষকে করুণা নয়নে ধ্যান করিতেছি । অন্তরে অন্তরে এই করুণাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি, বাহিরে ইহা জয়যুক্ত হউক, ইহাই কামনা ।

এই করুণাকে বাহারা সফল করিলে, মহৎ কর্মব্য তাহাদের সমুপে । তাহাদের পথ

কি?—অমোঘ অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঋষি তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। স্বীকার কর—“ঙ্ং হি বলদা অসি”—হে দেবতা, তুমিই বলদাতা। বল আমার নয়, বল তোমার, এই অমুভূতিকে জীবনে প্রবল কর। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তুমি হুর্লল, কেননা তুমি আফগানে মুখর হইয়া উঠিয়াছ। শক্তিকে ধারণা করিবার সামর্থ্য যদি তোমার থাকিত, তাহা হইলে নিখর হইয়া যাইতে, এত আফগান থাকিত না। অতএব বলশালী বলিয়া যে অভিমান কবিতোছ, তাহা সর্বৈব মিথ্যা; তোমার উক্তিই তাহা প্রমাণ করিতেছে। এই অভিমান ছাড়—“অহং বলী” না বলিয়া বল—“ঙ্ং হি বলদা অসি।”

“তুমি বলদাতা” এই স্বীকৃতিতে আত্মবল ক্ষুণ্ণ হয় না—ইহাতে প্রমাণ হয় না। যে আমি হুর্লল। অহংকে কোথাও ঠাঁই দিও না—“আমি হুর্লল” এমন কথাও বলিও না। অহংকে সম্পূর্ণ নিরসন করিতে হইবে—আমি সবল কি হুর্লল, সে বিচার করিয়াও অহংকে কোথায়ও প্রস্রয় দিলে চলিবে না। অহং ক্ষুদ্র—ঙ্ং ভূমা। অহং বলিতে বুঝি দেহের ক্ষুদ্র আয়তন বা মনের স্বল্প পরিসর; আবার ঙ্ং বলিতে বুঝি সীমার বাহির; ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ অমুভূতি। অতএব অহং ছাড়িয়া ঙ্ং বলিতে হইবে—তাহা হইলেই আপনাতন্ত্র ছাড়িবার উপায় হইবে। বলের উপাসনা করিতে হইবে—কিন্তু অহংক্ষুদ্র পরিসরে নয়—ঙ্ংএর ভূমানন্দময় বিস্তৃতিতে।

বল, “ঙ্ং হি বলদা অসি”—অহং নিরসন করিয়া এই কথা জপ কর, আনন্দে প্রাণ পুরিয়া যাইবে—বল কি, তাহার আনন্দময় অমুভূতি লাভ করিবে; কিন্তু কোনও অমুভূতির উপরেই অহংএর ছাপ দিও না—দেখিবে, উহা

উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এইরূপে দেবতার সামীপ্য লাভ করিবে, কালে তুমিই দেবতা হইয়া যাইবে। তোমার অহংকে নিদলিত করিয়া অতর্কিতে কণ্ঠ হইতে ঋষির ছন্দে ধ্বনিত হইবে—

অগ্নিরগ্নি জন্মনা জাতবেদা  
যতং মে চক্ষুরমৃতং মে আসন।  
অকুপ্তিধাতু রজসো বিমানো  
অজস্রো দধৌ ইবিরগ্নি নাম।

—আমি অগ্নি, আমি গুরু; জন্ম হটতেই আমি জন্মের নশস্ত জানি, অতএব আমি স্বয়ম্ভু; পৌরুষ আমার চক্ষু, অমৃতের আশ্রয় আমার রসনায়—অতএব আমিই দ্রষ্টা, আমিই ভোক্তা। আমি প্রাণ, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ধাতা আমি—আমি মহাকাশের অসীম প্রসার। অফুরন্ত জ্যোতির ভাণ্ডার আমি; আবার আমিই সেবার অজস্র উপকরণ।

এই অমুভূতিতে তুমি আমি একাকার। ক্ষুদ্র অহংএর নিরসনে ঙ্ংএর উপাসনা মহা অহংএর জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। ইহাই আত্মজ্ঞান—অনন্ত বলের ভাণ্ডার।

আবার বল, “ঙ্ং হি বলদা অসি”—হে অনন্ত বলের ভাণ্ডার, তুমি তো তোমার বলকে রূপাণ্ডমত অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে না, পরমানন্দে ঘটে ঘটে যে তাহা বিলাইয়া দিতেছ। “রূপং রূপং মম্বা বোভবীতি মায়াং রূপধনস্তস্যং গরি স্বামী”—পরম ঐশ্বর্যশালী দেবতা রূপে রূপে ছড়াইয়া পড়িতেছেন—বার বার ছড়াইয়া পড়িতেছেন; নিতের তন্তু হইতে এ কি অপরাগ মায়াং সৃষ্টি তিনি করিলেন! হাঁ, ক্ষুদ্র অহং-ও জগতে আছে; কিন্তু সে তো একা তোমার অহংটা নয় যে শুধু তাহাকে আঁকড়াইয়া কোণে বুসিয়া থাকিবে। একবার চাহিয়া দেখ, ঘটে ঘটে ক'ত অহং-এর মেলা;

কত আমিরের বৃন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে—  
দেবতার ঐশ্বর্য্য তাহাদের বর্ণে বর্ণে অলিয়া  
উঠিয়াছে! শক্তির অপরিমিত ভাণ্ডার হইতে  
অজস্র স্কুর্লঙ্গাদিকে দিকে বিকীরণ হইয়া  
পড়িতেছে! নিজের ভাবনা ছাড়িয়া দেবতার  
এই লীলা প্রত্যক্ষ কর, আর আনন্দগদগদ  
কণ্ঠে বল—হে মঘবন, হে বিচিত্র সম্পদের  
আধার, তুমি হি বলদা আমি!

বলাধানেব ইহাই বেদমন্ত্র; ঋষি ইহাই  
প্রত্যক্ষ করিলেন, ইহাই প্রচার করিলেন।  
ঋষি এই অমেঘ নির্দেশকে মাথা পাতিয়া  
গ্রহণ কর। “শ্রদ্ধা অস্বিনু ধত্ত” — ইহা  
প্রজ্ঞা রাখ—সত্য লাভ করিবে।

ইহার পর তিনটি উক্তিই ঋষি এই  
সত্যের সাধন সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন। তিনিই  
বলাধাতা, এই কথা জানিয়া প্রথমতঃ স্বীয়  
তনুতে বল প্রার্থনা কর—বল, “বলং দেহি  
তনুং নঃ”—সম্বাস্তৃত আমাদের প্রতিজ্ঞার  
তনুতে তুমি বলাধান কর। আমাদের স্থূলতম  
প্রতীক এই তনু। ইহাকে শরীর বলিতেছি  
না, বলিতেছি তনু, কেননা শিরশঃধর্ম্মকে  
বড় করিয়া দেখিয়া আমরা ইহাকে ছাড়িয়া  
যাইতে চাই না। এই জড়পিণ্ডের মাঝেও যে  
প্রাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে—যাহা সর্বত্র  
সম্ভব বা ব্যাপ্ত হইতে চাহে, আমরা তাহার  
প্রতি ঈর্ষিত করিয়া বলিতেছি, আমাদের  
তনুতে তুমি বলাধান কর; এই দেহকে  
বলশালী করিয়া বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়  
যাহাতে ব্যাপ্ত করিতে পারি, এই কৃত্রিম আধারে  
অবরুদ্ধ প্রাণকে দিকে দিকে ছড়া-  
ইয়া দিতে পারি, সেই আশীর্বাদ আমাদের  
কর। অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যই তাহার উপায়,  
আমরা ব্রহ্মচারী হই, আমরা বীৰ্য্য লাভ করি

—তবেই আমাদের তনুতে বলাধান  
হইবে। হে বলদাতা, গেই বীৰ্য্যবল তুমি  
আমাদের দাও!

আবার বল, “বলমিচ্ছানিভুংস্ব নঃ”—হে  
ইন্দ্রিয়ের অধিপাত দেবতা, আমাদের বাহন-  
সমূহে তুমি বলাধান কর। “আত্মানং রাখনং  
বিক্র, শরীরং রথেষেব তু, ঈন্দ্রিয়ানি হযানাহঃ”—  
হে দেবতা, তুমি নিজেকে রথী বলিয়া  
জান—আর জান, আমরা এই দেহই তোমার  
রথ; আর সেই রথের বাহন হইল আমরা  
ইন্দ্রিয়গণ। হে ইন্দ্র, তুমি এই বাহনসমূহকে  
বলশালী কর, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার  
বলাধানে তেজস্বী হউক। যে তনুতে বল  
লাভ করিয়াছে, তাহার ইন্দ্রিয় যে তেজস্বী  
হইবে, ইহা স্বাভাবিক। বেছে বীৰ্য্য ধারণ  
করিলে, ইন্দ্রিয়ও বীৰ্য্যশালী হইবে।

শেষ প্রার্থনা—“বলং তোকায় তনয়ায়  
জীবসে”—হে দেবতা আমাদের সম্মানসম্ব-  
ন্ধিত বলাধান কর, যেন তাহার বীচিয়া  
থাকে। আত্মাতে বলাধানের সঙ্কেত জানিয়া  
যে দেহেও ইন্দ্রিয়ে বীৰ্য্য সঞ্চয় করিয়াছে,  
তাহার এই প্রার্থনাসিদ্ধি কত সঙ্গজ। অথচ  
এই প্রার্থনাই আজ এই বীৰ্য্যগৌরব দেশে কত  
পিতামাতার হৃদয়ে কক্ষণ মূহুরে অনিত হই-  
তেছে। শিশুপ্রাণের হৃদয়ে অশ্রু দেখিয়া  
জাতিপ্রাণ কাদিয়া বলিতেছে—“হে দেবতা,  
আমাদের সম্মানসম্বন্ধিত বলাধান কর, যেন  
তাহারা বীচিয়া থাকে।”

কিন্তু ইহাদের বীচাইয়া রাখিবার উপায়  
কি? ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন—নিজের  
দেহকে, ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বীৰ্য্যবস্ত কর;  
তোমার “তোক” এবং “তনয়”—পুত্র এবং  
পৌত্র বলশালী হইয়া বীচিয়া থাকিবে। কিন্তু

জানিও, জানক্স বলেব ভাণ্ডার যিনি, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ মাথার না লটলে তোমার বলেব সাধন বুথা চইবে! ব্রহ্মচর্যা, কশ্মশক্তি, কুলপ্রতিষ্ঠা—সমস্তই দীর্ঘক হইবে আত্মসমর্পণে। দেশকে বাঁচাইবার, জগৎকে আগুটিবার ইচ্ছাই এক

মাত্র পথ। আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীশঙ্কর নিকট নতদ্বার হুটয়া আকুল কর্তে আমরা প্রার্থনা করি—

বলং যেহি তনুসু নো বরমিহানিহুংস নঃ।

বলং হোকায় তনয়ায় জীবসে হং হি বলদা অসি।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

## সম্যক্ দর্শন

—\*—

বস্তু অনাধার্যের স্বভাবতঃই সরল হয়, সত্যবাদী হয়; এটা কি ওদের গুণ বলব? ওদের স্বভাবসুলভ আচরণের অনুকরণ করব?—না। অজ্ঞানের পূজার কথনো শুভ হতে পারে না। যাকে তোমরা স্বভাবসুলভ সরলতা বলছ, সে তো ওদের অজ্ঞানতারই পরিচয়। অশিক্ষিত একটা লোকের সবলতা দেখলে লোকে বলে, “লোকটা কি বোকা!” কিন্তু উচ্চবংশীয় কোনও ব্যক্তি ঠিক ওই রকম ব্যবহার করলে বলে, “আচ্ছা, ভদ্রলোক কি সরল!” সত্য মিথ্যার স্বরূপ না জেনে, সত্য-মিথ্যা আচরণের দোষগুণ না বুকে, শুধু সত্য-ভাষণে আর সরল ব্যাপ্যারেই অনভ্যাস কি বড় হয়ে গেল সত্য-মিথ্যা, সবলতা-কপটতার স্বরূপ জেনে দোষগুণ বুকে যদি কেউ মিথ্যা ছেড়ে সত্যের, কপটতা ছেড়ে সরলতার আশ্রয় নেয়, সত্য আর সরলতা তখনই গুণ, তখনই অমৃতাচার পক্ষে তারা শুভকর।

অনেক জীবজন্তুর মাঝে বিশেষ বিশেষ সঙ্গুণ আছে। কুকুরের প্রভুভক্তির কথা

দয়। এটা তার বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু তা বলে দাস্যভাবের অনুশীলনে সিদ্ধান্ত কি নে অবস্থা লাভ কববেন, কুকুর কি প্রভুভক্তির ফলে সেই অবস্থার আদিকালী হবে? কুকুরের প্রভুভক্তি তার প্রকৃতির দর্শ্য, স্বভাববশেই তা হুটে ওঠে। বালকের সভাশাসিতা ও সরলতাও প্রশংসনীয় বা অনুকরণীয় নয়; কারণ তার বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্-উদ্দেশ্য না হওয়ায় সে যা দেখে বা শোনে, তাই স্খামগ পকাশ করে, তার বিপরীত ঘটনার অবতারণা করতে পারে না। এতে তার অনুবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানের অনুশীলনে যদি এই সব গুণ স্বপুষ্ট হয়, অনুষ্ঠাতার মাঝে শুভেচ্ছার সঞ্চায় কলে, তবেই তাদের আচরণে শুভ হতে পারে।

সর্বত্রই বিচার সূত্রে হওয়া দরকার। সব বস্তুই বুদ্ধির চালনীতে ফলে তার অসার অংশ ছেড়ে দিয়ে সারটুকু নিতে হবে। এদেশের লোকের আজকাল সব গৈন, গুলিয়ে গিয়েছে। বিচারকের অভিমানটা আছে, ছটফটানীও

থুব আছে, কিন্তু সৃষ্টি-বিচার করবার মত। একটা স্বতন্ত্র ফল আছেই। যে বহিরাচারী, স্বৈরী, গাভীরা, প্রশান্ত আছে কি না, সেদিকে কার লক্ষ্য নাই। বিচারক হতে হলে বিচক্ষণতা চাই, তীক্ষ্ণ মন্ব অন্তর্দৃষ্টি চাই। প্রশান্তির নীতলছায়াধি বসে বিচার করতে হবে। সংস্কারশূন্য হয়ে বিচার করতে পারলেই নিছক খাঁটি সিদ্ধান্তে পৌছান যায়—নইলে শুধু হাম্বড়াগিরিই সার।

• আমাদের এদেশে সাধারণের বিচার-ধারাটাই বদলে গেছে। অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়েই এদেশের একে ওদিশ। স্থূল নিয়েই যত মারামারি—ভিতরের দিকে কার লক্ষ্য নাই। সাদৃশ্য বিষয়েই এদেশের বিচার দেখ না কেন। একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, কর্মরতা জ্ঞান লাভ করতে চাইছে। সাধারণে তাকে একজন জ্ঞানি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সঙ্গে সমান মনে করবে; কিন্তু নিষ্ঠাবান কর্মীকেই হয়ত জ্ঞানীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে। যেহেতু লোকটা নিষ্ঠাবান, যেহেতু সে ফলাহারী বা একাহারী, যেহেতু সে কৃচ্ছমাধক বা তাপিস—তাতেই কি সে শ্রেষ্ঠ গারষ্ঠ হয়ে গেল? সে আচারী বলেই কি বড় হয়ে গেল? আচার-বিচার তো চিত্তশুদ্ধির জন্তই। আগে দেখ, তার আচার-মত কর্মের অনুষ্ঠান কি না; তার পর তার সার্থকতার বিচার কর। অন্তরশুদ্ধির জন্তই তো ধ্যানশুদ্ধি করিতে হবে। বাইর সাক করার ফলে ভিতরটা কতটুকু শুদ্ধ হচ্ছে, তাই দেখতে হবে, আর তাই দেখে ভালমন্দের রায় দিতে হবে। অনেক শুধু সংস্কারবশে ও রকম আচার মেনে চলে; তাতে কি তার ভিতর শুদ্ধ হয়?

তবে কি বলবো যে শুদ্ধাচারের কোনও সার্থকতা নাই? হাঁ, আছে। কর্মের

একটা স্বতন্ত্র ফল আছেই। যে বহিরাচারী, কর্মের ফল হতে সে বঞ্চিত হবে না। শুচি-তার সংস্কার অর্জন করবার ফলে পরবর্তী জীবনে বা জন্মান্তরে হয়তো সে শুভ জন্মকর্ম লাভ করবে। শুদ্ধমত হয়ে জন্ম নেওয়ার পর শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে কালে তার উৎকৃষ্ট গতি হবে। অবশেষে জ্ঞান লাভ করে তার জন্ম সার্থক হবে। যিনি জ্ঞানাত্মী, তাঁর আসন কত উচু! জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।

কর্মযোগের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জ্ঞানলাভ। এ জ্ঞান অবশ্য ব্যবহারিক জ্ঞান নয়। তুমি-আমি, ঘট-পট, জীব-জগৎ বিষয়ে যে জ্ঞান, ও তো ব্যবহারিক জ্ঞান। এ জ্ঞান বৈতন্যে আশ্রয় করে উৎপন্ন। এতে আমাদের মাঝে এক অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি এনে দেয় না। এ মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞান বা জ্ঞানসামান্য। যাতে সমস্ত পৃথক ভাবের বিশেষণ করে একই তত্ত্বের উপলব্ধি এনে দেয়, তাকেই বলি জ্ঞান। আলি তুমি, ঘট, পট, মঠ—এ সমস্ত কর্তব্যবস্তুর বস্তু। এ সব সৃষ্টি পদার্থ—আমারই সৃষ্টি, আমার মনের সৃষ্টি। অহংজ্ঞানের ফলে জগৎ; কাঁচা আমির অভিনিবেশেই জগৎ; এ সব আমারই মানসকল্পিত। এ স্বপ্নরাজ্য। স্বপ্নে আমি বাঘ দেখছি—খেতে আসছে, আর ভয়ে অস্থির হয়েছি। স্বপ্ন ভাঙ্গলো, বাঘও পালালো, হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। জেগে কিন্তু বাঘও নাই চঞ্চলতাও নাই, ভয়ও নাই। তখন আমি স্বপ্ন ও স্বপ্ন হলো। স্বপ্নের বাঘ কি আর সত্যিকার বাঘ? ও তো আমার মনেরই সৃষ্টি। এই মনই বাঘ সৃষ্টি করে আবার তারই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। স্বপ্নের সময় যদি জানা যেত, এ স্বপ্নের বাঘ, মনের সৃষ্টি, এর কোনও

বাস্তব সত্তা নাট, তাহলে আর ভয় হুহু না—  
স্বপ্নরাজ্যও ধ্বংস হয়ে যেত। তেমনি এত  
ব্রহ্মাণ্ড, জীব জগৎ সবই আমার সৃষ্টি—আমার  
কল্পনা। অহং আর ইদং-এর ভেদজ্ঞানে  
অদিত্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছি। এ মোহের  
ঘোর কাটলে আর স্বপ্নরাজ্য থাকবে না। তখন  
দেখব, এই এক আমি ছাড়া আর কিছুই  
না।

আমি আমার করেই জগৎটা মোলো।  
কোনটা বাপু তোমার? এত সাধের, এত  
যত্নের, এত আপনার এই যে দেহটা—যেটিকে  
আমার আমার করে একেবারে অস্থির হয়েছ,  
এর কোনটা তোমার? এর ওপর কি তোমার  
কোনও কর্তৃত্ব আছে? এই যে স্বাসপ্রশ্বাস  
বইছে, এই যে রক্ত চলাচল করছে, পাকস্থলীর  
ক্রিয়া হচ্ছে—এর কোনটা তোমার উচ্চাধীন? এই  
ক্ষুধা তৃষ্ণা, বায়ু ইন্দ্রিয় বা অস্থিবিক্রিয়ের  
ক্রিয়া, এর কোনটা তোমার কর্তৃত্বে চলেছে?  
দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি, ক্ষীণত্ব-পীনত্ব—কোনটা  
তোমার উচ্চাধীন হচ্ছে? এতটুকু স্বাধীন  
ইচ্ছা বা কর্তৃত্ব নিয়ে বুঝা দেহের ওপর দাবী  
কবে মরছে। তুমি নিজেকে এই আশাবে পড়ে  
কি হয়েছ, আগে ভাব দেখ।

এই সে জগৎজ্ঞান, একে যথার্থ দর্শন  
বলে না। এ একটা বিপণীতমুখী আভাস-  
জ্ঞান মাত্র। বেদান্তের মতে বলছে, হুগলো  
এ কেমন জ্ঞান? যেমন ধর, তুমি একটা  
ঘরের ভিতর বসে আছ। সে ঘরটার দরজা-  
জানালা সব বন্ধ, মাত্র এত একটা জানালা  
খোলা আছে, আর খোলা জানালার বিপ-

ন্নীত দিকে দেওয়ালে একটা আয়না বসান  
আছে। তোমার দৃষ্টি রয়েছে সেট আয়নার  
ওপর। ওই খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে  
জগতের প্রতিবিম্ব যতটুকু যেভাবে পড়ছে,  
তুমি সেভাবেই ততটুকু দেখছো। কাজেই  
এ দর্শন তো সংস্কার দর্শন নয়। এ হচ্ছে বস্তুর  
আভাসদর্শন মাত্র। বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে  
হৃদয়দর্পণেব ওপর যেকোন প্রতিফলিত হয়,  
জীব বা গৃহাঙ্কিত জন্তু, সংসারী বা ভোক্তা  
আমি, তাই দর্শন করি, তাই উপভোগ  
করি।

আর একজন দ্রষ্টা বা সাক্ষী চেতা পুরুষ  
আছেন, তিনি নিগুপ্তভাবে সংস্কারবিশুদ্ধ  
হয়ে দেখছেন। সেট দ্রষ্টা বা সাক্ষী চেতার  
স্বভাবগত উদারবাচী “সামিহের প্রসার।” সেই  
আনিষ্ট পাকা আমি।

পূর্বে যে সামান্য জ্ঞানের কথা বল  
হয়েছে, সে জ্ঞান কাঁচা আমিকে আশ্রয় করে  
রয়েছে। কাজেই সে জ্ঞান কাঁচা জ্ঞান বা  
মিথ্যা জ্ঞান বা আভাস জ্ঞান। দেশকাল-  
পাত্রের ভেদেই সংস্কার। অতরাং দেশকাল-  
পাত্ররূপ গন্তীর বান্ধেদেই পাকা আমির  
প্রসার। সংস্কারে আচ্ছন্ন হলেই জ্ঞান সক্ষীর্ণ  
হয়। বিচার করতে হলে সংস্কারবিশুদ্ধ হয়ে  
কমতে হবে, তবে সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে  
পারবে। সংস্কাররূপ শত্রু হয়, অন্ধকাররূপ  
বুদ্ধিবিচার হয়। তাই বিচার সঠিক করতে  
হলে অন্ধকার পুষ্ট করতে হবে, জ্ঞানের অন্ধ-  
নীগ্রন করতে হবে—শুধু স্বভাববশে বা  
সংস্কারবশে আচরণ করলেই হবে না।

## ভক্তির স্বরূপ

—\*—

ভক্তি কি? দেবধিনারদ বলিতেছেন—সাক্ষী  
কটম পন্নমপ্রমক্কনী। এই  
স্বকটী বিশ্লেষণ করিলে বুঝি, সর্বভূতের শুদ্ধা  
প্রকৃতিই ভক্তি। দার্শনিক খণি বলিতেছেন,  
প্রকৃতির সমস্ত প্রবৃত্তিই পরার্থে প্রয়োজিত,  
—তাহার মাঝে স্বার্থচেষ্টা বিদ্যমান নাই,  
খাঙ্কিতে পারে না। প্রকৃতি পরিণামিনী  
—ক্রিয়ালীলা, প্রসবধামিনী। এই ক্রিয়ার  
উর্দ্ধ ও অধঃ দুই প্রকার পরিণাম আছে। অধঃ  
পরিণামে প্রকৃতির সৃষ্টিগীলা—বৈচিত্র্যের  
শেলক; এই প্রকৃতি পুরুষের স্বেগাখা। উর্দ্ধ  
পরিণামে প্রকৃতির সংহরণলীলা—বহুকে  
সংস্কৃত করিয়া একো পর্যায়সান ঘটাইবার  
চেষ্টা; পুরুষকে অপবৃদ্ধ, বিবিজ্ঞ বা কেবল  
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত প্রকৃতির  
দুই প্রবৃত্তি। প্রকৃতির বাহিরে খাঙ্কিয়া বিচার  
করিলে দেখি, এই উভয় প্রবৃত্তির মূলে  
একই তত্ত্ব; উহা আত্মদান, আত্মসমর্পণ—  
পরের জন্ত আপনাত্মক সব বিলাইয়া দেওয়া।  
আমার অন্তঃশক্তিকে প্রস্ফুট করিয়া ঐশ্ব-  
র্যের বিকাশ করিতেছি—ইহাও পরকে, খুদী  
করিবার জন্ত। আমার সব ছাড়িয়া; কাপা-  
লিনীর এত উদ্বাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি—  
ইহাও পরের স্বরূপবিশ্রান্তস্বার্থের জন্ত। পর  
কাহাকে বলি?—আমা হুইতে যিনি শ্রেষ্ঠ,  
তিনিই পর; ইহাতে মনস্তত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব  
উভয় লক্ষণই পূর্ণমান; জীবের শুদ্ধাঙ্কিত  
স্বরূপই পর। ঐশ্বর্য প্রকৃতি এত পরের সুবেহ  
বাস্তবিক খুদী হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে নিগুন

খাঙ্কিয়া আত্মসমর্পণ বাঞ্ছা করিলে জীবকে দুঃখ  
পাইতেই হয়, অতঃপর আশায় জলিতেই হয়।  
পরের সুখে খুদী হওয়াই তাহার যথার্থ তৃপ্তি,  
যথার্থ সুখ। প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ পরিচরকেই  
বলি ভক্তি।

ভক্তি জীবের স্বভাব—এ কথা অতি  
সত্য। জীবকে জগতের নগ্নে রাখিয়া, শক্তির  
দিক দিয়া যদি দেখি, তাহা হইলে অসঙ্কোচে  
বলিতে পারি—সমস্তটা সৃষ্টিই ভক্তির এক-  
টানা প্রবল উচ্ছাস মাত্র। ভক্তির সার্থকতা  
হয় পূণ্য—যজ্ঞে। যাহাতে মনস্তত্ত্ব বৃদ্ধি ছিল,  
তাহাতে পরকীয় বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করাট যজ্ঞ।  
এই যজ্ঞ, এই পুণ্য, এই সমর্পণের ব্যাকুলতা  
দেখিতেছি সৃষ্টিব অন্তে অন্তে। এত শোভা,  
এত রিলাস, কাহার জন্ত? আবার মরণের  
রিক্ততা জীব প্রকৃতিতে কাহার স্মৃতি আনিয়া  
দেয়? দেহনানাবধুর প্রকৃত আপনাকে  
নিষ্পেষণ করিয়া যে রস আবাদন করে, তাহার  
প্রতি তাহার স্বাভাবিক নতি থাকে না কি?  
যে জীবনে যথার্থ প্যবার সাগর পাটয়াছে,  
মরণের মৃগাখুদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই এ  
নগ্নত্ব জানে। তাই বলিতেছিলুম, জীবনে-  
মরণে, সৃষ্টিতে-প্রলয়ে সমস্ত প্রকৃতি জুড়িয়া  
পরার্থ-সাধনার একটা প্রবল স্রোত মাত্র।  
বাষ্টি আধারে ইহাকেই বলি ভক্তি; সমস্ত  
সৃষ্টিতে হঠাৎ স্বভাব ছাড়া আর কি বলিব?  
অতঃপর ভক্তি জীবের স্বভাব, এ কথা বলিতে  
সঙ্কোচ কোথায়?

প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াধারা অতিপ্রোচ বস্তু

কি? কে তাহার প্রেমাস্পদ? ঋষি বলিতেছেন, “বা—কষ্টে।” এই প্রেমস্বরূপিনী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চক্ষিমাতে, তাহা সেই বৃথি ভাঙ্গ করিয়া গানে না। ইহা সুজের সহজ অর্থ। প্রতিমুখে চাহার আর এক অর্থ পাই। প্রতিতে পরম দেবতাকে বলা হইয়াছে—“কঃ।” কেন তাঁহাকে কঃ বলা হইল, তাহার ব্যাখ্যা যাক্ষ নিকৃষ্টে উল্লখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—“কঃ কমণো বা, কমণো বা, সুখো বা”—তিনি কামীর কাম্য অর্থের সাধন, তাই তাঁহাকে বলি, ক (কম ধাতু); অথবা তিনি সর্বত্র অগ্র-প্রতি, তাই তিনি ক; কিম্বা তিনি সুখ-স্বরূপ বলিয়াই ক। প্রতিতে অন্তর্ভুক্ত আছে—“কঃ ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম।” ব্রহ্ম ক=আনন্দ; ব্রহ্ম খ=আকাশ, নিলেপ; উভয়ত্র একই বস্তুই ইঙ্গিত।

বাকরণ-বিচার দ্বারা ক-এর আর এক রহস্য জানিতে-পারা যায়। নন্দিকেশ্বর বর্ণ বিপ্লব করিয়া তাহার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, “অব্যাকরণে ব্রহ্মরূপঃ স্মৃতিগুণঃ সর্বস্বয়ং”; ক-কে তিনি বলেন প্রকৃতি—“প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চৈব সর্বেষামেব সম্যকম্। সমুত্তমমিতি বিজ্ঞেয়ং কপস্য-ত্বাদিতি নিশ্চিতম্।” সুতরাং তাহার মতে ক=শক্তিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য। আরও একটু রহস্য এই যে, ‘কঃ’ পদকে কিম্বের দিক্টি রূপে গ্রহণ না করিয়া ক স্বরূপেই তাহার সর্বস্বনামই জ্ঞাপন করিবার জন্ত, নিকৃষ্টকার “কষ্টে” দেবায় হাবি বা বোধঃ” এই প্রতি-উদাহৃত করিয়াছেন। এতৎ কঃ খং প্র-সমর্পণের মন্ত্র—অতএব ভক্তির বীজস্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ ইহার উদ্দিষ্ট দেবতা, সর্বস্বনাম

চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত। মহাত্মাযাকার বলিতেছেন, “সর্বেষাং স্বয়ম্, তৎ সর্বস্বনাম।” ক স্বরূপে সর্বস্বনামরূপে ব্যাখ্যাত—ইহা নিগূঢ় ইঙ্গিত বটে; কেননা এক পরমতত্ত্ব ছাড়া যথার্থ সর্বস্বনাম আর কাহাকে বলিব?

বিচার থাক। কেননা বিচার পরস্বরূপেই বিচার। আমরা জীব, আমাদের সাধনা-প্রকৃতির অহুসরণে; আমাদের এইটুকু বৃত্তিতে হইবে, আমাদের প্রকৃতি পরমপ্রেমরূপ। ভালবাসাই আমাদের স্বভাব। উহা স্বভাব বলিয়াই নির্নিমিত্ত প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত। তাই আমরা কাহাকে যে ভালবাসি, তাহা বিশেষ কবিয়া না জানিয়াও ভালবাসিতে পারি। আমাদের প্রেমেই দেবতা, কি জানি কে; তাগ করিয়া জানি না বলিয়া ভালবাসিতে গিয়া হুঃখ পাট, প্রেমের পরম প্রকাশ সকল ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? হে বিচারক, তুমি আমাদের স্বভাব বৃত্তি তাহার পর দোষ ধরিতে হয়, পরিণত আলোর যেমন প্রকাশ করাট স্বভাব, কাহাকে প্রকাশ করিতেছে, সে বিচার সে করে না, তেমনি ভালবাসাই আমাদের প্রকৃতি। আমরা স্বভাবতঃ প্রেমরূপ বলিয়া এই ভূতী ক্ষীণবাহন বেটনীতে বাতা কিছু আসিয়া পড়ে, তাহাকেই “আত্মগ চটয়া জড়াতরা ধরি— আমাদের প্রকৃতি “সর্বৈ কষ্টে প্রেমরূপ।” সে প্রেম অরম না পরম, সে বিচার, হে বিচারক, তুমি পরে করিও। বলিও, “এই প্রেমের বস্তু উৎকৃষ্ট নয়, কাজেই ইহাকে আসক্তি নাম দিলাম; আবার ইহার বিষয় অস্তি উৎকৃষ্ট, অতএব এত পরম প্রেমকে ভক্তি নাম দিলাম।” আমরা দীর্ঘাঙ্কি, উৎকৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির মূল প্রবৃত্তিই প্রকাশিত হইবেক মাত্র। আসক্তি হইতে ভক্তিতে উত্তীর্ণ হইল, ইহাই



আমাদের নিরতি; সুতরাং ভয় নাই—  
স্বভাবের পথে চলিলে কোনও ভয় নাই।

**ভুক্তি অমৃতস্বরূপাঃ।** পূর্বে বাৎস্যাহি,  
উর্দ্ধ ও অধঃ ভেদে প্রকৃতির দুইটি পরিণাম।  
উর্দ্ধ পরিণামে বিবেক বৈরাগ্য; উহাই যোমের  
পূর্ণাভাস, তাক্তর বীজ। অধঃ পরিণামে  
সিসৃক্ষা, আসক্তি; ইহাই সংসারের বীজ।  
সংসার মদন-মরণের লীলাক্ষেত্র। ‘মদনের  
অভিনয়ে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু সে আনন্দ  
যে জ্ঞানীর তীর্থনয়নের বহিঃজালাতে ভস্মী-  
কারে পরিণমিত, তাহা কি জান না? সংসারে  
রতি মুক্তিভা, সে কামবধু। যে রতির বিলাস-  
সজ্জার মদনের সার্থকতা আশা করিয়া তুমি  
উৎফুল্ল হইয়াছ, জ্ঞানী যে দেখিতে পাইতেছেন  
তাহার পিছনে বৈধব্যের করাল ছায়া—  
তাহার আনন্দকুঞ্জের পরিসমাপ্তি অরুণ্ডদ  
বিলাপে। আসক্তির পথ ছাড়িয়া গ্নিরোধের  
পন্থা, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন কর, মরণের ভয়  
থাকিবে না। কামে মরণ, কেননা তাহা আগা-  
গোড়া অভাব দিয়া গড়া; আর প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী,  
কেননা তাহা আমাদের স্বভাব, স্বরূপ।  
ভাবের অভাব বা রূপের অভাবন কি সম্ভব  
হয়?

অমৃতের পিপাসায় কষ্ট জন্মিয়া গেল, কিন্তু  
তাহাকে পাইবার জন্ত মরণের পথে ছুটিয়া  
চলিয়াছি। ইহাই মায়ী। এই মায়ীকে অতি-  
ক্রম করিবার জন্ত প্রকৃতির পরাবর্তন আব-  
শ্যক। প্রকৃতি হুঃখপায়, আপনাকে নিরাশ্রয়  
ভাবিয়া; তাহার বেদনা নিরহেন্দ্র বেদনা।  
তাহাকে আশ্রয় দাও, তাহার বুকভরা ভালবাসা  
সঁপিয়া দিতে পারে এমন অচর্কণ আধার জুট-  
ইয়া দাও—আনন্দের বসন্তহিল্লোলে তাহার  
তরুণ মন যুগ্মিত হইয়া উঠিবে।

অমৃত রসস্বরূপ। রসের প্রতি রতি বা  
পিপাসা প্রকৃতির মজ্জাগত। কিন্তু রসস্বরূপে  
নিমজ্জিত হইয়া একান্ততা লাভ না করলে  
রতির চরিতার্থতা ঘটে না। আমাদের প্রকৃতি  
মাজিয়া আছে রসে নয়—রসভাসে। তাই  
মিলনের আভাস আছে মাত্র—বাস্ত-  
বতা নাই। এই বিচ্ছেদের দুঃখই সংসার  
ক্লেশ। ইহার হাত হইতে নিস্তার পাঠিতে  
হইলে প্রকৃতির শক্তি চাই, রসস্বরূপে আত্মসম-  
র্পণ চাই। সমর্পণ সিদ্ধ হইলেই স্বভাবের  
ক্ষুধা; উহাই অমৃত। “সোমমগম অমৃত  
অমৃতমঃ”—ইহা ভক্ত ঋষির অমৃতভূতির চরম  
সার্থকতা।

ভক্তিতে কি হয়? “সম্প্রসক্তা  
পুমান্ সিন্ধো ভবতি, অমু-  
তো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি”  
—ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃত  
হয়, তৃপ্ত হয়। অগৎ জুড়িয়া দেখিতেছি,  
প্রকৃতির বাসকসজ্জার ভাব। এত আয়োজন,  
এত বিলাস সম্ভার, “কাহার জন্ত? কাহার  
জন্ত এই সম্ভার, সে যদি না আসিল, তবে  
ইহাদের জড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে কি বুক  
জুড়াইবে? হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে না  
কি? মিলনের আশায় প্রকৃতির আয়োজন;  
তত্ত্বগত কাম্য। আশা মিটিলেই কাম্যবিরতি,  
ইহাই সিদ্ধি। কিন্তু এই কাম্যবিরতি জড়ত্ব নয়,  
মৃত্যু নয়—ইহা অমৃতস্বরূপ; কেননা ইহা  
বিরহিণী প্রকৃতির স্বরূপে প্রত্যাবর্তন—চির-  
বাহুজন্তের সহিত চিরমিলন। ইহাই তৃপ্তির  
পরম নিদান। অমৃতের আবাদনেই তৃপ্তি।  
মদনধর্মকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির অধঃ  
পরিণাম, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। ইহাতে চক-  
লতা বাড়িয়াছে—অতৃপ্তিও বাড়িয়াছে।  
প্রকৃতিসু অতৃপ্ত বাসনাই মরণের প্রতিকূল।

তাহার শক্তি আছে—তাই সে গড়ে ; কিন্তু মনের মতন করিয়া তো গড়িতে পারে না—তাই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া গড়ে। এই যে গড়িতে চাহিয়া গড়িতে পারিতেছে না—ইহাই তাহার বুক ছুঁড়িয়া অতৃপ্তির তপ্তশ্বাস জাগাইয়া রাখিয়াছে—তাহার আনন্দের মাঝে মগনের কবাল ছায়া আনিয়া দিয়াছে। অবশেষে যেদিন আপনার সিস্থক্ষকে সে সংস্কৃত করিয়া অতৃপ্তিতে ব্যাকুল আঁপি হুটী উদ্ধৃদিকে তুলিয়া দেপিগ, সেইদিন কোন অজানা পুরুষের সদাজাগ্রৎ জমৃতদৃষ্টির বিনিময়ে তাহার সারা অঙ্গে পুণ্যের বান ডাকিয়া গেল—আপনার সিস্থক্ষার অতৃপ্তিকে সেই দেবতার পায় নিবেদন করিয়া দিয়া সে তৃপ্ত লাভ করিল, অমৃতা হইল, তাহার প্রবৃত্তির সার্থকতা খটিল। যেমন বহিঃপ্রকৃতিতে, তেমনি আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও নিয়ত এই লীলার অভিনয় হইতেছে।

উদ্ধৃদেমাঅনাআনং—ইহা শ্রীভগবানের আদেশ। হুটী আঁখি কি করিয়া হয়? অর্থ এই—পরম পুরুষের আশ্রয় দিয়া প্রকৃতিতে উদ্ধৃদমুখে প্রেরণ করিবে। পুরুষ-প্রকৃতির প্রেমমগ্নপর্কে লক্ষ্য করিয়া উভয়কে আঁখি বলিয়াছেন—প্রাণ আপন, ও তার আপন—হুই-এ এক আত্মা। প্রকৃতির উদ্ধৃদগতি না হইলে কি হইবে? তাহাতে আশা, শোক, ঘেম, আসক্তি, কামচঞ্চলতা—এইগুলি ফুটিয়া উঠিবে। ইহাদের সকলের মূল কথা—

পিরহ। বিরহই আশা জাগায়, আবার হঃখে পীড়িয়া মারে, অপ্রেমের সৃষ্টি করে। আবার আশা হইতে আসক্তি ও উৎসাহও ডাকিয়া আনে। এইগুলি মনের ভাল, কিন্তু মিলনের আনন্দের সহিত তুলনায় ইহারা কি? প্রিয়-জনের সহিত মিলনে আশা, আসক্তি, কাম-চঞ্চলতার বন্ধনও ঘুচিয়া যায়।

এই প্রাণন ধ্বন প্রথম নামিয়া আসে, মানুষ তখন উন্মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারান্নো ভবতি। উন্মাদের আচার বিপরীত—ইহা প্রাকৃত লোকের দৃষ্টি। সংসারভূমিকের দৃষ্টিতে, প্রকৃতির স্বরূপে পরাবর্ত্তনে নির্ণয় তো ঘটবেই। পরমহংসদেব বলিছেন, কুঁড়ে ঘরে হাতী হুকিলে ঘেমন হয়, ভাবে তেমনি হয়। কিন্তু কালে এই আলোড়ন শান্ত হইয়া যায়। সে শান্তি এত নিখর যে বাতিরের কিছুতেই আর তাহা ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। শুদ্ধতার বকে বিকোভের আলোড়ন, তাহাতেও শুদ্ধতা ক্ষুব্ধ হইতেছে না—ইহাই সিদ্ধ রূপ। শ্রীতি বলিতেছেন, “বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।” হুই-এ এক হুটীতে ইহা সম্ভব। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই অঘি বলিতেছেন—ভক্ত্য আত্মারাম। ইহা স্বরূপ-সিদ্ধি। ইহার পরে বিলাস। তাহাই ভক্তির পরমোৎকর্ষ ভাগ্যবতে তাহার ইঙ্গিত আছে—

আত্মারাম্যং মনসো নিষ্ঠা স্বাপারকমে,  
কুর্ন্তা হৈতুকীঃ উত্তমিখভূতগণেঃ হিরঃ॥



## হিমালয়ের পত্র

—: { \* } :—

{ পূর্ব প্রকাশিতের পর }

ওম্ আনন্দম্—আনন্দম্—আনন্দম্। সুগভীর  
রহস্তে ঘেঁসা এট জগৎ—কি অপরূপ তার  
শোভা! এর হৃদয়ে যে ভাবের স্পন্দন,  
তা কি কেউ ধরতে পেরেছে—তার বেদনা  
'কেউ বুঝতে' পেরেছে? কিন্তু প্রকৃতির  
স্পন্দমান হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের খুবটী  
মিলিয়ে নাও—দেখবে আদি অন্ত সব সহজ  
হয়ে গেছে।

একজন আমেরিকান ভাবুক বলেছিলেন,  
“প্রকৃতি হচ্ছে ভাবেরই ঘনিষ্ঠতম বস্তু; বরফ যেমন  
জল হয়ে বাষ্প হয়ে যায়, প্রকৃতিও আমার  
হৈমনি ভাঙে ফিরে যাবে মনের প্রতি-  
ফলনেই জগৎ; জগৎকে আসল তত্ত্বটী  
উন্মোচন করণ মত নিম্নোক্ত ভাবের মাঝে অচ-  
রিত মুক্তি পাচ্ছে। এট জটিল দেখি, সংহত  
বা অসংহত অবস্থাতেই হোক, প্রাকৃতিক পদার্থ  
মনের ওপর সর্বদা অটীকূল বা প্রতিকূল  
প্রভাব বিস্তার করেছে। জড়ে আঁক মাছুষ,  
অপুণ্যমাণ্ডে সংহত মাছুষ, উদ্ভিদগণের  
সম্প্রদায়ী মাছুষ এট হৃদয়গ্রন্থি মাছুষের  
সঙ্গে কথা কহিতে চায়।

এমন হৃদে পাবে; জগৎ যদি আমারই  
কল্পনা, তবে আমার ইচ্ছারূপ তার পরিবর্তন  
হয় না কেন?

এর উত্তরে আচার্য্য গৌড়পাদ বলেছেন,  
অপরূপো দেখছি, চোখা হুঁইয়ারাম বিভক্ত  
হয়ে দেখা দিচ্ছে—একদিকে ওটা বাইরের  
বিশ্ব, আর একদিকে তা অন্তরের বেদনা,

বাগনা ইত্যাদি। সে অবস্থার মনে হয়,  
অন্তরের ভাবগুলি যেন আমাদের অধীন,  
অতএব পরিবর্তনসহ—তাদের সত্তাও যেন  
অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিবিরকে মনে  
হয়, তারা যেন আমার অধীন নয়, তাদের  
যেন একই নিরপেক্ষ কঠিন সত্তা রয়েছে—  
যেমন স্বপ্নে মুগ্ধচাপায় ধরলে মনে হয়।

কিন্তু বাস্তবিক যে ভেগে রয়েছে, তার  
দিক হতে দেখতে গেলে, স্বপ্নের বহিরঙ্গ বা  
অন্তরঙ্গ পরিবার বাস্তবই হোক, আর অস্বাভাবিক  
হোক, উভয়ই তা শুধু ভাব ছাড়া আর  
কিছুই নয়। তা ছাড়া, জাগ্রত ব্যক্তির কাছে  
সে ভাব তার নিজস্ব, তার আপনাতত্ত্ব।  
আবার জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ কতকগুলি  
বহিরঙ্গ বিষয়কে কঠিন অপরিবর্তনীয় সত্তা  
বলে বিশ্বাস করে, আর অন্তরঙ্গ ভাবসমূহকে  
আসত্তা সংজ্ঞা দিয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য  
করনা করে। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে, কঠিন  
বস্তুই হোক, বা বিগল্য সত্তা ভাবসমূহই  
হোক—হুটই স্বপ্নে মত তুচ্ছ। যতক্ষণ  
পর্যন্ত তাদের প্রাণভাগ রয়েছে, ততক্ষণ  
তারা নিজস্ব বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়; যদিও  
ইচ্ছামত তাদের পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না,  
তবু তারা জ্ঞানীরই নিজস্ব চিন্তা। কি করে  
তোমার চুল বাড়ে, তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়,  
বুড়ি তার কোনও প্যাপ্যা দিতে পারে না—  
কিন্তু তা সত্ত্বও তুমি তো তাদের নিজস্ব বলেই  
জান। তেমনি যিনি জীবন্ত, তিনি নিজস্ব

মঙ্গলের আশ্রয়পে অশ্রুতব করেন বলে সন-  
তাকেই তাঁর আপন বলে জানেন। তিনি  
এয়ে পূর্ণ। তাঁর কাছে বস্তুগত বাস্তবই  
হোক, অগাধবই হোক, এক চৈতন্যই  
ক্রমাগত তাদের উদ্ভাসিত করছে—সেখানে  
দ্বিতীয় চৈতন্য তো নাই।

( ৩ )

মশাল ঘোরানো তারতম্যে কোনও  
অসাধারণ ব্যাপার নয়। অল্প মশালটা  
কখনও একটা প্রশস্ত আলোকচক্রের মত,  
কখনও বা সূক্ষ্ম অগ্নিরেখার মত, কখনও  
বুড়াতালের মত, কখনও উর্ধ্বে, কখনও নীচে,  
কত খেলাই গেলে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত  
খেলা কি আশ্রয়ের ধর্ম বহন? এগুলো  
মশাল থেকে হলো না বাইরে থেকে এলো?  
মশালটা বখন স্থির ছিল, তখন কি এই সমস্ত  
খেলা তার ভিতর হুকে গেল? বখন মশাল  
খাওয়া, তখন তারা গেল কোথায়? সমস্ত  
প্রশ্নের জবাবেই আমরা বলব—না। মশালটা  
বখন চক্ৰাকারে ঘোরে, তখনই সে জ্বালা, আঁকা  
বাঁকা কত রকম রেখা দেখা যায়। মশালের  
গতি থামলেই আর এই সমস্ত রেখাখি খেল  
দেখা যায় না। মশালটা দ্রুতবেগে ঘোরবার  
সময় আলোর রেখাগুলো যদিও আমাদের  
চোখে পড়ে, তবুও তাদের সত্য বলতে পারি  
না।

ঠিক তেমনি শুদ্ধচৈতন্যের বেলায়। স্থির  
মশালের মত তার মাঝে বিচিত্র নামরূপের  
কোনও নিদর্শনই পাবে না। বখনই নামরূপ  
দেখা দিচ্ছে, তখনই জানছি, বৃহত্তম মশালে  
আঁকা রেখাচিত্রের মত সেটা নিত্যজুই ফাঁকী।  
এ সমস্ত খেলা চৈতন্যকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে  
না বা মলিন করে না। এসমস্ত খেলার

আলোর সূক্তাকে অস্বীকার করা যায় না বটে,  
কিন্তু আলোতে এই সমস্ত চিত্রের সূক্তা স্বীকার  
করা তো চলে না। তেমনি সমস্ত নামরূপের  
প্রতিভাশ্রয়ের মাঝেই রাম। চছেন প্রাণকং  
ব্রহ্ম—কিন্তু রামে তাঁরা আরোপিত মাত্র।  
মশালের রেখাচিত্র যেমন আনর্তনের দরুণ  
অবাস্তবসত্তা নিয়ে দেখা দেয়, তেমনি নাম-  
রূপের বৈচিত্র্যও চৈতন্যের মায়াশক্তির প্রভাবে  
দেখা দেয়।

“ইদ্রো মায়াভিঃ পুরুষণ জগৎ” শক্তি  
কোন্না শাধীন সত্তা নেই। তার প্রকাশ হতেও  
পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু সে পূর্ণক  
হয়ে থাকতে পারে না। প্রতি বাস্তব জীব  
এই শক্তি চৈতন্যের স্পন্দন বা মন আকারে  
দেখা দেয়। স্পন্দমান মন আর প্রাতিভাসিক  
জগৎ একই বস্তুর এ পিঠ আর ও পিঠ;  
স্পন্দনীন মন আর চৈতন্য একই কথা। মন  
হতে বাসনার খাদ দূর হলে তার চঞ্চলতা দূর  
হয়, জন্ম তা স্থির হয়ে আসে। সম্পূর্ণ স্থির  
হলে মন ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই হল সাক্ষাৎকার;  
এতে মায়া জয় হয়, লগৎ স্বর্গোত্তানে পরিণত  
হয়, হারানো স্বর্গ আবার ফিরে পাওয়া যায়,  
মনে হয়, সৌন্দর্য্য সব জগৎগার উপচে পড়ছে  
যেন। ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেলে সব ভাবনা চিন্তা  
সৃষ্টিদীনন্দক, পরম সুস্বাদু চিবকালের জন্ত  
ডুবে যায়।

একটা যুগ রামের সম্মানেই একটা  
গোপাপ ছিঁড়ল—তবে বলে। কিন্তু নাকের  
কাছে সেটা পড়লে না ধরতেই একটা মৌমাছি  
বেরিয়ে এসে তার নাকের ডুগায় কামড়  
মসাল। লোকটা ভ্রমায় চাঁৎকার করে  
উঠল, গোলাগটা ভায় হাত হতে গলে  
পড়ল।

গোলাপের পাণ্ডিত্যে কি ভ্রমর লুকানো থাকে ? হাঁ, থাকে বটে কি ? ইঞ্জিয়াসক্তির বৃত্ত গোলাপ, সর্ব্বের মাঝে একটা করে ছুঁথের মোমাছি লুকানো আছে। অসংযত বাসনার শান্তি হয় অপরিহার্য্য বেদনাতে।

হে মোহবিভ্রান্ত জীব, নিজকে তুলো না কখনও। গোলাপকে সুন্দর দেখে তুলতে যাচ্ছ কেন ? ফুল যেখানে ফুটে রয়েছে, তুমিও সে সেখানে আছ, তার, রক্তিম, তার সুগন্ধি তো তোমার। রাজার ঐশ্বর্য্য তোমার ; সৌন্দর্য্যের মাদকতা তোমার ; মণিমাণিক্যের দীপ্তি তোমার ! নিরর্থক বাসনা পূর্বে মরুছ কেন, কিসের লোভে ? সর্ব্বময়ের সঙ্গে তোমার ঐক্য অসম্ভব কর। ব্রহ্মের সঙ্গে আপনাকে একীভূত জান। শত শত গোপ-কুমারীর হাতে হাত ধরে রাসোৎসবে যিনি নৃত্য করেছিলেন, সেই ঐক্য যে তুমিই। তুমি প্রাসাদে আছ, সমুদ্রে আছ—উপবনে আছ, মরুভূমিতে আছ—বনক্ষেত্রে আছ, গর্ভ-গৃহে আছ।

উত্তম গিরিশিখর হতে তারস্ববে রাম বলছেন, বারা বলছে আমরা! দুর্ব্বল, আমরা দীনহীন, তারা জানছে না যে তারা রাজ-রাজেশ্বর—তারা সর্ব্ব রাম ! নিজের কল্পনার কারাকন্ড হয়ে থাকো না। জাগো, জাগো—মোহনিদ্রা টুটে যাক—জগৎছত্র উড়ে যাক ! ছুঁথের পাঁকে অসংযত হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছ কেন, যখন জানছ যে তুমিই, সব ঠাই জুড়ে আছ ! আত্মচৈতন্যে সদ্ব্যজ্ঞাৎ হও—সব ছুঁথ দূর হয়ে যাবে। তুমিই যে সর্ব্বস্থলের সার, সকল আনন্দের প্রাণরস তুমি। তোমার কে কতি কবতে পারে ? রামের মোহাই দিয়ে বলাছি, “মুখ্যমনিং বিজি।” পিছিয়ে

আত্মকে যখন জানতেই হবে, তখন আর জানতে বাকী রাখা কেন ? অক্লান্ত অধ্যবসারে, অদম্য উৎসাহে স্থখের পেছনেই না ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছ দিনরাত ? কিন্তু পদে পদে তাতে পরাভূত হওনি কি ? তবে আর এ বোকামী কেন ? ইঞ্জিয়নিবরে স্থখ খুঁজো না। ইঞ্জিয়ের দাস সব।—ছেড়ে দে তোদের বাইরে খোঁজা ! অমৃতের সাগর যে তোমার মাঝে রে। তুমি যে অমিয় হতে অমিয় গো ! তোমার মন আর এই জগৎ ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হয়ে যাক। তোমার ক্ষুদ্র অহঙ্কর আনন্দের পাগলাঝোরায় ভাসিয়ে দাও না।

বাচারে, এই তো মাটির দেহের চূড়ীঘরে আটকি আড়িস্—আর তাবি এত দরদ ? এটা অনায়াসেই শেষ গতি কি হবে, তারই বা এত ভাবনা কেন ? সমস্ত ব্রহ্মের কুসংস্কার কেড়ে ফেল দেগি ! যে আঁগি ব্রহ্মদর্শন করে না, তারক উশড়ে ফেল ! যে হৃদয়ে বাসনা-রোগ বাসা বেঁধেছে, সে চুলোর যাক না কেন ! ব্রহ্মভাবের গিব অভাব এতদূর মুছে ফেল, তোমার সভাস্থিতিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধর। সেখানে নিন্দা নাট, স্তুতি নাট, ক্ষুদ্র সুখভঞ্জেব তবঙ্গ নাট। ব্রহ্মভাবে দেহতনু বোঝাই কর আগে, তাবপর অস্ত্র কপা। এর পর কোথায় বা থাকবে তীর, কোথায় বা থাকবে পাল, কোথায় বা থাকবে তুমি ! হাঁ, এটা ভাঙ্গা দেহতনু আধাছেঁড়া আধময়লা পালে বৈরাগ্যের বঁড়ো হাওয়া এসে লাগুক—ব্রহ্মচৈতন্যের অপার পারাবানের ভেসে যাক সব ! স্বর্গস্থায়ী মাতাল যে, সেট ভো স্থগী। যিনি ব্রহ্ম মাতোয়ারা, মরণ মত-বালা—তিনিই ধর্ম্ম। যিনি আত্মানন্দে বিভোর, তিনিই পূজ্য। ওঁ—ওঁ ! \*

\* শ্রীমৎ বাবী রামতীর্থ

# হিন্দু-মুসলমান

—: { \* } :—

পশ্চিমে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ পাকিয়া উঠিয়াছে, এই খবরটাই কিছু দিন ধরিয়া পাঠিতেছিলাম। এবার বুঝি বিরোধের বিষয় পূর্বেও বিসর্পিত হইতে চলিল। দূরে থাকিয়া কলিকাতার হাজামার যে বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে আশা-আশঙ্কা দুয়েরই অবকাশ আছে দেখিতে পাঠিতেছি। উভয় সম্প্রদায়ের মাঝেই নির্দিষ্টরূপে লোক আছেন, তাঁহারা শান্তি স্থাপনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, বিদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরকে আশ্রয় দিয়াছেন, ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণের স্বত্ব। ধর্মগত অনৈক্য এই হাজামার মূল হইলেও ধর্মবোধহীন ছদ্মবেশের অর্পণোলূপতা অরাজকতার সুযোগ পাইয়া বিরোধকে আরও বনহিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে—এই সংবাদে হৃদয়বিষাদে দুয়েরই কারণ বর্তমান। হয়ত এই বিরোধ মধ্যস্থতিক নাও হইতে পারে—ইহাতে এমন একটা আশা আছে। কিন্তু ইহার স্মৃতি স্নান হইতে না হইতে যদি একটু স্বল্প ধরিয়া অন্তত বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সমস্তা আরও কটিল বলিতে হইবে।

হিন্দুবা হাজামার মার খাইয়াছে বেনী, ইহা শুধু কথায়; ইহাতে যদি তাহাদের নির্দিষ্টরূপে ও সচ্ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে এই ব্যাপারকে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া পাঠ না। দেবতান রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু যুবকেরা সংযত হইয়া প্রাণ বিসর্জনে পর্যন্ত কৃতসম্মত হইয়াছে—ইহা অতি সুখের কথা, বড় আশার

কথা। এই হাজামার নারী জাতি ধর্ম হইতে রক্ষা পাঠিয়াছে—ইহা তাহাদের বড় ভাগ্য বলিতে হইবে। বোধ হয় সহরবাজার বলিয়াই এরূপ হইয়াছে; নতুবা যে-আক্রমণীগ্রামে নারীর যে লাজ্জিনার বিবরণ নিত্য শোনা যায়, তাহাতে হিন্দুর পৌকষের প্রতি বিচার আসে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে। কিছু দিন পূর্বে উত্তরাঞ্চলে এক নীচাভীয়া ধর্মীতা হিন্দুনারীর রক্ষার প্রস্তাবে অতিজ্ঞাত হিন্দু ক্ষুদ্রচেতার মত যে তাচ্ছল্যভরা উত্তর দিয়াছিল, তাহার কথা এখনও মনে অনেক মনে আছে। আবার এই সেদিন আগামেই উল্লেখিত আহোমদের হাতে নিঃসহায় নারীদিগকে সঁপিরা দিয়া বাঙ্গালী মুসলমান প্রাণভরে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছে—ইহাও শুনিলাম। কিছুদিন পূর্বে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বড় লোকের সম্মুখে একটা মাত্র কামোদ্ভূত গোরা এক অসহায়-ভিখারিণীর উপর প্রকাণ্ড রাজপথে অত্যাচার করিয়া নিষ্কৃতি পাইল, ইহাও শুনিয়াছিলাম। এই সমস্ত ঘটনাগুলি মিলাইয়া দেখিলে কি সিদ্ধান্ত হয়? পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র নারীধর্ষণে মুসলমানেরই হাত বেনী, এইরূপ একটা নিরূপায় আক্রোশের কথা শুনিতে পঠিতেছি। উভয় সম্প্রদায়ের ইহাও একটা বিরোধের হেতু হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার মার প্রকৃত তথ্য কি, অপরাধে ভাগ কার কতটুকু, উপরোক্ত তিনটা বিভিন্ন যুগের উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, আজকার নয়, আর কালই যে চলিয়া যাইবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান ছাড়া তৃতীয় এক শক্তি দেশের মাথার উপর রহিয়াছে। এই শক্তি না থাকিলে বিরোধ কোথায় গড়াহত, স্বরাজও কতখানি আগাইয়া আসিত, তাহা ভাবিবার বিষয়। রাজ-শক্তির অপচার নিবারণের জন্ত সংহতির প্রয়োজন; হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তাহা ঘটিতে দিতেছে না। রাজনীতিবিদগণ তাই রাতারাতি উভয় সম্প্রদায়ের বৃকের উপর মিলন সৌধের ভিত গাড়াতে চান। কিন্তু চালাকীর মিলন টিকে কি? দুইটা বুদ্ধিমান মানুষই যৌথ স্বার্থের খাতিরে বহুক্ষণ মিলিয়া থাকিতে পারে না—আর এ তো দুইটা প্রকাণ্ড জাত। ইহাদের মাঝে মিলন কালসাপেক্ষ, ঐতিহাসিক আশুকল্যাসাপেক্ষ।

বন্ধা হইয়া যদি একত্র ঘরকন্না করিতে হয়, তাহা হইলে হাজার বিরোধ থাকিলেও আশোষ না করিলে চলে না। ইতর জাতির মাঝে এই সংঘর্ষ ও সামঞ্জস্যের নীতি চোখের উপরই দেখা যায়; ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিরা দেখিলে মানুষের মাঝেও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বই কি? সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে হিন্দু-মুসলমান মিলিতেছে এবং মিলিলে, ইহা বুদ্ধিতে প্রদর্শিত হইছে। কিন্তু অবাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত এ ক্ষেত্রে চালাকী করিতে গেলে বিরোধ আরও পাকিয়া উঠিলে—এ কথাও ভাব!

এক একটা জাতির মূলগত এক একটা প্রেয়সা আছে; বিবর্তন ঘটাইতে হইলে তাহার মাঝে এই স্বজাতি আকর্ষণ করিয়া শক্তি-চেষ্টার প্রয়োগ করিতে হইবে। এদেশে

হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টান এই তিনটা সভ্যতার মূলে তিনটা ভিন্ন দেখিতে পাঠিতেছি। হিন্দুর জাতীয়তা ব্রাহ্মণ্যভঙ্গমূলক। মুসলমানের ক্ষাত্র-ভঙ্গ, আর ইউরোপের বৈশ্বভঙ্গ। হিন্দুর অতীত বলিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকাশ মাত্র বৃদ্ধি। তার রাজনীতি, যুদ্ধনীতির মাঝেও তৎকথার এত ছড়াছড়ি। হিন্দুর রাজ্য রাজত্ব করিতেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার কর্তৃপক্ষ রাখিয়া আছেন। অথ হিন্দুর কাছে অনর্থ; তাই স্বদেশে থাকিয়া যদি স্বমায়ামে স্বধর্মোচরণ হয়, তাহা হইলে বিদেশে পা বাড়াইবার প্রলোভন কোনও হিন্দুর মনে জাগে না। অনেক বিপ্লবের পর ঐক্য একবার হিন্দুকে টানিয়া উপরে তুলিয়া ছিলেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত—আবার সে রাজ্যও স্বর্গরাজ্য—কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল, কিন্তু হিন্দু তাহার ফলে পাইল ভয়জন্য। অশোকের কীর্তি “গান্ধার হইতে জলধিশেষ” পর্যন্ত ছাইল বুটে—কিন্তু তাহারও আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিকাশ মাত্র। ভাল বল, মন্দ বল, হিন্দুকে ইহাই বিশেষত্ব। হিন্দু ধর্ম বাঁচাইয়া অরাজকতা সহিবে, লাঞ্ছনা সহিবে, মার খাইবে—ইহা তাহার স্বভাব।

মুসলমানের মাঝে ক্ষাত্রভাব প্রবল। যে জাতের মাঝে এই ধর্মের উদ্ভব, আজও তাহার পোষ মানে নাই। এমন কি এই ধর্মের গোড়া পত্তন হইয়াছে তরবারি দিয়া, বিদেশে প্রচার হইয়াছে তরবারির মুখে। Pan-Islamism স্বপ্ন মুসলমান এদেশে বসিয়াও দেখে। আভিজাত্যের গর্ভ মুসলমানের মজ্জাগত; তাহার স্বাধীন জাত, একথা আজও ভুলিতে পারে নাই। বাংলা, ফার্স তুর্কক মূলক হইতে বহু দূরে, তাহি এখনকার মুসল-

মান জলবায়ুর গুণে কতকটা শাস্ত। কিন্তু বতই পশ্চিমে বাটবে, ততট মুসলমানের আভি-জাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাউবে। যে রাজা, সেই গুরু; ইহাতে মুসলমানের উপাসনা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয়তার উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর ক্ষাত্রযুগের কথা স্মরণ কর। ক্ষত্রিয়েরা দেশটা ওলটপালট করিয়া ফিরিত। রাজস্বয়, অশ্বমেধের কল্পনা অত্র জাতি করিতে পারে নাই; তেজ দেপাইবার অভিনব ফন্দী বটে। আর “জীবদ্ভুং হুকুলাদপি”—ইতিহাস পুরাণ তার সাক্ষী। এখনকার হিন্দুর কাছে এ সব স্বপ্ন; কিন্তু মুসলমানের কাছে আজও চহা সত্য। এই তুলনায় মুসলমান সভ্যতার প্রকৃতি বুঝা যাইবে।

ইউরোপের বৈশ্বতন্ত্র। শুধু ইংরেজ বলি না, কেননা আমরা ইংরেজের অধীন তো নই শুধু—গোটা ইউরোপের বাণিজ্যকুল জাতি মাত্রই আমাদের রাজা। ইহার তপস্তা করে না, লড়াই করে না, কিন্তু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ইষ্টসিদ্ধি করিতে জানে। আজ জগৎ বৈশ্বতন্ত্রের অভ্যাস। যারা জগতে আজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব করে, ব্রাহ্মণের দৈত্য তাহাদের কাছে উপহাসের বিষয়; হাতাহাতি করাটা অসম্ভব। চাই অর্থ, চাই বিলাসোপকরণ; যাব টাকা করিবার ঝঁকির জন্য আছে, সেই রাজা। আমেরিকা গত যুদ্ধে হাতেমতে লড়াই করে নাই—কিন্তু যুদ্ধে জিতিয়াছে সেই।

শুধু হিন্দু মুসলমানে নয়, ভারতবর্ষে আজ এই ত্রৈবর্ণিক তন্ত্রের মাঝেই লড়াই শুরু হইয়াছে। জগতে শ্রেষ্ঠ তন্ত্র নব জাগিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতেছে, ইহার আগিলে, লড়াইটা আরও পাকিবে।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধ—এটা অবাস্তব কথা। অন্ততঃ ধর্মের দোহাই দিয়া লড়াই করিবার মত মুখ মুসলমানের নাই। আদৌ রায় মুসলমানধর্মের সন্মতি হইয়া গিয়াছে। এখনকার মুসলমান দূরে আছে, তাই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না। ধর্মকে বাধ দিয়া সেখানে মুসলমান রাষ্ট্র গড়িতেছে। ইউরোপে ইহার পরীক্ষা হইবে—বৈশ্বতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষে। কিন্তু ধর্মের মুখের খসিয়া পড়িলে এখনকার মুসলমানের থাকিবে কি? থাকিবে আভিজাত্যবোধ, ক্ষাত্র উত্তেজনা। আজও মুসলমান তাহাই নিয়া লড়িতেছে—ধর্ম একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে পূর্বেও এদেশে একবার বিরোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বহু সহিয়া শেষে পরশুরামের জয় দিয়াছিল। ক্ষাত্রশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া শেষে তাহার কুলধ্বংস করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছিল, তাহারা বোধহয় শাস্ত শিষ্টই হইয়াছিল। গ্রহীটা সভ্যতার আদর্শ পরম্পরের সংঘর্ষে শেষে এই সামঞ্জস্য পরিণত হইল। পুরাণকারের এই রূপকের পুনরাবর্তন হইবে কি? অবশ্য পরশুরাম যে মাতৃঘাতী একথাও ভুলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণকুলেও পরশুরামের প্রয়োজন আছে। তাই পরমানন্দ ঠিক বলিয়াছেন, “হুকুল আর সবলে মৈত্রী হাসির কথা। ‘ভেড়িয়া’ আর ‘ভেড়ে’ কখনও দিক হয়? ছাগের অহিংসায় বাঘের হিংসা দুই হয় কি?” বর্তমান সমস্তা হিন্দুকে এই দিক হটেতেও ডাবিতে হইবে।

বিপ্লবের প্রতীকার কি করিয়া হইবে, ইহা সকলেই চিন্তা করিতেছেন। বল অবশ্য



সুদূর ভবিষ্যতের হাতে, কিন্তু কাজ তো এখন  
হইতেই শুরু করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের  
জয় হইবে, ইহা বিশ্বাস করি, কিন্তু ধর্ম তো  
হ্রস্বলের ক্রীড়াপুত্তলী নয়। বর্তমানে হিন্দু  
সবল কি? হ্রস্বলের ক্ষমায় অন্যায় নিবারণ  
হয় না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহন হইতে হইলে  
কীথ শক্ত করিতে হইবে। সমাজের অধস্তর  
পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বীৰ্য্য সঞ্চার করিতে

হইবে—শুধু শাস্ত্রের কাক। বুলি আওড়াইয়া  
নয়, বার্থ্য করিতকর্ম্ম হইয়া। হিন্দু গোড়াই  
হউক অথবা উদারত হউক, সে হিন্দুত্ব এখনও  
তাহার হয় নাই বলিয়াই মনে করি। একাগ্র  
চিত্তে স্বপক্ষাচরণ করিয়া হিন্দু বলসংরক্ষণ  
করুক, ব্রাহ্মণ্যদায়িত্বকে বহন করা তবেই  
তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে—সর্বপ্রকার  
বিরোধের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই জয়ী হইবে।

## ধরা পড়া

এতদিন তবে বঁধু,  
বুঝেছি কি ভুল।

অক্ষুট বেদনা দিয়া  
তোমারে গড়েছে হিয়া,  
কৈদেছে স্মৃতির ঘিরি

বাসনা ব্যাকুল;—

এ শুধু আমারি ব্যথা,  
আনন্দ বিপুল—

ভেবেছিলাম এতদিন,  
সে কথা ক্রি ভুল।

তোমারো আঁখিতে এ কি,  
অশ্রু দেখা যায়।

ক্ষুরিয়া অধর দুটি

আকুলতা রহে ফুটি,

গোপনে বকেম মাকে

বেদনা ঘনায়;—

তোমারো পরাণ তবে  
আমারেই চায়।

নহিলে আঁখিতে কেন

অশ্রু দেখা যায়।

আর কোথা বাবে বল,

পড়িয়াছ ধরা।

বিরহ নহে তো বঁধু,

আমারি হিয়ার মধু,

তোমারো পরাণখানি

কাঁদনেতে ভরা;—

মিছে কৈন কাছে এসে

দূরে সরে পড়া।

চকিতের আঁখিজলে

পড়িয়াছ ধরা।

## ছাত্রগণের প্রতি.



“ছাত্রাণামধ্যনং তপঃ” ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্বী। অর্থাৎ ছাত্রগণ জ্ঞানার্জনের জন্যই সকল চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিলে। এই সময়ে অল্পবিশিষ্ট চিন্তা ও চেষ্টার চিন্তের গতি বিভিন্নমুখী হইলে একাগ্রতা জন্মহীন হইতে পারে, সুতরাং সম্যকরূপে জ্ঞান অর্জন হয় না। এই জন্য প্রাচীনকালে আমাদের দেশে গুরু-গৃহে একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণ জ্ঞানার্জনে রত হইত। প্রকৃতির উনুকে উদার কৃত্রিমতাবিজ্ঞিত নিভৃত লীলাক্ষেত্রে এই আশ্রম জীবন সদৃশরূপে ব্যয়িত হইত। সেখানে সংসারের আবির্ভাব স্থান পাইত না, সুতরাং ছাত্রগণের জীবনেও কোনরূপ আবির্ভাব প্রবেশ করিতে পারিত না। তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বভাবানুকূলেই গঠিত হইত। অকাজ-পকতা দাব তাহাদের ভিতর আসিত না। তাহারা রাজাপ্রজা, ধনীদীন নির্বিশেষে মনুষ্য-সম্মানরূপেই প্রতিপালিত হইত; সুতরাং আভিজাত্যের বা পদমর্যাদার দ্বারা তাহাদের শিক্ষার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইত না। যাহার ভিতর যে বীজ থাকিত তাহাই সুপরিণত হইয়া সময়ে ফলে ফুলে সুশোভিত হইত। শাস্ত্র-দিতে যে সকল সত্য লিপিবদ্ধ আছে, ছাত্রজীবনে পরীক্ষা করিয়া তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবারও তাহাদের সুযোগ ঘটিত। সর্বোপরি আচার্য ও গুরু তাহাদের নিকট জীবন্ত শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপত্ত হইতেন। সুতরাং শ্রেষ্ঠব্যক্তি বৈরূপ আচরণ করেন, তদনুসারে ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করেন—এই

সত্য সফল হইয়া। ছাত্রগণের জীবন মধুর করিয়া তুলিত।

শিক্ষাকালেই যাহাদের লিঙ্গা ১০ উপস্থিত হইত, তাহারা সাক্ষাৎসন্দর্শন ও জগৎপরিভ্রমণ জন্ত জীবন উৎসর্গ করিত। আর যাহারা এই উভয়ের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইত, তাহাদিগকে গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিতে হইত। পূর্বের সংযম, শিক্ষা ও আদর্শ পবন থাকার তাহার। এই পরীক্ষার অবশিষ্ট উত্তীর্ণ হইতে পারিত। তখন তাহারা আবার উচ্চ উচ্চতর জ্ঞান লাভের প্রয়াসী হইয়া তদনুকূলে জীবন বাপন করিয়া পূর্ণতা লাভ করিত। এইরূপে প্রত্যেকের জীবনে পূর্ণতা লাভ করাই সে কালের আদর্শ ছিল। সে যুগে এমনভাবে সমাজ সংগঠন করা হইতছিল যে উভার সর্বত্রই শিক্ষাকেন্দ্র এবং সমস্ত ব্যবস্থাই মনুষ্য জীবনের সুস্বার্থে লক্ষ্যমুখী। এই শিক্ষার মনীষী, ব্রহ্মগণ, ব্রাহ্মণ, কায়িক ও ভিতরে নিয়োজিত ছিল না। মনুষ্যমাত্রেরই এইরূপ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে জীবন বাপন করিয়া সেই একই লক্ষ্যমুখে, ধাবিত হইত। সমাজ-শৃঙ্খলার ভিতরেও কোন বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণ ছিল না। গুরুকর্তৃক অল্পমানে সমাজের বিভিন্ন স্তর থাকিলেও লক্ষ্য এক ছিল বলিয়া সকলের ভিতর সহযোগিতা ছিল, বিরোধ ঘটিবার কোনই কারণ ছিল না।

বর্তমানে বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত

হইয়া ভারত সেই আদর্শ ভুলিয়াছে। ভারতের পূর্বোক্ত উচ্চতম আদর্শই দেশের প্রাণ। দেশকে জাগাটতে হইলে আবার এই আদর্শকে জাগাইতে হইবে। দেশকে জাগাইবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত রোগ নির্ণয় না করিতে পারিলে যেমন নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিফলমনোবৎ হইতে হয়, আজ দেশের পক্ষেও তজ্ঞা অবস্থা ঘটিয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষাক্ষেত্রের ও আদর্শজাতীয় শিক্ষার অভাবে আমরা দেশের একমাত্র আশাতরঙ্গাঙ্কল কচি ও কোমলপ্রাণ বালক-বালিকাগুলিকে ক্রুর অধঃপাতের পথে পরিচালিত করিতেছি, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। আমরা স্বরাজের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কিন্তু এই স্বরাজ রক্ষা করিবে কাহার? যাহারা শিক্ষার দীক্ষায়, আচারে ব্যবহারে, চলে চলনে বিলাসব্যাসনে সম্পূর্ণ পরদেশী ভাবাপন্ন হইতে শিক্ষা পাইতেছে, তাহারা কি স্বরাজ রক্ষা করিবে? মুখে বলিতেছি স্বরাজ, আর মনে প্রাণে মানিয়া নিতেছি বৈদেশিক শ্রেষ্ঠতা। ছেলেরা শিক্ষা পাইতেছে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অতিরঞ্জিত। নানা দেবদেবীর ভজন, সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার, জাত্যভিমান, অশ্রদ্ধা, দোষ, আচার-ব্যবহারে গোপ্যকপুরুষদে অসভ্যতা ইত্যাদিকে আমরা বিব্রত; আর যাহা কিছু বৈদেশিক তাহা ধর ভাগ। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি পাঠের অবসর ছাত্রগণকে দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে বাল্যকাল হইতেই বৈদেশিক ভাষার মূল বৈদেশিক শাস্ত্রবিজ্ঞান ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহাও সর্বদা বিদেশী শিক্ষকের নিকট। কাজেই

সর্ব্বতোভাবে বৈদেশিক আদর্শের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া তাহারা যে তাহার প্রভাবে হইতে মুক্তি পাইবে, ইহা অসম্ভব। আবার বাল্যকাল হইতে এই ভাব অস্থিমজ্জাগত হওয়ার তাহাদের স্বদেশীয় ভাবও যে লোপ পাইবে, ইহাও অবধারিত। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই আমরা চালচলনে আহারে বিহারে যোগ আনা বিদেশী ভাবট দেখিতে পাই। ইহানাই আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শজনীন। সুতরাং দেশবাসী যে তাহাদের অনুকরণ করিয়া বৈদেশিক ভাবাপন্ন না হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? এত বৈদেশিক ভাবাপন্ন দেশের স্বরাজলাভের প্রয়াস উপহাস্যম্পদ নহে কি?

বৈদেশিক শিক্ষা, বৈদেশিক পানিপার্শ্বিক ও বৈদেশিক আদর্শ আমাদের দেশের শিক্ষিতের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে। তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের দেশে, উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে হাকিম, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার ও প্রফেসর। এত সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই কতটা স্বদেশী ও কতটা বিদেশী ভাবাপন্ন, তাহা তাহাদের আসবাব, গোষাক, পানিভোজন, যানবাহন দেখিলেই টের পাওয়া যায়। তাহার পরেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ। ইহাদের বেশভূষা, আচারব্যবহার ও অসংখ্যের ভাব দেখিলেই বুঝা যায়, উহার বৈদেশিক আচার ব্যবহারে কতটা তালিম দিতে শিখিয়াছে।

শিক্ষার আদর্শে বৈদেশিক প্রভাব পড়িয়া আমাদের কতটা স্বরাজ হইতে দূরত করিতেছে, তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমরা দেশের অনুকরণ ব্যাধি করিয়া করিয়া

তাহারাই প্রতিকারে প্রয়াস পাঠিতেছি। বৃক্কের মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখাপ্রশাখার মূল দিলে যেমন বৃক্কটিকে রসগ্রহণে সাহায্য করা হয় না, সেইরূপ আমাদের সর্ববিধ চেষ্টা আমাদের, অজ্ঞতার ব্যর্থ হইতেছে।

আমাদের দেশে এই দেড়শ' হুশো বৎসর ধরিয়া বৈদেশিক শিক্ষা পাইয়াও আজও শতকরা ৯০ জন মূর্থ রহিয়া গিয়াছে। দেশের এই মূর্থের দোষ ঘুচাইবার জন্য আজ যদি দেশেব লোক উদ্বিগ্ন, পড়িয়া লাগিত, তবুও বুঝা যাউত, কতকটা রোগ নির্ণয় হইয়াছে। কিন্তু না, যেন কে একেবারে বিস্ত্রিপণে ছুটিয়াছে। দেশে যাহা কিছু আন্দোলন আলোচনা কেবল কতকগুলি পাশ্চাত্যশিক্ষিত মুষ্টিমের লোকের মধ্যে। আর তাহা মুখে, কাজে নয়। কারণ মনে প্রাণে দেশের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাট। তাহারা দেশের স্বাধীনদিষ্ট কোনপ্রকার আচারঅনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহে। কারণ পাশ্চাত্যশিক্ষিত খৃ. কম লোককেই স্বাধীনগণের পন্থা অনুসরণ করিতে বা তাহাদের প্রদর্শিত সত্যের অনুশীলন করিতে দেখা যায়। কাজেই বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত লোক দিয়াও আমাদের দেশের প্রকৃত কাজ হইবে না।

আমাদের প্রাচীন আদর্শাঙ্গীকারী জীবন-বাপনকারী সাধুহ্রদয় ব্যক্তিগণই আমাদের প্রকৃত আদর্শ এবং তাহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একমাত্র ধোয়া আচার্য্য বা গুরু। ইহারাই যখন এই দেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন ও কলুষিত সমাজ হইতে বালকগণকে উদ্ধার করতঃ পুরুষের উন্নয়ন ও নিভৃত স্বভাবকেই গুরুগুরুত্বপূর্ণ আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রে বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবেন, তখনই দেশে প্রকৃত কার্য্য

হইবে। দেশকে উদ্ধারের অল্প পন্থা নাই। “নাভ্যঃ পন্থা বিত্ততে অরন্যায়।”

এই দেশেই ব্যাস বায়ীকির জায় আদর্শ যশি, শঙ্কর বৃক্কের জায় আদর্শ ত্যাগী, গৌর-দেব জায় আদর্শ প্রেমিক, মুখাতির বামচন্দ্রের জায় আদর্শ রাজা, জনকের জায় আদর্শ গৃহী, মীতাসাবিত্রীর জায় আদর্শ রমণী, লক্ষ্মণের জায় আদর্শ ভ্রাতা ইত্যাদি কতকটা জানাযাছেন। দেশের জলবায়ুর গুণে এখনও মহাপুরুষ ও গুরু জ্ঞানীর অভাব নাই। উচ্চ আদর্শ খুঁজিবার জন্য আমাদেরকে অত্র দেশে অনুসন্ধান করিতে হইবে না। এখনও এই দেশের মাটিতে কত ভাল জিনিষের বীজ লুপ্ত আছে। অনুকূল আবহাওয়া পাইলে তাহাতেই অসুপারদগম হইবে। কিন্তু সেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা চাহ। একমাত্র শিক্ষা-গুণেই এই দেশ উন্নত হইয়াছিল, আবার শিক্ষাবারাই দেশকে উদ্ধার-করিতে হইবে। দেশের একমাত্র অভাব শিক্ষার।

অমুক নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, অমুক বিপথ-গামী হইয়াছে, অমুকের দোষে দেশের এই হৃদিশা ইত্যাদি বলিলে দ্বিতীয় উর্দ্ধে নিক্ষেপের জায় তাহা নিজের গারেক আসিয়া পড়ে। সুতরাং এইরূপ কলমে সময়পাতনা করিয়া আমাদের একযোগে কর্ত্তব্য প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দেশের যখন শিক্ষার অভাবই প্রকৃত রোগ, তখন এই দিক্কে সকলের সমবেতভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা পাশ্চাত্যের বহুঅভ্যর্থনাপ্রাপ্তি বিলাসবাসনমুখী না হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শ সংযম ও তপস্যার ফুটিয়া উঠুক। আমরা আবার, বাহুব হই। আবার দেশভার মেধা দেবচরিত্র ফুটিয়া উঠুক। জনতের আদর্শ এই দেশে ছিল,

আবার ইহাকে আদর্শ হইতে হইবে—পাশ্চাত্যের মিত্যা ত্রাসিত্ব অমুসরণ করিয়া নহে, সত্যের অমুসরণে বীৰ্য্যলাভ করিয়া।

বিলাসকলমে বীৰ্য্যগানি হয়, সংযম বীৰ্য্যলাভ হয়। এই সত্য প্রাচীন ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐশ্বার্য্য এই সত্য সমাজকে দান করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাধনার মূলে এই তপস্তা, যে তপস্তায় যে সংযমে আমাদের বীৰ্য্য অর্থাৎ শক্তিলাভ হইত। এখন ক্রামর্য্য সংযমের নামে ভীত হই। এই সংযমের অভাবে আমাদের বীৰ্য্যগানি হইয়াছে। আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া চিন্তা ও দেহের উপর বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে।

সেকালে চাত্রগণ গুরুগৃহে সংযম ও তপস্তার অমুকুল ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিত। এক্ষণে সে গুরুগৃহও নাই, ব্রহ্মচর্য্যও নাই। সুতরাং সংযমের ক্ষভাবে চাত্রগণ বীৰ্য্যহীন হইয়া আর প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না এবং এইরূপ বীৰ্য্যহীন হইয়া সংসার ধর্ম্ম ও যুগাযম পালনে সক্ষম হয় নী। এই বীৰ্য্যহীন পিতার সন্তানগণ অরাস্য, ভগ্নবাস্তা, মুর্থ ও অজ্ঞান হইয়া পাকে। এই সকল সন্তানগণই কালে সমাজ পূরিচালন করে। সুতরাং সে সমাজের, সে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অন্বেষ্য। আমাদের বর্তমান লক্ষ্যের এই হৃদদর্শন।

দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া দেশের ভাবী কল্যাণও কিরূপ ভীষণ দাঁড়াইবে, তাহা দ্রষ্টব্য করিতেও হংকল্প হয়। ছাত্রগণকে বলি, স্তোমর্য্য এখনও সুাবধান হও। শ্রোত্রে গা ভুসাইও না। দেশ যে কিরূপ উৎসন্ন পথে ছুটিয়াছে, তাহা

বলিবার নহে। শিক্ষার কথা ঘুরে থাক, শিক্ষাক্ষেত্রগুলি এখন এমন ভাবেই কলুষিত হইয়াছে যে, ১৩১১ বৎসর কি ভয়ঙ্কর হইতে বালকগুলি সংসর্গমায়ে অনৈসর্গিক উপায়ে মৃত্যু কর করে। এই ব্যাধি একরূপ সংক্রামক হইয়াছে যে স্কুল কলেজের কোন ছেলে এমন নাই যে তাকে ঐ রোগে না পাটিয়াছে। এই সকল বালক ইহার বিষময় ফল না বুঝিয়া অপরিণত, অপরিপুষ্ট শুক্র অনৈসর্গিক উপায়ে ব্যর্থ করিতে করিতে যখন একেবারে হতশুক্র ও ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়, তখন আর কোনও উপায় থাকে না। একরূপ কঁত ছেলে যে অফালে কালকবলে পতিত হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। ঐ সকল বালক যখন উহার পরিণাম বুঝিতে পারে, তখন গোপনে চিকিৎসকের শরণাগত হয়, কিন্তু চিকিৎসকের অর্থোপার্জন ছাড়া রোগীর আর রোগপ্রতিকার হয় না। তখন নানারূপ কষ্ট ব্যাধির কবলে পড়িয়া জীবনের গণা দিন করুণা চাহে তাশেই কাটাটতে হয়। তখন তাহাদের জীবনে দিকার আসে; কিন্তু তখন কাঁদিলে কি হইবে! এই ত বর্তমানে ছাত্রদের অবস্থা! পিতামাতা ছেলেদের এই অবস্থা, যে না জানেন, এমন নয়। কিন্তু জানি-য়াই বা কি করিবেন? দেশ যখন এত দিকেই ছুটিয়াছে, তখন তাহার গতিরোধ করিবে কে? এতটুকু সাহস ও বীলবীৰ্য্য লইয়া আজকাল গৃহীণা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম উদ্‌ঘাপন করেন! সুতরাং এই বীৰ্য্যহীন সমাজের হৃদদর্শন যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

হে বালকবালিকাবৃন্দ, তোমরাই দেশের একমাত্র আশাভরসাহস্র, তোমরা তোমাদের এই অজ্ঞানকৃত দোষ দূর করিতে

চেষ্টা কর। তোমরা ছাত্রজীবনে তপস্বী ও সংযম দ্বারা বীৰ্য্য লাভ কর, শক্তিমান হও। তোমরাই দেশকে পরিচালিত করিবে, তোমাদের উপরই দেশের আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। তোমাদের এই অমূল্য জীবন ক্ষণিক উত্তেজনার বশে বিষময় করিয়া তুলিও না। তোমরা দেশের ভারস্বরূপ না হইয়া দেশের ভার লাঘব করিবার উপযুক্ত হও। তোমাদের সম্মুখে প্রস্তুত কর্মক্ষেত্র। বালসুলভ চপলতাদোষে তোমাদের সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ নষ্ট করিও না। যদি সমাজ তোমা-দিগকে এখন সাহায্য না করে, তোমরা তোমাদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চেষ্টা কর—স্বাবলম্বী হও। সংযত হও, তপস্বী হও, বীৰ্য্য লাভ কর। দেশ আবার তোমাদের পাইয়া ধন্য হউক। এই ঋষির দেশ আবার ঋষি হও। আবার গুণী জ্ঞানী হইয়া এই ভারতের মুখ উজ্জ্বল কর। পরানুকরণ পাপ, পরমুখাপেক্ষী হওয়া পণ্ডবৃত্তি। এই পতিত দেশে, এই পরপদদলিত দেশে বিলাসবাসন, হঠকারিতা, বাহ্যভবনপ্রিয়তা শোভা পায় না। এই নিরন্ন দেশে কতলোক অনাধারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ বা অর্ধোলঙ্গ রহিয়াছে, চিকিৎসাতাবে কত লোক অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে, শিক্ষার অভাবে কত লোক মূর্থ রহিয়াছে। তোমরা

দেশবাসী কুলীমজুরের জায় অন্ন কর্তৃক লালিত ও অপমানিত ভাবে জীবনপাত করিতেছে। আর তোমরা কি উচিত, এত বিলাসবাসন, এত আনন্দপ্রমোদ, হাটকোট, চসমা, বড়ি, মোটর, এই সকল ব্যবহার এই পরাধীন নিরন্ন দেশে শোভা পায়? ইহাতে নিজের জাতভাইকে উপহাস ও উপেক্ষা করা হয়, নিজের ইহাতে হীনতাই প্রতিপন্ন হয়, কিছুমাত্র বাহ্যছবি প্রকাশ পায় না।

সুতরাং হে প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, তোমরা জাতীয় জীবন হইতে এই কলঙ্ক অপনোদন কর, তোমরা আদর্শ চরিত্রবান হইয়া দেশের অত্যা-দ্র কর, আর সত্যপিপাসু হও। আবার সংযম তপস্বীর উপর তোমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠুক, আবার ত্যাগ বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠুক। ইহাই আমাদের জাতীয়ত্ব, ইহাই আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষা—যার জন্য এক দিন এই ভারত জগৎপূজ্য হইয়াছিল। এই ভারত চিরদিনই জগৎকে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দান করি-য়াছে। কাহারও কাছে কোন দিন কাদাল বেশে কিছু প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু, আমরা আমাদের সে গৌরব হারাইয়াছি তখনই যখনই আমাদের পুত্রগকে আমরা হারাইয়াছি—আমাদের বৈশিষ্ট্য আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই।

## সহজ সাধন

—{#}—

চিবহন সত্যকে যদি মানুষ কণিকের উচ্ছ্বাস  
বশেও আবিষ্কার করে, তাতে সত্যের মর্যাদা  
ক্ষুণ্ণ হয় না, অথবা তার কল্যাণ প্রভাব হতে  
মাহুদ বঞ্চিত হয় না। কিন্তু উচ্ছ্বাসে নিরতি-  
তয়ে গেলে কার্যক্ষেত্রে যখন আর সে সত্যের  
সাক্ষ্য পাওয়া যায় না, তখন অদিশাসী মন  
অকর্ণগাম্য অগবাসী সেই সত্যের ঘাড়েই  
চাপিয়ে রেখাট খেতে চায়। সে ভাবে, তখন  
আমি যা ভেবেছিলাম তা ভুল, নইলে  
তার নির্দেশ মেন পথ চলতেও ভুল হল  
কেন? তখন নূতন আর একটা সত্য আবি-  
ষ্কারের চেষ্টায় মাহুদের মন উত্তেজিত হয়ে  
ওঠে। তার চোখে পুরাতন সত্যকেই জাঁকড়ে  
ধরে গ্রাণপণ চেষ্টায় তার চরম রূপটা দেখবার  
কাজ যে সাধক বাগ্ন হয়ে ওঠে, মনের এই  
নির্ভর ভুলনা ও আত্মবন্দ হতে সেই সত্য সত্য  
বের হয়।

একটা উদাহরণ দিই। গুরুব কান্ত  
পেয়ে যখন আমবা সেবার্ত্তের দীক্ষ গ্রহণ  
করি, তখন নব অস্ত্রাগের প্রবল উচ্ছ্বাসে  
মনেছিলাম—হুজ কর্ত্তই সত্যান্তের পথ।  
সাদানুসঙ্গত্ব বস্ত্ত তত্ত্বা অধ্বানের মোটেই  
কোনও বাগ্নতা ছিল না। আজ হয়ত সত্যকে  
পাশর ভক্ত্ত আমবা, বাগ্ন হয়ে উঠেছি, অথচ  
এদিক কর্ত্তভাগ করে বসে আছি। ভাবছি,  
পাওয়ার একটা নূতন স্কিকর খুঁজে বার  
করতে হবে; হয়তো সেটা পান্নে আছে,  
নয়তো জানে, নরতো ভাবুকতায়। কিন্তু  
সহজ কর্ত্তের পথটা যে পর্যন্ত বাচাই না হচ্ছে,

সে পর্যন্ত মনকে নূতনের লোভে দিশেহারা  
করা কি সমীচীন হবে? এই কি বলব  
স্বৈর্য্যের অক্ষণ?

ইষ্টমুখি কে না চায়? আর কেউ বা  
না জানে যে ইষ্টমুখী স্থল নয়; তার ভাবে  
গড়া তত্ত্ব, আর সেই অতত্ত্ব তত্ত্বের সাধকের  
জগৎ আচ্ছন্ন করা যায়, তার কাছে তার ইষ্ট-  
মুখিই নিত্য জগন্মুখি। কিন্তু সাধাধন নজরে  
সামনে দেখছি, এই অতি স্থল, অতি কঠিন  
জগতের বাস্তব মুখি। এর মাঝে হিসাব  
নিকাশ, দায় কাসাদ রোগ শোক সবই আছে  
—অভাব শুধু ভাবের। যখন এই জগতের  
উৎপীড়নটাই জীবনে বিভীষিকা রূপে দেখা  
দেয়, তখন মনে হয়, আমার মনঃকল্পিত  
নন্দনবনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কোথায়?

সামঞ্জস্য নাই, তা মানি। কিন্তু সেই  
সামঞ্জস্য নষ্টানোর জীতাই তো সাধন। সিদ্ধ  
দৃষ্টিতে এই স্থল জগতের অন্তরে বাহিরে  
স্বপ্নেরই জ্যোতির্কর সত্তা চোখে পড়ে। কিন্তু  
অপারকের চোখে যদি তা না—উপড়ে, তাতেই  
কি তার বাস্তা মিথ্যা হয়ে যাবে? নন্দন  
কাননের স্বপ্ন দেখলেই তো হবে না, নিজের  
ভিতর যে মালমশলা আছে, তাই দিয়ে না  
নন্দনকানন তৈরী করে নিতে হবে।

এই স্বর্গ তৈরী করার বায়নাটাই মাহুদের  
মহুয়ায়। এতখানেই তাব সাধনা—পৌরুষের  
যাচাই। অবসিক উপহাস করে বলেছিল,  
“নিজের দেবতাকে যারা নিজ হাতে সৃষ্টি করে  
তাঁতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আত্মপদ্মা

কত ! তারা আবার প্রাণ পাবে কিসে ?  
কিন্তু আমরা বলি, পৌত্তলিকতাই বৈদান্তি-  
কতার চরমাদর্শ। যে দিন ভয় থাকবে না,  
দ্বিধা থাকবে না, সংশয় থাকবে না—একবারে  
নিজের হাতে নিজের ইষ্টদেবতাকে গড়ে  
তুলতে পারব—তাও শুধু ভাবের বাস্প দিয়ে,  
নয়, এই কর্মজগতের কঠিন বাস্তবতা দিয়ে,  
ঠিক আমার মতই মাটি দিয়ে তাকে গড়ে  
তুলতে পারব, সেই দিনই আমার সিদ্ধি।

তাই বলি, সহজ কর্ম ছাড়া সহজ সাধন,  
একান্ত সাধন, সূত্য সাধন আর কোথায়  
পাখ ? সংঘম তার পথ, মনন তার শক্তি।  
বাঁচে-মরে জগতে সবাই, কিন্তু সে খবর জানে  
কয় জনা ? জন্মমৃত্যু রোধ করাটা তো আমার  
মুক্তির গরজ নয়—আমার মুক্তি হচ্ছে, সেই  
জনাতে। জানতে হলে শুধু চোখ মেলে  
চাইতে হয়—সত্যের আলো আপনি এসে  
চোখে পড়ে। এর মাঝে আজওপি সাধনার  
ঠাই কোথায় ?

## ধ্যানযোগ

[ প্রবন্ধ—আচার্য্য নীলকণ্ঠ ]

আজ্ঞা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া তাঁহার  
সাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে  
হয়। ধ্যানের চারিপ্রকার আশ্রয় বা  
আশ্রয় ভেদে ধ্যানযোগ চারি প্রকার।  
পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই চারি প্রকার আল-  
ম্বনের কথা বলিয়াছেন—“প্রজ্ঞাননির্ধা-  
রণাভ্যাস বা প্রাণশু”, “নিবরনভী বা প্রবৃত্তিঃ”  
“স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানমালম্বনং বা”, “যথাভমত-  
ধ্যানাধা।” তাৎপর্য্য এই, নিম্নলিখিত  
চারিটি উপায়ে চিত্ত স্থির করা যাইতে  
পারে—(১) রেচক অথবা পুরকের অভ্যাসে  
বায়ু স্থির করিয়া তাহাই মনের অবলম্বন  
করিতে হয় ; বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হইবে,

ইহা নিশ্চয়। (২) বাহিরের সূর্য্য, চন্দ্র বা  
তাহাদের কিরণ অথবা কোন প্রস্মিতা ইত্যাদি,  
অথবা নিজের মাঝেই নাগিকাগ্র বা জিহ্বাগ্র  
প্রভৃতিকে চিত্তের অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির  
হইবে। (৩) জাগ্রদুদ্ভা এবং নিদ্রা-  
এই দুইটির মাঝামাঝি “কেবলু জ্ঞান আছি”  
—এই প্রকার যে অস্মিতাম্বুজের বোধ,  
তাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করা  
যাইতে পারে। (৪) নিজের ঋচি অশ্রুযাদী  
শিব অথবা বিষ্ণুর মূর্ত্তি, ঘটচক্র, দেবতা চতুর্থা-  
দির আলম্বনেও চিত্ত স্থির হয়। ইহা ছাড়াও  
চিত্ত স্থির করিবার অন্ত উপায় আছে, কিন্তু



বিচার করিয়া দেখিলে সেগুলি ইহাদের মাঝেই পড়ে।

অধিকারিতে এই ধ্যানকে বিতর্কাত্মক, বিচারাত্মক, বিবেকাত্মক ও নির্বিকার—এই চারি ভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি করনা করিয়া লইয়া সেই স্বপ্ন বিষয়ে কেহ চিন্তার প্রণিধান করিতেছে; ইহাকেই বলি বিচার, ইহা মধ্যমাধিকারীর ধ্যান। বিচারাত্মক ধ্যানকেও আবার সবিচার ও নির্বিচার এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মূর্ত্তিভাবনা করিবার সময় যদি ধ্যায়বিষয়ের প্রতিপাদক শব্দ ও তাহার অর্থের জ্ঞান চিন্তে জাগরুক থাকে, তাহা হইলে তাহা সবিচার ধ্যান। ভাষা ও চিন্তা প্রথম অবস্থায় পরস্পর সাপেক্ষ থাকে বলিয়াই এরূপ হয়। শব্দ আর অর্থের উল্লেখ না থাকিলে তাহাকে বলি নির্বিচার ধ্যান। আবার এই ধ্যানের বিষয়ই যদি স্বপ্ন মনঃকল্পিত বস্তু না হয় বা স্থূল-মূর্ত্তিই হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিতর্কাত্মক ধ্যান বলে। পূর্বোক্ত প্রকারে ইহারও সবিচার ও নির্বিচার এই দুইটা ভেদ আছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বিচারেই হউক আর বিতর্কেই হউক, উভয়ই মানসিক ক্রিয়া ভৌতিক মূর্ত্তিই তো আলম্বন; কীটের যেমন ভ্রমরাবস্থায় পরিণত হয়, মূর্ত্তির ধ্যানে সাধকও তেমনি করিয়া মূর্ত্তির সাক্ষ্যই লাভ করিবে। ইহাতে তাহার কৈবল্য বা মুক্তি হইবে না। তাহা হইলে মূর্ত্তিপূজা বা মূর্ত্তিধ্যান মুক্তির উপায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে?—ইহার উত্তর এই, ধ্যান হই প্রকার—ভাবনা ও প্রণিধান। সত্য অর্থী কল্পিত কোন বিষয় অলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে—এ ক্ষেত্রে বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান অসা-

বশত। • কিন্তু প্রণিধানরূপ ধ্যানের একটু বিশেষত্ব আছে। সামান্ততঃ একটা মণি দেখিতে পাওঁতেছ; ইহার বিশেষ কি গুণ, তাহা তুমি জান না, কিন্তু অপরে তাহা তোমাকে বলিয়া দিল। তখন তোমার সামান্ত দর্শনে ব্যাপারিত সেই চক্ষু দুটীকেই যত্নসহকারে উক্ত মণিতে সংস্থাপিত করিলে। ইহাতে তোমার বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান হইবে। ইহাই প্রণিধান। প্রণিধান ছাড়া আমরা বস্তুর তত্ত্ব জানিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, ফটিক স্বতঃই স্বচ্ছ; কিন্তু যদি তাহার কাছে একটা জবাফুল থাকে, তাহা হইলে অপ্রণিহিতচিত্ত মধ্যমদর্শক ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া মনে করিবে। দর্শনের ভাবায়, ফটিকে সে রক্তবর্ণের অধ্যাস করিবে। অধ্যাস দর্শক হয়ত তাহাকে ফটিক বলিয়াই চিনিতে পারিবে না—সে মনে করিবে, এটা বৃষ্টি পদ্মরাগ মণি। তাহার ফটিকে পদ্মরাগেব অধ্যাস হইবে। আবার অতি মূঢ় দর্শক কখনও হয়ত জ্যোৎস্নাকেও ইন্দ্রনীল বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে।

ঠিক এইরূপে দেখি—চিদাত্মা স্বতঃস্বচ্ছ; মায়ায় সান্ধিয়া হইলে তাহাকে বলি জঁম্বর; অবিশ্রাম্য তাহার ব্রহ্মভাব আরও আচ্ছন্ন হইলে তাহাকে স্বপ্নাত্মী বলিয়া ভ্রম হয়; অবিশ্রাম্য জঁম্বরও প্রবল হইলে বিরাতের অধ্যাস হয়। এইরূপ অজ্ঞানের প্রবলতাবশতঃ অধ্যাসের গাঢ়তা জগতের সমস্ত বস্তুতেই হইতেছে। কোন বস্তুতে চিত্ত প্রণিধান করিলে পর পর এক একটা করিয়া অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়া পূর্ব পূর্ব অধ্যাসটা অবশিষ্ট থাকে। আর যদি সর্বতোভাবে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে ফটিকের মত উপাধিরাহিত আত্ম-তত্ত্ব আপনিই প্রকাশিত হয়।

এখন ধর, তুমি ধ্যানের সবিতর্ক অম্বুদায়  
আছ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের উল্লেখপূর্বক স্থল-  
মূর্তির ধ্যান করিতেছ। প্রাণিধানের গাঢ়তা-  
বশতঃ ক্রমে তুমি নির্বিকর্তক স্থলধ্যান, সনিচার  
স্থলধ্যান, এবং পরিশেষে নির্বিকচার স্থলধ্যানে  
উপনীত হইলে। ইহার পর বিচারার্থা ধ্যানের  
ফলে তোমার চিত্ত যখন ইষ্টমূর্তির আকার ধারণ  
করিল, তখন সমগ্র মূর্তিটার ধ্যান না করিয়া  
এক একটা অবয়ব ছাড়িয়া দাও; অবশেষে  
শুধু তাহার মুখের হাসিটুকু বা চরণখণ্ডের  
জ্যোতিটুকুর মাত্র ধ্যান করিতে থাক। তার  
পর তাহাও ছাড়িয়া দিয়া গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে  
বিন্দু হইতে মনকে বিরাটে নিয়া ফেল।  
এইরূপে পূর্বোক্তক্রমে নিশ্চুর্ণের ধারণা  
হইবে।

বিতর্কধ্যানে স্থলপ্রতিমায় যদি চিত্ত প্রাণি-  
ধান করিতে পার, তবে তাহাতেও তত্ত্বজ্ঞান  
হইবে, ইহা অশৌচিক নহে।\* সচেতন পুরু-  
ষকে যদি স্থাপু বলিয়া ভ্রম কর, তাহা হইলে  
সে ভ্রমের কাছে অচেতন; কিন্তু তথাপি  
তাহার স্বরূপ চৈতন্ত্যই বটে। তেমনি প্রতিমার  
স্থলে অভিব্যক্ত বিরাটরূপে অচেতন্ত্বের অধ্যাস  
বা ভ্রম হওয়ায়, তোমার কাছে প্রতিমা  
অচেতন; কিন্তু ব্যস্তবিক তাহার তত্ত্ব চৈতন্ত্য।  
একটা উদাহরণ দিও। ধর, বিহুকে তোমার  
রূপা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু যদি তীব্র  
অভিনিবেশ সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া  
থাক, তাহা হইলে রূপা গিয়া বিহুকেটাই  
তোমার চোখে ফুটিয়া উঠিবে। এমনি করিয়া  
প্রতিমাকে যদি ভগবান জানে তীব্র অভি-  
নিবেশ সহকারে চিত্ত কর, তাহা হইলে  
তাহার জড়ত্ব দূর হইয়া চৈতন্ত্বের স্বতঃই  
আবির্ভাব হইবে। বাণরাজা শিবের সঙ্গে

কথা বলিতেন ইত্যাকার যে অনেক আশা-  
য়িকা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তাহার  
তাৎপর্য্য এই।

এ তো গেল অচেতনরূপে কল্পিত প্রতিমার  
কথা। চেতন মূর্তিরও এই একই তত্ত্ব।  
তাহারও স্বরূপ—বিশ্বরূপ। তীব্র অভি-  
নিবেশ সহকারে কোনও চেতনমূর্তির দিকে  
চাহিয়া থাক, বিশ্বরূপের আবির্ভাব দেখিতে  
পাইবে। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে, অর্জুন  
তাহার শরীরে এইরূপেই বিশ্বরূপ দেখিতে  
পাইয়াছিলেন।

সুতরাং বিতর্কধ্যান বা বিচারধ্যান উপ-  
হাসের বিষয় নয়। এই বিতর্কজাত প্রত্যক্ষ  
সম্বন্ধে যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বলিতেছেন—  
“ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ; আগম ও অনুমান  
প্রমাণের ইহাই বীজ।” নির্বিকচার ধ্যানের  
পরিপাকে সর্বজ্ঞতা পর্য্যন্ত লাভ করা যায়,  
পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে তাহাও বলিয়াছেন—  
“নির্বিকচার ধ্যানে পরিপক হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ  
লাভ হয় এবং তাহা হইতে শ্বতফরা প্রজ্ঞা  
উৎপন্ন হয়।” ইহার পর পূর্বোক্ত ক্রম অনু-  
যায়ী নিশ্চুর্ণে চিত্ত লগ্ন করা যায়। দেহ  
ভুলিয়া গিয়া চিত্ত যখন সর্বতোভাবে  
বাহ্যমূর্তির আকার ধারণ করে, তখন কীট  
ভ্রমে পরিণত হইলে তাহার কীটভাব যেমন  
দূর হইয়া যায়, তেমনি সাধকেরও জীবভাব  
দূর হইয়া কেবল ইষ্টমূর্তির আকার হইয়া যায়।  
যোগশাস্ত্রে ইহাকে মহাবিদেহা ধারণা নাম  
দেওয়া হইয়াছে।

যে বিতর্ক ও বিচার ধ্যানের কথা বলি-  
লাম, তাহাদের আলম্বন ব্যক্ত; উঠার  
অধম ও মধ্যম অধিকারীরই উপযুক্ত। আবার  
অব্যক্তকে আলম্বন করিয়া দুই প্রকার ধ্যান

আছে—সানন্দ ও সান্ত্বিত; উহার উত্তম ও  
অত্যাশ্রয় অধিকারী উপযুক্ত। গুরুপ্রদর্শিত  
উপায়ে অব্যাক্তে চিত্তধারণা করিলে যখন  
একেবারেই দেহ ভূগ হুত্যা যায় তখন “আমিই  
এই সমস্ত হইয়াছি”—এইরূপ বেদান্তপ্রোক্ত  
অনুভূতি হয় এবং সর্বস্বাকৃতা, সর্বকামতা  
প্রভৃতি ঈশ্বরগুণসমূহ সাধকে সুরিত হয়।  
ইহাই সানন্দ ধ্যান। আবার এই সমস্ত গুণ  
দূর হইয়া গিয়া যদি কেবল অস্মিতবোধটুকু  
অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা সান্ত্বিত ধ্যান।  
ইহাকেই বিবেকাত্ম ধ্যান বলা হইয়াছে। এই  
অবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষ যে বিবিধ বা পৃথক,  
এই জ্ঞান আবির্ভূত হয়; শাস্ত্রে ইহাকেই  
হৃদয়গ্রন্থি ভেদ বলে। অত্যাশ্রয় অধিকারী  
পরমেশ্বর্য উৎপন্ন হইয়া সমস্ত ভোগাসনা  
নিঃশেষে নষ্ট হইলে যোগেশ্বরের আবির্ভাব  
না হইয়াও এই বিবেক উৎপন্ন হইতে পারে।  
এই ক্ষণে ইহাকে মুখ্যধ্যান বলা হয়। সানন্দ  
ধ্যানকে ইহারই অন্তর্গত ধরিয়া বিতর্ক, বিচার

ও বিবেক এই তিন প্রকার ধ্যানের কথা বলা  
হইয়াছে।

বিবেকধ্যানের আলম্বন অব্যাক্ত, তাহা  
পূর্বেই বলিয়াছি। এই আলম্বন সম্বন্ধে শাস্ত্রে  
এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ আছে—“যুম চৈব  
পূর্বে এবং জাগর ঠিক পরেই যে ভাব  
অনুভূত হয়, তাহাকে আলম্বন করিয়া ভাবনা  
প্রবর্তিত করিলে অক্ষয় সুখ ভোগ করা যায়।”  
কিন্তু তথাপি গুরুদেশ ছাড়া এই পথে  
চলা বড় কঠিন ও কষ্টসাধ্য—বিশেষতঃ দেহা-  
ভিন্নানীর পক্ষে। গীতাতেও আছে “অব্যাক্তে  
আসক্তচিত্তের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে।”

চারি প্রকার ধ্যানযোগের মধ্যে—স্মৃতি,  
হৃদয়, কারণ ও চৈতন্য লইয়া বিতর্ক; হৃদয়,  
কারণ ও চৈতন্য লইয়া বিচার; কারণ ও  
চৈতন্য লইয়া বিবেক; নিকরীকৃত ধ্যানকে কৈবল্য  
বা মুক্তি। সমস্ত সাধনার উচ্চ ফলস্বরূপ,  
কাজেই উহাকে সাধনরূপে না ধরাই ভাল।

## সন্ন্যাসী

—\*—

বমাং, কণীকপতী, দীপ্তপতী, বনভাচারী,  
আউল, বাউল, চুবণদাসী, মধবাচারী, সন্ন্যাসী  
আদি বহু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছে। এদিন  
এই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীয়ে ভাগ্যবৈবাগ্য  
অনন্ত দৃষ্টান্ত দেখুইতে ভাবতব বুকুত হিন্দুধর্মের  
বিজয়পতাকা উঠাই সগর্বে ভাবতব মূল ধর্ম  
ভাগ্যবৈবাগ্য প্রচার করিছিল, এদিন এও  
লোকে সূর্য্যে একাব উন্নতিব চরম সীমাত

উর্গনীত হৈয়ো, শিয়াল কুকুবব দবে ইন্দ্রিয়-  
ভোগ্য বস্তুত ভোল নগৈ পবমার্থ লাভত আজ্ঞ  
নিয়োগ করিছিল।

এই সম্প্রদায়বিলক বিভিন্ন হলেও, সক-  
লোকেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ছট শ্রেণীব। এক  
বিবেকী, অপব তত্ত্ব। যি সকলে আত্ম-  
নাশ্যবিবেক দাবা আত্মবরূপ লাভব আশাক  
গৃহস্থায়শ ত্যাগ করে, তেঁওলোক বিবেকী।

আৰু যি সকলে সচ্চিদানন্দবিষ্ণুই লাভৰ আশাত ব্যাকুল হৈ গৃহস্থ্যশ্ৰম ত্যাগ কৰে, তেঁওলোক ভক্ত নামে পৰিচিত। দুয়োৰো ভাৱ পৃথক হলেও মূলত এক ভাগ্যবৈরাগাই তাৰ ঘাই কাৰণ। কাৰণেই উভয়েই সন্ন্যাসী।

আগৰ দিয়াত গৃহস্থই নিজৰ লৰা এটা সন্ন্যাসী কৰিব পাবিলে বংশ ও নিজক ধৰ্ম্ম জ্ঞান কৰিছিল, কিন্তু আজিকালি শিক্ষাৰ দোষতেই হওক নাইবা দীক্ষাৰ দোষতেই হওক, তাৰ বিপৰীত ভাৱতে দেখা যায়। যদি কোনো লৰাটো নিয়মসংযমাদি পালন কৰে, নিৰাময় আচাৰ কৰে, নাইবা সদগুণ পাঠ কৰিবা গদ্যগদ্য কৰে, তেন্তে মাকবাপেকৰ এটা বিশেষ ভৱৰ কাৰণ হয়। তবুও কণা; কাৰণ আজি প্ৰকৃতিৰ অধঃপ্ৰভাৱত পৰি সকলোৱেই ভাবশীল শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত; কাৰণেই সন্ন্যাসীৰ মহোচ্চ গভীৰ তৰ বুজিবলৈ অপাৰগ। নতুবা আজিকালি অধিকাংশ সন্ন্যাসী উন্নয়ন হোৱা দেখিও হয়তো পুতেকক সেই পথে যাবলৈ দিয়াত বিধা বোধ কৰে। ভগৱান গোবিন্দদেৱৰ ককায়েক বিশ্বৰূপে যেতিয়া গৃহস্থ্যশ্ৰম ত্যাগ কৰি সন্ন্যাসাশ্ৰমলৈ গ'ল, তেতিয়া মাকবাপেকে ব্যাকুল হৈ নিজ চৈষ্টদেৱৰ ওচৰত কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, “যেন মোৰ বিশ্বৰূপ আৰু ঘৰলৈ উলতি নাহে।” ধৰ্ম্ম মাকবাপেক! পুতেক সন্ন্যাসী হৈ পুনৰ ঘৰলৈ উলতি আহিলে পতিত তৰ, সেই কাৰণে পুত্ৰবৎসল মাকবাপেকে পুত্ৰ-শোকত মৃতপ্ৰায় হোৱা পুত্ৰৰ মজল কামনা কৰিছিল। এনেকুৱা মাকবাপেক নহলে কি গোৱাঙ্গৰ দৰে পুত্ৰলাভ হয়। আধ্যাত্মিক গভীৰ চিন্তানিৰত ভগৱদ্ভাৱনিভোৰ ভাৱতেই মাথোন এদিন তাৰদৰে গাইছিল—

কুলং পবিত্ৰং জননী কৃতার্থা  
বসুন্ধৰা পুণ্যবীতি চ তেন।  
অপাৰসম্বিশ্বংসুখনাগবেহস্মিন  
লীনং পৰে ব্ৰহ্মাণি যন্ত চেতঃ ॥

অপাৰ সচ্চিদানন্দমুদ্ভৱৰূপ ব্ৰহ্মত ঘাৰ চিত্ত বিগীন হয়, তেঁওৰ দ্বাৰা কুল পবিত্ৰ, জননী কৃতার্থা, ও বসুন্ধৰী পবিত্ৰা হয়। তেন্তেই দেখা, সন্ন্যাসীৰ আসন কিমান উদ্ধৃত। সেই দেখিয়েই শিবাত্ম্যৰ শব্দবা-চাৰ্ঘ্যই এই কোপীনদাবী সন্ন্যাসীগকলক উদ্দেশ কৰি গাই গৈছে—

বেদান্তবাক্যে সূ সদা বমন্তো,  
ভিক্ষান্নমাত্ৰেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।  
অশোকমন্তঃকৰণে চবন্তঃ,  
কৌণীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

দৈনিক ধৰণে সন্ন্যাসী হবলৈ হলে জীৱনৰ শেষ ভাগত হোৱাই কৰ্ত্তব্য। বিজকুমাৰে প্ৰথমে সাধিত্তী মন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰি দণ্ডধাৰণ কৰি শুক ঘৰলৈ যায়। শুকবৰত থাকি ধন্দ্ৰাভাগ্যৰ লগে লগে নিজ নিজ ধৰ্ম্ম, বেদ, শাস্ত্ৰাদিজ্ঞান, ও চিত্ত সংগম আদি শিক্ষা কৰিব। পিতৃ শিক্ষা ও সংগম অভ্যাগৰ দ্বাৰা চিত্ত যেতিয়া স্থিৰ হৈ জ্ঞানৰ বিকাশ হয়, তেতিয়া নিজ ঘৰলৈ সমানৰ্ত্তন হৈ শাস্ত্ৰোক্ত মতে বিয়া কৰাই গাৰ্হস্থ্যশ্ৰমত প্ৰবেশ কৰিব। এই আশ্ৰমত থাকি, শাস্ত্ৰীয় ক্ৰিয়াকলাপ কৰি ধৰ্ম্মাৰ্থে পুত্ৰ উৎপাদন কৰিব। তাৰ পাচত বানপ্ৰস্থ। এই আশ্ৰমত উপনীত হলে গৃহ-কৰ্ম্মৰ সকলো ভাৱ পুত্ৰৰ হাতত গতাই দি নিজে আত্মনিষ্কাম বিচাৰ কৰিব; আৰু যেতিয়া তীব্ৰ বৈৰ গা হব, তেতিয়া সন্ন্যাসগ্ৰহণ কৰিব। এয়ে শাস্ত্ৰীয় মতে সন্ন্যাসীৰ পথ।

কিন্তু ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্রমতেই বাৰ জিহ্বোপন্থ সংঘত হৈ বিষয় বৈবাগ্য উপস্থিত হয়, তেওঁৰ কাৰণ অজ্ঞ কোনো আশ্রমতই আক প্ৰয়োজন নাই, অইন কি সন্ন্যাসবোৰে মৰকাৰ নকৰে। যি সকলে গাৰ্হস্থ্যশ্রমত থাকি বিষয়ত আসক্ত হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণেই সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত। তাকে উপযুক্ত সময়ত গ্ৰহণ কৰা কৰ্তব্য। নতুবা যি বুঢ়া মাকৰাপেক, পতি-ব্ৰতা স্ত্ৰী আৰু কেঁচুৱা লৰাক ত্যাগ কৰি সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰে, সি মহাপাতকী—

‘মাতৃহা পিতৃহা স স্ত্ৰ্যাং

স্ত্ৰীবধী ব্ৰহ্মঘাতকঃ।

অসন্তুৰ্য্য স্বপিত্ৰাদীন

যো গচ্ছেত্তিকুকাশ্রমে ॥

যি লোকে পিতৃ মাতৃ লবা তিবোতাক ভৰণপোষণ ও স্ত্ৰী নহৰি সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰে, সি মাতৃবধ, পিতৃবধ, স্ত্ৰীবধ ও ব্ৰহ্মঘাতক পাতকত পৰে। সেট কাৰণে শাস্ত্ৰত আছে—

বিজ্ঞামুপার্জ্জয়েদ্ বালো

ধনং দাবাংশ্চ যৌবনে।

প্ৰৌঢ়ে ধৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মাণি

চতুৰ্থে প্ৰব্ৰজেৎ সুধীঃ ॥

লবা কালত বিজ্ঞা উপাৰ্জন, যৌবনত ধন, আদায়ীয়াত ধৰ্ম ও বুঢ়াত সন্ন্যাস অৰ্জন কৰিব। শাস্ত্ৰীয় আদেশ ইমূনি কঠোৰভাবে থাকোতেও যে বুদ্ধদেব, শঙ্কৰাচাৰ্য্য, কপিল-দেব, শুকদেব, গোবিন্দদেব আদি অবতাব সকলে আত্মীয়জনক শোক সাগৰত পেলাই সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিলে, এওঁলোক কিতেছে পাতকী? নহয়, এওঁলোকৰ দ্বাৰা এয়ে প্ৰমাণিত হলেও, প্ৰকৃত বৈবাগ্য উপনীত হলে কালকাল বিচাৰ নকৰি যি কোনো

সময়তে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এই দ্বাৰণেই শাস্ত্ৰত “তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপাদে” আদি বাক্য দ্বাৰা সন্ন্যাসৰ অধিকাৰ নিৰ্ণয় কৰি গৈছে। ভগবানৰ প্ৰেমাকৰ্ষণ যি অমৃতৰ কৰিছে, যি এবাৰ ভগবানৰ প্ৰেমানন্দ স্বৰূপ আনন্দ লাভ কৰিছে, তেওঁৰ ওচৰত শাস্ত্ৰ যুক্তিৰ মৰ্যাদা বৰ্জনীয় নহয়। সেই কাৰণেই প্ৰেমৰ মহাজন শ্ৰীমৎ ৰূপগোস্বামীয়ে কৈ গৈছে—

তত্তত্ত্বভাবাদি মাধুৰ্য্যে

শ্ৰুতে ধীৰ্গদপেক্ষতে।

নাত্ৰ শাস্ত্ৰং ন যুক্তিঞ্চ

তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥

সেট মাধুৰ্য্য ভাব উদয় হলে যুক্তি কিম্বা শাস্ত্ৰোক্ত বিধি মানিবৰ সময় নেথাকে। অতএব উপৰোক্ত শাস্ত্ৰবাক্যবোৰ অনধিকাৰৰ শাসন মাত্ৰ। ব্ৰহ্মচৰ্যা যুক্তিকল্পতৰ মূল, গাৰ্হস্থ্য তাৰ ডালপাতযুক্ত গা-গছ, বানপ্ৰস্ত তাৰ মুকুল ও সন্ন্যাস তাৰ শান্তিমুখ্যাবসম্ভবা পকা ফল। এই অমৃতময় ফল যি লাভ কৰা নাই, তাৰ জীৱনত লীঙ্ঘ্য কি? কাৰণেই তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলেই সংসারলালসা পৰিত্যাগ কৰি সন্ন্যাসাশ্রম গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন।

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধবৰ ওচৰত “সন্ন্যাসঃ জীৰ্ণাধি স্থিতঃ” অৰ্থাৎ সন্ন্যাস মোৰ মূৰত স্থিত বুলি সন্ন্যাসাশ্রমৰ গুৰুত্ব বুজাই গৈছে। কিন্তু আজিকালি শিক্ষাৰ অভাবতেই হওক বা প্ৰকৃত সন্ন্যাসীৰ অভাবতেই হওক সাধাৰণৰ সন্ন্যাস আশ্রমৰ প্ৰতি এটা ছেয়ভাব উপস্থিত হৈছে। এয়ে দেশৰ অকলাগৰ দ্বাই কাৰণ। যি পৰিমিত সন্ন্যাসীৰ প্ৰতি আদৰ নহয়, যি পৰিমিত সন্ন্যাসীৰ লগত গৃহস্থৰ এটা সম্বন্ধ

স্থাপিত নহয়, সেই পরিমিত দেশের যে বিশেষ কিবা উপকার হব, তাক কথ নোবাৰি।

মুক্তিকল্পতরুর ফল ভক্ষণর যদি ইচ্ছা থাকে, তেন্তে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ই হিন্দু, বুদ্ধ, মুতলমান, খৃষ্টান আদি সকলো জাতির আচার্য্য সকলর অনুমোদিত পথ। কিন্তু আজি হিন্দুধর্ম্ম-মোদিত ব্রহ্মচর্য্যরূপ মূল নোহোৱাত মুক্তি কল্পতরুর অগ্নাত্ত অঙ্গবোবো শ্রীহীন ও নীৰস হৈ পৰিছে। এই কাৰণেই গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুই আশ্রমেই স্নীপ হাবচালনিশিষ্ট হৈ পৰিছে। আজিকালি বিদ্যা, জ্ঞান ও মহম্ম শিক্ষা হওক বা নহওক, দীঘল চুলিডাৰি বাগি ভাবতীন কেইটামান বাহ্যিক নিয়ম পালি চালব পাৰিলেই সি সমাজৰ ওচৰত ব্রহ্মচারী। দেৱকৃত পিতৃকৃত স্বাধ্যায় ও আশ্রমোচিত অগ্নাত্ত ক্রিয়া কৰক নকৰক, বিষ্য কৰি কিছুমান সন্তান উৎপাদন কাৰব পাৰিলেই সি মন্ত গৃহস্থ। কেইটামান বুদ্ধকাকি শিকি শাস্ত্রৰ দুই এটা শ্লোক আওবাট গৌৰীক বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলেই হৰ্তেও সাধু। শিক্ষিতা বোৱাৰীৰ মন্ত্ৰণাত পুত্ৰট ঘৰব পৰা খেদাট দিগে শানপ্ৰস্থ; আৰু প্ৰাণ বায়ু পাঠৰ হুলে নম্বৰ দেহ বীৰ্য্যপন্ত্ৰেৰে আচ্ছাদিত কাৰু শ্মশানত পেলালেই সন্ন্যাস সিদ্ধ—পূৰ্ণ সমাধি।

সন্ন্যাস-হেন পাঁপপুণ্যাতীত পবিত্ৰ আশ্রম আশ্রমকাণ্ডৰ প্ৰভাবত সাধাৰণৰ চকুত সন্দেহ ও হেম দৃষ্টিত পৰিব লগা হৈছে; কি কুক্ষণত বান্ধসবাজ বাবণে কপট সন্ন্যাসীৰ বেশ ধৰি নীতাক হবণ কৰিলে, কব নোবাৰিছোঁ। সেই অবধি চোৰ ডকাইত, নৰঘাতক, বদমাইস লোকে ছবভিন্সি সাধিবলৈ সন্ন্যাসীৰ বেশ

ধাৰণ কৰা হল। সন্ন্যাসী হিন্দুসমাজৰ নীৰ্ব স্থানীক; সেই কাৰণে হিন্দুৰে সাধু সন্ন্যাসীক অকপটে শ্রদ্ধা ও ভক্তি কৰে ও তিবোতা সকল নিঃসঙ্কোচে তেঁওলোকৰ আগত ওলায়, এই কাৰণেই বদমাইস লোকে নিজ ছবভিন্সি সাধিবলৈ সন্ন্যাসীৰ বেশ ধৰি সমাজৰ নানা ক্ষতি কৰিছে। ভাল বস্ত্ৰবেই নকল হয়। ইও সন্ন্যাস আশ্রমবেই মহন্ত ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু সাধাৰণ লোকে বাবে বানে এই দৰে ভণ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত হৈ সন্ন্যাসীৰ প্ৰতি শ্রদ্ধা ভক্তি কমি ভয় কাৰণ হৈছে। বিশেষতঃ অপবিত্ৰ চিন্তাশক্তঃ সাধাৰণে প্ৰকৃত সাধুক চিনিবো শক্তি নোহোৱাত পৰিছে। “সাঁচ কহে ত মাৰে মাটি; বুড়া জগৎ পতিয়ায়;” কাজেই পচনবচনবাগীশ ভণ্ডই সমাজক ভুলাই নিলব মতলব সিদ্ধি কৰে। প্ৰকৃত সাধুক অগ্ৰাহ কৰি, আপোন ছবয়ৰ আদৰ্শ অনুযায়ী জটাজুট সন্যাস্ত চিনটা খবম কমজুলধাৰী সন্ন্যাসীৰ অনুসৰণ কৰে। তেওঁলোকে প্ৰকৃত সাধুব ওচৰেই গৈ ভাল নেপায়, কাজেই সতৰ পৰা আতৰি থাকে। কাজেই সন্ন্যাসৰ দুৰ্দশা দিনে দিনে পাটিছে। আৰু সাধু সন্ন্যাসীয়ে সমাজৰ পৰা বিতাৰিত হৈ হানিজলত আশ্ৰয় লৈছে। বদমায়ে বেশ ধাৰণ কৰি সমাজক ঠগাত ছাবভে। নহলে সাধু স্বৰ্ঘ্যৰূপ। কদাচি নেদেখিলেও অধ্যাত্ম চকু যাব আছে, তেওঁৰ ওচৰত অশ্রুকাশিত নহয়। সাধুব মূৰ্ত্তি শাস্ত্ৰ ও আনন্দময়। যাব ওচৰলৈ আহিলে ত্ৰিতাপক্লিষ্ট জীবেই ক্ষন্তেকলৈ হলেও শান্তি পায়, সেয়ে প্ৰকৃত সাধু। ইয়াৰ বাহিৰেও সাধুব বহুই লক্ষণ শাস্ত্ৰত আছে, কিন্তু সেই বুলি ইন্দ্ৰজাল ও শক্তিমতা সাধুব লক্ষণ বুলি কোনো শাস্ত্ৰতে লেখা নাই। আৰু

সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিরে চালেও দেখা যায় যে, প্রকৃত সাধুব অভাব কি? কিয়ং-তেওঁ নাহিব কার্য্য দেখুবাই সমাজক মোহিত কবিতৈল যাব? তেওঁলোক আছে অজ্ঞানী, পাণী, ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবক শাস্তি দিতৈল। বৃজককি দেখুবাই সমাজক ভুলোবাতো উদ্দেশ্য নহয়।

এই কারণেই কণ্ড যে তওব তওমীত ভোল নগৈ প্রকৃত সাধুব অমুসবণ কবা, যদি তোমাব প্রয়োজন হৈ থাকে। এই তওবোবক বিশ্বাস কবি তোমাব জীবনক লক্ষ্যহীন কবা সমাজব পক্ষে বব অমঙ্গলজনক।

## স্বামী রামতীর্থ

—❦—

### ( ছাত্রজীবন )

ইতিপূর্বে বলিয়াছি, বহুশুখীনতাই আমাদের দেশের বর্তমান ছাত্রজীবনের একমাত্র অভি-  
শাপ। বিজ্ঞাতীয় সভ্যতা ও বৈদেশিক শিক্ষা-  
নীতির কল্যাণে এই পাপের মাত্রা দিন দিন  
বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্রজীবনে অসংখ্য ও  
ব্যসনাসক্তির মূলেই এই বহিঃশুখীনতা। ভাল  
খাওয়া, ভাল পরা, থিয়েটার-বাধ্যস্ত্রোপ দেখিয়া  
ও আমোদস্বচ্ছন্দ করিয়া বেড়ানো ইত্যাদি  
সুস্বাদু প্রকার বিলাসবাগনই চিত্তের অধোবাহী  
গতিরত পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা অবশ্য  
বাস্তবিক ত্যাগকেই বড় মনে করি না; কিন্তু  
যেখানে মাতৃমুখ মোটেই ভিতরের দিকে নজর  
দিতে চায় না, বহিঃস্বর্কষ হইয়া আশ্রয়তা  
করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেখানে বাহির  
টাকেও লজ্জা দিবার প্রয়োজন আছে। বাহি-  
রের তুলনায় তীর্থরামের নিঃস্পৃহ অকিঞ্চন  
ছাত্রজীবনের কাছে আজকালকার অনেক  
ছাত্রই লজ্জা পাইতে পারে। তীর্থরামকে  
মাছুষ হইতে ছুঁয়াছে সম্পূর্ণ নিজের উপর  
নির্ভর করিয়া; এমন কি নিজের আগাছাদান

পর্যন্ত তাঁহাকে নিজেই জোটেইয়া লইতে হই-  
য়াছে; আর ঐটুকু জুটাইতেই তাঁহাকে কত-  
খানি সহিতে হইয়াছে, তাহাও কাহারও  
অজানা নয়। নিজের কষ্টের উপার্জন লইয়া  
যদি কেহ ছিনিমিনি খেলে, তাহাতে তাহাকে  
দোষী করিলেও দায়ী করা যায় না; কিন্তু  
যাহারা পলাবল্যী হইয়া, পবের খাইয়া, পরের  
পরিয়া, বাবুগিরি করিতে লুজ্জাবোধ করে না,  
তাহাদিগকে আর কি বলিবার আছে?

তবুও আমরা বলি, এটা বাহিরের বিচার।  
তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলাম, তীর্থরামের  
বিলাসবাসনগর্জিত শিক্ষণময় জীবন তাঁহার  
চৌক্য নহে। অভ্যাকপড়িয়াই তিনি এত  
লালসিধা ভাবে চলিতেন; সঙ্গতি থাকিলে  
কি করিতেন কে বলিতে পারে? এ কথা  
মাঝে কতকটা যৌক্তিকতা আছে বটে। কিন্তু  
আমরা জানি, অভাবের মাঝেই থাকি, আর  
স্বচ্ছলতার মাঝেই থাকি, আমাদের মনুষ্যত্বের  
পরিচয় পাওয়া যায়—পারিপার্শ্বিককে আমরা  
যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি, সেই দৃষ্টি দিয়া।

অভাবের তাড়নায় জর্জরিত হইয়াও যদি কাহারও স্বভাবের শিক্ততা লোপ না পায়, মুখের শিশুহুলত হাসটুকু স্নান না হয়, তবে বুঝিব মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় সেই পার হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাব অভাবের প্রতি দৃকপাত না করিয়া নিজের জীবনকে একটি নিরাপত্ত লক্ষ্যের অভিমুখে প্রদোদিত করিবার সামর্থ্য যে নাথাকে, তাহাকেই বলি মানুষ। সে তো কেবল বাহির দেখে না—সে দেখে অন্তরের চিরস্তন সত্যকে। যে কোনও অবস্থার মাঝে পড়িয়াও অন্তরের এই সত্যকে স্মৃতিত ও জয়যুক্ত করাই তাহার পণ। আমরা তীর্থ-রামের জীবনে এই অটুট সত্যসঙ্গর, এই অবিচল সত্যপ্রতিষ্ঠার সাধনাই মূর্তিমতী দেখিতে পাই। তিনি যদি গরীবের ঘরে না জন্মিয়া রাজার ঘরেও জন্মিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার দৃষ্টি এমন করিয়া অন্তরের দিকেই নিবদ্ধ থাকি—বিলাসব্যসনের মত্ততা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। সুখে 'হুখে' এমন সদাদন্দ, আনন্দসাধনায় এমন তৎপর কয়টি ছাত্র আমাদের দেশে মিলে? তাহা ছাড়া বিশ্বহিতে আনন্দদানের লক্ষ্য লইয়া কয়টি ছাত্র জ্ঞানার্জনে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে?

তীর্থরামের এই অন্তরের কথাটা বুঝিতে পারিলেই তাহার আচার ব্যবহারের মত্য্য তাৎপর্য্যটা আমরা বুঝিতে পারিব। ছাত্র জীবনে বিলাসব্যসনের আমরা বহু নিন্দা করি-রাছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছি, বাহিরের চেয়ে ভিতরটাই আমরা বড় বলিয়া জানি। এই ভিতরকে দৃষ্টি আরম্ভ হইলে ছাত্রজীবনের কুচ্ছতার একটি নূতন তাৎপর্য্য আমাদের চোখে পড়ে। শাস্ত্রে ইহাকে বলে অপরিগ্রহ। ইহার অর্থ এই, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর বস্তুটুকু আমরা প্রাপ্যধারণের পক্ষে

নিভাত্ত প্রয়োজন, আমরা ততটুকু মাজাই গ্রহণ করিব, ইহার অতিরিক্ত কেহ বাচিয়া দিলেও লইব না। অন্তঃস্বামী লক্ষ্য না হইলে অপরিগ্রহের স্বরূপ বোঝা যায় না। কতটুকু ভোগবর্জন করিলে তাহা ত্যাগের উদ্যাপক হইবে, ইহা মানুষ সব সময় বিচার করিয়া উঠিতে পারে না। ফলে আত্মপীড়ন ও আত্ম-প্রবঞ্চনা উভয়ের হাতেই তাহাকে লাক্ষিত হইতে হয়। ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বই এই ধানে। তীর্থরামের জীবনকে যদি আমরা অপরিগ্রহের দিক দিয়া বিচার করি, তাহা হইলে তাঁহার সংযম ও কৃচ্ছতার উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে পারিব। আর তাঁহার ছাত্র জীবন যদি আমাদের ছাত্রদের অনুকরণীয় হয়, তাহা হইলে বার্ষ বাহ্যিক অনুকরণের দুর্যোগ হইতে বাঁচাইয়া এই অপরিগ্রহের আদর্শ ই তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। তীর্থরামের মত তাহার বুদ্ধক,—"বাহিরকে আমি কেয়ার করি না, আমার রাজত্ব ভিতরে; আমার জন্ত আমি খাটিনা, আমি খাটি অগতের জন্ত; জ্ঞানের অমূল্যলবনে শুধু আমার আনন্দময় বিকাশ অনুভব করাই আমার লক্ষ্য; মরি আর বাঁচি, এট সঙ্গ হইতে কিছুতেই 'বিচলিত হইব না।' ছাত্র জীবনের ইহাট মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র জপে শ্রীলাসামন্তি, অমৃতম, উচ্ছ্রান্ততা দূর হয়; চিত্ত নিশ্চল হয়, তপস্তা সহজ হয়।

এই তো গেল স্বক্ষ-বিচার। আর একটি স্থল কথার উপর তীর্থরাম বরাবর জোর দিয়াছেন, আধুনিক ছাত্রদিগকে আমরা তাহাও লক্ষ্য করিতে বলি। তীর্থরাম বায়বায় বঞ্চিতেন, "তোমার মন খারাপ হইয়াছে কেন জান? নিশ্চয় তোমার পেটে অস্থ হইয়াছে।"



কথাটা শুনিতে অদ্ভুত বটে, কিন্তু ইহার মূলে একটা গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। আহাৰ, নিদ্রা, মৈথুন—তিনটাই জীবনের স্বভাব। স্বভাব বলিয়াই ইহাদের উপর কতৃৎ করা বড় কঠিন; আর ইহাদিগকে আয়ত্ত করাই দিচ্ছি। ছাত্রদিগকে এই কথাটা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের মূল ভিত্তি এই ত্রিবিধ সংযমে। সাধারণতঃ ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমরা মৈথুনবর্জনই বুঝিয়া থাকি। তাই চরিত্রকে এই দীর্ঘ দিয়া বিস্তৃত রাখিতে পারিলেই আমরা যথেষ্ট হইল মনে করি। কিন্তু আহাৰ ও নিদ্রার উপর কতৃৎ না জন্মিলে বীৰ্য্যধারণ কখনও সম্পূর্ণ সাধক হইতে পারে না। বিশেষতঃ আহাৰের সংযম এ বিষয়ে সব চেয়ে প্রয়োজন। নিদ্রার বিলাসের অবকাশ ততখানি নাই, তাই সেটা মানুষকে তত উদ্ভ্রান্ত করে না। কিন্তু খাওয়ার মাঝে মানুষের কাণ্ডগরি যথেষ্ট আছে। ভুলও সে ক্ষেত্রে বেশী হয়। উপনিষদে আছে, আহাৰ শুদ্ধ হইতে সম্বন্ধিত হয়। কথাটা একেবারে সহজ ও বোধগম্য, আহাৰ শব্দের অর্থানে টানিয়া-বুঝিয়া অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। এই গোড়ার কথাটাকেই ত্রিবিধ বিশেষ করিয়া আঁকেড়াইয়া পরিয়াছিলেন। তিনি ঠিক

বুঝিয়াছিলেন, দেহের রোগই বল, আর মনের রোগই বল, গেটের রোগই সকলের মূল। তাই সমস্ত ছাত্রজীবনে আহাৰসংযম তাঁহার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় হইয়াছিল। তিনি দুইটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন,— মানসিক পরিশ্রমের অল্পপাতে আহাৰের পরিমাণ কনাইয়া লঘু অর্থচ পুষ্টিকর আহাৰ গ্রহণ করিতেন এবং শরীর প্রকার উত্তেজক ও স্নেহ যুক্ত দ্রব্য বর্জন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ যেখানে শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই, সেখানে অত্যধিক ইয়াও অগ্রগ্রহণ করিতেন না।

আহাৰ সম্বন্ধে এই সূক্ষ্মবোধ তাঁহার অধ্যাত্মশক্তি ক্ষুণ্ণেরই বিশেষ পরিচায়ক। তাঁহার অন্তঃকরণ ভাগটুকু কেহ না ধরিতে পারিলেও স্থলতঃ তাঁহার এই আহাৰবিষয়ক সংযমের অঙ্গসংগে ধাক্কা কেহ করে, তাহা হইলে ক্রমশঃ সে সূক্ষ্ম বোধেরও অধিকারী হইবে, ইহা নিশ্চিত। একমাত্র আহাৰ নিদ্রার সংযমে এমন সমস্ত নিগূঢ় রসস্ত মাতৃয়ের আরম্ভ হইতে পারে, যাচা বুদ্ধিব মায়র্প্যাচে ধরা পড়ে না। আমরা ছাত্রদিগকে নিজে যাচাই করিয়া ইহার সত্যানুগত্য নিদ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি। মংগলী পাদালী জ্ঞাত মাহের মতই রসনার সোণতায় মগ্ন হইয়া গিয়া বসিয়াছে—তাঁহার চেতন হইবে কেব?

## অভিনব শিশুশিক্ষা

—\*—

### সঙ্কলিত কথার

ছেলেবেলায় শিশুশিক্ষা, বালাশিক্ষা, শিশুবোধ ইত্যাদি বই অনেকেই পড়েছি। ধারা এই সমস্ত বই লিখেছেন, তাঁরা জন্মজন্মান্তরের গুরু নশাই। এঁদের নীচু নজরে দেখছি না, কিন্তু শিশুচরিত্রের প্রতি এঁদের যে মনোভাব,

তার সমালোচনা না করে পারছি না। এঁদের আওতায় মানুষ হয়ে একদিন আমারও মনে হত, শিশুচরিত্র বোঝা খুবই সহজ, ছেলেকে মানুষ করার সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে অবিচল গান্ধীধর্মের সহিত বড়োর ভাব ছেলের মাথায় ঠুকে দেওয়া। অনেকেই এই নীতি

অগ্রসরণ করতে দেখেছি ; সেখানে এই নীতি সফল হয়নি, সেখানে দোষটা যে ছেলেবু বদ-  
বতাবের, এমন রায়ও শুনেছি এবং তার ফলে উৎপীড়নের মাত্রা বাড়তেও দেখেছি।  
দেখেছি ছেলেদের শেখাবার আগ্রহটাই অনেকের মাঝে দ্রুত হয়ে ওঠে ; কিন্তু বিনীত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্ত নিয়ে তাদের কাছেও কিছু শিখবার আছে, সে কথাটা কেউ খেয়াল করে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকাল উলটো প্রোত বহিতে আরম্ভ করছে। দেশ বিদেশে আজ শিশুচরিত্র একটা গুরুতর অধ্যয়নের বিষয় হয়ে পড়েছে। এখন শিশুই প্রকৃত শিক্ষক, শিক্ষকেরা নম্র ও উৎসুক হৃদয় নিয়ে এই মুকুটবিহীন রাজাদেরই মনোরঞ্জন করতে ব্যগ্র। এই আন্দোলনের মাঝে 'কোথায়ও যে আতিশয্য নাই, সে কথা বলতে পারব না, কিন্তু এর একটা বিশেষত্ব এই দেখতে পাচ্ছি, শিশু ও শিক্ষকের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষুরণের সঙ্গে এই আন্দোলনের সফলতার একটা সম্বন্ধ আছে। যে কোনও বিজ্ঞানের মাঝে, উপায়কে নয়, লক্ষ্যকে বড় করে দেখতে হবে, এই হচ্ছে এদেশের সনাতন মত। শিশুবিজ্ঞানেও আজ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ধুম গড়ে গেছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণে যে নীতি অবিকল হবে, তার লক্ষ্য যদি সমগ্র মানবজাতির চরম লক্ষ্যের সঙ্গে এক না হয়, তাহলে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করে দেখেছি, চরম সত্যের পানে যে শিক্ষক আগনার জীবন পরিচালিত করছেন, মনস্তত্ত্বের আইনগুলো তাঁর স্বচ্ছ হৃদয়ে আপনা হতেই স্মরিত হয়। প্রকৃতির নিপুণ অভিপ্রায়টা যেন তিনি দিব্য চক্ষে দেখতে পান এবং শিক্ষানীতিকে তারই

ইচ্ছিতে পরিচালিত করতে পারেন। এই অধ্যাত্মপ্রেরণার বলেই শিক্ষাজগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। প্রাচীনের সংস্কারাক্ত নীরস একঘেয়ে শিক্ষাপ্রণালী আর অক্ষাতিনের বহু আড়ম্বরপূর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী—উভয়ের মূলগত সত্যটা আবিষ্কৃত হবে কেবল শিক্ষকের অধ্যাত্মদৃষ্টির বিকাশে।

শিক্ষক আর গুরু এক পর্যায়ের বস্তু। আত্মপ্রতিষ্ঠা না হলে কার গুরুত্ব ফোটে না। শিক্ষক যিনি হ'উন না কেন, বাস্তবিক আত্মপ্রতিষ্ঠা না হলে তাঁর দ্বারা শিক্ষার কিছু সার্থকতা হবে, এমন আশা করা যেতে পারে না। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব, বেদান্তোক্ত সাক্ষী চেতার ভাব শিক্ষকের মাঝে যখনই ফুটেছে, তখনই তাঁর শিক্ষায় ফল হয়েছে, অপরের হৃদয়কে তা স্পর্শ করেছে—শিক্ষকেরা এটা লক্ষ্য করে দেখবেন। শিক্ষাকে আত্মপ্রবোধনের উপায়স্বরূপ ধারা গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জানেন, অন্ধকারে বিভ্রান্তদুরণের মত শিক্ষকের অধ্যাত্মদৃষ্টি সফলের মাঝে চাকতির মত কখনও না কখনও ফুটে ওঠে। এই শুভ মুহূর্ত্তভাগর একটা বিবরণ সঙ্কলন করে শিক্ষকদের দরবারে পেশ করার হচ্ছা আছে। শিক্ষক বলতে পিতামাতাকেও বুঝ এবং শিক্ষাক্ষেত্র বলতে একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থালীর চিত্র মনে জাগে, এ কথা পূর্বেই বলে রাখা ভাল। এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত ঘটনা কল্পনা করব, তা গুরুত্বের কিছু নয় ; শিশুজীবনে প্রায়ই গুরুত্বের কিছু ঘটে না। কিন্তু এই সমস্ত ছোট ছোট, ঘটনার সমাধান হতেই শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে, এই কথাটা স্কলকে মনে রাখতে অমরোদ্য কার।

### শিক্ষকের কথা

বিজয়কে আশি বরাবর তাল ছেলে বলেই জানি। শেষকালে সে যে এমনটা করবে,

এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিছু দিন ধরে তার মন অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার দরুণ ‘আমিও’ একটু কড়াকড়ি বন্দোবস্ত করেছিলাম। এ কি তারই প্রতিক্রিয়া?

সেদিন বাইরে থেকে স্কলবাড়ীতে ফিরতেই আমার সহকর্মী সুরেশ একটা ছোট কোটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, “আজকে এইটা আবিষ্কার করেছি।” খুলে দেখ, তাতে কিছু দোস্তার উপকরণ। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “এ কোথায় পেলে?” সুরেশ বললেন, “বিজয় আর রমেশকে একটু কাজে বাইরে পাঠিয়েছিলাম। ফিরবার সময় দেখি, এইগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। রমেশ লুকাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। তবে আর কখনও এমন কাজ করবে না বলছে!”

আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। রমেশ নুতন ছেলে; দুজন প্রায় সমবয়স্ক বলে বিশেষ করে বিজয়ের সঙ্গে তার একটু ভাব আছে। অনুমান করলাম, এই কাণ্ডের মূলোৎসাহ। “আর করব না”—এটা ছেলেদের বান্ধি গং—কুইনি দিয়ে অব আটকানোর মত অনেকেই মেরে ধরে ভয় দেখিয়ে ওই স্বীকৃতিপত্রটুকু আদায় করেই নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাতে প্রতীকার তো হয়ই না, বরং মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ছলনা, ভীকৃত্য ইত্যাদি নানা আপদগুণো এসে জুটে। দুজনকে ছাড়াছাড়ি করতে গেলেও ফল হবে না—তাতে বিজয়ের জেদ বেড়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করাই প্রথম কর্তব্য বোধে পারছি; কিন্তু পাপের মূলোচ্ছেদ কি করে হবে, তা ভাবনার বিষয়।

সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বিজয় কি বলল?” সুরেশ বললেন, “আমি ধমক দিয়ে

‘জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এ সব খেয়েছিস?’ সে জবাব করল, ‘যদি খেয়েই থাকি, আপনি তার কি করবেন?’” জবাবটা শুনে আমার ব্রহ্মাণ্ড অবধি জলে গেল। এতটুকু ছেলের মুখে এত বড় কথা! ইচ্ছা হল, আচ্ছা করে তথনি যা কতক দিয়ে কি করতে পারি তা দেখিয়ে দিই। কিন্তু উত্তেজনার সময় যাই করা যায় না কেন, তার ফল কখনও ভাল হয় না—এ কথা আমি দ্রব সত্য বলে মানি। তাই জোর করে নিজেকে ধরে রাখলাম; এমন কি আলোচনা-প্রসঙ্গেও যদি মনের উত্তেজনা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই ভেবে সুরেশের সঙ্গেও কোন কথা বললাম না। ঘরে এসে কোটাটা টেবিলের ওপর রেখে চুপ করে বসে রইলাম। ভাবলাম, দেখি ঘটনার স্রোত কোনদিকে গড়ায়। মাথা ঠাণ্ডা হলে ভগবান্ নিশ্চয়ই কাজ করবার একটা সূত্র ধরিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যার পর ছেলেরা রোজ একবার আমার কাছে আসে। সেদিন আর সবাই এসে, বিজয় এলো না। আমার মন হতে একটা মন্ত বোঝা নৈমে গেল। বুঝলান, সুরেশের কাছে স্পর্দ্ধাভরে যাই বলে থাকুক না কেন, বিজয়ের মনে লজ্জা বা সন্দোহ হয়েছে, অন্তর্য্যাকে স্তায় প্রতিপন্ন করবার জেদটা ভা হলে চূপে গৈছে। মালমসলা শুদ্ধ কোটাটা প্রকাশ্য-ভাবেই আমার টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। ভাবলাম, বিজয় এ ঘরেই শোয়; যেতে আস্তে তার অপকীর্তির নিশানাষরূপ কোটাটা চোখে পড়বেই। যদি দেখি, তার ভিত্তরকার মালমসলা নয়ছয় হয়েছে, তা হলে বুঝবো রোগ গুরুতর; আর তা না হলে তার অপকীর্তির নিদর্শনটা যে মুক হয়ে অহরহ তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এতেই বিজয়ের মনে অনুশোচনা আসবে। আমার শাসনের

চেরে এই মনোবশে তার উপকার হবে বেশী। সেদিন আমি শোয়ার পর বিজয় ঘরে এসে চুপি চুপি শুনে। আমি টের শৈলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না।

এমনি করে দু' দিন কেটে গেল। বিজয় একটু সন্ধ্যা করে চলছে বুঝতে পারছি; কিন্তু আমি ব্যবহারে কোন বৈলক্ষ্য দেখালাম না, অথচ বেশী মেশামেশি করবারও চেষ্টা করলাম না। আমাদের দু'জনার মনের মাঝে যে কোথায় টান পড়েছে, তার নির্বাক সাক্ষি স্বরূপ কেবল কোটাটা আমার টেবিলের উপর পড়ে রইল।

তিন চার দিনের মাঝেই বিজয়ের সন্ধ্যা-টুকু সম্পূর্ণ কেটে গেল। আবার আগের মতই সে আমার কাছে এসে গল্প, আবদার ইত্যাদি জুড়ে দিল। আমিও কোনও সন্ধ্যা রাখলাম না, প্রাণ খুলে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলাম। কথার মাঝে হঠাৎ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, “বিজয়, বেশী করলে শেষটার কি হয়, জান?” বিজয়ের মুখ ঝিম্ব হয়ে গেল। সে ঢোক গিলে বলল, “মরে যায়।” “যা ভাল ছেলে, তার মেশা করে?” বিজয় চোখ নীচু করে মাথা নাকল শুধু। জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি

সেদিন ওগুলো জানলে কেন?” বিজয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল; “আমার ভাল হতে ইচ্ছা করে না, আমার মরে যেতে ইচ্ছা হয়।” আমি তাকে বুকের কাছে ধুটেনে এনে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কোন অস্ত্রায় করলে কেউ যে মনে ভারী বাথা পেতে পারে, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?” বিজয় মাথা নেড়ে বলল, “না।” আমি বললাম, “কিন্তু তুমি জানো না, তুমি অস্ত্রায় করলে আমার প্রাণে কি কষ্ট হয়! আমি যে, তোমায় ভালবাসি, তুমি কি আমার মনে বাথা দিতে পার?” বিজয় বলল, “না।” আমি বললাম, “শাস্ত্র থেকে তাহলে মনে রেখো, তুমি যদি কোনও অস্ত্রায় কর, তাহলে যে তোমায় ভালবাসে, তার মনে ভারী লাগবে। যে ভালবাসে, তার মনে কিছুতেই বাথা দিতে নাট।”

এমনি করে চোখের জলের মাঝে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল। বিজয় তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে কি না জানি না; কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি, ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র; আমার ভালবাসায় যদি কোনও ছলনা না থাকে, তাহলে তার শক্তিকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। যদি সে শক্তি সব ক্ষেত্রে সফল নাও হয়, তাতেই বা কি। আমার হৃদয় তেঁা মধুময় হয়ে থাকবে।

## ‘আরণ্যক’

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীর্যমায়ন তাম্রবিন্দন ঋষিষু প্রবিস্থম॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৩।৯

ঋষি যে দেবতার স্পর্শ পেয়ে সগৌরবে বলেছিলেন, “সোমম্ অপাম অমৃতম্ অভূমঃ” সেই দেবতাই যে তোমার আমার ভিতরে রয়েছেন। কিন্তু আমরা মোহাক্ষ হয়ে কামনাবাসনার জাল দিয়ে তাঁর প্রকাশের

পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি, তাই আমাদের এই দুর্দশা। তিনি স্বপ্রকাশরূপ, সর্বদা প্রকাশিতই রয়েছেন, আমরা তাঁর প্রকাশের পথে মায়াময় জালের আড়াল দিয়ে রেখেছি। জাল ছিঁড়ে ফেল, দেখবে তোমার ভিতরেই

অমৃত সঞ্চিত রয়েছে—কি শুধার তোমার  
প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তুমি ওঠ—  
জাগ—এ উপনিষদের যুগে আর মোহাচ্ছন্ন  
হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। দেবতা এসে  
তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন—তাকে হৃদয়ে  
বরণ করে নাও।

\*

এ জগতে এই একটা মজা, গাছের খবর  
পশুর খবর, কীটপতঙ্গের খবর, গ্রন্থনফত্রের  
খবর নিতেই সকলে ব্যস্ত। কিন্তু নিজের খবর  
জানতে চায় অতি অল্প লোকে। আত্মজ্ঞানের  
কথা হলে লোকে একটা আজগুবি স্বপ্ন-  
রাজ্যের কথা বলে ভাবে। আত্মা এক কাল-  
নিক পরীক দেশের সোণার গাছে হীরার পাতা  
আর মণিকের ফলের মত জিনিষ নয়—তা  
হচ্ছে আসল তোমার কথা—তুমি আমি যা,  
তাঁবই কথা হচ্ছে। এ অটল সত্যে বিশ্বাস  
কর, লাভ হবে তোমার, না করলে তুমিই  
ঠকবে। এই যে তোমার নিজকে তুমি বিশ্বাস

করতে পারছ না, ঐটাই মহামায়ার খেলা,  
মায়ার ভুলে নাকফোঁড়া বলদের মত রূপরসের  
দিকে ছুটে চলেছ। ইন্দ্রিয়ের সুখকে নিজের  
সুখ ভেবে ত্রুক্ষণের মধ্যে হাবুডুব খাচ্ছ—  
জানামৃতের স্বাদ যদি একবার পেতে, দেখতে  
কি তুচ্ছ সুখে তুমি মগ্ন হয়ে আছ।

\*

এই যে পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ, এটা মনের  
স্বপ্নাকার সংস্কার শিল্প আর কিছু নয়।  
সব যোগের মূল ঐ সংস্কার। এই জগুই আর্থা-  
খ্যাগণ সংস্কার দূর করবার জন্য এত চেষ্টা  
করতেন। প্রথমে কুসংস্কার দূর করে সুসং-  
স্কারাপন্ন হতে হয়, তার পর তাকেও ত্যাগ  
কবে নিজের শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করতে  
হবে। এই হল আর্থাশিক্ষার মূলনীতি।  
সমস্ত সংস্কার দূর হয়ে গিয়ে আত্মজ্ঞানে প্র-  
স্টিত হতে পারলে প্রহ্লাদের ছায় তার নি-  
শিথ অমৃত হয়ে ওঠে।

## সংবাদ ও মন্তব্য

আগামী ৩১ বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া হইতে পঞ্চমী তিথি  
পর্যন্ত দিবসত্রয় অত্র সারস্বত মঠের উনবিংশ বার্ষিক  
উৎসব ও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত  
হইবে। আমরা সাধু ভক্ত, আর্গ্যদূর্ণণের 'গ্রাহক',  
পাঠক ও অনুগ্রাহকগণকে উক্ত উৎসবে যোগদান করি-  
বার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

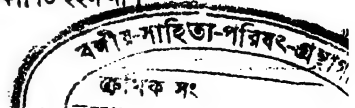
ঐষ্ঠাধিতা আশ্রম পরমহংসদেব উৎসবের পূর্বেই  
অত্র মঠে পদার্পণ করিবেন এবং কিছুকাল এখানেই  
থাকিবেন।

পক্ষিমবাকুল সারস্বত আশ্রমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক  
স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত প্রভাকর চৌধুরী বিগত ৫ই চৈত্র  
পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে উক্ত

আশ্রম অত্যন্ত কতিগ্রস্ত হইল। শ্রীগুরুপায় তাঁহার  
শোকগ্রস্ত পরিবার সাহায্য লাভ করুন।

বিগত ৩রা ৫: ৪ঠা এপ্রিল উত্তরবঙ্গালা ভক্তসম্মি-  
লনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কুচবিহার সহরে  
হইয়াছে। বগুড়ার প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত  
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৫ই এপ্রিল  
তারিখে কলেজের ছাত্রগণের বিশেষ অনুরোধে স্ববক্তা  
শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র সেন ছাত্র ও অধ্যাপকগণের একটি  
সম্মিলিত সভায় ছাত্রগণের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি  
স্বদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

স্থানান্তরিত: দানপ্রাপ্তিবিকার, গ্রন্থপরিচয় ইত্যাদি  
এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না।





৩ তম সং

# ভাষ্য-দর্পণ

১৯৭ বর্ষ }  
 সমষ্টি সং ১৯৪ }  
 জ্যৈষ্ঠ { প্রথম খণ্ড  
 { দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্নয়ে

[ ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।২ ]

[ বৈখানসি ঋষত ঋষিঃ—অগ্নিদেবতা—ত্রিষ্ট পৃ ছন্দঃ ]

আ হোতা ঋত্বো বিদথান্যছাৎ  
 সত্যো যজ্ঞা কশিতমঃ স বেধাঃ ।  
 বিদ্যুদ্ভথঃ সহস্রস্পুত্রো অগ্নিঃ  
 শোভিক্ষেণঃ পৃথিব্যাঃ পাত্তো অশ্রেহ ॥

এসেছেন দেবহোতা যজ্ঞভূমে আনন্দের • খনি—  
 'সত্য তিনি, ধাতা তিনি—যজ্ঞমান, কনিশিরোমণি ।  
 বিজলীর রথবাহী দেব অগ্নি লক্ষনার • ধন—  
 দীপ্ত তাঁর ভটাজালে ধরাবকে ছড়ায় কিরণ ।

অখামি তে নমউত্তিঃ তুমস্ব  
 ঋতাবস্তভাঃ চেততে সহস্রাঃ ।  
 বিহা। অা বন্ধি বিনুশো নিশ্বসি  
 মধ্য অা বহি ক্লতস্ব বজ্রাঃ ॥

জানাই তোমারে নতি, বীর্যবান, কর তা গ্রহণ—  
 তুমি বজ্র-অধিরাজ, নিখিলের চিত্তবিবোধন;  
 জান তুমি গুণিগণে, সবে ডাকি জানগো হেথায়,  
 বজ্রভাগী হয়ে বসো কুণোপরি তাদের সভায়।

ঐবতাঃ ত উষসা বাজরজ্জী  
 অগ্নে বাতস্য পথ্যাক্তিরচ্ছ ।  
 স্বঃ সীম অজান্তি পূৰ্ব্বাঃ হবিভির  
 আ বন্ধুরেব তস্তু দুৰ্নোণে ॥

হে দেবতা, মনধাত্তে স্তমজ্জা উষা আর নিশি  
 ছুটে আলো তোমা পানে রহুপথে ঢকলিয়া নিশি;  
 চিরন্তন তুমি তাই পূজে সবে হবি উল্লাসে;—  
 যুগ হেন তারা দুটা বাঁধা আছে মোদের দুয়ারে।

মিত্রশ্চ তুভ্যঃ বরুণঃ সহস্রো  
 অগ্নে বিধে মরুতঃ স্তম্মমর্চন ।  
 স্বচেছাচিষা সহস্রম্পূত্র তিষ্ঠা  
 অভি ক্রিতিঃ প্রথরাস্ত্ৰ সূর্য্যো নুশ্ব ॥

মিত্র আর বরুণের চোখে তুমি মহাবীর্যশালী,  
 জানে তাহা বিশ্বদেব, বহি জানে আরতির ডালি;  
 বীর্যসাধ্য তুমি দেব, ধরাধানে বিখারিয়া ছালা,  
 সূর্য্য হেন মহিমায় নিখিলেরে করিয়াছ আলা।

বসুং তে অস্ম্য কুন্নিয়া হি কামম  
 উত্তমহুতা নমসোপসত্য।  
 অজিষ্টেন অক্সস। অক্ষি দেবান্  
 অশ্বেষত। অক্সস। বিপ্রো অশ্বে ॥

এনোহ তোমার তরে বাহা চাহ তরিয়া অঞ্জলি—  
 বাঢ়িয়া প্রসাদ তব নমি পায় দিমু, তাহা তুলি;  
 ডেকে আন দেবতার বজ্রভূমে, করি সমর্পণ  
 কল্পহীন ভূতিগাথা—হোক তাহে সবার তর্পণ।

অজি পুত্র সহসো বি পুর্কার  
 দেবস্য অস্ত্যুতসো বি বাজাঃ।  
 অহং দেহি সহস্রিণঃ কুন্নি  
 শোভোদ্যোণ বাচসা সত্যমশ্বে ॥

শক্তির তনয় তুমি, ভক্ত জন পেল বহুবার  
 শতবিরবিনাশন তোমা হতে কত উপকার;  
 পুরিয়া সহস্র সংখ্যা হে দেবতা দাও আনি ধন;  
 দ্রোহহীন বাক্যে তব সত্য পথে করি বিচরণ।

ভুভ্যঃ দক্ষ কবিভ্রনতো আনীমা  
 দেব মর্ত্যাসো অশ্ববন্ধে অকক্ষ।  
 অহং বিশ্বস্য পুন্নিথস্য বোধি  
 সর্কঃ তদশ্বে অশ্বতঃ স্তুদেহ ॥

দক্ষ তুমি, হে দেবতা, জান সব বত আয়োজন  
 করেছি তোমার তরে বজ্রভূমে মোরা, মর্ত্যজন;  
 কর তা স্বীকার দেব—দাও তজ্জ্ঞে স্মরণে রথ;  
 অমৃত পিপাসা তব বাক মিটে—দেখাও সুপথ।



## সাক্ষী চৈতন্য

জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুশুপ্তি বা স্থল, হৃদয় ও কারণ। এই তিনটি অবস্থা নিয়ে তিনটি শরীর। তিন অবস্থাতেই অক্ষয়চৈতন্য প্রবৃত্ত রাখা হচ্ছে সাধনা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তিতে জ্ঞানপ্রবাহ অবিরুদ্ধে প্রবাহিত রাখতে পারলে স্থল, হৃদয় ও কারণের জ্ঞান হয়। সাধারণতঃ জাগ্রতের জ্ঞান স্বপ্নে আর স্বপ্নের জ্ঞান সুশুপ্তিতে থাকে না। জাগ্রতের “আমি”কে স্বপ্নে সজাগ করতে পারলেই আর স্বপ্ন থাকে না। স্বপ্নের “আমি”র এ জ্ঞান থাকে না যে আমিই জাগ্রতের আমি, স্বপ্ন দেখছি। দেহান্তে জীব স্থল ছেড়ে হৃদয়ে যায়, সাধারণ ভাষায় তাকে বলে মৃত্যু; কিন্তু সেই হৃদয় শরীরে এই স্থলের জ্ঞান থাকে না। তখন একথা মনে থাকে না যে সেই স্থলের আমিই স্থল ছেড়ে হৃদয়ে এসেছি। স্থলের জ্ঞান হওয়া সহজ—যেমন জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞান। হৃদয়কে আরক্ত করা কঠিন। স্থল হতে হৃদয়ের এলাকা আরও বড়। বুদ্ধি, মন, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি সত্তারটি পদার্থ নিয়ে হৃদয় শরীর। মনন দ্বারা হৃদয়ের জ্ঞান হয়, আর নিদিধ্যাসনে কারণ জ্ঞান হয়। কারণ এক; অবিতা বা মূল প্রকৃতিই কারণ। সুশুপ্তিতে অহংকে প্রবৃত্ত রাখতে পারলেই দ্রষ্টা শক্তি দৃষ্টার।

সমাধি লাভ না হলে সম্যক জ্ঞান জন্মায় না। আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহং নই, ইত্যাদি যে সমস্ত জ্ঞান জাগ্রতে মনন করছ, তার আভাস জ্ঞান যাত্রা। স্থল শরীর নষ্ট

হলে জ্ঞানকে খাড়া রাখা যায় না। জীব যখন স্থল ছেড়ে হৃদয়ে যায়, তখন তার স্বরূপ জ্ঞান ভুল হয়ে যায়; সে এক রকম অতিভূত অবস্থায় থাকে। স্বপ্নের সময় যেমন মনে রাখতে পারি না যে জাগ্রতের আমিই স্বপ্নদ্রষ্টা হয়েছি এবং আমারই মনের কল্পনা দিয়ে কত কি সৃষ্টি করে তার স্বরূপ সুখদুঃখ পাচ্ছি, তেমনি হৃদয়ে গিয়েও আমাদের স্থলের জ্ঞান লোপ হয়। কাজেই সে সময় প্রেরণ, ইষ্ট, গুরু জ্ঞান ইত্যাকিন্স কথা স্মৃতিতে আসে না। যদি ধ্যানসহজের বা নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বপ্নের “আমি”কে সজাগ রেখে হৃদয়ের জ্ঞান আরক্ত করতে পারি, তাহলে মৃত্যুর পরও স্বরূপজ্ঞান স্মৃতি উঠবে। তখন জ্ঞানতে পারবে যে তুমি কে। হৃদয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারলেই কারণের জ্ঞান সুগম ও সহজসাধ্য হয়।

সাধারণ কথায় বলে, জীব যখন গর্ভে থাকে, তখন ওপারের জ্ঞান থাকে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হলেই সে জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, তখন তার সব ভুল হয়ে যায়। তেমনি স্থল শরীর ন্যাসের পরও জীবের স্থল জ্ঞান থাকে না, এখানেই খবর ওপারে নেওয়া বা ওপারের খবর এখানে আনার ক্ষমতা থাকে না। স্বপ্রাবস্থায় জাগ্রতের জ্ঞান পৌছাতে পারে; কিন্তু যখনই মনে হয়, আমি স্বপ্ন দেখছি, আমিই স্বপ্রাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, যুমন্ত মায়ায় ভেগে ওঠে। বত কিছু পাখনা, এই “আমি”কে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তিতে প্রবৃত্ত রাখা। স্থল, হৃদয় ও কারণ জ্ঞান আরক্ত হলে আর ভুল হয়

না, তখন শরীরনাশের পরও শুক, ইষ্ট ও  
জ্যোতির্জ্ঞান লাভের থাকে। উৎক্রান্তি প্রাণকে  
জাগ্রত করেই তার থাকে। মানুষ ও আরও  
চ'রস্টা বুদ্ধিমান জীবজাড়া আর ককিউৎ  
ক্রান্তি হয় না। আবার মানুষের মাঝেও  
বাদের প্রাণবায়ু ছদরে কক্ক করে শরীরপাত  
হয়, তাদেরও উৎক্রান্তি হয় না। এই জন্যই  
অপঘাত মৃত্যু না আকস্মিক মৃত্যুতে মানুষকে  
পল জন্ম নিতে হয়। কারণ, তখন তার মন  
লক্ষ্যভাব ও সংস্কারবর্জিত থাকে; কোনও  
আশা আকাঙ্ক্ষা বা কামনাবাসনা না থাকায়  
তার মন চঠাৎ তম্র অভিভূত হয়ে পড়ে,  
নিজকে জাগিয়ে রাখবার জন্য সংস্কারের  
কোনও অবলম্বন পায় না; কাজেই সে অব-  
স্থায় সে প্রকৃতির জীড়নক হয়ে পড়ে।  
পশুসোনি প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত, রক্ষিত ও  
প্রকৃতির বাবাই ধ্বংস হয়। প্রকৃতিই তাদের  
জন্ম, আবু ও ভোগের নিরামক।

যোগীর শরীর নাশও ছুপিঙে বায়ু  
কক্ক করেই হয়, কিন্তু তাঁর উন্নততর গতি  
লাভ হয়, কারণ যোগী তাঁর আঘাটচৈতন্য প্রবু  
য়ে প্রাণবায়ু ছেড়ে দেন। প্রাণবায়ু স্থান-  
প্রস্থান রূপে স্থল আর স্থূম্মর সংযোগ রক্ষা  
করে চলেছে। বিষয় আর ইন্দ্রিয় এক দিকে,  
আর একদিকে মন—মধ্যে চলে প্রাণ। বাস  
গ্রহণ করবার সময় ইন্দ্রিয় আহরিত বিষয়  
গুলি মনের নিরুট পৌছে দেয়, মন বুদ্ধির  
আভিভূতে সেগুলো উজ্জল করে তোলে;  
আবার প্রাণস ভ্যাগের সময় ইন্দ্রিয়ই স্বসংযুক্ত  
বিষয়ের প্রতি বহিমুখী প্রেরণা নিয়ে আসে।  
ইতরাং প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ করলেই বিষয় সম্বন্ধ  
ভ্যাগ হলে। কিন্তু বিষয় সম্বন্ধ ভ্যাগ হলেও  
মনের ক্রিয়া চলে থাকবে, সে তার সম্বন্ধ

বিকল্প বৃত্তি নিয়ে ক্রিয়ালীল হবে। ইতরাং  
প্রাণের বোধ করবার পরও মনের মননক্রিয়া  
বন্ধ করবার জন্য প্রাণাহার, ধারণা ও ধ্যানের  
সহায়তা নিতে হয়।

একটা কিছু অবলম্বন দিয়ে মনকে কোনও  
বস্তুকে একাগ্র করতে হয়। মনের শতশ-  
বিতস্ত চিন্তাপ্রবাহকে প্রত্যাহার করে একটা  
বিশিষ্ট বিষয়ের ধারণা উৎপন্ন করে নিকৈপশু  
অবস্থার একাগ্র বৃত্তিতে তদগত করাই হল  
ধ্যান। এর পরিপক অবস্থাতে ধ্যান, ধ্যায়  
ও ধ্যানের ভেদ নষ্ট হয়ে গিয়ে চিন্তাবৃত্তি নিকক  
হলেই মনবুদ্ধির লয় হয়ে যায়। তখন বাসনার  
বীজ পুড়ে যায়; বীজের আকার মাত্র থাকে,  
কিন্তু তার অঙ্গুর উদগমের শক্তি নষ্ট হওয়ার  
আর নতুন কর্মবীজের সৃষ্টি হয় না। একেই  
বলে ছয়গ্রাহি ভেদ। সুস্থিতি হচ্ছে তম্র,  
তম্রের পরপারে জ্ঞান। সুস্থিতিতে যিনি আত্ম-  
চৈতন্য প্রবু রাখতে পারেন, তিনি ওমহকে  
অতিক্রম করে জ্ঞানের ভাস্বর রাজ্যে পৌছান।  
তখন তিনি জীবমুক্ত। তখন তাঁকে কর্ম  
আর বাধতে পারে না—কর্ম অকর্ম বলে  
তখন আর তাঁর কিছু থাকে না। তিনি  
কর্তা হয়েও অকর্তা, অকর্তা হয়েও কর্তা—  
সুতরাং কর্তব্যাকর্তব্যের সত্তীত। তিনি সব  
করেও কিছু করেন না, আবার না করেও সব  
করেন—“হ্যামি স'মো ন'লোকানু ন বক্তি র্  
নিবধ্যতে।”

‘তাই বলে কি জানী অপকর্মই করেন ?  
তাঁর না।’ আবার করেন না—একথাই বা  
জোর করে বলি কেন ? সিদ্ধ জীবমুক্তের কাছে  
সবই সমান—কাজেই তাঁর কর্মকর্ম নাই।  
একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ একটা প্রসিদ্ধ মঠের  
মোহান্ত হয়েও চানারের কাজ করে জীবিকা

অর্জন করতেন। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে সবই উজ্জল হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর ব্যবহার দ্বিক সাধারণ মানুষের মত। জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে অনুকের বিবশ্রমোগে তাঁর শরীর নষ্ট হবে, তবুও তিনি তাঁর প্রাক্ত-কার চেষ্টা করেন না, কারণ এসবকে কোনও রূপ প্রবন্ধ তাঁর শরীরের প্রতি সমতারই পরিচায়ক। আসক্তিই তো বন্ধনের কারণ। জীবদুঃখ মহাপুরুষেরা প্রারম্ভে চলেন। প্রারম্ভ করের ক্ষমাই তাঁদের উদ্দেশ্য। জীবদুঃখই হউন আর বাই হউন, প্রারম্ভ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। একখাটি একটা গর দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

একটা লোকের একমাত্র পুত্র বিবরকর উপলক্ষ্যে বিদেশে ছিল। একদিন সে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেল। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতা শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল, এমন কি তাঁর গর্ভে জীবন ধারণ অঙ্গ হয়ে উঠল। অবশেষে মৃত্যুকামনার সে একটা লাঠি নিয়ে নিজের মাথার মেরে বসল, তাতে মাথা কেটে কত হয়ে পেল। লোকটী মরল না বাটে, কিন্তু লাঠির ডায়ে তাঁর মরণব্রণা হতে লাগল। ঘটনাক্রমে তাঁর পুত্র হঠাৎ জীবিত সবহার তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত। ছেলেকে দেখে পিতার শোকজনিত সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে গেল। বাটে, কিন্তু মাথার কুতজনিত বাধা দূর হল না। তাঁর মরণ ভাকে কিছুকাল ভুগতে হলো, ব্যাধিও বাধা, ওষুধ বেগুন ইত্যাদি কর্তব্য থাকল। এইরূপে জীবদুঃখ মহাপুরুষেরও সর্বমংশের হিংস্র হয়ে জ্বরগ্রহি ভেদ

ও কর্তব্যীক তর্জিত হলেও, অতিকৃত্য হাউ হাউ পরিভ্রাণ পেলেও তাঁকে প্রারম্ভে না ভোগ করবার তা করতেই হবে। প্রারম্ভ ওষু ভোগেই শেষ হয়—এ আইন সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

জানেন যে জ্ঞানীর কি আনন্দ, অপরে তা কি করে বুঝবে? সাধারণে বলে, জ্ঞানীর শুভ জীবন। কিন্তু তা নয়। জ্ঞানী যে অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ করেন, তিনি আনন্দময়, আনন্দই তাঁর স্বরূপ। তাঁর ক্ষুদ্র অহংসুর চার গিরেছে, বিরাট অহংকে প্রসারিত করে দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত বস্তুকে তিনি আপন জানে গ্রহণতরে বুক জড়িয়ে রেখেছেন আর নিজের দ্রষ্টা, সাক্ষী, চেতা হয়ে যে কি অনির্বচনীয় আনন্দ আশ্বাদ করছেন, তাঁর আভাস যে পেরেছে, সেই ধত্ত হয়েছে। অন্যস্বাক্ষিত বস্তুর স্বাদ অপরকে বেগুনা যায় না, সুতরাং অপরকে সে আনন্দের কথা বুঝানোর চেষ্টা পণ্ডিত্র মাত্র।

আমি যে আনন্দস্বরূপ, অমৃতের সিদ্ধ-স্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ। আমাতেই সব অবস্থিত, আমা হতেই উদ্ভূত, আমার আশা-তেই সব লীন হচ্ছে। এই যে আকাশে অগণিত গ্রহনক্ষত্রের মেলা—এ তো আমারই বিকাশ। আমি স্বপ্রকাশ—ওরা আমার জ্যোতিঃসুত্রেই জ্যোতিঃমান। আমার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হিতি লয় হচ্ছে—বহু, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সব আমিই ধারণ করে আছি। আমিই সব—আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি পূর্ণ, আমি মহান—আমি সেই—আমি সেই—“সোহং—সোহং।” ওম্।

## কর্ম-সংকেত

—৩—

কাজ করতে গেলেই অভিমান জুটবে এসে। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, ভগবদ্দর্শন না হলে অভিমান যায় না। সে তো বহু দূরের কথা। ততটা যে হবে হবে, সাধারণ কর্মী তার আত্মা জই করতে পারে না। তবে প্রথম হতেই অভিমান হতে ততটা তফাৎ থাকে যায়—অন্ততঃ নিজের চেতন—ততটাই ভাল। কর্মযোগের এটা অপরিহার্য অঙ্গ। অভিমানের একটা রূপ হচ্ছে আত্মসমীচনা—নিজের স্বাধীনতা খুঁজতে বলা। আত্মসমীচনা নিন্দার কথা—এটা আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সে ধারণা অসুস্থ কাল খুব কম হয়। আত্মসমীচনাকে বিনয় বলে চালিয়ে দেবার প্রয়াস সব জায়গাতেই দেখা যায়। অতি ভালবাসাকেও মেনি, ভাবে কেন, ভাবার শুদ্ধ নিজের গুণগণনা জাহির করে কেনেন। অবশ্য বুদ্ধি, অভিমান। ছাড়া কর্ম হয় না। কাজ করলেই মনে হবে, এটা আমি করছি—তা ভানই হোক, আর মনই হোক। আর তাই থেকে নিজের ওপর, কাজের ওপর একটা দৃষ্টি রাখতে হবে। দৃষ্টি রাখা হবার চেতনা কর না কেন, একই না একই আশির রেশ থেকেই বাবে। তা থাক। তবে আমিই করছি—এ কথাটা অপরকে জানাবার জন্য ব্যর্থ না হই—এই প্রথম কথা। এই ব্যতীতই হল অভিমানের জড়। আত্মপ্রসাদ অমূল্যব কর্তে পারি, যদিও তার মাঝেও কোথা হতে অভিমান এসে জোটে। কিন্তু অপরকে নিজের

বাহ্যিক জিনিষে আত্মপ্রসাদ অমূল্যব করা—এ হচ্ছে আত্মহত্যার নামান্তর। তাই কর্মীর নীরব হওয়া খুবই প্রয়োজন। মুখ বুজে—একবারে দীর্ঘে ভিত্তি চেপে কাজ করে যাও, দেখবে অভিমানের অর্ধেক বোঝা নেমে গেছে। মনের মাঝে তবুও যত প্রতিবাদ চলবেই; তা চলুক। কারি ভাল কথাতেও কান দিও না, মন্দ কথাতেও না। মুখ বন্ধ থাকলে মনটাও ক্রমে চুপ হয়ে আসবে। কথার কথার বাড়ে—এটা চলতি কথা; শুধু কথা বাড়ে না—অভিমানও বাড়ে। চাল-চলন হাবভাব সব নরম কর, কোমল কর। হয় প্রার্থনা, নয় আত্মবরণে সমাধান—হুই পথ।

✽

কেউ নিজস্ব করতেই টপ করে বলে কেল, তাকে পাওয়ার জন্যই আমাদের যা কিছু প্রয়োজন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, কপাটা কি ঠিক? কি করছি তাকে পাওয়ার জন্য? কিছুই না। সেই নিত্যকার মত খাওয়া-পরা শোওয়া-বসা—এই ব্যাপারেরই তো অধঃস্থ পুনরাবৃত্তি চলছে। আবার এও ভাবি, কিই বা করবে? সাধন কি আর একটা দুঃস্বপ্নের জিনিষ? এই নিত্যকার খাওয়া-শোওয়া-বসার মাঝে যে সাধন চালাতে না পারে, দুঃস্বপ্নের সাধনে তার ভরসা কি? নিত্যকালের মাঝেও সাধনা চলছে বই কি; তবে কিনা সেটা তার সাধনা নয়, আমার সাধনা—অভিমানের সাধনা। অহংএরই সাধনা

করছি, অথচ আমিই তাঁর খবর জানি না—  
এত বড় ভুল আর কোথায় দেখেছি? যেদিন  
এ খবর জানুব, সেদিন চমক ভাববে, এই  
কর্মের জোরায়ই সেদিন তাঁর পানে উজান  
বইবে। কিন্তু এখন করছি কি? কথার,  
কাজে, ভাবে কেবল প্রচার করছি, আমি কি।  
আর যখন বতরু আমার স্বরূপ প্রচার হচ্ছে,  
ততরুতেই ভারী খুশী। ছটা উপদেশের  
মূলি আওড়ালাম, অমনি আমি আচার্য্য;  
‘হ’ ছত্র লিখলাম, অমনি আমি কবি; ছটা  
ছেলে ঠাণ্ডালাম, অমনি আমি শিক্ষক;  
সংসারের কাজে ছটা পরামর্শ দিলাম, অমনি  
আমি ব্যবস্থাপক। কাজগুলো বিচার করে  
দেখ—কত সামান্য, অথচ তাঁর দরুণ উপাধিটা  
বা মিলছে, তা কত বড়। একে লাভের  
ব্যবসা বলব না? আর মজা এট, যখন আমি  
না, তাতেই মহা খুশী—যেন ওতেই আমার সব  
পরিচর নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমি যে  
ওর চেয়ে কত বড়, কত মহান—সে খবর  
মাঝে কে? তা বুঝতে হলে বলতে হবে,  
কাজে যেউপাধি ছুটির আনে, তার একটাও  
আমার নয়—আমি একেবারে অকর্মী, শিন  
সচ্চিদানন্দ।

✽

কাজ কখন করবে আর কখন ছাড়বে—  
এ ঠিক করতে ভারী হুঁসিয়ার হতে হবে।  
সোজা কথা এই—ভাবের জোরায় এসে যতক্ষণ  
তোমার অন্তর্কিতে অবশ্য করে না ফলে,  
ততক্ষণ কাজ ছেড়ো না। তা বর্জ্য করা, তা  
হলে বুঝতে হবে তোমার বেয়াক ফাঁকী।  
পূর্ণগর আর পূর্ণতমো—তুইই বাইরে দেখতে  
একরকম; তাই দূরে তুল হবার খুবই  
সম্ভাবনা। হরত পূর্ণ তমোতেই ডুবে আছি,

আর ভাবছ মহাসাম্প্রতিকতার দরুণ বুঝি কর্তৃ  
বিরক্তি এসে পড়েছে। তখন মনে হয়ত  
কোনও ভাবনাচিন্তারও চেষ্টা খেলছে না,  
কিন্তু তা বলে মনে করো না যে ওটা উপরতর  
লক্ষণ; আসলে হয়ত ওটা নিশ্চেষ্টতারই  
নিশানা। প্রমাণ, হুঁচকারটা ভাবনার মনুনা।  
তবু তমোতেও মাহুখ থাকতে পারো না, তবু  
সঙ্গেও না—চিন্তায়। কাজে মাঝে মাঝে তাকে  
রজোতে নেমে আসতে হয়। তখন যেমন  
প্রবৃত্তি জাগে, তাতেই বোঝা যায়, চিত্ত কোন  
ভূমিতে ছিল। আলো আর আধার, সব  
আর তমঃ—ছটোই ভাঙার। কাজ করবার  
সময় ছটো ততেই রসদ মেলে। তাই তো  
জগতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ছট মার্গ রয়েছে—  
সু-কু রয়েছে। নিশ্চেষ্টতার পর যদি দেখে,  
কু ভাবে, কু কাজে চিত্ত প্রেরিত হচ্ছে,  
তাড়লে বৃক্কেব, এতক্ষণ তমোতেই ডুবে ছিলে।  
গীতার এটাকেই মলচেন—তমোর প্রমাদফল।  
যদি দেখে, নিশ্চেষ্টতার পর সু ভাবে সু কাজে  
প্রেরণা পাচ্চ, তাড়লে বৃক্কেব, সব্ব ছিলে  
আত্মর মজো থেকে সঙ্গে গ তমে যাওয়া চলে  
—ভাব আর কাজের ধারা ধরে।

✽

এই জগৎ চিত্তশুদ্ধি করতে কর্মের প্রয়ো-  
জন—তপস্যার প্রয়োজন। অ-তপস্বীর যোগ-  
সিদ্ধি হয় না। সব্বশুদ্ধি হলেই চিত্তশুদ্ধি হল।  
সংকাজে, সংচিন্তায় যে রজোবৃত্তির চর্চ্চা হয়,  
তাতে রজের নিবৃত্তি হয়ে সব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ  
হয়। আবার অসং কাজে, অসং চিন্তায়  
রজোনিবৃত্তি হয়ে তমে বিজ্ঞান লাভ হবে।  
রজোকে খাটিয়ে নিতে পারলেই নিবৃত্তি, তা  
ছাড়া তার কোনও সার্থকতা সম্ভব হয় না।  
কারজই প্রমাণ হয়, কর্ম করাই জীবের

জ্ঞাত। এখন যে দিকে কর্ম করবে, সেই দিকেই প্রতিষ্ঠা হবে। কিছু না করে কেউ থাকতে পারে না। হাতে পায়ে না খাট, মনে ভোলপাড় চলবেই। ভাল বিষয়ের ভাবনা না কর, মন্দ বিষয় উঠবেই—কেমনা মন্দের সংস্কার তো পাকা। এই জ্ঞাত ভাল হবার দরুণই সাধাসাধনা দরকার, মন্দ তো হয়েই আছে। কিছু না করলেও মন্দ হয়ে যাব—আর কিছু না করলে ভাল হব না—তাই কিছু করা চাই-ই।

✱

অভিমান আসতে থাকবে আর হুঁহাতে তাকে ঠেলতে থাকবে, এই হল কর্মীর অন্তঃ-সাধনা। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই লড়াই করতে হবে। অমুকে বলল, ওঃ তুমি খুব বুদ্ধিমান;

গুনেই মনটা নেচে উঠল। কিন্তু শুদ্ধ না, দিব্যপুরুষ অন্তর থেকে বলে উঠলেন, “ততঃ কিম্”—হলিই বা তুই বুদ্ধিমান—এই কি তোর সবটুকু? না, তুই যে আরও বড়!” কেউ বললে “তুই ভণ্ড!”—মনটা নেমে গেল। আবার গুনছি, সেই গভীর প্রশ্ন—“ততঃ কিম্?”—যদি সত্যসত্যই ভণ্ড হস্, তাহলে সত্য কথার রাগ করবি কেন? আর যদি মিছামিছিই তোকে ভণ্ড বলে থাকে, তাই বলগ করেই বা কি করবি?” তাই বলছি, চিন্তের স্থির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। সুখ হোক, দুঃখ হোক, টলবে না—কাজ করে ভালও চাইবে না, মন্দও চাইবে না। একটা পরমাশ্রয় না পেলে এ ভাব সহজ হয় না। সে আশ্রয় হয় স্বরূপ, নয় ভগবান। হই-ই এক।

## হিমালয়ের পত্র

—{✱}—

### বিশিষ্টাশ্রম

আজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। মেঘগুলো নানা আকৃতিতে আকার ধরে, কোথায়ও বা ঘন কোথায়ও বা পাতলা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মেঘ হতে আলোক প্রতিবিম্বিত হয়ে চারদিক অপূর্ণ জ্যোতির্ময় মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, নন্দন কাননের শিশুরা যেন নানাবর্ণের মনোরম সজ্জায় সেজেছে। এ শোভা চিত্রকরের তুলিতে ফোটে কি? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে রঙ্গের লুকা-

চুরী হচ্ছে, কোনও দর্শক তার নিশানা পাবে কি? যে, দিকুই তাকাও না কেন, আল, জরলা, বেগুনী রঙ্গের অনির্বচনীয় বৈচিত্র্যে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে স্বার তারই ফাঁকে ফাঁকে চিরস্নিগ্ধ নীলের ভূমিকা মাঝে মাঝে উকি দিচ্ছে দেখতে পাবে। এই দিকে দিকে বিচ্ছুরিত সুষমায় রামের চোখ যে জলে ভরে এল, আনন্দে যে তিনি ‘আত্মহারা’ হয়ে গেলেন। মেঘের খেলা মিলিয়ে যায়, কিন্তু কি অপরূপ কাহিনী যেন সে রেখে যায়। বঁধুর

কাঁচ থেকে অমিয়ার পেয়ালা খেন তারা নিয়ে এসেছিল, আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে আবার ফিরে গেল কি ? জগতে যা কিছু মন লোভায়, তারই রহস্য এই। তাঁরা চকিতেব মাঝে ফুটে ওঠে, তারপর রামের ছাতিতে বিকৃতিক্রমে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। সঞ্চরমাণ মেঘমালার সঙ্গে যে আশানাই করতে যায়, তাকে দেয়ানা ছাড়া আর কি বলায় ? অথচ লোকে এই আপাতপ্রতীয়মান ও লতভবিলীয়-মান মেঘমালার মাথাকেই আঁকড়ে রাখতে চায়—আর তাঁরা চলে গেলে ছেলের মত কেঁদে ওঠে। ভারী মজা তো ! ওঃ, আমি যে আর হাসি চাপতে পারছি না গো !

কেউ কেউ আবার করে কি, মেঘের মাঝে ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্তন হচ্ছে, পুঞ্জাপুঞ্জরূপে ভিন্ন ভিন্ন হিসাব খতিয়ে রাখতে গিয়ে সময়ের অপব্যবহার করে। মাগোঃ ! ওরা কেমন-ধারা ম'মুখ ? ওদের চারদিকে আলোর অজস্র প্রস্রবণ, তবুও আলোকের আকুল তৃষ্ণা তাদের মিটবে না কি ? এদেরই না লোকে বলে বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক। তাঁরা চুল চিরে হস্তাগ করতেই বাস্তু, কিন্তু সে কেশ যে বঁধুব শিরোভূষণ, তা কি তাদের নজরে আসে না ছাই ! ওঃ—আমি যে আর হাসি চেপে রাখতে পারছি না। যার দৃষ্টি নামস্কপের মেঘে আড়াল করে 'দেয়নি, আলোকের আকর্ষণীয় মূল নিদান যিনি দিবাচক্ষে দেখতে পান, যে আত্মদর্শীর প্রেম সাধাবস্তুরে লাভ করেছে, মরুভূমিতে তারিয়ে যাওয়া নদীর মত সমুদ্র পাবার আগেই যার প্রেম শুকিয়ে যারনি, সেই ধাত। সম্বন্ধ স্থখ থেকে দূর হতেই হবে। সম্বন্ধ যেন ডাকহরকরা। সে যে প্রিয়তমের প্রণয়লিপি বয়ে এনেছে, তা যেন খুঁইয়ে বসে

না। দিশলাইয়ের কাঠি ধরতে না ধরতে পুড়ে যায়, কিন্তু তা দিয়ে যে চিরকালের মত প্রদীপ ধরিয়ে নিতে পেরেছে, সেই তো চতুর। বাষ্প খরচ হয়ে যাবে, রসদ কুরিয়ে যাবে, এ তো জানা কথা ; কিন্তু তার আগে জাহাজ এনে বন্দরে লাগাতে পারলে তবে না বাহাদুরী। ছ' চোখে যা ঠেকছে, তাই ভগবদর্শনের নিদর্শন যে করতে পারে, জীবদর্শনের দর্পণ যে করতে পারে, তারই জীবন সার্থক। গ্রহ-নক্ষত্র, নদী-পর্বত সমেত 'এই সমগ্র বিশ্ব তা'ই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল। এ একেবারে খাটা কথা জানবে—আমি তোমাদের নিচ্ছে বলছি না।

উন্মুক্ত উদ্ভার প্রকৃতিতে চিরনূতন সৌন্দর্য্য রয়েছে, নগরের ধূমে আবিল রাজপথের সঙ্গে তার তুলনা করে দেখ দেখি। প্রকৃতি কারু স্ততি বা নিন্দা করে কারু মাঝে খণ্ডবোধ জাগিয়ে দেয় না, কাটকে সে কোণঘেঁষা করে রাখতে চায় না। তার সামনে মানুষ সহজেই সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করতে পারে। সুসভ্য সমাজের চেয়ে উদ্ভিদজগতে বোধ হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরিমাণ বেশী ; কিন্তু সে সংঘর্ষের আনন্দ উপভোগ করে কে ? যে তাদের মাঝে থেকেও নিজেকে নির্বিকার সাক্ষিস্বরূপ রাখতে পারে। অরণ্যে 'বৃচ্ছন্দবিহার' করবার মত লোকসমাজে যিনি নিকৃৎসঙ্গে বিচরণ করতে পারেন, নির্বিকার সাক্ষিচৈতন্যরূপে অবস্থান করতে পারেন--দেহের সঙ্গে আগনাকে গুলিয়ে না ফেলে নিজের দেহটাকেও অপর দশটা দেহের সামিল বলে ভাবতে পারেন, এ জগৎ তারই কাছে নন্দনকানন। যারা এমনি ভাগবতজীবন যাপন করেন, তাঁরাই জগ-জ্যোতিঃ। যে জ্যোতিঃ নির্বিকার সাক্ষি-

রূপে সকলকে দর্শন করে, নিখিল দৃষ্টের সেই  
হচ্ছে প্রাণ।

প্রাণের স্রোত বয়ে চলছে। ব্রহ্ম ছাড়া  
আর কার সত্তা নেই। কাকে আমরা লজ্জা,  
কাকেই বা ভয়? সমস্ত প্রাণের বিকাশ সেই  
মহাপ্রাণেরই লীলা—সে আর আমি এক।  
সমস্তটা জগৎই অ'মার হিমালয়ের অরণ্যবিহার  
ভূমি। আলো ফুটলে ফুল হাসে, পাখী গায়,  
তটিনী নৃত্য করে। ধাতু সেই জ্যোতির  
জ্যোতিঃ। জ্যোতির সমুদ্র বয়ে চলছে,  
আনন্দের হাওয়া ছুটে চলছে।

এই মধুর নিকুঞ্জে—আমি শুধু হাসি,  
গাঠি, আনন্দ করি, নাচি। ওকি কার বিক্রম  
ধ্বনি শুনে পাচ্ছি? না, এ ঘে সমীরণের  
মুহুপ্রবাহ! কার উপেক্ষাব শাসি কি? না,  
ও তো পত্রের মর্দরধ্বনি! তরুলতায়, জলে  
স্থলে আমারই নান্দীর স্পন্দন—সে কি আশা-  
কেও ছাপিয়ে উঠবে, নাকি!

• আমি নাচি—নাচি—মধুর আনন্দে নাচি  
শুধু। আর আমার নৃত্যচঞ্চল, চরণাঘাতে  
পথের ধূলি তারা হয়ে ফুটে ওঠে।

আমায় জঁঘা! নাই, ভয় নাই—আমি  
সবার আধির তারা। পাপ নাই, শোক নাই,  
অভীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, লজ্জা নাই, ক্ষতি  
নাই, পীড়া নাই, ভীতি নাই! 'আমি বিশ্ব'  
আআ, অমৃতের প্রস্রবণ। আমি সবার  
আনন্দ, সবার বাস্তু। তটিনীর কলকলে  
আমি, আশার মধুর স্বপনে আমি। আমি  
অমৃত প্রলেপ—আমি শুদ্ধ শাস্ত্র রাম।  
যে মূরের আমি বন্ধার তুলেছি, তাতে গ্রহ-  
গ্রহাস্তর লোকলোকান্তর যে গাঁথা রয়েছে!

✱

## বাস্তবনশৃঙ্গ

চাঁদ উঠেছে—প্রশান্তির রক্ততোক্কাসে চারি-  
দিক প্রাবিত হয়ে গিয়েছে, রাসীর তৃণশস্যার  
উপর পূর্ণচন্দ্রের আলো উপচে পড়ছে। এই  
পাহাড়ে যেখানে সেখানে শাদাগোলাপের  
অপরিমিত দীর্ঘ বীথি নিরীক আনন্দে বিসর্পিত  
হয়ে থাকে; চাঁদের আলো প্রতিহত করে  
এমনি ভাবে তাকে তারা কাঁপিয়ে তুলছে যে  
মনে হচ্ছে নিগরনুগ জ্যোৎস্নার মধুর স্বপ্ন যেন  
তারা। ঘুমো, বাছা ঘুমো—

ঘমনোজী, গঙ্গোজী, স্নমেক, কেদার, বজ্রী  
প্রভৃতি হিমশিলা এত কাছাকাছি রয়েছে যে  
মনে হয়, হাত বাড়ালেই যেন তাদের ছোঁয়া  
যাবে। বাস্তবিক এই বাশিষ্ঠ আশ্রমের চারি-  
দিকে অর্ধবৃত্তাকারে হীরকশৃঙ্গগুলি যেন রক্ত-  
মুকুটের মত বিকশিত করছে। জোছনাল-  
ছধসায়রে চুড়াগুলো যেন ডুবে রয়েছে, আর  
তাদের গভীর সোহংধ্বনি স্নিগ্ধ সমীরণপ্রবাহে  
এখানে ভেসে আসছে যেন।

এই পাহাড়ের সব বরফ গলে গিয়েছে,  
আর এখন চূড়ার কাছাকাছি বিপুল অধি-  
ত্যাকারে নীল, হলদে, শাদা, লাল কত রঙের  
ফুল ফুটে রয়েছে—তার মাঝে কার গন্ধ এত  
মিষ্ট। এখানে লোকে আসতে ভয় পায়—  
তারা বলে এটা পরীস্থান। এই সংস্কার  
থাকতে প্রাকৃতিক সুষমার ধ্বংসের হাত  
থেকে এই দেবভোগ্য উপবনের মর্যাদা রক্ষা  
পেয়েছে। নম্র এই ফুলবনের উপর দিয়ে চল-  
বার সময় খুবই সাবধানে চলেন, যদিই বা  
অভর্কিত পদক্ষেপে কোনও ছোট ফুলের গায়ে  
ব্যথা লাগে।

• কোকিল, ঘোয়েল ইত্যাদি কত পাখী  
ভোরে এসে রাসের কাছে বৈতানিক পায়।



বহু উচুতে গরুড় উড়ছে, ছপুয়ের কক্ষমেঘকে স্পর্শ করে—এই কি গরুড়বাহিনী বিকুর প্রতীক নয় ? সেদিন রাত্রে, একটা বাজ রামের পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

ঐ ঝিলটার ধারে ধারে পুষ্পিত বনস্পতির কি অপক্লপ সজ্জা। ওরা কেনি বাঁধনে বাঁধা পড়েছে ? সে তো পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগত

সম্বন্ধের বাঁধন নয়। একটা সমাজ-সংহতি তাদের আছে, কেননা সবাই একই জলাশয়ে তাদের শিকড় মেলেছে। এই রসপ্রীতিই তাদের সংহত করেছে। আমরাও যেন সত্যের মাঝে তেমনি প্রকার সংহত হই—হ্যালোকে মিলি, হায়ে মিলি, রংমে মিলি।\*

\* শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ

## সন্ন্যাসী আৰু নিৰ্লিপ্ত গৃহী

সন্ন্যাস অৰ্থে সং = সম্যকৰূপে + শাস = ত্যাগ ; সম্পূৰ্ণৰূপে বি ত্যাগ, তাকে সন্ন্যাস বোলে। এই সন্ন্যাস তৰু সহজে ধাৰণা কৰা টান ; গতিকেই সাধাৰণে সন্ন্যাসৰ প্ৰকৃত তৰু বুজিব নোৱাৰি, একোটা মনগড়া ভাবত সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম আৰোপ কৰে। কোনোৱে ভাবে যে কাম্যকৰ্ম্ম ত্যাগেই সন্ন্যাস, কোনোৱে ভাবে কৰ্ম্মফলত্যাগেই সন্ন্যাস, কোনোৱে ভাবে গৃহ-ত্যাগ, জটাজুট ধাৰণ, গৈৰিক পৰিধান আদিয়েই সন্ন্যাস।

সম্যকৰূপে ত্যাগেই হল প্ৰকৃত সন্ন্যাস। ত্যাগ কি প্ৰকাৰ ? “আসক্তি পৰিহাৰঃ।” আসক্তি পৰিহাৰেই ত্যাগ।

যত্ৰাত্ত্বঃ মনসা তবৎ তত্ৰাত্ত্বং বিদ্ধি রাখৰ।  
— মনসা অপৰিত্যক্ত্য সেব্যমধনঃ স্বখাবহঃ ॥

যাক মনৰ পৰা ত্যাগ কৰা যায়, সেয়ে প্ৰকৃত ত্যাগ ; নতুবা বাহ্যিক ত্যাগ ত্যাগেই নহয়। কৰ্ম্মফল ওপৰিষদ ভোগৰ লিপ্সু যি সমূহ ত্যাগ কৰিব পাৰিছে, সেয়ে ত্যাগী—

সন্ন্যাসী। তত্ত্বজিজ্ঞাসু অৰ্জুনে ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণক কৰ্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ ও কৰ্ম্মফলত্যাগ এই উভয়ৰ তাবতম্যা শোধাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল “হে পাৰ্থ, দান যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কৰা কালত নিজ কৰ্ত্তৃম্মাভিমান ও স্বৰ্গাদি ফল-ভোগৰ কামনা ত্যাগেই মোৰ মতে শ্ৰেষ্ঠ।” কামনামুক্ত কৰ্ম্মই বন্ধনৰ কাৰণ ; অতএব সকাম কৰ্ম্ম বৰ্জন কৰা সন্ন্যাসীৰ অবশ্য কৰ্ত্তব্য। দেহ থকা সত্বে জীবই কৰ্ম্ম নকৰি নোৱাৰে। কৰ্ম্ম কাৰিবই, কিন্তু সেই কৰ্ম্ম ভগবানত অৰ্পিত হ'ব। ফলাশা নকৰি, আসক্তি বা বিমক্তি বাতৰীকে উপস্থিত কৰ্ম্ম কৰি থোৱাই হ'ল কৰ্ম্মসন্ন্যাস। কৰ্ম্মত্যাগ তিনি প্ৰকাৰ, সাধ্বিক, বাহ্যসিক ও তামসিক। ফলাশাস্থ হৈ কৰ্ম্মৰ অনুষ্ঠান সাধ্বিক ত্যাগ। সন্ন্যাসীৰ এই সাধ্বিক ত্যাগ অবলম্বনীয় হলেও, ই গুণময়। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই “ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ৰৈগুণ্যো ভবান্ধন” বুলি বি ত্যাগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই ত্যাগ নিগুণাত্মক।

এই গুণাতিত সন্ন্যাসেই যুগুক্ষু সকলৰ অবলম্বনীয়। ফলত্যাগৰূপ সাংস্কৃতিক ত্যাগত নিত্য-কৰ্ম্মাদিৰ কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি বিজ্ঞমান থাকৈ; কৰ্ত্তব্য পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সন্ন্যাসাশ্ৰমৰ অধিকাৰ নহয়; গতিকে এই দুই বিৰুদ্ধ ভাবৰ সামঞ্জস্য ৰাখি কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতিৰেকে উপস্থিত কৰ্ম্ম ফলাভিসন্ধিশূন্য হৈ কৰি যোৱাই নিগুণ ত্যাগ। প্ৰথমপাত পানীতে থাকিও যেনেকৈ পানীত লীন নেঘায়, সেইদৰে কৰ্ত্তব্যবুদ্ধি শূন্য হৈ স্ব স্ব চক্ৰিয় দ্বাৰা কৰ্ম্ম কৰি গলে, কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মফলত জড়িত হব নেলাগে। এই ত্যাগৰ নাম গুণাতিত ত্যাগ। এয়ে প্ৰকৃত সন্ন্যাস। এই ত্যাগ সন্ন্যাসৰ মহিমা কীৰ্ত্তন কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে—

সৰ্বলোকেষপি ত্যাগী সন্ন্যাসী মম দুৰ্ভভঃ।

সমাজত খ্যাতি পাবৰ আশাত ফলমূল আহাৰ কৰা ৰাজস ত্যাগ, আৰু চিত্তশুদ্ধিৰ কাৰণে বিধি অনুসৰি সংযমী হোৱা সাংস্কৃতিক ত্যাগ। কিন্তু কেউবিধেই গুণময়, কাজেই সন্ন্যাসীৰ অবলম্বনীয় নহয়। সন্ন্যাসীৰ ত্যাগ নিগুণাত্মক। প্ৰলুব্ধ নোহোৱাকৈ অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ স্ব স্ব বিষয় ভোগ কৰাৰ নাম গুণাতিত ত্যাগ। নতুবা লেংটি মাৰি গছৰ তলত বহি থকাৰ নাম ত্যাগ নহয়। লেংটিত আসক্তি, গৰদত বিৰক্তি, কষলত আসক্তি, নিহালিত বিৰক্তি, পজাত আসক্তি, দালানত বিৰক্তি, শাকত আসক্তি, মিষ্টান্নত বিৰক্তি—নিগুণ ত্যাগৰ লক্ষণ নহয়। আসক্ত ও বিয়ক্ত নহৈ স্ব স্ব ইন্দ্ৰিয় দ্বাৰা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কৰাকেই গুণাতিত ত্যাগ বোলা যায়। এনে নিগুণ ত্যাগীয়েই প্ৰকৃত সন্ন্যাসী। বহুতে আপনাব সকলো ত্যাগ কৰিব পাৰে; কিন্তু নিজক কোনেও সহজে ত্যাগ কৰিব

নোৱাৰে। অতৰাং সৰ্বকোত্তম সন্ন্যাসী তেওঁকেই, যি সকলো কামনা পৰিত্যাগ কৰি, শব্দগত ও ভক্তিপৰায়ণ হৈ নিজক পৰমেশ্বৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰিব পাৰিছে। যেতিয়া তোমাৰ “তুমিত্ব” ব্ৰহ্মস্বৰূপত কিম্বা ভগবানৰ সন্তাত ডুবি যাব, যেতিয়া তোমাৰ অস্তিত্বৰ লেশমানো স্বতন্ত্ৰতা নেথাকিব, তেতিয়াই তুমি ত্যাগী;—তেতিয়াই তুমি বৈরাগী;—তেতিয়াই তুমি প্ৰকৃত সন্ন্যাসী।

এই পুৰিমিত যি আলোচিত হ’ল, তাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ’ল যে কৰ্ত্তব্যজ্ঞান শূন্য হৈ উপস্থিত কৰ্ম্ম কৰা, নিৰ্দোষী হৈ অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ কৰা ও নিজৰ নিজস্ব ভগবানত অৰ্পণ কৰাই গুণাতিত ত্যাগ। সম্যকৰূপে এই প্ৰকাৰ ত্যাগ কৰাকে প্ৰকৃত সন্ন্যাস বোলা যায়। ভগবান নিগুণ; গুণৰ অভাব নহয়—গুণৰ অতীত অৱস্থা মাত্ৰ; অৰ্থাৎ তেওঁ গুণত লিপ্ত নহৈ গুণৰ দ্বাৰা কৰ্ম্ম কৰে মাত্ৰ। সেইদৰে সন্ন্যাসীৰ ত্যাগ নিগুণাত্মক—তেওঁলোকে গুণত লিপ্ত নহৈ, গুণৰ দ্বাৰা কৰ্ম্ম কৰে, কৰ্ম্মত আসক্তি বা বিৰক্তি নাই। এনে ধৰণৰ ভাসেই প্ৰকৃত সন্ন্যাস পদবাচ্য।

সংসাৰত থাকিও যুগুক্ষু লোক সন্ন্যাসী হব পাৰে। সেই কাৰণেই জনক, অশ্বৰীষ আদি মহাত্মা সকল গৃহী হৈয়ো সন্ন্যাসী নামে পৰিচিত। নতুবা লেংটিৰ মায়া এৰিব নোৱাৰিলে সন্ন্যাসাশ্ৰমত থাকিলেও সি গৃহস্থাদম।

যি কোনো আশ্ৰমীয়েই হওক, যদি নিৰ্গিণ্ত ভাৱে সংসাৰত থাকে, তেন্তে তেওঁ সন্ন্যাসী—মুক্তিৰ অধিকাৰী। নিৰ্গিণ্ত গৃহী ও প্ৰকৃত সন্ন্যাসী এক। এওঁ লোকৰ ভিতৰত ব্যবহারিক ভাবে পাৰ্থক্য থাকিলেও পাবমাৰ্থিক

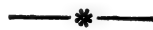
ভাবে কোনো ভেদ নাই; আমালোকে পুৰাণৰ হৰিহৰ মূৰ্ত্তিৰ দ্বাৰা ইয়াকে শিক্ষা পায়। ইয়াত হৰ অৰ্থে শশানবাসী, জটাজুটধাৰী শিব, আৰু হৰি অৰ্থে দৈকুণ্ঠ বিহাৰী বিষ্ণুক বুঝাই। হিন্দু মাত্ৰেই জানে যে হৰিহৰ অভিন্ন। কিন্তু বাহ্যতঃ উভয়ৰ আকাশ পাতাল প্ৰভেদ। এক জন সৰ্ব্বব্যাপী, শশানবাসী, বাঘচাল মাত্ৰ সম্বল, বিকণ বেশ; কাজেই হৰ ত্যাগী—বৈবাগী—সন্ন্যাসী। ইজন হ'ল মণিমুক্ত খচিত ন্যস্তগানে আমোদিত বৈকুণ্ঠ বিহাৰী;—লগত অগুণমা স্তম্ভবী—কাজেই হৰি ভোগী—বিলাসী—গৃহবাসী। স্থূলতঃ দুয়োৰে মাজত পাৰ্থক্য দেখিলেও মূলতঃ কোনো বিভিন্নতা নাই। শিব সন্ন্যাসী সচা;—কিন্তু চোৱা—তেওঁৰ কোলাত কোন্ সেই বিশ্ববিমোহিনী? এওঁ জীবজগৎকণা বিশ্বকণিণী প্ৰকৃতি। শিব সন্ন্যাসী হৈ আমিতৰ সন্ধীৰ্ণতা নাশ কৰিছে হয়, কিন্তু জগৎজীৱক বুকত সাংঘটি ধৰিছে; পৰাৰ্থে আৰ্থ পদ দলিত কৰিছে; নিজৰ বুলি-বলৈ তেওঁৰ একো নাই সচা, কিন্তু প্ৰতিভূতেই তেওঁৰ, প্ৰত্যেকৰ হিতৰ কাৰণেই তেওঁ বত। সেই কাৰণেই তেওঁ ভূতনাথ ননমে অভিহিত। তেস্তে দেখা গ'ল শিব সন্ন্যাসী হৈয়ো সংসারত লিপ্ত। আৰু আমি যে হাবিক 'গোকুল' বিলাসী ৰূপে দেখিছো, তেওঁ গোকুলত গোপগোপী লৈ প্ৰেমত মাতোৱাবা, বাধাৰ প্ৰেমত যেন লল-কলা, বাধাৰ সামান্য স্নৰহৈসাত বাধাকুণ্ডত প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ উত্তত, সকলোৰে জানে যে ত্ৰীকুঞ্চ বধোত্তম প্ৰাণ। বাধাৰ ক্ষন্তেক বিবহত যেন তেওঁ নৈবাচে। 'কিন্তু ক'তা? যেই অক্লব আৰ্হি মথুৰাৰ সম্বাদ জনালে, সেই মথুৰালৈ যাত্ৰা কৰিলে, বাধাৰ ওচৰত দেখা কৰি বিদায় লোৱাৰ অবসৰ তেওঁৰ নহল বা প্ৰাৰ্থজন নেভাবিলে। ত্ৰি-

কুঞ্চৰ মথুৰাযাত্ৰা সংবাদ পাই ৰত্নিণীবাই আৰ্হি বাটত দীঘল দি পৰি ক্ষন্তেক বৈ যাবলৈ কতনো ধৰিলে, কতনো কান্দিলে, অবশেষত বণৰ তলত পৰি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈকো উত্তত হ'ল; কিন্তু ক'তা। ৰত্নিণীৰ সেই প্ৰেমোদ্ভাদ মৰ্মভেদী কাহৰতালৈ ক্ৰক্ষেপ নকৰি ত্ৰীকুঞ্চত মথুৰা যাত্ৰা কৰিলে। ৰাম অবতাবত পতি-প্ৰাণা সীতাক বিনা অপবোধত ৰজাৰ কৰ্ত্তব্য জ্ঞানত বনলৈ দিলে। তেনেহলে দেখা গ'ল, তেওঁ জী পুত্ৰ, বিষয় বৈতৰ লৈ ভোগত ভোল থাকিলেও, জী পুত্ৰৰ আচল ধৰি নিজ কৰ্ত্তব্যত তেলা নকৰিছিল, আত্মস্বত অক্ল হৈ জীৱৰ হুংগ নেপাহৰিছিল। সন্ধীৰ্ণ আত্মস্বৰ্থত পৰি পৰাৰ্থ পদদলিত কৰা নাছিল; নিজৰ হিত কৰিবলৈ গৈ পৰৰ হিত পাহৰা নাছিল; গতিকেই তেওঁ গৃহী হলেও নিৰ্লিপ্ত। হৰ সন্ন্যাসী হৈয়ো লিপ্ত, আৰু হৰি গৃহী হৈয়ো নিৰ্লিপ্ত। লিপ্ত সন্ন্যাসী ও নিৰ্লিপ্ত গৃহী একে কথা—কাজেই হৰিহৰ এক—অভেদ। ইফালে গৃহীৰ আদৰ্শ হৰি, সন্ন্যাসীৰ আদৰ্শ হৰ। যি গৃহস্থই হৰিক আদৰ্শত জীৱন গঠন কৰিছে, তেওঁ হৰৰ আদৰ্শত গঠিত সন্ন্যাস জীৱনৰ সৈতে একে। দুয়োৰে মাজত কোনো বিভিন্নতা নাই। বৰং হৰিৰ গঠিত গৃহস্থী হৰৰ আদৰ্শত গঠিত নোহোৱা সন্ন্যাসীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। 'আৰু হৰৰ আদৰ্শত গঠিত সন্ন্যাসী সকলোগ্ৰকাৰ গৃহস্থতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, এই কথা কোৱাই বাহুল্য। সেই কাৰণেই সেই কালত সন্ন্যাসীৰ ওচৰত দোৰ্দ্দণ্ডশ্ৰুতাপ ৰজা পৰিমাণত সকলোৰে কৰজোৰ কৰিছিল। হৰিহৰ অভেদ হলেও হৰই "জগদগ্ৰক" ৰূপে পৰিচিত।

অতএব গৃহস্থই হোৱা বা সন্ন্যাসীয়েই হোৱা, 'যি আত্মস্বৰূপত থাকি নিৰ্লিপ্তভাবে

বিষয়ভোগ করি, অন্যসকলভাবে জগৎ হইত, আমিত্বের সন্ধীর্ণতা ভাঙ্গি বিখন্ড। আমিত্ব প্রসারিত করি সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টিত জগতের হিত অহুষ্ঠানত জীবন উৎসর্গ করিছ; যিনি নবক অমৃত দি নিজে গবল পাশ করিছে; যিনি পবন দিল্পিত মণিহার পিঙ্কাই নিজে ফণিহার ধারণ করিছে, তেওঁরই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আই, আমি 'সকলোরে নন্তচিত্ত হই এই মহাযোগী সন্ন্যাসীর চরণত নতজানু হই।

আমিত্বের সন্ধীর্ণতা ভাঙ্গি বিখন্ড। আমিত্ব প্রসারিত করি সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টিত জগতের হিত অহুষ্ঠানত জীবন উৎসর্গ করিছ; যিনি নবক অমৃত দি নিজে গবল পাশ করিছে; যিনি পবন দিল্পিত মণিহার পিঙ্কাই নিজে ফণিহার ধারণ করিছে, তেওঁরই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আই, আমি 'সকলোরে নন্তচিত্ত হই এই মহাযোগী সন্ন্যাসীর চরণত নতজানু হই।



## শক্তিতত্ত্ব

জগতের মূলে শক্তি। অহংকৃত্য: পরিবর্তনই জগৎ। যদি পরিবর্তন থাকে, তাহা হইলে তাহার বিপরীত অপরিবর্তনের অবস্থাও নিশ্চয়ই আছে—ইহা আমাদের বুদ্ধি বলিয়া দেয়। চঞ্চল আর অচঞ্চল—এই দুইটা ধারণা বিভক্ত না করিয়া জগতের কোনও অবস্থার বিষয় আমরা চিন্তা করিতেই পারি না। চঞ্চলতার আর এক নাম গুণ বা বিকোভ। তাহা হইলে অচঞ্চল তত্ত্ব হইল নিগুণ, নির্বিকার। এই কথাটাকেই বেদান্তের পরিভাষায় বলে, ব্রহ্ম নিগুণ, শক্তি সগুণ। শিস্ত্য তা বলিয়া দুইটা তত্ত্ব নয়—একই তত্ত্বের দুইটা দিক, যেমন একই পাতার দুইটা পিঠ। আমাদের বুদ্ধি দোটার মতো মাঝে পড়িয়াছে কি না, তাই তাম কাছে ব্রহ্ম আর শক্তি, স্বৈর্য্য আর চঞ্চলতা দুইটা আলাদা আলাদা বলিয়া মনে হয়। এটাই তো ভ্রম বা আবৃত্তা বা ভেদদর্শন। ব্রহ্ম আর শক্তিতে, সগুণে আর নিগুণে, স্বৈর্য্য

আর চঞ্চলতার মেরু বিজ্ঞাতের মত জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে—এইরূপ অহুভব করাই অদ্বৈতজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞান মানে সব এক-পা করিয়া ফেলা নয়—দুইয়ের মিলিয়া যে পূর্ণতা, ইহাই জানা অদ্বৈতজ্ঞান। মননের তত্ত্ব অদ্বৈততত্ত্ব, বিচ্ছেদের প্রতিভাস হইল দ্বৈতভ্রম। বৈষ্ণবের রাসের চিত্র অদ্বৈত বিলাসের ফটো; শাক্তের হরপার্বতী অদ্বৈততত্ত্বের ঘনবিগ্রহ।

শক্তিকে আমরা বলি না। মাকে অহুভব করিব কি আখ্যায়? আপনাদের হৃদয়ে। সন্তান সুধার মাঝে মাকে অহুভব করে; যখন বাহিরের ভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া আশ্রয় খোঁজে, তখন মাকে অহুভব করে—আপনার অন্তরের ব্যাকুলতায়। ভীত, ব্রহ্ম, বুদ্ধি সন্তান “মা মা” বলিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে—সেই ব্যাকুলতাই জমাট বাঁধিয়া করুণার ঘনবিগ্রহ হইয়া মা রূপে দেখা দেয়, স্নেহতার অকোমল বেষ্টনে সন্তানকে জড়াইয়া ধরে। মাতৃসত্তার

প্রমাণ এই অন্তরের বাকুলতায়। আগে ভিতরে মাকে চাও এবং পাও—তাহা হইলে বাহিরে পহিতে আর কতক্ষণ ?

শিশুর হৃদয়ে এই সহজ সরল মাতৃমহুভূতি-কেই দার্শনিক চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না, কার্যদ্বারা তাহার অনুমান হয়। একটা টিল ছুঁড়িলে, বিশ হাত দূরে সেটা ছিটকাইয়া পড়িল। কেন পড়িল ? তুমি বলিবে, আমার বাহুপেশিতে যে শক্তি অবরুদ্ধ ছিল, তাহাকে মুক্ত করিয়া ঢেলাটার মাঝে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছি, তাহাই ঢেলাটাকে এতদূরে বহিয়া নিয়া ফেলিল। তোমার হাতখানা দেখিতেছি, ঢেলাটাকেও দেখিতেছি, কিন্তু হাত হইতে কি বস্তু আসিয়া ঢেলাটাকে সচল করিল, তাহা তো দেখিতেছি না। অথচ সে বস্তু নাই, এমন বলিতে পারি না। ইহা তোমার বাহুর শক্তি, বাহুতে অনুপ্রাণিত হইয়া আছে, প্রয়োজন হইলে কার্যে অভিব্যক্ত হয়, নতুবা বাহুতেই লীন থাকে। আজকাল বিদ্যুতের বলে কি না হইতেছে; আলো, তাপ, গতি, ইত্যাদি কত বিচিত্র কার্যে তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আসলে বিদ্যুৎটা কি, কোথায় আছে, তাহা কেহ জানে না—বিদ্যুতের কাজগুলি যেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, বিদ্যুৎ সেরূপ হয়, নী। ‘এই হইতেছে শক্তির রহস্য। শক্তি আছে—নইলে কাজ হয়, কিসে ?’ আবার সে নাই-ও, কারণ তাহার কাজ দেখিতে পাঠ, কিন্তু তাহাকে তো দেখিতে পাই না। অতএব শক্তি সদসত্তী, বা অনির্কচন্য।

এই কথাটাই একবার জগতের মাঝে আরোপ করিয়া বোঝ দেখি। জগৎটা দেখি-

তেছি চলিতেছে; কিন্তু কে চালায় তাহাকে তো দেখিতে পাইতেছি না। অথচ কাজ দেখিয়া কর্তার অনুমান না করিয়া উপায় নাই। নৈমিত্তিক এই যুক্তিতে ঈশ্বর প্রমাণ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, জগৎ একটা কার্য, কেননা তার মূলে দেখিতেছি ক্রতি বা প্রবল; তাহা হইলে কর্তা একজন আছেন, এ কথা নিশ্চয়; তিনিই ঈশ্বর। এইরূপে কাজ দেখিয়া ঈশ্বরের অনুমান আসে, তার পর তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা—ইহাই নৈমিত্তিকের রীতি। সাংখ্যবাদীরা বলেন, ঈশ্বর মানি না; কিন্তু তাহারও কার্য মানেন, আর কার্যের মূলে স্বভাব মানেন, নতুবা কার্যপরিণামের তো কোনও ব্যাখ্যা হয় না। নৈমিত্তিকের ঈশ্বরও শক্তি, সাংখ্যবাদীর স্বভাব বা প্রকৃতিও শক্তি। ইহার সকলেই শক্তিকে বাহিরে বাহিরে দেখিয়াছেন। শক্তিকে অন্তরঙ্গভাবে দর্শন করিয়াছেন বৈদান্তিক; কি করিয়া, তাহা বলিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, কার্য দেখিয়া আমার শক্তির অনুমান করি; ইহাতে প্রমাণ হয় শক্তি আছে। নৈমিত্তিক ও সাংখ্যবাদী এইরূপে শক্তি মানিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ চিন্তার শক্তির স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যখন কার্যের স্বভাব হয়, তখন শক্তি কোথায় থাকে, এই প্রশ্ন আপনা হইতেই মনে জাগে। অনুমানবাদীরা বলিবেন, শক্তি তখন সুপ্ত অর্থাৎ নাস্তি। ইহাতে প্রকারান্তরে শক্তির অসত্তাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু শক্তির এই সুপ্তাবস্থা বা অনভিব্যক্ত অবস্থা যদি আমার নিজের মাঝে আরোপ করি, তাহা হইলে আর এক রহস্য চোখে পড়ে। একটা উদাহরণ দিয়া কুণ্ডাটা বুঝাইতেছি। মনে কর, তোমার সম্মুখে বীররসের অভিনয় হইতেছে। অভি-

নয়ের ধর্মই এই, তাহা দ্রষ্টার মাঝে রসের উদ্বেক করে। তুমি স্বয়ং চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, আঁফালন ইত্যাদি তোমার স্নায়ুপেশী ইত্যাদিতে অল্পরূপে ক্রিয়া জাগাইয়া দিবে। কিন্তু তুমি দর্শক বলিয়া নিজকে সংযত করিয়া রাখিবে, ঐ সমস্ত ক্রিয়াকে অভিযুক্ত হইতে দিবে না। এখন অভিনেতা ও দর্শক, এই উভয়ের অবস্থা তুলনা কর। দেখিতে পাইতেছি, অভিনেতা সক্রিয়, দর্শক নিষ্ক্রিয়। কিন্তু অভিনেতার মনে যে ভাব, যে প্রেরণা, দর্শকের মনেও তাহার সমস্তই পুনরাবৃত্ত হইতেছে। তাহা হইলে দেখিতেছি, উভয়ের মূলে একই শক্তি—কিন্তু অভিনেতাতে তাহা ক্রিয়াশীল, দর্শকে নিষ্ক্রিয়। অগত মজা এই, অভিনেতা শক্তির পরিচালনার তন্ময়, স্তব্ধ রসের আবাদন হইতে বঞ্চিত; কিন্তু দর্শক অভিনেতার সমস্তগুলি ভাব পাইয়াও নির্বিচার, অতএব অভিনয়ের রসিক সমজদার। এইখানে দেখি, অভিনেতার মাঝে কার্যাবশে শক্তি ক্ষুরিত, কিন্তু দর্শকে তাহা অনভিব্যক্ত রূপে সন্নিহিত। অভিনেতার মাঝে শক্তির অগুমান মাত্র, কেননা অভিনেতা তন্ময় হইয়া আছে বলিয়া তো শক্তির ক্ষুরণ অমুভব করিতে পারিতেছে না; আর দর্শকের মাঝে শক্তির স্বরূপাত্মভূতি—কেননা দর্শক যখন কার্য ও দর্শন কার্যেছেন আবার সেই কার্যের মূলগত প্রেরণাকেও অন্তরঙ্গরূপে তাহার মাঝেই আবাদন করিতেছেন। কার্যাপ্রেরণা তাহার ভিতরেও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তিনি তাহা চাপিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া প্রেরণার আনন্দ সাক্ষাৎভাবে অমুভব করিতেছেন, কার্যের হট্টগোলে তাহার স্বরূপাত্মভূতি হারা-ইয়া ফেলিতেছেন না।

এইরূপে ঐদান্তিক বোঝেন, বাহিরে, বাহ্য দেখিতেছি, তাহা শুধু কার্যমাত্র, তাহা সত্য

নহে। কার্যের মূলে যে কারণ তাহাকেই দেখিতে হইবে; কারণই কার্যরূপে অভিযুক্ত, ইহাই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। আর এই কারণকে চিনিতে হইলে কার্য হইতে পরাবৃত্ত হইয়া নিজের মাঝে তাহাকে অমুভব করিতে হইবে। ঐদান্তিকের কার্যাকারণ-কাস্ততাবাদ, ঐদান্তিকবাদ, মারবাদ সমস্তই শক্তির অন্তরঙ্গাত্মভূতির ফল।

ঐদান্তিকের দর্শনধারা ধরিয়াই আমরা বলি, মাতৃসত্তাকে তোমার অন্তরে অমুভব কর। সন্তানের কাছে মা কি?—মা তার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, মা তার পরম আশ্রয়, মা তার সমস্ত অভাব ও ব্যাকুলতার চিরশান্তি। সন্তানের স্বরূপ কি?—সন্তান ক্ষুধিত, পিপাসিত, ভীত, অভাবজড়িত, নিরস্ত্র বাকুল। এই উভয় ভাবের সন্ধি হইলেই আনন্দ, তাহাই সিন্ধি। মাকে বাহিরে পাইবার পূর্বে তোমার সন্তানদের দাবীকে পাকা কর। আগে বোঝ, এই যে সংসারে দুঃখজালায়না পাইতেছে—ইহারা মায়েবট আগমনীর ব্যাকুলভাবের স্বরূপ; এই যে মাতৃদর্শনের জন্ত তোমার প্রাণ জুড়িয়া হাটাকার বাজিয়া উঠিয়াছে—ইহাই তো মায়ের স্বরূপ, এই তো তোমার মাঝে মা। যেখানে জালা, সেখানেই শান্তি তার পেছনে; যেখানে ব্যাকুলতা, তার পেছনেই তৃপ্তি। জালা-তুমি—শান্তি মা; ব্যাকুলতা-তুমি—তৃপ্তি মা; অসহায়তা, একান্ত নির্ভর তোমার স্বরূপ—করণী, মমতা, মায়ের স্বরূপ। জগৎ জুড়িয়া এমনি করিয়া মায়ে ছেলেতে জড়াজড়ি করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে মাইবে, সেখানেই মাকে পাইবে, যদি নিজের মাঝে সন্তানকে জাগাইয়া মায়ের প্রাণে মেরের পিপাসা জাগাইয়া থাক। কার্য দেখিয়া কারণ বুঝি; সন্তানকে দেখিয়া মাকে জানি। আগে বার্থ সন্তান হও—মাকে পাইতে কোনও বাধা থাকিবে না।

## সাধনা ও আত্মানুভূতি

—{#}—

মুক্তিপথের যাত্রী যাত্রী সাধক—তা তিনি লক্ষ্য তোরণ দিয়া রাজদরবারে উপনীত হউন বা প্রাসাদপশ্চাত্তাঙ্গের দুর্গকক্ষের সঙ্কীর্ণ পথে রাজাধিরাজ সকাশে উপস্থিত হউন। বাস্পীয় বাতাসের ভায় সাধকের একটা ধরাবাঁধা পথ নাই, যে অবস্থায় আছি, তাহাই সাধনার অবস্থা—পারিপার্শ্বিক যেকোনই হউক না কেন, সে শুধু তাঁহার ইচ্ছা। যেকোন প্রঃখযন্ত্রণার আয়োগিগ্নি ক্ষময়ে জলুক না কেন—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতি মুহূর্তে শত বৃত্তিক দংশনের জ্বালা প্রাণে প্রাণে অমৃত হউক না কেন, জানি তাহা তাঁহার ইচ্ছা। বৃথিতৈছি, আশ্রিত-জন্ম তাঁহার ইচ্ছার ক্রীড়াশীল কন্দকের মত সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে একদিন বাতায়ন বিগলিত হইয়া মুক্ত হইয়া পড়িবে। তাই মনে চর, বর্তমান অবস্থাই আমার সাধনার অবস্থা। বধ্যশক্তি অনাসক্তভাবে কর্তব্য করিয়া নিজ লক্ষ্যে স্রোতদৃষ্টি রাখিয়া দিনেব পর দিন অতিবাহন করিতে হইবে—শুধু সেই দিনের অপেক্ষায়, যে শুভমুহূর্তে শ্রীগুরুর কৃপায় অতীত পূর্ণ হইবে, যেদিন একান্ত শান্তি উপস্থিত হইবে। শান্তি! যদি 'জিজ্ঞাসা কর, শান্তি অর্থে কি বুঝিবে?' তবে বলিব, শান্তি অর্থে আত্মানুভূতি। 'আত্মানুভূতিতে জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত বিশ্রান্তিষ্ট শান্তি।' কিন্তু এই আত্মা কি, অমৃতুতি কি, অমৃতুতি আনিবার সাধনাই বা কি—তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে।

আত্মানুভূতির জন্মই জগতে যত কিছু

সাধন ভজন। কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠানে সাময়িক ভাবে মনের সমতা হইলেও অমৃতুতি আসিতে পারে না। অমৃতুতি অন্তরের জিনিষ—উহা বহিঃসম্বন্ধশূন্য। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দৃশ্যমান জগৎ সংসার হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত জড়বস্তুর আসক্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজকে এক ঘনাক্ষরায় রাজ্যে লইয়া আসিতে হইবে; সেই অন্ধকায়ে সম্পূর্ণ নিরালম্ব অবস্থার অবলম্বনস্বরূপ নিত্য আলোর সন্ধান কমিতে হইবে। চক্ষু নিমীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধহীন হইলে তখনই মাত্র ক্ষণেকের তরে মনে হইবে যে, আমি স্ব-তন্ত্র, আমি চৈতন্ত্যমাত্র; আমার বন্ধন নাই, ঐদৃপদার্থ কখনও আমার বন্ধন হইতে পারে না—উহা মায়ায় খেলা মাত্র।

অনেকে হয়ত এরূপ মনে করিতে পারেন যে গুরুই কৃপা করিয়া অমৃতুতি জাগাইয়া দিবেন, অতএব সাধনভজনের প্রয়োজন নাই। আবার অনেকে আছেন, যীহার তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন, যিনি কৃপা করিয়া সাধনভজনের শক্তি দিবেন, যোর ক্রুদ্ধ সাধনার ক্রোধ সহিব্যার দৈর্ঘ্য দিবেন, সত্যানুসন্ধানের অদম্য ও অপ্রতিহত ইচ্ছা অন্তরে জাগাইয়া দিবেন। আমি কিছু করিব না, গুরুই সব করিয়া দিবেন—এরূপ সত্যলোভে আনন্দ কোথায়? যদি তির্যাক্তিতের পায়ের ধ্বনি শনিবার জন্ত সারা জীবন কুরঙ্গের ছায় উৎকর্ণ হইয়া না রহিলাম, তবে তাঁহার প্রাপ্তিতে ভূপ্তি

কোথায়? তাই বলি, হেঁঠাকুর, যদি দয়া করিয়া ধরা দিয়াছ, তবে যে বস্তু সত্যরূপ, প্রেমস্বরূপ, তাহাকে বুঝিতে যেন একটা উৎসাহিতের স্থায় প্রলয়কালীন বোর ঝঞ্ঝা-বাতের ভিতর দিয়া নিজেই জ্বলিতে জ্বলিতে সাধনগগনের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে গিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারি। তাই ডাকি, হে ভগবান, চঃখ দাও, সাধনভজনের যতপ্রকার কুচ্ছতা আছে সবই দাও, সঙ্গে সঙ্গে তাহা বহিবার ও সহিবার শক্তি দাও—তবেই না তোমাকে পাউলে আনন্দ হইবে।

এ পথ বন্ধ; যিনিই এ পথে গমনেচ্ছ, তিনিই মনে মনে দৃঢ়ভাবে জানিয়া রাখুন—সাধকের সহায় কেহ নাই। গুরু পূর্ব জন্মের সাধনার সঙ্গে এ জন্মের সাধনা যোগনা করিয়া দিবেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির সহজ পথটা বলিয়া দিবেন। সাধনা কিন্তু নিজেকেই করিতে হইবে। তবে যদি কখনও চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে হতাশ হও, তবে, তোমার ব্যাকুলতার ব্যথিত ও রূপাপর্যবশ হইয়া গুরু তাহা সহজ করিয়া দিতে পারেন। মনে রাখিবে, গুরু ও ভগবান স্বরূপতঃ এক। আর এ কথাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে, যিনি ফলদাতা, তিনি অনধিকারীকে তাহার কর্ম ব্যতীত ফল দিতে পারেন। তবে এটুকু হইতে পারে যে তোমাদ্বারা কর্ম করা-ইয়া লইয়া তারপরে তিন ফল দিতে পারেন। আত্মদর্শনের পর জীবের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না। তাহার ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন আর অথবা রূপার ইচ্ছা হয় না—হইতে পারে না। তাই বলি, সাধনভগতে তুমিই তোমার বন্ধু। এ কথা শ্রীভগবান অর্জুনকেও বলিয়াছিলেন—

উদ্ধেরদাস্তানাস্তানং নাস্তানমবসাদয়েৎ।

আত্মেব হ্যাগ্নেনো বন্ধুর্গাত্মেব রিপুর্নাস্তনঃ ॥

আত্মা চিন্মাত্রঃ। আর জীব চিদাত্মাস। চিদাত্মাস বা জীবাত্মা আত্মাকে অনুভব করেন সাধনা দ্বারা। চিত্ত নিত্য, শাস্ত্র, ক্ষয়বৃদ্ধি-হীন, নিরাকার, নিরূপেয়, নির্লিপ্ত, স্থব্ধঃস্থের অতীত, সাক্ষিমাাত্র এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। আর জীব বা চিদাত্মাস বিনশ্বর, স্থব্ধ হঃস্থ ও মোহে অভিভূত। এই চিদাত্মাসের আবার পাঁচটা শরীর আছে। এই শরীর পাঁচটা পরমাণুস্বরূপ হইয়া সমস্ত শরীরেই ওতপ্রোত। পরমাণু স্বল্প অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর আরও স্বল্প অবস্থাই উৎকৃষ্ট কোশের স্বরূপ। সাধনাদ্বারা এক এক করিয়া চারিটা অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিলেই পঞ্চম অবস্থায় চিদাত্মাসের আত্ম-হুত্ব হইয়া থাকে। আর এই পঞ্চম অবস্থায় যদি জীব শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হয়, তখনই সে শ্রীভগবানের সহিত মিশিয়া যায়। সূত্রাচার আমরা বাহ্যকে আত্মা বলি, তাহা কখনই আত্মা নহে। উক্ত চিদাত্মাসের চতুর্থ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। চৈতন্য প্রথমে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন। সেই বিম্বের আভা আবার পরবর্তী শরীরে অসংস্কৃত-পরমাণুপুঞ্জ বা বিজ্ঞানময় কোশকে আভাসিত করিয়া সতেজ করে। এটরূপে এক একটা কোশ পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কোশকে সতেজ করে। এখন দেখিতে হইবে যে আমরা বাহ্যকে আত্মা বলিয়া অনুভব করি, তাহা প্রকৃত আত্মা কি না?

অধ্যাত্মজগতে সাধনার তিনটা অবস্থা আছে যথা—প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। সাধনার ভগবানকে জানিতে ইচ্ছা হইয়া মতাপ্রকৃষের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তদুপনিষ্ট সাধনাদিতে অনুগত হইয়া সাধনার ক্রম আত্মে সহ করেন, তাহারাই প্রবর্তক



শ্রেণীর। এই প্রবর্তকের প্রথম যে আশ্রয় অমুভূতি হয়, তাহা তৎ আত্মা নহে—উহা প্রাণময়কোশ আভাসিতকালী চিদ্রাস। প্রবর্তক এই চিদ্রাসের লাড়া প্রাণে প্রাণে অমুভব করিয়া শ্রীভগবানকে জানিবার জন্ত বাগ্ন হন। বহু সন্ধানের পর প্রবর্তক যখন শ্রীভগবানকে জানিতে পারেন, তখনই তিনি সাধক। সাধকের অবস্থার পরেই সিদ্ধির অবস্থা। সিদ্ধির অবস্থায় ভগবানের সাক্ষ্য লাভ হয়। মানবমাত্রেরই ভিতর কোন না কোন প্রকার সাধনার ইচ্ছা প্রমুখ আছে। মানব সব সময় ভোগে রত থাকিতে পারে না। ইহার কারণ, মানবের ভিতর শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি, তটস্থ শক্তি ও মায়ী শক্তি—এই ত্রিবিধ শক্তিই কার্য্য করিয়া থাকে। স্বরূপ শক্তিই চিহ্নশক্তি; তটস্থ শক্তিকে কেহ জীব-শক্তি বলেন, কেহ বা কুণ্ডলিনী বলেন। এই জীবশক্তি বা তটস্থ শক্তির ভিত্তরই স্বরূপশক্তি ও মায়ীশক্তি উভয় শক্তিই বিস্তৃত। তজ্জন্ত জীব দোলকের মত একবার এদিকে, একবার ওদিকে দোলায়িত হইতেছে। মায়ীর আবরণী শক্তিতে জীব মোহগ্রস্ত হইলেও স্বরূপ শক্তির সচিৎ জীবশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর মিলন স্বাভাবিক। বাহার জীবশক্তি প্রবুদ্ধ হইবার সময় হইয়াছে, সেই প্রবর্তক।

এই চিহ্নশক্তির অমুসন্ধান কৃতকার্য হইলে আত্মমুভূতি হইবে। কিন্তু কি উপায়ে তাহার অমুসন্ধান করিতে হইবে? তাহার অমুসন্ধান করিতে হইলে একই স্থানে, মিয়মিতকালে, পরিমিত সময় কোন স্থির পদার্থ লক্ষ্য রাখিয়া, পরে নেত্র মুদিত করিয়া সম্পূর্ণ নিরালস্য অবস্থায় নিজকে ছাড়িয়া দিবে। সেই অন্ধকারে তুমি নিজকে অমুসন্ধান করিতে থাকিবে।

যেমন অন্ধকারের ভিতর থাকিলেই বৈজ্ঞাতিক আলোর জন্ত প্রাণটা যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, নেত্র নিমীলনে, তজ্জপ সর্বত্রই অন্ধকার দেখিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠে—চাই আলো, চাই সেট জ্যোতি, যে জ্যোতিস স্বরূপ আমি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান সহ মন্ত্রের মানস জপ কর। যদি তোমার মন্ত্র ও মূর্ত্তি কিছু না থাকে, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সময় হইলেই গুরু আপনাই হাজির হইবেন। স্বয়ং ভগবান তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন্ত্র ও মূর্ত্তি ঠিক করিয়া দিয়াছেন, বন্ধনের সঙ্গেই তোমার বন্ধনমোচনের উপায়ও করিয়া রাখিয়াছেন—কিন্তু ভ্রমশ্রম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ীর প্রভাবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তোমার প্রতি স্থানে যে মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, সেই প্রাণব শ্রবণের অধিকার তোমার সহজাত। এই স্বতোথিত ধ্বনি তোমারই মনোলয়ের জন্ত। স্বাসের তালে তালে হৃদয় হইতে সে ধ্বনি উথিত হইতেছে—সেই ধ্বনিতে মনন করিবে। দেখিবে ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত মায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইয়া গিয়া মূল শরীরের অন্তিমবোধ পর্য্যন্ত লয় হইয়া যাইবে এবং তুমি জ্যোতি অমুভব কারতে থাকিবে। এখান হইতেই তোমার সাধনার আরম্ভ, কারণ শরীর জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত যত সাধনা সমস্তই বিফল। শরীর জ্ঞান লোপের সঙ্গে সঙ্গে আত্মমুভূতির প্রথম সোপানে প্রথম পাদক্ষেপ হইল জানিতে হইবে।

তার পর সাধনার দ্বিতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় স্বাসের বহির্গমন বন্ধ হইয়া মনস্তির হয় এবং সময়ের পরিমাপবোধ লোপ হয়। স্বাসের বহির্গমন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রাণায়াম আরম্ভ হয়। আত্মজ্যোতি বা চৈত-

জেন লাভা তখন আরও উজ্জল ও স্নিগ্ধ বোধ হয় এ। সত্ত্বমূর্ত্তির সুস্পষ্ট দর্শন লাভ হয়। কিছু দিন পর সাধক মনোময়শালায় অবস্থান করেন এবং বাহিরের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন হৃদয়াভ্যন্তরীণ জ্যোতি-শ্মশলাস্বৰ্ণবর্তী হৃদয়গামীন ইষ্টদেবতার বাক্য শ্রবণ হয় এবং সাধক তাঁহার সহিত নান। হস্তপরিহাস করেন। সাধক তখন ভুলিয়া যান যে তিনি নিজেই ইষ্টদেব হইয়া নিজেই সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

এ অবস্থায় যে সমস্ত ক্ষমতা লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রাদি দশ নিকপালের ক্ষমতার সমান। কিন্তু এই সমস্ত অবস্থা পরমহংসভূগ অনেক নিম্ন অবস্থা। একমাত্র পরমহংস অবস্থাতেই আত্মদর্শন বা আত্মাহুতি হইয়া থাকে। যে সমস্ত সাধক এই সমস্ত ক্ষমতালাভে তুষ্ট হন, তাঁহারা আর অধ্যাত্ম-রাজ্যের তৃতীয় স্তরে গমন করিতে পারেন না। চৈতন্য মনোপাধিক থাকায় সাধক রূপ লট-রাই বাস্তব থাকেন। কিন্তু স্বল্প শ্রোত্রাদি সহিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা গঠিত বিজ্ঞানময় অবস্থার গমন অবস্থার সময় হইলে রূপের ক্রয় হইতে থাকে। এই বিজ্ঞানময় অবস্থাটি জ্ঞানের নিম্নভূমি; এখানে পৌছিতে পারিলে ঈশ্বর লাভ হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সৃষ্টি

হিত্তি প্রায় করিবার ক্ষমতা জীবের আয়ত্ত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নিজেকে, তাহা অবগত নন। শ্রীতগবান তাঁহাদের ভিতর যেরূপ প্রেরণা দেন, তাঁহারা তদনুযায়ী কর্ম করেন। যে সমস্ত মানবাত্মা একপ অবস্থা লাভ করেন, সময়ে তাঁহারাও আত্মজ্ঞানে অধিকারী হন।

ইহার পরের অবস্থা আনন্দময় কোশ। আনন্দময় কোশ যে কি তাহা আমাদের বুদ্ধি-গম্য নহে। আচার্য্য বলিয়াছেন—“কোন অন্তর্মুখী বুদ্ধিবৃত্তি ভোগকালে চিদানন্দ প্রতী-বিশ্বাবশিষ্ট এবং ভোগগরিসমাপ্তিতে প্রকৃতিতে লীন হয়, তাহাকেই আনন্দময় কোশ বলে।” এই আনন্দময় শরীর আত্মার স্বরূপ নহে। এই আনন্দময় শরীরে জীব বধন উন্নীত হয়, তখন মাত্র তাহার গোপীভাবলাভ হয় এবং তখন মাত্র তাহার আত্মাহুতি হইয়া থাকে—তৎপূর্বে নহে। এই অবস্থা লাভ হইলেই তখন তাহাকে সাধক বলে।

সাধকের বৈতাবস্থা হইতে শ্রীতগবানের একান্ত করুণাময় অবৈতভাবের অবস্থা হইলেই সাধক সিদ্ধ হন বা তখন পরমহংসপদ লাভ করেন। ইহাই অত্মভূতির স্বরূপ অবস্থা।

## ‘মনঃশৈখর্য’

—\*—

ইঙ্গিরাণং হি চক্ৰতাং যদনোহমুবিধীয়তে ।

তদন্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥

এই হচ্ছে রোগের ত্তিমান, এই ধরে চিকিৎসা করতে হবে। অগতঃ প্রাণময়—স্পন্দমান; কাজেই বিষয় আসছে যাচ্ছে, ইঙ্গিয়ও ছুটাছুটি করছে। এই যেন শক্তির চাকলা—রক্তস্রবের ক্রিয়া। চিত্ত সঙ্গাংশ বা জ্ঞানাংশ হতে উৎপন্ন। কাজেই তার মাঝে সাক্ষিত্ব কতকটা আছে, আবার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিও আছে। ইঙ্গিয় এসে বিষয়ে যুক্ত হল—স্বভাবের বশে। মন তখন তার পিছু লাগল। মন যদি সব হতে বিচ্যুত হয়, তাহলে অমনি রক্তের আবর্তে পড়ে অতি-মাত্রায় চকল হয়ে উঠবে, নানা কিকিরফন্দী বের করতে থাকবে, তন্ত্রিয়ের উপর হকুম চালাবে—এমনি করে সে বিষয়ের নৈকট্য খুঁজবে। আর তাতেই প্রজ্ঞা হত হয়ে, মাহুষ অমাহুষ হবে।

কাজেই মাহুষের অধঃপতনের জন্ম দায়ী তো ইঙ্গিয় নয়, দায়ী হচ্ছে মন। মন যদি সন্ত হতে বিচ্যুত হয়, তবেই সর্বনাশ, তাহলে বিষয়ের রাজস ও তামস বিকার তুধু তার ভোগে আসবে। আর মন যদি সবে প্রাতি-ষ্ঠিত থেকে বিষয় গ্রহণ করত, তাহলে বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান হত, আনন্দলাভ হত, ইঙ্গিয় তখন ক্রিয়াশীল হলেও ক্ষতি ছিল না, আত্মা তাতে গুণাবৃত হতেন না। এই হচ্ছে বেদা-জ্ঞান ভোগ—শুদ্ধস্বের ভোগ। এই অব-স্থাতেই ‘রমণীয়ং সঙ্গং থাকে, না করে রমণ’—

অথচ রমণস্থখের কোটিগুণ আনন্দ মিলে।

বিষয় গ্রহণ করবার সময়, চিত্তকে চকল হতে দেবে না—তা দ্বি-লই ধূমের সৃষ্টি হবে। আর ধূম বেশী হলে দীপনির্বাণ অবশ্যজ্ঞাবী। দীপশিখা যখন স্থির থাকে, চারদিকে কাচের বেটনী থাকে, তখনও প্রাকৃত নিয়মে ধূম উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির উন্নততর নিয়মে সেই ধূম দগ্ধ হয়ে দীপশিখাকে আরও উজ্জ্বল করে। সাধারণের ভোগে আর শুদ্ধ-স্বের ভোগে এই তফাৎ।

মনকে নিগৃহীত করাই তা হলে সকল সাধনার সার; তা হয় অভ্যাস দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা। অভ্যাস Numerical strength; বৈরাগ্য Logical strength। যুক্ততর্ক দ্বারা বিচার দ্বারা চিত্ত-প্রশান্ত করতে হবে, এ তো আছেই; তা ছাড়া একেবারে সংখ্য ধরে বিষয় ভোগের মাত্রা কমাতে হবে, ভ্যাগের মাত্রা বাড়াতে হবে। এ দুটো কাজ সমানে চললে তবে মনোনিগ্রহ হবে।

সংস্কার মরে না কেন? স্মৃতির অভাবে, অনিচ্ছাসের দরুণ। সংস্কারবশতঃ ভোগ করে কষ্টও পেয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর তা মনে নাই। তাই আবার ভোগের পানে ছুটলাম। একবার ভোগ করে ইঙ্গিয় অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন প্রকৃতি বিশ্রাম দিল; আবার কিছুক্ষণ পরে নুতন করে শক্তিসঞ্চয় করে ইঙ্গিয়কে যখন সজীবিত করে তুলল, তখন আবার ভোগের স্পৃহা ও সামর্থ্য জেগে উঠল। এমনি করে প্রকৃতি চিরযৌবনের

ডালি পুরুষের সামনে ধরে দিচ্ছে। এই ভোগের কি শেষ আছে? তাই শান্ত্রী বলে, সংসার অনাদি, অনন্ত।

শেষ থাকার কোনও প্রয়োজনও তো নাই। তবে স্বাধীন হয়ে ভোগ করা চাই, পরামীন থেকে নয়। তাই ভোগের আয়োজনের মাঝে স্থির থাকা। এমনি করে প্রাকৃত ভোগকে অচঞ্চল হয়ে গ্রহণ করতে পারলে তবে অপ্রাকৃত আনন্দের উদয় হবে। এ কথা

মানুষ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না—তাঁরা ভোগকে কিছুতকিমাকার মনে করে আত্মকে ওঠে। বিষয় ভোগ তো নয়, মূলে চক্ষে বাসনাভাগ। ভোগ মানে উন্নততর উপারে ভোগ, যে ভোগে বিরতি নাই, বিরক্তি নাই। ভোগের আয়োজন আছে, ভোক্তা আছে—এ দুটির পরিবর্তন সম্ভব নয়; পরিবর্তন ঘটতে হবে করণের। করণশুদ্ধি হলোই সফলতা মিলবে। স্থির হতে বলছি এই জন্তই।



## ছাত্র রামতীর্থ



বেশভূষা সম্বন্ধে তীর্থরাম কিরূপ নিঃস্পৃহ ছিলেন, তাহা লাগা বনস্পতিজীর নিম্নলিখিত উক্তি চাইতে বোঝা যাইবে—

“গ্রীষ্ম ও বর্ষার তীর্থরাম মোটা খন্ডর পরি-  
ভেন। মাথা প্রায়ই খালি থাকিত। দেশী  
পাঞ্জাবী ঢঙ্গে চুগ ছাটিভেন। বাহিরে যাতে  
হইলে একটা শাদা মকমলের পাগড়ী মাথায়  
বাঁধিয়া লইতেন। আমায় যতদূর স্মরণ হয়,  
তাঁহার মাথায় কখনও টুপী দেখি নাই।  
শীতকালে কেবল মাত্র একটা কাঁশ্মরী পটুর  
কোট শীত নিবারণ করিতেন। বিলাতী  
ডজেব পোষাক পরা তাঁহার আদর্শেই পছন্দ  
ছিল না। একদিন দেখি, তিনি যেন কি  
একটা সঙ্কেটে পরিয়াছেন, ভাবনার যেন আর  
কূল কিনারা পাইতেছেন না। জিজ্ঞাস করিয়া  
জানিলাম, হুই এক দিনের মধ্যেই ইউনিভার্সি-  
টির কনভোকশন্ হইবে। সার্টিফিকেট

আনিবার জন্ত তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত  
হইতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে  
এই সময় বিলাতী কোট ও বুট পরিতে হইবে,  
কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া কিছুতেই  
এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারিতেছেন না।  
কিছুক্ষণ তর্কের পর এই সাব্যস্ত হইল যে, ও  
হুটী জিনিষ কলেজেই কাহারও নিকট চাইতে  
কিছুক্ষণের জন্ত চাহিয়া লইয়া কাজ চালানো  
হইবে। অবশেষে এই রফা অনুসারেই কাজ  
করা হইল।”

তাঁহার সাদাসিধা চালচলন ও সরলতা  
সম্বন্ধে তাঁহার এক অধ্যাপক বলিয়াছেন—

“তীর্থরামের সে সময়কার চালচলন  
নিভান্তই সাদাসিধা ছিল। তাঁর ঘরে আসাব  
গজের মধ্যে শুধু একটা খাটয়া ও তাহার  
উপর নেহাৎ সাধারণ একটা তক্তপোষ ও এক

খানা চাদর বিছান থাকিত। কিন্তু তীর্থরাম প্রায়ই মাটির উপর শুইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। আর পুঁতি পুস্তকগুলি খাটায়ার উপর তুলিয়া রাখিতেন। বাজার হইতে তাঁহাকে খাবার কিনিয়া আনিতে হইত। দরিদ্রতার দরুণ পর্যাপ্তপরিমাণে হুধ পাঠিতে পারিতেন না—একটু ঘি সংগ্রহ করা তো দূরের কথা। কাপড়চোপড় নিতান্ত সাদা-সিধা ও মোটা বকমের হইত; কিন্তু তাহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।”

তাঁহার ছাত্রাবস্থার আহার সম্বন্ধে আর একজন লেখক লিখিয়াছেন—

“কেবলমাত্র হুধই গোঁসাইজীর আহার ছিল, এ কথা বলিলে অত্যাুক্তি হইবে না। অনেক সময় দিবাতাগেই তিনি ভোজনব্যাপার সমাধা করিয়া রাখিতেন। ছুখানি নিত্য পাতলা কুটা ছাড়া তাঁহাকে কখনও আর কিছু খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।” দিনের পর দিন তিনি কেবলমাত্র একটু হুধ খাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, এমনও দেখিয়াছি। যদি কখনও কোনও ভাল খাবার খাওয়ার ভ্রম নিতান্ত ক্ষেদ্র ধরিতাম, তাহা হইলে শুধু আমার মনঃস্ফূর্তি জন্ম করিকামাত্র ভাঙ্গিয়া মুখে দিতেন। তাঁহাকে কখনও ভ্রম বাস্তবতার কারণে দেখি নাই। তবে ছই একবার সন্ধ্যায় সন্নিহিত হইলে কোনও হিম্মত কারখানা হইতে এক আধ বোতল সোড়া কিনিয়া খাইতে দেখিয়াছি। মাংসভক্ষণকে তো তিনি প্রকাশ্যেই পাপ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, এমন কি কেহ এই পোষ্য উত্থাপন করিলেও তাঁহার ক্ষণা বোধ হইত। তিনি বলিতেন, যদি কখনও বাজার করিবার সময় কোথা

হইতে মাংসের গন্ধটুকু নাকে ঢুকিত তো দহক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মাথা ঘুরিতে থাকিত। এইরূপ মাদক পদার্থকেও তিনি হলাহল বলিয়া বর্ণনা করিতেন।”

ব্যায়াম ও যুক্তাহার বিষয়ে তিনি নিজেই একবার ধর্মারামজীকে লিখিয়াছিলেন, “মহা-রাজজী, আজকাল আপনার শরীর কেমন? আপনি যতটুকু পারেন, ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিবেন এবং মাঝে মাঝে ছই একদিন উপবাস করিবেন। আশি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছাতেই আপনি আরাম হইয়া যাইবেন। আমার তো মনে হয়, অল্পবয়সের সময় পানাহারের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ঔষধপত্রের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়াতেই আপনি কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন।”

নীতিমত ব্যায়াম করা তীর্থরামের নিত্য-কর্ম ছিল। অদ্যক্ষ ইর্ভিজ সর্বপ্রথম তাঁহাকে ব্যায়াম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইর্ভিজ বলিয়াছেন, “আমেরিকা হইতে আমি যখন প্রথম এই কুলেজে প্রি-অপাল হইয়া আসি, তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর এক অতি সুশীল, শাস্ত, বিনয়ী পিতৃব্যি আমায় চোখে পড়ে। নানারকমে সে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। ছেলেটাকে আমার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে তাহাকে সর্বদা প্রশংসার দৃষ্টিতে না দেখিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না। তাহার শরীর চর্কল দেখিয়া একদিন নিষ্ঠুরে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ‘তুমি যদি একটু অধিক ব্যায়াম কর তো ভাল হয়, কারণ স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে তোমার লেখাপড়া ঠিক ঠিক চলিবে না।’ আমার কথাটা তাহার মনে লাগিল। ইহার পর যেমন তাঁহার শরীরের উন্নতি হইতে লাগিল,

ভেদনি তাহার মত কুশাগ্রবৃদ্ধি হাজ একটীও কলোজ মহিক না। পণ্ডিতে তাহার বিশেষ অঙ্গুমাগ ছিল এবং এই বিষয়ে প্রথম হইতেই সে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল।”

তিনি যে ব্যায়াম করিতেন, তাহা একটু নতুনতর। তাঁহার এক বন্ধু বলিতেছেন—

“এম এ পড়িবার সময় তীর্থরামকে এক-প্রকার ব্যায়াম করিতে দেখিয়াছি, বাহা আর কাহাকেও কোনও দিন করিতে দেখি নাই। ঘরের ঘেঘের উপর একটা খাটিয়া পাতিয়া তাহার ছইটী পায়া ধরিয়া তিনি বতদূর পারেন সোজা সেটাকে উচু করিয়া তুলিতেন এবং ধীরে ধীরে আবার তাহাকে সোজা নামাইয়া রাখিতেন। মুখ বন্ধ রাখিয়া তিনি ঘন ঘন এই কসরত করিতেন।” এই অদ্ভুত কসরত একবার প্রিন্সিপাল বেল সাহেবকে দেখাইয়া তাঁহাকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চিঠি হইতেই আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই ব্যাপার হইতে তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নিয়োকৃত পত্রাংশ হইতে তাঁহার ছাত্র-জীবনের প্রেরক ও ধারকশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে—

“তোমার বর্ণার্থ বন্ধুগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সর্বদা চেষ্টা করিও। ইহা ছাড়া অন্য কোনও সম্পূর্ণ বিষয়ের লেশমাত্র চিন্তাও ছদ্মবে হান দিও না। সংসদ, সঙ্গ্রহ ও নির্জনবাস দ্বারা স্বরূপে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়। আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা থাকিলে সমস্ত সংসার তোমার দাস হইবে।

“সংসদ, সঙ্গ্রহ ও তজনকীর্তন—এই তিনটী বস্তু তোমাকে ত্রিলোকের রাজা করিয়া দিতে পারে। কুসঙ্গসেবাধারা কেবল রাজ্য ধ্বংসের কোপ নিজের উপর টানিয়া আনিয়া হয় এবং তাহার দক্ষণ অশেষ দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়। নির্জনবাস ও অন্নাহার করিলে স্বয়ং পরমাত্মা আসিয়া তোমার সঙ্গ করিবেন।

“যিনি ভক্ত, তিনি ঘন ও উপকরণহীন হইয়াও বাদশাহের দৌলত ভোগ করিয়া থাকেন। বস্ত্রমাত্রের সাহায্য না লইয়া ভক্তি মানুষকে উত্তর লোকের রাজা করিয়া দেয়।

“কবীরজীর এই দোহাটীতে কি প্রকার অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে—

মন এসো নির্দল ভয়ে লৈসে গঙ্গাবীর;  
পিছে পিছে হরঁ কিরে কহত কবীর কবীর।”

(ক্রমশঃ)

## যম ও নিয়ম

[ প্রবক্তা—ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব ]

যোগের আটটি অঙ্কের মধ্যে প্রথম হইল যম ও নিয়ম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম। ইহাদের মধ্যে যে কোনও সময়ে যে কোনও উপায়ে যে কোনও প্রাণীর প্রতি জোহ না করা হইল অহিংসা। পরে যে আরও নয়টি যম নিয়মের কথা বলিব, অহিংসাই তাহাদের ভিত্তি। অহিংসার সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই তাহাদের অমুষ্ঠান প্রয়োজন। অহিংসার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য শৃঙ্গে অত্রাণ্ড যম নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণ যত রকম ব্রতই অমুষ্ঠান করুন না কেন, সমস্ত দ্বারা অহিংসার স্বরূপটাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন মাত্র। প্রমদিবশতঃ তিনি বাহ্য কিছু অত্রাণ্ড আচরণ করেন, তাহার মূলে থাকে হিংসা। তাহার ব্রত-চরণের অত্রতম উদ্দেশ্য, এই হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া।” অর্থাৎ একমাত্র অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের সমস্ত সাধন ইহাই হইয় জানিতে হইবে।

বাক্য ও মনের বার্থ্য্য ভাবই সত্য। অর্থাৎ বাহ্য যেমন দেখিয়াছি, কিবা যেমন অনুমান করিয়াছি সেইরূপ বলা বা চিন্তা করাই সত্যপ্রতিষ্ঠা। নিজের ঐশ্বর্য্যভূতি অপ-রের মাঝে সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে যে বাক্য প্রয়োগ করা হইল, তাহাতে যদি প্রব-

ক্তনা না থাকে, ভ্রম না থাকে, কিবা শ্রোতার কাছে তাহা অর্থশূন্য না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সত্য বাক্য বলিব। কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইবে, বাহাতে সকল প্রাণীর হিত হয় এই উদ্দেশ্যে; কাচারও অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বণাভূত বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা সত্যপদবাচ্য হইবে না। যদি সত্য কথা বলার ফলে দেখা গেল, তাহাতে প্রাণীর অহিতই হইতেছে, তাহা হইলে তাহাকে সত্য বলিব না, তাহাকে বলিব পাপ। ভোমার কাছে একরূপ সত্য কথা পুণ্য বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা পুণ্যের আভাস মাত্র—কাহার ফলে ভোমার কেবলমাত্র বিঘাণ্ড ও অন্ধকারই লাভ হইবে। এই জন্য সব দিক দেখিয়া স্তনিয়া বাহাতে সর্বভূতের হিত হয়, একরূপ সত্য কথাই বলিবে।

অধর্ম্ম করিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করাই স্তেয়া অস্তেয় তাহার বিপরীত; কোনও কিছুতে স্পৃহা বা ঝাকাই বার্থ্য্য সস্তেয়।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া উপস্থের সংযম করাই ব্রহ্মচর্য্য। তাৎপর্য্য এই, উপস্থ সংযম করিয়াও যদি কেহ কুভাবে জী অঙ্গ দর্শন, স্পর্শন কিবা তাহাদের সহিত আলাপাদি করে, তবে তাহার আচরণকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হইবে না।

বিষয় অর্জন করিতে গেলে কষ্ট, রক্ষা করিতেও কষ্ট, নষ্ট হইয়া 'গেলেও কষ্ট; আবার বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইলে সংস্কার-বশতঃ কষ্ট পাইতে হইবে; তাহা ছাড়া বিষয় অর্জনে হিংসা অবশ্যস্বাভাবী এবং তাহার দরুণ কষ্টভোগ আছে। এইরূপের বিষয়ের দোষ দেখিয়া বিষয়সংগ্রহে বিমুখতাট অপরিস্রব্ধ। অহিংসা হইতে অপরিস্রব্ধ পর্য্যন্ত এই পাঁচটি যম।

জাতি, দেশ, কাল বা আচারের কোনও-রূপ গভী না রাখিয়া সার্বভৌমভাবে এই সমস্ত যম অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মহাব্রত সাধিত হইয়া থাকে।

অহিংসার জাতির গভী কিরূপ? যেমন জেলে কেবল মাত্র মাছেরই হিংসা করে, অন্ত্র সে অহিংসাকরণ করে। ইহাকে পূর্ণ অহিংসা বলা যাইতে পারে না—এখানে জাতির গভী স্থলপ্ৰাপ্ত। দেশের গভী যেমন—তীর্থে প্রাণিবধ করিব না। কামের গভী যেমন—চতুর্দশীতে প্রাণিবধ করিব না, কিম্বা আজ পূর্ণা দিন, আজ হিংসা করিব না। এই তিন প্রকার গভী না থাকিলেও অহিংসার আচারের গভী থাকিতে পারে—যেমন, (দেশাচারানুযায়ী) দেবতা বা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যেই প্রাণিবধ করিব, অন্ত্র উদ্দেশ্যে নয়। কিম্বা ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে হিংসা করিতে পারে, কিন্তু অন্ত্র করিতে পারে না। এই প্রকার জাতি, স্থান, কাল বা আচারের গভী না রাখিয়া অহিংসা প্রভৃতি যমগুলি সকল অবস্থাতেই পালন করা উচিত। চিত্তের যে কোনও ভূমিতে, যে কোনও বিষয়ে, যে কোনও প্রকারে এই পাঁচটি যম সাধনায় যদি কোথাও ব্যভিচার না হয়, তাহা হইলে সেই সার্বভৌম যমানুষ্ঠানকে মহাব্রত বলা যায়।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্বী, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রাণিধ্যান—এই পাঁচটি নিয়ম। তদ্ব্যতীত মৃত্তিকা জল ইত্যাদি জনিত ও পবিত্র আহারাদি জনিত শৌচকে বাহ্যশৌচ বলা যায়। অভ্যাস, অহংকার, ইত্যাদি চিন্তনল সমূহের কালন আভ্যন্তরশৌচ। যে উপকরণ আমার নিকটে রহিয়াছে, তাহা ছাড়া অন্ত্র কিছু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা না থাকাই হইল অন্ত্রশৌচ। বৃন্দসংস্কৃতিই তপস্বী। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম, স্থিরাবস্থান ও জ্ঞান, কাষ্ঠমোদন ও আকারমোদন—এইগুলি বৃন্দ। (যেথেকে কিছু না বলিয়া ইচ্ছিতে মনোভাব প্রকাশ করা আকারমোদন, আর ইচ্ছিতেও কিছু প্রকাশ না করা কাষ্ঠমোদন।) কৃচ্ছচান্দ্রারণ, সান্ত-পন ইত্যাদি ব্রতকেও তপস্বী বলে। মোক্ষ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা গুরুজনকে স্নানাদি দ্বারা পূজা করাকে ঈশ্বরপ্রাণিধ্যান বলে। শস্যের কিম্বা আসনে থাকুন, অথবা পথেই চলিতে থাকুন, যিনি সর্বদা আত্মস্থ, স্বাধ্যায় সংস্করণ ও বিপর্যায়রূপ বিতর্কজাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারবীজকে সর্বদা ক্ষয় হইতে দেখিতেছেন, তিনিই ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত এবং অমৃত ভোগের অধিকারী—ঈশ্বর প্রাণিধানের ইহাই লক্ষণ। স্ত্রীকারও বলিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রাণিধানে প্রত্যেক চৈতন্য অধিগত হয় এবং যোগের অন্তরায় দুই হইয়া যায়। এই সমস্ত যম ও নিয়মের বিরুদ্ধ ভাবকে বিতর্ক বলে।

চিত্ত বিতর্কদ্বারা আক্রান্ত হইলে বিপরীত ভাবনাদ্বারা তাহাকে দূরকরিবে। ব্রাহ্মণের চিত্তে যদি হিংসা প্রভৃতি বিতর্ক উপস্থিত হয় অর্থাৎ তিনি যদি চিন্তা করেন, “যে আমার অপকার করিয়াছে, তাহার অসিষ্ট করিব, মিথ্যা কথা



বলিব, ইহার জিনিষটা আমি লইব, কিবা অমুকের জীর সহিত ব্যভিচার করিব, অমুকের বিহারের আমিই কর্তা হইব,” তাহা হইলো কুণ্ডিতে হইকে গাঁহার চিত্ত উন্মার্গগামী হইতেছে, অসন্তোষের মত বিতর্কের তাগে তিনি তপ্ত। তাঁহার তখন প্রতিপক্ষ ভাবনা অর্থাৎ বিতর্কের বিপরীত চিন্তাশ্রোত প্রবর্তিত করা উচিত। তখন তিনি চিন্তা করিবেন, “এই সংসারবন্ধিতে জলিয়া পুড়িয়া অরণ্যে আমি যোগধর্মের শরণ লইয়াছি এবং সেই দিন অবধি আমি হইতে কাহারও কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবে না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। এইরূপে একবার বিতর্ক ত্যাগ করিয়া আবার তাহাকে গ্রহণ করার আমি বাস্তবোজী কুকুরের ভায় আচরণ করিতেছি। কুকুর যেমন বসি করিয়া আবার তাহাই ভোজন করে, তেমনি পরিত্যক্ত বিষয় আবার গ্রহণ করিয়া আমিও কুকুর তুল্য ব্যবহার করিতেছি।”

হিংসা-প্রভৃতি বিতর্কসমূহ স্বয়ংক্রিয়, অপরের দ্বারা কারিত অথবা অহুমোদিত হইতে পারে; ক্রোধ, লোভ বা মোহ তাহাদিগের নিদান হইতে পারে; তাহাদিগের বেগ মুহ, মধ্যম কিবা তীব্র হইতে পারে; বেরূপই হউক না কেন, তাহার অন্ত হৃৎ ও অন্ত অজ্ঞানের কারণ।—এইরূপ চিন্তাধারাকে চিত্তে দৃঢ় করাই প্রতিপক্ষ ভাবনা।

যেমন ধর, হিংসা একটা বিতর্ক। স্বয়ং হিংসা করিলে উহা কৃত; নিজ হাতে কলমে না করিয়া অপরকে দিগ্ন করাইলে উহা কারিত; কেহ হিংসা করিলে যদি তাহার সমর্থন করি, তবে তাহাতে আমারও অহুমোদিত হিংসা করা হয়। গোত, ক্রোধ

ও মোহকে নিদান করিলে ইহাদের এক একটিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা বাইতে পারে। যেমন মাংসের বা চর্মের লোভে হিংসা করিলে; কিবা অমুকে আমার অপকার করিয়াছে, এই বিবেচ্যবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া হিংসা করিলে; কিবা এইরূপ করিলে আমার ধর্ম হইবে, এই প্রকার ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া হিংসা করিলে। আবার লোভ ক্রোধ ও মোহের মুহ, মধ্যম ও তীব্র বেগ অনুযায়ী তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে। তাহা হইলে মোটের উপর হিংসার সাতাইশটা ভেদ হয়। আবার মুহ, মধ্য ও তীব্রেরও মুহ মুহ, মধ্য-মুহ, তীব্র মুহ—এইরূপে প্রত্যেকের তিনটা করিয়া ভেদ হইতে পারে। তাহাতে মুহ-মধ্য, মধ্য-মধ্য, তীব্র মধ্য; আবার মুহ তীব্র, মধ্য-তীব্র, তীব্র-তীব্র—এই কয়েকটা ভেদ পাওয়া যায়। সর্বসমষ্টিতে তাহা হইলে হিংসার একাশীটা ভেদ হয়। ইহার পরও সূক্ষ্মবিচার দ্বারা হিংসার আরও অসংখ্যভেদ করনা করা বাইতে পারে। মিথ্যা, ত্রের ইত্যাদির বৈল্যেও এইরূপ জানিবে।

“অনন্ত হৃৎ ও অনন্ত অজ্ঞান এই বিতর্ক সমূহের ফল”—এইরূপ ভাবনাই প্রতিপক্ষ ভাবনা। হিংসা সূক্ষ্মেই বিচার করিয়া দেখ, হিংসক প্রথমতঃ বধ্য প্রাণীর বীৰ্য অর্থাৎ শরীরপ্রচেষ্টা নষ্ট করিয়া দেয়; তার পর অস্ত্রাঘাতে তাহাকে ব্যথা দেয়; তার পর তাহাকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করে। ইহার ফলও হিংসকে ফলিয়া থাকে। বধ্যের বীৰ্য বিনষ্ট করার দ্বারা হিংসকের চেতন ও অচেতন সর্বপ্রকার উপকরণই ক্ষণবীৰ্য্য হয়। (জীপুত্র চেতন উপকরণ; শরীর ঘন ইত্যাদি অচেতন উপকরণ।) বধ্যপ্রাণীকে হৃৎ

দেয় বলিয়া নরক, তির্যক বা প্রেতবোধিতে  
হিংসককে দ্রুত পাইতে হয়। আর বখোর  
প্রাণ হরণ করে বলিয়া প্রাণসংশয়কর অবস্থায়  
বর্তমান থাকিয়া অতিক্রম মরণের পথ চাহিয়াও  
কোনও রকমে তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়,  
কেননা কঠোর ফল থেকেই পরিণত হইয়া  
অমৃতবগোচর হইবে, তাহার একটা নির্দিষ্ট

ধারা আছে। হিংসার ফলে যে দ্রুত অবস্থা-  
ভাবী, তাহার ভোগ সমাপ্ত না হইলে ভোগ  
প্রাণ বাহির হইবে না। যদি হিংসার সহিত  
পুণ্যের কোনও যোগ থাকে, তাহা হইলে  
কিছু স্থবভোগ হয় নটে কিন্তু হিংসককে  
তথাপি অন্নায়ু হইতে হয়। অতএব বিতর্কের  
এইরূপ ফল, ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া  
চিত্তকে প্রশান্ত করা সকলেরই কর্তব্য।

## অপ্রমাদ



“অনিচ্ছা বস্ত সংখার—অঙ্গমাদেন বিহরণা  
তিক্রমণ—হে ভিক্ষুগণ, সংসারসমূহ অনিত্য,  
তোমরা অগ্রমত্ত হয়ে বিচরণ কর”—এই ছিল  
বুদ্ধদেবের শেষ উপদেশ। এর পরেই বুদ্ধ-  
জ্যোতিঃ মহাপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।  
কাজেই বলতে পারি, বুদ্ধদেবের জীবন  
জ্ঞানপ্রচারণার সাধে নিরর্থক এই অপ্রমাদের  
উপদেশটী। এটা বিশ্লেষণ করে বুঝবার  
প্রয়োজন সকলেরই আছে।

যেতালে কখনো পান না পড়ে, সাধক-  
জীবনের এই হল একান্ত লক্ষ্য। এর জন্য  
নিষ্ঠা প্রয়োজন। অতঃপর জাগ্রতে নিষ্ঠার  
সফলতা লাভ করা সহজ হয় না। কত সং-  
সার আমাদের মাঝে প্রসূত রয়েছে। যখন  
যেমন নিমিত্ত উপস্থিত হচ্ছে, তখন তাকেই  
আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য তারা  
সর্বদা যেন ঠেলাঠেলি করছে। ততঃ  
এই সংসারের হইগোল সর্বদা চলছে বলেই  
কোনও কিছুতে আমরা একমুণী নিষ্ঠা নিয়ে

থাকতে পারছি না। সংসারের এই ঠেলা-  
ঠেলি স্বাভাবিক—একেই বলি প্রকৃতির গুণের  
ক্রিয়া। একমাত্র তত্ত্ব জানলে গুণের এই  
বিক্ষেপকে রোধ করা যায়, নতুবা চঞ্চলতা  
দূর করবার আর কোনও উপায় নাই।  
সংসারসমূহে তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, ওরা অনিত্য,  
অথচ প্রতি মুহূর্তে আমার কাছে নিত্য-  
সত্যের মুখোপ পরে হাজির হচ্ছে। যখনই যে  
সংসার আমার মাঝে চাড় দিয়ে উঠে, তখনই  
তাকে প্রশস্ততা স্বীকার করে তার হৃদয়ে  
চলতে থাকি, কিছু পরমুহূর্তেই তাকে পর্যাটন  
করে আর একটা নূতন সংসারের উদয়  
হচ্ছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, এটাই বাক  
নিষ্ঠা। এমনি করে আমাদের প্রজা মলিন  
হয়ে সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছি।

যদি ভ্রমটাকে কিছু প্রাকৃত সংসারের  
সমষ্টিরূপে ধরি, তাহলেও দেখি, এখানেও  
আমাদের প্রতিনিরত অনিত্যে নিত্যভ্রম  
হচ্ছে। এই ভ্রমই প্রমাদ। এর দূরপাই

আমাদের বুদ্ধি স্থির থাকছে না। সংস্কারকে তাই অনিত্য বলে ভেদে তার প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে নির্ঝাঁপের দিকে অবিলম্বে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে—বুদ্ধবানীর এই হল তাৎপর্য।

“পমাদো মচ্চনোপহৃম্—প্রমাদ মৃত্যুর পথ”—এ কথাও তিনি বারবার বলেছেন। জীবনে মৃত্যুর পথেই আমরা পুনঃ পুনঃ পাই দিছি। কিন্তু বুদ্ধাভ্যাসন তখন দ্রবণ থাকে না কেন? জীবনটাকে কতনকমেই নিঃশেষ করে দেওয়া যায়। কেউ পশুর মত, কেউ মানুষের মত, কেউ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে, কেউ বা জ্ঞানচর্চার জীবন পাত করছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এরা কেউ এমন একটা কিছু ধরে নাই, যা নাকি সার্বভৌম বলা যেতে পারে। সমস্তই এক একটা পথ মাত্র; এটা ভাল, ওটা মন্দ, এমন ভাবা মনের জুল। যার যেমন ক্রটি, যেমন আশা, যেমন সঙ্গতি, সে তেমনই পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিহীনানে সব পথই তো তুল্যমূল্য। তাই যদি হয়, তাহলে নিষ্ঠাসহকারে একটা পথ আঁকড়ে থাকবার একটা সার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়; তাহলেই আর পরম্পরের প্রতি জিহ্বা বা বিরোধের ভাব থাকে না। এই নিষ্ঠাটুকুই হল প্রেরণোত্তের উপায়। “গীতা-কার ভাই বলেছিলেন, সবাই স্বধর্ম পালন কর, পরধর্ম আশ্রয় করলে সব বাবে। বরং স্বধর্মে মরণ ভাল; তবু পরধর্ম আশ্রয় করো না—ওতে ভয়ের কারণ আছে। গীতাকার আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—স্বধর্মের মোহাই দিই প্রাণ্ডুলভ্য ফলের দিকে যে তোমাকে প্রলুব্ধ করছি, তাও মনে 'করো না। স্বধর্ম হলেই যে সেটা ভাল ধর্ম হবে, এমন কথা তো নয়। হরত আদর্শের দিক থেকে বিচার করতে গেলে পরধর্ম অমর ও স্বধর্মিত হতে পারে, তোমার স্বধর্ম বিগুণ হতে পারে, তবুও স্বধর্ম ছেড়ে না।

এর মাঝে দুটি কথা আছে। প্রথমতঃ স্বধর্ম নিরূপিত হয় সংস্কার অনুযায়ী। বহু সংস্কারের স্বল্পের মাঝে যেটা প্রবল হবে, যেটা তোমার মজ্জাগত হবে, তারই ক্রিয়া হতে দিতে হবে। মিঠা ও অপ্রমাদের প্রচোজর এই থাকেই। সব সংস্কার একেবারে তুমি উড়িয়ে দিতে পার না; দিতে গেলে ফল কখনও ভাল হবে না। তাই অনিত্য সংস্কার সমূহের মাঝেও স্বভাবানুকূল সংস্কারটাকেই পাকা করতে হবে। আর এক কথা এই—স্বধর্ম পালনে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ‘সবারই আছে—এই কথার উপর নির্ভর করেই গীতাকার স্বধর্মোচরণে কর্মক্ষয়ের পথ বলে দিলেন। যেটা যার স্বভাব, তার অনুসরণে সে আরাম পায়। তাই স্বধর্মের পথে চলা আমাদের পথ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা বলে এর মাঝে যে শাসন নাই, এমন নয়। মোহের ছলনার, সংস্কারের স্বল্প এমন সুখাবহ স্বধর্মও মানুষ ভুলে যায়। তখন নিষ্ঠার অক্লুণ তাড়নে তাকে পথে ফিরিয়ে আনতে হয়। এইটাই হল বুদ্ধকথিত অগ্রমাদ।

যা করবে, তা মোহের সঙ্গে করবে। এক পথ ধরে চলবে, বান্চাল হবে না। সাময়িক বিরক্তির দরুণ মনে হতে পারে, দুর্ভোগ ছাই, আমি যে পথ ধরেছি, তার চাইতে অমুকের পথটাই তো আমাদের। কিন্তু তখন মনে করতে হয়, পথের মূল্য সর্বত্রই সমান—পথটাই লক্ষ্য নয়। যে পথ ধরেছ, তারই চরমে যাবার চেষ্টা কর। অগ্রমত্ত হও। একটা শেষ করে আর একটা ধর, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আল এটা, কাল ওটা এমনি করে তবুয়ে হয়ে বেড়ালে কোনও দিন আর পথের অন্ত মিলবে না। অনিত্য সংস্কারকে উচ্ছেদ করতে হবে, কিন্তু তার পথই হচ্ছে স্বভাবে স্বধর্মে অগ্রমত্ত থেকে কর্মবার্য কর্মকর করা।

# মুক্তাবাই

—:~:—

মুক্তাবাই দাক্ষিণাত্যের ধর্মগুরু আচার্য্য জ্ঞানেশ্বরর কনিষ্ঠা ভগিনী। আচার্য্য জ্ঞানেশ্বরের জীবনকাহিনী ইতিপূর্বে “আর্য্যদর্পণ” পত্রিকা-স্তম্ভে আংকোচিত হইয়াছে। “জ্ঞানেশ্বর” নামক তাঁহার রচিত গীতাভাষ্য মহারাষ্ট্রভাষার রত্নস্বরূপ। হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরের পিতার নাম নিট্টলপন্থ, মাতার নাম কল্পিণী দেবী। নিট্টলপন্থের তিন পুত্র, এক কন্যা। ষোষ্ঠপুত্র নিবৃত্তিনাথ, দ্বিতীয় জ্ঞানেশ্বর, তৃতীয় সোপানদেব। সর্বকনিষ্ঠ কন্যার নাম মুক্তাবাই।

অদৃষ্টের বিপর্য্যে চারিটা ভাইবোনের জীবন সমাজ হইতে নিচুত হইয়া এক প্রকার নিঃসঙ্গভাবেই কাটিয়াছিল। মুক্তাবাইর পিতা বাল্যকাল হইতেই সংসারে বীতশ্রু হইলেন। পিতামাতার উপরোধে বিবাহ করিবার পরও সংসারে তাঁহার মন বসে নাই। একাদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কালীতে আসিয়া স্বামী রামানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন। বিট্টলপন্থ বিবাহ কবেন নাই, সংসারেও তাঁহার কেহ নাই—এই বিশ্বাসে রামানন্দ তাঁহাকে সন্ন্যাস দিয়া স্বীয় মঠের কর্তৃত্বভার তাঁহার উপর স্তম্ভ কাবলেন। কিছু দিন পরে রামানন্দ স্বামী শিষ্যদর্শনের সহিত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিট্টলপন্থের খন্তাবালয় আলকীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে ঘটনাক্রমে কল্পা-

বাটর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কল্পা-বাট যে বিট্টলপন্থের পনিতাক্তা স্ত্রী কৈহা জানিয়া রামানন্দ স্বামী নিতান্ত দুঃখ চইয়া পুনবার কালী কিরিয়া আসেন, এবং আত্মগোপন করার অপরাধে বিট্টলপন্থকে মঠের কর্তৃত্বভার ছাড়াইয়া পুনরায় সংসারাপ্রমে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন।

গুরুর আদেশে বিট্টলপন্থ আবার আলকীতে ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্তা পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার উভয় সঙ্গীত উপস্থিত হইল। সন্ন্যাস ছাড়িয়া পুনরায় সংসারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সমাজচ্যুত হইলেন, অথচ গুরুর আদেশে তাঁহার সংসার ফেলিয়া যাওয়ারও উপায় রহিল না। এইরূপ অবতাসঙ্কটের মাঝে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ও নিতান্ত চঃখদারিত্যাপন্ন অবস্থায় ক্রমে তাঁহার তিনটা পুত্র ও একটা কন্যা ভগ্নগ্রস্ত করেন।

যেরে অন্ন নাই, পিতা পূর্বাপর সংসারে নিঃশ্রু ও আপনভাবে বিভোর; সমাজ পরি-ত্যক্তের সম্মান বলিয়া পাড়াপ্রতিবেশী মহায়-সঙ্কলও কেহ নাই, এমন কি স্পর্শদায়েব ভয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা প্রগাঢ় ইহাদেব সহিত খেলাধুলা করিতে আসে না—এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরম রেহে পরম্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া চারিটা ভাইবোন মাহুষ হইতে লাগিল। ইহারা ‘কিরূপ’ সংসারে লালিত পালিত হইতেছিল, তাঁরা মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি ও নিরঞ্জনমহাশয়ের নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই বোঝা বাইবে। মহীপতি লিখিয়াছেন, “ব্রাহ্ম-

শেরা ও লক্ষ বাক্সবেরা বিট্টলপন্থকে পরিত্যাগ করিল। তিনি অরণ্যের মাঝে একটা পর্ণ-কুটার বাঁধিয়া, জীকে লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। পরিবার পোষণের জন্ত তিনি ভিক্ষা মাগিয়া আনিতেন এবং দিনরাত উইচিভার কাটাইয়া দিতেন। সর্বদা গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থের শ্রবণ মনন করিতেন এবং সর্বক্ষণ আপনায় চিন্তকে প্রসন্ন রাখিতেন। নিরঞ্জনমাতন্ব লিখিয়াছেন, “বিট্টলপন্থ চৈতন্য-প্রম ছাড়িয়া গৃহস্থপ্রম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। চারিদিকে নিন্দা রটিল গেল, কেহ তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিত না। যে ভিক্ষা মিলিত, ধীরে ধীরে তাহাও বন্ধ হইয়া আসিল। কখনও কখনও দিনে একবার মাত্র অন্ন কুটিত। কখনও গাছের পাতা খাইয়া, কখনও বা বায়ুভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইতে হইত। এইরূপে বার বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু তথাপি বিট্টলপন্থ আপন লক্ষ্যে অটল রহিলেন।”

এইরূপ পারিণামিকের মধ্যে শিশুর চরিত্র যেরূপে ধৈর্য্য, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া কুটিয়া উঠিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ধৈর্য্য ও কল্যাণের প্রভিযুক্তি মাত্র ছাড়া মুক্তার বাল্যকালের সজনি কেহ ছিল না। মুক্তা কখনও সংসারে প্রবেশ করিবে এরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পিতা কোনও দিনই পোষণ করিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগবৈরাগ্য ও জ্ঞানচর্চাকে আদর্শ করিয়া বিট্টলপন্থ যেরূপ পুত্রসন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, বস্তার বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম করিতেন না। পিতার শিক্ষার এতদূর ভ্রাতাদের আদর্শে ব্রহ্মচারিণী মুক্তাও বিদ্বানী ব্রহ্মবাদিনী হইয়া উঠিলেন।

এদিকে জননীর নৈপুণ্যে গৃহ-কার্য্যও তাঁহার অবিশেষ দক্ষতা জন্মিল।

পুত্রদিগের উপনয়নের সময় উপস্থিত হইলে বিট্টলপন্থ একবার সমাজপতিদিগের নিকট তাহার দক্ষণ অল্পমতি প্রার্থনা করিলেন। সমাজপতিরা সে কথাই কান তো দিলেনই না, অধিকন্তু বিট্টলপন্থের পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রাণবিসর্জনের পাত্তি দিয়া দিলেন। পুত্রদের কল্যাণকামনার বিট্টলপন্থ এবং কৃষ্ণিনীন্দেবী মাথা পাতিয়া এই বিধি মানিয়া লটলেন। একদিন নিশীথে কিশোর-বয়স্ক পুত্রকল্পাদিগকে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়া এই দম্পতী গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রয়াগের পুণ্যতীর্থে প্রাণ বিসর্জন করিয়া সমাজের শাসন হটতে অব্যাহতি পাইলেন।

পিতামাতার গৃহত্যাগের পর চারিটা ভাই-বোনের সংসারে মুক্তাই গৃহিণী হইয়া কল্যাণী জননীর স্থান অধিকার করিলেন। সমাজ যেমন বাঁকিয়া ছিল, তেমনি বাঁকিয়াই রহিল, কিন্তু ইহারা তাহাতে ক্রক্ষেপ করিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃনিবৃত্তিনাথ অপর সকলের গুরু ছিলেন। ভ্রাতাদের সেবা করিয়া এবং অবসর সময়ে তাঁহাদের সঠিত অধ্যাত্মচর্চা করিয়া ব্রহ্মচারিণী মুক্তার আনন্দে দিন কাটিয়া যাঁতে লাগিল, নাদীস্থলত সংসারচিন্তা ক্ষণেক কালের জন্তও তাঁহার চিন্তে স্থান পাইল না।

মুক্তাবাই অসাধারণ বিদ্বানী ছিলেন। ভ্রাতা জ্ঞানেশ্বরের ঞ্চর তাঁহারও অসামান্য কবিত্বভিত্তি ছিল। জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রভাষায় মুক্তাবাই বহু অনুল্লভ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাইয়েরা যখন ধর্ম্ম-প্রচারার্থে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন,

মুক্তাবাইও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া প্রচায়ে সহায়তা করিতেন। জ্ঞানেশ্বর ও নিবৃত্তি-নাথের জীবন কথা ও প্রচার কাহিনীর অধিকাংশ উপকরণ আমরা মুক্তাবাইর রচনা হইতেই জানিতে পারি। মুক্তাবাইর জ্ঞান-বৈরাগ্য সমুজ্জ্বল অভঙ্গ রচনা ছাড়া তাঁহার জীবনের আর কোনও বিশেষ কথা জানিতে পারা যায় না। নিম্নে তাঁহার জীবনের দুইটা ঘটনা মাত্র আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানিতে পারি নাই। কাহিনী দুইটির মাঝে প্রথমটা জ্ঞানেশ্বরের ‘অলৌকিক শক্তি’ পরিচয় মাত্র, স্তব্ধতা তাহাকে আমরা তত মূল্যবান মনে করি না। দ্বিতীয় কাহিনীটাই সুন্দর এবং মুক্তার নির্মল অবদানের পরিচায়ক।

প্রথম কাহিনীটি এই। একদিন নিবৃত্তি-নাথের ‘মাঁড়’ (একপ্রকার পাণ্ডুব্য) পাইবার ইচ্ছা হয়। এই খাড়াটা প্রস্তুত করিতে হইলে সন্টার উপর আগুনে সোঁকিয়া নিতে হয়। ঘরে সরা ছিল না; মুক্তাবাই কুমারবাড়ীতে ‘সরা’ আনিতে চলিলে। পথে বিঘোনা নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত দেখা। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, “এই ছুঁড়ী, কোথায় যাচ্ছিস্?” মুক্তাবাই তাঁহার প্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। হিংস্রক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগকে বলিল, “খনরদার, এই মেয়েটাকে তোরা কিছুই দিবি না। যদি দিস্, তো মজা দেখতে পাবি।” মুক্তাবাই যেখানে যান, ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সকলকে বারণ করিয়া দেয়। ফলে মুক্তা কোণায়ও সরা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। দাদাকে খাইতে দিতে পারিলেন না ভাবিয়া তাঁহার মনে ভারী কষ্ট হইল। কুটারে

ফিরিয়া আসিয়া দুঃখে কোঁড়ে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, “তার জন্ত কি? বাসনপত্রের কোনও প্রয়োজন নাই। তুই আমার পিঠের উপর মাঁড় সোঁকিয়া নে।” এই বলিয়া তিনি ধোঁগবলে অগ্নি আবাহন করিয়া পৃষ্ঠদেশকে কাঁচাচাগার মত তপ্ত করিয়া তুলিলেন। মুক্তাবাই জ্ঞানেশ্বরের পিঠে মাঁড় সোঁকিয়া দাদাকে খাইতে দিলেন। বিঘোনা ব্রাহ্মণ আড়াল হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া নিজের কুব্যবহারের দরুণ ইহাদের কাছে ক্ষমা চাহিল।

কালক্রমে নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বহু ভক্ত জুটিয়া গেল। একদিন মুক্তাবাই ‘সহজ স্থিতি’ অর্থাৎ নগ্ন হইয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ চান্দদেব নামে এক ভক্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চান্দদেব মুক্তাকে তদবস্থায় দেখিয়া অশ্রুতপ্ত ও গম্ভীত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শুনিতে গাইলেন, মুক্তা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে-তেছেন—“এটা দেখছি গুরুদ্রোহী!” চান্দদেব কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং মুক্তার স্নান শেষ হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার এমন কি অপরাধ তুমি দেখিলে যে তখন আমাকে গুরুদ্রোহী বলিলে?” মুক্তাবাই তীক্ষ্ণ ও অচঞ্চল মৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সম্মুখ বিন্দু করিয়া বলিলেন, “রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি কেহ একটা মাটির দেয়াল দেখিতে পায়, তাঁহা হইলে তাহার চিন্তে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় কি? গুরুরূপার তুমিও তাঁহার কাছে উপদেশ পাইয়াছ যে, নারীসেহকে মাটির দেয়াল বলিয়া মনে করিও। গুরু যদি তোমার হৃদয়ে থাকিতেন, তবে তোমার

চিন্তে বিকার জন্মিত না! একটা পাই যেমন বনে বসনহীন কটকট বিচরণ করে, লোকালয়ে আসিয়াও ভেয়ানি নগ্নদশাতেই বিচরণ করে। আমাকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখা উচিত ছিল না কি? কিন্তু গুরুপদে পাইয়াও যখন তোমার চিন্তে বিপরীত ভাবনার উদয় হইতেছে, তখন তোমাকে গুরুদ্রোহী বলিব না ত কি?”

মুক্তার এই ত্বেজস্বী উক্তি শুনিয়া চান্দদেব কণকালের জন্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি যোগসাধনা করিতেন, জ্ঞানচর্চা করিতেন, পৌরুষের অভিমান তাঁহার মাঝে যথেষ্টই ছিল। কিন্তু মুক্তার কথা শুনিয়া তিনি বুকিতে পারিলেন, মুক্তা জ্ঞানের কোন্ উচ্চভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, আর তিনি কত নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছেন। মুক্তা তখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকামাত্র, আর তিনি প্রোঢ়ের নীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি এই তেজস্বিনী ব্রহ্মবিহ্বীর নিকট তাঁহার নিজকে শিশুর মত অসহায় মনে হইতে লাগিল। তিনি নতজাহ্নু হইয়া বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “মা, তোমাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তুমি মহাশক্তিস্বরূপিণী, তোমায় সামান্য দৃষ্টিতে দেখিয়া আমি তোমার অপমানই করিয়াছি। সন্তান বলিয়া যদি করুণা করিলে, তবে আর আমাকে ছাড়িয়া যাইও না মা!” মুক্তা সুগভীর স্নেহে চান্দদেবের মস্তকে চতুর্দর্শ করিয়া কহিলেন, “মা কি সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, চান্দদেব? কিন্তু তবুও তুমি দাদার

কূছে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি আমাদের সকলেই গুরু।” চান্দদেব তখনই নিবৃত্তিনাথের কাছে গিয়া সকল কথা নিবেদন করিয়া মুক্তাবাইর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অমুমতি চাহিলেন। নিবৃত্তিনাথের অমুমতি অমুসারে মুক্তা চান্দদেবকে মহাবাক্য শুনাইয়া অধৈততত্ত্বের উপদেশ দ্বারা জ্ঞানের প্রান্তভূমিতে আকৃত করিয়া দিলেন। যে বটবৃক্ষের মূলে মুক্তা চান্দদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আজও “বিশ্রাস্তি বট” নামে প্রসিদ্ধ আছে। মুক্তাবাইর উপদেশে উদ্বুদ্ধ চান্দদেব উত্তরকালে দাক্ষিণাত্যের এক জন শক্তিশালী আচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১২০১ শকাব্দে মুক্তাবাইর জন্ম হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মোটে ষোল বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই এই ব্রহ্মবাদিনী কুমারী নারীজগতে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা মিলে না। মহারাষ্ট্রবাসীরা ‘আজও মুক্তাকে ভুলিতে পারে নাই। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, মুক্তা এখনও মহারামাধি লাভ করে নাই, তাঁহার কল্যাণদৃষ্টি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এখনও ভারতসম্প্রদায়ের উপর অমৃত বর্ষণ করিতেছে। পঞ্চরত্নের তাঁহার পিতালয় ছিল, কেহ কেহ মনে করেন, তিনি এখনও সেখানেই আছেন। থানেশ্বরের এদলাবাদ গ্রামে কেহ কেহ তাঁহার সমাধি নির্দেশ করিয়া থাকেন।



## ভক্তি ও নিরোধ

—\*—

জীবের প্রাণে নিত্য হাহাকার, তার চারিদিকেই অভাবের তাড়না। অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ যদিও তাহার হৃদয়েই লুকাইয়া রহিয়াছে, তথাপি সে তাহার সন্ধান জানে না, অন্তরের ধন সে বাহিরেই খুঁজিয়া বেড়ায়। নিজের চেষ্টায় তাহার সকল অভাব মিটে না বলিয়াই তাহাকে অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, অপরের কাছে হাত পাতিতে হয়। প্রাকৃত জগতে এই প্রকার কামনামূলক পরবশতা জীবের একেবারে মজ্জাগত। লৌকিকভাবে আমরা কতজনার নিকট কত কিছুই না কামনা করিয়া থাকি; যদি স্বজাতিয়ের নিকট কামনা পূরণ না হয়, তাহা হইলে সংস্কারানুযায়ী বিজাতীয় ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাহার দরবারে কামনার আরজী পেশ করিতে কল্প করি না। চাহিতে গেলেই মাথা নীচু করিতে হয়, দাতার তুষ্টিসাধনের প্রতি নজর যায়। এই দৈন্ত ও প্রসাদন স্বার্থধারা প্রণোদিত হইলেও অনেক সময় বিকৃতবুদ্ধির নিকট ভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ভক্তির সহিত যে স্বার্থসম্বন্ধ নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে কামনামূলক দৈন্ত ও প্রসাদন ভক্তির বাহ্য লক্ষণাক্রান্ত হইলেও প্রকৃত ভক্তি হইতে দূরে।

ভক্তি, ভাব ও প্রেম মূলতঃ একই বস্তু—গাঢ়তার তারতম্যানুযায়ী সাধনশাস্ত্রে ইহাদের ভেদ কল্পনা করা হয়। ঋষিপ্রণীত ভক্তিশাস্ত্রে তিনটিকেই ভক্তি শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে; বর্তমান প্রবন্ধেও আমরা ভক্তি-শব্দটী সেই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিব।

কামনা যদি অ-ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ভক্তি ও ভাব যদি একপর্যায়ের বস্তু হয়, তাহা হইলে, প্রথমতঃই এতা দেখিতে পাই, কামনা ও ভক্তি আলোক ও আধারের মত বিরুদ্ধপদার্থ। কামনার মূল কথা অভাব, অপূর্ণতা। ভাবের তাৎপর্য স্ব-ভাব, পূর্ণতা। যদি অভাব থাকে, তাহা হইলে যাহার অভাব নাই, তাহার কাছে অভাবপূরণের আশায় আমরা হাত পাতি। ভক্তিভেদে দেখি, যে পরমবস্তুকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতাতেই তাহার সার্থকতা। তাহা হইলে উভয়ের মাঝে ভেদ হয় কোথায়? ভেদ এই ক্ষেত্রে যে, অপূর্ণের পূর্ণের প্রতি স্বভাবসম্মত প্রবণতাই কামনা; আর পূর্ণের পূর্ণবস্তুর প্রতি স্বভাবসম্মত প্রবণতাই ভক্তি। কামনার জীবস্বভাবের অপূর্ণতাই কেবল-ফুটিয়া উঠে; আর ভক্তিতে ফোটে জীবস্বভাবের পূর্ণতা। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রবণতা, দৈন্ত, প্রসাদন ইত্যাদি লক্ষণ উভয়ত্র একরূপ হইলেও মূলে উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

জীবে ও শিবে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, তাহা মানি। তথাপি জীবের পূর্ণতা জ্ঞান পরমবস্তুর পূর্ণতাতে একটু ভেদের আভাস কল্পনা করিতে হয়, নতুবা আনন্দের আবাদ হইতে পারে না। ভক্তি সম্বন্ধত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নামরস না থাকিলে সম্বন্ধ মধুর হয় না। এই জন্ত স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করিয়াও জীবে ও শিবে ভেদের আভাস রাখিয়া দিতে হয়—



আনন্দনের জ্ঞাত। জীব ভক্তিতে পূর্ণতালাভ করে অপূর্ণজীরের ভক্তি কামনার ছদ্ম আনন্দ মাত্র। যুগপৎ দুইটা পূর্ণ সত্তা স্বীকার করিতেছি, ইহা একটা রহস্য বটে। প্রতিও এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—পূর্ণমদঃ, পূর্ণমদম্। এইখানে যে আছে সে-ও পূর্ণ, আর ওখানেও যে আছে, সে-ও পূর্ণ। পূর্ণস্বরূপের প্রতি পূর্ণের অভিসারই ভক্তি বা ভাব বা প্রেম।

জীবের পূর্ণতা কেমন?—যেমন ফলের পূর্ণতা। কপি ফুল হইয়া ফুটিল—দেখিতে বড় সুন্দর; কিন্তু ওই বর্ণনাগে তো অমুরাগ নয়, ও যে বাসনার বক্তব্য। গন্ধ ছুটাইয়া, রঙ ছুটাইয়া, পাণ্ডি মেলিয়া সে কেবল আপনার অপূর্ণ বাসনার তৃপ্তি খুঁজিতেছে—বৈজ্ঞানিক একথা ভাল করিয়াই জানেন কিন্তু সেই ফুল ঝরিয়া যখন ফল ধরিল, তখন সে পরিপূর্ণ। ফুলে সমগ্র গন্ধটা নাই, কিন্তু ফলের মাঝে কত গাছ, কত ফুল, কত ফলের সম্ভাব্যতা নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অথচ ফলটা ক্ষুদ্র, গাছেরই একটা অংশ মাত্র। কিন্তু অংশ হইয়াও ফলের মৃত্যুতে, বাসনার নিরোধে সে পরিপক্ব হইয়াছে, পূর্ণ হইয়াছে। জীবও ঠিক এভাবে পূর্ণের অংশস্বরূপ হইয়াও অনন্ত সম্ভাব্যতায় অসীম, পূর্ণ।

ভক্তিশাস্ত্রের ঋষি বলিতেছেন—সান কামস্বমনা নিরোধক্লপজ্ঞাত—ভক্তি কামনা নয়, কেননা তাহা নিরোধ স্বরূপ। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে জ্ঞান ভক্তির ক্ষুদ্র হয় না। জলের নীচে রত্ন রহিয়াছে; যদি জলে ঢেউ খেলিতে থাকে, তাহা হইলে রত্ন দেখা যায় না; জল স্থির হইলে তাহাও দীপ্তি আপনি ভাসিয়া উঠে।

বাসনা চিত্তের চঞ্চল অবস্থা; উহা দূর না হইলে ভক্তি বা জ্ঞান কিছুই বিকাশ হইবে না।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, চিত্তের পাঁচটা অবস্থা আছে—ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাধারণ মানুষের কামনায়ুক্ত চঞ্চল চিত্তভূমিকে ক্ষিপ্ত বলা হয়। কোনও একটা কামনার পরিপূরণে স্থির উদয় হইলে যে কণিকতৃপ্তিপূর্ণ সরযুক্ত ভাব জাগে, তাহাই বিক্ষিপ্ত অবস্থা এবং স্পন্দগন্ধারযুক্ত ও আপাত নিরুদ্ধবৎ প্রেতীয়মান তমোময় অবস্থা চিত্তের মূঢ় ভূমি। যতক্ষণ জীবের সংসারদশা, ততক্ষণ তাহার মাঝে এই তিনটি অবস্থারই উদয় বিলয় হয়। সংসারনিমুক্ত হইলে তবে চিত্তের বহুমুখী গতি রুদ্ধ হইয়া একাগ্র অবস্থা উৎপন্ন হয়। একাগ্রতাই ভক্তির বীজ। অমুরাগ শুধু একজনকেই চায়, বহুর সঙ্গে বর্জন করে। এই জ্ঞাত ভক্তিসাধনায় ইষ্টানিষ্ঠার এত মাহাত্ম্য।

পূর্ণ একাগ্রতা সাধিত হইলে চিত্তের বৃত্তি সমূহ আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়। সমাধি ভিন্ন জ্ঞান বা ভক্তির স্বরূপ বোঝা বাইতে পারে না। ভক্ত ভগবানের মিলনেই সমাধি; প্রেমের সমাধিতে শুধু সে আর আমি—বিদ্রাভে বিদ্রাভে জড়া-জড়ির তায় দুইটি স্বরের একান্ত মেশামিশি। সেখানে জগৎ আছে কি নাই, কে তাহার খবর রাখে? সংসারদশা জীবের বিরহের অবস্থা; তাই সেখানে আকুলতা, অপূর্ণতা, ক্লিষ্টভেদ। সমাধি সংসারভূমির অতীত পরিপূর্ণ মিলনের অবস্থা। সেখানে পরম লাভ, পরম সিদ্ধি, পরম তৃপ্তি। সূত্রায়ঃ বৃত্তিবিকল্পের অবসর কোথায়?

নিরোধ ভক্তির স্বরূপলক্ষণ; সম্যাস তাহার তটস্থ লক্ষণ বলা বাইতে পারে।

বাহুভূতি ছাড়া স্বরূপ বর্ণনার আর কোনও উপায় নাই; কিন্তু তটন্ত লক্ষণ দ্বারা বাহির ধরিয়া ভিতরের স্বাৎপণ্য বর্ণনার চেষ্টা করা বাইতে পারে। সহজবোধিগণী জীবের পক্ষে এই জ্ঞাত সাধনরাজ্যে তটন্ত লক্ষণের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। বাহিরের লক্ষণ ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে অন্তরে স্বরূপ জাগিয়া উঠিতে পারে। ঋষি তাই নিরোধকে ভক্তির স্বরূপলক্ষণরূপে নির্দেশ করিয়া তটন্ত লক্ষণরূপে বলিলেন, “নিরোধস্ত লোকবন্দব্যাপারসম্মাসঃ”—লৌকিক ও বৈদিক কার্যসমূহের সম্পূর্ণ ত্যাগই নিরোধ।

এক্ষণে কৰ্ম্যত্যাগ কি, তাহাই অবধারণ করিতে হইবে। স্থূলতঃ কৰ্ম্যবিরতি কৰ্ম্য ত্যাগের লক্ষণ হইতে পারে না, কেননা তাহা প্রাকৃত নিয়মবিরুদ্ধ এবং তদনুকূল প্রচেষ্টা জীবের তমোবুদ্ধির হেতু। কৰ্ম্যের ফলত্যাগই স্বার্থ কৰ্ম্যত্যাগ। লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্যের সম্মাস বলিলে প্রথমতঃ ফণাশারহত কৰ্ম্মাশু-ষ্ঠানহ বুদ্ধিতে হইবে। ভক্তিশ্রদ্ধার আচা-যোগ্য পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। বাসনাত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ—উহাই কামনার নিরোধ বা চেষ্টাবৃত্তির নিরোধ এবং ভাক্তর প্রাপক। ইহা বুঝতে কোনও গোল নাই।

সম্মাসের এই অন্তঃস্বীনতাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—“তস্মিন্মন-ন্যতা তদ্বিরোধিসুদাসীনতা চ” অর্থাৎ ঈশ্বরে অনন্তভাবে এবং তাহার বিরোধী বিষয়মাত্রই উদাসীত্বকেও নিরোধ বলে। এই উক্তিকে ভক্তের সম্মাসের পরিচয় রূপে গ্রহণ করা বাইতে পারে। ভগবানে অনন্ততা কি?— অন্যান্যপ্রাণিণাং

ত্যাগোহিন্যতা”—অন্য আশ্রয়ের ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করাই অনন্ততা। আগাদের অতৃপ্ত চিত্ত অন্তরে স্থিতির হেতু না পাইয়া তৃপ্তির আশায় বহিষ্মখে ধাবিত হয়, এ কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। অন্তের প্রতি এই প্রবণতা ভক্তি-রই অস্পষ্ট আভাস, ইহাও সূত্রিত করিয়াছি। কিন্তু চিত্তের এই অগ্রপ্রবণতা পটবিনয় হইতে পরাবৃত্ত হইয়া যখন পক্ষম তৃপ্তির নিদানকে আগমনার মাঝেই থুঁজিয়া ফিবে, তখনই ভক্তির উন্মেষ হয়। তিনি আছেন, আমার হৃদয় জুড়িয়া আছেন। বাহিরেও তিনি আছেন, এ কথা আমার কাছে তখনই সত্য হইবে, যখন ভিতরে তাঁহাকে পাইব। এখন বাহিরে যাহা দেখি, তাহাই চঞ্চল, খণ্ডিত; আমারও দৃষ্টি অশুদ্ধ। তাহা হইলে বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইবে কি করিয়া? কাজেই বাহিরকে ছাড়িয়া আসিতেই হইবে। বাহিরের মোহ অতিক্রম করিতে পারলে তবে ভিতরে রস পাইব। আর অন্তরের রসধারা একবার উৎসারিত হইলে, বাহিরকে তাহা প্লাবিত করিয়া দিবে। তখন দেখিব, ভিতরে বাহিরে তিনই। এই চরম সত্যটুকু লাভ করবার জন্যই বহিরাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্তঃপ্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই অনন্ততা, ইষ্টানিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, বা অন্তের সম্মাস।

বাহির ছাড়িলেও তাহার সহিত সঞ্চ-দ্ব হয় না। সঞ্চ মুছিয়া ফেলিয়া নিরাশ্রয় শূন্যতার মাঝেও, আপাইয়া পড়িতে চাহি না। তবে বাহিরের সহিত আমার সঞ্চ অন্তরের সঙ্গে কি আকারে সমঞ্জস হইয়া থাকিবে?—ঋষি বলিলেন, বাহরূপারে উদাসীনতাই তাহার একমাত্র পথ। আমারও স্বরণ করাইয়া দিতেছি, স্থূলকৰ্ম্মসম্মাসে প্রাপ্তি

করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বাসনাভ্যাগ হইলে  
কর্ম থাকুক আর না থাকুক সে তার ইচ্ছা—  
বাগনা ছাড়িতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। এই  
দিক হইতে বিচার করিলে বুঝি, ঔদাসীন্ম  
বলিতেও স্থূল কর্মবিরতি ব্যাঘাত না। উৎ—  
উর্দ্ধে, আসীন যিনি—তিনিই ঔদাসীন; কর্ম-  
কোলাহলের উর্দ্ধে তিনি—তিনি নিলিপ্ত।  
অহংবোধে জীব কর্মে লিপ্ত হয়। অহংটা  
যে পরম বস্তুর কাছে সঁপিয়া দিয়াছে, তাহার  
কর্মে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা কোথায়? ভক্তি  
শাস্ত্রের পরিভাষায় সে কর্মকে বলে সেবা।  
ভক্তের কর্ম আছে—তাহা পরপ্রীত্যার্থে অমু-  
ষ্টিত, অতএব সেবা। তাই ঋষি বলিতেছেন,  
লোকে বেদেষু তদনুকূল-  
চরণং তদ্বিরোধিশুদাসীনতা  
—লোকে ও বেদে বিহিত ভগবানুকূল  
কর্মের আচরণই যথার্থ ঔদাসীনতা। তাহার  
তুষ্টি বিধানই ভক্তের ঔদাসীন্ম বা কর্মমুদ্রা-  
সের রূপ। ঔদাসীন্মের মাঝে যে অবহেলার  
ভাব রহিয়াছে, তাহা অহংএর প্রতি, ঐশ্বর্য  
প্রতি নয়।

এতদ্ব্যপেক্ষে দুইটা ভেদের কথা বলিয়া  
আসিয়াছি—লৌকিক ও বৈদিক। ইহার  
তাৎপর্য্য আছে। কতকগুলি কাজে আমাদের  
সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে—সেগুলি সংসার-  
স্থিতির পরিপোষক। ইহাদের সমুচ্চানে যে  
লাভ হয়, তাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলে  
অভ্যুদয়। অভ্যুদয়মূলক কর্মট লৌকিক কর্ম,  
উহা প্রবৃত্তিপণের দোসর। আর যে সমস্ত  
কাজ আপ্তজনদ্বারা প্রেরিত হইয়া অগুষ্ঠান  
করিতে হয়, অতএব নিবৃত্তিমূলক বলিয়া যাহা  
সংসারস্থিতির অতিকূল, তাহাই বৈদিক।  
ইহার অগুষ্ঠানে নিঃশ্রেয়স বা অভ্যুদয় হইতেও  
পরমোৎকৃষ্ট স্থিতি লাভ হয়।

এক্ষণে কথা এই, প্রবৃত্তিমূলক কর্ম কবাই-  
বার মত নিবৃত্তিমূলক কর্মও কবাইব কি না?  
যদি কর্মভ্যাগের যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া থাকি,  
তাহা হইলে বলিব, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উভয়ই  
আমার কাছে অপ্ৰয়োজক। “জানামি ধর্মঃ  
ন চ মে প্রবৃত্তিঃ” ইত্যাদি বচন কর্মমুদ্রাসের  
জ্ঞাপক। কিন্তু দ্বয়ীকেশকে যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে  
না পাঠিতেছি, সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্তিমূলক কর্ম  
ভ্যাগ করিলে অজ্ঞাতসারে প্রবৃত্তিরই পোষকতা  
করা হইবে মাত্র। কাজেই যে পর্য্যন্ত “আমি  
করিতেছি না—তুমিই সব করাইতেছ”—  
এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়্যাত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন না হয়,  
সে পর্য্যন্ত নিবৃত্তিমূল শাস্ত্রশাসন মানিয়া  
চলিতেই হইবে, নতুবা পতনের আশঙ্কা আছে।  
ঋষি তাই বলিতেছেন—“ভবতু নিশ্চ-  
য়দাত্মাবুদ্ধিঃ শাস্ত্রব্রক্ষণম্,  
অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া।”

লৌকিক আচারের বেলাতেও এই কথা  
খাটে। তবে লৌকিক কার্য্য যত কম,  
জীবন যত সরল হয়, ততই ভাল। সব  
ছাড়িতে পারা যায়, কিন্তু দুটা অন্ন দিয়া প্রাণ  
বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনটা আমরণ থাকিয়া  
যায়। মরণও তাঁহার চাতে তুলিয়া দিয়াছি,  
সুতরাং তিনি যতদিন না মারেন, ততদিন  
তাঁহার ইচ্ছায় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বই কি?  
বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যতটুকু লৌকিক  
প্রচেষ্টা, ততটুকুই কর্তব্য। নিশ্চয়্যাত্মিকা  
বুদ্ধির পরও তাহারই ইচ্ছাকে এই কর্মটুকু  
অবশিষ্ট থাকে। তাই ঋষি বলিয়াছেন—  
লোকেহপি তাবদেব, কিন্তু  
ভোজনাদিব্যাপারস্বাশ্রয়-  
শাস্ত্রণাবাধি—লৌকিক আচারও যত-  
দিন বুদ্ধি নিশ্চয়্য না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত;  
কিন্তু শরীরটা যতদিন আছে, ভোজনাদি  
ব্যাপার ততদিন থাকিয়াই যাইবে।

## আরণ্যক

• —\*—

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ায়ান্ তামববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টান্ ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৩।৯

—ঃ{\*}ঃ—

যেমন সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ নিত্য বর্ত্তমান, সেইরূপ ব্রহ্ম ও সংসার। ব্রহ্মসমুদ্রে সংসারতরঙ্গের উত্থানপতন অবিরাম চলেছে। নিলিপ্ত দর্শক লহরীর পর লহরী দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে যান। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীও তেমনি দূব হতে লহরী দেখে আনন্দলাভ করেন। আর এক প্রকার লোক আছে, তা'রা তরঙ্গের মাঝে যায়, কিন্তু এমন কোশলে নিজকে রক্ষা করে যে তরঙ্গ তাদের কিছুই করতে পারে না। সংসারের এটরূপ : যা'রা সংসারের রহস্য জেহন কোশলে জীবন যাপন করেন, তাঁদের ভয় নাই। মরে কেবল অল্প অকুশল ব্যক্তি। তরঙ্গের মাঝে সাঁতার দেবার কোশল যারা জানে না তারাষ্ট ডুবে মরে, অনুভিজ্ঞ অতস্বজ্ঞ সংসারীরও ঠিক এই দশা।

✽

অন্ধকার দেখলে আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে যা'ই, আর আলো দেখলে প্রাণে বল আসে, নবীন উৎসাহ জেগে ওঠ কেন ?

এর কারণ হচ্ছে, আলো বা জ্যোতিঃই আমাদের স্বরূপ। তা অপ্রাপ্ত এই জড় আলোক নয়—সচ্চিদানন্দময় জ্যোতিঃ, কিন্তু সেই কারণেই এই জড় জ্যোতি দর্শনেও আত্মজ্ঞান-বিমূঢ় মানবের অন্ধকারময় হৃদয়ে স্বরূপের

আভাস যখন ফুটে উঠে, তখনই আমরা আনন্দে বিভোর হয়ে যা'ই—আর যেন মৃত্যু-বিভীষিকা থাকে না। তাই দিনের আলোকে আত্মজ্ঞান কতকটা উন্মেষিত হওয়ার আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করি—আর রাত্রির অন্ধকারে আত্মজ্ঞানের অভাবে ভয়ে কাতর হই। স্মৃতিরাজ্যে জীবনে যারা জ্ঞানের আলো লাভ করেছেন বা নিজেকে স্বপ্রকাশস্বরূপ বলে জেনেছেন, তাঁদের আর কখনও আলোকের অভাব হয় না—ভয় তাঁদের নিকট হতে চিরকালের জন্ম পলায়ন করে—অভয়ে, অমৃতত্বে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন।

✽

‘তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ কি না, তাই তাঁর জগতের সব জিনিষকেই পূর্ণানন্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জগতের অণুপরমাণুও পূর্ণ—এর কোথাও তাঁর অভাব নাই—তা'ই অপূর্ণতাও নাই। নিজেকে অপূর্ণ ভেবে জগৎ হতে বিষয় আহরণ করতে যাওয়া, এ যেন দীপ্ত দিবালোকে চোখে হাত দিয়ে অন্ধকার খেঁচার মত। হাতটা খুলে নিশ্চয় সব দেখতে পাবে। যুগ যুগ ধরে সংস্কার জমে অস্বস্তিকে অন্ধকারাগার করে রেখেছে। সব সংস্কার ধুয়ে মুছে হৃদয়কে নির্মল স্বচ্ছ করে তুললেই জ্ঞানের আলো জলে উঠবে—নিজ্যক পূর্ণ বলে উপ-

লক্ষি করতে পারবে। আনন্দ অমৃত তোমার বিশ্বাস এলে তখন বিচারতর্ক কক্ষ কর্কশ মধ্যেই আছে, তাকে অশুভব করতে হবে।

আর অশুভব করতে প্রাণ মন আকুল হয়ে উঠে। তাই সাধক গাহিয়াছেন, “কাজ নাই

যত দিন তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস না হয়, আর জ্ঞান বিচারে আমার দেখা পাগল তত দিন জ্ঞানবিচার ভাল লাগে। ঠিক ঠিক করে।”

—\*—

## নিবেদন

—\*—

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব আগামী শারদীয় পূজার অবকাশে তাঁহার জন্মভূমি পরিদর্শন উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিসনের অন্তঃপাতী কুতুবপুর গ্রামে পদার্পণ করিবেন এবং তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত এই শুভ সুযোগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মভূমি মহাপীঠ দর্শন করিতে তাঁহার অনুগামী হইবেন—এই মর্মে একটি প্রস্তাব বিগত ভক্তসম্মিলনীতে গৃহীত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভক্তসহ জন্মভূমি দর্শন তিথিটা চিরস্মরণীয় করিতে এবং তাঁহার বিরাট উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতাকল্পে তাঁহারই শুভ নির্দেশের অনুসরণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী এই উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মভূমিতে একটি আশ্রম ও তৎসহ “স্বামি-বিদ্যালয়” স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপযোগী এক খণ্ড জমী খরিদ করিবার আয়োজন হইতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের পিতৃপিতামহের ভিটায় একটি ইষ্টক মন্দির তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্ম সম্প্রতি ৩৪খানা বর উঠানও প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্বাহের জন্ম বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমি তদীয় শিষ্যবর্গের নিকট সর্ববীর্যের সারস্বরূপ; এই পুণ্য ভূমিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুরাগী শিষ্যভক্ত মাত্রই এই শুভ অনুষ্ঠানটীর সফলতা কল্পে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে

৩রা কার্তিক পর্য্যন্ত একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক আগামী ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও আশুযজ্ঞিক ব্যয়াদি নির্বাহকজন প্রতি ৫ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, সুতরাং উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত সমাগত ভক্তগণের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব ইহাতেই বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুতুবপুরে যে আশ্রম ও ব্রহ্মচার্যবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহার সাহায্যার্থ যিনি সাহা দিতে চাহেন, তাহাও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে।—

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅগ্নিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল,  
সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া  
(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি)

## সংবাদ ও মন্তব্য

### আশ্রম সংবাদ

জগদগুরু শ্রীমচ্ছরচাচাচার্যের আবির্ভাব এবং অত্রতা সারস্বত মঠের ১২শ বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে ৩১শে বৈশাখ হইতে ২রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত অত্র মঠে শ্রীশ্রীগুরুবন্দ্যের পূজা, হোম, আরজিক, বেদাদি পাঠ ও নান্দবস্তাদি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীহট, কুচবিহার, ঢাকা, করিমপুর, নওগাঁ প্রভৃতি স্থান হইতে ভক্তদলের সমাগম হইয়াছিল। বোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও মঠের নিকটবর্তী ভক্তমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা ও বজীতে সমাগত ভক্তগণ তিলক ধারণ করেন। পরে কল-মূল, খেচরার, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণিত হয়।

অত্যন্ত শাশ্বতশ্রমণলিতেও অক্ষর ভ্রুতীর উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠাধিপতি শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ২০শে

বৈশাখ মঠে পদার্পণ করিয়াছেন। সন্ধ্যাতি কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি মঠেই থাকিবেন।

### গ্রন্থ পরিচয়

রঘুনন্দনভট্টাচার্যাকৃতং তীর্থযাত্রা-তত্ত্বম্—

—কলিকাতা, গ্রামবাজার সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সমস্তপক্ষে ১/০, সাধারণ পক্ষে ১/০। গ্রন্থখানি রঘুনন্দনের হুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতিতম বর্ষভূত একখানি অপ্রকাশিত তত্ত্বগ্রন্থ। ইহাতে গয়া, এরাণ ও বারাণসী, এই তিনটি তীর্থে প্রয়োজনীয় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানির উপযোগিতা সন্দেহ অকৃত কাহন্য মতভেদ হইবে না। পরিষৎ বহু অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রণ ভার গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতবিভাগমোদী ও স্বদেশীরাগীর কৃতজ্ঞতাজন হইয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থের মুদ্রণাদি পরিপাতি হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ইহা সেবানগরকল্পক মুদ্রিত হইলে বহুল প্রচারের পক্ষে আরও সুবিধা হইত।

## উৎসবে সাহায্যপ্রাপ্তি

### সারস্বত মঠে ।

শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস ২৫, শ্রীযুক্ত অধর চন্দ্রপাল ২৫, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মহাকিরা ১৩, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি ১০, শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার দাসগুপ্ত ১০, শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র দে ৯।

### পাঁচ টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তা:—গোবর্দ্ধন কুণ্ড, কুমুদিনী কান্ত সাহা, অভুলচন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র গুহ, আদিত্য চন্দ্র কাশী, ভুবন মোহন রায়, ইন্দ্র পদ সাধুখাঁ, বিহারী মোহন শর্মা, নলিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র লাল কুরি।

### চারি টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তা:—হেমন্ত কুমার ঘোষ, বিরজা-চরণ মিত্র, ভূষণ চন্দ্র চক্রবর্তী।

### তিন টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তা:—রমা প্রসন্ন একচারী, ভীমাচরণ বসু, মনুগনাথ বসু, অক্ষয়কুমার রায়, মহেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুষমাশোভা দেবী।

### দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তা:—ব্রজেন্দ্র মোহন চৌধুরী, শর-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রিন্সনাথ নন্দী, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, অভুল চন্দ্র রায়, জনৈক অজ্ঞাতনাথ দেবেন্দ্রনাথ দে, কৈলাস চন্দ্র দাস, কামদেব মহাপাত্র, গগন চন্দ্র দে, শঙ্কুনাথ দালাল, উমেশচন্দ্র পাল, বিবেকবর বসু, নলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধু-ভূষণ কর্মকার, সন্দীপা কুমার সেন, নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়, গোপীনাথ ঋতভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ দে, সুরেন্দ্রনাথ দে, ভবরঞ্জন গুহ, ব্রজবানী

কুরি, ঈশ্বরচন্দ্র কুরি, রমেশচন্দ্র কুরি, কালী-নাথ দত্ত।

### এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তা:—অমূল্য দাস, অভুল চন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্র নাথ মাইতি, প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, নলিনী কান্ত মুখোপাধ্যায়, রাস মোহন চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমার কর্মকার, নৃসিংহ-পদ পাল, অধিনী কুমার পাল, হরি নাথ কব্জ, কুমুদিনী গুহ, অমূল্য মোদক, লক্ষ্মীসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিনী কুমার পাল, অধিনী কুমার দাসগুপ্ত, ঘনশ্যাম দলই, করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায়, নিকুঞ্জবিহারী নাথ, প্যারী মোহন নাথ, উর্ধ্বশী দেবী, দ্বারকানাথ সিংহ, প্রসন্নকুমার রক্ষিত, কৃষ্ণমোহন দাস, গোবিন্দ চন্দ্র পুততুগু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত, হরপ্রসাদ রায়, শশিকুমার দাস গুপ্ত; কুরি—শ্রীনন্দন, যতুনন্দন, বনবিহারী, নিদানচন্দ্র।

### আট আনা করিয়া—

কুরি—প্রসন্নমণী, মনমোহন, যোগেন্দ্র লাল, প্রাণবন্ধু, রাজমোহন, সুচিত্রমণী, নন্দ-রানী, রাসমণী, নিতামণী, গৌরচরণ, ব্রজমণী, ঈশানচন্দ্র। বিজয়চন্দ্র তালুকদার, অমরনাথ মণ্ডল, গুরুচরণ দাস ও কেনারাম মণ্ডল।

### অস্বনামতী আশ্রমে

শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার দাসগুপ্ত ৩।

### দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তা:—হেমন্তকুমার ঘোষ, বিধুভূষণ কর্মকার। কুরি—ব্রজবানী, বনবিহারী, ঈশ্বরচন্দ্র।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—প্রাণচরিত্র আচার্য্য, রাধানাথ দে, অম্বিনীকুমার আদিত্য, সারদাচরণ চক্র-বর্তী, ব্রজপালী আচার্য্য, মহেন্দ্রনাথ পাল, অক্ষয়কুমার পাল, শরৎচন্দ্র পাল, প্রসন্নকুমার সাহা, হরেন্দ্রকুমার বণিক, রমমোহনপাণিক্য বৈকুণ্ঠকুমার মমঃ। কুরি—নিদানচন্দ্র,

তীনন্দন, যত্নন্দন।

আট আনা করিয়া—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র, মহাঃ কুরি—প্রসন্ন-ময়ী, মনমোহন, যোগেন্দ্রলাল, প্রাণবন্ধু, রাজ-মোহন, হুচিভ্রময়ী, নন্দলালী, রাসময়ী, নিত্য-ময়ী, গৌরীচরণ, জৈশানচন্দ্র, ব্রজময়ী, অমরচাঁদ।

## দানপ্রাপ্তি-স্বীকার

—\*—

হালিসহর আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ১০০

পাঁচ টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, " যীশে ল্প মাথ মুখার্জী, " নৃসিংহপদ পাণ, " জামলাল লাল, " রজনীকান্ত মিত্র, " নিতাইচন্দ্র দত্ত, " সিদ্ধেশ্বর সাধু খাঁ, " গৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, " মহেশচন্দ্র হংস, " বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

তিনটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার রায়, " শম্ভুনাথ-লাল।

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র পাল, " পি, সি, চক্রবর্তি, " ব্রজেন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, " তাঁরকনাথ দে, " হরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, " যুগলচরণ সাহা, " দেবেন্দ্রনাথ দত্ত, " সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, " বদরীনারায়ণ চেল্লী, " রাধানাথ রায়, " R. N. Paul. " Major B. D. Bose. Manager—Indian Press.

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—তিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারমণ রায়, বাথনআল মুখোপাধ্যায়, ময়নাথ মণ্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ দ, জনৈক শান্তিপুরালী, বামনদাস মুখোপাধ্যায়,

উজ্জ্বলানন্দ বসাক, হেমচন্দ্র দাস, বিজয়গঙ্গাভ সাহা, ললিতমোহন সাহা, জ্যোতিষ্ময়ী রায় চৌধুরী, রেবতীমোহন রায়, গঙ্গকুমার বর্দন চন্দ্র সাহা, রামগোপাল সাহা, যতীন্দ্র-মোহন সাহা, দীপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ডাক্তার যুগলনাথ জী, মুক্তিনাথ ভট্টাচার্য্য, তাবাপসন্ন সাগরী, জনৈক স্ত্রীলোক, হরিপদ কুণ্ড, অম্বিনীকুমার পাল, বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিবেদী সেন, রামানন্দ বিশ্বাস, বেণীমাধব ঘোষ, আত্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্র চট্টাচার্য্য, মহানন্দ রায়, তবিনাথরণ মিত্র, নবীন্দ্রনাথ মিত্র, জনৈক চৈতন্যী, যতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচ-পাঁড়ে, Jyran Biswas, বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, নৃসিংহপ্রসাদ বিশ্বাস, পাঁচাল নন্দী, ব্রজ-গোবিন্দ সেন, নবীনচন্দ্র চৌধুরী, বিধুভূষণ রায় চৌধুরী, চৈতন্য ভূঞা, ডাক্তার হরেন্দ্রলাল দে, নবীনচন্দ্র দে, কামিনী কুমার পাল, বগলাকুমার পাল, অক্ষয়কুমার ভৌমিক, ফীরোজচন্দ্র মহাজন, শশীভূষণ দে, কাশীধর শান্তি, শমসকুমার কণ্ঠকান, চন্দ্রকুমার বড়ুয়া, কল্পকান্ত বড়ুয়া, মতিচন্দ্র দেবশর্মা চৌধুরী, সারদাচরণ চৌধুরী, চন্দ্র-কুমার বড়ুয়া, অক্ষয়কুমার মুখার্জী, ডাক্তার কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত, নবীন্দ্রোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, মান রাজা, মোহিনীমোহন দত্ত, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, জনৈক ভদ্রলোক, বামিনীরজন চৌধুরী।



## আট আনা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচ-  
গোপাল মাস্তা, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়,  
অজিতকুমার সেন, — অক্ষয়প্রসাদ মুখার্জী,  
D. N. Pal.

## খুচরা সংগৃহীত—

উড়িষী কুলিগণ ১১, মাঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র  
বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, আলিপুর বারলাইয়েরী  
৪১০, স্বজাগত বিজ্ঞানবির ছাত্রবৃন্দ ১১, মাঃ  
শ্রীযুক্ত গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭/০।

## ভাণ্ডারাল আশ্রমে—

শ্রীযুক্ত মোহন ভগবানদাস ননীপুর ৫।

## দুইটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—নিবলকুমার সিংহ, নরপৎ সিংহ,  
(বহরমপুর) রমণীমোহন সেন, লেডী  
ডাক্তার, পি. এন. গুপ্ত, পি. সি. গুপ্ত,  
কুমার অমরেন্দ্রনাথ রায়, একজিকিউটিভ  
অফিসারগণ।

## একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—বৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অনাথ  
নাথ রায়, (বহরমপুর) প্রমোদ-  
কুমার ভট্টাচার্য্য, প্রিন্সিপাল বি. সি.  
দাস, প্রফেসর বি. সি. নাগ, প্রফেসর  
হেমন্তকুমার সেন, প্রফেসর ডি. ডি. বা. প্রফে-  
সর বি. সি. রায়, বিজ্ঞানচন্দ্র রায়, কালীকুমার  
বানার্জি, হোমিওপ্যাথ সেন, বিভূতিভূষণ ভট্ট,  
জিতেন্দ্রমোহন সেন, বৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,  
জিতেন্দ্রমোহন বানার্জি, বলিনীনাথ চট্টাচার্য্য,  
অনিলকুমার চট্টাচার্য্য, বিজ্ঞেন্দ্রনাথ মুখার্জি,  
গিরিজাতুলস শর্মা, অরবিন্দকুমার পাল, দীরা-  
লাল সেন, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, উৎকৃষ্ট রায়,  
কুলদাক্ষত ভট্টাচার্য্য, অবনীমোহন শর্মা,  
অরিন্দ্রকুমার অধিকারী, স্বদেশচন্দ্র নাগ,  
প্রভাতচন্দ্র সেন, নৈকেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রভাতচন্দ্র  
সাহা, বিশ্বভূষণ সাহা, মৌলভী জিয়ার রহমান,  
মৌলভী এ. হক, বেণুগোবিন্দ সেন, মণিমোহন  
সেন, রায় বাহাদুর এনু সি. নাগ, বারকানাথ  
সিংহ।

## খুচরা সংগৃহীত—

ননীপুর রাজবাড়ী ২১, শ্রীযুক্তা রানী সরস্বতী  
দেবীর কাছারী ২১, হেমিণ্টন হোষ্টেল ২৫০,  
হাইলার হোষ্টেল ৬৫০, যেন হোষ্টেল ৪১,  
কুমার হোষ্টেল ৩১, মহারাণ হোষ্টেল ৩১,  
সারাজ হোষ্টেল ২১, রিট্রিট হোষ্টেল ১১, নিউ  
হোষ্টেল ১১, শান্তি নিকেতন মেছ ৩১,  
সেটেলমেন্ট অফিসারগণ ৫৫০, সবডিভিসনাল  
অফিসারগণ ৩১, কয়েকজন হিতৈষী ৮১,  
অগ্রান্ত ১৬১।

## খড়কুমার আশ্রমে—

শ্রীশশিভূষণ কুণ্ড ২১, শ্রীকালীনাথ কুণ্ড ২১।

## একটাকা করিয়া—

শ্রীগঙ্গেশ চৌধুরী, হরিপদ মাস্তা,  
শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীদ্বীকেশ ঘোষ, শ্রীধর্মদাস  
ঘোষ, শ্রীচন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীবীজনাথ ঘোষ,  
শ্রীরসমণ মণ্ডল, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সরকার রুজ-  
হেট, শ্রীহরিপদ দাস কুণ্ড, শ্রীশশধর দে,  
শ্রীঅমলাচরণ নন্দী, শ্রীগনেশদেব রায়, শ্রীনারা-  
য়ণচন্দ্র চাকরা, শ্রীশশীভূষণ চানক।

## আট আনা করিয়া—

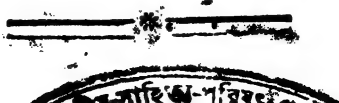
শ্রীহরিনাথ বার, শ্রীজ্ঞানারায়ণ চৌধুরী  
শ্রীরামচন্দ্র পাল শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ শ্রীঅতুলচন্দ্র  
চট্টোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীরসিকলাল  
ঘোষ, শ্রীবীজকুমার ঘোষ।

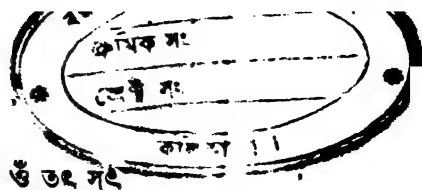
## খুচরা সংগৃহীত—

ইডপালা হাইস্কুলের ছাত্রগণ ৮১০, ইডপালা  
স্কুলের শিক্ষকগণ ৩১০, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ  
মাঃ পার্কেসী দিগর খড়ার শ্রমিক দল ৩১০,  
মিহিরবাবু কুঠি ২৫০, অগ্রান্ত ২১০।

## সারস্বত মুঠে—

শ্রীলবন শর্মা ১১, শ্রীলবন বরুবা ১১,  
শ্রীভিষেক গগৈ ১১, শ্রীলবননাথ ভট্টাচার্য্য ১১,  
শ্রীযুক্ত গুণেশ্বর বরু ১১, "জ্ঞানানন্দ বরুঠাকুর  
২১, D. N. Ray. ১১, "ভোলানাথ শর্মা  
২১, "পূর্নানন্দ শর্মা ১১, "হোমেশ্বর শর্মা ১১,  
"পদ্মশ্বর শর্মা খড়ি ১১। (ক্রমশঃ)





# আমি-দর্পণ

১৯শ বর্ষ } আমি { প্রথম খণ্ড  
সমষ্টি সং ১৯৫ } তৃতীয় সংখ্যা

অগ্নয়ে

—\*—

[ ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।৩ ]

—\*—

[ কাভ্য উৎকীল ঋষিঃ—অগ্নিদেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ]

বিপাজসা পৃথুনা শোশুচানো  
 বাথস্য দ্বিষো ব্রহ্মসো অমীবাঃ ।  
 সূশর্মণো ব্রহতঃ শর্মণি স্যাম্  
 স্মধেব্রহৎ সূহবস্য প্রণীতো ॥

রয়েছে উজলি কায়, অগ্নি, তব দীপ্তি সুবিপুল,  
 অরি মম রোগহীন ব্রহ্মকুলে কর নিরমূল;  
 হে মহান, চিরসুখনিকেতন যাচি তব পায়,  
 কণ্ঠ ভরি নিই নাম, যজ্ঞশালা দীপি মহিমায় ।

স্বপ্নে অশ্রু উষসে স্মৃতি

স্বপ্নে স্মৃতি উদিত বোধি গোপাঃ ।

তদ্ব্যবহিত্য তনয়ঃ জুস্ম

স্তোমঃ মে অগ্নে তন্ন স্মৃজাত ॥

ফুটেছে উষার আলো, হে দেবতা, জাগো এইবার,

ছড়ায় কিরণ, রবি—নাও এসে আমাদের ভার ।

গাঁথিয়াছি গীতি, তব—তনয়ে চাহ করুণায়—

দিব্যতেজে দীপ্ততম জাগো অগ্নি যজ্ঞবেদিকায় ।

স্বপ্নে স্মৃতি স্বপ্নভানু পূর্বীঃ

কৃষ্ণাঙ্গমে অরুণো বি ভাহি ।

বসো নৈষি চ পশি চাত্যঃ

কৃধি নো রাহ উশিজো যবিষ্ঠ ॥

অন্তর্যামী করুণর, নিখিলে যে ছড়ায়েছ আলো,

অরুণ কিরণ, ঢালি হরে নাও নিশীথের কালো ।

দৈত্য মম কর দূর, বক্ষপুটে দাও চিরবাস,

যৌবনের রাজা তুমি, দাও কণ্ঠে অমিয়-পিয়াস ।

অশ্রুত্বে অগ্নে স্বপ্নভো দিঙ্গীহি

পুনো বিশ্বাঃ সৌভগাঃ সংজিগীবান্ ।

যজ্ঞস্য নৈতা প্রথমস্য পাত্নো

ভজাতবেদো যজতঃ স্মপ্রনীতে ॥

হে বৃষভ, হৃদয়ধর, দীপ্ততেজে ব্যাপি বিশ্বময়,

বিপদের বক্ষ দলি কেড়ে নাও গোপন সঞ্চয় ।

যে আদিম যজ্ঞ হস্ত করে বিশ্ব কত না কল্যাণ—

অন্তর্যামী নেত্ররূপে কর তুমি ভায় অধিষ্ঠান ।

অচ্ছিত্রা শশ্ব জম্বিতঃ পুরুগি  
 দেবী অচ্ছা দীদ্যানঃ সুরমেষাঃ ।  
 ন্থো ন সগ্নিরভি বন্ধি বাজম্  
 অগ্নে অঃ রোদসী নঃ সুরমেকে ॥

তুমি রুদ্র, মহাকাল, জ্যোতির্ময়, জ্ঞানবিত্ত্বয়,  
 দেবতারে দিগু যাহা, ত্রুটী তার কর সম্পূর্ণ ;  
 রহ যজ্ঞ আগুনিয়া, বহ অগ্ন রথের যুতন ;—  
 ছালোক-ভুলোকে করে দীপ্তি ভব রূপে অতুলন ।

প্র পীপয় ব্রহ্মভ জিহ্ব বাজানু  
 অগ্নে অঃ রোদসী নঃ সুরমোষে ।  
 দেবেভির্দেব সুররুচা রুচানো  
 মা নো মন্তস্য দুশ্রুতিঃ পরিত্রাৎ ॥

দাও অগ্ন কল্পতরু, ঋদ্ধিভার করিব বহন,  
 মিটাব পিপাসা আজি রোদসীরে করিয়া দোহন ;  
 এসো নিয়ে দেবগণে, আলোকিয়া রহ চিত্তপুত্র,  
 মর্ত্যের দুঃখতি যত অধিরত করি দিও দূর ।

ইডামগ্নে পুরুদঃসঃ সনিঃ গোঃ  
 শশ্ব তমঃ হবমানায় সাধঃ ।  
 স্যামঃ সুনুস্তনহো বিজাবা  
 হগ্নে সাং তে সুরমতিভুঃ সুরমোঃ

যে ডাকে 'তোগারে নিতি, জানি দেব তুমি দাও তারে  
 উজলিয়া প্রজ্ঞা তার ক্ষয়হীন অগ্ন ভারে ভারে ;  
 যাচি হেন পুত্র আজ, বাড়াবে বে কুলের গরিমা—  
 লভে যে আশিষ্ তব, গরবের কোথা তার সীমা !

## গুরু ও গীতা

—\*—

গীতা ঐতিহাসিক কি না, তা নিয়ে অনেক তর্ক করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বলে বাস্তবিক কেউ ছিলেন কি না, ঐতিহাসিক তার প্রমাণ চান, নইলে তাঁর চোখে গীতার মূল্য কমে যায়। এ যুক্তির সারবস্তা সব সময় বুঝতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের যে ভাবধন বিগ্রহ আমার মনের মাঝে দেখতে পাচ্ছি, সেই জীবন্ত অনুভূতির চেয়ে মরা ইতিহাসের সাক্ষ্য কি বেশী প্রামাণ্য হবে? চিন্তের গতি নিত্য অন্তিমুখী না হলে সত্যাসত্যের এমনতর বিচার কেউ করে না। আমি মানি, শ্রীকৃষ্ণ একটা ভাব, অর্জুন একটা ভাব; ভাবরূপে তাঁরা নিত্য। সেই ভাব যে কতবার বিগ্রহে মূর্তিমত্ত হয়ে উঠে, তার খবর কি ইতিহাস রেখেছে? গীতার কৃষ্ণত্ব রূবেকার কোন ঘটনা, শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন কোন যুগের মানুষ—এই বুদ্ধি নিয়ে যদি গীতা পড়, তবে তার পরিপূর্ণ আনন্দ পাবে না।

‘কৃষ্ণার্জুন সংবাদ গুরুশিষ্যের সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গুরু, অর্জুন প্রপন্ন শিষ্য। অর্জুনের শিষ্য আরও সহস্র। স্বীকার করি, কেন না আমাদের মাঝে যে দৈন্ত ও জিজ্ঞাসা আছে, অর্জুনেও তাই দেখতে পাই। কিন্তু গুরু কি বস্তু, তা অনুভব করতে পারি না বলে শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্বের বা গুরুত্ব কৃষ্ণত্বের আরোপ করতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে। শ্রীকৃষ্ণ যদি গুরু হন, তাহলে একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে যান কি না; ‘তাকে তেমনি সহজভাবে গ্রহণ করা

কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি ভগবান হয়ে দূর থেকে আমাদের পূজা আদায় করলে আমরা অনেকটা সন্তোষে থাকি। শ্রীকৃষ্ণকে গুরু বলে ভাবতে এই দিক দিয়ে আমাদের খটকা। আবার নিজ গুরুকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবতে গেলেও গীতার ভগবদ্ভাবের যে সমস্ত উক্তি ও ক্রিয়াকলাপ আছে, সেগুলো আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নরাকার বিগ্রহে আরোপ করতে খুব জোর বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশেষতঃ আজ কাল গুরুত্ব যেমন গুরুত্বের অভাব দেখা যায়, তাতে গুরুত্বও কেউ জোর করে শ্রীকৃষ্ণের আসন নিতে সাহস পান না। এই জন্ত সন্দেহও বেশী হয়। বিচারের অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে ‘এমনি করে এই গীতাপ্রাবনের যুগেও গীতার সাধনা আমাদের জীবনে মূর্তিমত্ত হয়ে উঠে না।

আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না ভেবে একজন মহাযোগেশ্বর ব্রহ্মসিদ্ধ পুত্রস্বয় বলে মনে করে গীতার ব্যাপার ও উক্তিগুলি সারিয়ে বাও দেখি—দেখবে গীতার উক্তিতে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার হয়েছে। ভগবান বলে ভাবতে মানা করি। এই জন্ত যে, ভগবান আসলে কি তা তো আমরা জানি না, কারণেই তাঁর সম্বন্ধে বিচিত্র সংস্কার পোষণ করে তাঁকে একটা কিছুত্বকিমাকার করে ফেলি। তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। অসুখ কথাটা ভগবানের উক্তি—এই বললে দেখছি, অধিকাংশই কথাটা আমরা শুধু নির্দিষ্ট

চারে গিলে বসি, তাকে পরিপাক করবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয় না—এমন কি তা সম্ভব কি অসম্ভব, তা নিয়েও একটা প্রশ্ন মনে জাগে না। এগুলো কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বাসের পরিচয় নয়—এ হচ্ছে এক রকম আধ্যাত্মিক জড়তা। অতিমাত্রার শাস্ত্রের দোহাই আর অবতারের প্রাচুর্য্য এই জড়ত্বের ভাবে আমাদের দেশটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। এই জন্ত ভগবানের কথার চেয়ে মানুষের কথায় আমার চিন্তে সাড়া দেয়ে বেশী। ভগবান তো আমার কাছে মৃত, আর মানুষ জীবন্ত। মানুষের কথা হলেট মনে হয়, ওটা আমার সমজাতীয়ের কথা—ও শুধু বিনা বিচারে গিলতে হবে না, পরখও করা যাবে। আর যেখানে বিশ্বাসই করতে হয়েছে, সেখানে দেখেছি, মানুষের কথায় বিশ্বাস করে যে জোর পেয়েছি, মনের ওপর তা যেমন দাগ কেটে বসেছে—ভগবৎকৃতিতে তেমন বিশ্বাস আসে নি—একটা আবছারা ভাব, ভুলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তাতে লেগেই রয়েছে। এই থেকে বোঝি, আজ ভগবান এসে সরাসরি সামনে দাঁড়ালেও তাঁকে পুণ্য না, যদি মানুষের ভিতর দিয়ে তাঁকে না পাই। ভগবান পাওয়ার আগে গুরু পাওয়া এই জন্ত বেশী দরকার।

আর এই জন্তই বলছিলাম, গীতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হয়ে থাকলে তেমন রস পাই না, কিন্তু তিনি মহাপুরুষ বা ব্রহ্মবিদ গুরু হলে গীতার উক্তি আমার কাছে আশ্চর্য্য রকম জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর মনে হয়, গীতা অমর, কেননা গুরু সত্য, তাঁর উপদেশ সত্য। তখন আর ঐতিহাসিকের ভূয়া বিচারের কথা মন আমলেই আনতে চায় না। এমন কি,

অর্জুনের কাছেও যে শ্রীকৃষ্ণ আগে মানুষ ও গুরু, তার পরে ভগবান—এর প্রমাণ যত্র তত্র রয়েছে। কিন্তু কাজের বেলায় সে কথাটা আমরা ভুলে যাই।

গীতাতে অর্জুনের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠলেন, তার আলোচনা করলে শিল্পের হৃদয়ে সঙ্গুরের প্রকাশ ধারার একটা আভাস পাওয়া যাবে। অর্জুণ বললেন, আমি যুদ্ধ করব না—এই বলে অহিংসার গুণ কীর্ত্তন করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে শুনলেন, শেষে হেসে বললেন—হাঁ, পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে। এই বলে তাঁর বলবার যা ছিল, তাই অর্জুণকে বোঝাতে লাগলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোকের পূর্ব পর্য্যন্ত এই বোঝা পড়া। এর মাঝেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের পত্তন করলেন—যা নাকি অনেকের মতে গীতাক্ষেপ বিশেষ ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলি খুব সাধারণ ও ব্যাপকভাবে উক্তি, নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর বোঁক দিয়ে এর মাঝে কৌখাও তিনি কিছু বলেননি। যে কোনও গুরু যুগে, আমরা এমনি উপদেশ শুনবার প্রত্যাশা রাখি।

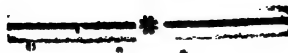
কিন্তু কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচ্য কণা হচ্ছে এই যে, এতে প্রচলিত সাধনার একেবারে বিপরীত বিধান দেওয়া হল। যুক্তি, বিচার, দর্শন ইত্যাদিতে প্রতিপন্ন করছে যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ; কর্ম্ম ছাড়লে তবে সংসার চক্র হইতে নিস্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু সে ভায়-গায় যদি কেউ উপদেশ দেন, “দেখ তুমি সহজ কর্ম্ম ছেড়ো না, ও সব বেদের দোহাই শোন-বার তোমার কোনও প্রয়োজন নাই, তুমি বেদের পরপানে চলে যাও, বেদ তো ব্রহ্মের

কথাই বলছেন, এই কর্মও সেই ব্রহ্মেরই বিকাশ, কর্ম আর বস্তু এক কথা, এই যে কর্মের চক্র চলছে সংসারে, যে এর আবর্তন না করে, সে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় খুঁজে বৃথা বেঁচে আছে, কাজেই অনাসক্ত হয়ে তুমি কর্ম কর তখন বুঝি, যে সংসারকে আমরা ভয় করছি, এড়িয়ে বেতে চাইছি, সেট সংসারকে যিনি আরও পাকা করে দিতে চান, প্রকৃতির একটা গোপন শক্তির তাগিদ তাঁর হাতে। খুব ভাল সঁাতাড়ু বললে তিনি অগাধ জলে আমাদের ঠেলে দিয়ে হেসে বলছেন, জল কেটে আমার দিকে আর দেখি !

আমরা জানি, সংসার বজার রেখে সংসার বন্ধন যিনি কাটতে পারেন, তিনিই সঙ্গুরু। এমন গুণী পুরুষের দেখা সহজে মেলে না—কিন্তু তা বলে তিনি নাট, তাঁর জায়গায় এক কল্পিত ভগবান দাঁড় করিয়ে শাস্ত্রের সীমাংসা করতে হবে, এ কথা তো মানতে পারি না। আজকাল অনেকে বলেন, কসে কর্ম কর, অকর্মে দেশটা উৎসন্ন গেল। কিন্তু কসে কর্ম করার ফলে মনে যে ময়লা জমে, তা হতে রেছাউ পাবার পথটা কেউ বলে দিতে পারেন ? আর দেখছি, পথ বলে দিলেও হয় না—পথ তো শাস্ত্রে কতই লেখা আছে—চাই একটা জীবন্ত মানুষ; তাঁর কথা, তাঁর প্রেরণা, তাঁর শক্তি আমার মাঝে জলজল হয়ে উঠবে, তবে না বুঝব—হাঁ, সহজ কর্ম করেও, সংসার

করেও কোথায়ও বাধা অনুভব করছি না—কোদাল মেরে, কুড়াল মেরে, মোট বয়েও আমি রাজার রাজা ! শুধু ভগবান মানলেই যে কর্মের এই সিদ্ধিটুকু মেলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। শুধু মানামানিতে কি হয় ? চোখে দেখা চাই—মানুষের সঙ্গ চাই। সংসার যদি ভগবানের সংসার হয়, তা হলে তার বন্ধন থাকে না, এ কথা শাস্ত্রে বলে। কিন্তু ভগবান মানুষ না হলে এই সংসার যে সত্যি সত্যি তাঁরই সংসার, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না ; মুখে বলি ভগবানের, কিন্তু প্রাণে জানি, ও বাজে কথা। ভগবান গুরু হলে তবে বুঝি, হাঁ তাঁরই সংসার বটে। গুরুগৃহে থেকে সহজ কর্মে দিনগুরুত্ব করলে তবে বুঝি, কর্মযোগ কত সহজ, কত উপাদেয়। জীবনে এই ভাগ্যটুকু না ঘটলে গীতার কর্মযোগ বুঝবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আর যে এই যোগের আশ্বাদ পেয়েছে, সেই জানে, গুরু আর কৃষ্ণ এক ; কৃষ্ণ ভগবান, এ কথায় তার প্রাণে তত সাদা দেয় না, কিন্তু কৃষ্ণ গুরু—গুরু কৃষ্ণ শুনলে সে একেবারে এলিয়ে পড়ে। গীতা যে সত্যি সত্যি ইন্দ্ৰি-হাস, তার প্রমাণসে বুঝার মাঝে পারি।

এই তো গুরুর ধর্ম। এখন শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে অর্জুনের কাছে তাঁর গুরুত্ব প্রকাশ করলেন, সেই কাহিনীই বলি। (ক্রমশঃ)



## অজ্ঞানের স্বরূপ



অজ্ঞান সম্বন্ধে বৈদ্যাস্তিকের কয়েকটি সিদ্ধান্ত আছে, বিশেষ প্রাধান্য সহকারে তাহাদের আলোচনা করিতে চাইবে। সিদ্ধান্ত কয়টি এই—(১) অজ্ঞান জড়সমূহের আদি, (২) অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী, (৩) অজ্ঞান ভাববস্তু, (৪) অজ্ঞান সংগ নয়, অসংগ নয়, অতএব অনির্জন্য, (৫) অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক।

এই কয়েকটি সিদ্ধান্তের মধ্যে—“অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী”—এটাই বাস্তবিক অজ্ঞানের সংজ্ঞা। বাকীগুলি ওই সংজ্ঞারই পরিপোষক অজ্ঞানের ধর্মের পরিচায়ক। এই ধর্মগুলির বিচার করিয়া অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিরোধ নিরূপণ, তাহাই আমাদের নিরূপণ করিতে হইবে।

অজ্ঞান জড়সমূহের আদি—এই লক্ষণটাই বিচার করিয়া দেখা যাক। জড় কাকে বলি? যাহা দৃশ্য অর্থাৎ অদৃশ্যবস্তু, তাহাই জড়। অজড় একমাত্র চৈতন্য। চৈতন্য বলিতে আমি। তুমিও চেতন, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎভাবে আমি জানি না, উপচারবশতঃ বলি, তুমি চেতন। একমাত্র আমিই চেতন, আমিই জ্ঞাত। আমার বাহিরে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা কাজেই দৃশ্য বা জড়। এই দৃশ্য কি? প্রথমে দেখিতে পাইতেছি—এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ জগৎ। স্থূলতঃ ইহাকেই দৃশ্য বলি। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও সূক্ষ্ম দৃশ্য আছে। নিজকে ধরিয়া তাহার বিচার না করিলে বোঝা যায় না। প্রথমতঃ ধর, আমার দেহ, কণ্ঠ

বার্তা, আচারে ব্যবহারে অনেক সময় দেহ-টাই “আমি” বলি—যেমন জ্বালি অল্পস্থ, আমি কালো ইত্যাদি। আমার কখনও “আমার” বলিয়া জ্ঞাত আমি হইতে দৃশ্য দেখকে পৃথক করিয়াও নিত। আমার দেহ আমি হইতে পৃথক—ইহা সোজা কথা। অধ্যাত্ম-জগতে এই প্রথম দৃশ্য।

তার পর মন। মনের সঙ্গে মাথামাথি বড় বেশী, তাই আমি চেষ্টাতে তাহাকে পৃথক করা সাধারণ মানুষের সাধ্য হয় না—তাহারা হয়ত এটা খেয়ালই করে না। চিন্তাশীল ব্যক্তির, বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ববিদেরা মনটাকেও দেখেন। মন না দেখিলে তাহার তত্ত্ব-বিচার হয় কি করিয়া? আর নিজের মন না দেখিলে পরের মনট বা দেখা কিবা বোঝা যায় কি করিয়া? অতএব প্রমাণ হয়, মনও দৃশ্য। আধুনিক দর্শনের দোড় এই পর্য্যন্ত। সুতরাং আমরাও এইখানে থামলাম। কিন্তু এই ধারায় বিচার করিয়া মনের স্বরূপ বুদ্ধিও দৃশ্য হয়।

তাহা হইলে প্রমাণ হয়—স্থূলজগৎ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সব দৃশ্য বা জড়। মাথামাথি ভাবটা যতই ছাড়াইয়া যাইবে, আমার আলো, ততই গির্ছাইয়া যাইবে, আর তাহার সম্মুখে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দৃশ্যরূপে ভাসিয়া উঠিবে। এই দৃশ্যগুলি আমি নই—কেন না আমি জ্ঞাত। জ্ঞাত চৈতন্য বা জ্ঞান। দৃশ্য তাহা হইলে জড় বা অজ্ঞান। ইহা প্রমাণ



হয়, দেখিতে পারিলে আভাসের বুদ্ধি হইতে অসুজ্ঞান মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সবটুকু বা অজ্ঞান। আমি হঠাৎ তিন হঠাৎ অর্থাৎ “আমি নই” এই ভাব হঠাৎ হঠাৎ উৎপত্তি। যেখানে “আমি”র সঙ্গে মেশামেশি, সেখানে ইহাদের সত্তা নাট—যেমন “আমি সুখী”—এখানে বুদ্ধি নাই। অতএব প্রমাণ হয়, অজ্ঞানই অজ্ঞানসমূহের আদি।

অজ্ঞান যদি উৎপত্তির নিদান হইল, তাহা হইলে কাজে কাজেই বলিতে হয়—অজ্ঞান ভাববস্তুর জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞান বলে না। অর্থাৎ অভাব বলিতে যে একটা নাস্তি-বোধ বা শূন্যতা বুঝি, তাহাই অজ্ঞানের স্বরূপ নয়। অজ্ঞান একটা শক্তি, একটা ভাব পদার্থ। অজ্ঞানের একটু ছোঁয়াচ, ভুলের একটু বেশ লাগিয়াই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা বুদ্ধির রঙে রঞ্জিত হইলেন; আর একটু ঘন হইয়া মন হইলেন, প্রাণস্পন্দন হইলেন, শেষে বা দেহ হইলেন! দেহটা স্থলভাবে দেখিতেছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণেই তাহা কোথায় উড়িয়া যাউবে—পরমাণু হইলে তো আর দেখাই যাউবে না। সুতরাং স্থল বলিয়াই যে কাহারও সত্তার জোর দখল আছে, তাহা নয়। স্থল স্থল হইয়া মিলাটয়া যায়, আবার কোথা হইতে জাসিয়া উঠে। যখন মিলাটয়া যায়, তখন বৃষ্টি, নাই—অর্থাৎ অভাব ঘটিল। কিন্তু একান্ত অভাব তো হয় না—মিলাটে আবার আসে কোথা হঠাৎ? অভাব তাহা হইলে, স্থল, স্থল, কিন্তু ভাব। স্থলের অজ্ঞান অভাব, কিন্তু স্থলে তাহাই আবার ভাব। কাজেই অজ্ঞান=অভাব, একেবারে পুরাতামাত্র নাস্তি—এ সিদ্ধান্ত করি কি করিয়া? বরং অজ্ঞান

স্থলভাব—এই কথাই বলা যুক্তিযুক্ত। স্থল-দর্শীর অজ্ঞান=স্থলদর্শীর বিজ্ঞান, সেখানে অভাবেরও সত্তা চোখে পড়ে। অতএব অজ্ঞান ভাববস্তুর, যেহেতু তাহা দৃশ্যের নিদান—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

তার পরের কথা হইল, অজ্ঞান অনির্কট-নীয়। পূর্বের আলোচনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারি। অনির্কটনীয় মানে রহস্য, বাক্যে বাহ্য প্রকাশ করা যায় না। বাস্তবিক একটা তত্ত্ব যদি একদিক হইতে দেখি আছে, আর এক দিক হইতে দেখি নাই, তাহা হইলে তাকে অনির্কটনীয় বলা ছাড়া আর উপায় কি? অজ্ঞানকে যেদিক দিয়াই বুঝি না কেন, তাহার ধারণাটাও ঠিক এইরূপ। যদি অজ্ঞানকে একটা প্রত্যয় বলিয়াই ধরি, তাহা হইলে দেখি, স্থলদর্শীর অজ্ঞান তাহার কাছে সৎ, কিন্তু স্থলদর্শীর কাছে তাহা স্বরূপতঃই অসৎ। যদি অজ্ঞানকে উপাদান হিসাবে ধরি, তাহা হইলে ভেদদর্শীর অর্থাৎ সৃষ্টিতে তাহা সৎ, অভেদদর্শীর অথবা ভেদের প্রলয়ে তাহা অসৎ। তাহা হইলে অজ্ঞান স্বরূপতঃ সৎও নয়, অসৎও নয়। এট হইল প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে অজ্ঞানের স্বরূপকথা।

আবার অজ্ঞানকে যদি সমষ্টিভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠরূপে দর্শন করি, তাহা হইলে তাহার আর এক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। সহজে ইহার ধারণা হইবে না বলিয়া একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া বলি। “জানিতাম না—জানিলাম” এই হইল আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধ। যখন জানিলাম, তখন আর অজ্ঞান রহিল না—সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝি। কিন্তু জ্ঞানের কলিত দিক হইতে বিচার করিলে বুঝি, যখন জানিলাম, তখনও

না-জানার সময়ের ব্যৱহারটা কিন্তু জানি; হয় তার অনুবৃত্তি থাকে, নয় তার স্বতি থাকে। তাহা হইলে জানার সময় না-জানাও আমার মাঝে থাকে। এই যে জ্ঞানদশার অজ্ঞান, এক দিক দিয়া বলিতে গেলে ইহা আছে, আবার আর এক দিক দিয়া নাই; হয়ত ব্যবহারে আছে, কিন্তু সার্থকতা হিসাবে নাই। একরূপ স্থলে অজ্ঞানকে সং বলি, না অসং বলি ?

এখন সমষ্টিভাবে ভাবিয়া দেখ, ব্রহ্ম জ্ঞান, অজ্ঞান উপাদান। তিনি যদি উপাদানকে জ্ঞানেন অর্থাৎ অজ্ঞানকেও জ্ঞানেন, তাহা হইলে অজ্ঞান থাকিয়াও নাই অর্থাৎ উহা অনির্কলনীয়। ব্রহ্ম অজ্ঞানেরও জ্ঞাতা; একেই লোকে বলে ভাণ। সংস্কৃতে আছে ভান। অজ্ঞানপ্রসূত জগৎটা ব্রহ্মের ভাণ বা ভান। বাহ্য ভাণ, তাহা থাকিয়াও নাই।

তার পর অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক। প্রকাশের উপর আৱরণ পড়াই হইল গুণসঞ্চার। অজ্ঞান যে ভাববস্তু, এই বিচারেই বুঝিয়াছি, তাহার 'সূর্যের বা জমাটবাঁধার' একটা তার-তম্য আছে। বাহ্য স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া নাই হইয়া যায়, আবার নাই হইতে স্থূলে ফুটিয়া উঠে, তাহার ব্যবহারকে বলি পরিণাম। যদি প্রত্যক্ষদর্শন নিম্ন আলোচনা করি, তাহা হইলে বলিব—স্থূল আছে—উহাই প্রতীতিগ্রাহ্য সত্তা; ক্রমে ফাঁকা হইয়া উহা প্রত্যয়ে পৌছাইলে নাই হইয়া যায়। কিন্তু তখনও উহা থাকে, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই যে স্থূল, ইহাকে বলি তমঃ, আর স্থূলের অভাব প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে

সূক্ষ্ম সত্তা, তাহাকে বলি সমঃ। মাত্মের স্পন্দন-টুকু রমঃ। অজ্ঞান যদি ভাবভাবের পরিণাম-ব্যাপার হয়, তাহা হইলে তাহা যে ত্রিগুণাত্মক, তাহা বুঝিতে তো বেগ পাইতে হয় না।

একপে এই লক্ষণ গুলি মিলাইয়া বুঝিতে হইবে অজ্ঞানে ও জ্ঞানে বিরোধ কোথায়। অজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের অভাব বুঝিব না, তাহা হইলে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং অভাব অজ্ঞান ও জ্ঞানের বিরোধের চেতন নয়। অজ্ঞান স্বতন্ত্র একটা জ্ঞান, যেমন পূর্জ্ঞান; আর জ্ঞান স্বতন্ত্র পরমার্থী জ্ঞান—এইরূপ বলাও চলে না। কেননা তাহা হইলে অজ্ঞানকে অসং বলিবার উপায় থাকে না; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ফলের দিক দিয়া ব্যবহারদশাতে অজ্ঞান একেবারে অসং হইয়া যায়। সুতরাং উত্তর-জ্ঞানবিরোধী পূর্জ্ঞান, ইহাও অজ্ঞানের লক্ষণ নয়। অজ্ঞান পরিণাম, উহা ত্রিগুণাত্মক অতএব উহাকে মিথ্যাও বলা চলে না। সুতরাং মিথ্যাত্ব নিরাও জ্ঞান-অজ্ঞানে বিরোধ নয়। তাহা হইলে আসল বিরোধ কোথায় ? অজ্ঞান জ্ঞানের অপনোত্ত—ইহাই উভয়ের বিরোধ। জ্ঞান অজ্ঞানকে হটাইয়া দেয়—একেবারে নাস্তিও করে না, স্বাতন্ত্র্য মানিষ্ট বিরোধ করে না, মিথ্যাত্ব বলে না। জ্ঞানে জগৎ নাই, না স্বতন্ত্র ভাবে বিরোধী হইয়া আছে, বা মিথ্যা—ইহার কোনটাই বলা চলে না। জ্ঞান হইলে জগতের কাঠামো থাকে, কিন্তু তাহার ভাবার্থ, বলাইয়া যায়। জ্ঞানজ্ঞানের বিরোধ, ফলিত বিরোধ—একেবারে নিছক বলনা নয়, নিরেট বিরোধও নয়। (৩০)

## রাস

—:~:—

প্রেমের শ্রোত বয়ে চলেছে জগতে, তার মাঝে রিরংসা যেন একটা পাকের মত। ওরে মাঝি, ওইখানে সাবধান হবি। কামের আদিত্তে অনাদি প্রেমের শ্রোত; যে ভাগ্যবান তাকে উৎরে এসেছে, সে জানে তার অন্তেও অনন্ত প্রেমের শ্রোত। মাঝে শুধু ওই একটা আবর্ত। আবার বলি, মাঝি, ওইখানে হুঁসিয়ায়।

রিরংসাতে সুখ আছে, এও সত্য—আবার কুশলনের জালা আছে—এও তো সমানভাবে সত্য। যে সুখ ক্ষণিক, অবসানে তার হঃখ থাকবেই। যে সুখ পেতে আয়োজনের প্রয়োজন, তা খণ্ডিত হবেই। আয়োজনের অপেক্ষাই কাম জাগিয়ে তোলে, মইতো সুখ তো সর্বত্রই সমান।

কাম অভাব, প্রেম স্বভাব। তাই রিরংসা অনিত্য, তার আদি অন্ত আছে, বশেই জুড়াও আছে। আর প্রেম নিত্য—আনন্দ প্রেরণায় সমুজ্জল। লৌকিক জগতে যা দেখছি, তারও একটা ধরাটুকু আছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়লে অভাব বোধ থাকে না। রিরংসা হতে তখনই মুক্তি।

পরমার্থতঃ একটা-ভোক্তৃভোগ্যভাব আছে জগতে—তাই হল ঐচ্ছিক। সে ভাবের মূল আছে অসীম বিস্তার। ক্ষুদ্র ভোগে তার আভাসমাত্র প্রতিফলিত হয় বলে মূখের মাঝেও ঐচ্ছিকের ফলন হয় বেজে ওঠে।

অজ্ঞ যদি তোমার মাঝে রিরংসা জুগে,

তবে তার তৃপ্তিতে ক্ষণিক আনন্দ লাভ হবে। কেননা এই একটা দেহ দিয়ে ভোগ করা তো! তার আর ক্ষমতা কতটুকু? আজ তোমার কাম চরিতার্থ হল, কিন্তু তাতে জগতের সকল নরনারীর তো হল না। তাই রিরংসা থেকেই গেল; কেননা তুমি দেহে বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মায় যে নিখিলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তুমি কামতর্পণে দেহকে তৃপ্ত করলে, কিন্তু আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তি তো হল না।

একটা দেহ বা মনের ভোগে যে কোনও দিন তৃপ্তি আসে না, তাতেই প্রমাণ হয়—আত্মা বিভূঁ অন্তর্ঘ্যামিরূপে তিনি বিশ্বের সকল রমণস্থলের আশ্রয় অনুভব করছেন। যদি কাকুনায় অন্ধ হয়ে মোহের চর্চনায় শুধু এই একটা দেহের ক্ষণিক উত্তেজনা দিয়ে তাঁর তর্পণ করতে যাও, তিনি খুসী হবেন না। এই জ্ঞাত প্রাকৃত ভোগে মাহুষের কখনও কামনা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

ক্ষুদ্র আহারে যে রিরংসা মিথ্যা ও ক্ষণিক, তাকে বিশ্বময় ব্যাপ্তি করে, দাও—প্রাকৃতি-পুরুষের অনাদিসিদ্ধ মিথুনানন্দ উল্লসিত হয়ে উঠবে। ভাল কথা। কিন্তু সে আনন্দ ধারণা করবে কে? এট ক্ষুদ্র দেহ, এই ক্ষুদ্র মন? না। তাহলে তো ওদের তর্পণেই বিধেধরের তর্পণ হত—প্রাকৃত নরনারীর কাম লীলায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের রাসলীলা হত।

তাই সেই নিখিলগ্যাপী মিথুনানন্দকে

ধারণা করবার জন্যই বেদান্তের সাধনা—  
প্রাকৃত দেহ-মন বুদ্ধির নিরাসন। ক্ষুদ্রত্ববোধ  
চলে গেলে বুড়তের রজতুমিতে তখন রাসলীলা  
স্বরূপ হবে।

সেই রাসলীলায় ক্ষুদ্র অহং-এর যে অধি-  
কার, তাই দ্রষ্টব্য ; আর ভূমায় যে অধিকার,  
তাই ভোক্তব্য। সেখানে দর্শনই ভোগ, তা  
মানি। কিন্তু দর্শনের যে রিক্ততা, তা অহং-  
এর পক্ষে ; আর তার যে বিলাস, তাই ভূমার  
আনন্দ। এই জ্ঞান ছাড়াই ভেদের করণ  
করছি।

আনন্দরূপী কেন্দ্রবিন্দু তখন রিক্ত, কেননা  
নিরাটকে ভোগ করবার সামর্থ্য তার নাই।  
এই রিক্ততাকে পরমশূন্য মনে করে নির্কোণের  
ভয় পায়, জানে না যে আমিত্বের পাত্র রিক্ত  
করে ভূমা আনন্দের স্বধায় তা পূর্ণ করে পান  
করছেন।

যাকে আমরা বলছি দর্শন, ভূমার তাই ভোগ ;

এই মন যে দেখছে, তাই হল অবাঙ-  
মানসগোচরের ভোগের রীতি ; নইলে  
মনের দেখার কি আনন্দ হত ? সুতরাং দ্রষ্টব্য  
আর ভোক্তব্য পরমার্থতঃ ওতপ্রেত হয়ে  
আছে। তাঁই জীব শিব—অদ্বৈত—ভেদে  
অভেদ।

খণ্ডজগতে রিরংসা সত্য হতে পারে না।  
তোমার মাঝে এখন রিরংসা আছে, কিন্তু  
আমার মাঝে হয়ত নাই। তা হলে পূর্ণ অল্প-  
ভূতি পেতে হলে শুধু তোমার রিরংসাকে ধারণা  
করলে তো হবে না, আমার মাঝে যে অভাব  
আছে, তাও তো ধারণা করতে হবে।  
তা হলে ভাবে অভাবে বিরোধ লেগে যার।  
উচ্চকোচীতে সংশ্লেষণ না হলে এর মীমাংসা  
হবে না। এমনি করে ক্রমেই উপরে গেলে  
চরমে সেই পরিপূর্ণ রিরংসার অকল্প স্বধাত্রোতর  
সন্ধান পাবে—যা নাকি প্রকৃতি-পুরুষের নিত্য  
বৃন্দাবনলীলার অনন্ত রসোদগার।

## ব্যাকুল

সঙ্গীহীন রাত্রদিন কত যুগ ধরে  
এমনি কেটেছে মোর ; তপ্ত ভাল পরে  
একটি চুমার লাগি কৈদেছে পরাণ,  
মাতৃস্নেহবুভুক্ষিত কিশোর সমান।  
হারিয়েছি শৈশবের শিশিচন্দ্র নির্ভর,  
সুখ-দুঃখে সমস্ত্রোত আনন্দ নিকর  
ঝরে নাহি পড়ে আর ; অশান্ত এ হিয়া  
মর্ম্মদাহে ব্যথাতুর ফিরে ফুকারিয়া—  
কারে চাই ? পাব কোথা ? বুঝিনাযে কিছু

কেন তবু ছুটে যাই আলোয়ার পিছু !  
অজানা ভাবনারাশি যদি মূর্ত্তি ধরি  
ওঠে ফুটি, সর্ববদেহ উঠিবে শিহরি  
চকিত বিশ্বময়ে ভয়ে ; ফুটিবেনা কথা,  
ভুলে যাব সুখ-সুপ্ন, ভুলিবনা ব্যথা !  
যারে চাই, অজানা সে রহস্য এমনি,  
নয়নে লুকায়ে থাক নয়নের মণি ;  
তারি আলো যুচাইবে জগতের কালো,  
তবু তারে দেখিব না—এই মোর ভালো !

## নাগিলা



বহুকাল পূর্বে মগধ দেশে আৰ্য্যবান্  
রাষ্ট্রকূট ও রেবতী নামে এক দম্পতী বাস  
করিতেন। ভবদত্ত ও ভবদেব নামে তাঁহাদের  
দুইটা পুত্র ছিল। ভবদত্ত যৌবনেই জৈনাচার্য্য  
সুস্থিতির নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া  
শুরুসেবার আশ্রয়নিয়োগ করেন। একদিন  
ভবদত্তের এক গুরুতাই আচার্য্যের নিকট  
বলিলেন, “প্রভু, বাড়ীতে আমার এক ছোট  
ভাই আছে, সে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে।  
অনুমতি করিলে একবার বাড়ীতে যাইয়া  
তাহাকে আপনার চরণে আনিয়া সঁপিয়া  
দিতাম।” আচার্য্য সুস্থিতি বিরুদ্ধি না করিয়া  
আর এক জন শিষ্যসহ তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া  
দিলেন।

শিষ্যটা বাড়ী আসিয়া দেখে, তাইয়ের  
বিবাহ উপস্থিত—উৎসবের কোলাহলে গৃহ  
মুগ্ধরিত। ছোট ভাই বিবাহের আনন্দে এতই  
উন্মত্ত যে একবার দাদার খোজখবর করাও  
প্রয়োজন মনে করিল না। শিষ্য মর্দ্যাহত  
হইয়া ফিরিয়া আসিল।

শুরুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন  
এই কাহিনী বর্ণন করিল, তখন ভবদত্ত বিজ্র-  
পের সুরে বলিলেন, “আহা, তোমার ভাইটাই  
দেখিতেছি নিতান্ত গোঁয়ার। বিবাহের আমদে  
কি সাধুব শুরুস সংকার করিতেও ভুলিয়া  
যায়?” কথাটা সকলের কাছে ভাল লাগিল  
না। এক জন স্পষ্টই ভবদত্তকে বলিল, “ভাই,  
ভুলি যে জানী ও পণ্ডিত, সে কথা আমরা

জানি। তোমারও নাকি একটা ছোট ভাই  
আছে। একবার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে  
সাধু বানাইবার চেষ্টা করিয়া দেখ না। পরের  
সমালোচনটা তখন মুগ্ধরোচক হইত।” ভবদত্ত  
একটু বক্রকটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা,  
মগধে যদি কখনো যাই, তখন দেখিয়া  
নিও।”

কিছু দিন পর ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য্য  
সুস্থিতি ভবদত্তের বাসগ্রামের কাছে উপস্থিত  
হইলেন। পূর্বে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভবদত্ত  
শুরুর কাছে একবার গৃহে যাইবার অনুমতি  
চাহিলেন। সুস্থিতি শিষ্যকে চিনিতেন, তাই  
সঙ্গী বিনা তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভবদত্ত বাড়ী আসিয়া দেখেন, ভাইয়ের  
বিবাহ উৎসব। জ্ঞাপিতবন্ধুরা তাঁহাকে পাইয়া  
আরও উল্লসিত হইয়া উঠিল। ভবদত্ত বলিলেন,  
“তোমরা এত ব্যাপারে ব্যস্ত আছ, আমি  
স্থানান্তরে যাই।” কিন্তু তাঁহাকে কেহই  
ছাড়িতে চাহিল না। ভবদেব তখন অন্তঃপুরে,  
কুলাচার অনুযায়ী নববধূ নাগিলার প্রসাধন  
করিতেছেন—সুগন্ধি কুলের মালা পরাইয়া  
কপালে চন্দনলেপ দিয়া কস্তুরীর তিলক  
রচনা করিয়া দিতেছেন, এমন সময় খবর  
আসিল, ভবদত্ত আসিয়াছেন। ভবদেব  
আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া চলিলেন, অর্দ্ধ-  
প্রসাধিত নববধূর বুক হুক হুক করিয়া উঠিল।  
সখীরা বলিল, “একটু পরেই না হয় যাও,  
সাজটা শেষ করিয়া দিয়া যাও, নহিলে অকল্যাণ

হইবে।" ভবদেব "এখন আসিতেছি" বলিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেলেন।

বাহিরে আসিয়া ভবদত্তের তেজঃপূর্ণ সোম্যমুষ্টি দেখিয়া ভবদেব মস্তমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলেন। ভবদত্তও একটা কথা না বলিয়া ভিক্ষাপাত্রটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া আসিলেন। কোতুলবশতঃ অনেকেই ভবদত্তের পিছনে পিছনে চলিল, বিমূঢ় ভবদেবও চলিলেন। ক্রমে সকলেই ফিরিয়া আসিল, কেবল ভবদেব ফিরিতে পারিলেন না, কেননা তাঁহার হাতে দাদার ভিক্ষাপাত্র। কি জন্ত দাদা উহা দিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কোনও প্রশ্নও করিলেন না।

এতক্ষণ ভবদত্ত নির্ঝাঁক ছিলেন। এইবার ভাইয়ের সঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখের কথা উঠাইলেন। ভবদেবের বৃকের বোঝা অনেকটা হালকা হইয়া গেল। কথায় কথায় দুই ভাই আচার্য্য স্থিতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ভবদত্তের পিছনে বরবেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভবদেবকে দেখিয়া গুরুভাইয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ভবদত্তের অধরকোণে চকিতের মত একটী 'স্বপ্ন' হস্ত রেখা খেলিয়া গেল।

আচার্য্য স্থিতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবদত্ত, এ যুবক কে?" ভবদত্ত বলিলেন, "মহারাজ, এ আমার ছোট 'ভাই, আপনাদ শরণাগত।" বলিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে ভবদেবের মুখের দিকে তাকাইলেন। স্থিতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইবে?" ভবদেবের হৃদয়ে তখন তুমুল বড় বহিতেছে। নববধু নাগিলার শঙ্কাব্যাকুল করুণ আঁখি দুটা তেঁ তিনি ভুলিতে পারিতেছেন না। ভবদেবের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি তেমনি

প্রশান্ত সোম্যদৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। সে দৃষ্টি ভবদেব সহ্য করিতে পারিলেন না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার তাই সন্ন্যাসী, মিথ্যাবাদী নন।" দীক্ষা হইয়া গেল।

আত্মীয়-স্বজনেরা ছুটিয়া আসিল, বলিল, "নববধুকে অমন করিয়া কেলিয়া আসা কি তোমার উচিত, হইয়াছে? কে তোমাকে এ কুবুদ্ধি দিল?" ভবদেবের গর্ভে আত্মসম্বরণ কল্প কষ্টকর হইয়া উঠিল, তথাপি ভাইয়ের গোঁরব রাখিবার জন্ত তিনি চুপ করিয়া সমস্ত বাক্যবর্ষণ সহ্য করিলেন। সকলে আসিয়া ভবদত্তকে ধরিল, ভবদত্ত বলিলেন, "ভবদেব নির্ঝোঁধ নহে। তাহার ব্রতে আমি বিঘ্ন ঘটাইব কেন?" নিরাশ হইয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া গেল।

কালক্রমে ভবদত্ত প্রারোপবেশনে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। ভবদেব তখন যৌবনের প্রান্ত সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এখনও নাগিলাকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। সন্ন্যাস, তাঁহার জঁপিত 'ছিল না, শুধু ভাইয়ের মান রাখিবার জন্ত তিনি এ পথে আসিয়াছিলেন। ভবদত্তের মৃত্যুর পর তিনি ভাবিলেন, "শুধু দাদার আগ্রহে এ বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুতে এখন আমি মুক্ত। নাগিলার সেই কাতর দৃষ্টি তো এখনও ভুলিতে পারিলাম না। সেই অভাগিনীও কি আমাকে ভুলিতে পারিয়াছে? দূর হোকু ছাই, আর কতকাল এমন-করিয়া অলিয়া পুড়িয়া মরিব? দেখি, যদি নাগিলা, এখনও বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহাকে লইয়া আবার সংসারী হইব।"

এই মনে করিয়া ভবদেব একদিন চুপি

চুপি আশ্রম ছাড়িয়া নিজগ্রামে আসিয়া এক  
দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। গ্রামে আসিয়া  
প্রথমেই দুইটা স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ  
হইল। সন্ন্যাসী দেখিয়া ভাঙার। তাঁহাকে  
যথেষ্ট আপ্যায়ন করিল। ভবদেব তাহাদিগকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই গ্রামে আর্যশাসন  
রাষ্ট্রকূট ও তাঁহার স্ত্রী রেবতী দেবী বাস  
করিতেন। তাঁহারা এখনো বাঁচিয়া আছেন  
কি?” এক জন স্ত্রীলোক উত্তর করিল, “না,  
বহুদিন হইল, তাঁহারা স্বর্গবাসী হইয়াছেন।”  
অপর স্ত্রীলোকটা ভবদেবের কথা শুনিয়া  
যেহেতু অনিশ্চয়তায় তাঁহার দিকে চাছিল—  
ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিলে ভবদেব কি মনে  
করিতেন বলা যায় না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “তাঁহার পুত্র ভবদেব বিবাহের দিন  
স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, সেটা স্ত্রী কি এখনও  
বাঁচিয়া আছে?”

এইবার দ্বিতীয়া নারী কথা কহিলেন,  
স্বিঃদৃষ্টিতে চাছিল বলিলেন, “আপনিই কি  
সেই ভবদেব?” বোধ হয় তাঁহার কণ্ঠস্বর  
একটু কাঁপিয়া গেল। ভবদেব বিস্মিত হইয়া  
বলিলেন, “হাঁ, আমিই ভবদেব। তুমি কে?  
তুমি কি আমার নাগিলা?” নাগিলা এ কথা  
কোনও উত্তর করিলেন না—আঁচলে চক্ষু  
চাপিয়া অনশ্রুসুদী হইয়া রহিলেন। ভবদেব  
বাগ্ৰভায়ে উঠিয়া প্রসারিত করে হৃৎ পা সম্মুখে  
অগ্রসর হইয়াই আবার গমকিঞ্চ দাঁড়াইলেন।  
উদগত অক্ষ মুচ্ছিয়া নাগিলা শাস্তিকণ্ঠে প্রশ্ন  
করিলেন, “তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?”  
ভবদেব ভয়কণ্ঠে বলিলেন, “এ কথাও জিজ্ঞাসা  
করিতে হয়, নাগিলা? তোমাকে ভুলিয়া  
কোথায় গিয়া আমি স্বস্তি পাইব?”

সাক্ষী নাগিলার চক্ষু দুই দুঃসহ তেজে  
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিরস্কার করিয়া তিনি  
কহিলেন, “হুঃ, তুমি এত হৃৎকল, তাহা তো  
মানিতাম না? তুমি আমাকে সংসারমুখের  
অধিকারিণী কর নাই বটে, কিন্তু তোমার  
অপূর্ণ ভাগ্যের গোরবে আমি যে চিরগমনি  
ছিলাম। আজ ব্রতভঙ্গ করিয়া তুমি আমার  
চিরদিনের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া দিতে আসিয়াছ—  
কেন, আমি তোমার কি করিয়াছি? আমাকে  
তুমি ভোল নাই, সে আমার পরম গর্বের  
কথা; কিন্তু সে আমি কি এই রক্তমাংসের  
খাঁচাটা, যে এতদিনের সংগ্রাম ভুলিয়া ইহারই  
কাছে ছুটিয়া আসিয়াছ? বাহিরে তোমাকে  
হারা হইয়া অন্তরে যে আরও নিবিড়  
করিয়া পাঁহিয়াছ; দীর্ঘ তপশ্চর্য্যার প্রেমের  
এই রহস্যও কি তুমি বুঝিতে পারিলে না?  
বিবাহ-বাসরে যে প্রবর্তা কামের বন্ধন ছেদন  
করিয়া প্রেমের সিংহদ্বার আমাদের সম্মুখে  
মুক্ত করিয়া দিলেন, তুমি তাঁহাকে ভাই  
বলিয়া জান, কিন্তু আমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া  
যানি। আজ এসনি করিয়া তুমি তাঁহার  
স্নেহের অপমান করিলে?”

ভবদেব, অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।  
যুগপৎ পরিত্যক্তবোধে ও অশ্রুশোচনার  
মানিতে তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।  
নাগিলা উন্নতকণ্ঠে বলিলেন, “তুমি গুরু  
কাছে ফিরিয়া যাও। আবার যদি কখনও  
জান: এত গ্রামে আসিয়াছ, তাহা হইলে  
আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়া মরিব।” এই বলিয়া  
সাক্ষী ঘরপদে নরনের অন্তরাল হইয়া গেলেন  
—একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না, ভবদেব  
সেখানে আছেন কি না।

ভবদেব আবার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন  
এবং কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা হৃদয়ের হৃৎকল  
বাসনা জয় করিতে ব্রতী হইলেন।



## শিক্ষার টোটকা

—\*—

সরল হলেই সত্যবাদী হবে, এমন মনে করা ভুল। ছোট ছেলেদের সরলতা সন্দেহে এই রূপ ধারণা গোষণ করে অনেক সময় আমরা তাদের ক্ষতি করি। ছোট ছেলে সরল, কিছু বানিয়ে বলতে পারে না, যেমনটা দেখে তেমনটা বলে—এটা একটা স্বাভাবিক গুণ হলেও শিক্ষার দ্বারা এরও উৎকর্ষ প্রয়োজন। সরল বলে যেমন ওরা বানিয়ে বলতে পারে না, তেমনি একটা ঘটনাকে ঠিক ঠিক দেখতেও পারে না। সুতরাং একটা ঘটনাকে সংস্কার দিয়ে বিবৃত করে দেখা বড় পক্ষে যেমন ঘোষণা, ছোট পক্ষেও তাই। ছেলেরা পরস্পরের নামে নালিশ করে। অভিযোগ করে মিথ্যা নালিশ না করলেও গিফক লগ্য করে দেখবেন, অধিকাংশস্থলেই ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝে, তারা অভিযোগ করতে পারে না। এ স্থলে অভিযুক্তের কথা নিছক সত্য মেনে বিচার করতে গেলে অভিযুক্তের মনে একটা ক্ষোভ জন্মে এবং উভয়ের মাঝে অমিলের সূত্রপাত হয়। এই জন্ত নির্দিষ্টচারে ছেলের কথা মেনে যাওয়াতে ওদেরই ক্ষতি হয়। যে সরলতাবশতঃ ওরা সত্য বলে, ঠিক সেই আদিম সংস্কারমূলক সরলতাবশতঃ ওরা মিথ্যাও বলে। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ওদের সত্য মিথ্যার তুল্য মূল্য। কেমন করে সত্য কথা বলতে হয়, সত্য করে দেখতে হয়, তাও শিখাতে হয়; আর যিনি এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করে দেখেছেন, তিনিই জানেন, ব্যাপার কত সোজা নয়।

✱

একটা ছেলের সামনে আর একটা ছেলেকে উগ্রভাবে শাসন করলে অনেক সময় ওদের বিশেষ বকম ক্ষতি হয়ে যায়। উগ্র শাসনে মাত্রা ঠিক থাকে না—অপরোধটা হয়ত আসলের চেয়ে বাড়িয়ে তোলা হয়। তেলেদেঁরও সুনাম দুর্গামের একটা মূল্য আছে। সকলের সামনে একটা ছেলেকে অপমান করে আনাড়ী শিক্ষক অনেক সময় একটা হিংস্র তৃপ্তি অনুভব করে বটে; কিন্তু অযথা একটা ছেলের সুনামের ক্ষতি করে, তাদের সমাজে তাকে একঘেঁষে করে তান উন্নতির পথে যে সে কতটা রুদ্ধ করে দেয়, সেটাকে খেয়াল করে? তোমার বিচারে প্রতিপন্ন হল, অমুক ছেলেটা নিম্নেট মিথ্যাবাদী; এই ধারণাটা তার সঙ্গবাসীদের মাঝে প্রচার করে একে তো অপরের সহানুভূতি হতে তাকে বঞ্চিত করলে, তা ছাড়া ক্রূপর ছেলেগুলির মাঝে একটা কুসংস্কার ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সত্যাবচারণের ক্ষমতাকেও পঙ্গু করে ফেললে। দুর্গাম মানুষে সহজে বিশ্বাস করে, এমন সে ছেলেই হোক, আর বুড়োই হোক; নিন্দা করা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি; পাপের সঙ্গে পাপীকে যুগা করাও স্বাভাবিক। শাসনের সময় শিক্ষক হুঁসিয়ার থাকবেন, তাঁর ব্যবহারে এক সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি যেমত ছাত্র সমাজে জেগে না ওঠে। দশটা ছেলের সামনে একটা ছেলেকে প্রচণ্ডভাবে শাসন করে তাকে একটা character করে তোলা অধিকাংশ শিক্ষকের একটা বদভ্যাস।

✱



অপরের সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় কি রকম ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন, এ বিষয় শিক্ষক নিজেও ভাববেন, ছেলেকেও শেখাবেন। আমাদের নীতিশাস্ত্রে দোষগুণ সকলেরই এক একটা সংজ্ঞা আছে। সবাই জানেন, দার্শনিক সংজ্ঞাগুলি ব্যাপক—প্রতিপাত্ত বিষয়ের অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ থাকা সত্ত্বেও একই নামে তাদের পরিচিত করা হয়। গুণের সংজ্ঞা এমন ব্যাপক হলে তার ব্যবহারে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু দোষের ব্যাপক সংজ্ঞাগুলিকে নির্দিষ্টারে ব্যবহার করাতে ক্ষতি আছে। একটা উদাহরণ দিই। ছেলেদের মাঝে গুনতে পাবেন, সামান্য কারণেই এ ওকে হরত মিথ্যাবাদী বলছে, কিম্বা চোর বলছে—আর তাই নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে। আমরাও কখনও তাদের লোভী, হিংস্রক ইত্যাদি সংজ্ঞায় আপ্যায়িত করছি। এতে অনেক সময় যে দোষটা তাদের মাঝে মূহূর্ত্তাব্যে আছে, নামের সম্মোহনে তাকে প্রবল করে তোলা হয়। “ও না জেনে বলেছে,”—আর “ও মিথ্যাবাদী”, “ও না বলে নিয়েছে, আর “ও চোর”—এই দুই গ্রন্থ কথার মানসিক প্রভাবে চোর তফাৎ আছে। দোষের সংজ্ঞা ব্যবহার করলে অনেক সময় ওটা যেন চরিত্রের ওপর হুমকী হয়ে বসে যায়। এতে যে সংজ্ঞা ব্যবহার করে, তারও যেমন চিন্তা, দুঃখ হয়, তেমনি যার প্রতি ব্যবহার করা হয়, তারও ক্ষোভের কারণ ঘটে। তা ছাড়া এতে সত্যপ্রকাশের বাধা তো আছেই। দোষের সংজ্ঞা ব্যবহারে ভাবার দিক দিয়ে সুবিধা আছে বটে, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে ক্ষতি তার চেয়ে ঢের বেশী। সংজ্ঞা একটা নিরেট

বস্তু, তার মাঝে ক্ষমার অবকাশ নাই। কিন্তু সেই সংজ্ঞার প্রতিপাত্ত বিষয়ই যদি কেউ কথায় ভেঙ্গে প্রকাশ করে, তাহলে ক্ষমা করবার, ভালবাসবার একটা পথ পাওয়া যায়। ওপরের দুই একটা উদাহরণ নিয়ে বিচার করে দেখলেই শিক্ষক এটা বুঝতে পারবেন। এই অল্প বলি, অভিযোগের ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষক খুব সাবধান হবেন।

✱

“এইটে করিসু”—এই বলে ছেলেদের ওপর কাজের ভার দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি, আর হিসাবমত কাজটা না পেলেই চটে যাই—শোধ নেবার ইচ্ছাটা মনের মাঝে অদম্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এ জায়গায় ভেবে দেখা উচিত, শিশুমনের পক্ষে আমার নির্দেশ মত কাজ করবার কি কি বাধা ছিল। হরত আদেশের চেয়েও রুচিকর আর একটা কিছুতে তাকে আকর্ষিতকৈ আকর্ষণ করে নিয়েছে। আমিষবোধ যাদের ভাল করে জাগেনি—তাদের এমনি মন ছটকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বভাব শোধরান কি শাস্তি দিয়ে?—না। বরং তাতে কাজে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তিটাই বেড়ে ওঠে, কেননা তার মন দোটার মত মাঝে—স্বভাব আর শাসনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে স্বভাবটাই তার মাঝে জয়ী হবে। শেগাতে হবে কত সন্তর্পণে। কাছে বলে, প্রাণ বুঝে, কাজের ভাগ নিয়ে তবু রুচি জাগাতে হবে। নইলে ব্যস্ততার অবকাশে হ’ একবার খবরদারী করেই যদি ভাবি, আমার হুকুম তামিল করতে ছেলে বাধ্য—তাহলে সে ভুলের দরুণ আশাতঙ্গের মনস্তাপ ভুগতেই হবে।

## ভক্তির লক্ষণভেদ

বস্তুমাত্রের শুধু স্বরূপতঃ আশ্বাদযোগ্য, অতএব অনির্লব্ধনীয়। আশ্বাদন আমার নিজস্ব অনুভূতি; অপরকে তাহা বুঝাইতে গেলে মূল ছাড়িয়া বাধা চাইয়া অবাস্তুর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়। মূলেব অভিযাজক এই অবাস্তুর প্রসঙ্গকেই বলা যায় লক্ষণ। এই লক্ষণ বিচারেই শাস্ত্র পরিপূর্ণ। নহিলে আসল কথা কি কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে? পরমবস্তুকে কি শাস্ত্র কখনও প্রকাশিত করিতে পারে?

তাহা হইলে শাস্ত্রের কি প্রয়োজনীয়তা নাট? আছে। বাহ্যিক মূল ধরিতে পারে না, তাহাদিগকে স্থূল পরিয়া বুঝাইতে হয়; জ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনা চাইতে অজ্ঞেয় বস্তুর উদ্ভিত বুঝিয়া লইতে হয়। এটীক্স সাধকের পক্ষে শাস্ত্রোপদেশ বা শাস্ত্রবিদ্য 'অসীম উপযোগিতা। বিধিকে অক্ষরশঃ অনুসরণ করিয়া গেলে তদাভিযাজ্য তব্ধের ক্ষুরণ হইবে, ইহা অযৌক্তিক নহে। ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণবিচারে বর্তমান প্রবন্ধে 'আমরা এই আরোহপ্রণালীরই অনুসরণ করিব।

প্রেম বা ভক্তি প্রাণের টান। প্রাণের টান প্রাণে প্রাণেই বোঝা যায়—কথায় বা কাজে কখনও সঙ্কেতিত হইলেও হৃদয়ের মাঝে তাহা চিররহস্তে ঢাকাই থাকিয়া যায়। মুখে অনুযোগের কথা ফুটিয়া বলে না, আচরণে তাহা প্রকাশ করে না, তবু প্রাণ উবারিয়া ভালবাসে—এমনটী কি হয় না? তাহা হইলেই

তো বুঝি, ভালবাসা, কৰ্ম্মের অতীত, মনোনাশীণ অতীত।

গুণবিক্ষোভশূন্য অন্তঃস্বরী প্রীতি যদিও বা স্বরূপবস্থা হয়, তথাপি প্রাকৃতজগতে তাহার গুণময় ক্ষুরণ দেখা যায়। আশ্রয়ভেদে ইহার প্রকারভেদ হয়। ভক্তিমার্গের ঋষিরা ভক্তির গুণময় ক্ষুরণের বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করিয়া ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন।

ভক্তিপথের আচার্য্যদিগের মধ্যে ব্যাস, গর্গ, শাণ্ডিলা ও নারদ—চারিজন ঋষি ভক্তির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে ভক্তির ক্রমিক বিকাশের ধারাটী সুন্দররূপে বোঝা যাইবে।

মহর্ষি ব্যাস বলিতেছেন—তৎপূজা-দিসু অনুরাগঃ, ইহাটী ভক্তির লক্ষণ। এই লক্ষণটী বুঝিতে, হইলে ভক্তি বা প্রেমের মূল তত্ত্ব যে আত্মসমর্পণ, এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্বত্রই আমাকে সঁপিয়া দিয়াই অনুরাগের চরিতার্থতা বটে; কিন্তু আমি বলিতে কি বুঝি, তাহা ধরিয়া তবে সমর্পণের 'উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিরূপিত হইবে।

'আমি' বলিতে সাধারণ বুদ্ধিতে একটী বিন্দুমাত্র বুঝি, কিন্তু ব্যবহারে 'আমি' বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অহং-তা ও মমতা যতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, ততটুকুই বান্তবিক 'আমি'—কেত্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সপটাই 'আমি'—এই আমার রাজ্য বৈচিত্র্য আছে, বিরোধও আছে; ইহা হইতেই কৰ্ম্মের স্রষ্টি।

কেবল আমাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম কবিলে উহা বাসনার বেগবশতঃ নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি করিবে এবং কর্মানুযায়ী সুখ-দুঃখের বিচিত্র আনন্দন আমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাতে অহরহ-বিরাগ অবশ্যস্তাবী এবং তাহার ফলে বিচিত্র সংঘাতজনিত অস্বস্তিও অপরিহার্য। অথচ কর্মমূলা বাসনা দ্বারা অহং সম্পূর্ণরূপে গ্রস্ত থাকায় কর্মপ্রবাহ মোহ করিয়া অস্বস্তি হইতে অব্যাহতি পাও-য়ায়ও কোনও উপায় দেখি না।

কিন্তু উপায় আছে। সে উপায় কর্মকে অহং লক্ষ্য হইতে পরাবর্তিত করিয়া হং লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। ইহাই পূজা বা সেবা। “হং করোমি, জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্”—ইহাতেই পূজার সার্থকতা। কর্ম করিতেই হইবে; কিন্তু যাহা করি, তাহা তোমারই পূজা—এই ভাব চিন্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে পূজার সার্থকতা—ভক্তির আত্যাত্তিক স্ফূরণ।

কিন্তু সমস্ত কর্মকেই এইরূপ সেবাপূজার রূপান্তরিত করা সাধনসাপেক্ষ। এই জ্ঞাত্ত্ব বিধি অনুযায়ী বাহ্যপূজারও প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য ইহা ভক্তির নিম্নতম অঙ্গ। আমাদের সমাজে অধুনা এই পূজারই প্রচলন বেশী। বাহ্যপূজা আংশিক কর্মসমর্পণ, উহা চিত্তশুদ্ধির সহায়। সংসারের সব কাজই আমার জ্ঞাত্ত্ব, সব উপকরণই আমার তত্ত্ব—জ্ঞাত্ত্ব—ইহার মাঝে একটু কাজ, একটু সেবা, একটু উৎকৃষ্ট উপকরণ ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে তুলিয়া রাখিলাম—ইহাই লৌকিকপূজার তাৎপর্য। কিন্তু এই পূজাতেও যদি অহরহ না থাকে, নিস্তর্গা, গীতানুগতিকতা, বাহ্যভঙ্গর ইত্যাদি প্রবল হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে কতটুকু ভক্তির উদ্দেশ্য হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেহ ও প্রাণ লইয়াই কর্ম করি। ইহাতে উহা সঁপিয়া দেওয়াই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ—ইহাই বাসদেবের মত। এই সাধনার উৎকর্ষে ক্রমে গরম বস্ত্রও লাভ করিতে পারা যায়।

মহর্ষি গর্গ আরও একটু উপরের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, ভক্তি হইতেছে—  
“তৎকথ্যাদিসু অনুরাগঃ।”  
যেমন দেহ ও প্রাণে অভিমান রাখিয়া কর্ম, তেমনি মন ও বুদ্ধিতে অহং অভিমান রাখিয়া শ্রবণ, কীর্তন, চিন্তন ইত্যাদি আন্তর ব্যাপার। যাহারা মানসিক শক্তিশালী, বাহ্য কর্মের অপেক্ষা তাহাদের তত্ত্বা প্রবল নহে। এইরূপ অধিকারীর পক্ষে বাহ্যপূজা না করিয়া শ্রবণ কীর্তনাদির অন্তর্ধানই প্রশস্ত। কিন্তু ইহাতে এমন বৃষ্টি হইবে না যে চরম ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রবণকীর্তনকারী, কর্মী অপেক্ষা বিশেষ কোনও লাভের অধিকারী হইবে। কেবল প্রকৃতি অনুযায়ী অধিকার নিরূপণ করিয়া শাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ফল সম্বন্ধে সকলেই তুল্যভাগী।

তবে আর একটা কথা হইতে পারে। বিভিন্ন ঋষিনির্দিষ্ট পণ্ডুলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সাধন না করিয়া ক্রমানুযায়ী সাধনাও করা যাইতে পারে। যেমন বাহ্যপূজা নিয়মিকারীর পক্ষে প্রশস্ত। উহাতে চিত্তশুদ্ধি হইলে বাহ্য-মুঠানেব লাভলাভ ভাগ করিয়া মানসক্রিয়ার অন্তর্ধানরূপ শ্রবণ, কীর্তনাদির ব্যবস্থা করা হইল। শ্রবণাদিতে চিত্ত উন্নত হইলে শাণ্ডিল্য প্রোক্ত আত্মরতিমূল উপাসনার অধিকার জন্মিল ইত্যাদি। এইরূপে চারিজন ঋষির চারিটা পথকে একই সাধকের সাধনার স্তর অনুযায়ী গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে যে ঋষি যে মত প্রকাশ করেন, তিনি যে সেই মতানুযায়ী চলিয়াই সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া

তবে উহা জনহিতার্থ প্রচার করিয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এইরূপে প্রত্যেকটি পৃথকে স্বয়ংপূর্ণ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মহর্ষি গর্গের পর মহর্ষি শাণ্ডিল্যের অধিকার। তাঁহার মতে ভক্তি আত্ম-স্বাভাবিকোৎপত্তি অনুরাগঃ। ইহা পরম দার্শনিকের কথা। বাহ্যদের মাঝে কর্মস্পৃহা ও দৈহিকলক্ষণের ক্ষুণ্ণি প্রবল নহে, কিম্বা মানসিকভাবাবেগও উদ্দাম নহে, বাহ্যরা বিচারী ও নিবেদী, মহর্ষি শাণ্ডিল্য তাঁহারিগের অধিকার অনুযায়ী ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। ভক্তি সে প্রাণের টান, এ কথা তিন ঋষিই বলিতেছেন। কিন্তু এই টানটুকু কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহা নিয়তি লক্ষণের ভেদ। বাস ও গর্গের মতে প্রাকৃত তত্ত্ব-সমূহের সত্তা স্বীকার করিয়াই তঁহাদের ইষ্টে সমর্পণ করা বা মোড় ফিরাইয়া দেওয়া—ইহাই হইল ভক্তি। আর শাণ্ডিল্যের মতে প্রাকৃততত্ত্ব হইতে নিজকে বিবিক্ত করিয়া সেই শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ লইয়াই অমুরাগের প্রবাহ ছুটাইয়া দেওয়া হইল ভক্তি।

উপনিষদের একটি কথা স্মরণ করিলে শাণ্ডিল্য ঋষির উক্তির তাৎপর্য বোঝা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, “দেখ, জী স্বামীকে ভালবাসে; কিন্তু সে ভালবাসায় বাস্তবিক সে স্বামীকে চায় না, সে চায় নিজকে (ন পতুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মা নস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি)।” এই উক্তিটা জ্ঞানজগতের একটি মহাসত্য। ভাল-

বাসার বহিমুখী প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করিয়া তাহারই অমুরাগে সাধনোপকরণ সঞ্চয় করি। কিন্তু ভালবাসা যতটা বাহিরে যায়, তার শতগুণ যে ভিতরে পায়, ইহা যিনি নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। “গোপী হইতে কৃষ্ণের যত সুখ হয়। তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আনন্দ হয়।”—ইহা অমুরাগের স্বভাব। এই যে কোটিগুণ সুখ, আনন্দ—ইহাই আত্মরতি। ভালবাসায় পরকে যতটুকু আলোকিত করি, তাহার চেয়ে নিজে আলোকিত হই বৈশী। তবে কথা এই, সমর্পণের পথে বাহ্যরা চলিয়াছেন, তাঁহার নিজের কথাটা আমলে আনেন না। কিন্তু বাহ্যরা জানী ভক্ত, বিচারের পথে বাহ্যরা চলিয়াছেন, তাঁহার নিজকে তুলিতে পারেন না। বাহ্যকে তাঁহার আত্মানন্দেরই যুগবিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। আমরাই অন্তরের আনন্দ দিয়া প্রিয়জনকে আমি গড়িয়া তুলিয়াছি—দেহ-মন বুদ্ধির বালাই দূর করিয়া নিজকে যত নিঃশলভাবে অন্তর্ভব করিতে পারিব, প্রিয়-জনকে ততই চিন্মুররূপে দর্শন করিবার অধিকার জন্মিবে। আত্মা দ্বারা আত্মার দর্শন—ইহা শাণ্ডিল্যের ভক্তির চরম। যে ভালবাসে, সেও আত্মা—বাহাকে ভালবাসে, সেও আত্মা।

ইহার পর মহর্ষি নারদোক্ত লক্ষণ বাকী রহিল। ‘এ’ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।



## মুক্ত কে ?

—\*—

[ প্রবক্তা—শ্রীমৎ স্বামী সমর্থ রামদাস ]

কেহ কেহ বলে, “যে অদ্বয় ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, কল্পনা বাঁচার নাগাল পায় না, তাঁহার উপদেশ পাইয়া সেই বস্তু ধারণা করিবারাজেট শ্রোতা তদাকারকারিত হইয়া যাউবে। কিন্তু চৈতন্য পর আবার বৃত্তির উদয়ও তো অবশ্যস্বাভাবী। আলোচনা প্রসঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে আমরা উঁচু উঠিয়া ব্রহ্ম বনিয়া যাই, আবার পরমুহূর্তে বৃত্তি-রাজ্যে নামিয়া আসি। উড়ন্ত পতঙ্গের পায় সূতা বাঁধিয়া দিলে সে উচুতে উড়িয়া যায় বটে আবার সূতার টানে তখনি নীচে নামিয়া আসে। এমন করিয়া আমরাও কি বার বার উঠা-নামা করিব ? উপদেশের সময় যখন তদাকার হইয়া যাইব, তখন নিশ্চয় এই দেহটা পড়িয়া যাইবে, কিম্বা এ আপন, ও পর, এমনতর ভেদভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, “আমি কেবল ব্রহ্মস্বরূপ” এমন কথা বলা লজ্জার বিষয়। ব্রহ্মরূপ হইয়া সে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিবে, এ তো বিপরীত কথা। যে স্বতঃত ব্রহ্মরূপ, সে আবার আসে কি করিয়া ? এই জ্ঞাত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আমাদের ভাল লাগে না। হয় ব্রহ্মরূপে মিশিয়া যাও, নরত সংসারেই থাকিয়া যাও—নতুবা দুই দিক হইতে ধাক্কা খাইবে কত ? অধ্যাত্ম নরূপের চর্চা শোনার সময় জ্ঞান প্রবল হয়, আবার তার পরেই জ্ঞান লয় হইয়া ব্রহ্মরূপকে কামক্রোধে ঘিরিয়া ফেলে। ইহাতে পূর্ণ স্বার্থও মিলে না, পূর্ণ পরস্বার্থও মিলে না। সংসারের কাল

করিবার সময় যদি ব্রহ্মে প্রীতি উৎপন্ন হয়, আবার ব্রহ্মানন্দকে ভোগের সময় যদি গৃহকার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে এট টানা-টানির মাঝে মুখ কোথায় ? ইহাতে চিন্ত বরং আরও চঞ্চল হইয়া যায়। সার কথা এই, ব্রহ্মজ্ঞান আর সংসার এই দুয়ের মাঝে কখনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না।”

আমি ইহাদের জিজ্ঞাসা করি, “যে জ্ঞানী ব্রহ্ম বনিয়া গিয়া কাজকর্ম্ম না করিয়া জড়ের মত পড়িয়া থাকেন, তিনিই তাহা হইলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ? তাহা হইলে বাস-দেবাদি কন্মযোগীরা কি ডুবিয়া গেলেন ?” উত্তরে তাহারা বলে, “বেদ বলিয়াছেন, কেবলমাত্র শুক ও বামদেব এই দুইজন অত্যাঁপি মুক্ত। এই দুইজন ছাড়া আর সকলেই মুক্ত হইয়া আবার বদ্ধ হইয়াছেন। বেদের বচনকে আমরা অশ্রদ্ধা করি কি করিয়া ?”

জিজ্ঞাসা করি, জগতে কেবল এই দুইটা মাত্র মুক্ত পুরুষ ? আমি তো জানি প্রহ্লাদ, পরাশর, অশ্বরীষ ইত্যাদি মহর্ষি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেশ্বর ইত্যাদি দেবর্ষি ও বিদেহ জনকাদি রাজর্ষি ইত্যাদি কত মহাত্মা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। যদি বামদেব ও শুকদেব মাত্র মুক্ত, তাহা হইলে আর সকলেই কি ডুবিয়া গেলেন ? এ তো সূর্যের প্রাণ মাত্র। বলিতে পার, বেদ কি তাহা হইলে মিথ্যা বলিয়াছেন ? আমি বলি, বেদ এই দুই জনকে

কেবল উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—  
কিন্তু সাধারণ লোক পূর্বপক্ষকেই সিদ্ধান্ত  
বুলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। ঋতির জীবোদ্ধারের  
সামর্থ্য রহিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার  
করে। কিন্তু সেই সামর্থ্য কি এই দুই জনের  
উদ্ধারেই নিঃশেষ হইয়া গেল ?

যিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া কাষ্ঠবৎ  
পড়িয়া রহিলেন, কেবল তিনিই মুক্ত, এমন  
কথা বলিলে তুমি নিজেই ঠকিয়া যাওবে।  
কারণ যে শুকদেবকে তুমি মুক্ত বলিতেছ,  
তিনিই নানা প্রকারে সকলের আত্মবোধ  
জাগাইয়া দিয়াছেন। এইটুকু তিনি করিলেন  
কি করিয়া ? বৈদ তাঁহাকে মুক্ত বলিতেছেন  
—বেশ কথা ; কিন্তু তিনি তো ব্রহ্মাকার  
হইয়া সর্বদা উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া  
থাকিতেন না। শুকদেব যোগীশ্বর ছিলেন।  
যদি সর্বদা ব্রহ্মস্বরূপে থাকিয়া জাগ্রদবস্থায়  
আর তিনি ফারিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে  
সারাসার বিচার তাঁহার মুখ দিয়া বাহির  
হইল কি করিয়া ? যে ব্রহ্মস্বরূপ হয়, সেই  
যদি লাকড়ী বনিয়া যায়, তাহা হইলে একদেখ  
পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনাইলেন কি করিয়া ?  
তখন তো তাঁহাকে কত বিষয়ের সারাসার  
বিচার করিতে হইয়াছে, উদাহরণ জোড়াইতে  
চরাচর সৃষ্টি চুড়িতে হইয়াছে। কণেকের  
মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মে অবগাহন করিতে হইয়াছে  
আবার পরক্ষণে সম্পূর্ণ দৃশ্য সৃষ্টি চুড়িতে  
হইয়াছে, কত দৃষ্টান্ত আনয়া নিজের বক্তব্য  
বুঝাইতে হইয়াছে। এই শুকদেবকে বদ্ধ  
বলিলে কে ?

তাহা হইতে এই প্রশ্নাণ তয় যে, সমস্ত কর্ণ  
করিয়াও, কাষ্ঠবৎ পড়িয়া না থাকিয়াও  
সদৃশরূপ উপদেশে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায়।

অগতে কেহ মুক্ত, কেহ নিতামুক্ত, কেহ বা  
জীবমুক্ত, এ কথা খেয়াল থাকে যেন।  
এখানে কেহ যোগী, কেহ বা বিদেহরূপ, কেহ  
বা সমাধানী। দেহাভিমানহীন হইয়া বাহারা  
এই জগতে সচেতন, তাঁহারা জীবমুক্ত, বাহারা  
অচেতন, তাঁহারা বিদেহমুক্ত ; ইহা ছাড়া  
বাহারা যোগীশ্বর, তাঁহাদিগকে নিতামুক্ত  
বলিতে পারি। স্বরূপের বোধ হওয়ামাত্র যিনি  
মুক্ত হইয়া যান, তাঁহাকে তটস্থ বলিয়া  
জানিও। এই তটস্থতা ও শুকতার মাঝে  
দেহসম্বন্ধ কার্যম রহিয়াছে। (শিষ্যের মতে  
স্বরূপবোধ হওয়ার পর নিশ্চয়ই হইয়া যাওয়ারই  
মুক্তির লক্ষণ এবং চলাফেরা বন্ধের লক্ষণ।  
কিন্তু সদৃশরূপ মতে চলাফেরা করা বা শুক  
কিন্তু তটস্থ থাকা—এ সমস্তই তো দেহের  
স্বরূপ দেহের ধর্ম বলিয়াই গণ্য হইবে। দেহ-  
বুদ্ধি থাকিতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না।  
যদি কেহ বলে, ‘আমি মুক্ত’, তাহা হইলে  
বাস্তবিক সে বদ্ধ।)

মুক্তির নিদান হইতেছে স্বাস্থ্যবৎ—ইহা  
ছাড়া আর সমস্তই নিরর্থক। তোমাকে ‘মাজ  
স্বাস্থ্যবৎ দ্বারা তৃপ্ত হইতে হইবে। স্বাস্থ্যবৎ-  
তৃপ্ত পুরুষই মুক্ত ; তাঁহার লোকব্যবহার  
দেখিয়া লোকে বদ্ধ বলিলেই বা কি ? আকর্ষ-  
তৃপ্ত ব্যক্তিকে যদি কেহ ক্ষুধাতু বলে, তবে  
লোকের কথাতেই আর সে ক্ষুধাতু হইয়া  
যায় না। স্বরূপে তো দেহ নাই ই, তবে  
তাঁহার আর চঞ্চলতা বা শুকতা দ্বারা মুক্তের  
নিশ্চয় হয় কি করিয়া ?

বদ্ধ আর মুক্ত কীনা তো বাস্তবিক দেহ  
পথ্যন্তই ; দেহাভিমান রাখিয়াছেন বলিয়া  
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরও মুক্ত হইতে পারিতেছেন  
না। এমন কি, মুক্ততার আবনাও বৈ বদ্ধ-

তার লক্ষণ; মুক্ত ও বদ্ধ দুটাই বার্থ কল্পনা।  
সংস্করণে বদ্ধ কল্পনা নাই, এ কথা তুমি স্বতঃ-  
সিদ্ধই; যেমন বুদ্ধে প্রাথমিক বাধা কেহ  
সাঁতার কাটিতে পারে না, তেমনি মুক্তির  
অভিমান বাধা কেহ সংস্করণে অবস্থান  
করিতে পারে না। যিনি অহং হইতে ছুটি  
পাইয়াছেন, তিনিই মুক্ত। তার পর তিনি  
মুক্তই হউন, আর বাচালট হউন, তাঁহাকেই  
মুক্ত বলিব। কোনওকালে বিন্দুমাত্র বন্ধন  
সম্ভাবনা বাহার নাই, তাঁহার মাঝে মুক্তির  
ভাবনা আসে কোথা হইতে? যাহার বন্ধন  
হয়, তাহারই তো মুক্তি হইবে। এই ভাবে  
বিচার করিলে গোত্র যায়, যেখানে গুণসম্পর্ক  
রহিয়াছে, সেখানে সমস্তই ব্যর্থ।

বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মেন বস্তুতঃ।  
গুণস্ত মায়ামূলভার মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥

পরমশুদ্ধত্ব যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার  
কাছে বন্ধন-মুক্তির ভেদ নাই। বন্ধন ও  
মুক্তি দুটাই মায়ার খেলা। যখন নামরূপ নষ্ট  
হইয়া যায়, তখন মুক্তি কল্পনাট বা থাকে  
কোথায়? তখন তো বন্ধনমুক্তির সম্পূর্ণ বিষয়

রণ ঘটে। প্রশ্ন করিতে পার, তাহা হইলে  
অমুক্ত বদ্ধ, অমুক্ত মুক্ত, এই কথাই বা আসে  
কোথা হইতে? ইহার উত্তর এই—একমাত্র  
দেহাভিমানই আমাদের বাধা। দেহাভিমানই  
জীবকে বাঁদিয়াছে। দেহকে আমি মনে  
করাই বন্ধন। এই জন্ম লোকতঃ দেহাভি-  
মানীকে বদ্ধ বলা হয়, এবং দেহাভিমানকে  
যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে মুক্ত বলা  
হয়।

কিন্তু বন্ধমুক্তি কল্পনা তো মৃগতৃষিকা  
মাত্র। মায়াতে এই মিথ্যা প্রতিভাস উৎপন্ন  
হইয়াছে। জ্ঞানরূপী জাগৃতি উপস্থিত হইলেই  
এ মায়ার স্বপ্ন উড়িয়া যায়। স্বপ্নাবস্থার বদ্ধ  
বা মুক্ত হইতে পার, কিন্তু জাগ্রদশায় কি  
তাহার কল্পবৃত্তি চলে? স্বপ্নের তত্ত্ব যে জানে,  
সে আর স্বপ্নাবস্থায় পড়ে না; আত্মজ্ঞান  
হলে সমস্ত লোকই মুক্ত। শুদ্ধজ্ঞানের  
দৃষ্টিতে দেখিলে মুক্তি পর্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক।  
কেননা দেহবুদ্ধি নিয়াই বদ্ধ মোক্ষের কল্পনা;  
কিন্তু মহাপুরুষেরা দেহাতীত বস্তু—এই জন্ম  
তাঁহাদের বন্ধন বা মুক্তির কল্পনাই হয় না।



## বাক্যসংযম



“যোগস্ত প্রথমঃ ধারঃ বাক্যনিবারণঃ।”—শঙ্করাচার্য।  
“আত্মানং বা বিজানীথ—তুষ্টিং বাচং বিমুক্তম্।”—শ্রুতি

বাক্যসংযম চিত্তবৃত্তির নিরোধের মূল।  
বাক্যসংযম না হলে ধ্যান কিছুতেই হুঁতে  
পারে না। বাক্যের সংযম শুধু কথার সংযম

নয়—চুপ করে থাকা বা পরিস্রিত হিতবাক্য  
বলা নয়। এটা বাক্যসংযমের বহির্ভূত।  
বাক্যতত্ত্ব না জানলে তাকে পরিচালিত করা  
সহজ হয় না। বেশ চারিটা বাক্যের কথা  
বলেছেন—পরা, পশ্চতী, মধ্যমা, বৈথরী।

বৈখরী মানে যা সুস্পষ্টরূপে অভিযুক্ত—এই যেমন আমাদের কথাবার্তা। বৈখরী বাক্য হল স্পষ্টতম অভিযুক্ত। এর মূলে যে স্বল্পতর প্রেরণা রয়েছে, তাকে আয়ত্ত না করতে পারলে শুধু কথা না বললেই বাক্যসংঘম সিদ্ধ হবে না। অতীত প্রথম শিক্ষার্থীকে এই বৈখরী বাক্য রোধ করবার সাধনটি করতে হবে। তারই মানে নিছক চূপ করে থাকা। তবে চিন্তা স্বার্থ ও হিতকর পরিমিত বাক্য প্রয়োগ করা—এ সংঘমের আরও উন্নত স্তর; একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে।

বৈখরী বাক্যের স্থূল রূপ। বাক্য হতে জগৎ অভিযুক্ত হয়েছে—এমনি একটা কথা শাস্ত্রে আছে। সেট হিসাবে বাক্য শাস্ত্র, চৈতন্য ভাবে অধিষ্ঠিত। বৈখরী বাক্যের অধিষ্ঠাতা বিগাট। এটা সমষ্টি ভাবের কথা।

বৈখরীমূলে আছে তার স্বল্পরূপ—মধ্যমা বাক্য। এগুলো যেন চিন্তাস্রব, ঢেউ। যখন বাক্যে প্রকাশ কর, তখন স্বভাবতঃ পদ-প্রত্যয়বিভাগ হয়ে যায়। যেকোনও একটা বাক্য ধরে বিচার করে দেখ, 'মূলে একটা অর্থও ভাব বা idea, তার বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাক্যের পদগুলি যেন এক একটা দিক আলোকিত করবার চেষ্টা করছে। আবার ভাবের এঁট বিভিন্ন দলগুলিকে একটা, বৌদ্ধিক গণ্ডিতে রাখবার জন্য প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা জানেন, ভাষা বতই প্রবর্তন হয় (আমাদের ধারণায় মানুষের চিন্তা বত বহিষ্কৃত হয়), প্রত্যয়ের মাত্রা তত বেড়ে গিয়ে পদগুলি ততই বেশী ছিটকে পড়তে থাকে। বেদের ভাষা আর আধুনিক যুগের ভাষা তুলনা করলে বোঝা যায়, একটা

কত জমাট, আর একটা কত বিশ্লব। যে কোন বাক্য প্রতিপাত্ত বিষয়কে চিন্তার আমরা এক দেখি; ভাষায় তাকে ~~এক~~ করি। ভাষাতত্ত্ববিদগণ এট কথা স্বীকার করেন। চিন্তার মাঝে ভাষার ~~এক~~ সংহত আকৃতিই মধ্যমা বাক্যের স্বরূপ।

মধ্যমাতে পদপ্রতিপাত্তবিভাগ নাই, অথচ একটা ব্যাপারকে সমষ্টিরূপে ধারণা করবার শক্তি রয়েছে। 'চিন্তকে অন্তর্মুখী করে ভাষায় এট মূল তত্ত্বটিকে আয়ত্ত করতে পারলে মান্ত্য প্রবল শক্তি সঞ্চার হয়, স্বল্লাসসে বহু বিষয় নিখুঁতভাবে ধারণা করবার আশ্চর্য্য শক্তি জন্মে।

কিন্তু এট মধ্যমা বাক্যকেও আমরা যথার্থ রূপে ধারণা করতে পার না—বৈখরীকে এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। তাই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাষা আঁড়ান চলে। তার ফলে স্বল্প চিন্তা আর স্থূল ভাষার সংমিশ্রণে নিকল্প জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। যেমন, "অনন্ত"—এই শব্দটি স্থূল, কিন্তু শব্দের উপর একান্ত নির্ভর। কার বলে এর প্রতিপাত্ত স্বল্প অর্থের দিকে আকর্ষণের মন যার না অথচ একটা আবছায়া ধারণার উৎপত্তি হয়। ধ্যানের সময় এই-গুলিতে ভাবী পথ হয়।

অতীত বাক্য আর অর্থ সঙ্গীত হয়ে থাকার প্রণোদনায় খুঁসি উপক্যরও আছে। যেমন, "সাহসং" "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাদি কথা বলে বিশেষ কিছু না বুঝলেও, একটা জোর পাওয়া যায়। তবে ওইখানেই থেমে যেতে নাই। যে জোরটুকু পেলাম, তার মূল অনু-সন্ধান কর্তে হবে, শেষে শব্দানুরোপক হয়ে ভাব ধারণা করতে হবে।

ধ্যানের সময় এইটাই বিশেষ প্রয়োজন



হয়। বিহু বৈথরী বাক্‌নির্বপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত না হলে ধ্যানে গুরুতর বাধা জন্মায়। এই জন্তই জাচারি, বল্‌ছেন, শ্রীতি বল্‌ছেন, জ্ঞানের পথে চলতে হলে প্রথমতঃই চাই বাক্‌সংযম। শুধু বৈথরী বাক্‌কে রোধ করা নয় মধ্যম বাক্‌কেও তা হতে বিযুক্ত করা। যখন চুপ করে আছি, তখনও যতটা সম্ভব মনে মনে ভাষা ব্যবহার কর্‌বে না—ভাষানিরপেক্ষ হয়ে পিণ্ডাকারে বিষয় ধারণা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। চিন্তাশৈলী এই চেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলকথা, বাক্‌সংযমের এই গৃহ তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি না দিলে ধ্যান সহজ হবে না।

সমষ্টি স্বল্পবাক্‌ মধ্যমার অধিদেবতা তিরণাগর্ভ। ইনি প্রজাপতি—বিশ্বের architect। ইনি মনে মনে যা কল্পনা করছেন, তাই মধ্যম বাক্‌। বেদ তাঁরই অভিব্যক্তি। মধ্যমার সঙ্গে বেদের গৃহ সম্পর্ক, সে কথা আগেই বলেছি।

প্রথমতঃ বাক্‌তত্ত্ব এই পর্যায় জ্ঞানলেই যথেষ্ট। এই জন্ত আর দুটা বাকের সংক্ষেপে স্বরূপ নির্দেশ করছি।

মধ্যমার পর পশুস্ত্রী বাক্‌—এই হচ্ছে জীবর বামনা। সনিকল্প সমাধিতে এই বাকের সাক্ষাৎকার হয়। বাষ্টিতে বলতে পারি, আমাদের মাঝে যে willforce, তাই পশুস্ত্রীর রূপ, ইচ্ছা বা প্রেরণা চিন্তায় বিশ্লিষ্ট হয়ে বাকো ফুটে ওঠে। পাণিনির শিক্ষাতে শব্দ-ভিব্যক্তির আলোচনা কালে এ বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই তিনটা বাক্‌ নিয়ে জগৎ। প্রণবের স্বল্পতর রূপ পশুস্ত্রী। মূলধার হতে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে প্রণবের উত্থান কালে পশুস্ত্রীর অনুভব হতে পারে।

তাবশর পর বাক্‌ জ্যোতিঃস্বরূপিণী—নির্বিকল্পসমাধিগমা। এই হল প্রণবের তুরীয় রূপ।

এই কথাগুলি স্মরণে রেখে চিন্তকে একাগ্র করে ভাবকে শুদ্ধ করে বিচরণ করতে হবে, তবে গুরুতর বাক্‌সংযম হবে।



## বিপরীত

সেদিন বাঁধু চাইলে যখন মুহু মধুর হেসে—  
 ব্যথার বাঁধী বাজিয়ে গেলে সুখের বেশে এসে।  
 আজকে বাঁকা মুখের বাণী, কুটিল চোখের চাওয়া—  
 জাগছে আশা প্রাণে কেন, নিবিড় হবে পাওয়া!  
 দুঃখ যে ছাও আপন হাতে, সেই তো সুখের খনি—  
 ভালবাসার অবহেলা হল মাথার মণি!  
 বুঝেছি আজ—সব ভুলেছি, ভুলিনি সেই মুখ.  
 মরণ-সায়র মথনে তাই উথলে ওঠে বুক!



# হিমালয়ের পত্র

## জগদেবী অধিত্যকা

বাসনশূন্যের আশেপাশে সব জায়গার বৃষ্টি হচ্ছে দেখে রামকে সে নন্দনকানন ছেড়ে আসতে হল। নীচে ভারী স্তম্ভব একটা অধিত্যকার তিনি নেমে এলেন, সেখানে সব সময় বায়ুর মুক্ত হিলোল। কত শায়ী হলদে ঘুঁট আর নানারকম ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে। নানাবকম জাম প্রচুর পেকে আছে। নূতন ছাওয়া কুটীরের পাশেই একটা সবুজ মাঠ হুটী নদীর মাঝ দিয়ে ওপারপানে উঠে গিয়েছে। সামনে ভারী স্তম্ভব দৃশ্য—জল বউছে, পাতাডেব গা কচি পাতার ছেয়ে গিয়েছে, বনানীর উপর দিয়ে সবুজের ঢেউ গেলে যাচ্ছে যেন। এখানে দেখানে পাথরের বড় বড় চট্টান রামের স্তম্ভ সংলাসন গেতে রেখেছে। যদি ছায়ার দবকার হয়, শীমল নিকুঞ্জ তার আনন্দ শরন বিছিয়ে রেখেছে।

বনের রাখালেরা তিন ঘণ্টার মাঝে রামের স্তম্ভ এক পর্বকুটীর সঙ্গে দিলে। ছাউনীতে যাতে বৃষ্টিজল আটকান, তার স্তম্ভ, তাবা বখেই চেষ্টা-চরিত্র করেছে। রাত্রে খুব জোরে জল ঝড় এলো। তিন চার মিনিট পর পর বিদ্যুৎ চমকায়, তাব পর এমন কবে বাজ গর্জে ওঠে যে সমস্তটা পাহাড় ধরধর করে কেঁপে ওঠে। তিন ঘণ্টা ধরে এমনি করে ঈশ্বরের বজ্রকীড়া চলল। অঝোর ঝরে জল ঝরতে লাগল। চান দিয়ে জল পড়তে লাগল, স্রুড় এসে ধরখানাকে এমনি

দোলা দিতে লাগল। যে সব সময় ছাড়া মেলে মেলে রেখে, তবে বৃষ্টির হাত থেকে পুঁথি-পত্রগুলো বাঁচান গেলো। কাপড়চোপড় একেবারে ভিজ গেল। জমী বাসে ঢাকা বলে কাঁধা হল না বটে, কিন্তু চাল, ফুটো করে অনবরত এত জল পড়ছিল যে মেঝেতে আর তা শুষে নিতে পারল না। রক্ত আর কুর্ষের অবস্থাটা রাম তখন বেশ উপভোগ্য কবছেন। একরাত্রির দরুণ এমনি জলচর ব'নে গিয়ে বেশ একটা আনন্দ হচ্ছিল।

কারসী ক্রান্তি গেরেছেন, "তোমার পরি-পূর্ণ আবুফাল হতে একটা রাত আলাদা কবে নাও—সে রাতটা আর ঘুমিও না।" যে রাত বঁধু সঙ্গ এমনি করে মিলিয়ে দেয়, তাকে আশীর্বাদ করি।

মহে চনবাত্রিঃ পুরা শুকাব দেয়ান্।

ব সহস্রায় বায়ুতায় বজ্রিব ন শতায় শতায়

কে আক্রান্তক, হে বজ্রবান্, শত পাই, সহস্র পাই, অযুত পাই, তার শতশতও যদি পাই, তবুও তোমায় ছাড়ছি না। কোনও উপকরণের দ্বারা নিরস্ত তোমায় ছাড়ছি না—হে অসংখ্যদায়িন রাজা।

যজ্ঞকাসি পাতবতি যদর্ঘাবতি রজহন্।

অতস্বা শ্রীতি দ্বাপাদিত্য কেশিতিঃ হতাবা। আবিবাসিঃ

স্রামেস্তা ব্যাখ্যা—হে শত্রু (গর্জনশীল শাক্তমান্), তুমি ঘরে থাক (গর্জনশীল বৈদ্যমালায়) অথবা হে বজ্রহন্ (সুশরহায়ক), তুমি কাছেই থাক (গর্জনশীল বাতায়

নিকোড়ে); এই দেখে স্বর্গভেদী গীতগুলি  
দীর্ঘকেশ ভুবঙ্গের মত তোমার অভিমুখে  
প্রেরণ করি; তুমি তাতে আবোহণ কবে  
এস। আমার জীবন নিঞ্জরে সোমবস করে  
য়েখেছি। এস তুমি স্বর্গে বস, আমার  
প্রাণের সোমধারা পান কর।

সুদূর ভর আর তুচ্ছ খবরদারীতে মাহুস  
আমর জীবন কাটায়ে, এট কি জীবনের  
ভাংগা? সারাদিন কেবল ভাবনা—ভাববে  
কি করে দিন যাবে, আমার কি হবে! বোলা  
লব। পশুপাণীর মাঝে বতটুকু আত্মমগ্ন্যাদা  
আছে, এমন কি গাছের বতটুকু আছে, অস্তিত্ব  
ভতটুকু ও তো মাহুসের থাকি উচিত। পর!  
তো খড়ে বোঁদ্রে খুঁৎখুঁৎ কান না—প্রকৃতির  
লজ্জা মিলে নিশে থাকে। এত সব ধারণা—  
এই তো আত্ম—এ তো আত্ম। আত্ম তবু  
হানিহি। আমি গর্জন করছি। আমি কি  
মুন্সর, কি ভীষণ, কি সবল! হৃদয় হতে  
উপ্তে পড়ছে—

শিবোহিং শিবোহিং!

আ মেগল সঙ্কটান বনান  
জালামগ্ন সানুগতা নিরুদা!  
উষ্মজিতা বৃষ্টিভিরাগ্রগন্তে  
শুষ্কানি বস্তাওপবন্তি সিংহানি  
ভাগীকপানি বর্ষাকবাণা  
বোচা মুহুর্তকম্পিতদেবদ্যুতঃ।  
বহাসুবিস্তীর্ণঃ কিবাভে,  
রাসেব্যতে ভিন্নাংগিবহে।

এমন দিন যায় না, যে দিন খুব তোড়  
ফুটি না আসে। কানিদাসের এই প্রথম শ্লোক,  
তীব বর্ণনামায়া চঞ্চল কানে গিয়ে রামকেও  
কখনও কখনও বৃত্তিতে পাকড়াও কবে। কিন্তু  
কাজে তো আর গুহা নাই যে আশ্রয় নেওয়া  
অবৈধ। কাজেই সেককেই তখন ছাড়া

করে নিয়ে মনে কবতে হয়, এ বর্ষণ  
আমারই।

দ্বিতীয় শ্লোকে যে দেবদাকর বর্ণনা দেওয়া  
হয়েছে, তার কত সুখী। তাঁরা কান্দে,  
তবু গঙ্গাশীকরের শীতলসম্পাত বুক পেতে  
নিচ্ছে!

আহা, ঝটিকার করুণ স্পর্শ আব তুমার  
পাতের নিপাড়া শৈত্যের কাছে বুক পেতে  
হেওয়া কত বড় ভাগ্যের কথা।

সহস্রচক্র তাল

পরিচয়বচি তাবলেশা—

“এ বিবদান পাবিবধমানঃ।

শুদান বস্তাওপবন্তি সিংহানি

আ বাবস্তাওপবন্তি সিংহানিঃ।

—অতি উৎসাহ, চিমালয়েব তুঙ্গশ্রেণী প্রাণান্ত  
সরোবরে কমণেরা ঘুমিয়ে আছে। উত্তরা-  
কাল জ্বালকত কবে বয়েছেন সম্ভার, তাঁরা  
নিজ হাতে গানের চয়ন করে ওঁচাটী বাকী  
বেখে দেন। সকালবেগের সূর্য্য যখন প্রভাতী  
কিরণ চােন, তখন তাঁর অকণ রাগের দীপ্তি-  
ভরা চুখনে উপব থেকে এত আধকোটা কমল  
বাগাধেব ঘুম ভেঙ্গে যায়, নবীন সুষমাস তাবা  
অবন্ত হয়ে ওঠে।

গগনম্পনী পর্কতপত্তরেব উপর দিয়ে  
মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে—নীচে ভূর্জ  
গাছের বন দিগন্তের কোলে চেউয়ে চেউয়ে  
লুটিয়ে পড়ছে, ডাঠনে বাঁয়ে পুষ্পগুণ্ডিত গিরি-  
শৃঙ্গ। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মথমলের  
মত নরম ঘাসের গম্বী আটা, তাতে ছোট ছোট  
ফুলের মেলা—চলতে গেলে তাবা পায়ে জড়িয়ে  
ধবে। দূবে কৈলাস শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে—তার  
বেগমালী পপাতের রক্তোক্ষাস এখন হতেও  
চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট

কতরূপী হরিণ বিচাড়ে মত তোমার নামনে  
দিয়ে ছুটে যায়—চাঁদ যেন স্তাদের গির্হ  
সোওয়ার হলে মানার তাল। এই এদিকে, এই  
ভাদিকে বিশাল বিচিত্র পাখা মেলে—দিয়ে  
একাঙ গকড়েরা পাখককে, হঠাৎ চমকে  
দিলে। চলতে চলতে মাঝে খেমে গিয়ে  
কৈলাসের ব্রহ্মকমল গুটি একটী কুড়ায়  
তুলি—তাদের পাপাড়তে যেন গরু আর  
সোণা ঢেলে বেখেছে। কোথাও কোথাও  
মসাব, গুগ্গল ইত্যাদি গরু জ্বা প্রচণ্ড পাব  
মানে জমে আছে, লোকে মহা উৎসাহে সোঙলো  
খুঁড়ে তুলছে। আমবা স্ত্রীও গাভাম আগ  
প্রণয়ধ্বনি কবতাম।

সে স্থানটী গংসার কোলাহলের বহু উর্দ্ধ।  
কৈলাসের নিম্নল বিব যবে ছাওয়া ঝিলের  
বুকে ঢেউ খেলয়ে বইছে—গভাব সুশীতল

ঝিলগুলি, ফটকের মত বহু উর্দ্ধ বিস্তার  
দিয়ে পড়ে আছে। চারদিকে শুভ্র কপজ  
তুষাবের মেঘা। সব মিলে যেন একখান  
প্রকাণ্ড দর্পণ—সদ্য প্রকৃতি আবরু তপন  
ভাব সুখ দেখবেন বলে। এমনি ত্রিভুবন  
স্বপ্নদেবের জোলাব, গোলতাই হয় বটে।  
এত উচ্চত তো গ্রাম থাকবে, না, সব থাকবে  
না। বাত কাটাতে হত গুহার মাঝে,  
বাতাসও যেন সেখানে শুক করে ঘুন্নি  
পড়ত।

আহা, এই তো অঙ্গারতপ্ত দেবদ্বারের  
গন্তব্য ভূমিকে গেছেন ফেলে এসেছি। এখানে  
শুধু তপন পান কোলাকুলি আনন্দ—কেবল  
একমেবাদিতীয়ের নিবিড় আনন্দের মাঝে  
সঙ্গীতান বিনয়। ৩য়—৬ম।

২২-২৩শী পাতায়

## রূপান্তর

ওবে ভোলা, আঁধি মুদি, মনেব দুয়ার রুখি।  
গুঁজেছিস্ কানে?

ছাতি-কাটা পিয়াসায় ফিবেছিস কি আশায়  
অজানাব পারে?

বাসনাব বস্ত পাবে, ফুটেছে যবে যবে যবে,  
কবে সে গিয়েছে যবে, দেখিসনি ঢেয়ে;—  
অরূপা সে রূপে রূপে, মিশে আছে চুপে চুপে,  
তারি আরতির ধূপে গেছে আজি ছুয়ে  
বিজন দেউল খানি;— তারি বুকভরা বাণী  
নব অমুরাগে

তটিনীর কলগীতে বিহগের কাকলীতে  
পুলকে ছলকি চিত্তে মৌন হয়ে জাগে।

## সেবাব সহজ উপায়



সেবাটি একমাত্র আত্মোন্নতিৰ সহজ উপায়। সেবাৰ অভাবতে আজি সমাজ বোলা, ব্যক্তি বোলা, সকলো শূন্য। পৰস্পৰ মিলনশ্রীতি নহলে, সহানুভূতি নহলে, শাস্ত্ৰ কত? আজি-কালি প্ৰায় সকলোকে স্বাৰ্থপৰ দেখা যায়। তাৰ পৰা দেশৰ ও নিজৰ বে কি সৰ্বনাশ হৈছে, তাক কোনেও ভাবি নেচায়। গাঁৱে গাঁৱে নগৰ নগৰে যদি কিছুমান উত্তোগী মানুহ সজবদ্ধ হৈ দেশৰ ও দৰৰ সেবাত নিযুক্ত হয়, তেন্তে দেশৰো উন্নতি হয়; নিজৰো আত্মমুক্তিৰ পথ পৰিষ্কাৰ হয়।

এদিন এজন এজন ধৰ্মপুৰুষৰ কাষলৈ গৈ শুধিলে,

“আত্মমুক্তিৰ সহজ উপায় কি?”

“নাৰায়ণসেবাই একমাত্র সহজ উপায়।”

ঈশ্বৰ নিৰাকার, তেওঁৰ দেৱী কিৰূপে সন্তানে?”

“দত্তা ন’ত হুস ঠকাৰ নহয়, দীৰ্ঘ ঈশ্বৰ। ঈশ্বৰ ‘নিৰাকার’ অৰ্থাৎ পানীৰ আকাৰ। পানী যি পাত্ৰত থোৱা যায়, সেই পাত্ৰৰে আকাৰ ধৰে, ঈশ্বৰো তদ্রূপ। তেওঁ, যেনে অধাৰত থাকে, তেনেদৰেই ‘তেওঁৰ’ আকাৰ। তাৰ পাচত তোমাক আচল কথা শিকাই দিওঁ,—হুমি সদা ‘বানন কৰিবা ন’ত দীৰ্ঘ ঈশ্বৰ দি, নিৰাকার’ : এই ব’বে বানন কৰোতে কৰোতে এদিন হঠাৎ দেখিবা, নিৰ বা পানী শুকাই গ’ল,—নব শূন্য হ’ল, তোমাক দীৰ্ঘ ঈশ্বৰ হুস হৈ পাবল; তোমাৰ মূৰেদি বানন হব তেতিয়া ‘নিৰাকার’, সেয়া কৰা উচিত। মূলত লাগে ত্যাগ।

দীৰ্ঘ ঈশ্বৰ একেবাৰে হুস হ’ল তোমাক অলক্ষ্যে, তেতিয়া কৰিবা কি জানা? সদাই সেই হুস ইকাৰ দিয়েই বানন কৰিবা ‘নিৰাকার।’ বানন একোতেই নেৰিবা। তাৰ পাচত হঠাৎ এদিন তোমাক হুস ইকাৰ আৰু দীৰ্ঘ ঈশ্বৰ সব শুচি যাব। তেতিয়া তোমাক মুখত ওলাব নৰাকার। ন’ত হুস ইকাৰ নাট, দীৰ্ঘ ঈকাৰো নাই। সেয়ে ত’ল আচল বানন—বুজিলা? ঈশ্বৰ প্ৰথমে ‘নিৰাকার’ পাচত ‘নিৰাকার’ অবশেষত ‘নৰাকার’। নব শব্দে মানুহ। সব মানুহতে ঈশ্বৰ দৰ্শন হয় তোতয়া। মনত বাধিবা তেওঁ নৰাকার; নৰেচ নাৰায়ণ। নৰৰ পূজা, নৰৰ সেবাই হ’ল নাৰায়ণ সেবা। চিৰদিন এই নব নাৰায়ণ সেবা কৰা; মানুহৰ মুখতেই ঈশ্বৰৰ শোভা পায় বেচি। অকপী নাৰায়ণ নৰকপেচ বিৰাজ কৰিছে। মই তোমাক সাৰ কথা কলো,—মানুহক যিণ নক ব’বা, মানুহৰ কাৰণ প্ৰাণ দিয়া, মানুহৰ সেবা কৰিবা। জীৱন্ত আৰু একোকে প্ৰয়োজন নাই তোমাৰ—সাধন জনৰ সাৰ কথা নব নাৰায়ণ সেবা।”

সেবা চাৰি প্ৰকাৰ। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই চাৰি ভাগৰ সেবা। অজ্ঞানীক জ্ঞান দিয়া ব্ৰাহ্মণ ভাবৰ, আতুৰক বন্ধা কৰা ক্ষত্ৰিয় ভাবৰ, হুণিয়াক অন্নবস্ত্ৰাদি দিয়া বৈশ্য ভাবৰ ও বোগীআদিৰ পাৰচৰ্যা শূদ্ৰ ভাবৰ সেবা। যি যি ভাবে পাবে, সেইভাবেই

ত্যাগেই হ'ল সেৱাৰ প্ৰাণ। অজ্ঞানীক জ্ঞান দি সেৱা কৰাটো হ'ল উত্তম। দেশত আৰ্জিকালি সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱ। দেখিছা, তোমৰ আগত কত বোগী বিনা চিকিৎসা বিনা পৰিচৰ্যাটো মৃত্যু মুখত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কত বিধবা, পোতা-কন্যাটো এমুঠি অন্নৰ অভাবত, এখন বস্ত্ৰৰ লম্বাবত গছৰ তলত বা জুপৰিত পৰি চাতি ফুটি কৰিছে; দেখিছা কত দুৰ্বলিয়ে গলিৰ অত্যাচাৰণ বিপন্ন হৈছে, দেশত শতকৰা নেকল্পনষ্ট জন মানুহে শিক্ষাৰ অভাবত, অজ্ঞানান্ধকাৰণ থাকি কলৌজপো, মায়ামোহত জৰ্জৰিত। শিক্ষাৰ দোষত স্বাস্থ্য, বল, ধৈৰ্য্য, ধৰ্ম, নীতি, নিয়ম পাতৰি নিষ্টেজ, দুৰ্বল, বোগী, ভীক হৈ অশান্তি ভোগ কৰিছে। এটোখোৰৰ নিৰাকৰণত যদি কিছু লোক সম্ভৱ হৈছে সৎকল্পেৰে লাগি যায়, তেন্তে দেশৰ সৰ্ব্বতোভাবে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এনেগোৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰাটো হ'ল মানুহৰ কৰ্তব্য। ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মাৰ উন্নতি হয় বিশেষৰূপে।

সেৱাই হওক তোমাৰ ব্ৰত; ত্যাগেই হওক গোমাৰ মন্ত্ৰ। ত্যাগমন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈ যদি সেৱাধৰ্মত লাগিব পাৰা, তেন্তে তোমাৰ দ্বাৰা জগতৰ এনে কাম হব পাৰে, যি কাম হেজাৰ হেজাৰ স্বাৰ্থৰ মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা হ'ব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব তাগৰ সমান শক্তি নাই। এই মন্ত্ৰত দীক্ষিত হৈয়ে আমাৰ পুৰুষকৰ্ম্মৰ যি সকলে জগতক জ্ঞানৰ দীপ জলাই উজ্জল কৰাছিল। স্বাৰ্থৰ লোকৰ মুখ ক'ত? সন্তোষই বা ক'ত? যাৰ পৰৱৰ্ত্তনত দুখ নহয়, পৰৱৰ্ত্তনত সহানুভূতি নহয়, সি কি মানুহ?

সম্ভৱ হলে এটা বিশেষ শক্তি পোৱা

যায়। যদি সম্ভৱ হবলৈ মানুহ নোলায়, তেন্তে তুমি নিজেই ব্ৰতী হোৱা। যদি তুমি প্ৰাণেৰে সেৱা কৰা, তেন্তে তোমাক ভগৱানে সহায় কৰিব। তোমাৰ জীৱন যুদ্ধৰ সাৰথি হওঁ স্বয়ং নাৰাধণ। যুৱন্তৰ যাব সাৰথি, তাৰ আকৌ ভয় কি? কিছুমান ধৈৰ্য্যৰাৰ যদি সেৱা কৰিব পাৰা, তেন্তে দেখিব— প্ৰত্যেক দোষণ, নাৰাধণ তোমাৰ জন্মত বহি তোমাক কিদৰে পাবচালিত কৰিছে; তোমাক তোমাৰ বিপক্ষ গৈছে, যি তোমাৰ মতৰ বিৰুদ্ধ, সিও আহি তোমাৰ লগত যোগ দিবহি। উত্তম হ'ল সাক্ষাৎ ভেটি। ধৈৰ্য্য হ'ল অস্ত্ৰ। এই অস্ত্ৰ লৈ যদি কুক কলকলী সেৱাধৰ্ম্মক্ষেত্ৰত অবতীৰ্ণ হৈ ত্যাগমন্ত্ৰক সজাগ ৰাখি চলিব পাৰা, তেন্তে তোমাৰ সাক্ষাৎ মুকপ, জয় অনিবাৰ্য্য।

বহুতে ভাৱিছিল পাৰে যে সেৱা কৰিবলৈ হলে, দেশত কোনও হিতানুষ্ঠান কৰিবলৈ হলে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থ নহলে বহুতে ভাবে যে কোনো কাৰ্য্য কৰিবৰ শক্তি নেথাকে। এওঁ লোকে অৰ্থকে মূল বুলি ভাবে, কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে অৰ্থ মূল নহয়, প্ৰাণ হৈ মূল। প্ৰাণেৰে সদা এটা কামত ধৰা যায়, তেন্তে অৰ্থ আপোনামাপুনি আহে; অৰ্থৰ কাৰণ ভাবিব নেলাগে। ধৈৰ্য্য ধৰি, শুদ্ধ ভাবে কামত নেজানেনেবা কৈ লাগিলে সাক্ষাৎ হোৱাত কোনো সন্দেহ নাই। নিজক 'মহান' কৰা, দুৰ্বলতা দূৰ হ'ৱা, বীৰব দৰে, মহৎ কাৰ্য্যত লাগি যোৱা। তুমি তো দুৰ্বলী নোহোৱা, যাৰ প্ৰাণ আছে, উত্তম আছে, যাৰ অধ্যবসায় আছে, সি কিয় দুৰ্বলী হ'ব? ধৈৰ্য্য ধৰি কাম কৰা, ভগৱান তোমাৰ সহায়; শুভ কাৰ্য্যত সদায় ভগৱানে তোমাক সহায় কৰিব। অৱশ্যে

অৰ্থৰ যে প্ৰয়োজন নাই, এনে নহয়; কবিৰ পাবিলে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ এটা ভাল উপায় আছে। মৈথোনে যদি কবিৰ পৰা ব্যয়, তেন্তে অচিৰে অৰ্থৰ অভাব নেথাকে।

ভাৰতবৰ্ষত এটা বিশেষত্ব আছে। পাশ্চাত্য দেশৰ দৰে ভাৰত চহকী নহয়; কাৰণ এটা দেশ কৰ্মভূমি, আন দেশ হল নোগভূমি। ভাৰতত জন্ম লৈ কৰ্মযোগ্য সাধন কৰি আত্মমুক্তি লাভ কৰাটো চল শ্ৰীশুকৰ ইচ্ছা। আক এক কথা, এজননে দহ টকা দিয়াতকৈ দহজননে দহ টকা দি এটা কাম কৰাৰ মূল্য বেছি। গতিকে ব্যত চপিয়াৰ পৰা চহকী-লৈকে সকলোৱে সমভাবে যোগ দিব পাৰে, এনে ব্যৱস্থা কৰাটো শ্ৰেয়ঃ—যদিও খাটনী লাগিব বেছি। বৰ্তমান অৱস্থাত মুষ্টি-কা এটা ভাল অমুঠান। ভাৰতৰ বহুত ঠাইত এটা অমুঠান বাবা বহুত ডালৰ ডালৰ কাম সম্পন্ন হোৱা দেখা গৈছে। যদি কিছুমান ডেকাটো ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ বলি দি মহৎ স্বার্থসিদ্ধ হ'কে আত্মানয়োগ কৰি মুষ্টিভিক্ষাৰ প্ৰচলন কৰে, তেন্তে দেশৰ ও দৰৰ উপকাৰ হ'ব বেছি। সম্বন্ধ হৈ গাঁৱে গাঁৱে নগৰে নগৰে মুষ্টিভিক্ষা প্ৰচলন কৰি সেৱাৰ সাৰ্থকতা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। য'ৰে য'ৰে মুষ্টিভিক্ষা কৰা। এটা কাৰ্য্যত অস্ত্ৰে সাহায্য কৰে ভালৈ, যদি সকলো অকল এজনক লাগি যোৱা। 'যি পাবা মৈথোনে ক'ব থাকা; 'যিমে যদি কোনো লোকক দুবাজ তাক উপেক্ষা কৰে, কৰক—নিকংসাহ নহু। 'মৈথোনে কাম কৰি থাকা। বনত কাৰ্খিয়া, সং উদ্দেশ্যে যেনে যথাকে কৰে, ভগবান্ বধঃ তাৰ সহায়। জয় ক তোমাৰ? অনন্ত জীৱন পাব আছে। বহুত; 'ঈশ্বৰ দাবি লাহে লাহে কাম কৰা,

অচিৰে তোমাৰ অৰ্থ সংগ্ৰহ হ'ব, লগে লগে তোমাৰ সহায়ক হ'ব বহুত।

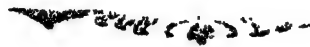
আজিকালি মানুহৰ বৰ স্বার্থপর। বন্ধি, এমুঠি চাউল নিবলৈকো মানুহে আগতি কৰে, এটা আশঙ্কা বহুতৰ চৰ পালে। কিন্তু সেটো ভয় নাই। ভাৰতত—অন্ততঃ হিন্দুৰ ঘৰত সেটো ভয় নাই। যেনে যিমানেকৈ ডাখিয়া ১০ক, কপণ ১০ক, কিন্তু অত্যাগতক, ভিক্ষুকক প্ৰত্যাখ্যান নকৰে কোনেও; কাৰণ হিন্দু মাত্ৰেই ধৰ্ম্মভীক। আগন্তুকক বিফলে পথালে যে গৃহস্থৰেই অসম্মত।

কিন্তু ভয় চল, ভিক্ষাৰী বুলি মানুহে বাদ দিণ কৰে, নেওচা দিয়ে। যি নিজৰ কাৰণ ভিক্ষা কৰে, সি ভিক্ষাৰী। ভিক্ষাবৃত্তি বৰ বেয়া হয়, কিন্তু তুমি গো নিজৰ কাৰণ ভিক্ষা নকৰা—কাৰণ পদৰ কাৰণ দেশৰ কাৰণ। যি পদৰ কাৰণ ভিক্ষা কৰে, সি ভাগী। ভাগীৰ অবমাননা যি কৰে, সি কি হিন্দু? তুমি কি দেখা নাই, গীতাৰ শ্লোককই ভাগীৰ প্ৰশংসা কিদৰে কৰিছে? ভাগীয়েই মানুহৰ মনুষ্যতা। সেটোবাবে কোনো ভয় নাই তোমাৰ। যোৱা, তোমাক কোনেও প্ৰত্যাখ্যান নকৰে। কোনোৱে নেজানি একো কৰিণেও সহ কৰিব, ভগবান্ৰ ওচৰত তাৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা, কৰিব—তাক বুজাব। দুজিলে কোনেও বিশ্বাস নকৰে; বৰঃ সহায়-ভূতি দেখুৱাৰেই সম্ভৱ বেছি।

মুষ্টিভিক্ষা দিয়াত তো গৃহস্থৰ লোকসাম নাই। এতি সাজে এমুঠি কৈ খোৱা লগৰ পৰা চাউল দিব, তাত লোকচান কি? এটা মগনীয়াৱেও দিব পাৰে। এমুঠি চাউল কম বেছি হলে কাৰো খোৱাত কমবেচি নহয়; কাৰেই গৃহস্থ কোনো লোকচান নাই

বহুতে লাভবান হৈছে। চাব পাৰে হয়। লাভবান হৈছে আশা নৈবেদ্যে লাভবান হৈছে আপাত কৰিব পাৰে হয়। কিন্তু তাৰ উত্তৰত কষ্ট, চাউল এমুঠি দিব, ভাত লাভ লোকচানৰ চিচাব কৰা অসুবিধাৰ কাজ নহয়। দান কৰোঁতে ফলবান আশা কৰিব নোপাই। ভাত দিয়াৰ গানি হয়। হিন্দু পণ্ডিত বাৰ বিশ্বাস, যি প্ৰকৃত গুণস্থ, সি কেতিয়াও দানৰ প্ৰত্যাশা কৰিব বুলি মনে নধৰে। তথাপি তাৰ লাভ আছে। প্ৰথমেই হল ধৰ্মলাভ; দ্বিতীয়তঃ হল সেৱা লাভ। ধৰ্মলাভ হল—শুক অৰ্ণিণি অভ্যাগত আদিক আগুৱাই খাওঁ গুণস্থই খাব, এয়ে হিন্দু গৃহস্থৰ ধৰ্ম; যি গুণস্থই দানৰ কাৰণ পাপ কৰে, সি পাপকে ভুগ কৰে এইটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ

গীতাত কোৱা কথা; 'আজি কালি মানুহৰ শুক, অতিথি আদিও শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰি আছে, আৰু সুবিধাও নথটে বহুত; 'এনে স্থলত যদি গুণস্থই সদাই ব্যাকুল হৈ পোৱা চাউলৰ পৰা এমুঠি চাউল নবনাৱাৰণ' সেৱাৰ অৰ্থে টেকেলিত থৈ যায়, তেন্তে সেই গুণস্থই শুক, অতিথিক খুৱাব ভুল্য হল; 'কাজেই আৰু পাপ ভুগ নহল। দানৰ সমান পুণ্য নাই; ই এটা দান, কাজেই পুণ্য অৰ্জনৰ সহায়ক; নিয়ম দানে প্ৰকৃত দান; এমুঠি চাউল যি ফলবান আশা নকৰাই সন্তান। কাজেই নিয়ম দানৰ সাধন হল তাৰ। টোৱাৰ বাবে সেৱা লাভ; মুঠি ভাঙাৰ টকাৰে তাৰ তাহাতৰে সেৱা কৰিব; কাজেই চোৱা লাভ কৰ।



## ব্ৰহ্মচৰ্য্য

—\*—

প্ৰধানতঃ এই কয়টা বিষয় ব্ৰহ্মচৰ্য্য সাধনেৰে বিষয়ীভূত—নিয়ম পালন, সাধন প্ৰণালী ও আত্মসংকল্প।

সংযমশীলকট ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ মূল উদ্দেশ্য। সংযম বলতে মন, বাক ও কাৰ্য এই তিনিৰ সংযম। কাৰ্য সংযম বলতে কৰ্ম্মেচ্ছিয়োগকে সংযত কৰা। স্থল বাহ্য শৰীৰ শুদ্ধি দ্বাৰা ও কৰ্ম্মকণ্ডলি আসন সুদা অভ্যাস দ্বাৰা এই কাৰ্য্যসিদ্ধি হতে পাৰে। জল সূক্তিকা গোময়াদি দ্বাৰা স্থল শৰীৰ শুদ্ধি কৰিতে হয়। সাবিক আহাৰ গ্ৰহণও স্থল শৰীৰ শুদ্ধিৰ

অন্তৰ্গত। সাবিক আহাৰ গ্ৰহণ স্থল শৰীৰ সাবিক উপাদানে গড়ে ভোলবাৰ একটা প্ৰধান উপায়। গুহতঃ সৰ্বশুদ্ধি দ্বাৰা উদ্দেশ্য; তাৰ আহাৰ সংযম বিষয়ে অনবধান হলে চলবে না।

সৰ্বশুদ্ধিই ব্ৰহ্মচৰ্য্য সাধনাৰ লক্ষ্য। ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনেৰেও লক্ষ্য স্থল সৰ্বশুদ্ধি। শুদ্ধসত্ত্ব হতে হলে মন, বাক, কৰ্ম সংযত কৰিতে হবে। এট স্থলশৰীৰেৰে শুদ্ধি কৰিলেই যথেষ্ট হবে না। সব সময় বিশেষ লক্ষ্য ৰাখিলে হবে যে আমাৰ এই শৰীৰ দ্বাৰা সংস্কাৰবশেৰে যে



কারও কোনও অনিষ্ট না ঘটে, এ শবীর যেন কারও পীড়ার কারণ না হয়। এক দিকে যেন—অভ্যাস ও অশাস্ত্রীয় কণ্ঠ হতে একে নিবৃত্ত থাকবে, আবার অল্প পক্ষে একে সং নিমিত্তের দ্বারা সজ্জিত কবাব ও চেষ্টা পাবে। সর্বদা চেষ্টার থাকতে হয় যে কখন, কি কবে এই শবীর দেশের ও দেশের ভিত্তে লাগাতে পাবব। সব সময় গুরু, প্রাজ্ঞ, দেব, বিজ্ঞ সেবা পূজার নিমিত্ত কবাব জন্ত উন্মুখ হয়ে থাকবে এবং যখনই সুযোগ ঘটবে তখনই সেও সুযোগের সংগ্রহ করবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান কববে।

বাক্য সংযম কবার উপকারিতা অনেক। সে সব কথা বিস্তাবে না বলে সংক্ষেপতঃ যা কর্তব্য, তাই বলি। বাক্য সংযম না কবলে গভীর চিন্তা কবার শক্তি জন্মায় না। পবেব হিতের জন্য আবশ্যকবোধে যথার্থ অর্থায় অস্তব বাস্তব একই বেশ বাক্য ব্যবহার কবতে হয়। আবশ্যিক বাক্যব্যয় সর্বদা ত্যাগ কবা উচিত। সূচিন্তিত ও মনঃপূত বাক্য ব্যবহার কবা উচিত। লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন কোনও বাক্য প্রয়োগ করে প্রভাবিত করাই হয়। প্রিয় মধুর, ও হিতকাৰী বাক্যপ্রয়োগই সর্বদা কর্তব্য।

মন সংযমই হচ্ছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধন। সত্য লাভের মানস জীবনের একমাত্র চরম ও পরম উদ্দেশ্য। অগ্নি মনঃশুদ্ধি হচ্ছে তাঁর একমাত্র সোপান। মনঃশুদ্ধি কবও কোথায় সত্য লাভ বা ধর্ম লাভ হয়েছে, এমন জানা যায় নাই।

সংযম ও মনঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে কখনই কেউ জীবনে ধর্ম ও কৃতার্থ হতে পারে কি? সমস্ত ধর্মই সংযম ও মনঃশুদ্ধি বিহীন একমত।

নিজকে ধর্ম ও মহিমামগ্নিত কবতে হলে চিত্ত স্থির, গভীর ও প্রশান্ত থাকতে হলে, জাগতিক বিস্মৃত হতে অল্প কথাকে হলে মনের উপর কর্তৃত্ব থাকা চাই, অসংযত মনকে সংযত করতে জানা চাই। মন স্বাভাবিক চঞ্চল, তাঁর স্বভাব বিষয় হতে বিষয়াস্তবে ছুটাছুটি কবা। এত অসংযত মন সংযত কবতে হবে। সংযত কবতে হলে আগে তার মগ্নিত দুই কবতে হবে। জলের মত স্বভাবাসক্ত অধোগতি নিবারণ কবার জন্য তাকে একটা উচ্চমুখী অবলম্বন দিতে হবে। অবশ্য সে অবলম্বনকে আশ্রয় কবে সব সময় সে থাকতে পারবে না—স্বভাববশে নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হতে যাবেই। যখনই জানবে যে, সে নিম্নভূমিতে রয়েছে, অমনি তাকে উচ্চভূমিতে কবে দেবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রগতি কবতে করতে সে তাঁর উচ্চমুখী অবলম্বনে স্থিতি লাভ কবতে সক্ষম হবে।

মনঃশুদ্ধি আবেগ কতকগুলি সাধনা আছে। সব সময় সাদৃশ্য আচার সংযোগে চেষ্টা কবাব। কোনও কুচিন্তা কুভাব আসতে দেবেনা, কুসঙ্গ কবাব না। সব সময় নিজের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ থাকতে হবে। নিজ হঠাৎভাবে অসুস্থ হলে যে সব সংযত মন চিন্তা, তাদের মনে স্থান দেবে, আবেগ তৎপ্রতিকূল চিন্তাসমূহ দুই কবে দেবে। কপটতা পিত্তনতা হিংসা ঘৃণা পরিশ্রম পবর্জ্য পবিত্র কান্তরতা, স্বার্থপরতা, বিপুলবিশ্বাস, অসত্য, এই সব দোষ মানবজীবনকে বিষময় কব তোলে। এদের কোনও একটিকে আশ্রয় দিলে অধঃপতন অতি দ্রুত হয়। সুতরাং এ সব অসদগুণকে বিবরণ ত্যাগ করে কল

আর্জুন দয়া সন্তোষ প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি সদ-  
গুণ সমূহের অনুশীলন করতে হয়। মনকে সব  
সময় উচ্চ ও মহান্ভাবে ভাবিত রাখতে হয়।  
মনঃশুদ্ধি করবার ও রাখবার আর একটা  
সহজ উপায় সাধু ও মহতের সঙ্গ করা।

ব্রহ্মচর্য্যসাধনের দুইটা বিভাব—একটা  
অর্জন আর একটা বর্জন। যখনই আমি  
একটা কিছু বর্জন করি, তখন একটা কিছু  
অর্জনও করি। যখনই আত্মহিত সাধনের  
ইচ্ছা প্রকট রূপ ধরে দেখা দেয়, তখনই সেই  
ইষ্টার্জনলোভে কিছু কিছু বর্জনও করি।  
এ বর্জনটা প্রথম প্রথম স্থূল জবা দিয়েই হয়ে  
থাকে, কাজেই প্রথমে দেবায়ত্তেরই আচ্ছাদিত  
হয়ে থাকে। সুতরাং স্থূলের ভাগ হতেই  
সাধনার সূত্রপাত হয়। তারপর ভাস্কর্য্য  
তৃপ্ত না হতে পারলে আরও কঠোর ও কঠিন  
সাধনার সূত্রপাত হয়। একেই আবার অল্প  
পক্ষে তপোযজ্ঞ বলা যেতে পারে।

অতঃপর ব্রহ্মচারীদের আর এক তপস্তা।  
“ছাত্রাগাম্ অধ্যয়নং তপঃ।” স্বাধ্যায় পাঠও  
ব্রহ্মচারীদের দৈনিক কর্তব্য। স্ব+অধ্যায়

=স্বরূপের অধ্যায়ই আজকালকার যুবকদের  
সহজ ও ইংগম হবে—এটা সব সময়েই চলে  
পারে। এ ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য সাধনের আর এক  
দিক আছে তপশ্চর্য্য ও ব্রত নিয়ম পালন।  
যত কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধনা, তার একটা  
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। লক্ষ্যের প্রতি একান্ত  
দৃষ্টি রেখে যথাযথ কর্ম্মানুষ্ঠান করে গেলে ফল  
অবশ্য মিলবে। যথাযথ সম্পাদিত কর্ম্ম লক্ষ্য  
বা সাধ্যবস্তুরূপে ঘটিয়ে দেয়। কর্ম্মের একটা  
অন্তিম ফল পাওয়া যায়ই। কাজেই তপশ্চর্য্য  
ও ব্রত নিয়ম পালন করতে পারলে তার  
অবশ্যলভ্য ফল তুমি পাবেই। তপশ্চর্য্যের  
উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে অশুদ্ধ শরীর ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ  
করা। এই উদ্দেশ্য বহুদুঃখান্বিত অসং এবং  
কুসংস্কারভর মনিন দেহমনকে মালিন্যমুক্ত  
স্বচ্ছ স্বক্স লবু ও সংযত করবার জন্যই তপস্তার  
প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা প্রবুদ্ধ না  
বেশে কতকগুলি মৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে  
গেলে ফল লাভ সন্দেহপরাহত। যে কোনও  
কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর না কেন, তাহা জীবন্ত ও  
প্রাণবন্ত হওয়া চাই। সত্যনিষ্ঠা ও নিঃসংশয়ই  
আশু শিদ্ধি দান করে। (ক্রমশঃ)

## ছাত্র স্বামীত্ব

—\*—

শাস্ত্রে আছে, “ছাত্রাগামধ্যয়নং তপঃ।” এটা  
উক্তির তাৎপর্য্য স্বামীর জীবনে পূর্ণরূপে  
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র জ্ঞানার্জনের  
জীবনের লক্ষ্য করিয়া কিরূপে নিজের দেহ-  
মনকে তিনি সাধনার উপযোগী করিয়া

তুলিয়াছিলেন, এ কথা আমরা ঠাঁতপূর্বে  
উল্লেখ করিয়াছি। শুধু তাহাই নয়, অধ্যয়ন  
সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা ছিল  
অসাধারণ। তিনি নিজেই এক পুস্তক উল্লেখ  
করিয়াছেন, “নিজে খাটিয়া যে একটা বস্তু

অর্জন করিতে পারিল না, তাহার লাভ ভোলাভট নহে।” আমাদের দেশে কর্ত্তে আলস্য, অড়তা, সুপুষ্টি ইত্যাদি জাতির মজাগত দোষ বলিলেও অভ্যক্তি হয় না—বিশেষতঃ ছাত্রাদিগের জীবন সাংসারিক চিন্তাশূন্য থাকায় ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে শ্রমবিমুখীনতা তাহাদের মাঝে বেশী দেখা যায়। ছাত্রমহলে যে উৎসাহ ও উত্তম দেখা যায়, তাহা নিতান্তই যৌবনের রক্তের তেজ। ‘উঠা প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বটে, কিন্তু বিধিমত অনুশীলন দ্বারা উহার শক্তি বাড়ানো প্রায়শই ছাত্রদের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না। ইহার ফল পরবর্ত্তী জীবনেই দেখা যায়। নিকৎসাহ, দৈন্যের ভুগসা, হুঃখমেষ্ট ইত্যাদি সমস্তই তো সেই যৌবনের শ্রমবিমুখীনতার ফল। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্গ্যাদা না রাখিলে শেষে ভুগিতেই হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি।

তীর্থরামের শ্রমশীলতার দৃষ্ট একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহার দিনচর্যা সম্বন্ধে নিজেই একবার ধন্যমণকে লিখিয়াছিলেন, “আজ কাল আমি ভোরে সাড়ে পাঁচটার উঠিয়া গাতটা পর্য্যন্ত পাড়। তারপর শোচ, স্নান ইত্যাদি করিয়া ব্যায়াম করি, তারপর পণ্ডিতজীর কাছে যাই। রাস্তায় বাইতে বাইতে পড়ি। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে খাওয়াশাওয়া করিয়া তাঁহার সঙ্গে কলেজে বাই। কলেজ হইতে আসিবার সময় রাস্তায় হ্রদ পান করি। বাড়ী আসিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া নদীর দিকে হাটে। নদীর ধারে গিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা থাকি বেড়াই। সেখান হইতে কিরিমার সহর সূর্যের চারিদিক ও বাগানেও কিছুক্ষণ বেড়াই। তারপর ঘরে আদিয়া ছাতের উপর বেড়াইতে থাকি। শুভ-কক্ষে কলকার, হইয়া যায়। মনে রাখি-

বেন, খোরাফিয়ার মাঝেও কিন্তু আমার অধ্যয়নের নিবৃত্তি হয় না। অন্ধকার হইয়া গেলে ব্যায়াম করি, তারপর আলো ধরাইয়া সাতটা পর্য্যন্ত পড়ি। তারপর খাওয়াশাওয়া করিয়া গেমকে পড়াইতে যাই। ফিরিয়া আসিয়া ঘরের আড়া ধরিয়া দশ বার মিনিট ব্যায়াম করি। তারপর প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া শুইতে যাই। আমার মনে হয়, যদি পেটে গোলমাল না থাকে, তাহা হইলে আনন্দ, চিন্তের ক্ষুধা, একাগ্রতা, পরমাশ্রম স্বরণ-মনন ও অন্তঃকরণের শুদ্ধি অতি সহজেই হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও স্বরণ-শক্তিও তীব্র হয়। একে তো আমি খাট খুব কম; তা ছাড়া যা খাই, তাও ভাল করিয়া জীর্ণ করি।”

এই তো গেল তাঁর নিত্যকার নিরলস অধ্যয়ন। সময়বিশেষে গণিতের একটা প্রব্লেম হইয়া তিনি পূর্বাপুরি ২৩ ঘণ্টা কাটাষ্টরা দিতেন, তাঁহার আহারনিদ্রা বোধ পর্য্যন্ত থাকিত না। একবার এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, “রাম যখন পিছারখী ছিলেন, তখন প্রায়ই রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনি পুস্তক হাতে পড়িতে পড়িতে চলিতেন। তাহা দেখিয়া এক ভদ্রলোক একটু ঠাট্টার ছলে রামকে বলিলেন, ‘তুমি এ কি করিতেছ?’ এ তো আর তোমার স্কুল নয়, রাস্তায় চলিতে গেলে বইখানা মুড়িয়া বগলে বাগিতে হয়।’ রাম জবাব দাওলেন, ‘সমস্ত জগৎই আমার পাঠশালা।’”

আর একবার এই সম্বন্ধে তিনি একটি কোতুককর কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

“রাম যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন তাঁহারই

নাথের আর একজন বিদ্বার্থী তাঁহার সঙ্গে পড়িত। এই সহাধ্যায়ীটী কেবল টো টো করিয়া বেড়াইত। বেশীর ভাগ সময় তাব তান-গান, নাচা-কোঁদা আর ঘোরাফিরাত্তে কাটিত। একদিন এক ভদ্রলোক তাহাকে ক্রিস্টিয়ান করিলেন, “তুমি সাধাদিনের মাঝে পড় কতক্ষণ ?” ছেলেরা হাসিয়া বলিল, “১৮ ঘণ্টা।” ভদ্রলোকটা বলিলেন, “বল কি ! পাঁচ ঘণ্টা তো তোমাকে বেড়াইতেই দেখি ; খেলাধুলাতে কাটে আট নয় ঘণ্টা ; বাকী রহিল দশ বার ঘণ্টা ; তাহা হইলে আঠার ঘণ্টা পড় কি করিয়া ?”

“আপনি অক্ষপাত পড়েন নাই বুঝি ? আমি অক্ষ কথিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, কেমন করিয়া আঠার ঘণ্টা পড়ি।”

“এটে, আচ্ছা বল দেখি, কি করিয়া ?”

“আমি আর রাম একই ঘরে থাকি। ঠিক ঠিক হিসাবমত তো আমার বাগো ঘণ্টা পড়ার সময় থাকে ; আর রাম পড়ে চক্কিশ ঘণ্টা ;  $১২ + ২৪ = ৩৬$  ঘণ্টা ; ছুইজন এক কোঠায় থাকি ; সুতরাং গড় কথিলে আমার ভাগে আঠার ঘণ্টা পড়ে না কি ?”

“তুমি নাহয় বার ঘণ্টা পড় ; কিন্তু রাম চক্কিশ ঘণ্টা পড়ে, এ কথা মানি কি করিয়া ? এ কি সম্ভব ? আমি জানি, রাম অনেক গুলি বিষয় পড়িতেছে, তাহাকে খুব খাটিতে হয়, এমন কি সে অপর ছেলের চতুর্গুণ পরিশ্রম করে। কিন্তু প্রকৃতির বিকক্ষে ২৪ ঘণ্টা কাজ সে করিতে পারে কি করিয়া ?”

“রাম বখন খাটিতে বসে, তখনও সে বিনা কাজে থাকে না ; একটা কিছু না কিছু তাহার কাছে থাকেই। হয় সে কিছু পড়ে,

না হয় কোনও সমাধান নিয়া তখনও বাস্ত থাকে। উইয়া আছে তো কোনও সমস্যা নিয়া বিচার করিতেছে। ঘুমাইবার সময়ও সে যা ভাবে, তারই স্বপ্ন দেখে। কাজেই চক্কিশ ঘণ্টাই সে অধ্যয়ন করে বই কি !”

“সহাধ্যায়ী বাহা বলিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই সত্য ; কারণ যে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে, তাহার জাগ্রদবস্থায় যে কাজ হয়, নিদ্রিতাবস্থাতেও তাহারই জেগ চলিতে থাকে।”

এইরূপ নিরলস অধ্যয়নের ফলে তাঁহার সুস্বাস্থ্যবান এমন জাগিয়া উঠিয়াছিল যে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

“রাম নিজের অমুভব হইতে বলিতে পারেন যে, তাঁহার পাঠদশার অনেক সময় জাগ্রদবস্থাতে গণিতের যে সমস্ত মীমাংসা অপূর্ণ রহিয়াছে অথবা বহু বিচার করিয়া যে বিষয়ের তিনি সমাধান করিতে পারেন নাই, তাহা স্বপ্নাবস্থায় আশ্চর্যরূপে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।”

এই নিরলসতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাঝে ছিল এচণ্ড আত্মনির্ভর। তিনি যাহা কিছু শিখিতেন, তাহা কেবল মাত্র নিজের চেষ্টায়—কোনও শিক্ষক বা সহাধ্যায়ীর নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। আত্মশক্তির এইরূপ অহরহঃ, অনুশীলনের ফলে তাঁহার মেধাও স্মৃতি এতই প্রখর হইয়াছিল যে ভুলিয়া যাওয়া কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেনই না। সর্বোপরি পরমায়ার উপর নির্ভর থাকায় তাঁহার সমস্তে এমনি একটা দৃঢ়তা ছিল যে, “দেহং পাতয়ামি বা কৃত্যং সাধয়াম” বলিয়া অথও মনোবৃত্তি লইয়া তিনি একটা কাজে লাগিয়া বাইতে

পারিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “রাম যখন বিজ্ঞাপিতের উর্দ্ধ শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে অধ্যয়ন বিষয়ে তিনি কখনও কোনও শিক্ষকের সাহায্য লইবেন না। অনেক সময় এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিত। গণিত শাস্ত্রের দ্রুত অংশগুলি অরত্ত করিবার জন্য রাম এরূপ কিছু পাওয়া মাত্রই তাহাতে লাগিয়া যাইতেন এবং কোনও আচার্য্য বা সহায়পুস্তক আলোচনা না করিয়াই প্রশ্নটি অরত্ত করিতেন। কিন্তু সকল সময় জয় লাভ হইত না। হয়ত সন্ধ্যা পাঁচটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত রাম একটা সমস্তা লইয়াই থাকিতেন, কিন্তু মীমাংসা মিলিতেছে না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া একটু তাজা হাওয়া নিবার জন্য ছাতে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখনো হয়ত মীমাংসা হইল না। তখন রাম শরীরপাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন— আর এমনি মীমাংসা আপন! হইতে ভাসিয়া উঠিল।”

একদিনের ঘটনা রাম নিজে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

“একদিন রাত্রে গণিতের খুব কঠিন কয়েকটা সমস্তা লইয়া রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ ভোর না হইতে এগুলো তিনি

মীমাংসা করিবেন। যদি না পারেন, তাহা হইলে মস্তক বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবেন। তার জন্য বিছানার নীচে একখানা ছুরীও রাখিলেন। অবশ্য এ কাজটা ভাল বলা চলে না, কিন্তু রামের ইচ্ছা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল হউক মন্দ হউক, এইরূপ কঠিন তপস্তা দ্বারা তবে তাঁহাকে জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছে। দুপুর রাত্রে পূর্বের চারিটা প্রশ্নের তিনটির মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু চতুর্থ প্রশ্নটি লঙ্ঘাই গেল বাধিল। সেটির মীমাংসা হইতে না হইতেই ভোরের আলো জার্নালার ভিতর দিয়া উকি দিল। প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাম আসন ছাড়িয়া ছুরী নিয়া ছাতে উঠিলেন এবং সেটা গলায় বসাইয়া দিলেন। ছুরীটা গলায় বিঁধিয়া রক্তও বাহির হইতে লাগিল, এমন সময়ে রাম যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া গেলেন। তখনই সম্মুখে দেখেন, আকাশের গায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর অগ্নিঅক্ষরে লেখা রহিয়াছে। রাম উহা অরত্ত করিয়া অঙ্কটি কয়িয়া ফেলিলেন। পরদিন তাঁহার সমাধান দেখিয়া কলেজের অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। বহুবার এমনি কঠিন তপস্তা দ্বারা রামকে গণিতের জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছে।” (১৪)

নদীয়া—কুতুবপুর—

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানে আশ্রম-স্থাপনকল্পে দানপ্রাপ্তি

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালী, নদীয়া ৩১, শ্রীকালীপদ দাস, নাটনা, নদীয়া ১৩, শ্রীকালীপদ দাস কর্তৃক সংগৃহীত ৩৭, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, ধিতপুর, ময়মনসিংহ ৫০, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র রায়, ধিতপুর, ময়মনসিংহ ১০, শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, গারুলিয়া, ২৪পরগণা ৪, জ্ঞানরত্ন শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ, আবুতরাপ, চট্টগ্রাম ৫। (ক্রমশঃ)



## আরণ্যক

—: { # } :—

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীৰ্যমায়ন তামস্বিনন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥”

কাজের নেশার মানুষ চোখের সামনে সব্বে ফুল দেখে। কিন্তু সে ফুলে যে সব্বে ধরেছে, এ কেউ কখনো শুনেছে? তবু নেশাখোরের খেয়াল, বুদ্ধির ধানিতে পিষে সেই সব্বে থেকে তেল বের করবে। মরণ আর কি। বার মগজটা একটু খিঁতয়ে এসেছে সেই সাদা চোখে দেখতে পার, কই, কোথায়ও তো কিছু নেই—সবি যে ফাঁকা! কাজের মাং-লামো থেকে জানী তাই বিশ হাত তফাৎ দিয়ে যান। মাতাল কিন্তু ভাবে, যে মদ খেলে না, সে আবার মনিস্ত্রি।

✱

বোধ হয়, বেশীর ভাগ মানুষট জবাব-দিহীর ভয়েই কাজ করে। জবাবদিহী বার কাছে করতে হয়, সেই তো প্রভু। সে আছে বাইরে বাইরে, তার স্বরূপ জানি না বলেই ডরিয়ে মরি। কিন্তু আদল ভয় যে মানুষের নিজেকে, সে কথা কেউ জানে না। নিজের কাছে যে জবাবদিহী করতে হয়, সেটা যত মারাত্মক, পরের কাছেই তত নয়। বুদ্ধির গোড়ায় জল এলে মাছুষ এ কথাটা বুঝতে পারে। নিজের কাছে যদি মন খোলাসা হয়ে যায়, তবে পরের তোরাকি রাখে কে? কিন্তু মাছুষ নিজের মনের কাছেই ভয়ে সব কথা খুলে বলতে পারে না, অথচ ভাবে, সেবুঝি পরকে ডরায়, পরের গোলাম।

✱

সংঘের যিনি নেতা—জীব-সৰ্ব্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আনন্দ করা—উৎসাহে সৰ্ব্বদা জ্বল জ্বল হয়ে থাক। শুধু মুখেও যদি আমরা কাউকে প্রভু স্বীকার করে থাকি, তাহলেও তার প্রভাব হতে চিত্তকে নিম্নুক্ত রাখা বড় কঠিন। প্রভুর ব্যবহারে মনে মনে যতই বিদ্রোহ করি না কেন, তার মুখের ভালমন্দ ছুটো কথায় মনটা যে ওঠে নাশে, এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? সেবক এটাকে তার ছুঁয়োগ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু প্রভুর স্পক্ষে এট মনোবৃত্তিটাট হচ্ছে একটা মন্ত ব্রহ্মযোগ। আমার চিন্তার, আমার কথার ধার আছে, তার আছে—এ ভাবটা মুখে বা ব্যবহারে প্রকাশ না করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে বে বিশ্বাস করে, সেই যথার্থ প্রভুত্ব করতে পারে। এমন কি পরিস্থিতিকে অগণন খুসীমত গড়ে তোলাও কতকটা তার আয়ত্তের মাঝে। নিজের মাঝে যে সম্মোহন শক্তি রয়েছে, এ কথা মানুষ জানে না বলেই বৈবের তরসা করে ছুঃখ পায়।

✱

এ ভাবটা যে বুঝেছে, নেতাগিরি তারই সার্থক। সে জানে, যে একবার আমার প্রভু স্বীকার করেছে, তাকে হাসানো কাদানো কতকটা আমার হাতেই। তবে কিনা লোকে

মাথা ঠিক না রাখতে গেলে কন্যার অপ-  
ব্যবহার করে ফেলে। বৈদান্তিকের মীমাংসা  
এই, গড়বার ডালবার শক্তি তোমার আছে—  
এই জেনে কেবল আনন্দ কর—সুখেও আনন্দ  
কর, দুঃখেও আনন্দ কর। নিতরূপ থেকে  
আনন্দ কর, দেখবে যত লঘু হয়েছে, তাকে  
প্রাণ এসেছে—সুখাসুখ। বিষমুখ সব উজ্জল  
হয়ে উঠেছে। আর তাই যদি বা না হয়,  
তোমার আনন্দ আর মারে কে? আনন্দের  
কাব্বারে স্রবীণা এইটুকু যে পথের হিসসা  
বজার থাকে বা না থাকে, নিজের ভাগ তো  
কেউ কাড়তে পারবে না।

\*

আগে জাহাজ চলত পালের ভরসায়।  
বাঁইরে থেকে বাতাসে যদি ঠেলা দিল, তবে  
জাহাজ চলল—নইলে পাল মুড়ি দিয়ে অধৈ-  
র্যে সমুদ্রে অচল হয়ে নইল। তাঁর ঈশ মাহুকের  
বখন বুদ্ধি বাড়ল, তখন সে জাহাজের  
খোলার ভিতরেই কল বসাল। এখন আর  
নমুকা হাওয়ার ভরসা করতে হয় না। কল  
টিপলেই জাহাজ চলে। আমরাও প্রথম বখন  
আনন্দ চাই, তখন পালের ভরসা করি;  
পরে দেখি, কল বসালেই তো হয়।

\*

এক এক সময় প্রাণে অভাব জেগে  
ওঠে, অগতঃ বাঁইরের কিছুতেই তা মিটে চার  
না। বৃদ্ধ হলে, যিনি তোমার অন্তরে  
রয়েছেন, তাঁর মাকে বিরতের সন্ধান জেগে  
উঠেছে—তিনি চান, একবার বাঁইরের কোলা-  
হল ছেড়ে নিরাশ্রয় তাঁকে নিয়ে বসে। ধ্যান  
কন্যার, চিন্তা একাগ্র কন্যার উঁট তো সময়।  
অগতঃ বোকা গাছ বখন কিছু ভাল লাগছে  
না বলে কেবল এদিকে ওদিকে ঠোঁকর দিয়ে

বেড়ার—অন্তর্যামীর করণ আদর্শান তনুতে  
পার না বা চার না।

\*

জীবন চাই না—মরণ চাই, এ হল গভীর-  
ভেদী পুরুষের কথা। বাস্তবিক মরণে যত  
শান্তি, অত শান্তি বিবরের মাঝে কোথায়?  
প্রান্তির বিশ্রাম, আর্তির আশ্রম, বাসেলার  
বিরাম—ওই তো মরণ। এ মরণ যেদিন  
প্রকৃতির পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়,  
সেদিন মানুষ হয়ত জীবনটাকেই আঁকড়ে  
ধরতে চায়। অগতঃ জীবনের মুখরতার মাঝেই  
মরণের প্রশান্তি সে কতবার খুঁজেছে। তবে  
কি তার কাছে ছোটো মরণ? হলেও বা।  
চেতন মরণ তার অবসরমত আশ্রয়; আনি  
চাই মনের মরণ—সেই তো আমার খেরল-  
খুসীর খেলা।

\*

সাপুর অপমান দ্বারা করে, তারা প্রকৃতির  
অপমান করে শুধু। আসল সাধু তো শিব;  
তাঁর অপমান করে এমন সাধ্য কার? দক্ষ  
রাজার স্বর্গাভিমানের মত দেশে অভিমান  
কোঁপে উঠেছে বড়; আপন মেয়ে সতীকে  
সে চিন্তা না; শিবের অপমান করতে গিয়ে  
সে আপন মেয়ের প্রাণ নিল। পরিণাম হবে  
যে। ছাগের মুণ্ড, সেই দুঃখেই তো প্রাণ  
কাঁদে। তবেই কি সতী প্রকৃতি বেঁচে  
থাকতে শিবের গায়ে আঁচড়টুকু সে লাগতে  
দেবে? সাধুর নিন্দা কি এতই সহজ?

\*

দেহটাকে তিল তিল করে হত্যা করলেও  
পাপ হয় না কাদের?—যারা বাহুদেবের দেখা  
পেরেছে। বিহক গাছারী প্রায়োপবেশনে  
মল্লগন, হৃদিকে নয়; সে কি কম অধিকার?

সবার আশা পূর্ণ হোক—নিরাশার বোঝা  
বইবার জন্য আছে তুমি—এই বীরত্বের গর্বে  
নির্ভিকন হয়ে থাক।

\*

চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস অর্জন করো না—চেও  
লী, আপনি পাবে। তুমি তো আর ভগ-  
বানের পরীক্ষক নও!

\*

সিংহ আর অশ্বরে লড়াই হচ্ছে, উমা  
আমার পা রেখেছেন ছরেরই উপর। বিরোধ  
হতে বাঁচবার এই পথ।

\*

একটা নক্ষত্র জ্যোতির বিলুপ্ত মাত্র—সে  
হিসাবে তার মূল্য নাই; কিন্তু অনন্ত নীলা-  
কাশে একটা গোপালির নক্ষত্র, সত্যের শুভ্র  
ললাটে একটা সিন্দূরবিন্দু!—কার রূপে কার  
রূপ? ছোট হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু নীলাকাশে  
ভারা হয়ে ফুটে ওঠ!

\*

মনমরা যদি হতে চাও, তো দৃষ্টি মত্ত রাখ।  
চোখ বঁড় মস্ত সমালোচক—মুখের দিকে  
তাকিয়েই ভাল না মন্দ আর দিল্লি বসি; আর  
মন তা নিয়ে যেতে ওঠে। তাতে তোমার  
লাভ?

\*

যাকে চোখ দিয়ে দেখি না, তাকে বুক  
দিয়ে দেখি। ভাবতেই যাক্তে পাই, সে যে  
আমার কত সঙ্গী, কত আপন, নাস্তিক তা  
মানবে কেন?

\*

সোজামুজি দেখার মানে জানা; আর  
আড়নয়নে চাওয়ার নাম ভালবাসা। যে  
আড়নয়নে তোমার দিকে চাইছে, তাকে  
শত্রু ভাবি কেন? ও যে তোমার বদিক  
বঁধুর চোরা চাউনী। বাইরে যাকে দেখছ,  
সে তো দূতী মাত্র—সে লিখন এনেছে শুধু  
ভিতরের খুবর কি জানে?

\*



## নিবেদন

আসামবন্দী সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ  
পরমহংসদেব আগামী শারদীয় 'পূজার অবকাশে তাঁহার জন্মভূমি' পরিদর্শন  
উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলার মেহেরপুর সুবডিবিসনের স্বস্ত:পাতী কুতুবপুর গ্রামে  
পদার্পণ করিবেন এবং তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত এই শুভ সুযোগে শ্রীশ্রীগুরুদেবের  
জন্মভূমি মহাপীঠ দর্শন করিতে তাঁহার অনুগামী হইবেন—এই মর্মে একটি প্রস্তাব  
বিগত তন্তুমস্মিলনীতে গৃহীত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের তন্তুমসহ জন্মভূমি দর্শন  
তিথিটি চিরস্মরণীয় করিতে এবং তাঁহার বিরাট উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতা-  
কল্পে তাঁহারই শুভ নির্দেশের অনুসরণ করিয়া তন্তুমগুলী এই উপলক্ষ্যে  
তাঁহার জন্মভূমিতে একটি আশ্রম ও তন্তুমসহ "ঋষি-বিদ্যালয়" স্থাপন করিতে উৎ-  
সুক হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপযোগী এক খণ্ড জমী খরিদ



করিবার আয়োজন হইতেছে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের পিতৃপিতামহের ভিটায় একটি ইষ্টক মন্দির তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রতি ৩৪খানা ধীর উঠানও প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত কার্য্য নির্বাহের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমি তদীয় শিষ্যবর্গের নিকট সর্ববর্তীর্থের সারস্বরূপ; এই পুণ্য ভূমিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে পাওয়া আমাদের মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অনুরাগী শিষ্যভক্ত মাত্রই এই শুভ অমুষ্ঠানটির সফলতা কল্পে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্পই হউক না কেন, তাহা দিতে কেহ কোনও সঙ্কোচ করিবেন না; মনে রাখিবেন—

“তুণৈগুণজ্ঞানাপন্নৈর্কৰ্ম্মণ্যন্তে মন্তদন্তিনঃ।”

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্তিক হইতে ৩রা কার্তিক পর্যন্ত একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক আগামী ১৫ই আষাঢ়ের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও আশুযজ্ঞিক বায়াদি নির্বাহজন্ত জন প্রতি ৫/- নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, সুতরাং উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুতুবপুরে যে আশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, তাহার সাহায্যার্থ যিনি যাহা দিতে চাহেন, তাহাও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে।—

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা— “

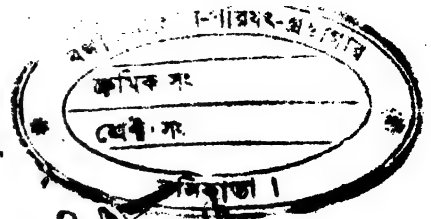
শ্রীঅগ্নিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া  
( অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি )

## সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্তমান মাসের ২২শে তারিখ শিলং রওনা হইবেন। তথা হইতে শ্রাবণের প্রথম ভাগে কলিকাতা যাইবেন। কলিকাতা হইতে মেঘের ঝড়গার সম্ভাবনা আছে। সম্ভবতঃ শ্রাবণের মধ্যভাগেই পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিবেন। তাঁহার পুরীর টিকানা—“নীলাচলকুটীর, স্বর্গদ্বার—পুন্ড্রী।

সাহায্য/বিশেষতঃ “মঠে দানপ্রাপ্তি-বীকার” এই সংখ্যার প্রকাশিত হইল না।





উত্তম সং

# আমি-দেবতা

১৯শ বর্ষ	শ্রাবণ	প্রথম খণ্ড
সমষ্টি সং: ১৯৬		চতুর্থ সংখ্যা

## ইন্দ্রায়

—\*—

[ প্রবেশ-সংহিতা—৩৩১ ]



[ বিখ্যাত পদ্য:—ইন্দ্রো দেবতা—ব্রিষ্ট পৃষ্ঠদঃ ]

ইচ্ছন্তি জ্ঞা সৌম্যাসঃ সখ্যায়ঃ

সুবন্তি সোমং দধতি প্রযাংসি।

তিতিক্ষন্তে অভিশন্তি জনানাম্

ইন্দ্র হ্রদা কশ্চন হি প্রকৈতৎ॥

সখা তারা, সৌম্য তারা, তোমারেই করে আকিঞ্চন,

নিভারি হবির সাথে সোমরস করেছে সিঞ্চন,

অভিশাপ অপম্মন সহিয়াছে পাতি দিয়া শির,

জানে তারা, তোমা হতে, শ্রেষ্ঠ কেবা এই ধরণীর।

ন তে দূরে পরমা চিত্রজাংস্  
 আ তু প্র যাহি হ্রিবে হ্রিভ্যাং ।  
 হ্রিরাং হ্রশেঃ সবনা ক্রতেমা  
 যুক্তা প্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ ॥

দূর যারে বলি মোরা, তুমি তারে কর না গণন,  
 হরিৎ তুংগে চাপি এস হেথা, হে হরিবাহন ।  
 অটল অটল তুমি, কল্লতরু, কর সোমপান,  
 সমিক্রিয়া হোমশিখা জুড়িয়াছি সোমের পাষণ ।

ইন্দ্রঃ সুরিশ্রো অমবা তক্ষত্রো  
 মহাত্রাতস্তবিকুর্গ্নি ঋবাবান্ ।  
 ঋদুগ্নো ধা বাধিতো মর্ত্ত্যেযু  
 কৃত্য তে স্বষভ বীৰ্য্যানি ॥

দেবের সহায় তুমি, মঘবন, কিরীটী সূন্দর,  
 সংঘনেতা, চিত্রকর্মে রণমাঝে মহাভয়ঙ্কর !  
 শত্রু হতে পেয়ে বাধা উগ্ররূপ করিতে ধারণ—  
 কোথা সেই বীর্য্য তব, করিলে কি তারে সম্বরণ ?

ঋং হি আ চ্যাবস্বন্নচ্যুতান্য্  
 একো ঋত্রা চরসি জিহ্মমানঃ ॥  
 ত্বন দ্যানা পৃথিবী পর্ব্বতাসো  
 'হনুত্রতাস্য নিমিতেব তস্মুঃ ॥

অচ্যুতের দর্প 'দলি টলায়েছ তারে বার বার,  
 যেথা যে কলুষ আছে, ফিরিয়াছ করি ছারখার ;  
 ছ্যালোক-ভুলোফ-গিরি নেয় মেনে তোমার শাসন—  
 মহাশূন্যে তাই বুঝি পাতিয়াছে অটল আসন ।

উত্‌ভয়ে পুরুষত প্রবোধি-  
 স্নেহো দৃঢ়মবদো' ব্রতহা সন।  
 ইমে চিদিদ্র বোদসী অপারে  
 স্বং সৎপূর্ণা মববন্ কাশিরিতে ॥

যাচিয়া অভয় তব রচি গাথা যুকারে যে সবে,  
 সত্য তুমি ব্রতবাতি, দৃঢ়কণ্ঠে বল, “তাই হবে।”  
 ছালোক-ভুলোক এই, নাহি যার হেরি পারাপার,  
 তাদেরো জুড়েছ তুমি—খ্যাতি তব ছেয়েছে সংসার।

প্রমুত ইন্দ্র প্রবতা হরিভাণ্ড  
 প্রতে বজ্রঃ প্রমুগ্নেন্তু শত্রুণ।  
 জহি প্রতীচো অনুচঃ পরাচো  
 বিশ্বং সত্যং কুণুহি বিষ্টমস্ত্র ॥

হরিহয়যুক্ত রথ নিম্পানে আসে গরজিয়া—  
 দীপ্ত তব বজ্র যেন অরাতির চূর্ণ করে হিয়া;  
 সম্মুখে যে পড়ে কেহ, পিছে থাকে, যায় পলাইয়া—  
 হান শিরে বজ্র তার সত্যালোকে বিশ্ব বিথারিয়া।

স্বপ্নে শাম্বুরদধা মর্ত্যাসা-  
 হভক্তঃ চিদভজতে গেহং সঃ।  
 ভদ্রা ত ইন্দ্র স্মৃতি স্মৃতাচী  
 সহস্রদানা পুরুষত ন্নাতিঃ ॥

অসীম সম্পদ তব, কণা তার পায় যদি কেহ,  
 চোখে কভু দেখে নাই, হেন ধনে ভরে যায় গেহ;  
 জ্যোতির্ময় শুভাশিষ নিখিলের করেছে কল্যাণ,  
 দাতা তুমি, বিশ্ব পুরে বসে তব অফুরন্ত দান।



## নারদীয় ভক্তি



ইতিপূর্বক ব্যাসদেব, গর্গ ও শাণ্ডিল্য এই তিন ঋষির কথিত ভক্তির লক্ষণ নিয়া আমরা সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াছি এবং ইহাই দেখাটতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাদের প্রদর্শিত সাধনা স্তরে স্তরে উত্তরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে এবং একজন সাধকের জীবনেও স্তরভেদে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে। অতঃপর দেবর্ষি নারদ কথিত ভক্তির লক্ষণ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এক কথায় বলিতে গেলে নারদোক্ত ভক্তির লক্ষণ অপর তিনটি লক্ষণের সমন্বয় স্বরূপ। উহা ভক্তির প্রাণ বস্তুটিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলা যাইতে পারে। নারদ বলিতেছেন, তদর্পিতাখিলচাক্ষুতা ও তদবিস্মরণে পরম-ব্যাকুলতা—ইহাই ভক্তির লক্ষণ। অশ্রান্ত ঋষির কথিত লক্ষণ হইতে ত্রাসভয়া দেখাইতে পারিলেই ইহার তাৎপৰ্য্য পরিস্ফুট হইবে।

ব্যাসদেব বলিতেছেন, ভক্তির প্রকাশ পূজায়। পূজা বিধির আশ্রিত; উহাও কৰ্ম বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কৰ্ম। আপাততঃ পূজা বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। স্মৃতরাং প্রবর্তসাধকের পক্ষে আংশিক কৰ্ম সমর্পণই ভক্তি, ইহাই ব্যাসদেবের মত। নারদ বলিতেছেন, শুধু উৎকৃষ্ট কৰ্ম কেন, তুমি বাহা কিছু কর, সমস্ত তাঁহাকে সঁপিয়া দাও—তোমার সমস্ত আচার ভগবানে সমর্পণ কর। গীতার নবম অধ্যায়ের হইটী শ্লোকে ভগবান্ এই হইল

সাধনা শাশাশাশি করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথম বলিলেন, ভক্তিপূর্বক “পত্রং পুষ্পং ফলং ভোয়ং” যে আমাদের দেয়, আমি তাহার সে সমস্ত গ্রহণ করি। ইহাই পূজা, ব্যাসদেব ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। ভক্তির সাধনায় এতী গৌণ। ভগবদ্ভাক্তিতেও সেইরূপ ভাবেই ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনিও বলিতেছেন—যে দেয়, তাহার দান আমি গ্রহণ করি; যেন, দাতার ইচ্ছার উপরই তিনি নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন, কাড়িয়া লইবার মত জোর দেখাইতেছেন না। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকেই আবার বলিতেছেন, “তুমি যা কর, যা খাও, যা হোম কর, যা দান কর, যা তপস্বী কর—সব আমাকে দাও।” ইহাই সমস্ত আচার তাঁহাতে অর্পণ করা—এ ভাব পূজার বাড়ী। তাই ভগবানও এবার দূরে থাকিয়া বলিলেন না যে, যে আমরা দেয়, তারটা আমি নিই, একেবারে জোর করিয়া ছাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, “তুমি দাও—নহিলে আমার চলে না।” সম্বন্ধ নিবিড় হইল কোনটাতে ?

অন্য পূজার মাঝে যে সস্ত্রম, যে সন্তোষ-কৰ্ম রহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু তথাপি এই সন্তোষকৰ্ম, এই দেবারতির ধূপ-গন্ধটুকু যেদিন সমস্ত কৰ্মে ছড়াইয়া পড়িবে, সমস্ত কৰ্মই যে দিন পূজার আকার ধারণ করিবে, সেই দিন ভক্তির পরিপুষ্টি হইবে—উহাই হইবে নারদীয় কৰ্মসমর্পণ।

গর্গ বলিতেছেন, শ্রবণকীৰ্তনে অনুরাগই ভক্তি। পূর্বে বলাগাছি, ইহা পূজা অপেক্ষাও

উন্নত অধিকার, কেননা উহা মননের অন্তর্গত। কিন্তু ইহার মাঝেও একটু বিধির গন্ধ আছে। যেখানে বিধি, বুঝতে হইবে, সেখানে স্বভাবের উপর একটু জবরদস্তি হইতেছে—ঠিক প্রাণ হইতে আনন্দ উৎসারিত হইতেছে না। তাই ঐশ্বর্য শ্রবণ কীর্তনেরও পরিণতির অপেক্ষা আছে। কীর্তন অপেক্ষা জপ শ্রেষ্ঠ। জপ যদি স্বাসের সঙ্গে গাঁথা হইয়া যায়, তাহা হইলে আরও ভাল। যখন স্বাস ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তখন জপ ছাড়িয়াও থাকিতে পারি না। সুতরাং ইষ্টস্বত্তি সর্বদাই জাগরুক থাকিবে; যদি ক্ষণেকের জন্তও ভুলিয়া যাই, তবে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে। যেমন স্বাস সহজভাবে নিই, তখন খেয়াল থাকে না, কিন্তু একটা বারের জন্ত বন্ধ করিতে গেলেই প্রাণের বন্ধন উধারিয়া আসিতে চায়; ইষ্টের স্বত্তি যখন এমনি করিয়া প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া যায়, তখন আর বাহ্য শ্রবণকীর্তন প্রয়োজন হয় না। ইহাও গর্গকথিত সাধনার পরিণতি। নারদ ইহার কথাটি বলিতেছেন, তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা—ইহাও ভক্তির লক্ষণ।

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, 'নারদোক্ত ভক্তিলক্ষণের দুইটি কোণীতে ব্যাসদেব ও পরমাচার্য্যের লক্ষণ দুটি পরিণত ও পরিপুষ্ট হইয়া স্থান পাঠিয়াছে। শান্তিলোক্ত লক্ষণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার নাট। উহা নারদোক্ত লক্ষণের অণুতে অণুতে অন্তর্গত রহিয়াছে। যেমন আমাকে আমি ভালবাসি, আমাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করি, আমাকে এক মুহূর্তের দরুণ ভুলিতে পারি না, তেমনি করিয়া তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার কর্ম্ম করি, তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। শান্তিল্য জ্ঞানের

খুঁটি ধরিয়া আছেন, নারদ তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান প্রেম অস্বাভিভাবে জড়িত। তাই একের লক্ষণ অপরে অন্তর্গত।

নারদের কথা এভাবে প্রাণের সহজ কথা। কোনও কৃত্রিম আচরণের প্রয়োজন নাট, ভাস্গাগড়ার প্রয়োজন নাট; যেমনটাই আছে, যেখানে আছে, ঠিক সেইভাবে সেইখানে থাকিয়া আপনাকে বিলাইয়া দাও। যাহা হুঃপ পায় কখন?—যখন সে একা থাকে। এক 'হওয়ার, কেবল হওয়ার সাধনাও আছে বটে, কিন্তু আমি বলি, তার মাঝে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। এক হইয়াও দুই—এই হইল আনন্দ—ইহাট সহজ ভাব। বেদেও আছে, "পরম পুরুষ সৃষ্টির আদিতে এক ছিলেন, কিন্তু তখন যেন তাঁহার ভয় ভয় করিতে লাগিল; সেই অসোয়াস্তি দূর করিবার জন্ত তিনি দুই হইলেন।" এটা পরম রসিকের অনুভূতি। তাই বলিতেছিলাম, একা একা শুধু আপনাকে নিয়া যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম হইয়া উঠে জ্ঞান, মন হইয়া উঠে একটা বোঝা। তাই কর্ম্মকে সরস করিতে, মনকে ক্ষুর্ভিগুস্ত করিতে আর কাহাকেও আমার প্রয়োজন। যাহাকে চাই—সে আমার মত হইয়া আসুক; কিন্তু আমাকে তাহার মত করিয়া নিক। মোট কথা 'বিজাতীয়, সঙ্গাতীয়, স্বগত, কোনও প্রকার ভেদ যেন না থাকে, 'অথচ বৈভূতের বিলাসিতা যেন থাকিয়া' যায়। যাহার অন্তরে এমনি আর একটা আত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে—আত্মা যার আত্মদর্শন করিতে যে শিখিয়াছে—সেই তো শ্রবী।

কবি শান্তিলোর কথাতেই বলি, আমা-  
কেও আমি চাই বটে, কিন্তু তাহাকেও চাই ;  
এক দিকে আত্মরতি আর এক দিকে  
অনুরাগ—দুইয়ে অবিরোধে সন্ধি হইয়া  
বাটক—এই মিলনের মালঞ্চ অখিলাচার-  
সমর্পণরূপী সেবার ফুল ফুটিয়া উঠুক—হারা  
হারা তরে বিরহের ব্যাকুলতা অচর্নিশ  
আমাকে মধুর শব্দর বিহবল করিয়া রাখুক।  
আর কি চাই, বল !

তুমি বলিবে, এমনটা কি কাহারও  
হইয়াছিল ? নারদ বলিতেছেন, হাঁ, ব্রজগোপী-  
দের তাই হইয়াছিল। ভগবান নিজ মুখে  
তাহাদের কথা বলিয়াছিলেন, “ভারা আমার  
তরুণপ্রাপ সঁপিরা দিয়াছে, আমার জ্ঞাত  
লোকবর্ষ ছাড়িয়া দিয়াছে, তাই আমি  
তাহাদের বুক করিয়া রাখিয়াছি। যদি আমি  
চোখের আড়াল হইয়া গেলাম, তাহা হইলে  
তাহারা আর প্রাণে বাঁচে না—বিরহে  
উৎকর্ষ্য বিভোল হইয়া আমার কথাই  
ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের অঙ্গ এলাইয়া  
পড়ে। আমি আসিব, এই সংবাদটুকু পাইরাই  
কোনও রকমে তাহারা বাঁচিয়া থাকে মাত্র।  
অধিক কি আর বলিব, আমিই তাহাদের  
আত্মা, তাহারা একান্ত ভাবে আমারই।”

এই ভালবাসা কি আত্মপ্রীতি ? না,  
আবার হাঁও বটে। যদি বল ভালবাসিয়াই  
গোপীন্দ্র সুরেশ, তাহা হইলে সেই তো  
হইল আত্মরতি। যদি বল, গোপী কৃষ্ণও  
সুরেশ সুরী, তাহা হইলে আত্মপ্রীতির  
অবকাশ রহিল কোথায় ? এই একটা  
হেরানী। আসল কথা হইতেছে, আত্মপ্রীতি  
কথাটাই গুণগোলের। আত্মা তো স্বয়ং

প্রীতি স্বরূপ ; সুতরাং বাহ্যে তাহার ক্ষুধি  
হইবে, তাহাতেই প্রীতিমুখ উৎপলিয়া উঠিবে,  
ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আত্মার ক্ষুধি তো  
সদাসর্বদা হয় না ; কত আবরণে তাহাকে  
চাকিয়া রাখিয়াছে—এই আবরণগুলিই  
আত্মা, এই ভুলে জীব মজিয়াছে। যখনই  
ক্ষুধ একটা বস্তুকে আত্মা বলিয়া লক্ষ্য করিয়া  
তাহারই ক্ষুধি সে খুঁজিয়াছে, তখনই তাহার  
মাকে কাম আগিয়াছে এবং এট কামে স্রবের  
সঙ্গে হৃৎকের আলাপ আসিয়া জুটিয়াছে। তাহা  
হইলেই দেখি, কামবর্জনেই যথার্থ আত্মার  
ক্ষুধি, তাহাতেই আনন্দ, আত্মার সহজ বিমল  
আনন্দ। জোর করিয়া বর্জন কর, তাহাতে  
ক্ষতি নাই ; কিন্তু তাহার চেয়েও সরল  
একটা পথ আছে—সমর্পণের পথ। বাহ  
জীবন্তভাবে আমার কামনার ছিল, তাহা  
তোমার করিয়া দিলাম। তোমার শক্তি  
তোমাকে কিরীইয়া দিলাম—আত্মা নির্মল  
হইল। এই বার প্রীতিমুখ উৎপলিয়া উঠিবে  
না কেন ? সমর্পণের মূলে এই তত্ত্ব রহিয়াছে।  
এই জ্ঞাত দিয়া মুখ। দিলে আপনাকে পাই—  
বাহ্যকে দিই তাহাকেও পাই—দুইয়ে অভেদ  
হইয়া যায়। ইহাই আনন্দ—ভক্তির চরম  
সার্থকতা। ইহাকে আত্মরতি বল, আপত্তি  
নাই, তত্ত্বসুখমুখি বল—একই কথা। তবে  
এ যে আনন্দ—অক্ষয়, অব্যয়, সহজ আনন্দ—  
সে কথায় তো ভুল নাই।

দেবর্ষি নারদ এই সহজ আনন্দের পথটাই  
দেখাইয়া দিলেন—বলিলেন, “সব তাহাকে  
সঁপিরা দাও ; তাহাকে ভুলিও না—ভুলিতে  
পার না—কেননা সে যে তোমার আত্মা—  
ভুলিতে গেলে মন্দের বন্ধন হিঁড়িয়া বাইবে  
না ?”



## ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]

—: { \* } :—

হে নরনারীকপী অদ্বিতীয় ভাব ও সংস্করণ  
পরমাশ্রয়,

আজ রাত্রিকার বজ্রগার বিষয়টা ভারী  
কঠিন আর গোলমেলে। দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে  
যাদের পূর্বে হতে একটু পরিচয় আছে, তারাই  
এম যথার্থ মর্মগ্রহণ করতে পারবে। তোমরা  
ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে সবাই চলেই যাও, আর  
জগৎশূন্য সবাই রামের কথা শুনতেই আস,  
তাতে তাঁর কিন্তু কিছুই আসে যায় না। সত্য  
হচ্ছে লোকজ্ঞানেরও বাড়ি। বিজ্ঞানের আইন  
জগৎ শাসন করেছে, করছে এবং করবেই—  
এখন লোকে তা জানুক আর নাই জানুক।  
নিউটনের আবিষ্কারের পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের  
আইন একই রকম ছিল। এমন কত আইন  
আছে, লোকে যার খবর জানে না, অথচ তার  
শাসনে জগৎ চলছে। খনিতে একখানা বড়  
হীরা পড়ে আছে, অথচ কেউ তার খোঁজ  
পায়নি; কিন্তু তা সবেশে হীরাতে হো আলো  
দেয়। তার পর লোকে তাকে তুলে নিয়ে  
মাথায়ই পরুক আর ফেলেই দিক, হীরার  
তাতে কি এল গেল?

বিষয়টা অবশ্য খুবই কঠিন; কিন্তু মন  
দিয়ে শুনলে তোমরা ধরতে পারবে বটে কি।  
বলতে পার, “এমন নিগূঢ়, যুক্তিবহুল, দার্শনিক  
তত্ত্ব আলোচনার কি প্রয়োজন ছিল? দর-

কার নেই—আমাদের কিছু নগদ বিদ্যা দিয়ে  
দিন—আমরা কাজের কথা চাই।” রাম কাজের  
কথাই এতদিন বলে এসেছেন বটে, কিন্তু  
ভাবের কথাও তো দুটা একটা চাই। মূলে  
একটা তত্ত্ব না থাকলে কোনও ব্যাপারকেই  
পোক্ত করা চলে না। জানই তো, তোমাদের  
যত কিছু ব্যবহার সমস্তই হচ্ছে শক্তির কর্মময়  
রূপমাত্র। কিছু লিখতে হলে কলম ধরবার  
আগে সনস্তুটা বিাং তত্ত্বরূপে মাথার পেলে;  
সকল কর্মের গোড়াতেই তাই ভাবের ভিত্তি।  
কোথায়ও যেতে হলে হাঁটাটা চল ব্যবহার,  
কিন্তু মন যদি দেহপেন্সীব গতিকে শাসন  
না করে, তাহলে চলা কি সম্ভবপর হয়? বিখ-  
বিত্তালয়ের এবং তার পাঠ্য বিষয়ের একটা  
ধারণা না নিয়ে কেউ কি কলেজে ভর্তি হয়?  
চোর যদি প্রতিবেশী কার ঘন দৌলতের কথা  
হরদম শুনতে থাকে, তাহলে এই সব উড়ো-  
খবরগুলো আর মনের ভাবগুলো একত্র  
জুটিয়ে তবে সে তাকে ‘কর্মের রূপ দেয় অর্থাৎ  
ধর্মীয় ঘরে সিঁদ কেটে ঢোকে গিয়ে। মন না  
চললে কোনও কাজই হতে পারে না; বা  
কর্মতে হবে, পূর্নাঙ্ক তার কিছু না কিছু জ্ঞান  
থাকা চাই-ই।

• তাই তোমরা যে ব্রহ্মরূপ, এ কথাটা  
রাম বার বার তোমাদের কাণের মাঝে



সেঁদিয়ে দিতে চান, আর বৃকের মাঝে ওই কথার ছাপমেঘের দিতে চান। দিনের পর দিন ওই কথা শুন্তে শুন্তে বৃকের মাঝে বসে যাক—পলে পলে মর্শ্য বিদ্ধ করুক। তারপর দেখান, মনের আইনে এই থাকে বল্হ বাজে কল্পন', তাই তোমার কাছে কি করে মহাশক্তির নিব্ব' হয়ে ওঠে, এই জ্ঞানটো তোমার মাঝে অক্লান্ত আনন্দ আর শাস্তির খনি হয়ে ওঠে।

আজকার বক্তৃতা'র বিষয় হচ্ছে, "বেদান্তের ভূমিতে ভাব ও বস্তুর সমন্বয়।" এ ও বলতে পার, আজকার বিষয়টা হচ্ছে, বৈদান্তিকের দর্শন ধাৰা। দার্শনিকের পক্ষে এটা ভাবী জরুরী কিস্তি।

তার পূর্বে ভাববাদ আর বস্তুবাদ সম্বন্ধে তোমাদের একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তার কববার সময় আমাদের নাট। সে সিদ্ধান্ত অনুসারী জগৎটা যেমন দেখাচ্ছে, আসলেও এটা ঠিক তাই, তাকে বলি বস্তুবাদ; আর ভাববাদী'র মতে জগৎটা যা দেখছ, তা নয়; অথচ জগৎটা আছে, কিন্তু যেমনটা দেখাচ্ছে তেমনটা নয়। বস্তুবাদী'র মতে জগৎটা ঠিক এটো রকমটো—এটা আসলেই খাঁটি। ভাববাদে'র আবার অনেক পাখা আছে। বিষয়নিষ্ঠ ভাববাদ আছে—বার্কলে আর দিকার্ট হলেন তার পাণ্ডা। আবার 'বিষয়নিষ্ঠ' ভাববাদ' আছে—তার প্রবক্তা হলেন প্লাটো আর কান্ট। নিশ্চয়শেষ ভাববাদ আছে—হেগেল আর শেলী তার ব্যাখ্যাতা—এমনিতরু আর কত কি আছে।

বেন ও গিলের ৭তম দার্শনিক আবার বস্তুবাদের

সমর্থক। বস্তুবাদ বা ভাববাদে'র ভিন্ন ভিন্ন শাখা ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে সমস্ত মতবাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছে, আজকার রাতের বক্তৃতায় তাদের সমালোচনাও কবব না। তবে তাদের সম্বন্ধে এইটুকু ইচ্ছতে জানাব, যাতে বেদান্তের তত্ত্বটা পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে।

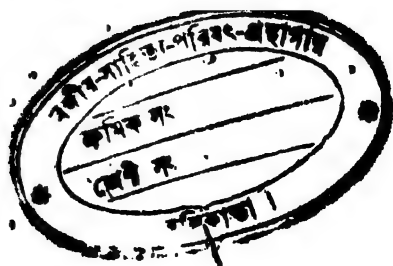
আসল কথা স্মরণ করবার আগে দুটা পরিভাষা বুঝিয়ে বলা দরকার—বিষয় এবং বিষয়ী। কথা দুটো এক এক শাস্ত্রে এক এক রকম ভাবে গ্রহণ করা হয়, এ বোধ হয় তোমরা জানই। দর্শন শাস্ত্রে বিষয়ী বলতে বোঝায় জ্ঞাতাকে, আর বিষয় বলে জ্ঞেয়কে। যখন 'এক কলমটা' দেখছ, তখন এ হচ্ছে তোমার বিষয়, আর তুমি যে দেখছ, তুমি হচ্ছে বিষয়ী। যে দেখাচ্ছে সে বিষয়ী, যা দেখছে তা বিষয়। সাধারণ কথায় বুদ্ধিকে বলবে বিষয়ী; কিন্তু বেদান্তের মতে বুদ্ধিও বিষয়। জ্ঞান তো, যা'ই দেখা যায় না কেন, তাই বিষয়; তুমি বুদ্ধিকেও দেখ, তার সম্বন্ধে চিন্তা কর, তর্ক কব, আইন কানুন দেব কব। যাব মধ্য দ্বা চিন্তা চলে, তর্ক চলে, তাকে আর বিষয়ী বলি কি করে? সে তো বিষয়। যা খাঁটী বিষয়ী, চিন্তায় না তর্কে তাকে ধরা যায় না। জ্ঞাতাকে কি করে জানা যাবে? ধর যে বিষয়ী, সে হয় জ্ঞাতা হবে, না হয় জ্ঞেয় হবে। যে মুহূর্ত্তে সে জ্ঞেয় হল, সেট মুহূর্ত্তেই সে বিষয় হল, আর বিষয়ী তো থাকল না। সাধারণ কথায় বিষয়ী বলতে কিন্তু আমরা বুদ্ধিকেই বুঝি। বেদান্তের মতে আসল বিষয়ী হচ্ছেন আত্মা—যান অন্য, ঘটে ঘটে এক ও অখণ্ড।

এই প্রসঙ্গে একটা সংস্কৃত কথা মনে রাখা  
• করকার। সংস্কৃতে বিষয়ীকে বলা হয় দ্রষ্টা  
আর বিষয়কে বলা হয় দৃশ্য। ব্রহ্ম বা আত্মা  
স্বার্থ বিষয়ী। এই আত্মাকে সোপেনহাউর  
বলেন Will, হেগেল বলেন Absolute Intel-  
lect। জান তো সোপেনহাউর আর হেগে-  
লের মত পরস্পরের বিকল্প। কিন্তু দেখ  
বেদান্ত তাঁদের মিলিয়ে দিচ্ছে। বেদান্ত  
বলছেন, সোপেনহাউরের Absolute Will ও  
বা, হেগেলের Absolute Intellect ও তা।  
সংস্কৃতে এই তত্ত্বকে বলা হয় ব্রহ্ম; ব্রহ্ম  
নির্কিংশেয় ইচ্ছা, জ্ঞান, সত্তা ও আনন্দ।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, স্বার্থ বিষয়ী  
হচ্ছেন আত্মা; আর ব্যবহারিক বিষয়ী হলেন  
বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মা। তাহলে হল,  
বুদ্ধিকে কর্তা রূপে রেখে আত্মাই হলেন  
বিষয়ী।

এখন দেখতে হবে, বস্তুবাদীরাই স্বপক্ষে  
কি যুক্তি দেখান, আর ভাববাদীরাই বা কি  
যুক্তি দেখান। এ একটা বিরাট বিষয়, তবে  
আলোচনাটা আমরা পুঁই সংক্ষেপে করব।

বার্কলের; সমালোচনা করবার সময় আমাদের  
নাই। ভাববাদীদের উনি একজন চাই।  
তাঁর দর্শনের বনিয়াদ ভারী পাকা; যতক্ষণ  
বেদান্ত মেনে চলছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর  
যুক্তিকে কেউ প্রতিহত করতে পারেনি'; কিন্তু  
বেদান্ত ছাড়া বা মাত্রই তাঁর পথ ভুল হয়ে গেছে  
আর তিনি কেবল গোলন্দাজির মাঝে  
ঘুরপাক খেয়েছেন। এসব খুব সরস সমা-  
লোচনা হত বটে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা  
অধ্যাপকদের সামনে বক্তৃতা করতে গেলে রাস  
হয়ত এ বিষয়ের দস্তরমত আলোচনা করতে  
পারতেন। বাস্তবিক তাঁর দর্শনের প্রথম  
ভাগের সঙ্গে শেষ ভাগের কি আশ্চর্য  
বিরোধ। শেষকালে কিনা তাঁকে কতকগুলি  
ভাববিগ্রহ মানতে হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে এক  
সম্পূর্ণ দীপ্ত; নইলে তো আর জগৎ ব্যাখ্যা  
করা চলে না। তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তু  
পেছনেই একটা ভাবের বিগ্রহ রয়েছে—সেটা  
স্বন্দেহী না কি, তাও বলা যায় না। ইত্যো-  
কার কত প্রলাপই না তিনি বকেছেন।  
যাক আজ রাতে আর সে কথা নিয়ে আমরা  
আলোচনা করতে চাই না। (ক্রমশঃ)



## কোন পথ শ্ৰেষ্ঠ ?

— \*():\* —

সত্য সকলোতে আছে,—এই শ্রদ্ধাৰণ লৈ চলিব পাৰিলেই হয়। সত্য সংসাৰতো আছে, বনতো আছে। মূলত লক্ষ্য উভয়ৰে এক, লক্ষ্য হেৰুৱালে সংসাৰতো ঠগিণী, বনতো ঠগিণী। সকলোৰে আকৃতি প্ৰকৃতি বিভিন্ন, কাজেই কচিও সকলোৰে ভিন্ন। কাৰো পক্ষে সংসাৰেই ভাল, কাৰো পক্ষে বনেই ভাল। ইয়াৰ মাজত কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, তাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ যোৱা অজ্ঞানৰ পৰিচায়ক মাত্ৰ। যি ইয়াৰ শ্ৰেষ্ঠতা বিচাৰে, সি নিশ্চয় মামুহৰ মাজত যি সত্য আছে তাক নেদেখে,— দেখে মাত্ৰ বাহিৰৰ চালচাল, অৰ্থাৎ ভেল.টা।

স্ব-গণ্ঠিত বেষ্টী হলেই কোনো কিছু ডাঙৰ নহয়। সংসাৰী অনেক, বিবাগী তাকৰ, সেট বুলিয়েই যে সংসাৰী শ্ৰেষ্ঠ, এনে ধাৰণা কৰা ভুল। সংসাৰী ও বিবাগী উভয়ৰ মাজত বিচাৰিলে খাটি সংসাৰী বা খাটি বিবাগী হাজাৰত্ৰয়া যে কেইজন ওলায়, তাৰ ঠিক নাই। উভয়ৰ মাজত দলাদলি হোৱা, শ্ৰেষ্ঠ নিকট ষিচাৰ কৰা স্ববুদ্ধিৰ কাম নহয়। বাহিৰ দেখি বিচাৰ নকৰি, উভয়ৰ মাজত যি সত্য নিহিত আছে, তাৰ বিচাৰ কৰা— দেখিগা উভয়ৰে লক্ষ্য এক; উভয়ৰে মাজত খুন ওচৰ সম্পৰ্ক—কাৰো এৰি কাৰো নচলে।

তোমাৰ পথ যে শ্ৰেষ্ঠ, ইয়াৰ প্ৰমাণ কি যুক্তিতৰ্ক দ্বাৰা নিকপিত হব, নাই শাস্ত্ৰদ্বাৰাই নিকপিত হব? শাস্ত্ৰ কিম্বা তৰ্ক কতো ইয়াৰ প্ৰমাণ নাই। তোমাৰ পথ যে শ্ৰেষ্ঠ, এইটোৰে প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত। তুমি তোমাৰ কৰ্ত্তব্য সমাপন কৰি তাৰ সাৰ্থকতা প্ৰমাণিত কৰিব লাগিব। তোমাৰ পথৰ শ্ৰেষ্ঠতা নিকপিত হব তোমাৰ কৰ্ত্তব্য দ্বাৰা। এট পথ সহজ, সিটো টান, এইটো এটা কল্পনা মাত্ৰ। তুমি অসমীয়া, সেট কাৰণে ইংৰাজৰ মাতৃভাষা তে'মাৰ ওচৰত কঠিন; কিন্তু ইংৰাজলগৰ প্ৰতি তো টান নহয়। ভাষাৰ ভেদ থাকিলেও ভাব হয়োৰো এক। এনে এঠাইলৈকে আমি যাব পাৰো, যত ভাষাৰ ভেদত ভাবৰ বিনিময় কৰাত কোনো বাধা নপৰে। তা'ত ভাবেই স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত—ভাষাৰ খোলা থহি পৰিছে।

সেই কাৰণেই কওঁ, সংসাৰত থাকিলে ভগবান লাভ হবনে, নাই সংসাৰ এৰিলে হব, এই তৰ্কই মিছা, যদি ভগবানৰ প্ৰতি প্ৰাণৰ টান নেথাকে। জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য তেওঁক লাভ কৰা। কত তেওঁক পোৱা যায়, সেটো তেঁৱেই তোমাক কৈ দিব। মোৰ পক্ষে যিটো সহজ তেওঁ তাৰেই ব্যবস্থা কৰি ৰাখিছে। জন্মিব পূৰ্বেই যি মাতৃস্তনত পিয়াহৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তেওঁ মোৰ প্ৰাণৰ

হেপাহ বুজিও কি তাৰ কোনো ব্যবস্থা ল'ব নাই ? মই যত থাকিলে তেওঁক পাব পাৰো, ঠিক তেনে ঠাইতে তেওঁ মোক বাধিছে—আশা, আকাঙ্ক্ষা, হেপাহ মনত জগাই দিছে তেনে দৰেই। কেবল হাত ভৰি এচাৰিলে হ'ব কি ? যতে বাধিছে, ততে স্থিৰ হৈ বহা। প্ৰযুক্তিৰ আহ্বান আৰু নিবৃত্তিৰ আহ্বান—দুয়োৰো পাৰ্থক্য কৰিবলৈ শিকা। তেওঁৰ কথা শুনি যদি চুলো—তেনেহলে আৰু ভয় নাই ক'তো—ধ'তেই থাকো। তালৈকে তেওঁ লৰি আহিব। মানুহে কি তেওঁক লাভ কৰিব জোৰ কৰি—যদি তেওঁ ধৰা নিদিয় ? আকৌ ইয়াকো জনো, তেওঁ ধৰা নিবলৈকে বহি আছে। পৰীক্ষাৰ কথাকে ধৰা; তেওঁ তোমাক যেনে জটিল সমস্যা দিছে, ঠিক তেনে উত্তৰো দিছ প্ৰাণত জগাই। যাৰ যিমান বিত্ত, তাক তেনে দৰেই প্ৰশ্ন কৰে তেওঁ। তেওঁ এনে পৰীক্ষক নহয় যে ছাত্ৰক ঠগাই ফেল কৰিব ইচ্ছাৰে কঠিন প্ৰশ্ন কাৰব। পৰীক্ষাত পাশ কৰোৱাই তেওঁৰ ইচ্ছা—ফেল কৰোৱা নহয়।

যতে তেওঁ বাধিছে, ততে স্থিৰ হৈ বহা, মন, প্ৰাণ এক কৰি উৎকৰ্ষ হৈ তেওঁৰ কথা শুনা। যি অৱস্থাতেই থাকা, কৰ্তব্য কতো কম নহয়। সংসাৰতো যেনে দায়িত্ব, সংসাৰৰ বাহিৰেও তেনে দায়িত্ব। দায়িত্ব কাৰো কম নহয়। দায়িত্ব কিয় ?—নাই তেওঁ তোমাক অলপ ইচ্ছাৰ স্বাতন্ত্ৰ্য দিছে বুলি। তুমি যে পতঙ্গকীৰ দৰে নোহোৱা। সিহঁতৰ তো কোনো চিন্তা নাই—খোৱা-পোৱা সকলোৰে তাৰ তেওঁৰ ওপৰত। কিন্তু মানুহৰ পক্ষে সেইটো নহয়। তুমি মানুহ, তোমাৰ মাথোঁৰে তেওঁৰ লীলা ফুটি উঠিব আৰু আচৰিত

কৰে। অকল ফুটি উঠাই নহয়—তুমি নিজে সেই লীলাৰ আশ্বাস অমৃতত কৰিবা—কৰি আশ্বাসৰা হ'বা। যিমানেই শক্তিৰ স্ফূৰণ হ'ব, সিমানেই তেওঁৰ লগত একাত্মবোধ বুজিব পাৰিবা। সেই কাৰণেই তেওঁ তোমাক অসহায় অথচ স্বাধীন কৰি এৰি দিছে—ভাল বেয়া দুয়ো তোমাৰ সম্মুখত দিছে; বাচি লোৱা। আকৌ বাচনিত ভুল হলে তাকো সংশোধন কৰি দিছে;—সংশোধন কৰিছে আশ্বাস কৰি—বুদ্ধি জগাই—শক্তি জগাই। এই কাৰণেই মানুহ বুলি তোমাৰ কৰ্তব্যৰ বোঝা বেচি। কিন্তু পতঙ্গকীৰ কোনো কৰ্তব্য নাই; সিহঁতৰ কামৰ ভাল বেয়াৰ বিচাৰ নাই।

কৰ্তব্যই হ'ল জীৱনৰ নিয়ামক। সকলো কামকে কৰিবৰ সামৰ্থ্য ও প্ৰযুক্তি আছে তোমাৰ, এনে স্থলত তুমি কোনটো কৰিবা, কোনটো নকৰিবা, এয়ে হ'ল সমস্যা। আদৰ্শও আছে তোমাৰ মাজতে। বিকাশ আৰু অবিকাশ, শক্তি আৰু দুৰ্বলতা, চেতনা ও জড়তা—দুয়োকো তুমি বুজা; তাৰ মাজত তোমাৰ কোনটো ইষ্ট, তাকো বুজা বেচ। দেহ, মনত বল হওক, চিত্ত বিকশিত হওক, জ্ঞানৰ দীপ জ্বলি উঠক—এইটো ইচ্ছা নহয় কাৰ ? স্তব্ধতাং সূয়ে তোমাৰ পথ। কৰ্তব্যক সেই আদৰ্শত পুৰিচালিত কৰাই হ'ল তোমাৰ কাম।

কালৈই প্ৰেমা গ'ল, মানুহ মাত্ৰৰে আদৰ্শ এক—কৰ্তব্যৰ ঠেলাও সকলোৰে পক্ষে সমান। অবশ্যে পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থান্তৰে কৰ্তব্যৰ প্ৰকাৰ ভেদ হ'ব পাৰে। কৰ্তব্য সঙ্গাবীৰো আছে, বিৰাগীৰো আছে। যেতিয়ালৈকে উভয়ে উভয়ৰ কৰ্তব্য কৰে,

তেতিয়ালৈকে উভয়েই খাঁটা। কৰ্তব্যত ফাকি দি যি নিজক ঠগাই, সি তত্ত্ব। অকল বৈবা-গীয়েই তত্ত্ব নহয়, সংসাৰবন্দিত যি ফাকি দিয়ে, সিও তত্ত্ব সংসারী। ভগবানৰ চকুত বুলি মৰা সাধ্য মাই কাৰো। যি যেনে কাম কৰিব, তাক ঠিক তেনে দৰেই ফল দি ইহুৱাই-কন্দু-হাই শিকাব-নিজৰ কৰি ল'ব। তুমি যি খুচি কৰা, তোমাৰ সাত-খুন মাক—এনে পৰোৱানা তেওঁ কাকো নিদিয়ৈ। পিছে তৰ্কৰ জোৰত যদি তেওঁৰ কথাৰ এনে অৰ্থই কৰি লওঁ, তেন্তে সি আমাৰ হৰ্তাগ্য।

কোনে কয় যে সংসাৰ প্ৰবৃত্তিৰ পথ ? বেচিভাগ লোকে প্ৰবৃত্তিৰ পথত চলি বুলিয়েই যে সেইতো ভগবানৰ আইন হ'ল, এনে ধাৰণা কৰা ভুল। সংসাৰ প্ৰবৃত্তিৰ পথ, এইটো এটা কথাৰ কথা মাত্ৰ—ভগ-বানৰ আদেশ নহয়। তুমি সংসাৰপথত চলিছা বুলিয়েই কি তুমি কব পাৰা যে, প্ৰবৃত্তিই মোৰ পথ ? এক হিচাবে প্ৰবৃত্তি সকলোৰেই পথ—কিন্তু লগে লগে আকৌ শাস্ত্ৰত কৈছে, “নিবৃত্তিস্ত মহাফলা”—সুতৰাং নিবৃত্তিয়েই তেগোৰ আদৰ্শ পথ। প্ৰবৃত্তিৰ পথত চলা আপত্তি নাই—কিন্তু এ দিন-খুন্দা খাই উভ-তিবই লাগিব তুমি। পিছে যি বুদ্ধিমান, তেওঁ শুক্লজনৰ আদেশ শুনি তাৰে, খুন্দা খাই ওভোতাতকৈ সেইপথে নোৱাৰাই ভাল।

সংসাৰৰ মাজতো এটা ভাব, বাহিৰতো এটা ভাব আছে ; দুয়ো মন্দৰ, দুয়োৰো সময়তে জীৱন পূৰ্ণ। পিছে কণ্ড শূনা, কচি অম-ৰায়ী, কৰ্ম অহুসৰি নিজে নিজে এটা পথ বাচি লোৱা। দুয়ো যেতিয়া নিজ নিজ কৰ্তব্য কৰি যায়, তেতিয়া বাধা নেথাকে কতো—উভয়েই সন্তোষ লাভ কৰে, আনন্দ লাভ কৰে। কিন্তু

য'তে কৰ্তব্যত ফাকি, ত'তে বিয়াবিবি, ভাল-বেয়াৰ বিচাৰ। তেতিয়া এ জনে আনজনক নিজ দললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰে।

প্ৰবৃত্তি পথত বহুত লোকে চলে, কিন্তু সেই বুলিয়েই যে সেই পথৰে অহুসৰণ কৰিব লাগে, তাৰোটা মানে নাই। এই কথা বাবে বাবে কৈছো ; সংসাৰত আছা বুলিয়েই, তুমি প্ৰবৃত্তিৰ দখলিস্বত্ব পোৱা নাই, ইয়াত থাকিয়েই ভগবানৰ মহিমা নিজ জীৱনত বিকাশ কৰিব লাগিব ; দহৰ ওচৰত আদৰ্শ হ'ব লাগিব—ঠিক ভগবানৰ দৰে সংসারী হ'ব লাগিব তুমি।

এটা প্ৰশ্ন মনত পড়িছে ;—এক ব্ৰহ্মচাৰীয়ে শুক্লৰ ঘৰত পাঠ শেষ কৰি, শুক্লক শুধিলে, “প্ৰভো এতিয়া মই কোন আশ্ৰম গ্ৰহণ কৰিম ? কোন আশ্ৰম শ্ৰেষ্ঠ, গাইহুৱা নে সন্ন্যাস ?” শুক্লক কলে, “এই কথাৰ উত্তৰ এতিয়া নিদিও। তই কিছু দিন ফুৰি আহ ;—তেতিয়া মই তোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। বাতত যদি আচৰিত কিবা দেখ তেন্তে আহি যোক কহিহিঁ”। এই কথা শুনি ব্ৰহ্মচাৰী ভ্ৰমণৰ কাৰণ ৰওনা হ'ল। এ দিন নানা ঠাই ঘূৰি ফুৰি আহোতে এখন হাবিৰ মাজতে সন্ধ্যা লাগিল। ব্ৰহ্মচাৰীৰে সন্ধ্যা লগা দেখি, এজোপা গছত উঠি ৰাতিতো কতাব মন কৰি তাত উঠিল। সেই গছত এ জোৰ চৰাইৰ বাহ আছিল। সেই দিনা বৰ বতাহ বৰষুণ। সন্ধ্যা লাগিল, কিন্তু মাইকী চৰাই জনী বাহলৈ অহা নাই, তাইৰ বিগদ শব্দা কৰি মতাৰোৰে চিক্ৰবিছে ; এনেতে এটা ব্যাধ বৰষুণত তিতিবুৰি আহি সেই গছৰ তলতে ক্লান্ত হৈ বহিলহি। তাৰ হাতত আছিল, সেই মাইকী চৰাইজনী। তাই মতা-

টোৰ চিঞৰ শুনি কলে, “তুমি এতিয়া চিঞৰ  
এবা, এই মানুহজন আমাৰ আতৰি, এওঁ বৰ  
জ্ঞান, অচিৰে এওঁৰ শুক্লাৰ ব্যবস্থা কৰা।”  
এই কথা শুনা মাত্ৰে চৰাইটো নানি আহি  
ব্যাধক কলে, “প্ৰভো, আপোনাৰ সেৱাৰ  
আজ্ঞা শুক।” ব্যাধে চৰাইৰ ব্যবহাৰ দেখি  
আচৰিত হ’ল, আৰু কলে, “মই জাৰত বৰ  
কষ্ট পাইছো, সোনকালে জাৰ নিবাৰণৰ  
উপায় কৰা।” চৰায়ে এই কথা শুনা মাত্ৰে  
কিছুমান শুকান পাত সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু  
কৰাব পৰা এডোখৰ জুই আনি জুই  
ধৰিলে। জুইৰ তপ পাত ব্যাধৰ জাৰ শুচিল,  
তেতিয়া ব্যাধে পুনঃ কলে, “মই ক্ষুধিত;  
মোক কিছু খাবলৈ দিয়া।” চৰায়েটো কোনো  
বস্তু সঁচি খোৱা অত্যাশা নাই, কাজেই  
চৰাইটো বিমোহত পৰিল, ব্যাধক খাবলৈ কি  
দিব ? অবশেষত কলে, “প্ৰভো, মোক ঘৰত  
এনে একো নাই, যাক দি আপোনাৰ ভোক  
নিবাৰণ কৰিব পাৰে। অতএৱ মোৰ মঙ্গল  
থায়েই আজি আপোনাৰ ক্ষুধা শুচাওক—”  
এই বুলি চৰাইটো জুইত জাপ দি পৰিলে,  
তাকে দেখি মইকী চৰাইজনীয়ে মাত লগালে,  
“এয়া, চৰাইৰ মঙ্গল আপোনাৰ কি ভোক  
শুচিল, অতএৱ মোৰ মঙ্গলো খাওক”—এই  
বুলি তায়ে জুইত জাপ দিলে। এই চৰাই  
হালৰ আচৰিত আত্মত্যাগ দেখি ব্যাধ তথা  
লাগিল, সি মঙ্গল-তৰুৰ খেত কঁচু ভাতে  
পেলাই ভগৱানৰ নাম কৰি প্ৰস্থান হ’ল।  
গছৰ ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মচাৰীয়ে ঘটনাটো দেখি  
আছিল। দেখি তাৰিলে যে এইটো এটা  
আচৰিত ঘটনা—শুক্লদেশক জনাব লাগিল।  
এই বুলি পাচ দিনা আকৌ অইন ঠাইলৈ  
বাট ললে।

ফুৰি ফুৰি কিছু দিনৰ পাচত সেই  
ব্ৰহ্মচাৰী গৈ এখন ৰাজনগৰ ওলাই দেখিলে  
যে ৰাজবাটীৰ ওচৰত বহুত মানুহ সমাগম  
হৈছে। ৰজাই মন্ত্ৰী, সভাসদ সহ সমুখত বহি  
আছে, ওচৰতে এজনী পৰমা স্নানকাৰী ছোৱালী  
থিয় দি আছে; আৰু দেখিলে ৰজাৰ সমুখত  
এখন কেবাহিত তপত তেল উটলি আছে।  
ব্ৰহ্মচাৰীৰ কোঁকল জ্বলিল, ব্যাপাৰ কি  
জানিবৰ মনে ওচৰ চাপিল। পৰম্পৰৰ মুখে  
জানিলে যে, ৰজাৰ ওচৰত থিয় দি থকা ৰাজ-  
কন্তাৰ সন্মত। ৰজাই পৰ কৰিছে, যি তপত  
তেলত ডুবি ওলাই আহিব পাৰিব, সেয়ে  
তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্তাক বিবাহ কৰাব, আৰু  
ৰজাৰ মৃত্যুৰ পাচত ৰাজসংগাসনৰ অধিকাৰী  
হব। বহুত ৰাজপুত্ৰ আছিল, কিন্তু কোনেও  
এই ব্ৰহ্মচাৰীক কাম কৰিবলৈ সাহ কৰা নাই।  
লাহে লাহে বেলেগে মাৰ যাব লগা হ’লহি।  
ৰজাই মনে মনে চিন্তা কৰিছে জানোৱা তেওঁৰ  
পৰ কোনেও বাখোতা নোলায়; জানোৱা  
কন্তাৰ সন্মত নহয়। এনেতে এজন সন্ন্যাসী  
কাৰোফালে ভ্ৰমণ কৰাকৈ আহি কেবা-  
টিৰ ওচৰত উপস্থিত হ’লহি। কিছু কাল  
কেৱাহিৰ ফালে চাই হঠাৎ কেবাহিত জাপ  
দিলে আৰু অক্ষুণ্ণ শৰীৰে ওলাই আহি  
আপোন মনে পুনঃ বাবলৈ ধৰিলে। চাৰিও  
ফালে চৈ চৈ পৰিল। ৰজাই উৎকল চিন্তে  
গৈ সন্ন্যাসীক প্ৰণাম কৰি কলে, “আপুনি যাব  
কলৈ। মোৰ পৰম সোভাগ্য, সেই চেতু মই  
আপোনাৰ বিচিনা এজন সাধুসন্ন্যাসীক  
জোঁৱাই ৰূপে লাভ কৰিলো। আপুনি মোৰ  
পৰ অনুসাৰি তেলত ডুবি দিলে, গতিকে মোৰ  
একমাত্ৰ কন্যাক আজি আপোনাৰ হাতত  
সমৰ্পণ কৰিলো, আজিৰ পৰা মোৰ কন্তাও

এই রাজা আগোনাব; গ্রহণ করি; কৃতার্থ করক।”

সন্ন্যাসীয়ে অলপ আচরিত হৈ কলে, “রজা, তুমি কৈছা কি ? মই তো তোমার পণব কথা একোকে নেজানো। তেল দেখি এটা প্রবৃত্তি হ’ল, সেই কারণ তেলত ডুৰ দিলো। তোমার কত্কা বা রাজ্যত মোর প্রয়োজন নাই।” এই বুলি সন্ন্যাসী গুচি গ’ল। ব্রহ্মচারীয়ে ঘটনাটো দেখি চমৎকৃত হ’ল, আর ভাবিলে, ইও এটা আচরিত ঘটনা—গুরুদেবক জনাব লাগিল। এই ভাবি প্রস্থান হ’ল।

বধাসময়ত ব্রহ্মচারী গুরু ওচরত উপস্থিত

হৈ ছয়টা ঘটনা আত্মোপাস্ত্র নিবেদন করিলেহি। গুরুবে কলে, “বৎস, তুমি শুধি-ছিলা, গার্হস্থ্যশ্রম শ্রেষ্ঠ নে নাই সন্ন্যাসশ্রম শ্রেষ্ঠ ? তোমার প্রশ্নব উত্তর এই দুটা ঘটনার মাজতে আছে। যদি চবাইচালব দবে আত্মোৎসর্গ করিব পাৰা, তেন্তে গৃহস্থ হোতা—আর যদি সেই সন্ন্যাসীর দবে অনাসক্ত হ’ব পাৰা, তেন্তে শেষ আশ্রম গ্রহণ করা।”

এতিয়া কোয়াচোন কোন পথ শ্রেষ্ঠ ? মই সেই কারণেই কহু, সত্য সকলোতে আছে। মাত্র লাগে, শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রাণ, আর প্রবর্তকের পক্ষে লাগে—কর্তব্যত নিষ্ঠা।



## বেদের কথা

—\*#()\*#—

একটা কথা আছে, বেদ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদ বলিতে আমরা একখানা কেতাব বুঝি, তাই কথাটা শুনিয়া অবাক হই। যদি বলি বেদ অর্থ জ্ঞান, তাহা হইলে বৈদান্তিকের মত কথাটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাঙ্কে আর একটা দিক চৰ্চা পড়ে। বীমাংসক বলিবেন, বেদ শব্দমাণি। শব্দ যদি বেদের শরীর হয়, আর বেদ হইতে যদি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করিবার একটা সম্ভেদ পাওয়া যায়। শব্দ হইতে জগৎ—এ কথাটার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রামাণ্যবান হ্রস্বত নয়। কিন্তু বেদরূপ

বিশিষ্ট শব্দমাণি হইতে জগৎ—এ কথাটার অনেকের পটুকা আছে। যদি বিশ্বাসবশে মানিয়া লই, তাহা হইলে ল্যাঠা চুকিয়া যায়। কিন্তু যদি কেহ প্রমাণ চায়, তাহা হইলেই মুস্থিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া কঠিন, কেননা বৈদিক সাধনার দ্বারা বহু যুগ ধরিয়া লুপ্ত। তবে অনুমান খণ্ডে কতকগুলি যুক্তি খাড়া করা যায়। বেদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে এখন আমাদের এই অনুমানই সম্বল। তবে ইহাতে লাভ আছে। বেদ জিনিষটা কি, তাহা বুঝিয়া হিন্দুধর্মাবলম্বীর গোড়ার কথাটা ধরিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

• মোটামুটি দুই চারিটা কথার ইঙ্গিত

করিব, কেননা যে সাধনা বহুদিন বিলুপ্ত, তাহার সম্বন্ধে সবিস্তার বলা সাধ্যাতীত।

এট বেদ হইতেই জগৎ হইয়াছে— এমন প্রমাণ করা সহজ নয়। কিন্তু বেদের গাঁথুনি যে রকম, তাহাতে বেদের শব্দ-রাশি সৃষ্টির লগ্নে বাঁধা, এ কথাটা বোধ হয় প্রমাণ করা বাইতে পারে। বেদের তর্ককাণ্ড সকামথ্যজের প্রবর্তক। যজ্ঞ কামনাসিদ্ধির অলৌকিক উপায়, ইহাই বেদের মীমাংসা। বেদের মন্ত্রে যে বাসনার স্পন্দনগুলিকে রেকর্ড করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ইচ্ছা করিলে সেই স্পন্দন জাগাইয়া বিশিষ্ট সৃষ্টি করা সম্ভব, এই কথাটাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ একটি কথা বেদের অপর নাম ছন্দঃ। ম্যাক্সমুলার বলেন, ছন্দোভাগ বেদের প্রাচীনতম অংশ। সে তাঁহাদের কথা; ইহার সভ্যসভ্য বিচার তাঁহারা করুন। বেদ আর ছন্দঃ যে সমানার্থক, টকাট আমাদের বক্তব্য। ছন্দঃ কথার দুইটা অর্থ পাই—এক কবিতা আর এক বাসনা। “কবিতার ছন্দঃ” এটা সবারই শোনা কথা; বাসনা অর্থে “স্বচ্ছন্দ” কথাটাও বাঙ্গালা ভাষায় অপরিচিত নয়। এখন প্রশ্ন হয়, বেদের নাম ছন্দঃ হইল কেন।

বেদ যে গোড়াগুড়ি কবিতা, একথা সবাই জানি। কবিতার মাঝে একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই—আবর্তন। গল্প একটানা; কিন্তু পড়ে যতি আছে, নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসা আছে। ইহাকে আমরা বলি মিল বা তুক। যতি আর মিল, দুইটা নিয়া হয় ছন্দঃ। আমাদের ভাবায় যে কবিতা হয়, তার মিল হয় ধ্বনিতে। ইহার মাঝে ব্যঙ্গনের প্রভাব সম্পষ্ট। দেবভাবায় যে

কবিতা<sup>১</sup> তাহার মিল স্বরে—একই পর্ধ্যায়ের স্বরের সঙ্গে স্বর গাঁথিয়া কবিতা রচনা হয়। ব্যঙ্গনের মিল আর স্বরের মিল, দুইটাতে একটা মধ্যস্থিত পার্থক্য আছে। ব্যঙ্গন একটা অভিঘাত—হোঁচট খাওয়ার মত। আর স্বর হইল কম্পন; সেই জন্ত তার হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্প্রুত, উদাত্ত, অমুদাত্ত ইত্যাদি ভেদ সম্ভব। কবিতার আবৃত্তিধর্মের মাঝে যে সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, তাহা যদি আগাগোড়া স্বর দিয়া গাঁথা থাকে, তাহা হইলে কঠিন ব্যঙ্গনাত্মক অংশটুকু বাদ দিলে কবিতাতে শুধু একটা স্বরের কম্পন অবশিষ্ট থাকিবে। সংস্কৃত কবিতার টহাই বিশেষত্ব, ইহা সকলেই জানেন। আধুনিক বাংলা কবিতাতেও এই স্বরবাহুল্যের বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। বৌদ্ধিক সংস্কৃতে স্বরকম্পন শুধু হ্রস্বদীর্ঘ নিয়া। কিন্তু বৈদিক ছন্দে তদতিরিক্ত উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত এই তিনটা স্বর-ধর্মের লীলা।

উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিতের স্বরূপ কি, আজ তাহা বলা কঠিন। ছন্দে শুধু তাঁহাদের স্থান নির্দেশ আছে, শিক্ষণ গ্রহণ সম্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু স্বরূপ চিনাটহা দিবার কেহ নাই। মহাভাষ্যকার উদাত্ত ও অমুদাত্ত সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিয়াছেন,—উদাত্ত আয়াম, আর অমুদাত্ত অস্বসর্গ। নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, প্রথমটীতে সমস্ত শরীরের নিগ্রহ বা স্তব্ধতা, দ্বিতীয়ে শিথিলতা। উর্দ্ধ ও অধঃ দুইটা স্থানও নির্দেশ করিয়াছেন, মূল স্ত্রেও তাহা আছে। কিন্তু ইহাতেও ব্যাপারটা কি, তাহা স্পষ্ট হয় না। তাই মহাভাষ্যপ্রদীপে কৈয়ট বলিতেছেন, “অভ্যাসসমিগম্যাচারঃ স্বরবিশেষঃ ষড়্‌জাদিবদ্ বিজ্ঞেয়ঃ—সাদেগর



সাধিব্যবসায় মত এই স্বরের সাধনা করিতে হয়।” কিন্তু এই সাধন করায় কে? ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের টীকাকার বলিতেছেন, “বায়ুবশতঃ শরীরের বে উর্দ্ধগমন, তাহা আয়াম, আয়াম সহ বাহা উচ্চারিত, তাহা উদাত্ত; বায়ুবশতঃ শরীরের বে অধোগমন, তাহা বিস্রম্ভ; বিস্রম্ভ সহ বাহা উচ্চারিত, তাহা অনুদাত্ত; বায়ুবশতঃ শরীরের আক্ষেপ বা তির্য্যগ্‌গমন সহ উচ্চারিত স্বরিত।”—এখানে বায়ু পরিচালনার কথা পাইলাম; অনুমান করিতে পারি, বায়ুর সহায়তার সমস্তটা শরীর খেলাইয়া স্বর উচ্চারণ করিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা কিছু বোঝা গেলনা।

শিক্ষাতে আর একটি কথা আছে—“উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত হইতে ঋত ও ধৈবত এবং স্বরিত হইতে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমের উৎপত্তি।” এইটুকু ইঙ্গিতে সায় দিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, বৈদিক স্বর musical accent মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাহা কেহ খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না। শিক্ষাতে আর একটি কথা আছে, “অনুদাত্ত স্বরে, স্বরিত কঠমূলে এবং উদাত্ত মন্তকে।” বুঝিলাম, এই স্থানগুলিকে যথাক্রমে কম্পনের আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা বোঝা গেল না।

প্রত্যেকটি স্বরে উদাত্ত, অনুদাত্ত বা স্বরিতের একটি না একটি বর্তমান। তাহাদের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পাঠক পূর্বেই একটু ইঙ্গিত পাইয়াছেন। পারস্পরিকের সময় গুরুত্ব মুখে তনিয়া বর্ণবিধি আবৃত্তি করিতে হয়। তাহার বিশেষ বিধান আছে। আবৃত্তির

অনুসূলে শরীর ও মন গঠন করিব্যবসায় অল্প বহু বিধিনিষেধ আছে। এমন কি এক একটা বেদভাগের আবৃত্তি অধিগত করিব্যবসায় অল্প পূর্ক হইতে ত্রত গ্রহণ করিতে হয়—সেই অল্প অনুগ্রহচর বেদভাগের বিশেষ নাম। এতখানি আয়োজন করিয়া তার পর বায়ুকে হৃদয়স্থ হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত প্রতি স্বরে খেলাইয়া নিয়া কম্পন তুলিতে হইবে। স্বরের কম্পন ও চিত্তের স্পন্দন একাকার হইয়া যাইবে—শব্দ কাঁপিয়া কাঁপিয়া রূপের সৃষ্টি করিবে—ভাব মূর্ত্ত হইবে। বৈদিকছন্দের এইটুকু—বিশেষত্ব। সামান্যতঃ আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি, কিন্তু বিশেষ বিধি দেখাইয়া দিব্যার কেহ নাই।

প্রয়োগের ভারতম্যে এই মন্ত্র একদিকে যেমন কামধেনু, অপরদিকে তেমনি বজ্ররূপ। বেদ স্বর: তাহা বলিয়াছেন—“একা বাক্‌ সম্যক্‌ জ্ঞাতা মুপ্রযুক্তা স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি”; আবার, “হঃই শব্দ: স্পন্দতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনতি যথেক্রমক্রমঃ স্বর-তোপ বাধাৎ।” স্বরকম্পনের দ্বায়ে বজ্র ইন্দ্রহস্তা না হইয়া ইন্দ্র বজ্রহস্তা হইয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথব্রাহ্মণে এই কাহিনী সন্নিবিষ্ট বর্ণিত আছে। শব্দের এই স্বক্স সাধনা আজ লুপ্ত, বেদপন্থা ম্লান। তজ্জ এই শব্দতত্ত্বকে নূতন ছাঁচে ঢালাইয়া মন্ত্রশক্তিকে অল্প উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব।

ছন্দ: সম্বন্ধে আর একটি কথা। ছন্দ: আবৃত্তি বা তাল, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন। ইন্দ: স্বরের লীলা। প্রাতিশাখ্য বরকে বলি:

তেছেন “অক্ষর”; উপনিষদেও ব্রহ্ম “অক্ষর।” ইহার মর্মগ্রাণ্য করিতে চাইবে। অক্ষর স্বর ধ্বনির মূল; অক্ষর ব্রহ্ম অগতির মূল। মূল তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে নৈচিহ্ন্যের ভরস, তাহাই লীলা। ব্রহ্মের লীলা অগৎ, স্বরের লীলা ছন্দঃ—হুইটী তত্ত্ব সমাস্ত্রবাল হইয়া চলিয়াছে। যিনি ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, বেদ হইতে সৃষ্টি এ কথার অর্থ কি। ছন্দের আবৃত্তিপদার্থ, আর সৃষ্টিলীলা একই ভবের দিকাংশ। প্রতিতে আছে—  
“যথা পূর্বমকল্পয়ৎ”—এই কল্পে যাহা আছে, তাহা পূর্ব কল্পেরই আবৃত্তি। শুধু এক কল্প হইতে আর এক কল্প পর্য্যন্ত কেন, এক অয়ন হইতে আর এক অয়ন, এক পক্ষ হইতে আর এক পক্ষ, একদিন হইতে আর একদিন—সৃষ্টিতে আমণা দেখি, অক্ষরেণ বৃকে আবৃত্তির লীলা। এই তো ছন্দঃ। ইহাকে যদি বিশ্ব-ছন্দঃ। প্রতিও বলিতেছেন—পৃথিবী একটা ছন্দঃ, নক্ষত্রগুলি এক একটা ছন্দঃ, আকাশ ছন্দঃ, ‘অস্ত্রীক ছন্দঃ ইত্যাদি।’ এই বিচিত্র ছন্দে প্রণীত অপরূপ বিশ্ব কাব্যের কবি সেই অক্ষর পুরুষ। বেদ বলিতেছেন, তিনি কবি, তিনি মনোবী।

বেদপন্থী বলিতেছেন, বেদ বিশ্বকাব্যেরই একটা সংক্ষিপ্ত সংকলন। বিশ্বছন্দঃ ‘যেমন অনাদি অনন্ত, বেদও ত্রাটী। বেদ সেই পুরুষেরই নিখাসের ভাল, অজ্ঞ কেহ তাহার সৃষ্টিকর্তা নাই; তাই বেদ অপৌকুষের। যে কল্পন সৃষ্টির মূলে, তাহাই ঋষির বৃকে নাথিয়া আসিয়াছে—শুদ্ধজন্মে প্রতিকলিত হইয়াছে। সৃষ্টির এই স্বরলিপির বেদ—ঋষি তাহা ধরিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। যজ্ঞে মন্ত্রের প্রয়োগ অর্থে কর্মে, জীবনে বিশ্ব-

বাসনাকে মূর্ত্ত করিয়া তোলা। এই যজ্ঞ সেই আদিম দেবযজ্ঞেরই অমৃতকরণ মাত্র (পুরুষযজ্ঞ)। যজ্ঞ সম্বন্ধে যিনি একটু আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, উচ্চাতে বিশ্বের এক একটা বিভাবকে মূর্ত্তি দেওয়ার সঙ্কেত রহিয়াছে। যজ্ঞের কল অমৃতকর না তদ্বৈতবোধে লয়। ‘মন্ত্র তাহার সাধন। যে কল্পনের অবতরণে দ্বৈতের সৃষ্টি, সেই কল্পন ধরিয়া উজ্জ্বল যোগ্য। এই জগৎ বেদপন্থীর কাছে বেদ ও বিশ্ব এক।

স্বরের বিচিত্র বিভাস ও আবৃত্তিই ছন্দের প্রাণ। আধুনিক ছন্দও দেখি এই তত্ত্ব। আর বেদে তো কথাই নাই, সেখানে স্বর-বিভাসে কত হৃদয় নৈপুণ্য এবং সেই নৈপুণ্যকে রক্ষা করিবার জন্ত কত সতর্কতা। এই সমস্ত চেষ্টা ‘শ্রুতের’ স্থলভাগকে রক্ষা করিবার জন্ত—যথাযথ স্বরস্পন্দনটী বজায় রাখিবার জন্ত। তাহার জন্ত নীচাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞি, প্রজ্ঞাশক্তি প্রয়োজন ছিল; এই ছন্দঃ অধিগত করিবার জন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্যের বিধান ছিল। ছন্দোরহস্য এত গভীর সাধনার ধন ছিল যে তাহা অনধিকারীর সংস্পর্শে আসিয়া পাছে বিকৃত হইয়া যায়, ঋষিসমাজ এই ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। শুধু বিশুদ্ধ কণ্ঠ নয়, ছন্দঃ-জ্ঞি রক্ষার জন্ত বিশুদ্ধ প্রতিভাও প্রয়োজন। একথা আধুনিক Philologistরাও বলেন। কানের দোষেও স্বর বিকৃত হয়। তাই কঠিন শাসন ছিল, “জীশুদ্বিজিবক্ণনাং ত্রয়ী ন প্রতিগোচরা।” আজকালকার লোক কথাটার মাঝে শূদ্রনিষ্ঠাতনের গন্ধ পাইয়া লাফাইয়া উঠে। কিন্তু ভাবিয়া দেখে না, শুধু শূদ্র নয়, দ্বিজসমাজের জ্ঞী ও ব্রাত্যগণকেও ছন্দে অধিকার দেওয়া হয় নাই। এ কি

দ্বিজসমাজের পক্ষপাত বলিব? অথচ ছন্দের বা ভাবপত্র তুষ, তাহাতে আচণ্ডালের অধিকার। আর্ঘ্যসমাজ Culture-এর প্রসার, Mass Education-এর প্রসার উপলক্ষ্যে যাহা করিয়াছে, তাহার ভুলনা জগতে মিলে না। আজও সেই Culture-এর প্রভাব আর্ঘ্যসমাজ-সম্পৃষ্ট কত অনাৰ্ঘ্যসমাজে অপ্রতিহতগতিতে প্রসারিত হইতেছে—অথচ তাহার মূল কোনও আন্দোলন নাই, Propaganda নাই। কিন্তু Technique শিক্ষা সম্বন্ধে এই সমাজ অত্যন্ত ছাঁশিয়ার। কোন সমাজই বা নয়?

যাক সে কথা। ছন্দের বহিরঙ্গ আলোচনার আর একটা দিক ওস্তেদর মন্তব্যে নিহিত রহিয়াছে। মন্তব্য ও সৃষ্টি, বেদ ও জগৎ হইয়ের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তন্ত্র আজও তাহা প্রমাণ করিতেছেন। না দেখিয়া বিশ্বাস করা বা না করার কোনও মূল্য নাই। কিন্তু যে মন্তব্যের শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে—সে ছন্দঃ হইতে জগৎ সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। এ কথার বিস্তার কুরিবান স্থানভাব। বেদপন্থা আর তন্ত্রপন্থার একটা স্থল পার্থক্য সম্বন্ধে শুধু এখানে ইঙ্গিত করিব। বেদের ভাষা জমাট; এত জমাট যে তাহা আধুনিক ভাষায় হুবহু ব্যক্ত করা অসম্ভব। শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার একটা তাৎপর্য আছে। যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি তাহা আদিবাক্যের চতুর্থ নিম্নস্তর;

তুরীয়াং বাচঃ, মনুষ্যা বদন্তি—ইহা বেদেরই কথা। কিন্তু বেদবাণী এই তুরীয়া বাক্যকে তৈলিয়া তাহারও উপরের স্তরের দিকে নিয়া চলিয়াছে, বেদার্থ আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এইরূপে ভাষাকে ভাবে জমাট করিয়া বেদ শব্দতত্ত্বের এক দিক পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার ক্রমিক পর্য্যায়সান হইয়াছে জ্ঞানকাণ্ডে। তন্ত্র ভাষা ও ভাবকে বিস্তৃত শব্দতত্ত্বের দিক দিয়া লইয়া গিয়াছেন; মাতৃকাবর্ণের তত্ত্ব ও বাবস্থা এই প্রয়াসের অত্যাশ্চর্য্য পরিণতি। সমস্ত জগৎকে কেবল কতকগুলি মূল শব্দস্পন্দনে পরিণত করা এক অদ্ভুত সিদ্ধি বটে।

আর একটা কথা বলিয়াই এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। পূর্বে বলিয়াছিলাম ছন্দঃ অর্থে বাসনা। ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বাসনা হইতে সৃষ্টি, আর ছন্দঃ হইতে সৃষ্টি একই ধারা। বাসনার মূল তত্ত্বপত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। সেখানেও দেখি, বাসনা অনাদি স্পন্দন, তাহারও প্রাণ আবৃত্তি—‘তাহা হইতেই সৃষ্টি’। ছন্দের সৃষ্টি হইতে বিধের সৃষ্টি, ইহাও বেদের কথা। ছন্দঃ বা স্পন্দন হইতে জগৎ—ইহা অভিব্যক্তির স্থল ইতিহাস; বাসনা বা সৃষ্টি হইতে সৃষ্টি—ইহা তাহারই স্বল্প ইতিহাস। উভয়ের সংযোগস্বত্র রাখিয়াছে বেদের ব্যাক্তিতত্ত্ব; সেখানে বাসনা ও ছন্দঃ একাধারে সম্পৃষ্ট। পত্রগুলির ফোটবাদ এই রহস্তরই কুক্ষিকা।



# বেদান্তের অধিকার



[ প্রবক্তা—ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ]

জগতে এই তিনটা জিনিষ পাওয়া বড় কঠিন—মুখুন্ড, মুমুক্শু, আর মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের রূপা না হলে এ সব হয় না। একে তো মানুষ হয়ে জন্মানোই কঠিন ; কিন্তু তার পরেও যদি কেউ মানুষের মাঝে পুরুষ হয়ে জন্মায়, আবার পুরুষ হয়ে বেদ-বেদান্ত পড়ে, অথচ এর পরেও আত্মমুক্তির জন্ত চেষ্টামাত্র না করে, তাকে আমি বলি আত্মবাতী। সে নিতান্তই বোকা বলতে হবে, নইলে এত স্নেহে শুনেও সত্য বস্তু ছেড়ে অসত্যবস্তুর পানে ছোটে ? যে নিজের স্বার্থ-টুকু পর্য্যন্ত বুঝতে পারে না, মানুষদেহ পেয়ে, পুরুষ হয়ে বেদান্তের অধিকার যে হেলায় হারায়, তার চেয়ে নির্দোষ আর কে ?

মুক্তি কি সহজ কথা ? শাস্ত্র পড়, যজ্ঞ কর, কৰ্ম্ম কর, ভজন কর—জানিবে সব মিছা। ব্রহ্ম আর আত্মা এক—এই জ্ঞান না হলে শত-কল্পেও কাক মুক্তি হয় না। এ হচ্ছে বেদের স্পষ্ট কথা। বেদেই আছে—বিত্ত দিয়ে কখনও অমৃতের আশা করো না। এ থেকেই বুঝি, কৰ্ম্ম কখনও মুক্তির হেতু হতে পারে না। এই জন্তই বলি, যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান যার হয়েছে, তিনি আত্মমুক্তির জন্তই চেষ্টা করবেন। তার উপায় হচ্ছে—বাহ্যাবয়বের সুখস্পৃহা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সদগুরুরূপী মহাপুরুষের আশ্রয় নিয়ে তাঁরই উপদেশমত নিজকে সমাহিত করা। সংসার সমুদ্রে ডুবে মরছে যে তা কি দেখতে পাচ্ছে না ? তোমার যে নিজেরই নিজকে উদ্ধার করতে হবে। তার পথই হচ্ছে

সম্যকদর্শনে নিষ্ঠা রাখা, সর্বদা যোগারূঢ় হয়ে থাকা।

যাঁরা ধীর, যাঁরা পণ্ডিত, আত্মতত্ত্ব অভ্যাসে স্বাদের রুচি আছে, তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পারেন, ভবের বন্ধন যদি এড়াতে হয়, তাহলে কৰ্ম্মসম্যাস ছাড়া কোনও পথ নাই। কৰ্ম্মের যে কোনও অবস্থাতেই প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলছি না। চিত্তশুদ্ধির জন্ত কৰ্ম্মের প্রয়োজন আছে বটে ; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধির জন্ত কৰ্ম্মের কোনও আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃের জ্ঞান হয় বিচারে—ঝুড়িঝুড়ি কৰ্ম্ম করলেও কিছু হবার নয়। ভুল করে একটা দড়িকে তুমি কালসাপ ভেবেছ ; তাতে তোমার ভয় হয়েছে, উদ্বেগ হয়েছে। এ যাবে কি করে ? যদি যথাযথ বিচার করে এটা যে দড়ি, এই তথ্যটা ধারণা করতে পার, তবেই তা সম্ভব। নইলে সাপ বলে ধরে নিয়ে দড়ি-টাকে হাজার ঠেকাও না কেন, তাতে তো ভয়-সংশয় ছাংখ যাবার নয়।

বস্তু নিশ্চয় হয় বিচারে, গুরুর উপদেশে—জ্ঞান, দান বা প্রাণায়ামে নয়। তবে ফল পেতে হলে ঠিক ঠিক অধিকারী হওয়া চাই ; দেশ, কাল ইত্যাদির যোগাড় তার সহায় মাত্র। এই জন্ত বলি, আত্মবস্তুর যদি কেউ জ্ঞানতে ইচ্ছা করে, তাহলে তার বিচার ছাড়া আর কোনও পথ নাই ; আর সে বিচারও করতে হবে ব্রহ্মবিৎ দ্বয়সিদ্ধ সদগুরুকে সাহায্য বাস করে।

আত্মবিস্তার অধিকারী কে ? বেদান্তের

অধিকার পেতে হলে এই লক্ষণগুলি থাকা চাই—প্রথমতঃ বেশ পরিষ্কার মাথা থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রজ্ঞান থাকা চাই; তৃতীয়তঃ শুদ্ধ উপস্থিত করবার ও খণ্ডন করবার কৌশলটি আয়ত্ত থাকা চাই। এগুলো হল বাইরের ভোঁড়গোড়। আসল কথা হচ্ছে, ব্রহ্মবিদ্যায় তোমার অধিকার আছে বুঝবে। যদি দেখি, তুমি বিশেষকী, বৈরাগ্যবান, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এই গুণগুলি তোমার মাঝে আছে; বিশেষতঃ তুমি ষথার্থ মূক্তির পিপাসু। এত যে চার দক্ষা আরোজনের কথা বললাম, শাস্ত্রে এদের বলে বেদান্তের সাধন। সাধনসম্পন্ন অধিকারী হলেই তবে ব্রহ্মবিদ্যায় ঠিক ঠিক নির্ভা হয়, নইলে পেছনে সাধনের জোর না থাকলে একবার বিচার এগোয় আর একবার পেছোয়—এমনি টাপমটাপই কেবল চলতে থাকে।

সাধনগুলির শাস্ত্রীয় নাম হচ্ছে—প্রথমতঃ নিষ্ঠানিভাবস্তবিরেবক, দ্বিতীয়তঃ ইহা-মুক্ত ফলভোগ বিব্রাগ, তৃতীয়তঃ শমাদি ষট্‌কসম্পত্তি, চতুর্থতঃ মুমুক্শুহ। ব্রহ্মসত্তা, জগৎ মিথ্যা—এমনি একটা দৃঢ় সংস্কার চিন্তে পোষণ করাই হচ্ছে নিষ্ঠ্যানিভাবস্তবিরেবক। “দেহজ্ঞান হইতে আরম্ভ করে ব্রহ্মজ্ঞানভূতির গুরু পর্য্যন্ত যা কিছু আমার ভোগের বস্তু, অতএব যা আমার বাইরে, তা সমস্তই অনির্ভর, খুঁজলে সবার মাঝেই এমন একটা না একটা খুঁত দেখতে পাব, যাতে বুঝতে পারব তাদের দেবার আমার পূর্ণ তৃপ্তি কিছুতেই ধরতে পারব না। তবে আর ভোগের বস্তুতে দর্শন শ্রবণের আসক্তি রাখা কেন?”

এমনি বিচার করে বিষয় পরিত্যাগ করাকেই বলে বৈরাগ্য।

তারপর ষট্‌ক সম্পত্তি। নিজের লক্ষ্যটী সর্বদা মনের মাঝে জাগিয়ে রাখা হচ্ছে শ্রদ্ধা অর্থাৎ চিন্তের ভারকেদ্রুকে ঠিক রাখা—এদিক ওদিক টলতে না দেওয়া। বহিরিন্দ্রিয়ই হউক আর অন্তরেন্দ্রিয়ই হোক বিষয় হতে মোড় ফিরিয়ে তাদের নিজ নিজ গোলকে আবদ্ধ করে রাখাই হল দম। অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে বিষয় এসে যদি ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থিত হল, অমনি যে তারা উত্তেজিত হয়ে একেবারে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তা হতে দেব না, লাগাম কসে ধরে তাদের ঠিক ঠিক স্থানে রেখে দেব। চিত্তবৃত্তির ধর্ম এই, সে কেবল বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়বে—আকাশ পাতাল নানা কথার আলোচনায় দিন কাটাতে। মনের এই বাইরের আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে উপ-ব্রতি। হুঃখের পাহাড় মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ুক না কেন, নিশ্চয় হয়ে সব সয়ে যাব, তার ঐতীকারের পর্য্যন্ত চেষ্টা করব না, তার জন্ত কান্না জুড়ে দেব না, এমন কি তার কথা চিন্তা পর্য্যন্ত করব না—ইহা তিতিক্ষা। শাস্ত্রের কথা, গুরুকথা ঠিক ঠিক সত্য বলে ধারণা করা—একেই বলি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা নইলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। শুদ্ধ নির্মল ব্রহ্ম সর্বদা বুদ্ধিকে স্থাপন করা হচ্ছে সমা-শান—চিন্তকে বানচাল হতে দেওয়া নয়। শম হচ্ছে মনের শাস্ত, সমাধান বুদ্ধির শাস্তি। এই হল ষট্‌কসম্পত্তি।

অহং বোধ হতে দেহ বোধ পর্য্যন্ত সমস্তই বন্ধন, আর এ বন্ধন সত্যও নয়; আমি কে, তা জানিনে বলে অজ্ঞানবশতঃ এই সমস্ত লক্ষন করেছি। আত্মবরূপ জেনে এই বন্ধন

হতে মুক্ত হবার ইচ্ছাই মুমুক্শু। মুমুক্শুদের  
আবার উৎস, মধ্যম, অধম পেন্দে মাত্রার  
ভারতম্য আছে। তবে অধম বা মধ্যম রকম  
মুমুক্শু থাকলেও বৈরাগ্য, শমদমাদি, গুরু-  
কৃপা ইত্যাদির বশে ক্রমে তার তীব্রতা বৃদ্ধি  
পায় এবং শেষে ফলদায়ী হয়ে থাকে। যার  
বৈরাগ্য ও মুক্তির পিপাসা এত ছটীই তীব্র,  
শমদমাদি তার পক্ষে বার্থ ফলবন্ত হয়ে  
থাকে। আর এতটীরা গোর যার মাঝে নাই,  
তার শমদমাদির কোনও মূল্য নাই। মরু-  
ভূমিতে জগদিন্দুর মত তার শমদম একটা  
কথার কথামাত্র।

যতগুলি কারণ থাকলে মুক্তির সম্ভাবনা,  
তাদের মাঝে ভক্তিই প্রধান। আত্মরূপ বা  
আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানই হচ্ছে ভক্তি অর্থাৎ  
আমি কে, পরম বস্তুব সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ  
এটুকু জানবার জন্য প্রাণের যে তীব্র ব্যাকু-  
লতা, তাকেই বলি ভক্তি। ভক্তি আর মুমু-  
ক্শু এক পর্যায়ের বস্তু।

বেদান্তের অধিকার পেতে হলে এই  
চারটি সাধন থাকা চাই। তারপর পারেন  
বোধন কাটতে পারেন এমন সঙ্গতরূপ আশ্রয়  
নেওয়া চাই।

বাণ্য যদি ঋণ রেখে যান, তাহলে ছেলে  
তা শোধ করে; কিন্তু সংসারে যে বোধনে  
নিজকে বেঁধেছে, তুমি ছাড়া সে বোধন খুলবার  
আর তো কেউ নাই। মাগায় যদি কেউ  
ভার চাপিয়ে দেয়, তাহলে আর একজন এসে  
বোকা নামিয়ে হুঃখ দূর করে দিতে পারে—  
কেন না এ হুঃখ বাইরের হুঃখ। কিন্তু ক্ষুধার  
জ্বালায় যখন পেট জ্বলে, তখন সে হুঃখ দূর  
করবার তুমি ছাড়া তো আর কেউ নাই।  
যার রোগ, ঔষধ পথ্য তো তাকেই দিতে হবে,  
তবেই না রোগ আরাম হবে; না অগ্নির ঔষধ  
খেলে রোগীর রোগ সারবে। তাই বলি  
বস্তুস্বরূপ জানতে হলে জ্ঞানের দৃষ্টি মেলে  
তোমাকেই তা জানতে হবে, কেবল পণ্ডিত  
হণেই চলেবে না। শব্দজাল তো মহারণ্য—  
চিত্ত কেবল তার মাঝে দিশেহারা হয়ে ঘুরেই  
বেড়ায়, ক্ষেত্রবার পথ পায় না; এই জন্ত তত্ত্ব  
জানতে হলে তত্ত্বজ্ঞের কাছে যেতে হয়, পণ্ডি-  
তের কাছে নয়। শুধু ঔষধের নাম জানলেই  
রোগ পায় না—ঔষধ খেতে হয়। তেমনি  
সাক্ষ্য অমুণ্য না হলে শুধু “আমি  
ব্রহ্ম” বললেই মুক্তি হয় না।



## শ্রদ্ধাবীৰ্য্য

—: {#} :—

ভোগ আর যোগের সমন্বয়সাধনের একটা ধূয়া অনেকদিন হইতেই দেশে দেখা দিয়াছে। ধর্মের সাধনাই জীবনের শ্রেয়ঃ এবং তাহার জন্ত অনেকখানি কষ্টস্বীকার, ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন—এই ছিল আগেকার আদর্শ। এখন কষ্টস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মাঝে নানি কারণে মন্দা হইয়া পড়িয়াছে; হয়ত আর পূর্বের মত জীবনীশক্তি নাট, কিম্বা মস্তিষ্কের দুর্বলতাব সঙ্গে সঙ্গে পরিণামদর্শিতার ক্ষমতাও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক, কলির জীব, বিশেষতঃ এই বঙ্গবাসী কলির জীব কষ্ট সহিতে নিতান্তই নারাজ। ভোগের একটা অদম্য পিপাসা লোকের কথার-বার্তার, চাণচলনে, সাহিত্যো-শিল্পে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যদি বলি, এই ভোগ-স্বাস্থ্য-মানুষের মাঝে যে-অংশটুকু পণ্ডিত, তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, মানুষের মাঝে যে অংশটুকু দেবতা, তাহাকে বাচাইয়া রাখিবার জন্ত অপরিমিত লালসার একটা প্রতিবেদক খুঁজিয়া বাহির করাও স্বাভাবিক হইবে না কেন? দেবত্বের এই স্বাভাবিক প্রেরণাশব্দতঃ “মানুষ ধর্মের আশ্রয় খোঁজে। স্বচ্ছন্দ ভোগের মুখে ধর্ম একটা বঙ্গার মত। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে যিনিই সচেতন হইয়াছেন, তিনিই বলিবেন; এই ধর্মের রাশটুকু টানিয়া ধরিবার প্রয়োজন কতখানি মনঃস্থিত।

ধর্মের কথা মানুষের কাণে বজ্রধ্বনির মত কঠোর। অথচ ইহাকে উপেক্ষা করিয়া ভোগের স্রোতে গ'-ভাসান দেওয়ার মত সাহস ও সামর্থ্যও তাহার নাই। এই জন্ত বুদ্ধমান মানুষ একটা নূতন ফন্দি আঁটিয়াছে। দার্শনিক কুতর্ক দ্বারা যদি ধর্মের কঠোর মুক্তিকে কোনও রকমে সরস করা যায়, সংসার জ্বলের আয়োজন ঘোল আনার উপর আঠারো আনা বজ্রের রাখিয়াও ধর্মের মুখোস যদি না খুলিতে হয়, মানুষ তাহার আয়োজনেই ব্যস্ত। আচার বিচারের শিথিলতার ভিতর দিয়াই যে জাতীয় চরিত্রের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নয়। বর্তমান যুগের স্বজনী প্রোতভাও ভোগ-যোগের এই অপক্লপ সমন্বয়ের জন্ত উষ্ণ পড়িয়া লাগিয়াছে। উপনিষদের বাছা বাছা বুলি, বৈষ্ণবসাহিত্যের সরস পদাবলী আজকাল অনেকেরই কণ্ঠস্থ। সেগুলি দিয়া জ্ঞান আর পেমের উৎকর্ষ যতটুকু হউক না কেন, ভোগীদের সমর্থন কিন্তু পূণ্য মাত্রাতেই চলিয়া থাকে।

• ভোগে সুখ নাই, এ কথা যদি বলি, তাহা হইলে মিথ্যা বলা হইবে। সংসারের পোপে ঘোল আনা লোভের প্রত্যক্ষ অমুভূতিকে চেলিয়া ফেলিয়া বৈরাগীর একটা বাক্য কণাই কি কখনও কার্যে হইতে পারে? সুখ চাও, সে ভাল কথা, তার জন্ত ভোগ প্রয়োজন—বেশ তো, তাই বা মন্দ কিসে। কিন্তু ভোগের সুখের সঙ্গে তার দুঃখের কথাটাও একবার

কিন্তু আজকাল উচ্ছৃঙ্খল ভোগতৃপ্তির যুগে।

ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন নয় কি? এ কথাই উত্তরে চার্লস একদিন বলিয়াছিলেন, দেখ, ভোগের সুখের সঙ্গে হুঃখ যে মিশাল থাকিবে, সে আর নতুন কথা কি? মাছে কি কাঁটা থাকে না? ধানগাছে কি খড় থাকে না? কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে মাছ খায়, ধানের চাষ করে। প্রতিপক্ষ চার্লসের এই যুক্তিতে বলিয়াছিলেন, নিত্য সুখের কথা; বলিয়াছিলেন, এতখানি হুঃখ সহিয়া তুমি সুখের জোগাড় করিবে, তার চাইতে এমন সুখের সন্ধান যদি তোমায় দিই, যাহার ক্ষয় নাই, উপকরণ প্রয়োজন হয় না, তাহা হইলে কি বল? চার্লস হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, শরীর শুকাইয়া কবে কোন্ লোকে গিয়া নিত্যসুখ পাইব, সে ভবসায় যে উপস্থিত লাভটা ছাড়িয়া যায়, তাব মত বোকা আর কে? আমি বলি, যতদিন বাঁচিয়া থাক, অণ করিয়া যি খাও। দেহ একবার ছাই হইলে কি আর ফিরিয়া আসিবে?

সুখে আমরা না মানিলেও মনে, মনে বোধ হয় প্রায় সকলেই চার্লসের এই যুক্তির তারিফ করি। কথাটা এই, উপস্থিত লাভ ছাড়িব কিসের ভরসায়? চার্লসের এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেহ দিতে পারেন নাই, কেননা এ কথার যে উত্তরই হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সংসার নিরাশ মশগুল হইয়া আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত লাভ ছাড়বার কথা আমাদের তো কাহারই মনে আসে না। মস্তিকে এমন শক্তি কোথায় যে ছুদিন পেছনের ভাবনা আজ ভাবিয়া দেখি? দৃষ্টির এমন তীক্ষ্ণতা কোথায় যে গোটা সংসারটাকে কর্মামলকের মত প্রত্যক্ষ করিয়া ভাব সকল

হেরফের বুঝিয়া নিই। কাজেই দুর্বলচেতা কৃপমণ্ডকের মত চার্লসের অল্পকরণে ক্ষীণবশে সবাই চোঁচাইতেছি, উপস্থিত লাভ ছাড়িব কিসের ভরসায়?

এই প্রশ্নের মূলেই রহিয়াছে অবিশ্বাস। তুমি বিচক্ষণ, পশ্চিমামদর্শী, তুমি আসিয়া আমাকে বলিতেছ, সংসারে ঐতটা আসক্তি ভাল নয়, আসক্তি কিছু কমাও, তাতে তোমার লাভ আছে। আমি অমনি বলিয়া বলিলাম—লাভের ভরসা কি? এর পর যিনি যত বিচক্ষণই হউন না কেন, আমার অজ্ঞাত একটা বিষয় নিরাশ কতকগুলি কথার শ্রদ্ধা ছাড়া তিনি আর কি করিতে পারেন? দর্শনের যত যুক্তি, যত তর্ক, সমস্তই য দাঁড়ায় বিশ্বাসের উপর। দেখিতেছি, জগতে সব ফাঁক ফাঁক, বেদান্ত আসিয়া বলিলেন, ওটা তোমার ভ্রম, ফাঁক কোথায়ও নাই—সব নিরেট, সব অখণ্ড। এ একেবারে আমার জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত কথা নয় কি? যদি অবিশ্বাস করি, না মানি, কোন্ যুক্তিতে তিনি ~~অবিশ্বাস~~ বুঝাইবেন? ভোগে মজিয়া আছি, গোপী আসিয়া বলিলেন, ও সব ছাড়—বাসনাফলের মত তৃপ্ত আর কোথায়ও পাইবে না। এও তো বিপরীত কথা। যদি না শুনি, তিনি আমাকে শোনাইবেন কি করিয়া?

তবেই দেখিতেছি, প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দেওয়া মুখের কথা নয়—অদৃষ্টের প্রতি, পরলোকের প্রতিষ্ঠিত ঠিক বিশ্বাস না জন্মিয়া দিতে পারিলে, গুহাহিত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষ না করিতে পারিলে তর্ক দ্বারা কোনও লাভ হইবে না। ধর্ম্য কর্ম বল, ত্যাগ সংযম বল, সমস্তের মূল হইল শ্রদ্ধা। যেখানে শ্রদ্ধা



নাট, সেখানে কহকগুলি শুক আঁচালের  
ঝোঝা পিঠে চাপাটের দাও, কোনও লাভই  
হটবে না। আবার একটি কথা না বলিয়াও  
একটি যুক্তি না দেখাইয়াও যদি নজরপ্রণয়  
নিখাসের, নিছাৎ-ফুলিঙ্গ কাহারও ভিতর  
জাগাইয়া তুলিতে পার, বুদ্ধ করামলকন্য  
তাঁহার কাছে সত্য হইয়া উঠিবেন, ভ্যাগ  
অনির্বচনীয় মহিমার প্রোক্ষল হুটয়া উঠিবেন।

নিখাসই সাধনার মেরুদণ্ড। আজ দেশবাসী  
হৃদয়ে নিখাসের আলোকরেখা মুছিয়া গিয়াছে,  
সংসারের করালছায়া আসিয়া পথ জুড়িয়া  
বসিয়াছে—একপস্থলে উপস্থিত লাভ ছাড়া  
দূর দূরান্তের কথা ভাবিবার ব্যস্তিবার সহস  
হটবে কার? শুধু পরকাল বা পরজন্ম বলিয়াই  
নয়, ইহকালেরই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়টা মানুষ  
অসন্ত নিখাস পোষণ করে? কে নিজের  
বলিষ্ঠ হৃদয়ের অসঙ্কেত পাতায়ের উপর দাঁড়া-  
ইয়া বলিতে পাবে, আমি জানি—এই আমার  
নিয়তি, এই আমাকে হঠতে হটবে? এমন  
কথা বলিতে হটসে পুরুষকারের প্রয়োজন,  
সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রচুর সঞ্চয় পেহুনে  
থাকা প্রয়োজন। নিখাস যে শুধু দৈবের  
ভরসা, এক কথা যাহারা মনে করে, তাহারা  
মহাভ্রান্ত। ঐকি ঠিক পুরুষকার না জাগিলে  
যথার্থ নিখাসও জন্মিতে পারে না। সে  
পুরুষকার দূরে থাকুক, বৈবের উপরও বুঝি  
মানুষ আর তেমন করিয়া ভরসা করিতে পারে  
না—ভবিষ্যৎ জ্ঞান এমন করিয়াই অন্ধকারে  
ছাইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় যদি ভ্যাগ-  
সংসারের চোখে ধুলি দিয়া উপাস্ত ভোগের  
কদম্ব পক্ষে মানুষ ডুবিয়া মরিতে চায়, তাহা  
হটলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

যে নিভীষিকায় সমস্ত হইয়া আত্মীয় প্রাণ

আজ ভোগপ্রণয়ের সময়ে আত্মপ্রবন্ধনার  
উপকরণ জুটায়! আনিতে চাচিতেছে, তাহা  
দূর করিতে হইলে নিখাস না প্রদান অভিষেক  
জাতিকে সজীবিত করিতে হইবে। এক উপায়ে  
তাহা সম্ভব, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। পূর্বের  
বলিয়াছি, তর্কবারা বা যুক্তি দেখায় প্রকা  
উৎপাদন করা কখনও সম্ভবপর নয়—নৈবা  
তর্কেণ মতিরান্বেষণ। প্রকা জাগাইতে হটলে  
নজরসংহত হৃদয়ের প্রচণ্ড প্রেরণা পাকা চাই।  
আজ সমাজের অসহ্য এতট বিশৃঙ্খল ও হুর্জল,  
যে তাহার মাঝে দৃঢ়চেতা সমাজপতির আবি-  
র্ভাবের আশা সূদূরপর্যন্ত। ক্ষেত্র কোণায়  
যে বীজ রোপণ করিলে তাহা অক্ষুরিত হটবে?  
দল পাকাইয়া একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার মন-  
লবকে নিফল জ্ঞান বলিয়াই তাহাকে সমর্থন  
করিতে পারি না। সম্বাদ্য হটয়া কাল কার-  
বার পূর্বে ব্যক্তিগত জীবনের উৎসর্গই আজ  
বিশেষ প্রয়োজন।

ভোগপ্রণয়ের পূর্বে প্রাণে যে দেশ  
ভাসিয়া যাচেতেছে, ইহা দেখিয়া কাহারও কি  
প্রাণ কাঁদিতেছে না?—অশ্রুত কাঁদিতেছে।  
এই বস্ত্রাবেগ রোপ করিবার শক্তি তাহাদের  
মাঝেই আছে। কিন্তু গান্ধীসেব ছায়া আজ  
চারিদিকে এমন নিবড় হইয়াছে, দেখা দিয়াছে  
যে ইচ্ছাও বুঝি অন্তরপুরুষের এত করুণ  
আবেদন, আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার এই  
সম্ভোপন আকাজকে নিফল, ভাবিয়াই  
দূরে সরিয়া গিয়া রাখিতেছে। আমি বলি, দেশের  
দিকে চাতিয়া দেখিবার তোমার কোনও  
প্রয়োজন নাই—তুমি তোমার অন্তরপুরুষের  
দ্বিগতপ্রেরণার অনুসরণ কর। দেশজনের  
প্রত্যেকে যদি কিছু কিছু শক্তি থাকে, তেজ  
থাকে, তবেই দেশের মিলনে মহাশক্তির আশা

ভাব সম্ভব। নতুবা ভয়ভয়ের উপর ভয়ভয়  
চালিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিয়াই কি তাহা  
একটা অলস অগ্নি-তুলিদের চেয়ে বড় হইয়া  
উঠিবে? দেশের কথা দূরে থাকুক, দেশের  
কথাও কণকালের জন্য না হয় তুলিয়া যাও—  
কেবল এই অমানিশার বিপুল আধারে প্রাণ-  
পের মত আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া রাখ।  
তুমি তোমাকে বিশ্বাস করতে শিখ। তুমি  
দেশের দেশের কি করিবে সে তো দূরের কথা,  
তুমি তোমার কি করিবে, সেই কথাই আগে  
ভাবিতে শেখ। সময়ে সময়ে আকর্ষণ প্রকৃতির  
সীতি। তোমার প্রাণে যদি প্রকার আলো  
জলিয়া উঠে, তাহা হইলে যেখানে বস ভক্ত-  
শক্তি প্রকাশের আকুলতার গুমরিয়া ধরিতেছে,  
সমস্তই সেই আলোককে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে।  
প্রাণের আকর্ষণে মানুষকে এক করা যায়—  
মুখের মুলিতে কাহাকেও বাধিয়া রাখা কি  
সম্ভব? সেই প্রাণ আগে নীরব তপস্তার।

একদিন এই নীরব তপঃসাধনার ছিল এ  
দেশের সমাজের প্রাণ। আজও যে শক্তি এই  
স্বংসোন্মুখ সমাজকে শাসন করিতেছে, তাহার  
মূল কোথায়, কাহার প্রাণ হইতে কবে  
উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে  
পারিবে কি? চিরকাল মানুষ এখানে নীরবে

আত্মদান করিয়াছে এবং সেই উৎসৃষ্ট প্রাণের  
পূর্ণাঙ্গিতা জমাট বাধিয়া সমাজ পড়িয়া  
তুলিয়াছে। আজ পুরুষসমাজ উজ্জ্বল, সনা-  
তন সাধনা হইতে ব্রহ্ম, কিন্তু এখনও চাহিয়া  
দেখ, নারীসমাজের নীরব তপঃশক্তি কতখানি  
সম্পূর্ণ মমতার জাতিকে আগলাইয়া রহি-  
য়াছে। কোথায়ও যে সংস্কার প্রয়োজন নাই,  
সে কথা বলিতেছি না, বলিতেছি সংস্কার  
করিবার পূর্বে প্রাণের প্রকাশতরঙ্গী আনন্দ  
কর—তাব নষ্ট করিয়া কিছু করিতে বাইও  
না। তাহা হইলেই বৃদ্ধিতে পারিবে, পরের সং-  
স্কারের চেয়ে নিজের সংস্কারের উপরেই এদেশের  
আগ্রহ বেশী। সেই স্বত্র ধরিয়া নিজের উপর  
বিশ্বাসকে উদ্ধৃত কর—বাহির তুলিয়া অন্তরের  
মাঝে সমাহিত হইতে শেখ, পারিপার্শ্বিক  
আপনা হইতে তোমার অন্তরূপ হইয়া উঠিবে—  
তোমার একাগ্রচিত্তের নিভৃত সাধনা একদিন  
বিশ্বের দেউলে ধূপগন্ধের মত ছড়াইয়া পড়িবে।  
যে নিষ্কারণ সমস্তা সম্মুখে উপস্থিত, তাহার  
আর তো কোনও নীমাংসা খুঁজিয়া পাইতোছি  
না। আজ ডাকিয়া কাহারও সাড়া পাওয়া  
হুইল—তবুও বলি—

এক মনে তোর একতাসাতে একটা যে তার  
সেইটা বাজা।

## ইচ্ছার স্বাভাব্য

—৩০০—

ইচ্ছাকে বড় ব্যর্থক করতে পারব  
অগতির সঙ্গে বিরোধ ততই কমে আসবে,  
আমাদের অধিকাংশ বিরোধের কারণই ইচ্ছার  
সঙ্গীর্ণতা।

কানো কানো ইচ্ছার এমন সঙ্গীর্ণতা  
স্বপ্নে, অন্ধ প্রবৃত্তি অমুখ্যারী কচির বাইরে  
আর কিছুই তারা দেখতে পার না। দেশের  
খ্যাতিতে ভায়তঃ স্নানকে বতটুকু জাগ  
বীকার কঁবতে হয়, তার মাঝেও তাদের মন  
ঠিক থাকে না—উপস্থিত নিজের ক্ষতিটাকে  
অতিরিক্ত ভাবে যেন নিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে  
ভীরা বৈকি বসে।

এ থেকেই বিরোধ, আপন। আমি  
এরকম না হলে পারি না, আমার এটা ভাল  
লাগে না, তবু জোর করে এ রকম করতে  
হব—এই সব ভাবে সে নিজকে হুঁত্যা মনে  
করবার অগৎ মর সবি তর্ক তার  
কাছে বিরোধী হয়ে দাঁড়াই। শক্তি থাকলে  
কোমর বেধে ঝগড়ার লাগে, না থাকলে  
অভিমানের নিজের বুক নিজে খুঁড়ে মরে।  
এ সব শুধু সাধ করে বাঁধনে ধরা দিয়ে পরে  
আঁকুপাকু করা।

এর চেয়ে নিজের ইচ্ছাকে যদি কচির  
চেয়ে বড় মনে করি—শুধু মনে করা নয়,  
নিজকেই বীর ইচ্ছার পরিচালক অমুভব করি,  
তবে আর ঝগড়া করতে হয় না, নিজকে  
হুঁত্যাগাত্ত মনে হয় না।

আমার ইচ্ছা সার্বভৌম—সবার ইচ্ছাকেই  
অস্বাক্ষেপে আমি আমার বলে বরণ করে নিতে  
পারি। কচি জাগল, সেইমত চললাম; যদি  
বিরোধ হয়, কেউ বানী হয়, বা নুতন কচি  
হুঁটি করতে যদি হয়, সে কমতা কি আমার  
নাই? আমি কি এতই ক্ষুদ্র? তাঁর ইচ্ছার  
যখন যে বেশে যে আচার, যে ব্যবহার আমার  
উপর এসে পড়ছে, সকল অবস্থার জন্যই আমি  
তৈরী। ব্যবহার তো ইচ্ছার মত গড়ে নেওয়ার  
যায় না—যে যেমন দেখে, সে তেমনি পার।  
এর মাঝে নিজের কচি অমুখ্যারী সাংগত দাবী  
করা নেহাৎ বোকানী।

সর্বাধিকার সকল পরিবর্তনের জন্য বার  
তৈরী, আকস্মিক বাধায় তাদের শিছু হটাতে  
পারে না; সহজে তারা প্রসূক হয় না;  
অন্তর্কিতে রিপু এসে তাদের চিন্তবৃত্তিকে  
এলোমেলো করে দিতে পারে না। তাদেরই  
“স্বার্থেবহুবিধমনাঃ স্বার্থেবহুবিধতঃ” থাক-  
বার মত শাস্তি লাভ হয়।

শক্তির উৎসব এই অটল ইচ্ছাক্রমে।  
ইচ্ছাক্রমেই আত্মার অধিবাস। আত্মা  
হয়ে নিজের ইচ্ছাকে যে বিশেষ বলে  
উপলব্ধি করতে পারে, ক্ষুদ্র বিশেষকে গারে  
বাকিয়ে অগ্নেই তাকে সুগড়ে পুড়তে হয় না।  
এই শক্তিই চাই—আত্মার প্রসার, ইচ্ছার  
ব্যাপকতা, চিন্তার সার্বভৌমিকতা। মোট  
কথা, নিজকে বিরোধের উর্দ্ধে উঠিয়ে নিলেই  
বিরোধে জয় হওয়া গেল।



## ইন্ডিয়-সংযম

—:৫:০:—

ইন্ডিয়কে কি করে বেশে রাখতে হবে, সে সম্বন্ধে উপনিষদে সংক্ষেপ অথচ স্পষ্ট দু'তিনটি উপদেশ আছে। উপনিষদ্ বলছেন, ইন্ডিয়কে কে বেশ করতে পারে?—“যত বিজ্ঞানবান ভবতি”—যার বিজ্ঞান আছে। জ্ঞান আর বিজ্ঞান দুটো কথা—জ্ঞানের পরেও বিজ্ঞান, কিনা বিশেষ জ্ঞান। তাবতে পার, বিজ্ঞান তো তাহলে চরম কথা হল। বিজ্ঞান হলে তবে ইন্ডিয়দমন হবে—আবার ইন্ডিয়দমন হলে তবে না বিজ্ঞান প্রকাশ পাবে। এ গোলক-ধাঁধার নীমাংস কি?

নীমাংস হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের সহজ অর্থ নিয়ে। জ্ঞান বলতে সোজা সোজা সাংসারিক অভিজ্ঞতাকেই ধরে নাও না কেন। বা নিয়ে সংসারে চলছি কিরছি—তাকেই না হয় জ্ঞান বললাম। দার্শনিক হয়ত একটু ইন্ডিয় হয়ে বলবেন, এ জ্ঞান ব্যবহারিক-জ্ঞান। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। জ্ঞান কথাটার যে সাদানিধে একটা অর্থও আছে, তার প্রমাণ রয়েছে চতুষ্টয়। সেখানে ঋষি বলছেন, মাহুৎ জ্ঞানী বটে, কিন্তু কেবল তারাই জ্ঞানী নয়—যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগানরঃ। এখানে জ্ঞান বলতে ব্যবহারকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। আমরাও উপনিষদের তাৎপর্য অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভেদ ধরতে জ্ঞানকে এই সহজ অর্থেই গ্রহণ করছি। তা ছাড়া, আর একটা কথা। সাধারণ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উন্নয়ন

হবে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। তাহলেই জ্ঞানের সিদ্ধরূপ আর সাধনরূপ—দুই-ই পাওয়া গেল। সিদ্ধরূপের কথাও উপনিষদে আছে—মত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। কিন্তু সাধন অবস্থার অমুভূতি যতই গাঢ়তর হতে থাকবে, ততই জ্ঞানের প্রকাশ অব্যাহত হবে এবং অমুভূতির প্রত্যেকটি ধাপকে জ্ঞান বলে দোষের হবে না। অবশ্য এটা জ্ঞানের আপেক্ষিক দিক।

মোট কথা জ্ঞান বলতে যদি সংসারের অভিজ্ঞতা বুঝি, তাহলে বিজ্ঞান বলতে বুঝবে তার চেয়েও উপরের কিছু। জ্ঞানকে বা নিয়মিত করছে, উপনিষদ্ তাকেই বলছেন বিজ্ঞান। এইখানে মনোজগতের একটা রহস্যের কথা বলি। আমরা সবাই জানি, আমাদের হিত শুনলো বড় এলোমেলো—আমরা এই এক কথা তাবতে তাবতে পরস্পরকেই আর এক কথার হট্টকে পড়ি। এই যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভাবাচোরা অমুভূতি—এইটুকুই বলছি জ্ঞান। কিন্তু রহস্য এই, মন যতই এলোমেলো হোক না কেন, তার পেছনে একটা মতলব কিন্তু বরাবরই লুকানো রয়েছে। একটা কিছুকে লক্ষ্য করে মন একবারে এদিক একবার ওদিক করে ঘোর বিব্রত সংসারীও একটা মতলব রয়েছে। কিন্তু তার প্রাণী করবার ক্ষমতা অল্প বলেই সে সমস্ত মতলবকে এককেন্দ্রে এনে চিত্ত-শুলোকে সাজিয়ে নিতে পারে না—একবার

ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার সামনে, এক-  
বার পেছনে নানাদিক থেকে তাকে-উকি  
দিয়ে দেখতে চায়। এইটাই হল-জ্ঞানের  
চকলতা বা জ্ঞান; আর ওই যে পেছনের  
মতলবীবুদ্ধিটুকু, ওইটাই হল জ্ঞানের নিয়ামক  
বা বিজ্ঞান। সাধারণ মানুষ শুধু জ্ঞানটাকেই  
দেখতে পায়, তাই তার ভারী অবস্থা। আর  
বুদ্ধিমান মানুষ তার পেছনে মতলবীবুদ্ধি বা  
বিজ্ঞানটুকু দেখতে পায়, তাই সে কাজকর্মে  
জারী হ'সিয়ার।

তাহলে বুঝতেই পারছি, প্রবৃত্তি নিয়েই  
থাকি আর নিবৃত্তি নিয়েই থাকি, জ্ঞানের  
পেছনে বিজ্ঞান সর্বদা লেগেই আছে। এখন  
নিজকে সামলে চলবার যদি ইচ্ছা থাকে,  
তাহলে বাইরে থেকে দৃষ্টিটাকে একটু ভিত-  
রে ফিরিয়ে দিতে হবে, জ্ঞানের পেছনে  
বিজ্ঞানকে ধরে থাকতে হবে। সোজা কথায়,  
যদি 'কর না কেন, কি মতলবে করছ, সেটা  
কর' সর্বদা ফেরাল থাকে; আর হরষড়ি  
বদলিও না একটা মতলব ঠিক  
রেখো। তাহলেই দেখবে, ইঞ্জিয়গুলো  
সাময়িক হয়ে এসেছে। ইঞ্জিয়গুলো হচ্ছে  
হাতিয়ার, তাদের দ্বারা ভাল-মন্দ সব জাজাই  
করা চলে। তবে কিনা সাধারণ হাতিয়ারগুলো  
মরা—সেগুলোকে যেখানে ফেলে রাখ, সেখা-  
নেই পড়ে থাকে, আর এই ইঞ্জিয়গুলো হচ্ছে  
যেন তুতে পাওয়া জ্যান্ত হাতিয়ার—চোট  
দেবার বুদ্ধিটুকুই পুতেই চাড়া হয়ে ওঠে। এই  
জন্তাই এদের সঙ্গে গেরে ওঠা কঠিন। হরষ  
জুনি এদের নিয়ে এক কাজ করবে ভেবেছ,  
তোমার অজান্তসারে কখন যে তারা তাদের  
কনের মত বিষয় পেয়ে ছুটে গিয়েছে। এই  
জায়গায় হ'সিয়ার থাকাই হল বিজ্ঞানের

কাজ। তোমার লক্ষ্য কি, বুদ্ধি কোন মুখী,  
সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বুদ্ধির রাশ কসে  
ধর, দেখবে, ইঞ্জিয় সাময়িক হয়ে এসেছে।  
লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, আর সেই লক্ষ্যপথের  
ধারায় সঙ্গে ইঞ্জিয়ের চালচলনগুলি মিলিয়ে  
নিতে হবে, তবেই ইঞ্জিয়-সংযম সহজ হবে।

এ থেকে বুঝতেই পারছ, এর দরুণ  
তোমার কতখানি হ'সিয়ার থাকি দরকার।  
উপনিষৎ এর পরেই সে কথাটা বলেছেন।  
“যুক্তেন মনসা সদা”—সব সময়ের জন্ত মন-  
টাকে লক্ষ্যে নিযুক্ত রাখতে হবে। প্রথমতঃ  
বিজ্ঞানবান হওয়া চাই—অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে  
সচেতন হওয়া চাই, তার পর মনকে হওয়া  
চাই—অর্থাৎ মনটাকে হারিয়ে ফেলে চলে  
না, লক্ষ্য ঠিক আছে কি না, সর্বদা সেদিকে  
কড়া নজর রাখা চাই।

প্রথম প্রথম সর্বদাই নিজের উপর কড়া  
নজর রাখা যে একরকম অসম্ভব, সে কথা  
জানি কিন্তু অভ্যাসে সবই হয়। অন্ন অন্ন করে  
অভ্যাস করতে হয়। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব ভারী  
অনুর একটা উপমা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন,  
“কোঁকের মাথায় চলা আমার অভ্যাস, এখন  
হিম হই কি করে।” ভেতরে যেখানে, যতটা  
খোঁক নিয়ে চলি, তার চেয়ে তাকে একটু  
কমাতে পারি না কি? দেখলাম, তা পারা  
যায়। প্রথম দশ পা গিয়ে একটু থমকে  
দাঁড়ালাম, তার পর নয় পা, ছয় পা, হ পা,  
এক পা করে শেষে একেবারেই থেমে  
গেলাম। এমন কি করে আমার মনকেও আমি  
বশে এনেছি।” মনকে হবারও ঠিক এই  
উপায়। সারাদিন হ'স থাকে না, আজ্ঞা,  
দিনের মাঝে হ'চার বার শুধু নিজকে হ'সিয়ার  
করবার জন্তই একটু সময় করে নাও না কেন।

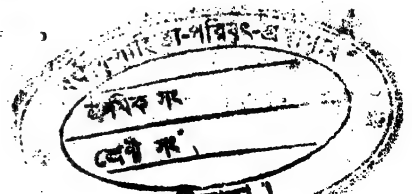
হিন্দুর ত্রিসন্ধ্যা, মুসলমানের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ—এর মূলে সেই অভ্যাসবৈশিষ্ট্য, হ'সিয়ার হবার সৌভাগ্য করা। সন্ধ্যাহিক আজকাল লোকে ছেড়ে দিয়েছে—তার বদলে নিয়মিত চাঁপানের রেওয়াজ হয়েছে। সন্ধ্যাহিকে আর কিছু না হোক, নিয়মিত চাঁপায়ার পিপাসার মত একটা ধরদারীর পিপাসাও ভোঁ জাগানো যেত। ইঙ্গিরসংঘ করতে হলে হ'সিয়ার হতে হবে, আর হ'সিয়ার হতে হলে অন্ততঃ সন্ধ্যাহিক একবার নিজের দিন রাতের ধরদারী করতেই হবে। ক্রমে অভ্যাস পাকা হয়ে আসবে, তখন আর সারাক্ষণ পাহারা দিতে গেলেও ক্লান্তি আসবে না।

এর পর উপনিষদ বলছেন, মনটাকে যদি হ'সিয়ার রাখে চাও, তবে সর্জন্য তুচি থেকে। শৌচ দেহেরও প্রয়োজন, মনেরও প্রয়োজন। তুচিটা হচ্ছে একটা আর্ট, সত্যের প্রতি মননের প্রতি আন্তরিক প্রভা হতে তার জন্ম। যখন শিশুর মন নিত্যন্ত অপরিণত, বড় কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা মোটেই নাই, তখনও তাকে তুচিটার শিক্ষা দিয়ে চিত্তকে সজাগ করে তোলা যেতে পারে। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে শিশুশিক্ষার প্রধান ভিত্তি করে মহা মহারাজ বলছিলেন, গুরুগৃহে ছোট ছেলে আসলেই আচার্য্য আগে তাকে শৌচ শিক্ষা দেবেন—“শিক্ষয়েৎ শৌচমাদিতঃ।” অপরিণত চিত্তে নতুন সংক্রামণের এই হচ্ছে গভীর মনস্তত্ত্বমূলক আশ্রয় বিধান।

তুচিটা জিনিষটা বাইর থেকে শুরু হয়, কিন্তু তার নির্ণয় প্রভাব শেষকালে অন্তরকেও অনুপ্রাণিত করে তুলে দেয়। শৌচ শেষকালে এমন একটা প্রচণ্ড প্রতিবেশক হয়ে দাঁড়ায়, যে অজান্তেই অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ ঘটলেও দেহ হতে সবলে সে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। আসলে শৌচ হচ্ছে একটা বাছাই। ভাল মন্দ দুইটা জগতে আছে; তার মাঝে ভালটা তোমার বেছে নিতে হবে। কোনটাকে তুমি ভাল বলবে? যত্নমূলক শিক্ষা বা লক্ষ্যের অনুকূল। শৌচ তোমাকে এই ভাল জিনিষগুলো বেছে নিতে শেখায়। প্রথম বাছবিচারটা দেখাদেখি করতে হয়। কিন্তু শেষে যখন তা সংস্কারে পরিণত হয়, তখন অপবিত্র সংস্পর্শে দেহ মন আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে—তুচিটা তখন সজাগ প্রহরীর মত মনের নিরীক্ষা থেকে হাঁকতে থাকে—“ধরদারী।”

তদুপায়ে বাছশৌচেই দেহের পরমাণুগুলি উজ্জ্বল হয়ে যায়। মনকে তখন তার আপন থেকেই উপর পানে টেনে নেয়। মন সম্পূর্ণ হলে তার প্রকাশী স্বভাব বা সদা প্রত্যক্ষ সহজেই ফুটে উঠে। তখন সমন্বয় বা একাত্ম চিত্ত হওয়া কঠিন হয় না।

সৌভাগ্যক্রমে উপনিষদের উপদেশগুলি এই—অতুচি জিনিষ থেকে দূরে, দেখো না, ছুঁয়ো না, শুনো না; তবেই মন সজাগ থাকবে; লক্ষ্য স্থির থাকবে। ইঙ্গিরসংঘের এই পুণ্য



## দেহ-ধর্ম



“শরীরমাধ্যং ধনু ধর্মসাধনং”—যুব বাঁটা কথ্য। তবে দেখতে হবে, যেহে আসক্তি এসে না পড়ে। আসক্তিমাট্রেই অপবিত্রতা—তাতে দেহকে জড় করে, মনকে গুরু করে, ফলকে গর্হীত করে। দেহকে মিলেবেগ, সুস্থ এবং বহু রাখতে হলে আসক্তি দূর করা উচিত নাই। আসক্তিতে বড়ই চিত্ত পুঙ্খিল হবে, রোগ অসুস্থতা ততই পেয়ে যাবে। শতকরা ৯৯ জনের অসুস্থতা বোধের কারণ যে অসংযম বা আসক্তিপরতা, এতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ প্রায় রোগই আসন্ন। নিজেরা সৃষ্টি করি—একটু রাগ তেনে ধরলেই তার প্রতিকার আপনি হয়ে যায়।

একবার প্রয়োজন যদি সংযমদ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে, তবেই দেহের সম্বন্ধে স্বাধীনতা আসন্ন হইবে। এর পর মনকে যে দিককেই পরিচালিত করি, সেদিকেই সে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারবে। এ হতেই ক্রমশঃ আশ্রয় সন্ধান হইবে।

ঠিক কতটুকু ভোগ্য হলে দেহের কাছ হইতে, অপ্রেমোজনের বন্ধনভঙ্গর কল্পনাই বর্জন করলে তবে নিজের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ধর্মসাধন সম্বন্ধে স্বাধীনতা, ইত্যাদি বিচারের জিনিষ হইবে। এর মূল আশ্রয় ফল্যে। ভগবানের কক্ষ তার বা সংঘে তারই চিত্ত অসুখের থাকে, তার ফলে ধর্মসাধনের প্রতিকৃতি বা স্বভাব অধিকারের উপর ভগবানের অপরাধ রূপ নিরত অধিকৃত থাকে। লক্ষ্য হইলে মন যদি না চ্যুত

হয়, তবে কখনো অসংযম তাকে পীড়িত কর্তব্য আসে না।

তার উপর নির্ভর চাই, স্বভাবের উপর অক্ষা চাই। এর পর নিজের দেহে ও অপ-রের দেহে সমদৃষ্টি। যিনি জ্ঞানবান, পনের জ্ঞান তার স্বভাবানি মমতা, তার বেশী মমতা নিজের দেহের উপর জ্ঞান প্রয়োজন হয় না। এইটাই অসংযম ভুলে যাই বলেই নিজের উপর আসক্তি হই, নিজের সম্বন্ধে পক্ষপাত করি। আসক্তিপরতায় নিজকে এত প্রকলভাবে বুঝে যে, ভুল বুঝে—স্বার্থ স্বার্থ কি, তা সে জানেই না। ঠিক ঠিক স্বার্থটা যদি মাহুত বজায় রাখতে পারত তবে তার উন্নতিই হত; দেহের স্বার্থ, মনের স্বার্থের মায়ার পড়েই তো সে ভুলিয়ে যায়।

নিঃস্বার্থ হয়ে নিজের সম্বন্ধে তাব। স্বা করবার, স্বভাবেই চরাচ্ছে। তবে তার মাঝেও মোহের প্রভাবকে নির্জিত করে নিজকে জানে যে আনন্দলাভ, এটুকু অসুখের করবার শক্তিই মাহুতের বিশেষত্ব।

শরীর যেখানে স্বভাবতঃ উদ্বিগ্ন হইবে, সেখানকার কথা আলাদা—সে রোগ হইবে তার আশ্রয়। কিন্তু যে উদ্বিগ্ন নিজে সৃষ্টি করেছি, সেছাড়া অসংযমকে প্রেরণ দিয়ে যে অসুস্থতার আশ্রয় দৃষ্ট করেছি, সে রকম উদ্বিগ্ন হতে দেহকে মুক্ত করা ধর্মসাধনেরই একটা অঙ্গ। দেহাশ্রয়িতা হলে, যে বন্ধন,

তা হতে মুক্ত না হলে চিত্ত কখনো প্রশান্ত হয় না।

মোট কথা, জ্ঞান থাকতে অজ্ঞানীর অস্তিত্ব করে অতিমানকে নিজের রাজা করে বসে না। আয়ত্তি, প্রলোভন, এতলো সামনে এলেও পা ছেড়ে দিবে চলা নির্ভরের লক্ষণ নয়। যথার্থ নির্ভর এলে কুপ্রবৃত্তি কাছে বেসেতেই পারে না। যদি না বুঝে না শুনে নিজকে ছেড়ে দেওয়ার নামই নির্ভর হত, তবে আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজন ছিল কি? আমি বলতে যেখানে সর্বাঙ্গ দেহ-মন, যেখানে অসংযম-আসক্তির সর্বাঙ্গতার সঙ্গে, তাকে মুক্ত করলে কেউ কারো সঙ্গে মিশবে না তো—তাতে বোঝা-ই বাড়াবে শুধু। দৃষ্টই বাড়াবে।

যথার্থ মিলন সেইখানেই, যেখানে পরস্পরের স্বাধীনতা অব্যাহত—কেউ কারো দ্বারা অভিভূত নয়। আসক্তির সঙ্গে দেহের যে মিলন, তাতে তো দেহের স্বাধীনতা থাকে না—দেহ সেখানে জড়ীভূত, মন অভিভূত, আত্মার তো সন্ধানই নাই। এমন লোক খুব কমই আছে, প্রত্যেক কণ্ঠেই নিজকে যে জড়ীকরণে রাখতে পারে। অব্যর্থ মিলনের আশাই মোড়—তা-ই বন্ধন। দেহকে প্রবৃত্তির চাতে ছেড়ে দিবে যেছায়, কেউ বিশেষ নিও না। প্রবৃত্তি তোমাকে চির-আশ্রয় দিতে

পারবে না, তোমার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য মিলন ঘটবে না। একদিন না একদিন বগড়াবিবাদ ছাড়াহাড়ি হবেই। তবে কেন এমন অশিক্ষিত আশ্রয়ের তরসা করা—অবিশ্বস্ত বন্ধুর আশ্রয় চাওরা? এ বন্ধু যে বন্ধনেরই কারণ। বন্ধনই তো জালা।

বাঁক্যের উচ্চাসকে বর্জন করে যেমন যথার্থ সত্যটুকুকে গ্রহণ করতে হয়, তেমনি আত্মব্রত বর্জন করে যথার্থ প্রয়োজনজ্ঞানে পরিমিত বিষয় ভোগ করতে হয়। সত্য গ্রহণে চিত্তের যেমন বোঝা বাড়ে না, প্রয়োজনমাত্রার বিষয়গ্রহণেও দেহ তেমনি সুস্থ-বল ও লঘু থাকে।

মাত্রাজ্ঞানহীন অবতর অসংযত ব্যাধি, তারাই উচ্ছ্বল হয়ে শক্তির অধিক আত্মব্রত করে, প্রয়োজনের অধিক সংযোজন করে—যে শক্তি অমৃত-রসায়ন, অজীর্ণদোষে তাকেই বিষরূপে বিসর্পিত করে—মেহে, মলে, বাঁক্যে এবং কলে ক্রমশঃ সমাজে ও লগতে।

জীবনের যথার্থ সুখের সংযমের ছন্দেই আত্মব্রত বহাগুণীদের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়ে এসেছে। তাঁদের বিখ্যাত কর, তাঁদের অমুগামী হও—অশরূপ তান-প্রভার অন্তর আলোকিত হবে, ভোগের আসক্তি ত্যাগের মহাশক্তিও পূর্ণাবলি হইবে।





## দিও নির্দেশ

ইচ্ছার সবলতা নির্দিষ্ট মূল, এ কথা সবাই জানি। কিন্তু ইচ্ছা কেন সাল হ্রস্বল হয়, ভাঙার নিদান জানি না বলিয়াই আমরা দুঃখ পাই। সাধারণতঃ একটা বিশ্বাস আছে, ইচ্ছা কঠোরের একটা নিগূঢ় শক্তি, কোথা হইতে জ্বলিলে, কোথায় যায়, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। এই জন্ত ইচ্ছার খামখেয়ালীতে আমাদের সব গুণ হইতে বসিয়াছে দেখিয়াও তাহাকে নিরস্ত্রিত করিবার মত উৎসাহ আমরা অনুভব করি না। ইচ্ছার সঙ্গে প্রায়ই কচির মোগ থাকে। ভাল কাজে প্রবৃত্তি লওয়াইয়াও দেখা যায়, মাত্র কতকগুলি পরে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন ? জবাব পাইবে—ইচ্ছা করিতেছে না। কেন ইচ্ছা করিতেছে না ?—না, ভাল লাগিতেছে না। এই ভাল লাগা না লাগার খামখেয়ালীতে কত তরুণ প্রাণের শক্তির যে ক্ষয় হয় অপচর নিত্য হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ বেচারীদের ইহাতে সোয়াস্তিও নাই।

খামখেয়ালীর একটা নিদান অতি সূত্রে আছে। বোধ হয় আমরা অনেকেই সেটা খেলাই করি না। হ্রস্বল মস্তিষ্ক হ্রস্বল ইচ্ছার মস্তিষ্ক ও পরিণেবিক, ইহা প্রব সত্য। ইঞ্জিন-সংযমের অভাবে এবং আহারশুদ্ধির ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক হ্রস্বল হইয়া পড়ে—অস্বাভাবিক অবস্থায় আসে, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়। আহারশুদ্ধি কতকটা আমাদের হাতে, এমন

কথা মনে করিলেও করিতে পারি; কিন্তু ইঞ্জিনসংযম বলিতে অনেকখানি গোঝার, ইহার যে কোন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া কোন দিকে নিয়া শেষ করিতে হইবে, তাহা সকলে বুঝি উঠিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ছেলৈমহলে এই বিষয়ে অপ্রতিপত্তির ভাবটা আমরা খুবই প্রবল দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

ইঞ্জিনকে বাগ মানাইবার পূর্বে কৰ্ম শুদ্ধাইয়া দেওয়া দরকার। কৰ্ম শুধু শুছানো নয়, কৰ্ম জোটানোও প্রয়োজন। ছেলৈদের মাঝে লক্ষ্য করিয়াছি, অধিকাংশেরই কাজ নিত্যন্ত ছাড়া। ছেলেরা পড়ার বেলী সমর খাটাইতে পারিবে, এই ভরসার তাদের প্রচুর অবকাশ দেওয়া হয়। কিন্তু সে অবকাশের কোনও সুদ্রব্যযোগ হয় কি না, তাহা কেহ আসিয়া দেখে না। আর দেখিবেনি বা কে ? নিজের ভাল মন্দ এখন নিজকেই সকলের বুঝিয়া নিতে হইবে, নতুবা আর উপায় নাই। যাক সে কথা। প্রথমতঃ বলিতেছিলাম, কৰ্ম জোটানো চাই। সমস্তটা দিন কৰ্মে নিরেট ভরাট চাই। শুধু লেখা পড়া নয়; একটু সেবার সুযোগ থাকিলেও খুব উপকার হয়। পরের জন্ত খাটার মত ইঞ্জিনসংযমের অমূলক উপায় বোধ হয় আর ইচ্ছা নাই। আলাকালকার বিভ্রান্তির সেবাচর্চার ব্যবস্থা খুবই কম। তাহা হইলেও বাহাদের সং হইবার ইচ্ছা

## আরণ্যক



“যজ্ঞেন বাচঃ পদবায়মায়ান্ তানমবিনন্দন ঋষিষু প্রবিত্তান্ ॥”

—ঋগ্বেদ সংহিতা—৩২৮

কৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করতেন, রাখালদের মনে হত এই বুঝি গো বৎস নিয়ে মাঠে বাও-  
রার সময় হল, গোপীদের মনে হত প্রাণ  
প্রিয়তম বুঝি আমাদের কথা অবগত করছে;  
আব নারদাদি ব্রহ্মর্ষিরা শুনতেন প্রাণবাস  
নাদধ্বনি। একই বাঁশী বস্ব এক এক জনার  
কাণে এক এক রূপে বেজেছে। ভগবান্  
উচ্চেন সবাইকে—কিন্তু শোনাও শুনে  
কেউ না দু’দিন আগে যাচ্ছে, আর কেউ বা  
দু’দিন পাচ্ছে। যার যেমন ভাব তাই ভেমন  
লাভ। এতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছুই  
নেই। “যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাং তত্বেন  
ভজাম্যহম্।

✽

প্রলোভনের মাঝে থেকেও যিনি প্রলুব্ধ  
নন, তিনিই বীর সাধক। তাই রাধাধি-  
জনক সাধকাগ্রগণ্য। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই  
করে কিছুতেই টিকে, উঠতে পারব না, এ  
তরে কপিত হরে যারা সংসার ত্যাগ করে  
ভীষ্ম, কাপুরুষ তারা। তাদের উপর ইন্দ্রি-  
য়ের আধিপত্য আরও বেশী। তাদের বল  
অমলেও শাস্তি নাই, বাতীঘরেও নাই। হর্ষ-  
লতা কাকে কুঁচিকার করে? অবিদ্যাসীর  
হর্ষল চিত্তকে। বিদ্যাস বত দৃঢ় হবে, হর্ষলতা

আগনি খসে পড়বে। কল হলে ফুল আগনি  
ঝরে পড়ে।

✽

নিজের শক্তিতে চলতে গেছেই বিপন্ন।  
তোমার শক্তি যে পণ্ড। অংশ কি কখন  
পূর্ণের চালে সমান চলতে পারে? আমি কছি,  
আমি করব এ হল অভিমানে কথ। আমি  
যদি তুমি বরী, আমি বিঘর তুমি বিঘরী, এ ভাব  
হলেই জানবে আত্মসমর্পণ, সম্মান প্রতিষ্ঠিত  
হয়েছে। তখন তুমিই করণ হয়ে গায়ে—  
“তোমার ইচ্ছা হউক হে পূর্ণ, আমার জীবন  
মাঝে।”

✽

চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবান্ আগনি ধরা  
দেবেন। তাই উত্তম অধিকারী ভগবানকে  
চাই; এই তোমার চরণে যেন সজ্জি থাকে  
এ সব কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁরা  
আগেই চিত্তটাকে মেলে ঘষে ঠিক করে রেখে  
দেন। ধূলিপড়া দিলে সাপ যেখানেই ঝুঁকুক,  
ছুটে আসবেই পালবে। চিত্তশুদ্ধিটাও হচ্ছে  
ভগবানের ধূলিপড়া। ভগবান্ তো তোমার  
মাঝেই রয়েছেন, শুধু আসনা, কামপ্রাণলো-  
দয় কদম দাও—অমনি তাঁর দর্শন পেয়ে মুগ্ধ  
হয়ে যাবে। এই হল সোজা সরল পথ, মাহাত্ম্য  
চলে কিন্তু এর উপরে।



## নিবেদন

সামবল্লীয়া সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ মহাসদেব আগামী শারদীয় পূজার অবকাশে তাঁহার জন্মভূমি পরিদর্শন লক্ষ্যে নদায়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিসনের অন্তঃপাতী কুতুবপুর গ্রামে পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহার বহু শিষ্যভক্ত এই শুভ সুযোগে শ্রী শ্রী গুরুদেবের জন্ম মহাপীঠ দর্শন করিতে তাঁহার অনুগামী হইবেন—এই মর্মে একটি প্রস্তাব ত ভক্তসম্মিলনীতে গৃহীত হয়। শ্রী শ্রী গুরুদেবের ভক্তসহ জন্মভূমি দর্শন যিটী চিরস্মরণীয় করিতে এবং তাঁহার বিরাট উদ্দেশ্যের আংশিক সফলতার তাঁহারই শুভ নির্দেশের অনুসরণ করিয়া ভক্তসমুদায় এই উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মভূমিতে একটি আশ্রম ও তৎসহ “ঋষি-বিদ্যালয়” স্থাপন করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের উপযোগী এক খণ্ড জমী বরাদ্দ করার আয়োজন হইতেছে এবং শ্রী শ্রী গুরুদেবের পিতৃপিতামহের ভিটায় একটি কামন্দির তুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রাপ্ত স্থানা বর উঠানও প্রয়োজন হইবে। এই সমস্ত কার্য নির্বাহের জন্য বহু ধর্ম প্রয়োজন হইবে। শ্রী শ্রী গুরুমহারাজের জন্মভূমি তদীয় শিষ্যবর্গের চিহ্ন সর্ববর্তীভাৱে সারস্বরূপ; এই পুণ্য ভূমিতে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল সমস্ত দেখিতে পাওয়া আগাদের মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক, ইহা বলাই বাহুল্য। যারা বিশ্বাস করি, শ্রী শ্রী গুরুমহারাজের অনুরাগী শিষ্যভক্ত মাত্রই এই শুভ উদ্দেশ্যের সকলতা কল্পে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাধ্য করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্পই হউক না কেন, তা দিতে কেহ কোনও সঙ্কোচ করিবেন না; মনে রাখিবেন—

“তু নৈশ্চ ন ব্রহ্মাপটৈর্নৈব ব্রহ্ম্যন্তে অন্তদন্তিনঃ।”

শ্রী শ্রী গুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পদ্যর্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্তিক দইতে কার্তিক পঞ্চম্ভ একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে লোক ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র সম্ভব তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্বাহকজনকে ৫ নম্বলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, সূত্রাং

আছে, তাহার। নিজের। দল বাধিয়া একটা সেঞ্চুরি পত্তন করিতে পারে বই কি! নিজের সমস্ত কাজ কর্ম নিজের হাতে করিবার চেহারাতেও কিছু কাজ জেটে। এতেও যদি দিন ভরাট না হয়, বাকীটুকু অগত্যা বিছাচুর্কা দিয়াই পুরিয়া নিতে হইবে। মোট কথা, কর্ম বাবা দিনটা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইচ্ছাতে কুচুর্কা, কুচিন্তার অবসর কম হইবে, সমস্ত দিনের খাটুণীতে শ্রান্ত হইয়া রাত্রে বিশ্রামটাও উপভোগ্য হইবে, কুংসিং উত্তেজনার হাত হইতেও রক্ষা পাইবে।

দিনটা যদি কর্মে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পার, তার পর তোমার চিন্তা হইবে, কি করিয়া কর্মগুলি গুছাইয়া নেওয়া যায়। এখনে ছুটি পথ আছে। কেউ কেউ কড়াকড়ি কটীনের পক্ষপাতী, কেউ কেউ আবার বেশারোয়াভানে চলিতেই ভালবাসে। আমরা দুটির একটাও পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে করি না। ইংরেজী কেতাবে সময়সূচিকার নানারকম আশ্চর্য্য উদাহরণ পাওয়া যায়; ছেলেবেলায় সেগুলো পড়িয়া অনেক ছেলের অধিকরণ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঘড়ির কাঁটার কাঁটার চলা মন্দ বলিতেছি না। কিন্তু নানা কারণে তাহা সর্ব্বাংশে সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদের দেশে সবাই ঘড়ি ধরিয়া চলে না; সুতরাং অপরের সহযোগ ব্যতীত সময়সূচিকা সব সময় সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনে কর্মই একমাত্র লক্ষ্য নয়; ইংরাজ কর্মের লাগাম মুখে করিয়া ছুটিতে মরিতে চায়; আমরা একটু আরোম করিয়া ছুটি নিয়া মরিতে চাই। সে দেশের প্রকৃতি বারোমাস এক রকম ঘোমটা টানিয়াই থাকে, সুতরাং ঘড়ি ধরা

ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের সে বস্তু নাই। হিন্দুর এক রকম সময়সূচিকা আছে সেটা প্রকৃতির অনুসরণে। ভোরবেলায় যখন স্নান হইয়া আসিল, দুপুর বেলায় যখন মাগার উপর আসিল, সন্ধ্যায় যখন তিনটি তারা ফুটিয়া উঠিল—এইগুলো হিন্দুর সময়ের হিসাব। বিশ্বপ্রকৃতিই কাছে বড়ি। আমাদের কাছে কিন্তু রকমই ভাল লাগে। এতে ছুটকটানি হয়, একটু এদিক ওদিক হওয়ার দরুণ বর্ধক উদ্ভ্রান্ত হইতে হয় না, সময়ের তার ক'লের উপর জ্বরদস্তি করিয়া তাহার বস্তু বিবাদ করিয়া তুলিতে হয় না। একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যায়—সময় ছেলেছে ছুটি প'রোয়া আন দশটা ইন্সানের ভাত রাঁদিয়া দেওয়া—এই দুই মাঝে মাঝে ছেলের উভয়ের তৃপ্তি কোন বেশী, তা বোধ হয় বলিয়া নিতে হইবে।

তবে ছুটি রীতিই মিলাইয়া নেওয়া পারে। দিনমানের কতকগুলি ছেদকে সঙ্গে মিলাইয়া রাখ, আর তার ফাঁক আলগা রাখ, অর্থাৎ সমস্তটা দিন কর্ম ভরাট করিয়া দাও। আমাদের বোধ এই ব্যবস্থাই কাশোপযোগী ও সহজ হইবে।

কর্মের অনাসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করার বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব আছে। খলি, সেগুলো আপাততঃ হোণা যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজেও কর্মে বালাই নাই, সেখানে আসক্তি অনাসক্তি বাজে। অল্পচিন্তায় যে কেউ খাটে না কথা বলিতেছি না; খাটে সকলেই

খাটার সত খাটে না, খাটার সীতি জানিয়া খাটে না। বিশেষতঃ যে সময়টার খাটুনি শিখিতে হয়, সেই সময়টাতেই কেউ পাট না। যাগাণ শিকারী, আমরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি— শিকার ও অভিভাবকেরাও শিকার এই দিকটা চাহিয়া দেখিবেন। ভাল হইবার ইচ্ছা অনেকের আছে, কিন্তু তাহারা পারিতেছে না কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছেলেরা অভি-  
 যাজ্ঞ নিষ্কর্মা থাকে বলিয়াই অসংসদেয় প্রভাব, বাহাদের আন্তরিক ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উত্তরার সুযোগ পায় না। অনেক ছেলে উপদেশ চাহিয়া চিঠি লেখে। আমরা অনেক উপদেশই ছাপার হরফে বাহির হইয়া গিয়াছে—সেগুলি যে তাহারা জানে না, তাহা নয়। তবে কিনা উপদেশ পালন করি-  
 বার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কেন সে ক্ষমতা নাই, সেই কথাটাই তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি, সকল উপদেশের দেরা উপদেশ—সেবা কর—কর্ম কর। প্রাচীন গুরুগৃহে এই উপদেশ স্তম্ভমান ছিল; শিক্ষিত তাই সকল হইত, মেধা সহিত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির সুরণ দেখা বাইত। আজ কালকার শোক বোধ হয় এদিকে এখন একটু রক্ষা দিতে শুরু করিয়াছে। Boy-Scout Movement আরম্ভ হইয়াছে—ইহাও উপকারিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাতার শতমুখ, য়াটে ছেলেরা নাকি ইহাতে ত্রি ফিরিয়া যায়। কিন্তু এর মূলেও সেই একই কথা— সেবা বর্জিত। নিম্নের হউক, পরের হউক, শাকার হউক, ক্রিফার হউক, এখন কর্ম চাই। দিনস্তর খ টিয়া বাও, ভাল হইবাব পথ আপ-  
 নিষ্ট দেখিতে পাইবে, ইচ্ছার দৃঢ়তা আপনি আসিবে।

আর একটি কথা ছিল, আহার শুদ্ধ। এ সম্বন্ধে আজকাল মাঝে মাঝে আলোচনা দেখিতে পাই। কাজ আর খাওয়া—দুটি ঠিক ঠিক হওয়া চাই, মতুবা শক্তি রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। রেগুটিমারে সকল দেশ এক করিয়া দিয়াছে, সকলের খাওয়াও এক-  
 কার করিয়া দিয়াছে। আগুগুটা না হয় ভালই মানিলাম, কিন্তু শেষেরটাকেও ভাল বলিব কিনা সন্দেহ। বাজালী যখন ঘরের খাতিত ঘরের পরিত, তখন গোধকরি এমন বীর্ঘহীন ছিল না। আজ যখন ঘরের বাহির হইতে হইবে তখন আর উপায় কি? আহারে ব্যাভিচার তো ঘটিবেই। কিন্তু সেই জন্যই বলি, হুঁসি-  
 যার হওয়া আরও প্রয়োজন।

এখনও এমন দুচারটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখা যায়, বাহারা ব্রাহ্মণও অজ্ঞাতকুলশীল হইলে তাহার হাতে খান না, কিবা গৃহে তাঁহারা স্থপাকে আহার করেন। ঘরের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, ছাত্রদিগের পক্ষে বাচিবে অন্ততঃ এই আদর্শ পালন করিয়া চলা উচিত। সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইবে না জানি। সকলকে উদ্দেশ করিয়াও আমা-  
 দের এই দেখা নয়। বাহারা নানা অত্যা-  
 চাবে-অনাচারে বীর্ঘহীন হইয়া পড়িয়াছে, ঐকীকারেব কেনিও পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, বাকে আড়ম্বর আর অনর্থোক্তিক ঔষধের নিস্তাপন খোঁজা ছাড়িয়া তাহারা এই গোড়ার কথাটা একবার আঁকড়িয়া ধরুক দেখি। আহারশুদ্ধিতে বীর্ঘরক্ষা হয়—ইহা বেদের কথা। যদি আহার শুদ্ধ করিবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে নিজের বোঁগাড় নিজে-হাতে করাই ভাল। অবশ্য আনিব বর্জন করিতে হইবে। আমাদের পবিত্রতাই তাহার প্রধান পুষ্টিকরী শক্তি। ভুক্তভোগী ছাড়া অপরকে এ কথা বুঝাইবার সাধ্য নাই।

শ্রীহরপদ সাধুবাঁ এ  
 শ্রীমানকীর্তন চক্রবর্তী হাওড়া  
 শ্রীগোপীনাথ স্বতন্ত্ররূপ চট্টগ্রাম  
 শ্রীস্বচরণ দাস ধুবড়ী  
 শ্রীমহেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বীপ  
 শ্রীস্বামোহন দাস এ  
 শ্রীযোগেশ্বর গাঙ্গুলী ভাড়া  
 শ্রীধর্মদীপক মতিতি মেদিনীপুর  
 শ্রীকানীপদ দাস নাটনা (২য় বার)  
 শ্রীকানাইলাল কুণ্ড নবদ্বীপ  
 শ্রীগরিজাবন্দ্য কর  
 শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস  
 শ্রীসিকচন্দ্র কর্মকার সম্বীপ  
 শ্রীমতী সুষমাশোভা দেবী এ  
 শ্রীমতী বিজয়সানি গুহ এ  
 শ্রীমতী কিরণবালা দেবী এ  
 শ্রীমতী হেমঙ্গিনী দেবী এ  
 শ্রীশশধর চক্রবর্তী কুচবিহার  
 শ্রীমতী প্রফুল্লালা দাসী  
 শ্রীমতী চরসুন্দরী দাসী  
 শ্রীমতী চারুবালা নন্দী সম্বীপ  
 শ্রীমতী সরোজিনী কর এ  
 শ্রীমতী মনোমোহিনী ঘোষ এ  
 শ্রীমতী নিরুপমা দেবী এ  
 শ্রীমতী নিজরা দাসী এ  
 শ্রীমতী কাকুনপ্রভা গুহ এ  
 শ্রীমতী শৈবলিনী দত্ত এ  
 শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী নাগ এ  
 শ্রীমতী মনোরমা দাসী এ  
 শ্রীমতী কুম্মমকামিনী দেবী এ  
 শ্রীমতী মনোহরা দাসী এ  
 শ্রীমতী সুষমতিবালা দাস এ  
 শ্রীচন্দ্রমোহন দাস এ  
 শ্রীপ্রসন্নকুমার বল এ  
 শ্রীক্ষেত্রমোহন কর্মকার এ  
 শ্রীকিশোরীমোহন কর্মকার এ  
 শ্রীকুম্মমোহন দাস এ  
 শ্রীকৃষ্ণাকান্ত সুখোপাধ্যায় এ

শ্রীনিপিনবিহারী কর এ ১৫  
 শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী ৫০  
 সম্বীপ পুচরা সংগৃহীত ১৫৫০/০  
 (ক্রমশঃ)  
 সান্নিধ্যত-মতে  
 জমিদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ২৫  
 জমিদার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী ১০০  
 শ্রীযুক্ত শংকরচন্দ্র সেন বোকাখাতা...মানিকগর  
 বিজয়ীরাঙ্গ অভয়াপুরী কোট অব ওয়ার্ডস্ ১০০  
 শ্রীযুক্ত ইমানাথ দে ৭  
 মোরাটারী ভদ্রেশ্বর দাসের পাড়া ৭  
 চাপরবাড়ার ও ভকতপাড়ার সংগৃহীত ৬০  
 শ্রীযুক্ত শঙ্করাম সিংহ ৬/০  
 চাইটানতল গ্রামবাসী ৫  
 শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস ৫  
 শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র রায় তালুকদার ৫  
 শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস ৫  
 রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বক্রা ৫  
 "গজেন্দ্রন রায় দাস-দিঃ ৫  
 মোরাটারী গ্রাম ঘেড়াবান্দা পাড়া ৪০/০  
 শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার তালুকদার ৪  
 "তিনকড়ি দাস ৪  
 "উপেন্দ্রচন্দ্র দাস ৪  
 "মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪  
 "অনিন্দ দাস ৩  
 "বসন্তকুমার সিংহ ৩  
 আড়িয়ার ঝাড়িবালা গ্রামবাসী ৩  
 আনোয়ারাডা তলসরাপাড়া ৩  
 শ্রীযুক্ত ধর্মেশ্বর দাস ৩  
 অতুলেশ্বর দাস ও গুপ্ত চাপড়বাড়ার ২১  
 "ভাদুরাম সিংহ ভকতপাড়া, ২১  
 "প্রভাচাম দাস আড়িয়ারঝাড়, ২১  
 বোকাটিকর গ্রাম, ২১  
 শ্রীজ্ঞানচরণ সরকার মৌরাটারীপাড়া, ২১  
 পুচরা সংগৃহীত ২১  
 শ্রীকপটদাস দাস সত্যপুর, ২১  
 "রমণীকান্ত দাস সত্যপুর, ২১  
 "স্বর্নানারায়ণ মেধুর বহলপুর, ২১  
 "সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব বহলপুর ২১



১২শ উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থান, ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার  
 ক্ষণ পূর্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হওয়া প্রয়োজন।

কুতুবপুরে যে আশ্রম ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইবে, তাহার সাহায্যার্থ যিনি  
 দান দিতে চাহেন, তাহাও উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

### কুতুবপুর আশ্রমে যাতায়াত পথের বিবরণ—

গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল  
 পথ মেহেরপুর যাইবে। মোটর ভাড়া জন প্রতি ১ এক টাকা, ১ ঘণ্টা  
 মধ্যে যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে,  
 নোকাতে ২ ঘণ্টা, কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌছা যায়; মোটর ভাড়া জন  
 প্রতি ১০ আট আনা।

প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌছিবার সময় নিম্নে লিখা  
 হইল।

শিলিগুড়ী প্যাসেঞ্জার ও আসাম মেল	...	...	প্রাতে ৯—৫৮ মিনিট
চট্টগ্রাম মেল	...	...	বৈকালে ৩—৪১ মিনিট
ঢাকা মেল	...	...	রাত্রি ১—৪৯ মিনিট
দার্জিলিং মেল	...	...	রাত্রি ২—৪৩ মিনিট
সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	...	...	রাত্রি ৩—৫ মিনিট
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	...	...	ভোর ৫—৫০ মিনিট

( কার্তিক মাসে সময়ের সামান্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব )

দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্তগণ কলিকাতা হালিসহর নৈহাটি ও রাণাবাট  
 ক্ষুভতি স্টেশন হইতে অনেক ট্রেনেই চুয়াডাঙ্গা পৌছিতে পারিবেন। প্রধান  
 প্রধান ট্রেনের সঙ্গে মোটর সার্ভিসের যোগ আছে।

### চিঠি লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল, সবজঙ্গ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া  
 ( অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি )





## সংবাদ ও মন্তব্য

—:[:#]:—

আগামী ৬ই তারিখ সোমবার স্থলপূর্ণিমা তিথিতে আসামবঙ্গীর সাবংগ মঠাধিষ্ঠাতা পূজাপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। “অমরা” সাধু, ভক্ত ও আর্ধ্যদর্পণের গ্রাহক, অমুগ্রাহক পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করিতে সাধরে আহ্বান করিতেছি।

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্তমানে কলিকাতা অকলে ভ্রমণে আছেন। শীঘ্রই তাঁহার পুরীধামে প্রত্যাবর্তন কবিবার কথা।

এসংক্রান্ত গোলযোগে বর্তমান মাসের পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। আগামী মাসের পত্রিকা যথানিয়মেই প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ রাখিবেন, আর্ধ্যদর্পণ প্রতি মাসের তৃতীয়া সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা পৌঁছিবার কথা। সুতরাং মাসের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা যোগাযোগ করিয়া আনিব।



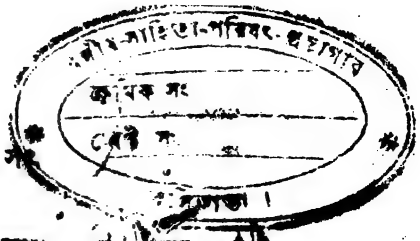
## দানপ্রাপ্তি

শ্রীমদীশ্বর-কুতুবপুর-আশ্রম  
স্থাপনোপলক্ষে

(পূর্ণাহুতি)

শ্রীগজানন্দ সাহা কালনা	১০০
শ্রীগুরু-বাহন রায় চৌধুরী দিনাজপুর	২০
শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোপুর	২০
শ্রীভবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুচবিহার	১০
বগুড়া আশ্রমের সৈবকবল	১০
শ্রীনারায়ণদাস নন্দী শিলং	১০
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় রাঙ্গুণী	১০
শ্রীহেমচন্দ্র দাস ২য় দফা আবুতলাপ	১০
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গুৱাহাটী ২য় দফা	১০

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দে কালীমাজার	১০
শ্রীকুতুবপুর দত্ত শ্রীশ্রী	১০
শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তামলুক	১০
শ্রীচৌধুরী সরকার নবাবীপ	১০
শ্রীশ্রীনাথ বসু বারদী ঢাকা	১০
শ্রীমুগ্ধনাথ চৌধুরী মেদিনীপুর	১০
শ্রীপ্রাণেশ্বর নাহিড়ী তাড়াস	১০
শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী তাড়াস	১০
শ্রীকালীনাথ দত্ত বগুড়া	১০
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাস বৈষ্ণব কালীমাজার	১০
শ্রীহেমচন্দ্র দাস	১০
শ্রীগণেশ্বর সরকার	১০
শ্রীভাণ্ডার দাস কলিকাতা	১০



উত্তম

# আমি-দেবতা

১৯শ বর্ষ	ভাদ্র	প্রথম অঙ্ক
সমষ্টি সং ১৯৭		

ইন্দ্রায়

[ ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।১ ]

ॐ

[ বিশ্বামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টপ্ ছন্দঃ ]

সহদানুং পুরুষত ক্ষিয়ন্তঃ  
অহন্তমিস্র সহ পিণক কুণারুং ।  
অভি স্বত্রং বর্জমানং পিত্বারুশ্ব  
অপাদমিস্র তবস্৷ জঘন্ত ॥

জননীয়ে নিয়্যে যবে আসে স্বত্র করি আফালন,  
ছেদি বাহু, চূর্ণি কায়, স্তব্ধ তার কর গরজন।  
স্পর্ধা তার বায়ে নিতি, হিংসা করি নাই মিটে আশ,  
পঙ্গু করি ইন্দ্র তারে বীর্যবলে করহে বিনাশ।

নি সামান্যমিষিরামিষ্ম ভূমিঃ  
মহীমপান্নাঃ সদনে সসম্ম।  
অন্তর্ভাদ্যাঃ স্বশতো, অন্তরীক্ষম্  
অর্ষস্বাপস্বরেহ প্রসূতাঃ ॥

এই ভূমি সুবিশাল ছিল যাহা সুবম চঞ্চল,  
সীমাহীন তারে তুমি যথার্থই করেছ অটল।  
স্তব্ধ করি দ্যুলোকে অস্তরীক্ষে করিয়াছ স্থির,  
তোমার প্রেরণা বশে হে বৃষভ, বহে হেথা নীর।

অমাত্যগো বল ইন্দ্ৰ ব্রজো গোঃ  
পুরা হস্তোভয়মানো ব্যার।  
সুগান্ পথো অকুণোন্নিরজে গাঃ  
প্রাবন্ বানীঃ পুরুহতঃ ধমন্তীঃ ॥

বড় হিংস্র বলাসুর, জলরাশি ছিল আবরিয়া—  
তুমি ছিলে শাস্তা তার, তাই ভয়ে গিয়েছে সরিয়া।  
করেছ সুগম পথ, বহি যায় সলিলের ধারা  
পিয়ালী ধরার বৃকে কলকলি—পেয়ে তার সাড়া।

একো দ্বৈ বসুমতী সমীচীঃ  
ইন্দ্ৰ ক্সা পপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্।  
উতান্তরীক্ষাদতি নঃ সমীক  
ইমো ব্রথো সমুজঃ শূর বাজান্ ॥

দ্যুলোক-ভুলোক দুই বন্ধু তারা, ধরে কত ধন,  
একা ইন্দ্ৰ আছ তুমি তাহাদের করি আপূরণ।  
অন্তরীক্ষ হতে নামি একবার এস মর্ত্যপুর—  
দিব্যরথে দিব্য হয় নিয়োজিয়া ওহে মহাশূর।

দিশঃ সূর্যো ন মিনাতি প্রদীপ্তা  
 দিবে দিবে হর্ষাশ্বপ্রসূতাঃ ।  
 সৎ শদানভবন আদিত্যৈ  
 বিমোচনং কুণ্ডে তত্ত্বস্য ॥

যে পথ দিয়াছ আঁকি নিজ হাতে, হে হরিবাহন,  
 সেই পথে চলে নিতি, ছাড়ি তারে যায় না'তপন ;  
 কিরণ-তুরঙ্গ তার ছায় ব্যোম অসীম-বিখ্যার,  
 সংহরে যে রশ্মিজাল—জানি দেব, মহিমা তোমার ॥

দিদৃক্ষন্ত উষসো শাননন্তেনা  
 বিবস্বত্যা মাহি চিত্রমনীকম ।  
 বিশ্বে জানন্তি মহিনা শদাগাদ্  
 ইন্দ্রস্য কৰ্ম সুরতা পুঞ্জনি ॥

বিশ্ব রহে পথ চাহি—আলোকের পরি চিত্র ভূষা,  
 নিশার সম্পূট ভেদি—হের ওই আসে বুঝি উষা ।  
 জানি যবে তারপর প্রকাশিল উষার মহিমা,  
 তোমারি স্মৃতি সে যে, কেবা তার দিতে পারে সীমা ।

মহি জ্যোতির্নিহিতং বক্ষণাসু  
 আমা পক্ষং চরতি বিজ্রতী গোঃ ।  
 বিশ্বং স্রাজ্য সমুত্তমুপ্রিস্রাস্রাৎ  
 সৎ সীমিত্তে অদদাঃস্তোজনাস্র ॥

বহি যায় নদী যত, মহাজ্যোতিঃ ধরে গর্ভে তাঁরা—  
 তরুণী ধেমুর মত চরি করে, স্তনে ক্ষীরধারা ।  
 বিশ্বে যাহা স্বাদুতম তারি মাঝে রয়েছে সঞ্চিত,  
 দিলেন বাসব যাহা, নিঃস্ব বলে নহি তো বঞ্চিত ।



## ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]

ভাববাদীরা তাঁদের মত সমর্থন করতে যে সমস্ত যুক্তি দেখান, তার ছ'চারটা এই—  
প্রথমতঃ তুমি নিজ ক্রিয়াশীল না হয়ে কোনও কিছু জানতে বা অনুভব করতে পার না। বিষয়ীর ক্রিয়া বা স্পন্দনই জগৎকে তোমার চোখে হুটিয়ে তুলছে। তুমি কিছু লিখছ হরত, লেখার মাঝে মন একেবারে ডুবে গিয়েছে, একটা সাপ তোমার সামনে দিয়ে চলে গেল, তুমি তাকে দেখতে পেলে না—  
কেননা সাপ তোমার কাছে তখন সাপ নয়—  
সর্প তখন অসৎ। ভাববাদীরা তাই বলেন, বিষয়ীর মনের স্পন্দনটা যদি না থাকতো, তাহলে কোনও বিষয়ও থাকত না। যখন ঘুমিয়ে আছ, বিষয়ী তখন নিষ্কর, চারদিকে চট্টগোল করলেও শুন্তে পাও না। কেউ কেউ ঘুমের সময় চোখ মেলে থাকে। তাদের চোখের মাঝে সব জিনিষেরই ছায়া পড়ে, সব তাদের চোখের সামনে রয়েছে, কিন্তু তারা তো দেখতে পার না। ভাববাদীরা বলেন, মন তোমার নিজস্ব, বিষয়ী তার স্পন্দনকে নিরুদ্ধ করে রয়েছে, তাই কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মনের স্পন্দন ছাড়া কি এই জগতে কিছু দেখতে পার না। মনকে নিরুদ্ধ করে রাখা না করে এই টেলিফোন বা দেওরাগণটা দেখতে চোঁটা কর, রামের কথাগুলো শুনেতে চক্কা কর কিবা বা হোক একটা কিছু অনুভব করতে গিয়ে দেখ যেণি, কোনও কিছুই সাড়া পাও কিনা।

না তবে কি অনুভব চলে? তা চলে না। তাই ভাববাদীরা বলেন, সমস্তটা জগৎ কেবল একটা ভাবের প্রবাহমাত্র—এটা ভাবেরই বহির্লীলা।

জগৎ যে আছে, তা জানু কি করে? ইন্দ্রিয় দিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো স্বয়ং তো আর অনুভব করতে পারে না। মন যখন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হয়, তখন তাদের অনুভব করার ক্ষমতা জাগে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তো দেখে না—ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে দেখে মন। আপাততঃ মন বা বুদ্ধিকেই আমরা বলছি বিষয়ী। মনের স্পন্দন ছাড়া কিছু শুন্তে পার না, দেখতে পার না বা করতে পার না। তাই ভাববাদীরা বলেন, “যারা জগৎকে সত্য মনে, বস্তুবৎ মনে, প্রকৃষ্টিক এ’ গেনেই মান, তাদের পুণঃ পুণঃ বলছি, তোমরা আত্মবিশ্বাস হঠাৎ, ভুলে কলো না। যা কিছু বাটরে, সব তোমার ঝুঁটি, তোমার ভাব হতে প্রতিকলিত—এক কথায় এ জগৎ তোমার নিম্ন হাতে গড়া।” এট হল ভাববাদীদের মূল বক্তব্য। দেখতেই পাচ্ছ, তারা কতকটা বৈদ্যাস্থিকের মত। কিন্তু রাম বলছেন কি, বার্কলে, প্লাটো, হেগেল, কার্ট, ফিক্টে, শোল সোপেনহাউর তারা বেদান্তের অনুসরণ করছেন বটে, কিন্তু বেদান্তীর প্রমাণশাস্ত্র এ সমস্ত মতকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরস্পর মতভেদ আছে, এঁদের প্রতি বক্তৃকটাক করছেন, কিন্তু বেদান্ত তাঁদের সকলকে

মিলিয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত দার্শনিকেরা অহংটাকে খুব বড় করে তোলেন, কিন্তু বেদান্তের সে পন্থা নয়; অজ্ঞাত দার্শনিকের সঙ্গে এই খানেই তার প্রভেদ। সত্যকে সত্য-স্বরূপেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ভাববাদীদের আর একটা যুক্তি এই—এই যে জগৎটাকে লোকে সাধারণতঃ সত্য বলে গ্রহণ করে, এটা তাদের মত একটা ভুল। কেননা হিন্দুরের ভিতর দিয়েই আমরা জগৎটাকে এমনি দেখছি বই তো নয়। কাজেই দৃশ্যতঃ জগৎটাকে সত্য বলতে গেলে হিন্দুরের দেখার উপর ভরসা করেই আমাদের রায় দিতে হয়। কিন্তু হিন্দুরের দর্শন তো বিশ্বাস করতে পারি না। ধর চোখের কথা। পিপ্পড়ের চোখের দৃষ্টি আর মানুষের চোখের দৃষ্টি ভালাদ। মানুষের চোখে একটা জ্ঞানয যেন দেখায়, হাতীর চোখে তার চেয়ে অনেক বড় দেখাবে। বেড়ের চোখে জলের জিনিষ বেশ পরিষ্কার দেখায়, কিন্তু বাতাসের ভিতর দিয়ে দেখতে গেলেই সেগুলোকে সে ঝাপসা কুয়াসার ঢাকা দেখতে পায়। এখন বল দেখি, কার চোখকে বিশ্বাস করি? মানুষের চোখকে না পিপ্পড়ের চোখকে? যদি গুণিত হিসাবে ছোট বড় গণনা কর, তাহলে পিপ্পড় একাদিকে ছোট হলেও গুণিততে বড় বই কি। অণুবীক্ষণের সীতিতে যদি চোখের গঠন হয়, চক্ষুর স্নায়ুর অবস্থান যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তাহলে জগৎটা তোমার কাছে একেবারে আর এক রকম তৈরী হবে। যদি দূরবীক্ষণের ধরণে চোখের স্নায়ু গঠিত থাকে, তাহলে কিন্তু জগৎটা আবার আর এক রকম হয়ে যাবে। এক রকম খেলনা আছে, তার নাম “দেখন-হাসি।”

ছবানা কাচের কলক দিয়ে তা তৈরী। তার ভিতর দিয়ে তাকালে সব জিনিষই হাস্যকর ও অদ্ভুত দেখায়। অতি স্থলর একখানা মুখও “দেখন-হাসি” আয়নার ভিতর দিয়ে দেখলে এমন বিল্লী লম্বা দেখাবে যেন তার চিবুকটা ঠেকেছে মাটিতে আর মাথাটা উঠেছে আকাশে। আবার কাঁচটা একটু ঘুরিয়ে দেখ, দেখবে, মুখের খাড়াই ঠিক আছে, কিন্তু তার একটা কাণ গেছে কাশীতে আর একটা প্রাণে। তোমার চোখ দুটো যদি ওই ধরণে গড়া হয়, তাহলে জগৎটা একেবারে বদলে যেত। অজ্ঞাত হিন্দুরের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। স্নায়ু বা মাংসপেশী যদি অন্তরকমে গড়া হয়, তাহলে জগৎ আর এক রকম হয়ে যাবে। বলতে পার, চাঁদ্রের, পেশী ইত্যাদি যেভাবে গড়া আছে, চিরকাল সেই ভাবেই থাকবে। কিন্তু তা হয় না। পরিণামবাদ বলছে, সব জিনিষই মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। ভাববাদীরা এই জ্ঞান বলেন, জগৎটা যা দেখছি তা নয়; এখন যা দেখছি, তা মিথ্যা, মারা বা মতিভ্রম মাত্র।

ভাববাদীদের পক্ষ আরও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সে সমস্ত খুঁটিয়ে আলোচনা করতে গেলে এমন অনেক রাতই কেটে যাবে। এখন আমরা বস্তুবাদীদের সম্বন্ধে হুঁচকার কথা বলতে চাই। বস্তুবাদীরা বলেন, “তাই ভাবুক, তোমার যে ভাবী ভুল হচ্ছে। তুমি বলতে চাও যে আমরা যা কিছু দেখি, সবই আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। তাই যদি হয়, আচ্ছা তাহলে এই যে সামনে দেওয়ালটা দেখছি, এটাকে একটা ছোড়া বানিয়ে দাও না তাই। তোমার মত ক্ষুদ্র বিষয়ী বুদ্ধি যা বল

থেকে যদি এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এই রুমালটাকে বাঁক করে দাও, না হয় এই গেলিগটাকে একটা ইয়ারত বানিয়ে দাও না। আসল কথাটা কি জান, এই জগৎটা একটা বাস্তব সত্য। এই দেওয়ালটা আসলে দেওয়ালই, সেইজন্য চিরকাল তোমার ইন্সিরের কাছে দেওয়াল বলেই এটা ঠেকে, আজ দেওয়াল আর কাল হল ইয়ারত—এমন হয় না।”

বাস্তববাদীর এই আপত্তির খণ্ডন ভাববাদীরা করেছেন বটে, কিন্তু হপ্‌কেন্স সওয়াল জবাব করবার সময় তো আমাদের হবে না। ভাববাদীরা বলেন, সৃষ্টি করাটা সময়সাপেক্ষ, নইলে ভাব দ্বারা সৃষ্টি অসম্ভব নয়। ভূতের কথা ভাবতে থাকলে ভূত দেখা যায়—যাই ভাববে তাই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তা ছাড়া স্বপ্নে আমরা সৃষ্টি করি না কি? আমাদের করনাই তো সেখানে বাস্তব হয়ে ওঠে। এই জবাবের আবার পার্টা জবাব বাস্তববাদীরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ সব সওয়াল জবাব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না।

বেদান্তও জগৎকে আমার ভাব, আমার সৃষ্টিক্রমে দেখতে বলেন, কিন্তু জগৎকে যখন আমার ভাব বা সৃষ্টিক্রমে বেদান্তী দেখেন, তখনও তাকে ভাববাদী বলা ঠিক হবে না। রাম এই কথা বলছেন শুনে তোমরা অবাক হচ্ছ হয়ত। কিন্তু এই কথাই আমি বারবার তোমাদের বলছি। “ইউরোপ [আমেরিকার] লোকেরা মনে করে, বেদান্ত বুদ্ধি এক রকম

ভাববাদ। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যত লেখা রামের হাতে এসেছে, সবগুলিতেই বেদান্তকে ভাববাদ বলা হয়েছে—কিন্তু রাম স্পষ্টই বলছেন, এরা কেউ বেদান্ত বোঝেনি। বার্কলে বা প্লেটোর ভাববাদ বলতে যা বোঝ, বেদান্ত কিন্তু আসলে তা নয়। এ তার চেয়ে অনেক উচুদরের জিনিষ।

ভাববাদীর জগৎ দাঁড়াচ্ছে ক্ষুদ্র বিষয়ীর উপর, তার ক্ষুদ্র মনবুদ্ধির ওপর। কিন্তু বেদান্তী যখন বলছেন, আমার ভাব হতেই জগৎ সৃষ্টি, তখন সে আমি বলতে ক্ষুদ্র মনবুদ্ধিকে কিন্তু লক্ষ্য করছেন না। মনবুদ্ধি নিজেই তো চঞ্চল; তারা তো সৃষ্টি পদার্থ মাত্র। বার্কলে যখন বলেছিলেন যে স্বপ্ন বিষয়ীর সৃষ্টি মাত্র, তখন তাঁর বিষম ভুল হয়েছিল। তার ভুল এই যে, স্বপ্নের বিষয়ীকে তিনি জাগ্রতের বিষয়ীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। গত রাতে আমরা আলোচনার বুঝেছিলাম যে স্বপ্নের বিষয়ী জাগ্রতের বিষয়ী হতে পুথক্ক। স্বপ্নের বিষয়ী অনেকটা স্বপ্নের বিষয়েরই মত। আবার জাগলে পর, জাগ্রতের বিষয়ীও অনেকটা জাগ্রতের বিষয়ের মত। অথচ বার্কলে এই ছটীকে ঘুলিয়ে ফেলেছেন। এ জগৎ স্বপ্ন জাগ্রতের বিষয়ীর সৃষ্টি নয়; কিন্তু এ আমার আত্মার সৃষ্টি—ব্রহ্মের বিবর্ত।”

এতক্ষণ আমরা বেদান্তের প্রমাণবাদকে এসে পড়লাম। (ক্রমশঃ)



## বৰ্ত্তমান হিন্দুসমাজ

বিষম কাল উপস্থিত; হিন্দুসমাজৰ উপযুক্ত নেতাৰ অভাবত সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও শ্বেচ্ছাচাৰী হৈ পৰিছে। সমাজৰ সবহতাগ মানুহেই উন্নয়নগামী; অথচ সকলোৱেই শাস্ত্ৰজ্ঞ, ধৰ্ম-বক্তা ও উপদেষ্টা। সিহঁতে আপোন আপোন শিক্ষা দীক্ষা অমুসৰি যাৰ যেনে সংস্কাৰ বা ধাৰণা জন্মিছে, সি সেই ভাবেই শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যা কৰি শিক্ষা দিছে। ইয়াত নিজে যে প্ৰভাৱিত হৈছেই নে—আকৌ লগতে দশ জনকো বিপণ-গামী কৰিছে। কোনোৱে অনিচ্ছাভিমানত উন্নত হৈ, আত্মদৰ্শী ও সত্যদৰ্শী ঋষি সকলৰ ভুল দেখুৱাই নিজৰ বাহাদুৰী জাতিৰ কৰিছে। কোনোৱে বা আকৌ এক শাস্ত্ৰৰে এডোখৰ বাদ দি, এডোখৰ অতিৰঞ্জিত বুলি, এডোখৰ মিছা ভ্ৰম বুলি বাদ দি, নিজৰ মতলবসিদ্ধিৰ উপযোগী অংশ বাচি গৈ ধৰ্মপ্ৰচাৰক হৈ পৰিছে। কোনো কোনোৱে তত্ত্ব প্ৰৱণ-বিলাক লৰাক ভুৱা দিয়া উপকথা হেন ভাপি বৈদ্যাস্তিক ব্ৰহ্মবিৎ হৈ পৰিছে। কোনোৱে আকৌ কোনো শাস্ত্ৰক আধুনিক, কোনোক স্বাৰ্থপৰ ব্ৰাহ্মণৰ, বচিত বুলি দাৰিত টাও দি, অবজ্ঞা কৰি বিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। কোনোৱে আকৌ দয়া পৰবশ হৈ ব্যাকবণক ভাপত প্ৰাণত্যাগিক গলাই তাৰ পৰা খাদ উলিয়াই খাটি অংশ বাহিৰ কৰিছে;—সেই ভাপত ঐতিহাসিক মত পৰ্য্যন্ত উৰি গৈছে। কোনোৱে আকৌ নিয়ম সংগম, বিধিনিষেধ আদিক কুসংস্কাৰ বুলি শ্বেচ্ছাচাৰৰ প্ৰশংসা দিছে। কিন্তু সকলোৱেই ধৰ্মহীন, নিপথত ঘূৰি গৈছে। ধৰ্মৰ লক্ষ্য হেৰুৱাই কণো জপো,

অথচ মুখত বড় বড় কথা; দৰ্শন উপনিষৎ যোগ জ্ঞান আদিৰ কাহিৰে কল্প সৰু কথাৰ ধাৰকে নেধাৰে। সিহঁতৰ ভিতৰত কোনো বেদান্তৰ মায়াবাদী, কোনো নৌকধৰ্মৰ শূন্ত-বাদী, কোনো ক্ৰীতান্ত কৰ্মযোগী, কোনো উপনিষদৰ ব্ৰহ্মবাদী আৰু কাৰো মুখত যোগ সমাধি।

এই তো গল শিক্ষিত নেতা, উপদেষ্টা ও চেলাৰ কথা। আৰু যি ধৰ্মৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে, সিহঁতে কেবল মালা-ঝোণা, তিলকমাতি, চেনি-কল, বাছ শোচাচাৰ লৈয়ে ব্যস্ত; তিনি সক্ষ্যাত সক্ষ্যাপূজাৰ ধূম, অথচ মিছা মোকদ্দমা, মিছা সাক্ষী, পৰনিন্দা, পৰম্পৰহৰণ ও পৰদাৰগমনত নিবৃত্তি নাই। এই শ্ৰেণীৰ মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰাণ এৰি দি সংস্কাৰবশতঃ হাৰ মাংস লৈ, চাউল পেলাই তুঁহ লৈয়ে রান্ধ। এটা কথাবে উদাহৰণ দিও।—হিন্দুসমাজত ব্ৰত ও পৰ্ব উপলক্ষ্যে উপবাস কৰাৰ বিধি আছে। উপ—ওচৰত বাস অৰ্থাৎ ভগবানৰ ওচৰত বসতি কৰাই হ'ল উপবাস। সেই কাৰণে আগদিনাৰ পৰা সংযমাদি ধাৰা চিন্তা শুদ্ধ ৰাখি পৰ্বদিনত দিনে ৰাতিয়ে সংযতভাবে ভগবানৰ আৰাধনা ও ধ্যান-ধাৰণাত নিযুক্ত থকাৰ ব্যবস্থা। কিন্তু এই শ্ৰেণীৰ লোকে মিছা কথা কৈ পৰনিন্দা ও কাক্সিয়া কৰি দিনে ৰাতিয়ে এটোপা গুানী পৰ্য্যন্ত নেখাই অনা-হাৰত থাকিব পাবিলেই উপবাসৰ সাৰ্থকতা হ'ল বুলি নিবেচনা কৰে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মানুহে জ্ঞানগৰিষ্ঠ ঋষিৰ্শ্ৰেষ্ঠ সকলৰ প্ৰতিষ্ঠিত ধৰ্মৰ স্মৃতি বাঞ্ছন চিন্তিব চেষ্টা কৰিছে, আৰু



দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মানুহে বান্ধোনৰ ওপৰত বান্ধোন দি অন্তঃসাবশ্ৰুত হৈ পৰিছে।

আৰু 'এক শ্ৰেণীৰ' মানুহ স্থিতি হৈছে, সিহঁত জাৰজৰ্জৰাৱলীয়া। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকলৰ বাধ্যতাত হিন্দুশাস্ত্ৰ পাঠ কৰি ইহঁত অজ্ঞ সমাজৰ বিজ্ঞ হৈ পৰিছেহি। সিহঁতৰ মুখত কেবল কুসংস্কাৰ, পৌত্তলিকতাৰ ব্যাখ্যা, কেবল ধৰ্ম্মসভা ও বক্তৃত্বৰ ধুম। যি গীতাৰ এটা শ্লোক অনুবাদ কৰোতে সাতোতা তুল কৰে, তাৰে সমালোচিত হিন্দুধৰ্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্ৰ পাঠ কৰি, এই শ্ৰেণীৰ লোকে পণ্ডিত হৈ গুৰুত পৰিণত হৈছে। আৰু সকল সংস্কৃতা-নতিজ্ঞ বুজি নিজে শাস্ত্ৰৰ ভুল সংশোধন ও শ্লোকৰ অজকৰ্ত্তন কৰি নিজ মতত পুথি লেখি হিন্দুসমাজৰ নিঃস্বার্থ উপকাৰ সাধিছে। এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ দ্বাৰা হিন্দুধৰ্ম্মৰূপ কলঙ্কৰ ফল-ফুল, ডাণ্ড-পাত কণ্ঠিত হৈ স্বাণুণ্ড শোভা ধাৰণ কৰিছে।

ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এক শ্ৰেণীৰ লোক আছে, সিহঁতে ভক্ত। সিহঁতে, কীৰ্ত্তনাদি শব্দৰ বচিত পুথিৰ পৰা নিজ মতৰ পক্ষ-পাতী কেই ফাকিমাৰ শ্লোক ও ফকৰা আওৰাই ভক্ত সাজিছে। ইহঁতে বৈষ্ণৱ, শক্তিৰ বিদ্যেয়ী, তিলকমাতি মালাঝোলা লৈয়ে ব্যস্ত। ইহঁতে ব্ৰাহ্মণ বিদ্যেয়ী। ইহঁতৰ দ্বাৰা সমাজত দলাপলি ধৰ্ম্মৰ উপক্ৰম হৈছে।

আৰু 'এক শ্ৰেণীৰ' লোক আছে, সিহঁত-অবতাব। নিজে কিছা ভক্তৰ দ্বাৰা সমাজত অবতাবৰূপ অৱতীৰ্ণ হৈছে। ভগ-বান গৌৰাঙ্গদেবৰ পাচৰে পৰা অবতাবৰ আমদানী চলিছে। ইয়াৰ মাজত দুই চাৰি জন অবতাবে ফাতেক ও' বীপান্তৰাসৰ লীলাভিনয় কৰাও দেখা যায়। তথাপি ধৰ্ম্ম-

প্ৰাণ সবল মানুহবোৰ দলে দলে গৈ অবতাবৰ দলগুটি কৰিছে। এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ দ্বাৰা হিন্দুসমাজ খণ্ড খণ্ড হৈ পৰিছে, আৰু প্ৰকৃত সাধুচৰিত্ৰ অবতাবৰ অন্তৰালত পৰি লোক-দৃষ্টিৰ বহিৰ্ভূত হৈ পৰিছে। অবতাবৰ সংশয় জাল ছিন্ন কৰিব নোৱাৰি সাধু মণ্ডলৰ ত্যাগ বৈবাগ্য বা জ্ঞান ভক্তিৰ আদৰ্শ সাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিবলৈ অপাৰগ হৈছে।

এতিয়া সাধাৰণৰ উপায় কি?—সিহঁতে কৰিব কি, কোন পথ ধৰিব, আৰু কাৰ কথাত বিশ্বাস কৰিব? সেই কাৰণেই কৈছো, বিষম কাল উপস্থিত। আৰু বিষম কাল বুলি-য়েই তো ভয় হয়। বিশ্বাস কৰো কাৰ কথাত? যেয়ে কৈছে "গৃহস্থ উঠা" আকৌ তেওঁই কৈছে "মুঠিবি, বাতি আছে।" এতিয়া কি কৰা কৰ্ত্তব্য? এতিয়া কৰ্ত্তব্য এই যে আমাৰ দৈৱদত্ত যি মনুষ্যত্ব—তাৰেই আশ্ৰয় লোৱা। কিয়নো তেওঁ আমাক কৰ্ম্মক্ষেত্ৰত অবতীৰ্ণ হবৰ কাৰণে, প্ৰত্যেককেই জ্ঞান দিছে, অলপ স্থিৰভাবে সেই জ্ঞানৰ আশ্ৰয় লৈ বিবেকৰ বশবৰ্ত্তী হৈ চলিব পাৰিলে কোনো গোলযোগ নহয়। "আমাৰ দেহৰূপৰ সাৰথি বিবেক শ্ৰীকৃষ্ণই সংশয়াকুলিত বিষাদময় শিয় ও সখা অৰ্জ্জুনকণী মনক সদায় গীতামৃত পান কৰা-ইছে। অতএব বিবেকৰ শৰণাগত হৈ জ্ঞান লাভ কৰাই হল আমাৰ কৰ্ত্তব্য। কিন্তু যাৰ চিত্ততত্ত্বি ছোৱা নাই, সিয়ো মায়াৰ সন্মোহন মত্তত মত্ত হৈ পৰিচালিত হৈছে, বিবেকৰ বশবৰ্ত্তী নহয়। সুতৰাং প্ৰথমে বিবেক জগাবৰ কাৰণে বিবিধমতে চিত্ততত্ত্বি কৰা আবশ্যক। আৰু চিত্ততত্ত্বিৰ ইচ্ছা থাকিলে ভগৱদ্ভিষ্ট নিয়মবোৰো সদাই পালনীয়। সেই কাৰণেই ঋষিসকলে মানুহ জীৱনৰ প্ৰথম সোপানত

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমব ব্যবস্থা ক'বছিল। ব্রহ্মচর্য্য-  
শ্রমত শাস্ত্রাদি পাঠত জ্ঞান লাভ আক আহা-  
বাদি ও শ্রমদমাদিব অভ্যাসত চিত্তশুদ্ধি হয়;  
সেই কারণেই ধর্ম্মর ভেতিয়েই হ'ল ব্রহ্মচর্য্য।  
ব্রহ্মচর্য্যর অভাবতেই আমার সমাজর এই  
ছবগস্থা। চিত্তশুদ্ধি নহলে কোনো ধর্ম্মতেই  
অগ্রসব হব নোবা। খৃষ্টান, মুছলমানর  
মতভেদ, শাক্ত ঐক্যবর মতভেদ, পৌরাণিক  
দার্শনিকর মতভেদ; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে  
কোনো সম্প্রদায়বে মতভেদ দেখা নেয়ার।  
চবিত্ত গঠনর লগে লগে চিত্তশুদ্ধিৰ আশ্রয় ও  
খৃষ্টান, মুছলমান সকলো সম্প্রদায়বে অমু-  
মোদিত। “চূর কবা, মিছা ক,” এহতৌ  
কোনো সম্প্রদায়বই অতিশয় নহয়। সুতরাং  
আমার প্রথম জীবনত সর্বসম্মত চিত্তশুদ্ধিৰ  
সাধনা কৰিবলৈ কাবো বাধা নাই। ইহাও  
প্রত্যাভত হবর ভয় নাই কাবো, আক ইহাও  
অভ্যাস বিশেষরূপে শিক্ষিবও প্রয়োজন নাই।  
দেশ কাল পাত্রভেদে সাম্বিক আহাব ও  
সাংস্কৃতিক চিন্তার অভ্যাস কাবলেই সহজে চিত্ত  
শুদ্ধি হয়। ইহাও দ্বারা শরীর নীবাগ ও সুস্থ  
হয়, বিশ্বাস ও ভক্তি জনয়ত বর্দ্ধিত হয়।

চিত্তশুদ্ধি হলে যাব যি ভাব, যি মতত  
বিশ্বাস হয়, তাকে অংলঘন কবা কর্তব্য।  
অন্ত মত শ্রেষ্ঠ ও নিম্নর মত নিকৃষ্ট, মিছা ও  
কুসংস্কারপূর্ণ বলি শুনিও বিচলিত নহয়।  
নিজ মত দৃঢ়রূপে ধারণ কৰি পরিণতি ও পরি-  
পুষ্টিব কারণে চেষ্টা কৰা। কিয়নো কোনো  
মতেই কোনো সম্প্রদায়েই নিবর্ধক নহয়।  
অন্ত লোকে সাম্প্রদায়িক মত বিলাকর সম-  
লোচনা কৰি দুর্বলসাধকাবর মন ভাঙ্গি দিয়ে,  
কিন্তু কোনো মতেই মিছা নহয়। সকলো  
মতভেদ আশ্রিত লোক পূর্ণ সত্যত কখনো সহ্য

একদেশত গণিত হব। যেতিয়া মানুষ  
মাজেই আকৃতি-প্রকৃতিত ভিন ভিন, তেতিয়া  
গিইতব মতবো। বৈষম্য এক অবশ্যজ্ঞাবী।  
কাজেই মতবোবক পথ মাত্র জানি কোনো  
মতর নিন্দা ন কৰি, সকলো মতব কৰি,  
কালী, কৃষ্ণ, খৃষ্টর গিচুবী'ন পকাই মতী  
তিবোতার দবে স্বধর্ম্মানন্ত হৈ থাক। জন্ম-  
স্তবর সংস্কার, শিক্ষা ও কচর্ভেদে আধকাবা-  
মুদ্রণ যি কোনো এত মত অংলঘন কবা।  
লাহে লাহে বিশ্বাস দৃঢ় হৈ, ভাব পুষ্ট হলে,  
লক্ষ্য স্থির হলে তদমুদ্রণ সাধন প্রণালী অং-  
লঘন কৰি। সাধনাত লক্ষ্যবস্ত উপলব্ধি  
হলেই তৎপ্রাপ্ত ভক্তিব উদয় হয়, তেওঁক  
পাবব কারণ প্রাণ ব্যাকুল হব। তেতয়া সং-  
বর যাবতীয় বস্তত বিবাগ জন্ম অভীষ্ট বস্তত  
চিত্তর অবিচ্ছিন্ন একমুদী গতি হয়। কাজেই  
চিত্তবৃত্তি নিবোধেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়।  
তেতিয়া আত্মবরূপ লাভ ও কৃতার্থ হৈ মুক্ত  
পদত থাকিব পারি।

কিন্তু মুক্তি লাভ কৰিবলৈ হলে একন মুক্ত  
লোকর সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র  
মতে তেওঁই গুরুনামে অভিহিত হয়। গুরুর  
কৃপা বিনে মুক্তিপথত অগ্রসব হ'বর উপায়  
নাই। গুরুর শিষ্যত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চা-  
ন কৰিলে, অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ হব নোবা।  
কাজেই গুরুর আবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি  
কৰি। যি আত্মবরূপ লাভ কৰিছে তেই বই  
গুরু। নতুবা অন্তর ওচবলৈ গুলে গুরুর  
অভাব পূরণ নহয়। এনেকুয়া গুরু নেপালে  
সবলভাবে ভগবানর ওচবত প্রার্থনা কবা।  
অকপটভবে সবল প্রার্থনা আমার পক্ষে পবন  
কার্য্যকাৰী। যেতিয়া যি দুর্বলতা অমুদ্রব  
কবা—হ'ব কারণ ভগবানক প্রার্থনা কৰি,

হাতে হাতে কঁল পাব। কাজেই শুকন  
 প্রয়োজন বুজি ব্যাকুল হৈ প্রার্থনা কৰা—  
 ভগবানে পঠাই দিব। উপযুক্ত সময় হলে শুক  
 আপোনা আপুনি লাভ হয়। শুক পালে আক  
 তম কি? সৰ্ব্বদা তেওঁৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি,  
 তেওঁৰ আদেশ পালন কৰি ঘোঁৰা, সৰ্ব্বাৰ্থ  
 সিদ্ধ হয়।

তেখেতে চেঁচৈ প্রকৃত ধৰ্ম্ম পণ্ডিত লোকৰ  
 এই জগতত একোৰেও অভাব নহয়। দুবৰ  
 পৰা হাটবজাৰ হাট-ফোড়ল শুনা যায়,  
 কিন্তু হাটৰ মাজেই গোমোৱা, দেখিও,  
 কোনো গোলমাল নাই। ঠিক সেই দৰেই  
 ধৰ্ম্মজ্ঞানৰ প্ৰতিবেশেই বাগবিত্তা, বিবেচ  
 কোলাহল, কিন্তু প্রকৃত ধাৰ্ম্মিকৰ ওচৰত  
 কোনো বিসম্বাদ নাই। মুক্তাৱস্থা অমাব  
 স্যৰ, সূৰ্য্য তক লাভ কৰা—  
 সকল কামতই সফল। ধৰ্ম্মলাভ কৰাটো  
 বিজ্ঞাবুদ্ধি, মূলধন, কিন্তু বগবানৰ প্ৰয়োজন  
 নাই, কেঁচল গাণভৰা বিশ্বাস আৰু ভক্ত  
 লাগে। মাহুৰ মনত বগবানৰ দুটা প্ৰশ্নৰ  
 উদয় হয়,—ভগবান আছে কিম্বা নাই। নদ  
 নাই, তেখেতে তো কথাই নাই—চাৰ্জ, ক  
 মতৰ অমুগ্ৰণ কৰা; নতুবা “তুমি কোন”  
 তৰ অমুগ্ৰণ কৰা। আৰু বদ তেওঁ আছে,  
 তেখেতে নিশ্চয় কোনো ব দেখিছে, যি দেখেছে  
 তেওঁৰ ওচৰত গৈ চাহ লোৱা নতুবা তেওঁ  
 স্নিকপে দেখেছে স্বৰ্গ উপায় জানি লোৱা;  
 কেনে হলেই কৃতার্থ হয়। আৰু বদ ভগবানত  
 বিশ্বাস নাই, কালী, কৃষ্ণ আদি সংস্কাৰালোক  
 পাহৰি সবগভায়ে সমাহিত চিন্তে বিচাৰ  
 কৰক তাৰ মত কি? তাক লাগে কি?  
 আমি সূৰ্য্য কাল, চৈবদিনৰ কাৰণ নিব  
 বজ্জি পূৰ্ণসূৰ্য্যৰ তিলাৰী আমি। কিন্তু সূৰ্য্য

ক’ত? ধনত জনত, বিজ্ঞাত-বুদ্ধিত, খ্যাতি  
 প্ৰতিপত্তিত, কৃষ্ণা মন বশাদি অনিত্য পাৰ্থিব  
 পদাৰ্থত কোনোৱে কেতিয়াবা সূৰ্য্য হব  
 পাৰিছে নে? নাই পৰা। কাজেই তাত  
 তোমাবো সূৰ্য্য হব সম্ভাবনা নাই। তুমি  
 যে নিজেই আনন্দময়; তুমি তোমাৰ স্বৰূপ  
 জানিব পাবলৈ সূৰ্য্য হয়। যি ভগবানকে  
 নেমানে, অথচ সূৰ্য্য বিচাৰে, আৰু যি সূৰ্য্য  
 নিশ্চয়, ভগবান লাভত ব্যাকুল, এই উভ-  
 য়েই প্ৰকাৰান্তৰে একে বস্তুৰেই ভিলাৰী।  
 কিয়নো, সূৰ্য্য যে সূৰ্য্যস্বৰূপ ভগবানেৰ বাহৰে  
 কতো নাই, আৰু ভগবান লাভতে যে পূৰ্ণ  
 সূৰ্য্য হয়, কাজেই উভয়েই এক পথৰ পথিক।  
 কিন্তু অনাতত্ত্ব মূলদৰ্শী লোকে সিহঁতক নাস্তিক  
 ও ভক্ত নামৰ আখ্যা দি জগতত দণ্ডাৰি ও  
 চিন্তাশেষ সৃষ্টি কৰিছে। প্রকৃত অভক্তই  
 যি শ্ৰীকৃষ্ণক নন্দা কৰে, তব তাক নাস্তিক  
 মূৰ্খগিৰা, কিয়নো সি শ্ৰীকৃষ্ণক ভগবান বুল  
 নেজানে বা বুজি নোৱৰে। সেই দৰে  
 ধাৰ্ম্মিককো বৈষ্ণৱ কৃষ্ণভক্ত বুলি স্বীকাৰ  
 কৰা কঠৰ্য্য। আমি সকলোবোৰেই  
 মোতৰ পানী—অনন্তধামৰ যাত্ৰী, যদিও  
 আপোন আপোন থকা ঠাইৰ পৰা যাত্ৰা  
 কৰাত নানা পথৰ সৃষ্টি হৈছে, তথাপি সক-  
 লোৰ গাত একে কেন্দ্ৰলৈ ভগবচ্চৰণলৈ।  
 তেখেতে আৰু হিন্দা। বিবেচ, বন্দ কোলাহল কৰা  
 কিম্বা? যদি সূৰ্য্য লাগে সূৰ্য্যতোভাবে ভগবানৰ  
 শৰণাগত হোৱা, তেওঁৰ কৃপাত অনন্ত সূৰ্য্য  
 শান্তিৰ অধিকাৰী হৈ নিত্যধাম প্ৰাপ্ত হয়।

অতএব ধৰ্ম্মলাভ কাৰবলৈ কাৰো কতো  
 বাধা হব নোৱাৰে। যি কোনো মতৰ আশ্র  
 য়ত পৰিচালিত হব পাৰিগেই কৃতার্থ হব পৰা  
 যায়। এটা আলপিনৰ বাৰাই আত্মহত্যা

কৰা যায়, কিন্তু অল্পক মাৰিবলৈ চলে ঢাল তৰোৱাল ও মুক্ত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, সেট দৰে নিজে ধৰ্ম্মলাভ কৰিবলৈ হলে কোনো কষ্ট নাই। পিছে যি অল্পক শিক্ষা দিয়ে, তেওঁ নানা শাস্ত্ৰ, নানা মন্ত্ৰ, নানা গথ, ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্ৰণালী জানিব লাগে। কিন্তু সত্যলাভ নকৰিব হবৰ স্পৰ্শ কৰা ও শাস্ত্ৰলোচনা কৰিবলৈ যোৱা বিড়ম্বনা মাত্ৰ। এট শ্ৰেণীৰ লোকৰ দ্বাৰাই সমাজ অধঃপাতে গৈছে। অনধিকাৰী হৈ যি শাস্ত্ৰগাথা ও ধৰ্ম্ম-প্ৰচাৰ কৰে, গিহঁতে দেশৰ, দহৰ ও সমাজৰ ঘোৰ শত্ৰু। সত্যলাভ নকৰি শাস্ত্ৰপাঠ কৰ-বলৈ গলে, শাস্ত্ৰৰ নিগূঢ়াৰ্থ বুজি তৰ মৰ্ম্ম বহুত ভেদ কৰি নোৱাৰে। হিন্দুশাস্ত্ৰ অনন্ত; সৰ্বাধিকাৰী লোককে ঠাই দিবৰ কাৰণে প্ৰবৃত্ত পথৰ শত শত শাখা প্ৰাশাখাত বিভক্ত হৈ, নিবৃত্তিপথত স্তৰে স্তৰে অনন্ত দেশলৈ উঠি গৈছে। মুকুমাৰ লৰাৰ কোমল হৃদয়ত ধৰ্ম্মবিজ দিবৰ কাৰণ বৰ্ণাশ্ৰমোচিত ব্ৰত নিয়মৰ পৰা ব্ৰহ্মগত থাণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম-পাসকৰ সন্মাস পৰ্যন্ত হিন্দুধৰ্ম্মৰ দেশ। শুককুপাত প্ৰকৃত জ্ঞান নহলে শাস্ত্ৰপাঠ কৰ একোকে বুজা নেযায়। প্ৰকৃত পক্ষে সকলো শাস্ত্ৰ ও সকলো প্ৰকাৰ সাধনাৰ মুখা উদ্দেশ্য ও ফল এক; পিছে উদ্দেশ্যপথত যোৱা পদ্ধতি বা প্ৰণালী বিভিন্ন হব পাৰে। শাস্ত্ৰবোৰ সত্যদৰ্শী ঋষিসকলৰ দ্বাৰা ৰচিত। সত্য এক, কাজেই শাস্ত্ৰবোৰ পৰস্পৰ কি বিভিন্ন ও বিসম্বাদী হব পাৰে? কিন্তু অনধিকাৰীয়ে হুগবুদ্ধিত শাস্ত্ৰলোচনা কৰ পাম্পৰ বিভিন্ন দেখে। সেই কাৰণেই আজি একে শাস্ত্ৰকে পাঁচজন পৰি পাঁচেকমে নিজ নিজ সংস্কাৰ ও শিক্ষাভূকণ ব্যাখ্যা কৰি হিংসাবিষেবৰ তাপত

সমাজ পুৰি চাই কৰিলে। এক অধিকাৰীৰ উপদেশ অল্প অধিকাৰীক, গৃহস্থৰ উপদেশ সন্ন্যাসীক, আৰু সন্ন্যাসীৰ উপদেশ ব্ৰহ্ম-চাৰীক কৈ হিন্দুসমাজক উন্মাদগামী কৰি তুলিছে। সাধাৰণে এটবিলাক শাস্ত্ৰব্যাখ্যাতা, উপদেশদাতা, ও প্ৰচাৰকৰ্ত্তা সকলৰ বিভিন্ন মতবাদৰ পাকঘৰনীত পৰি হাবুডুপ খাই মৰিছে। অতঃপৰ সত্যলাভ নকৰাকৈ, কেতিয়াও শাস্ত্ৰৰ গোলোকধাৰাত প্ৰবেশ কৰা কৰ্ত্তব্য নহয়; সেয়েহে আক এট জীবনত পাৰ হবৰ উপায় নেথাকিব। মাহুহবোৰে দাবহাৰিক বুদ্ধিত শাস্ত্ৰপাঠ কৰি অজসমাজত নিজ হৈ কেবল বিৰাট তৰ্কজাল বিস্তাৰ কৰি হেঁচৈ কৰি ফুৰে। এই সমাজভ্ৰষ্টা-শোকে নিজেতো জ্ঞানলাভ কৰিব নোৱাৰেই, তহুণৰি আৰু পাঁচজনকো বিপথলৈ পৰিচালিত কৰি সমাজত দলাদলিৰ সৃষ্টি কৰে। কাজেই সাধক সকলে ভক্ত ও ভগবানৰ লীলাগ্ৰেহ ও নিজ নিজ সাধনপথৰ সাৰভূত কাৰ্য্যসাধনোপযোগী শাস্ত্ৰাংশ মাত্ৰ পাঠ কৰিব। তাৰ পাচত সত্যলাভ কৰি সাধাৰণক শিক্ষা দিবৰ কাৰণ সকলো হিন্দুশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিব। তেতিয়া দেখিবা, হিন্দুশাস্ত্ৰত কেনেকুৱা স্তম্ভশ্ৰংগেৰে কত অগাধতত্ব স্তৰে স্তৰে সজ্জত। কোনো শস্ত্ৰই দিছা বা জিবৰ্ক নহয়; কোনো নহয় কোনো এক অধিকাৰীৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধি হবই। ৰাজনীতি, অৰাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি, আদি এনে কোনো নতুন কথা কোনোবাই কি কব পাৰিব যি বিশাল হিন্দু শাস্ত্ৰৰ কোনো এখন পুথিত উল্লেখ হোৱা নাই। আদি উপযুক্ত শুকব অভাবত উপযুক্ত শিক্ষালাভত বঞ্চিত হৈছে। বুলিয়েই অসীম

জানসম্পন্ন আৰ্য্যশাস্ত্র জন্মিও অকৰ্ণণ্য  
ও নগণ্য হৈ, সচাই বোলে শোকে আক  
সকলিত কৰ্মনাথৰ অতলজলত পৰি হা হত্যাশ  
কৰি বৰিছে।

অন্তঃস্ব সত্যগাৰ্ভ কৰি বিকৃতার্থ হৈছে.

উঁহেই চিন্তাশূন্যকণ কলতাগাবব দুবৰী হৈ  
সকলসাধাবণৰ চ্ৰুতবত অধিকাৰাত্মকণ শুককথা  
প্রচাৰ কৰি সমাজৰ সুখ শান্তিৰ প্রতিষ্ঠা  
কৰি। ক্রিতাপন্থ জীবন শুকানকৰ্ত্তত ধৰ্ম্মৰ  
অমৃতধাৰা ঢালি সজীবিত কৰি কুলিব।



## প্রেম ও মহিমজ্ঞান

—:({#}):—

ভগবতঃশিলাগারতা—ভীহাতেই সমস্ত আচার  
বিচার অর্পণ কর, ইহাট হটল নারদীয়া  
ভক্তির আদর্শ। কথা হইয়াছিল, একজন কি  
আর একজনকে তাহার সব সঁপিয়া দিতে  
পারে? মহর্ষি বলিয়াছেন, ওঁ অস্তি এবম্  
এবম্, যথা ব্রজ গোপিকানাং—ই তা পারে,  
যেমন ব্রজগোপীরা।

তাহা হইলে মহর্ষিরও মতে গোপীপ্রেমই  
আদর্শ। কিন্তু এই প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে  
একটু বিচার কথা আছে। সচরাচর আমরা  
জানি গোপীর প্রেমে মহিমজ্ঞান ছিল না।  
ইহাই গোপীপ্রেমের বিশেষত্ব। যেখানে  
মাহাত্ম্যজ্ঞান রহিয়াছে, সেখানে প্রেম সঙ্কুচিত।  
ঠিক ঠিক সমান সমান না হইলে প্রেম হয়  
না—সমজাতীয়ে আকর্ষণই প্রতিষ্ঠা নিদান।  
মাহাত্ম্যজ্ঞান সবে প্রভা স্তম্ভ, কিন্তু প্রেম  
কি করিয়া স্তম্ভ? বিশেষতঃ গোপীর প্রেম  
প্রেমের আদর্শ যেখানে মাহাত্ম্যগোধ কোথায়?  
মহোদা গোপালকে ভগবান বলিয়া মানিতেন  
না আপনাব নাড়ীছেঁড়া ধন বলিয়া জানিতেন?

কাজু শ্রীকৃষ্ণদামোদর সখা, তাহাদের মতই  
একজন, না ভগবান? শ্রীরাধার প্রাণ উদ্বা-  
সিয়া ভালবাসার পাত্রটীর কথা না হয়  
ছাড়িয়াই দিলাম। মহাজনেরা একবাক্যে  
বলিবেন, এই সমস্ত সম্বন্ধের মাঝে সচজ-  
ভাণেট ক্ষুণ্ণি হইয়াছে—মাহুয মাহুযকে  
গেমন করিয় ভালবাসে, ইহাদের ভালবাসাও  
তেমনি; তাই তাহা শ্রীকৃষ্ণের মস ও অপবে  
রতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। নতুবা ভগবদ্-  
গোধ থাকিলে উহা রসাতল বলিয়া  
পরিগণিত হইত, ইহা আলঙ্কারিকেরাও  
বলিতেন। মাহুযাই প্রেমের প্রাণ। মাহাশ্মা  
ও মাহুযা পরস্পর বিরোধী; সামন্তত্ব ভিন্ন  
মাহুযা উদর চাইবে কোথা হাতে?

অথচ এই গোপীপ্রেমের কপালেই মহর্ষি  
নারদ বলিতেছেন—ন তত্রাপি মাহা-  
শ্ম্যজ্ঞানবিশ্মৃত্যপবাদঃ; ত-  
চ্ছহীনং তাত্ত্বাণামিব, নাস্তি  
এব তন্মিহ স্তম্ভস্তম্ভস্তম্ভস্তম্ভস্তম্ভ—  
গোপীও যে মাহাত্ম্যজ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছিল,

এমন অপবাদ দিতে পার না; মহাত্মাজান! না থাকিলে যে প্রীতি জারেন পতি নীতির তুণ্য; তাহাতে প্রিয়কনের স্বার্থে সুখী ওয়া চলে না।” পূর্বে যে প্রীতির আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে—মহর্ষির এই উক্তিগ সত্যিক তাৎপৰ্য সম্পূর্ণ বিরোধ দেখা যাইতেছে। ইহার অবশ্য সামঞ্জস্য প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধেই আমরা দুই চারিটা কথা বলিব।

মহর্ষি নারদেব পক্ষে ভাগবতের কোনও কোনও শ্লোক অমূল্য। রামলীলাধায়ে গোপী বলিতেছেন—মৈত্র্য নিভোহহঁতি ভবান্ গদহু নৃশংসম্; ভবান্ তত্ত্বতঃ কিল বদ্ধ-রায়া (তুমিই শরীরগণের বন্ধু ও আত্মা); ন থলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অপিলদেহি নামস্তরাঙ্কক...তুমি যে কেবল গোপীব ভেলে তানয়, তুমি সমস্ত নৈকীয় অন্তরাঙ্গ্যব সাকী।” গোপীব এই সমস্ত উক্তিগুলিতে ভগবদ্বোধ সম্পষ্ট। ইহার উত্তর কি? ভাগবত ভবানের নীলাম্ববর্ণন, প্রারম্ভে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। পরীক্ষিত যখন ‘শ্রীকৃষ্ণ পব দারাম্ভমৰ্ষণেব আরোপ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভগবত্তার কথা স্বরণ করিয়াই শুকদেব সে অপারিত খণ্ডন করিয়াছিলেন। “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ বয়ং”—এ ভাগবতেবষ্ট কথা এং কৃষ্ণভক্ত স্ববিশমাজে এ কথা সর্বজন-বিদিত ছিল। গীতাতেও দেখি, ‘শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংসার মাঝে ভগবদ্বোধের অভাব উকবুঁকি দিতেছে—বিশ্বরূপদর্শনের পর সে কথা সম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাৎশংসারও একবার বিশ্বরূপদর্শন হইয়াছিল।

যোট কথা, এষ্ট সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, ‘শ্রীকৃষ্ণ সহস্র ভাষ্য,

এই কথাটা যদি ‘শ্রীকৃষ্ণসিকের চরম অমুভূতি হয়, তাহা হইলেও ‘শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—এই অমুভূতিকেও প্রেমের সাধনরাজ্য হইতে একেবারে নির্দাসিত করিতে পারি না। এই উভয় অমুভূতির মাঝে একটা সামঞ্জস্য না হইলে নবদীপ্য ভক্তির আদর্শ সম্বন্ধ আশ্রয়ন একটা খটকা থাকিয়া যয়। তাহান মীমাংসাকি?

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ‘শ্রীকৃষ্ণ লীলা নিত্য ও পূর্ণ। নিত্য বলিতে এই বুঝি, ইত্যাকে কোনও বিশিষ্টকালের মাঝে আনয়ন করিয়া রাখা যায় না; পূর্ণ যে রূপ বৃন্দাবনে উপলব্ধি উঠিয়াছিল, আজও সে বসিকেন চিত্তে ভাঙন তরঙ্গ উঠিতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। পূর্ণ বলিতে এই বুঝি উহা সর্বপ্রকার অধিকারী এই উপযুক্ত; যে যথ্য মাৎ প্রপঞ্চস্ত তাৎপৰ্য্যেব ভজ্যম্যং যে যেমনভাবে চাহিয়াছে সে যেমনভাবে তাহাকে পাইয়াছে। এইখানে বুঝিতে হইবে, লীলা আশ্রয়িত্ব এক কোটিতে নিত্যত্ব সম্বন্ধিগ্রহ ‘শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান, তার এক কোটিতে প্রমাণশ্রয় সাধক বর্তমান। সমস্ত পনিগাম আছে প্রমাণের প্রামাণ্যের ভাবনমা আছে। নিশ্চয়ঃ সত্যনি সাধক, তাহান এই জগতেরই বজ্রভূমিতে দাঁড়াইয়া, সূত্রং ইহার স্পন্দন ও পরিণামের সত্যি আশ্রয়িত্ব স্পন্দন ও পরিণাম অবশ্য-স্তব। আশ্রয়নি ব্যাপারটিকে যদি, আমরা এইভাবে দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, একই তত্ত্ব প্রমাণভার সাধনকে ক্রমিক উৎকর্ষবশতঃ যুগ যুগ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী নিকট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে মূল সত্যের কোনও জনি হয় না, বরং সেই সত্যবর্ণনেরই অপকল্প লীলাটোচিত্য

সামান্য সাধকের দ্বায়ক অভূতপূর্ব উন্মাদে মাতাইয়া ভোগে।

আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভাগ্যভী সভা হইতে মানুষী সূত্রায় অবতীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে এককালে যে নীলা প্রকট করিয়াছিলেন, যুগ হইতে যুগান্তের ক্রমিক অভিযান্ত্রিকিতে সেই নিত্যগীর্নাই বিশ্ববৃন্দাবনে নিত্যকাল ধরিয়া পুনরভিনীত হইবে—অসুস্থ নিশ্চই একদিন না একদিন বৃন্দাবনের রসমাধুরী আশ্বাদন করিবে। এই আশ্বাদনের পরিণতি থাকিবে। ভারতবর্ষের সাধনজগতের চোঁকিহাসে এই পরিণতি অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ মানুষ মণ্ডলুর্গাটুকু আনিষ্কার করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবত। তাঁহার গুণের চণ্ডীদাস, নিতাপতি ও তাঁহার পরে অজ্ঞাত বৈষ্ণব মহাজনগণও ভাগবতমণ্ডল এই নিগূঢ়তম অস্তরঙ্গ অমুভূতিব কথা বিচিত্র ছন্দে গাতিয়া গিয়াছেন। রাজাগী জাতির প্রাতঃপ্রভাতের ইহা অসীম করণ। “কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোচ্চ নরগীলা” এই অমুভূতিতে মাহাত্ম্যজ্ঞানের আভাসটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়া রাসকন্দা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তক মানুষরূপে পাঠিয়াছেন। রাজালী বৈষ্ণব-দর্শনের বীকৃষ্ণ গুরুদাদে, অধুনা অবজ্ঞাত কস্তাভা পাত্তি সম্প্রদায়ে, নরের মাঝে নীর্যেণের পূর্ণপ্রকাশের আশ্চর্য্য বহু সঙ্গী, টিঙা গীতিরাছে শ্রীকৃষ্ণভাবনী ভাগ অমুদান করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

যদি নিত্যচক্রে অগ্নি হত রাখিয়া জাতীয় সাধনায় ক্রমিক অভিযান্ত্রিক দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণ নীলাকে আলোচনা করি, তাহা হইলে সৎ-সেই বৃত্ত পাত্রি, তদিত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান

হইতে ক্রমে মানুষ হইয়াছেন। মূলে তিনি যোগী তাহাই আঁছেন, কিন্তু যুগান্তব্যাপী সাধনার ফলে আমরা ক্রমে তাঁহাকে মানুষরূপে পাঠিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ভগবানের ক্রমে মানুষ হওয়া শ্রীকৃষ্ণগীতার এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব। অজ্ঞাত অবতার মানুষ হইতে ক্রমে ভগবানরূপে পূজা পাঠিয়া থাকেন, অথকট অবস্থা হইতে ক্রমে প্রকট অবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাম অবতারের কথা দণ্ডাঘাতে পাঠে। ইহার মূল রামায়ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা করিবে না। এই কথা পাঠিয়া অবতারের ভগবন্তা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণভাবনী সমাজ একটু কটাক্ষ করিয়া থাকেন, ইহা আমরা জানি। কিন্তু তথাপি অবতারের যে সাধনপন্থা নর হইতে নারীর পদনীতে উন্নীত হইয়া জনসমাজের হৃদয়ে আসন পাঠিয়া থাকেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনীলায় আমরা ইহার বিপরীত দেখি। প্রাচীনযুগের শ্রীকৃষ্ণ বহিঃপ্রকাশ আশ্বাদনকারীদের নিকট ভগবান; যুগান্তব্যাপী সাধনার বিবর্তনে আজ তিনি মানুষ। তাঁহার বৃন্দাবনলীলার দিকে ও চাহিয়া দেখ, কিশোর শ্রীকৃষ্ণের রাস-নীলা এক অশাস্ত্র্য্য ব্যাপার; যে দুই হইতে উঠা দেখিলে, তাহার চক্ষু খানিয়া যাইবে, সেইটাকে অলৌকিক বলিয়াই মনে করিবে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কাছে অমানুষ। ব্রজার কথা স্বরণ কর—সেখানেও ভগবন্তাই পরীক্ষা। বৃন্দাবনলীলার মাঝে বহিঃপ্রকাশে অলৌকিক স্বপরিণতি। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই ধীরে ধীরে অলৌকিক স্বরণ করিয়া শেষকালে পূর্ণপুরি মানুষ হইয়াছেন। বারংবার ছেলে-

পুলে নাতি-নাৎনী নিরা তাঁহার বিপুল সংসার ।  
 কে তখন বলিলে, এই মানুষটি কৈশোরে  
 কুলললনার প্রাণ মজাইয়া রাসোৎসবে প্রাকৃত  
 মননলীলায় বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল ? গোপীনা  
 কচি খুকী, শ্রীকৃষ্ণ কচি খোকা, রাসলীলা  
 একটা ছেলেমানুষী—এমন কবিতা শ্রীকৃষ্ণকে  
 চূর্ণকার করিবার কোনও প্রয়োজনই আশ্রয়  
 দেখি না । কিশোর শ্রীকৃষ্ণ গোপবান্ধবের  
 প্রাণ মজাইয়াছিল, কিশোরীরা মনোহরণ  
 করিয়াছিল, যুগী গোপাঙ্গনায় কুল মজাইয়া  
 ছিল, সমস্ত বৃন্দাবন প্রেমের বজায়  
 ভাঙিয়াছিল—ভাগবতের এই সংজ্ঞা বর্ণনাকে  
 যদি বিশ্বাস না করিতে পার, তাহা হইলে  
 “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ সয়ং” কথাটায় গার দাঁও কি  
 শুধু পঙ্করর মুখে কাঁল পাইয়া ? কিশোর  
 শ্রীকৃষ্ণ বহিঃসদৃশিতে ভগবান্, আবার  
 প্রোঢ়াৱস্থায় তনিত সমুদ্র মানুষ, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ  
 লীলার বিশেষত্ব । বাঁহারা সাধন রাজ্যের  
 নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা  
 জানেন, ভগবানের এইরূপ সমুদ্রের মাঝে  
 মিলাইয়া যাওয়া একটা মর্যাদাপূর্ণ গীতা ও  
 সাধনার চরম সিদ্ধি । শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের এই  
 ধারাটী বাঙ্গালী তত্ত্বের অভিনব গুরুবাদের  
 সিদ্ধি করিয়া এতদিন গুরু-গোবিন্দে অভেদ  
 সিদ্ধান্তে সাধন-রাজ্যের এক নূতন তোরণ-  
 দ্বার উদঘাটন করিয়া দিয়াছিল । ঐশ্বর্য  
 দর্শন বাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন ও ঐশ্বর্যের  
 নিগূঢ় সাধনার সহিত বাঁহারা পরিচিত  
 আছেন, তাঁহারা এই রহস্য অবগত  
 আছেন । এই রহস্য দ্বারা সাধন রাজ্যে  
 বাঙ্গালী উপনিষদের তত্ত্বাভাব তত্বকে  
 আশ্চর্য্য সফলতা যান করিয়া জ্ঞানের গাথ-  
 নাকে প্রেমের সাধনার সহিত মিলাইয়া ধর্মকে

পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে । অধঃপতিত বাঙ্গালী আজ  
 তাঁহাদের পূর্বপুরুষের এই কৃতিত্বের কথা  
 বুঝিবে কি ?

মহর্ষি নারদ যুগ গোপীনা প্রেমে মাহাত্ম্য-  
 জ্ঞানের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, তাঁহর মূল  
 শ্রীকৃষ্ণসাধনার ক্রমিক অভিব্যক্তিকে, ইহা  
 বোধ হয় পাঠক এখন ব্যস্তিতে পানিয়াছেন ।  
 ইহার মাঝে আরও একটু কথা আছে ।  
 গুরুবাদের সঙ্গে না মিলাইয়া হইলে তাহ  
 বুঝা যাইবে না । আমরা সংক্ষেপে তাঁহাই  
 আলোচনা করিব ।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যুগান্তর-  
 ব্যাপী সাধনার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে যে স্তর-  
 গুণি জটিলে পার হইরা আসিতে হয়, ব্যক্তি  
 লাধনাতেও অবলম্ব্য সেও স্তরগুণের সাক্ষ্য  
 পাওয়া যায় । জ্ঞান ও ব্যক্তির পরিণামধারা  
 মূলতঃ এক, ইহা আধুনিক পারিভাষিকী  
 স্বীকার করিবেন । এই কথাটুকু স্মরণে  
 রাখিয়া আমরা ঐশ্বর্যবর গুরুতত্ত্বের সহায়  
 শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তাঁহার সাহিত গোপীনা প্রেমে  
 মাহাত্ম্যজ্ঞানের সম্ভাবনার আলোচনা করিব ।

রাগানুগা মার্গের তত্ত্বগণ সাধনতত্ত্বের  
 আশ্রয় সাধনা করিতে করিতে জ্ঞানান্তরের  
 সূক্ষ্মত বশতঃ ব্রজভাবে লুক্ক হইয়া যখন ব্যস্তিতে  
 পারেন, গুণময়ী সাধন ভক্তি দ্বারা প্রেমভাস্ত  
 লাভ করিতে পারা যায় না, তখন তিনি সর্ব  
 ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রেমিক গুরুর কৃপা  
 ভিক্ষা ও তাঁহার চরণে আশ্রয়সমর্পণ করিয়া  
 থাকেন । গুরু ভক্তের প্রতি কৃপাপরম্প  
 হইয়া সাক্ষাৎ ভজন ক্রিয়া প্রদান করিলে  
 তত শ্রীকৃষ্ণকেই ভগবান মনে করিয়া আপন  
 আপন ভাবমুখীতে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া



থাকেন, তাবাহুগাণে প্রভু, পিতা মাতা, তাই বহু, পুত্র অথবা স্বামী জ্ঞানে শ্রীশুকরই সোণার একান্ত অমুরক্ত হন। ব্রহ্মবিচারী শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রকট লীলায় ব্রহ্মবাদীদিগের মনঃপ্রাণ অপরূপ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাতঃ অমুরক্ত করিয়াছিলেন, প্রেমিক শ্যামোদয় রাগবদ্বৈদেশ্য গুরু ঠিক সেই ভাবে ভাব-লুক শিষ্যের চিত্তবৃত্তি অবধারন করিয়া লন। শ্রীশুক একাধারে ভক্ত ও ভগবান—তাঁহার অন্তরে ভগবান, বাহিরে ভক্তভাব। তাই ভাবপ্রিত ভক্তগণ গুরুদেবকেই ভগবদ্বুদ্ধিঃ চিন্তা করেন, এইরূপ গুরুচেষ্টা হইলে ভক্তের মনোময় সিদ্ধি দেহের ক্রমশঃ পারগুণি হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মবিচার বিশিষ্ট সাধন-সম্পদ।

শ্রীশুকঃ এই প্রকার ভগবদ্বুদ্ধির সাহায্যে ঐশ্বর্য্যবৈশিষ্ট্য কথিত “নরাকারগবত্রঙ্গ”রূপ গুরুর লক্ষণটি পাঠ্য এখানে মিলিটো লউন, “আচার্য্যদেবো ভব” এই উপনিষদের আদেশ স্বরণ করুন, “আচার্য্যো ব্রহ্মগোমূর্তিঃ” এই মনুস্মৃতির আদেশ স্বরণ করুন, তাহা হইলে এই মহত্ত্বের সঙ্কেত বুঝিতে পারিবেন। একই প্রকারে একাধারে নরহ ও ব্রহ্মহো, আরোপ করিতে গিয়া গুণবর চিত্ত প্রথম অবস্থায় বড়ির দোলকের মত উভয় কোটিতে সঞ্চরণ করিতে থাকে। প্রাকৃত মাহুয প্রকৃতদৃষ্টিতে গুরুক যদি তাহারই মত আর এতটী মাহুয মনে করে, তাহা হইলে গুরুতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ন।

কাজেই গুরুর আদর্শ গুরুদ্বারা বিদ্যুৎ রাখিবার জন্ত, আনি যখন মাহুয, তখন গুরু পরব্রহ্ম গুরুঃ এই প্রকার বুদ্ধি রাখাই সঙ্গঃ। এই বুদ্ধিতে সাধনার ক্রমশঃ অগ্রগতি হইয়া নিজের গুণময় তত্ত্ব পরিচয় করিয়া গুরুর সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে। এই প্রকার গুণময় শ্রুতি তত্ত্বাগের দশাতেই ইষ্টে মাহাত্ম্য-জ্ঞান থাকে। প্রয়োজন, নতুবা প্রাকৃতগুণসংস্পর্শে ভাবের মলিনতা ঘট বিচিত্র নহে। গোপীরা নিতাসিদ্ধ প্রেমে এই প্রকার সাধকভিনয়ের আরোপ করিয়াই মহর্ষি নারদ বলিতেছেন, সেখানে মাহাত্ম্যজ্ঞান ছিল, নতুবা গোপীর প্রেম জার প্রীতি মাত্র হইত।

কিন্তু ইহার পরেও অণো কথা আছে। গুণময় স্বভাব পরিচয় করিলে সহজ মাহুযভবের ক্ষুণ্ণিও সাধনার চরম সিদ্ধি। সেই অবস্থাতেই যথার্থ গোপীভাবের বিকাশ। সেখানে গুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ নরাকার পরব্রহ্ম; তিনি সহজ মাহুয। ভক্তও তৎ-স্বরূপতা লাভ করিয়া সেখানে সহজ মাহুয হইয়াছেন। সাধনজগতে এই সহজ নর-নারীর সহজ লীলাতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অগমে র্ত্তী মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে—কিন্তু তাহা দেখিয়া, বিগলিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন—

গেলক উপর মাহুয বসত

তাহার উপর নাই।

মাহুয ভাবেতে বসতি করিলে

তবে সেই মাহুয পাই!



# গৌরীবাঈ

— ৩০০ —

সংখ্যে ১৮১৫ সালে গুজরাতেব অন্তঃপাতী  
জুঙ্গলপুর সহরে ব্রাহ্মণকুলে গৌরীবাঈর জন্ম  
হয়। গৌরীবাঈর পিতা বাহুবল্লভ শাস্ত্রী  
আচর্য্যমণি, জয়সিং, ও শাস্ত্রজ ব্রাহ্মণ  
ছিলেন। সাত নম্র, পাঁচ নম্র, একটীবাত্র  
মেয়ে, তাই ছলে বেলায় গৌরীবাঈর আদব বহু  
সীমা ছিল না। গৌরীবাঈর পাইবা অনেক  
সময় ছেলেমেয়ে ভয়ানক আশ্রমে ও ছুঁত  
তটরা উঠে। কিন্তু গৌরীবাঈর স্বভাব স্নেহ  
ছিল না। শতশ্রুত সন্তানতার সচিত তাগাব  
মুখে এমন একটা গাভীরিণে তাই মামিন  
ছিল, বাহু দেপখা মনে হত যখন একটা  
বা লকার দেহে কোনও বর্ষাগী গাভীর-  
গেনিনী ব্রহ্মবাদিনীর আবর্তাব হইয়াছে।  
শাস্ত্রী মহাশয় সমস্ত সময় কতাব মুখেই  
অন্যমেয় নরনে চাহিয়া থাকিতেন আর তাগি-  
তেন, “এ কি মেয়ে, না যথার্থই গৌরীবাঈ  
মায়ের আখার শিখের মত বদ, পাতব  
কোথায়?”

কিন্তু মেয়ের বিবাহ কটনাখা হইলেও এ  
দেশে কখনও বরের অভাব হইয়াছে, এমন  
কথা উচিতসে লেখে না। যথা সময়ে গৌরী-  
বাঈর বর জুটিয়া গেল। পূঁচ ১৮১৭ বরসংকুল-  
প্রাণজুবাণী গৌরীবাঈর বিবাহ হইয়া গেল।  
আধুনিক চারতাব এখানে হস্ত বাণ্য  
বিবাহের দোষকর্তন সুখ হইয়া উঠিলেন।  
কিন্তু উপাখ্যক ? ছেড়শ ১৮১৭ পূঁচের বলা  
বিবাহের দোষকর্তন লগ্নী মায়ের এত মাথা মাঠ-  
ইত না—আবহমানকাল সমাজে বাহা চলিয়া

আসিয়াছে, বিনাবাক্যব্যক্ত তাহাই মানিয়া  
হইত। ইতিবাচকিগত স্বখ্যাগৌরীবাঈর  
বাঈ হইত না কেন, সমষ্টিগত সমাজনীনে  
যে তাহার কোনও সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যাচ্ছত,  
তাহা বল যায় নী। এ বাহা হইত, দেশচার  
অগ্রহারই শাস্ত্রী মহাশয় পাদবৎসরের মেয়ে  
বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু মনেপ্রাণ নিশ্চিন্ত  
হইতে পারিলেন না, একটা আনন্দত আশঙ্কা  
কিটার মত তাগাব বুকে বিধিয়া রহল।

আট দিন বাইতে না বাইতেই আশঙ্কার  
কল দেখা দিল, গৌরীবাঈ বিধবা হইল। গৌরী  
ছলে মাতৃধ, গৌরীবাঈর অর্থও যেমন সে বুকে  
নাচ, বিধবা হওয়ার দুঃখও তেমন বুলিল না।  
কিন্তু গৌরীবাঈর মাতা এত আকস্মিক নিপৎনাতে  
একবারে লগ্নীগ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ও  
কাতর হইলেন বটে, কিন্তু কতাব তাগাব  
তাগিয়া তাহার দুঃখ অনেকটা চিত্তা গভীরতর  
হইল।

একটা লগ্নী জীবন না বাঁধিয়া দিলে  
তাহাকে পঁচাণনা করা অসম্ভব হয়। পূঁচের  
জীবনে বৈ চতুর্ভাষ গভাণনা আছে, তাই তাহার  
লগ্নী দে নিজেও বাঁছা লগ্নী পাণে, আশ্র  
রেন অভাব সেতওটা গুণতরক্ষে অগ্রতব  
করে না। কিন্তু নারীর জীবন আমাৎকর্ষণে  
শূন্যলত, পোড়া হইতেই বতঃপর্বাণ্ট একটা  
অবগদন না দিলে তাগা হর্ষ ও অকলাপকর  
হইয়া উঠে। বিধবার ব্রহ্মচর্যা শাস্ত্রের বিধান,  
কিন্তু সে বর্ষানকে সকল কারবারে চোটা  
সমাজে কোথায় ? শুধু এই দিকদ্বারা শাস্ত্রের

স্বাধীনা স্বার্থ ভাবে রক্ষা করিয়া চলিলে  
নারীরা জীবনে সুখের বিশাল বহিরা বাইতে  
পারিত, কিন্তু সে কথা চিন্তা করে কে ?

শাস্ত্রী মহাশয় সুপণ্ডিত অধ্যাপক। পাঁচ  
বৎসরের কল্যাকে তিনি স্বার্থাতি ব্রহ্মচর্য্য  
ব্রতে দীক্ষিত করিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত  
করিলেন। ইহাতে ঘরে বাহিরে একটু গুঞ্জন  
উঠিল বটে, বিজ্ঞেরা এমন মন্তব্যও প্রকাশ  
করিলেন, “এ যেন একটু খাড়াবাড়ি; মেয়ে  
ঘরের কাজ করবে না পণ্ডিত হবে ?”—কিন্তু  
শাস্ত্রী মহাশয় আপন সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন।  
তিনি বলিতেন, “কি হলে, কি মেয়ে,  
শিক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। শিক্ষা  
বলিতে দেহ, মন ও আত্মার সম্যক স্ফুর্তিই  
বুঝি। বিশেষতঃ যে শিক্ষা বর্ণের সকল না  
হইত, তাহার সুখ কি ? ছেলেরা কেবল  
পড়িবে, কাজ শিখিবে না—এও যেমন শিক্ষার  
উদ্দেশ্য নয়, তেমনি মেয়েরা কেবল কাজই  
শিখিবে, মনের উৎকর্ষ করিবে না—ইহাই বা  
কেমন কথা ? ছেলের উপনয়ন যেমন একটা  
সংস্কার, মেয়ের বিবাহও তেমনি একটা  
সংস্কার। গুরুগৃহ বাস পণ্ডিত অর্থও ব্রহ্মচর্য্য,  
শুক্লসেবা ও শাস্ত্রাভ্যাস যেমন শালকের আঁঠু  
কন্তব্য, বিবাহবনের পূর্বে পর্য্যন্ত মেয়েদের  
পক্ষেও ঐকি তেমনই পূর্বে নারী শিক্ষার  
ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্যস্থান যাবা  
ছেলেদের আশ্রয় যেমন আশ্রয়রক্ষা করিতে  
শিক্ষা দিত—কুমারীজীবনে, বৈধবা জীবনে,  
এমন কি বিবাহিত জীবনেও মেয়েদের  
তেমনই আত্মস্বাধীনা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে  
হইবে। স্বার্থাতি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গলনই তাহার  
প্রথম উপায়। তাহার ভিত্তি সহ বলিতে-

ছেন, “কল্যাণের পালনীয়া শিক্ষণীয়তি-  
ব্রহ্মঃ।”

গৌরীর অকালবৈধব্য যেমন তাহার সং-  
সার সুখের সমস্ত আশা নিশ্চল করিয়া দিল,  
তেমনি তাহার আত্মমুক্তির পথও প্রাপ্ত  
কারণ দিল। গৌরীর পিতা এত কথা শ্রবণ  
রাখিয়াই কল্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে  
লাগিলেন। ইহাতে সংসারের আর দশজনের  
সহিত গৌরীর তেমন মেলামেশার সুযোগ  
হইত না। কিন্তু বাস্তবিক, হঠাৎই তাহার  
চারজে যে গাভীগ্রন্থ ও একান্তবাসা প্রসন্নতা দেখা  
বাইত, তাহাতে পিতার এই আপাতকঠোর  
ব্যবস্থা তাহার নিকট কিছুমাত্র গীড়ানাদক  
মনে হইল না। অধ্যয়নের প্রতি গৌরীর  
অসাধারণ অগ্রসার ছিল, পিতাও যত্ন কারণ  
মেয়েকে সংস্কৃত শিক্ষাদলেন এবং টীকাভাষ্যাদি  
সহ গীতা, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি পাঠ  
করাতে লাগিলেন। সাধারণতঃ আমাদের  
দেশের মেয়েদের নাকট ছোটবেলা হইতে  
সংসার চক্রকেই খুব উজ্জল করিয়া আঁকা  
হয়, নারীজীবনের যে অল্প কোনও মাৎসা  
থাকিতে পারে, তাহা মোটেই ধারণা করিতে  
দেওয়া হয় না। গৌরীর পিতা এই প্রচলিত  
আদর্শ পরিচয় করিয়া কল্যাকে প্রাচীন  
যুগের ব্রহ্মবাদিনীর আদর্শে উজ্জ্বল কারণ  
ভূমিতে লাগিলেন। কল্যে ব্রহ্মোদয় বর্ষীয়া  
কিশোরী গৌরী চরিত্রের মাধুর্য্যে, গাভীগ্রন্থে,  
শালীনভায়, পাণ্ডিত্যে ও তপস্চর্য্যায় সকলের  
নিম্ন উৎপাদন করিল। গৌরীর খ্যাতি  
কথা শুনিয়া নগরের মহিলারা শুধু তাহা  
দেখবার জন্য তাহার সুখের গুটি কথ  
তথ্যের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে আসা  
গোনা করিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত সময় বহিরাংশী মহাশয়  
কৃত্যকে যোগ্যভাবে নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষা  
ও পারিপার্শ্বিক অল্পকূল হওয়াতে, গৌরী  
তাঁহাতে আশ্রয় সফলতা লাভ করিলেন।  
গৌরী নাজিব নানা সদৃশপন কণা দূর দূরান্তর  
চড়াইয়া গড়িল। এই উপনিয়োগ অত্যাশ্রয়  
তপস্কাব কাহিনী ক্রমে দেশের বাতা শিব-  
সিংহও শুনিতে পাইলেন। কৌতূহলবশতঃ  
তিনি গৌরীকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার  
অগাধ পাণ্ডিত্য, সবেল বাগতাব ও মধুর উপদেশ  
দেখিয়া-ভুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পেলেন।  
গৌরীও প্রতি তিনি এতদূর আকৃষ্ট হইলেন  
যে সস্ত্র সস্ত্র মুগ্ধা বার করিয়া একটি মন্দির  
ও পুষ্কিনী করাইয়া তাঁহা গৌরীর নাম  
উৎসর্গ করিলেন। ১৮৮৩ সংখ্যে গৌরী এই  
মন্দিরে ইষ্টমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহ্য সমস্ত  
সংস্রা ত্যাগ করিয়া সেইখানেই বাস করিতে  
লাগিলেন। তথা তাঁহাব, বয়স মাত্র ২০  
বৎসর। তাঁহার উপদেশে বাতা শিবসিংহ  
মন্দিরের পাশে একটা ধর্মশালা নিৰ্ম্মাণ কবা-  
ইয়া সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের যথা-  
নীতি সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বহু-  
দূর হইতে কত লোক গৌরীনাট্যকে দর্শন  
করিতে তাঁহাব উপদেশ শুনিতে আসত;  
তাঁহার এই ধর্মশালাতেই অশ্রয় লইত এবং  
গৌরীর মাধেব মন্ত্র আচরণে মুগ্ধ হইত।  
তাঁহার উপদেশ লাভে কুসংস্কার হইয়া গৃহে  
বিরিয়া বাতত। গৌরীনাট্যের উপদেশে এই  
সরল ও সহজ বোধ ছিল যে তাঁহা মদ্যমোহ-  
পাথার পণ্ডিত হইতে অশিক্ষিত কৃষকের  
করকে পর্যন্ত সমভাবে স্পর্ষ করিত। অথচ  
এরূপে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য  
ছিল। শাস্ত্রজ্ঞানের সাক্ষ্যে সাধনের দৃষ্টি  
হওয়াতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

এমনি করিয়া আরও কিছু দিন কাটিয়া  
গেল। গৌরীনাট্য সাধনার পথে ক্রমশঃ  
সব চর্চা লাগিল। কিন্তু ম'দ্যেব পক্ষত  
চেষ্টার একটা সীমা আছে। বিশেষতঃ  
সাধনবাজ্যে—সেখানে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি  
বস্তু লইয়া সূক্ষ্মতের কানবার—সেখানে একজন  
দিশারীর বড়ই প্রয়োজন হয়, নতুবা কোন্টা  
সংস্কার আর কোন্টা সত্য, সে সত্যকে অনুমিত  
হওয়া যায় না। আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা অনেক  
কেই বলিয়া থাকেন, সত্যের পক্ষে ভিতরের  
আলোকে পূর্ণ চিনিয়া চলিল, সেখানে আর  
বাহির চর্চাতে লঠন ধরিলার লোক লাগিলে  
কেন? শিষ্ট সদ্ধানী মাত্রই জানেন, ওটা  
বুদ্ধিবৃত্তি জগৎবস্তুর কণা; খেটাকে সে ভিত-  
রের আলোক বলিতেছে, সেটা বাহিরের  
আলোকে মতক কি না, তাই অন্তরবাজ্যের  
হিসাবে সেটা বাস্তবিক আলোক না আধার,  
তাঁহাব নির্ণয় কবে কে? তাই কে একজন  
দিশারীর প্রয়োজন, সে শুধু বাহিরের-লঠন ধা-  
বে, ভিতরে আশ্রয় ধরাইয়া দেয়। বুদ্ধিদিয়া  
মাত্রই কি কখনো এই চতুর্দিকে চিনতে  
পারিয়াছে? বৈদিক যজ্ঞের কথা শ্রবণ কর।  
দেবতাব অগ্নিচন, আপ্যায়ন, স্নাত ক্রি-  
তেছেন তিন জন ঋষি; মাত্র শ্রবণ করিয়া  
তত্ত্বমর্মে অন্তঃপ্রবেশাবশ্যক; তাঁহার কাণ  
কোঁরয়া বাইতেছেন, গাতিবেদ্য কাহারও  
উপদেশের অপেক্ষা রাখিতেছেন না। কিন্তু  
চতুর্ধ বুদ্ধিক্রিয়া, পার্শ্ববর্তী পদতই  
দেখিতেছেন। যখন যে কাজটা হাতে আসি-  
তেছে, অর্পণ বুদ্ধিক বা তাহা ধরিয়া একবার  
ক্রমের সুখের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,  
“মজ্জুহি”। “মজ্জা” বলিতেছেন, “মজ্জা”—  
আর এই অজ্ঞানোদয়ের নিষ্ঠুরতা অস্তঃপ্রবেশ

অল্পকাল পরেই আকার ধারণ করিয়া উঠিল।  
নির্ভয়ে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। অগাধ-  
কণ্ঠে অত্যন্ত স্বাভাবিকের ন্যায় বাক্যবল  
বৈদিকযজ্ঞের মত এমনি একটি দিশারীর  
প্রবোধন কর, নতুবা "বেলাশেষের শেষ  
ধ্বংস" গানে পলাত একটা সংসারের অর্থ  
খাতিয়া যায়।

প্রায়শ্চিন্তের কথাটা উঠিয়া বলিয়াই এতটা  
বলিয়া। নতুবা গৌরীর মন যে স্থির  
থায় এমন কষ্টকার ধরিতা ছিল, তা বলিতে  
পারি না—কেননা সে ছিল স্বাভাবিক যুগ।  
আমি এমন অস্থিরতার যুগ। সে যাই হউক,  
নিজের চেষ্টায় এত পিতার যত্ন তিনি যত-  
দূর করিয়াছেন, ইত্যাদি পুত্র সে আরও  
কিছু করিয়াছে। তাঁরা তিনি সর্বদা  
অমৃত্যু কবিতাভিগেন, কিন্তু পেশানকার  
সকল তাঁকে কে বলিয়া দিলেও শুক  
বুজিয়া নাহির কথা নানা কারণে তাঁর পক্ষে  
সম্ভব নয়। তবে তাঁর প্রাণের আকুলতা  
দেখিয়া ভগবান যে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর নিকটে  
আবির্ভূত হইলেন, বিবিধ শাস্ত্রাঙ্গোচনার  
এ নিজের সাধনসকল প্রতিজ্ঞার একপা তিনি  
নিশ্চিতরূপে বুঝাছিলেন। তাঁর য-  
শালার অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইল,  
অধিকাংশই তাঁর সঙ্গী। তিনি সক-  
লকেই বখাওয়া সাধুর পণ্ডিত্য করিতেই,  
কি জানি, ইচ্ছার দ্বারা কে তাঁর সাধন  
কর, তাঁকে জানে।

—কাল সাধুদের একটি গণ্ডা বাতিনী  
বর্ণনালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁদের  
দ্বারা একজন অতিশয় ভেজঃপূর্ণতার সন্ন্যাসী  
ছিলেন। তাঁর দিকে পাইয়াই যাত্র  
গৌরীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি আর সে

দিক দূরে চকু ফিরাইতে পারিলেন না।  
সন্ন্যাসী গৌরীকে দেখিয়া মুগ্ধ মুগ্ধ হাত  
কবিতাছিলেন, এখন তাঁর তব্দ অমৃত্যু  
দেখিয়া "অমৃত্যু সত্যের উত্তমকে কাছে  
ভাকলেন। গৌরী নিগলিত স্বরে তাঁর  
চরণে লুপ্ততা পড়িলেন। সন্ন্যাসী সত্যের  
তাঁর হস্তকে চন্দ্রার্ণব করিয়া কাঁপলেন,  
"গৌরী, আমি আসিয়াছি। তুমি যে তাঁর  
জান না—দেখাচ্ছে তাই তাঁর জানিতে  
আসিয়াছি। মীরান ভাণ্ডার জ্ঞানের দিক  
দিক দিয়া যে অমৃত্যুপূর্ণতাটুকু মিলে, তাঁর পূর্ণ  
করিবার জন্যে আমার তোমাকে আসিতে  
হইয়াছে। আমিত তোমার সাধনাকে পূর্ণ  
করিয়া দি। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

গৌরী সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসীর অমৃত্যু  
কবিতা। সন্ন্যাসী তাঁকে লইয়া মন্দির  
মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাঁড় করিয়া দিলেন।  
উভয় মন্দির কি কথাবার্তা হইল, তাঁরা  
কেউ জানিল না। সন্ধ্যার পরে কোন সাতা  
অজানা পাঠা সকলে ছাট খুলিয়া দেখিল,  
গৌরীসন্ন্যাসী সন্ন্যাসীর অবস্থার উপস্থিতি, তাঁর  
কোলে একটি অতিশয় বালগোপাল বিগ্রহ;  
কিন্তু মন্দির মধ্যে সন্ন্যাসীর কোনও নিদর্শন  
না। সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য  
হইয়া গেল। প্রকার, সন্ধ্যার শেষেই ছাট  
কিছুকাল সকলে বাতির দুইখা আলি।

সেই দিন রাত্রে গৌরীসন্ন্যাসী প্রায় আপন  
আগনে সমাহিত থাকিতেন। ক্রমে তাঁর  
স্নানি এতখানি আরও হইল যে তিনি এক  
পক্ষ কাল পক্ষি একাসনে সমাহিত হইয়া  
থাকিতেন। সেসকল এই সময়ে তাঁর  
কৃত্রিম করে ডালা লাগাইয়া রাখিত, কেহ  
তাঁরকে বর্ণন করিতে পারিত না।

সংবৎ ১৮৬০ সাল পর্যন্ত গৌরীবাহী এইরূপ প্রারম্ভঃ সমাহিত অবস্থায় তাঁহার স্বগ্রামেই কাটাইয়া দিলেন। গুরুশ্রমত বালগোপালের সেবা তান বহুস্বেই করিতেন। যখন অশক্ত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের কন্যা চতুরীবাহী বিগ্রহের সেবা করিত। এই বালিকাটি ছোটবেলা হইতেই গৌরীর একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহাকে ধরিয়া রাখা যাইত না—মন্দিরের কাজ, ধর্মশালার কাজ, গৌরীবাহীর সেবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিত। গৌরীও তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া এই মেয়েটিকে আপনাম মনের মতন করিয়া গাড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

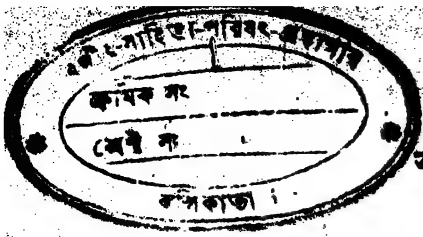
ক্রমে অধিক লোক সমাগমে গৌরীবাহী বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চতুরীর হাতে সমস্ত ভার সঁপিয়া দিয়া ১৮৬০ সংবতে তিনি তীর্থযাত্রার বাহির হইয়া পড়িলেন। গৌরী জয়পুর সহরে উপস্থিত হইলে জয়পুরের মহারাজ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়া আপনায় রাক্ষ্যে তাঁহাকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরী তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফিরাইয়া দিলেন। মহারাজ সেগুলি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়কে বিলাইয়া দিলেন।

জয়পুর হইতে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গৌরী কাশীতে উপস্থিত হইলেন। কাশীতে আসিয়া গৌরী নিরঞ্জন-বাসের ইচ্ছায় গঙ্গার তীরে একখান ঘর বাধিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কাশীর রাজা সুলতানসিংহ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া বিপুল সংকার পূর্বক পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা উপহার দিলেন। গৌরী বিরক্ত হইয়া কাশী ছাড়িয়া ত্রিক্ষেত্র অভিমুখে চলিয়া গেলেন। ত্রিক্ষেত্র হইতে রামেশ্বর ও তথা হইতে ভারতের অন্তান্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গৌরী আবার কাশীতে উপনীত

হইলেন। কাশীতে কিছুদিন থাকিয়া আবার তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

গৌরীর অবর্তমানে চতুরীবাহী তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজ পরিচালনা করিয়া ছিলেন। ইহাই হইল তাঁহার অন্তিমপরীক্ষা। একদিকে আত্মীয় স্বজনদের নানা উৎপীড়ন, অপর দিকে সমস্ত কঠোর আত্মনিয়োগ—এই উভয়ের মাঝে পড়িয়া চতুরীকে বড় বিরক্ত হইতে হইত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই তাঁহাকে গৌরীবাহীর আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌরী চতুরীর শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ করিয়া মনোনিবেশ করিলেন। আধার উপযুক্ত ছিল, স্মরণ্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। গৌরী যখন বুঝিলেন চতুরী তাঁহার ভারবহন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছেন, তখন নিশ্চিত হইয়া মন্দির, ধর্মশালা, বালগোপালের সেবা ও লোকশিক্ষার ভার তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া সংবৎ ১৮৬৫ সালে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করিলেন।

গৌরীবাহীর কবিত্বপ্রতিভাও অসামান্য ছিল তাঁহার অধিকাংশ কাব্যতাই অশ্লীল ভাষায় প্রতিপাদক, অথচ বর্ণন ভঙ্গীতে অতি সরল ও সুকুমার ছিল। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, “আত্মা অখণ্ড আবেন জাবে, জন্ম নহী তো ফির মরনা ক্যা।” বাস্তবিক এই ব্রহ্মবাদিনী ভগবিনী স্বাভূতভিত্তি মহিমায় চিরকাল আমাদের মাঝে অমর হইয়া রহিয়াছেন। সুশিক্ষা ও সং আদর্শে পরিচালিত হইলে বৈধব্যজীবনও যুগ হুঃখের হয় না, গৌরীর জীবন কথা তাহার জলন্ত প্রমাণ।



## সুখ-দুঃখ

সাংখ্যের চতুর্বিধের প্রথম ব্যূহ হচ্ছে দুঃখ। অর্থাৎ দুঃখকেও জীবনে একটা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে, দুঃখ কি, তাও চিন্তে হবে। সাধনার এই হচ্ছে প্রথম পাঠ। বাস্তবিক দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিপর্যস্ত। খাই দাঁট, রোগগান করি, ছেলেপুলে নিয়া সংসার করি, মনে ভাবি, বেশ আরামে আছি। চিন্তের এই নিশ্চিত অবস্থার পরকালের কথা, জন্মান্তরের কথা, দুঃখের কথা বা মুক্তির কথা মানুষের মনে আসতেই পারে না। সাধনা কাকে বলে, সাধনলক্ষ্য আর্ধ্যপতায় বা কি, আরাম শয়নে শুয়ে তা কখনো বোঝা সম্ভবপর নয়। তাই সাংখ্যকার বলছেন, বুদ্ধদেবও তাঁর প্রতিধ্বনি করে বলছেন, সত্য লাভ করতে হলে আগে দুঃখের ভোরগন্ধার পার হয়ে আসতে হবে। দুঃখ কাকে বলে, তা বিশেষ করে অনুভব করতে হবে; বন্ধনজালার প্রাণে ছটফট করলে তবে না তা হতে মুক্তির পিপাসা জাগবে। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে এই দুঃখ বোধের দর্শন বিশেষ করেই বুঝিয়েছেন। দুঃখের স্বরূপবোধ সম্বন্ধে তাঁর একটা উপমা বড় সুন্দর। তিনি বলছেন, যেমন মানুষের ক্ষেত্র এত সুকুমার স্পর্শপ্রাণ যন্ত্র যে তাতে একটা মাকড়সার তাঁত পর্য্যন্ত ছোঁয়ালে ব্যথা হয়, তেমনি বিষয়সংস্পর্শ হতে চিত্তকে নিম্নুক্ত রেখে তাকে এমন সুকুমার করতে হবে, যাতে বিষয়ের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াতেই দুঃখের অহুত্ব চিন্তে তীব্র হয়ে ওঠে।

‘দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের বিপর্যস্ত ভাব হচ্ছে চিন্তের চঞ্চলতায়। চঞ্চল চিত্ত বিষয়সংগ্রহের দক্ষণ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভর করে রয়েছে। ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপূর্ণ, বিষয়ও অনিশ্চিত; সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগে চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তির মাত্র উদয় হচ্ছে। এই ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই আমার সুখ বলে মনে নিতে অভ্যস্ত। এর বিপরীত সুখও আছে— চিন্তের নিশ্চল অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের নিরোধে। কিন্তু অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি তো তাতে স্বস্তি পাবে না। সে ছটফট করতেই ভালবাসে, যদিও সে জানে ছটফট করে যথার্থ সোয়াস্ত নাই। বিষয়ীর চঞ্চল চিত্তকে ধ্যানে তন্ময় হতে বল, তাতে সে হাঁপিয়ে উঠবে। অথচ নানা জ্বালাযন্ত্রণার হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য সে চিরকাল নিশ্চিন্তই আশ্রয় খুঁজে এসেছে। মনের জ্বালা নিটাবার জন্য সে ঘুমের বা নেশার কোলে ঢলে পড়তে রাজী, কিন্তু তবুও চিন্তের একাগ্রতায় বা ধ্যানতন্ময়তায় তার স্বস্তি নাট। ইন্দ্রিয়সেবার এই হচ্ছে বিপরীত শাস্তি। চঞ্চলতাতে সুখ নাই জানি, অথচ তন্ময় হাত হতে বাঁচবারও তো পথ নাই। এ অবস্থায় বিষয়সংস্পর্শই তার পক্ষে সুখ, বিষয়বিরতি দুঃখ। সংসারের পক্ষে সুখ-দুঃখের এই হচ্ছে মাপকাঠি।

কিন্তু বিবেকীর সুখ-দুঃখের সংজ্ঞা ঠিক এর বিপরীত। তিনি বলবেন, বাসনার ক্ষয় হতে, বিষয়বিরতি হতে, চিন্তের নিস্তরঙ্গ ভাব হতে—যে অহুতম সুখ, সংসারে

তার শতাংশের একাংশও তো মিলতে পারে না। খুব ভাল 'ওস্তাদের কাণে' সুরের একটি পর্দা ভুল হয়ে গেলে যেমন গানের সমস্তটা রসই মাটি হয়ে যায়, বিবেকীর কাছে বিন্দুমাত্র বিষয়সংস্পর্শজনিত চিন্তের ক্ষোভও তেমনি পরম দুঃখের নিদান। তিনি চান, নির্ঝাঁপ দীপশিখার মত চিত্তকে সমস্ত বিকার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে। এই নির্ঝাঁকর অবস্থাই তাঁর পক্ষে সুখ, বিকারমাত্রই দুঃখ।

তা হলেই দেখি, সংসারী ও বিরাগীর সুখ-দুঃখের আদর্শ একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার এর মাঝে রহস্য এই, যে যে ভূমিতে আছে, সেই ভাবে, আমি বেশ আছি। বিষয়ী বিষয়সংস্পর্শই গোয়ে, বৈরাগ্য বোঝে না, বৈরাগী আবার বিষয়-বিরতিই বোঝে, সংসার বোঝে না। বিষয়ীর সুখ চিন্তের একটা পরিণাম, আবার বৈরাগীর সুখও তাই—এই হিসাবে যদি বিচার করি, তাহলে 'উভয়ের সুখের পরিমাণগত কোনও তারতম্য ধরে, আদর্শের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করা চলে না। কিন্তু শুধু সুখের পরিণাম ধরেই তারতম্য নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় না; কেন না, বিষয়ী ও বিরাগী উভয়ের সুখের স্বরূপ আলোচনা করতে গেলেই বিচার এসে পড়ে। তখন প্রজ্ঞার সহায়তা ছাড়া উভয়ের সুখের স্বরূপের আত্মাদের আর কোনও উপায় থাকে না। তাহলে এই দুটি আদর্শের যথার্থ বিচারক হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বলে, পরিমাণ যাই থাকুক না কেন, বিষয়ীর সুখ যে চিন্তের চপলতা হতে উৎপন্ন এবং এই চপলতা হতে মুক্তি পাবার মাত্র বিষয়ীর অন্তরের অন্ততলে

একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা রয়েছে, এই হতেই তো প্রমাণ হয়, বিষয়ভুরঞ্জিত সুখ অপেক্ষা বিষয়বিরতির সুখই উৎকৃষ্টতর। কেন না চরমে বিষয়বিরতির দিকেই সবার চান—সেইখানেই সবার বিশ্রাম। বিষয়ী নিজের ক্রেড়ে আত্মসমর্পণ করে, যে বিশ্রাম পেতে চায়, সেই বিশ্রামই বিরাগী চান, চির-জাগৃতির পরম জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে।

তা হলে এই বিরামসুখের প্রতি বিষয়ী ও বিরাগী উভয়ের লোলুপতা হতেই উভয়ের আদর্শের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিরূপিত হবে। দেখতে হবে, কার বিশ্রান্তি শাস্ত, কার বিশ্রান্তিতে ভোগের উৎকর্ষ। পূর্বেই বলেছি, চপলতার বিশ্রান্তি অবসাদে, দৈনন্দিন নিদ্রা তার প্রমাণ, মৃত্যুর আবর্তন তার সাক্ষী। কিন্তু চিত্তকে নিগর করে তাকে জাগ্রত রেখেই যদি তার বিশ্রাম সুখের আয়োজন করতে পারি, তা হলে সেই সুখই কি উৎকৃষ্টতর হবে না? অবসাদে যে বিশ্রান্তি আসে, তাতে বিষয়সংস্পর্শ হতে বিচ্ছেদ ঘটেই। সার্বজনীন বিষয় চর্চা করে তারই অবসাদে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার বিষয় সংযোগ থাকে কোথায়? যে বিষয় তার এত প্রিয় ছিল, প্রকৃতির অগজ্যা নিরমে তার নিকট থেকেও তাকে ছুটি নিতে হয়। মৃত্যু-রূপী জীবনান্তকর অবসাদেও ঠিক তাই ঘটে। কিন্তু চিত্তকে বিষয়বিরত অথচ সজাগ রেখে যে বিশ্রাম, তাতে বিষয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবার তো কোনও কারণ থাকে না। বিরাগীর চিত্ত তখন বিষয় চায় না, কিন্তু বিষয় তাকে চায়; প্রকৃতির দৃষ্টি বিষয়ের উপর স্তব্ধ না থাকলে তার ক্ষুধি হবে কোথা থেকে? বিষয়ী বিষয়কে চায়, কিন্তু পায় না;



বিরাগী বিষয়কে চায় না, কিন্তু পায়। চিত্তের পরিণামদশায় উত্তরের সুখের আদর্শের তার-তম্য ন বুঝে পারলেও পরিণামদশায় কিন্তু সে ভেদটুকু সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে ওঠে। এরপরেও কি আর সুখের বস্তুতে হবেন, কার সুখের আদর্শ উৎকৃষ্টতর ?

সুখ-দুঃখের আদর্শ বিচারে বিষয়ীকেও একটা পক্ষ করার উদ্দেশ্য আছে। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মানুষ যেমন বিষয়কে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, দার্শনিক বুদ্ধিতেও তেমনি তার সত্যের একটা সার্থকতা পাওয়া যায়। প্রথম হয়, বিষয়বুদ্ধিকে বৈরাগী নিন্দা করে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না; কেন না বিষয়সুখ যতই কণিক হোক না কেন, তা যে সুখ, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই; আর বিষয় কণিক হলেও তার সত্যকেও অস্বীকার করবার উপায় নাই। কণিক সুখকে কণিক বলে নিন্দা করা যেতে পারে, তাকে ছেঁয় বলা যেতে পারে, কিন্তু কণটবচিৎ্রা যখন প্রবাহের আকার ধারণ করে অপরূপ তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করে, তখন তার সুখমাকে তো প্রত্যাহ্বান করা চলে না। এই দর্শন হতেই লীলাবাদের উৎস। নিত্যবাদী বলছেন, 'জগৎ উড়িয়ে দাও, ওর সবটাই চকল, নখর; লীলাবাদী বলছেন, তা কেন, ও নিত্য চিন্নপুরুষেরই লীলা সুখ দুঃখ তাঁরই দান, সংসার তাঁরই অপরাধ। সমতার নির্বাক, একে ছেড়ে যাবে কেন, বাবেই বা কি করে ?

বাদ চতুর্দশনারের দিক দিয়ে দেখি, তা হলে বুঝতে পারি, দুই পক্ষের কথাতেই সত্য আছে। যদি ছুটি সত্যই সত্য হয়, তা হলে বলতে হয়, এ হচ্ছে একই তত্ত্বের দুটি

বিভাব; প্রকৃতির সহজ প্রেরণাবশতঃ কেউ চায় বিষয় বর্জন করে সুখ পেতে, কেউ চায় বিষয় নিভরে সুখ নিতে। তুমি দোষ দেবে কার ? কিন্তু পুকেই বলেছি, যদি চরম পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করা হয়, তা হলে বলতে হয়, বিষয়ীর শেষ দশায় চেয়ে বৈরাগীর শেষ দশা উৎকৃষ্ট, অতএব বৈরাগীর আদর্শই শ্রেয়। কিন্তু তা হলেও এই প্রশ্ন থেকেই যায়, এই আপাত-দৃশ্যমান সুখ-দুঃখে গড়া জগৎটার কি উপায় হবেন ? এর সঙ্গে বৈরাগীরও তো একটা যোগ থাকা প্রয়োজন। যে প্রকৃতি আশ্রয় করে এই জগতের বুকে সে ফুটে উঠেছিল, তাকে নিরোধ করে নির্কাসিত করে সে পরম সত্য লাভ করেছে—কিন্তু প্রকৃতির সত্য বিলোপ তো তাতে হবার নয়। সাংখ্যকার জবাবে বলেছিলেন, প্রকৃতি একজনের সম্বন্ধ কৃতার্থা হল বটে, কিন্তু অপরের সম্মুখে তার মোহিনী মায়ী বিকাশ করতে বাধা কি ? অর্থাৎ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা বহুত্ব আমাদের জীব জগতের বিনিয়াদ, তাকে তিনি সাধনার শেষ লীলা পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাই আপাততঃ প্রকৃতির নিরাসনে তিনি কৃতার্থতা লাভ করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু নিরোধ মানেই তো বিলোপ নয়; আজকে যাকে চেপে রেখেছি, সমগ্র সত্যের হিসাব যেদিন হবে, সেদিন তাকে তার জায়গা স্থান তে দিতেই হবে। তাই নিরোধটা আত্যন্তিক হতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় থেকেই যায়। বিশেষতঃ বহু আত্মাবাদী আত্মার আত্মার সমাহৃত্তির কথা সম্বন্ধে কি জবাব দিবেন ? অহৃত্তির সাম্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আত্মার সংখ্যা করা কি সম্ভব।

যদি বল, সর্কারের ভারভয়ে ভেদ হবে, তাও তো সম্ভব নয়, কেন না সংস্কারকে নিরোধ করা তোমার লক্ষ্য। বাক্যে তাক্ষিরে দিলে, তাকে দিয়ে সীমা আগলানো চলে কি করে ?

নিরোধবাদ বা নাস্তিবাদের উপর এই আপত্তির মীমাংসা হয় বেদান্তে। বেদান্ত বশেন, হী, ক্ষুদ্রতা, সর্কারীতা পরিহার করা প্রয়োজন বটে ; বিষয় বৈরাগ্যও অপরিহার্য। কিন্তু এ তার পথ নিজকে সঙ্কুচিত করে নয়—নিজকে বিস্তার করে। মনে কর, চোখের সামনে বিষয় উপস্থিত রয়েছে ; তার বিচার হতে আত্মরক্ষা করতে হবে। তার দুটো পথ আছে ;—তর চোখ বুজে থাকতে পারি, মনকে শূন্য করে রাখতে পারি, নয়ত চোখ মেলে থেকেই বিষয়ের অভিঘাত অটপ হয়ে সহিতে পারি। এর তত্ত্বটা এই - চিত্ত আর বিষয়, ঠিক এই দুটির মাঝে নিচ্ছেদরেখা টানতে হবে। এ শুধু মননশক্তি বগেই সম্ভব। তাতে বাটরের বোগাযোগ কিছু থাকতে পারে বটে। নিরোধবাদী মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেও রুদ্ধ করলেন, ভূমাবাদী ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন না, কিন্তু তার রসগ্রহণে নিরত থাকলেন মাত্র, তাঁকে মননশক্তিরই পূর্ণ সহায়তা নিতে হল। নিজকে সঙ্কুচিত করলে আত্মহার নয়, কাজেই বিষয়ের অভিঘাত হতে আত্মরক্ষা—এই অমূল্যত্বের প্রকৃতির মায়াজালে বিস্তারের সঙ্গে তাঁকেও বড় হতে হবে। এ-ও বন্ধন মুক্তি। এখানে বাহ্য সাধনার আশ্রয় নিলাম না—শুধু মননশক্তির উপর নির্ভর করে আমার চলতে হল।

এই মননশক্তির একই পরিচয় দেওয়া

প্রয়োজন। আত্মকাল সম্বোধন বিস্তার কথা আমরা সবই জানি। সম্বোধনের কালে, যেখানে যা ছিল না, সেখানে তাও সৃষ্টি করা যায়। তার জন্য অল্প উপাদান প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় শুধু তীব্র ইচ্ছা ও সুস্পষ্ট কল্পনা। চিত্ত ও বিষয়ের সংযোগস্থলে নিজেকে ধরে রেখে যদি বিষয়ের দিকে তাকানো যায় তাহলে এই সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে মনে আসে, বিষয়ের সঙ্গে আপ্যায়িত হওয়া না হওয়া শুধু আমার ইচ্ছাশক্তির স্বল্প স্পন্দনের উপর নির্ভর করে। এই স্বল্প স্পন্দনটিকে ধিনি ধরতে পারেন, তাঁর বাহ্য সাধনার প্রয়োজন হয় না—আত্মপ্রসারণ দ্বারাই প্রকৃতির আল হতে তিনি মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু যিনি এই স্পন্দনটী ধরতে পারেন না, তাঁকেই প্রকৃতির বিপরীত মুখে নিরোধশক্তি প্রয়োগ করতে হয়, সাধন তাঁরই প্রয়োজন। ভূমাবাদীরা বলবেন, ইচ্ছার স্পন্দনে কল্পনার লঙ্ঘনে জীব হয়েছি। এর বিপরীত স্পন্দন ও কল্পনার প্রসারণ ক্ষণে ক্ষণে আমার মাঝে হচ্ছে। সেই অমূল্য কণগুলিকে ধরে বিপরীত মুখে নিজকে প্রচোদিত করাই পুরুষের কর্তব্য। যেমন দুঃখের হাত হতে বাঁচবার জন্য জাগৃতির অঙ্গই অমূল্যত্বকে তীব্র প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট কণে তুললেই বুকের চটকা ভেঙ্গে গিয়ে স্বপ্ন কোথার নিলে যায়, ঠিক তেমনি অন্তঃশক্তিবলেই দুঃখের, সকলের দুঃখের হতে আমাদের বাঁচতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগকে অবীক্য করেই জীবিত হতে নিজকে অপসম্বোধিত করণ—কিন্তু নিরোধবাদী প্রকৃতির নিরোধ পরিণামের সহ্যে তার সঙ্গে লড়তে চান। প্রকৃতি তাঁর কাছে বাস্তব, মারা নয়, অথচ শেষকালে

সেই প্রকৃতিরই বাস্তবতা তিনি অস্বীকার করেন। তাই তাঁর দর্শনে একটা বিবোধাত্মক থেকেট বার, সত্যের পূর্ণ দর্শন তাঁর হয় না। যিনি জগৎকে মারা বলেন, তিনি তাঁর সত্যকে আদিতে অন্তে একই রূপ দেখেন, বাস্তব বলে তত্ত্ব বর্ণে স্বীকার করে শেষকালে নিবোধ দ্বারা সত্যকে চেপে ফেলত তাঁর না। আজকাল আমাদের দেশে অধিকাংশ দার্শনিকই মারাবাদের এট রহস্যটুকু না জেনে নাস্তিবাদরূপ প্রকৃতিদর্শনের সঙ্গে তাকে ঘুলিয়ে ফেলেন।

বেদান্তেও এই সম্যক দর্শনেই লীলা ও নিত্যের সমন্বয় হয়েছে, বিষয়ী ও নিবাসীও স্বল্প মিটে গিয়েছে। বৈবাসীক দর্শনকে ঠিক এই ভাব থেকেই আমরা পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি; তাই বলেছিলাম, জাগ্রৎ বিশ্রামে বিষয় লোপ পায় না, কিন্তু তার সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। নিরোধবাদী কিন্তু বিষয়লোপেই নষ্ট পক্ষপাতী। লীলাবাদীও বিবোধ তাঁর সঙ্গেই—মারাবাদীর বা ভূমাবাদীর সঙ্গে নয়। বৈরাগ্যেও একটা ফল আর একটা সাধন আছে। ভূমাবাদীর কাছে বৈরাগ্যের ফলটাই বাস্তব, আর নিবোধবাদীর কাছে তার সাধনটাই বাস্তব। এট স্ক্রল পার্থক্যটুকু না ধরে গেলে আমাদের দেশের লীলাবাদীরা বৈরাগ্যের সমস্তটা দোষ মারাবাদীর ঘাড় চাপিয়ে

মনের ভূখে পড়ার ছন্দে তাঁকে গাল দিয়েছেন; এমন কি মারাবাদীর শিরোনামি খ্রীষ্টোত্তম মহাপ্রভুর মুখ দিয়েও নানা চণ্ডেব কথা বলতেও সক্ষম কবেন নি।

তবে নিরোধের কি প্রয়োজন নাট ? আমরা বলি, খুব আছে। সাধন হিসাবে তার খুবই প্রয়োজন আছে। বৈদিক শিক্ষার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রসারের সহজ শিক্ষার দ্বারা আমাদের দেশে যেতে লোপ পেয়েছে। গোটা দেশটা এখন সাংখ্যবাদের করলে। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণের ভাব আমাদের এত অভ্যস্ত, প্রকৃতির পরিণামকে আমরা এত বাস্তব বলে জানি যে, তাহাতে বিবস্ত করে, তপস্বী দ্বারা, আত্মনিরোধ দ্বারা আত্মচৈতন্যকে জাগ্রৎ না করলে আত্মপ্রসারের কোনও নিশানাট খুঁজে পান না। এই জন্য এই যুগে নিরোধবাদীও তীব্র বৈরাগ্য, সাংখ্যকাণ্ডে চতুর্ভুজ প্রথম ব্যুৎপন্ন মনন এত প্রয়োজন। আমরা ভোগকাতর দেশকে পুনঃ পুনঃ বলব, বিষয় ছাড়, দেখ, জগৎ দুঃখময়। কিন্তু মনে জানি, এ কথা চরম কথা নয়। ভূমার মাঝে বিষয়েরও স্থান আছে, আনন্দেরও স্থান আছে। কিন্তু সে কথা আজ শোনায় কে ? শোনার অধিকারী কোথায় ?



## ছাত্র রামতীর্থ

—: {#} :—

[ পূর্বাহ্নসময় ]

তীর্থরামের ছাত্রজীবন সম্পর্ক একটা গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে বাকী রহিয়াছে। আগকাল দেশ উদ্ধার করিবার, দেশের উন্নত করিবার নানাপ্রকার কল্পনা, জল্পনা চলিতেছে। ইহার মধ্যে রাজনীতিরও যোগ রহিয়াছে। দেশ উদ্ধারের চেষ্টা নিশ্চয়ই ভাল কাজ, রাজনীতির চর্চাও কিছু মন্দ নয়। কিন্তু কথা হইতেছে, রাজনীতির সহিত ছাত্র-জীবনের কোনও সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় কি না। এ সম্বন্ধে তীর্থরামের কি অভিমত, তাহা উল্লেখ করিয়া আমরা তাহারই সমালোচনা করিব।

তীর্থরাম ছাত্রজীবনে রাজনীতিচর্চার প্রতিপক্ষ ছিলেন। তাঁহার একদিনের দিন-লিপিতেই এ সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত তিনি সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—“আজ কংগ্রেসে শিখা ছিগাম। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের বড় বড় নজর বজুতা গুলি, তাহাদের বলিবার ভঙ্গী কিরূপ, তাহা পরখ করিব। কিন্তু সেদিনকার বজুতা গুলি মনে হইল, দাদাভাই নৌরজীর সম্বন্ধে ঐকলঙ্কো সন্তোষার্থে বেরূপ খেপিয়া উঠিয়াছিল, আমি যে বেরূপ কিছু করি নাই, তাহার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কংগ্রেসওয়ালাদের বজুতাতে আমি নিম্নরূপে আনন্দ পাইলাম না—একটুও প্রেরণা পাইলাম না। দেখিলাম, এসব কেবলই ফাঁকা বুলি।”

তীর্থরাম কোনও দলভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার এই কথাগুলি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অমূল্য বিনিময় গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাদা কথায়, তাঁহার অভিমত, এই, যে কোনও বিষয়ে ফাঁকা আড়ম্বরের কোনও সার্থকতা নাই। ইহাতে যোগ দিয়া চিন্তকে কেবল লঘু করিয়া তোলা ছাড়া আর কোনও লাভ হয় না। রাগ ও প্রজ্ঞার সম্পর্কের মাঝে যেখানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, সেখানেই রাজনীতি কলগ্রন্থ হইতে পারে। আমাদের দেশের রাজনীতি আজ সহস্র বৎসর হইল লোপ পাইয়াছে। এখন রাজনীতি বলিয়া বাহা চলি, তাহা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। ঐশ্বর্য্য এই রাজনীতিচর্চার পক্ষপাতী, তাঁহার আগ-কাংশ লোকেই নিদেনীয় সভ্যতার ভক্ত। উঠিতে বাসতে তাঁহার দেশের লোককে খেঁচা দিয়া থাকেন, ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় তোমরা অশিক্ষিত, অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আবার তাঁহারাই মুখ কিরাইরা রাজ্যের দ্বারের ধরণা দিয়া সাম্য নৈজী-বাসিনতার নম্রকী করিয়া কাঁদিতে থাকেন। যেখানে মূল্যে এত বড় একটা বৈষম্য রহিয়াছে গুলি—তাঁহার নিজেরাই বিক্রয় করেন, সেখানে যে সাম্যের অধিকাংশ কি করিয়া দাবী করা হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। দেশের হিত আর রাজনীতি, এই দুইটা

আজকাল জড়াতরা গিরাছে। রাজনীতিতে  
বোম না মিলে দেশের হিত করা যাউতে  
পারে না, এই অজ্ঞাতো নেতারা ছেলের  
দল জ্যাগাইয়া থাকেন। বেশী দিনের কথা  
নয়, পুত্র অসহযোগ আন্দোলনের সময়  
নেতারা ছেলেদের লিখাটিলেন, জুলকলেজ  
গোলামখান—উই-ছাড়িয়া এস। পড়ার  
করচ অমিত্র ছেলেদের বাগধড়ার গাঁঠি হট-  
তেই দিতে হয়; সুতরাং গোলামখান  
থাক না থাকা লম্বন্ধে ইহাদের মতামতেরও  
একটা মূল্য থাকা সম্ভবপর। কিন্তু দেশো-  
দ্ভিত প্রবল বস্ত্রীয় অভিনবকদের ক্ষীণ  
আপত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার ফলে  
ছাত্রসমাজ যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিরেচনা, নৈতিক  
হুর্ললতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছে,  
তাহার জন্য কাগদিসকে দায়ী করা উচিত,  
তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ছাত্রজীবনে  
রাজনীতি আঁতোর দেশহিত করিবার চেষ্টায়  
যে কি জ্বল করিবে, তাহা এই একটা দৃষ্টান্ত  
হইতেই সুস্পষ্ট হইবে।

দেশের হিত করাতে আপত্তি কিছুই  
নাই। কিন্তু তাহারও তো বোম্বাটা থাকা  
চাই। নিজের হিতের প্রতি বার খেয়াল  
নাই, সে পরের হিত করিবে কোন্ আদর্শের  
অঙ্গসরণে? যে নিজের বোকাই বহিতে  
পারে না, সে পরের বোকা বহিবে—হায়  
কোন্ সাহসে? যুবক চিন্তে আপার অস-  
মিত্র প্রত্যাব; আশায় বুক বাঁধিয়া সে  
সাধারণ চেতনও বেশী করিবে বলিয়া আগাইয়া-  
বায়। কিন্তু তাহার এই নিবেকহীন  
উৎসাহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যও একটা  
বাধকশক্তি থাকা প্রয়োজন। ছেলেরা যুক্তি  
উত্থাপিত করার সময় কখনও কখনও তাহাকে

একটা লাজ জুড়িয়া দেয়; ইহাতে যুক্তি  
ভাঙা হয়। বটে, কিন্তু তাহার মাথা ঠিক  
থাকে। যুবকদের কর্তন্যার হাওয়ার উদ্ভিত-  
দোষেরা যে বুদ্ধেরা চিরকাল পেছন হইতে কেবল  
টিক্‌টিক্‌ করিতে থাকেন, তাহার উদ্দেশ্যে  
কেবল তার ঠিক মাথা। কিন্তু অনেক  
যুবকই দ্রুত বুদ্ধের এই বাজে নকুনীকে বা-  
দান্ত করিতে পারে না। অশ্রু জগতে নিত্য  
নূতন আপার ঘটতে থাকিবে, নূতন সৃষ্টি  
প্রেরণার কখনও কখনও বুদ্ধের অভিজ্ঞতাও  
উলটিয়া যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধের  
বচনমাত্রই যে অগ্রাহ হইবে, এমন কথা বলা  
যায় না। কিন্তু আজকালকার শিক্ষণীয়কান  
নীতিই হইতেছে—প্রাচীরের প্রতি অশ্রদ্ধা।  
রাজনীতিচর্চার এই অশ্রদ্ধাকে দিন দিন  
আবণ্ড বাড়িয়া তুলিতেছে। এমন কি  
নেতাদিগকেও এই বহুস্তে রোপিত বিশ্ববুদ্ধের  
ফল ভোগ করিতে হয়। নেতার পদ  
পাইয়া তিনটা বৎসরও কেহ টিকিয়া  
থাকিতে পারেন না; অথচ তিন বৎসরের  
দাঁকেই যে তাঁহাদের মত ও অভিজ্ঞতা পাণ্ডিগ্য  
যায়, তাহা বলা চলে না। ইহাতে প্রমাণ হয়,  
জনসাধারণের বিচাণশক্তি নাই, দুঃসম্পিত  
নাই, একটা লোকের কথা সব দিক হইতে  
তলাইয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই। হৃদয়ে  
পড়িয়া যখন বাহার সহিত একটা কথার  
মিল হইতেছে, তখনই তাহাকে বাহবা দিয়া  
আকাশে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে—আবার  
পরমুহুর্তেই আর এক কথার চেষ্টা গিয়া  
তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে।  
রাজনীতিক্ষেত্রে এমনি অব্যাহিতচিত্ততার  
পরিচয় আর কত বৎসর ধরিয়াই তো

দেখিতেছি। এই হট্টগোলের মাঝে বিভাগ-  
ণীর তরুণ চিত্তকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া  
তাহার যে কি মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা  
আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি না।

হজুগে মাতিয়া দেশের হিত কক্ষণে চেয়ে  
আত্মহিত করিবার চেষ্টায় বেশী জোর দেওয়া  
প্রয়োজন—এ কথা আমরা বরাবরই বলিয়া  
আসিতেছি। বর্তমান রাজনীতি শরতের  
মেঘগর্জন মাত্র—উহাতে দেশের যথার্থ হিত  
সামান্যই হইয়া থাকে। উপরন্তু ইহাতে  
উচ্ছৃঙ্খলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা, অপরিণাম-  
দর্শিতা ও অশ্রদ্ধার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই  
জন্ত নিত্যাশীর জীবন হইতে এই পাঠটা  
তুলিয়া দিলে লাভ ছাড়া লোকমান নাই।  
শ্রীকৃষ্ণ বা ভীষ্মের মত রাজনীতিজ্ঞ হইলে,  
তাহাদের পদতলে বসিয়া শিখিবার অনেক  
থাকে, কেননা, তাহারা রাজনীতিকে মনুষ্য-  
নীতির সহিত একত্বের বান্ধিয়া দিতে পারেন।  
কিন্তু বর্তমানে সে আদর্শ কোথায়?

তীর্থরাম রাজনীতিচর্চাকে সত্বরে পরিহার  
করিয়া চলিতেন। কিন্তু এ জন্ত তাঁহার  
দেশপ্রীতি যে কোথাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিম্বা  
তিনি যে দেশের কোনও দ্বিত করিতে  
পারেন নাই, এ কথা কি কৈহ বলিতে পারে?  
তাঁহার An Appeal on behalf of  
India যে পড়িয়াছে, সেই জানে দেশের  
হৃৎথে তাঁহার প্রাণ কতখানি কাঁদিত।  
কঠোর ব্রহ্মচর্যা, আত্মশুদ্ধিতে শ্রদ্ধা, ভক্তির  
তরঙ্গিতা, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি ক্রমশঃ  
গুণাবলীতে তিনি আজ উত্তর ভারতের  
তরুণ চিত্তকে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল করিয়া  
তুলিতেছেন—ইহাকে দেশের সভা উপকার  
বলিব না তো কাহাকে বলিব? আর তিনি  
ভারতকে বাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি কঠোর

সাধনা দ্বারা তিল তিল করিয়া অর্জন  
করিয়াছেন—পরেব মুখের ফাঁকা কথা কাড়িয়া  
আনিয়া হাটের মাঝে ছড়াইয়া দেন নাই।  
বাহা আমার নিজের জিনিষ, তাহাই যথার্থ-  
ভাবে পরকে দান করিতে পারি। ধর্ম,  
করিয়া দানে কোনও সার্থকতা আছে কি?

কেহ বলিতে পারেন, এই যদি তীর্থ-  
রামের দেশহিতের নমুনা হয়, তবে তাহার  
জন্ত তাঁহার লেখাপড়া শিবিবানই বা কি  
প্রয়োজন ছিল? তিনি তো সারাক্ষণই মালা  
টপকাইয়াই দেশের হিত করিয়া বাহিতে  
পারিতেন। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই,  
তাঁহার অধ্যয়নপ্রীতি যে কোন আদর্শ দ্বারা  
অনুপ্রাণিত ছিল, একবার তাহাই স্মরণ  
কর। অধ্যয়ন তাঁহার তপস্যা ছিল। তাহাকে  
আয়ত্ত করা, চিত্তকে উজ্জ্বল ও একাগ্র করা,  
ইন্দ্রিয়কে শাস্তদাস্ত রাখিয়া এতদু মানসিক  
শক্তি অর্জন করা, পরমাত্মায় অবিচলিত  
নিষ্ঠা রাখা—এই ছিল তাঁহার অধ্যয়নের  
উদ্দেশ্য, শুধু বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ  
করা নয়। যে সাধনার এইগুলিতে দীক্ষা হয়,  
শিক্ষার্থীজীবনে তাহার চর্চা অংশ কঠিন।  
রাজনীতিচর্চার যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা  
হইলে রাজনীতিকে তিনি দূরে পরিহার  
করিয়া চলতেন না। তিনিও শিক্ষার্থীর  
চিত্ত গইয়াই কংগ্রেসে গিয়াছিলেন, কিন্তু  
শিখবার কিছু না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া  
আসিয়াছেন। এক কথায় তিনি বর্তমান  
রাজনীতির, মধ্যস্থদা করিয়াছেন—“ও সব  
ফাঁকা কথা—ওতে আনন্দ নাই, প্রেরণা  
নাই।” আমরাও ইহার সমর্থন করি এবং  
রাজনীতিচর্চা পরিণত বয়সের জন্ত তুলিয়া  
রাখিয়া ছাত্রদিককে মনুষ্যত্ব অর্জনে অধিক  
মনোযোগী হইতে বলি। (ক্রমশঃ)

## বেদান্তীর ধ্যান

—\*#(0)#\*—

শুধু চোখে বুঝে ধ্যান নয়, চোখ মেলেও ধ্যান চলে। আমি দিয়ে সব ব্যাপ্ত দেহে হবে। সব আমার মাঝে—আমি ছাড়া কিছুই নাট। ক্ষুদ্র পরিমিত এই অমৃত্যুত্ব সবারই হচ্ছে, কিন্তু গিচাব কর্ত্ত জানে না বলে, কেউ এটা টের পার না। আমার এই অমৃত্যুত্বকে বিজ্ঞান করবারও পথ রয়েছে। সে পথ যে সত্যের পথ, অমৃত্যুত্বই তার প্রমাণ। এই ধারণা করতে হবে—যতটুকু জগৎ আমার ইঞ্জিরঞ্জ হা মনোগ্রাহ হচ্ছে, তার চেয়েও আমি ব্যাপক। আমার বাইরে যা কিছু মনে করি, তা বাস্তবিক আমার ভিতরে। আমি সকলকে ব্যাপে ররেছি, কিন্তু আমাকে কেউ ব্যাপে থাকতে পাবেনি।”

চোরে, আছি—যতটুকু দেশে যতটুকু দৃশ্য চোখে পড়ল, ততটুকুই আমার দেহ। এই আমার অল্পময় স্বরূপ। শুধু একটা দেহই আমার নয়—এই দৃশ্যের মাঝে পঞ্চভূতের বস্তু নৃষ্টি, সবই আমার দেহ। আর সেই সমস্ত মৌলিক গতি, বস্তু স্পন্দন সব আমার প্রাণ। অল্পময় কোষের জ্ঞান নিতে হবে দেশের ব্যাপ্ত হতে। যতটুকু দেশের জ্ঞান যে ইঞ্জির দিয়ে গ্রহণ করা হচ্ছে, ততটুকু পর্য্যন্তই আমার দেহ। আমি দেশের অতীত, তাই অল্পময় শরীরের বাইরে। ছুপ করে এসে আছি, দুই শব্দ শুনা—মনে কর না যে শব্দটা আমার বাইরে হচ্ছে। এই শব্দ শোনার মাঝে একটা দূরত্বের অমৃত্যুত্ব আছে, যে অতিবৃত্ত হতে শব্দ উপস্থিত হচ্ছে, সেই বিশ্বের সংস্কার আছে।

এগুলো কিছু আমার বাইরে নয়। যতটুকু দূরত্বের অমৃত্যুত্ব হল, ততটুকু ব্যাপ্ত করেই আমার দেহ—সুতরাং শব্দটা আমার মাঝেই রয়েছে। এই পরিব্যাপ্ত দেহের মাঝে প্রাণ বিচিত্র স্পন্দনে অহবঃ স্পন্দিত হচ্ছে—শুধু একটা পিণ্ড নয়—সর্বত্র। দেশ জগৎ আমার অল্পময় দেহ, তার সর্বত্র প্রাণের অমৃত্যুত্ব চাই—যেমন প্রাকৃত অনন্তর এই অভিমাত্রী দেহপিণ্ডের সর্বত্র প্রাণের সাড়া পাই। দেশ দেহ শুধু জড় নিস্তব্ধ দৃশ্য নয়—প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্ত আমার এই পরিব্যাপ্ত দেহের রূপান্তর ঘটছে। বায়োস্ফোপের সিনের মত দৃশ্য জগতের সংস্থান প্রাতি মুহূর্ত্তেই এদল যাচ্ছে। পানী উড়ছে, পাতা নড়ছে, শাহুদ চলছে, নতুন নতুন দৃশ্যের আবির্ভাব হচ্ছে—এই ছিল ঘরের দৃশ্য, বানিক পবেই তা মাঠের দৃশ্যে রূপান্তরিত হল—ইত্যাকার দৃশ্য বা শ্রব্য দেশ জগতের যত বিকাব, সব অমৃত্যুত্ব করতে হবে প্রাণের বিকাশ বলে। বাস্তবিক কোথাও না কোথাও প্রাণের স্পন্দন হচ্ছে বলেই তো এই সব রূপান্তর। প্রাকৃত দৃষ্টিতে হয় তুমি চলন্ত, নয় অপরে চলছে, তাহলে রূপান্তর ঘটছে। কিন্তু জ্ঞানের দৃষ্টিতে তো তুমি-আমির ভেদ নাই—সর্বত্রই এক দেহ, এক প্রাণ—যতটুকু দেশের অমৃত্যুত্ব, ততটুকু জুড়ে এক প্রাণবন্ত আমি বিকাশ।

তারপর এম নোজগতে। এক গিঞ্জু মুন তোমার মাঝে, কিন্তু তার শক্তি কত

৫৫৩। সেট মন দিয়েই তো অপরের মনেও অনুমান করছ। নতলে নিজের মন ছাড়া অপরের মনকে প্রত্যক্ষ করবার শক্তি তোমার কোথায়? তাই সর্বত্রই এক মন ছাড়া দ্বিতীয় মনের অস্তিত্ব নাই। এই মন শিচ্চি এবং কালে ব্যাপ্ত। মন ক্রমিক; ক্রমে ক্রমে তোমাকে কেন্দ্র করেই শিচ্চি ভাবের অস্তিত্ব হচ্ছে। সে সমস্তই যে অস্তিত্ব মনোভূমির অভিমত মন থেকে আসছে তা নয়; প্রাকৃত দৃষ্টিতে থাকে অপরের মন বলতে, তা থেকেও আসছে বটে। কিন্তু অপরের মন বলতে সেটা বহিরঙ্গ এবং তোমার অভিমত ক্ষুদ্র মনের চিন্তা অন্তরঙ্গ—এখন ধারণা তুল। তোমার অভিমত বাস্তু মনেও পরক্ষণেই চিন্তা পূর্বকণের তুলনায় বহিরঙ্গ। প্রত্যেক ক্রম নূন নূন হয় আগুত, আগার লয় হচ্ছে। সুতরাং কোনও ক্রমে মনই কোনও ক্রমের অপেক্ষা রাখছে না। নূন ভাব, নূন চিন্তা তোমার মাঝেই বা আসছে কোথা থেকে? কাজেই তোমার অভিমত প্রাকৃত মনও অপর মনের মতই বহিরঙ্গ। সাক্ষীই বার্থ তুমি। বাস্তবিক নিজেই মনকেও এমনি রাষ্ট্রে কৈলে দাও, দিয়ে গবার মনের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত কবে, জীবন অজুত্ব কোলে তাদের টেনে নিয়ে অন্তর্ভুক্ত কবে নাও—ভাঙলে বাস্তু মন ছাড়া একটা সমষ্টি মনের সন্ধান পাবে। তাই স্বরূপ কি? যেমন তোমার এই প্রাকৃত অগতির স্বরূপ তোমার প্রাকৃত মন, তেমনি সমষ্টিগত বা দেশ অগতির স্বরূপ এই সমষ্টি মন। এইরূপে অশিচ্চি বা কালচিন্তার মনকে পরিণ্যস্ত বলে ধারণা করতে হবে। এই মন সমষ্টি মন—সমষ্টি ইন্দ্রিয়বোধ সহাবে

বিষয় আহরণ করে বহুর্ভে বহুর্ভে পরিবর্তিত হচ্ছে। সকলের মনকে জড়িয়ে নিয়ে, অথবা দেশাঙ্গগতের অন্তরালে কালবিন্দু এই মনোময় কোষ।

তার পর এসো বিজ্ঞানময় কোষে। আগে বিজ্ঞান কি তাই বুঝতে হবে। বিজ্ঞান হচ্ছে, নিশ্চয়ান্বিত্য প্রতীতি। দেশকালবিন্দু সমষ্টি দেহ মন-প্রাণ একটা লক্ষ্য ধারী পরিচালিত হচ্ছে। দেহের রূপে, প্রাণের ক্ষুণ্ণে, মনের প্রতিবিম্ব অক্ষুণ্ণ বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যই একটা উদ্দেশ্যকে আশ্রয় কবে সংহত হচ্ছে। তোমার এই নিয়মিত দেহ-মন-প্রাণের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণান কবে দেখ, সর্বত্র শৃংখলা আছে, আইনের বন্ধন আছে—ভোগ বা অপর্ণমুখী একটা গতি আছে। বিজ্ঞান যেন স্রীষ্টের মত—একবার সৃষ্টিত হচ্ছে। আবার প্রসারিত হচ্ছে, ভাঙতে দেহ-মন-প্রাণের কাঁটা একবার বিষয়েব দিকে, একবার চৈতন্যের দিকে আবর্তিত হচ্ছে। এট ছুঁইটা গতির মাঝেই সৃষ্টির যত বৈচিত্র্যের উদ্ভব—আলো-আধার, ভাল-মন্দ, পাপ পুণ্যের যত খেলা। এই বৈচিত্র্য সমষ্টির উপর একের অভিমান এবং সেই একের organic unityই বৃদ্ধি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ তোমার অস্তিত্বানী নিশ্চয়ান্বিত্য বৃদ্ধি নয়—দেশকালবিন্দু দেশ অগতির পরিচালিকা নিশ্চয়ান্বিত্য বৃদ্ধি—বা তোমার মাঝে মোক্ষমতিমানের সৃষ্টি কবে, বা অপরের মাঝে সংসারভিমান সৃষ্টি করে। সেট সেই দিক দিয়ে অগতঃ দেখতে শিখাচ্ছে। কিন্তু তোমাকে ব্যক্তিগত অভিমান হতে মুক্ত হয়ে প্রত্যেকেই ধারণা করতে



হবে—মোক্কেশ পক্ষ বা প্রতিপক্ষ দুইই তোমার চৈতন্যের আশ্রিত, এই অমৃত্যব নিয়ে বুদ্ধির স্বরূপ ধারণা করতে হবে। এই হল তোমার 'বিরাট' বিজ্ঞানময় কোষ—এরও সাক্ষী তুমি। কেননা এ বিজ্ঞান এক হলও রহতে প্রসিদ্ধ—ভোগ আর অপবর্গ এই দুইটা ধারা ধরে সে চলছে। সুতরাং তার আগে গেছনে যাওয়া আছে। কিন্তু তুমি দুইটা ধারারই ধারক। তাই তুমি সাক্ষী—বিজ্ঞান-ভিত্তিনীও নও। তুমি দেখছ সর্বত্র বিজ্ঞানের বিকাশ—একটা Intellegent Force সর্বত্র ক্রিয়া করছে—স্পষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে সকলকে চালনা করছে, সকলের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করছে। তোমার বিরাট দেহ মনে যখন এই ক্রিয়া হচ্ছে, তখন তা যোদ্ধাভিমান আনছে। এই হল পক্ষ। কিন্তু প্রতিপক্ষের সংস্কারও তোমার মাঝে আছে; সেই হচ্ছে সমষ্টি বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ ধারা। তুমি উভয়ের উর্দ্ধে।

তার পর এস আনন্দময় কোষে। বিজ্ঞানের মূলে কাম বা বাগনা বা আনন্দ। আনন্দ প্রাণেরও প্রাণ। এ আর বোঝাবার উপায় নাই। বলা চলে আনন্দ কারণশক্তি। আনন্দের প্রেরণাতেই বিজ্ঞান ফুটেছে, মন ক্রিয়াশীল হচ্ছে, প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, দেহ

রূপান্তর গ্রহণ করছে। এই যে এতগুলি সাক্ষীর ক্রিয়া—এর যে সমষ্টি, তাই আনন্দ। এগুলিকে সমষ্টিভাবে ধারণা করতে গেলে আনন্দ স্বতঃই এসে পড়ে। বিচ্ছিন্নের সমষ্টিই আনন্দ। যা মূলে বিচ্ছিন্ন, তা যদি সূক্ষ্ম সংযুক্ত না থাকবে, তাহলে বিচ্ছেদ হওয়ারই যে অবকাশ থাকবে না। যেখানে বিচ্ছেদের পর মিলন, সেখানেই তো আনন্দ। এই আনন্দ নৃক্সিমমষ্ট্যভিত্তিমাত্রের প্রেরণাতেই ক্রিয়ার পটভূমি দেখা দিয়েছে। তাই বলছিলাম, আনন্দ সমষ্টিরূপ কারণের অমৃত্যু—তা হতে কার্যাক্রমে দ্বিমুখী বিজ্ঞান, বহুমুখী মন, স্পন্দনাত্মক প্রাণ, রূপান্তরী দেহ—এই সমস্ত হচ্ছে। কিন্তু তুমি আনন্দও নও শুধু—তুমি আনন্দের দ্রষ্টা, অমৃত্যুবিভা। আনন্দ আর তুমি যে যুক্ত হয়েও বিযুক্ত—তার প্রমাণ স্রবু-প্তিতে। কিন্তু স্রবুপ্তি চাই না—চাই জাগৃতি—সেখানেই দ্রষ্টার আনন্দ। এই আনন্দ যখন কার্যাক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়—তখনও তুমি আছ জাগ্রতে—আবার যখন সমস্ত জগৎকে আপনার মাঝে টেনে নিয়ে স্রবুপ্তিতে বিশ্রাম করে, তখনও তুমি আছ সাক্ষী জ্যোতিঃস্বরূপে। তুমি কার্য-কারণের অতীত।



# দৈব ও পুরুষকার

—:({#):—

[ প্রবক্তা—ভগবান্ প্রজাপতি ]

বীজ ছাড়া কিছুই উৎপন্ন হয় না। বীজ ছাড়া ফল হয় না—এমন কি বীজ হইতেই আবার বীজের উৎপত্তি। কৃষক ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করে, কর্ষণ ভাণই হউক আর মন্দই হউক, বীজ অমুখারীট সে ফল পায়। আবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না হইলে বীজও নিষ্ফল হয়। তেমনি পুরুষকার ছাড়া দৈবও ব্যর্থ। পুরুষকার ক্ষেত্র, আর দৈব বীজ; ক্ষেত্র ও বীজের যথাযথ সংযোগ হইলে তবে ফল লাভ হয়। ভাল কাজ করুক আর মন্দ কাজই করুক, কর্মের ফল পরিপক্ব হইলে তাহা। কর্তাই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শুভ কাজের ফল সুখ, আবার অন্তত কর্মের ফল দুঃখ; বাহ্য করা যায়, তাহাই ফলশ্রুত হয়; কেহ কিছু না করিলে ফল পাইবে কোথা হইতে? যে কর্মী, ভাগ্য তারই অমুকুল, প্রতিষ্ঠা তারই করায়ত্ত। যে কর্মহীন সে তো ভ্রষ্ট, তার ভাগ্যে কেবল কাটা ঘরে মূণের ছিটা। তপস্তা, সর্গসুখ, ধনরত্ন, যা কিছু বল, সমস্তই পুরুষকার বলে লাভ করা যায়। মনুষ্য জন্ম হইতে স্বাহারা দেবদাতা করিয়াছেন, তাঁহারাও পুরুষকারই। ব্রহ্মের করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণের শ্রীলাভ হয় শৌচে, ক্ষত্রিয়ের পরাক্রমে, বৈশ্যের পুরুষকারে আর শূদ্রের সেবা দ্বারা। যে পরকে দিতে জানে না, যে ক্লীবের মত উৎসাহহীন ও নির্বীৰ্য্য, যে কর্মস্বরূপ স্বভাব গঠন করিয়া তুলিতে পারে নাট, বান তপস্তা নাই, ভোগ তাহার আরম্ভ

হটবে কি করিয়া? ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকেও সমুদ্র গর্ভে তপস্তা করিতে হইয়াছে। কর্ম করিয়া যদি ফল পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে সমস্তই ব্যথা হইত। গোকে ভাড়া হইলে বৈশ্যের উপর নির্ভর করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিত।

মানুষের বাহ্য করা উচিত, তাহা না করিয়া যে কেবল দৈবের দিকে হাঁ করিয়া চাতিয়া থাকে, তাহার সমস্ত আশাই নিষ্ফল হয়; স্বামী ক্লীব হইলে স্ত্রী কি পুত্রভাগ্য বঞ্চিতা হয় না? দৈব শুভ হউক কিবা অন্তত হউক, তাহার দক্ষণ টহলোকে তোমার ততটা ভয়ের কারণ নাই; কিন্তু পুরুষকারে যদি কোনও ত্রুটি থাকে, তাহার দক্ষণ পর-  
 কালে ভয়ের বথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। পুরুষকার ধরিয়া তবে দৈবের অমুখবর্তন করা চলে; কিন্তু মোটেই কোন কর্ম করিবে না; আবার দৈব তোমার ফল দিবে, এরূপ কখনও হয় না।

তুমি তোমার বন্ধু, তুমিই তোমার শত্রু; তুমি কি করিতেছ না করিতেছ, তাহা তো তুমিই জান—তোমার সমস্ত কর্মই তো তোমার আত্মা সাক্ষী। পুণ্যদ্বারা পাপ প্রতিহত হয়, আবার পাপদ্বারা পুণ্যও প্রতিহত হয়। এইরূপে কর্মশূন্যতঃ পাপপুণ্যের যথোচিত ফলেরও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হয়, সর্বত্র কর্মই বলবৎ। দৈব

যাহা আছে, তাহা থাকুক ; তুমি যদি পুণ্যের অকুষ্ঠান করিতে পার, দেবদ্বৈত তোমার আরও হইবে—দৈব তখন তোমার কি করিবে ?

পুরুষকায় কি করিয়া দৈবকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহার কাহিনী শোন। যযাতি স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্ম হইয়া মাটিতে পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার দৌহিত্রগণের পুণ্য কর্মহেতু আবার তিনি স্বর্গলোক ফিরিয়া পাইলেন। ধৃতবাহুপুত্রেরা ঘোব করিয়া পাণ্ডবদিগের রাজ্য কাড়িয়া নিল ; কিন্তু তাহার বাহুবলেই সেই রাজ্য পুনরধিকার করিল, দৈবের মুখ চাহিয়া রহিল না।

আশ্বিন যতই অশ্ব হউক না কেন, বাতাস পাইলে তাহা যেমন শব্দ উঠিয়া উঠে, তেমনি দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের যোগ হইলেই দৈবের পুষ্টি হয়। তৈল ফুটাইয়া গেলে নীপশিখা যেমন জ্বলি উঠে, তেমনি

তেমনি কর্মের যোগ না থাকিলে দৈবের প্রভাব কমিয়া আসে। মানুষ জগতে বিপুল ধনসম্পত্তি হাভের কাছে পাইয়াও কর্মহীন হওয়ায় তাহা ভোগ করিতে পারে না ; আবার বাহ্যিক নিত্য উৎসাহশীল, তাহার দৈবদ্বারা সবদ্ব্যবসায় বিত্তব্যবহার করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। এ জগতে যে কর্মহীন, তাহার জীবনই ব্যর্থ ; ইচ্ছা করিয়া যদি কেহ বিপথে চলে, দৈব তাহাকে স্থপথে টানিয়া আনে না ; দৈবের কোনও প্রভাবই নাই। শিষ্য যেমন গুরুকে অনুসরণ করে, দৈবও তেমনি কৃতকর্মেরই অনুসরণ করে। পুরুষকায় দ্বারা সঞ্চিত শক্তি দৈবকে পরিচালিত করিয়া অসীম স্থানে লইয়া যায়। পুরুষকারের কি শক্তি, তাহা তুমি নিজেই বিচার করিয়া নোও ; তারপর আরও কর্মে নিযুক্ত পুরুষকারের সংযোগ করিয়া তাহার অক্ষুণ্ণ দৈবকে উদ্ধৃত করিয়া তোল। ইহাই সিদ্ধি।



## আরণ্যক

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবায়মায়নু তামসদিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥”

—ঋগ্বেদ সংহিতা—৩৮৮

আমিষে বা অহংতবে যে কর্তৃত্ববুদ্ধি, তাই অহংকার। এ অহংকারকে সমূলে দূরীভূত করা চাই। আমিষকে যত প্রসারিত করিতে থাক, ততই তার বিলোপ সাধন হবে। যেমন পূর্ণ পূর্ণ বিকসিত হয়ে বিনষ্ট হয়, তেমনি আমিষও পূর্ণ প্রসারিত হলে পরিত্যক্ত হয়। আমিষের সঙ্কোচেই আমিষের আয়ুর্ভূতি—অস্বাভাব্য হয়ে যায়। তাই ‘সমস্ত

অশান্তির মূল। আধুনিক, প্রাচীন, জাতীয় ও ধর্মগত সমস্ত বিবাদের মূলই হচ্ছে আমিষের সঙ্কোচ। আমি তোমার ভালবাসি না, তোমার ক্রোধ দেখলে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয় না। হৃদয়িক জলপ্রাবণ প্রভৃতি এসে সহস্র সহস্র জীবন ধ্বংস করল, কিন্তু আমার প্রাণ কাঁপল না। এর কারণ কি ? অস্ত্রকে “আমি” হতে বস্ত্র জানি করি বলে।

আমিষকে আমাতে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বব্যাপী করে দাও—সকলীকতা, সৎকোচ, স্বাভাব্য সম কারামুক্ত করে অনন্তের সঙ্গে মিশিয়ে দাও, তুমিও সমদর্শী এবং জগতের আদর্শস্থানীয় হও।

\*

কর্মের দ্বারাই মানবাত্মা আপনাকে আপনি মুক্ত করছে, তাই যদি না হত, তবে ইচ্ছা করে মানব কখনই কর্ম করত না। মানুষ যতই কর্ম করছে, ততই তার ভিতরকার অদৃশ্য ভাবগুলি আপনি ফুটে উঠছে। কর্ম করা কারো ভয়ে কিম্বা দায়ে পড়ে নয়— আপনাকে সহজে ব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য। যারা বাস্তবিক কর্মের মধুর আনন্দন জীবনে ভোগ করে নাই, কর্মেই যে আত্মার মুক্তি এ কথা জানে না, তারাই দুর্বল মুহমানভাবে বলে, জীবন দুঃখময়, আর কর্ম কেবলই বন্ধন।

\*

আত্মাতে যাহা আছে, সময়ে তারই বিকাশ হয় মাত্র। জ্ঞান, শ্রদ্ধাভক্তি সবই আত্মাতে নিহিত; উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং সময় পেলে আপনি তারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যখন বিরুদ্ধভাবে প্রকাশ পায়, তখন তারাই রিপু। হস্তধারা চক্ষুধারা যখন কুকার্য্য করি, তখন তারাই রিপু, সুকর্মের সমীপে আবার তারাই বন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মস্থানের নাম কাম—যখন ভগবৎসেবা করি, তখন উহার নামই প্রেম।

\*

কর্মই যাদের লক্ষ্য—কর্তা নয়, তীর্থে বাঙরাই যাদের উদ্দেশ্য—পাওরা নয়, তাদের নিকটই কর্ম করা তীর্থ করা সব ভারী এবং

অসার বলে বোধ হয়। কর্ম করতে গিয়ে যিনি একবার কর্তার খোঁজ পেয়েছেন, তার উপর হাজার কর্মের বোঝা চর্চণিয়ে দাও, কিছুতেই তিনি উদ্বিগ্ন বা অস্থির হবেন না। কারবার করতে গিয়ে আমরা প্রথমই মূল-ধনটী হারিয়ে বসি, তাই আমাদের লাভে-মুণে সদ বিনষ্ট হয়। সুখ-দুঃখ সম্পাদ-বিপদ বাই আমূল্য না কেন, যদি কর্তার দিকে অচল লক্ষ্য থাকে, তবে কেন ভীত হব? মন যাদের সম্প্রসারিত কঁটার দ্বারা একমুণী হয়েছে, তাদের ভাগেই ভগবান লাভ।

\*

নোগ চল ভিতরে; বাহিরে ঔষধ ব্যব-হাসে কি ফল হবে? কাম ক্রোধ লোভ মোহ সুব তোমার মনের বিচার। ইন্দ্রিয় বেচারীদের দোর কি? ইন্দ্রিয়ে মনঃসংযোগ না হলে কি কখন কুক্ষম করা যায়? আগে মনটী স্থির কর—তারপর দেখবে, সবাই ঘাড় নত করে এসেছে। মূলে জল না চলে শাখায় জল দিলে কি বৃক্ষ বড় হয় বা সুস্বাদু ফল নিত্যরূপ করে? যিনি মন জয় করেছেন, সমগ্র জগৎ তার করতলগত।

\*

কুঠার চন্দনবৃক্ষকে ছেদন করে নিজেই সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জগতের আদর্শস্থানীয় মুনি-ঋষিগণ শত নির্যাতন সহ করেও জীবনের চিত্তকামনাই করেন থাকেন, আহুর্না বাতনা পেয়েও প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেন না। পরশ যদি ছুঁলে সোণাও সোণা হয়ে যায়। যোগী-ঋষিরা হচ্ছেন পরশমণি—যতই পানী তানী হওনা কেন, একবার তাদের পরশ পেলে, তুমিও সোণা হয়ে যাবে। রাবণ দাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সুমিত্রই লাভ করে-

ছিল, অপাইবাধাই গৌরাজন্মের কপালে, দিকে, কিন্তু প্রাচীরবেষ্টিত গৃহের মাঝে কান্না ছুঁড়েও কপাপাত্রই ছড়ান ছিল। তগ- তাদের প্রবেশাধিকার নাই। সে এলাকার খানের ‘অহৈতুকী কৃপা। তাঁর কৃপা হলে রাজত্ব করছে ক্ষুদ্র প্রদীপ। তার অধিকারে অতি পাবণও ভবলাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সেই বড়।  
“সুখং কংসোতি বাচালাং পশুং লভয়তে গিরিং।”

#

অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করতে গিয়ে পাখীর চোখের পুতুলী বই আর কিছুই দেখতে পান নাই। আমরাও যখন তগবানকে লাভ করতে গিয়ে সব ভুলে যাব—ক্ষম্য কেবল তগবান থাকবে, তখনই তগবান লাভ হবে। অত্ৰ কিছু চোখের সামনে কিছা স্মৃতিতে জাগলেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাব।

#

তাকে যদি ভালবেসে থাকি, তবে গে আমার অবগুণ ত্রিমেই সব সময়ে ব্যস্ত থাকে বলে মনে করব? তাতে যে তাব ভালবাসাকে অপমান করা হয়। অপরাধেরও অমন ক্ষমা কোথায় কার কাছে পাব? তবে আর অপরাধ করে তার কাছে লুকাচুরি কেন? তার ক্ষমার ভয়? সে তো বইয়ের দণ্ডধারী পুলিশ নয়—সে যে অন্তরের অন্তস্তলে ভাল-বাসার রিস্পেক্টনে পীড়ন করবে।

#

কৃত্রিম উপায়ের না ছোট করতে গিয়ে চাঁদের মেয়েবা পায়ের বিকৃতি ঘটিয়েছে মাত্র। সাধন ক্ষমারও যখন প্রকৃত পথ ছেড়ে কৃত্রিম উপায়ের দিকে হুঁকে পড়ি, তখনই আমাদের বিকৃতি ও অবনতি ঘটে থাকে।

#

যার অধিকারে সেই বড়—হুঁপ করবার কিছু নাই। চরমার্থ জগৎময় আলোক

বিশ্বাস হচ্ছে লক্ষ্য। বিশ্বাস যাতে হয়, তার জন্যই বত সাধন ভজন ও তপস্তা। বিশ্বাসের আধার যাব আছে, তার নির্ভর আপনি আসবে। কিন্তু যার তা নাই, তার বিচার আসবেই। বিচার করলেই বিচার্য বস্তুকে ধারণা করবার জ্ঞান আবার সেইরূপ মন বুদ্ধি চাই। কাজেই এখানেও দেখছি আধাবস্তুদ্ধি নটলে বিচারে শুদ্ধি ফুটে না—বিচারের লক্ষ্য ভুল হয়ে যাবে। কাজেই বিশ্বাস করি বা না করি, যাতে বিশ্বাস হয়, আশ্রয়নের মুখ থেকে সে উপায় অবলম্বন করতেই হবে। এখন কোথায়ও নিভূতি দেখে বিষয়ে বা ভয়েই হোক কিছা ভাল-বাসায় আকৃষ্ট হয়েই হোক, একজনকে না একজনকে প্রথমতঃ মেনে নিতেই হবে। যে, অপরকে না মেনে চলতে চায়, সেও নিজকে মানে। কাজেই প্রথমতঃ নাস্তিক বা তগবানে ‘অবিশ্বাসী’ হলেও সে সকল রকমে বঞ্চিত হবেন না।

#

আড়াল থেকে এক জন টানছে, মর্মে কিন্তু তা দেখেও দেখছে না—বাইরের খেলনা নিয়েই মত্ত। কিন্তু একবার যদি সে মনচোয়নের দিকে নজর পড়ে, তবে কি আর অমন খেলনার ধরে রাখতে পারে? তখন সব খেলনার মালিকের খোঁজ পেয়ে মন তাঁর দিকেই উঠাও হবে।

## নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে সশিষ্যে তাঁহার . পদার্পণ উপলক্ষে আগামী ১লা কার্তিক হইতে ৩রা কার্তিক পর্য্যন্ত একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্বাহ জন্ম জন প্রতি ৫. পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে; এরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থানের বন্দোবস্ত ও আহাৰ্য্য সংগ্রহ পূর্ব হইতেই করিতে হইবে। ৬ মাইলের ভিতরে উপযুক্ত কোন হাট বাজার নাই। বিশেষতঃ অত্যন্ত আশ্রমে ভক্তসাম্রাজ্য উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তদের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার ভার যেরূপ আশ্রম সংশ্লিষ্ট সদস্য ও ব্রহ্মচারিবর্গ লইয়া থাকেন, কুতুবপুরে সেরূপ ভার গ্রহণ করিবার কোন লোক নাই। এই সমস্ত কারণে পুনঃ ভক্তগণের নিকট নিবেদন যে ষাঁহারা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাহারা অনুগ্রহপূর্বক জন প্রতি ৫. পাঁচ টাকা হিসাবে সত্বর পাঠাইয়া দিবেন; এই টাকা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার পর দিলে চালবে না। ষাঁহারা পূর্বের টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার কোন প্রকার দায়িত্ব আমাদের থাকিবে না। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পাকা মন্দির প্রস্তুত হইতেছে; কয়েকখানা ঘরও প্রস্তুত হইয়াছে; এই আশ্রমটী অল্প কোনও আশ্রম অন্তর্গত নহে, ইহা সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীর পীঠস্থানস্বরূপ। আশ্রমটী স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। তাই সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে মন্দিরাদি নির্মাণকল্পে প্রত্যেকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্যদানে আমাদের উৎসাহিত করিবেন।

কুতুবপুর আশ্রমে যাতায়াত পথের আলোক -

গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল পথ মেহেরপুর যাইবে। মোটর ভাড়া জন প্রতি ১. এক টাকা, — ১ ঘণ্টা সময়ে যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে, নৌকাতে ২ ঘণ্টা, কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌঁছা যায়; মোটর ভাড়া জন প্রতি ১০ আট আনা।

প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছিবার সময় নিম্নে লিখা হইল।

শিলিগুড়ী প্যাসেঞ্জার ও বাসাম মেল	...	...	প্রাতে ৯—৫৮ মিনিট
চট্টগ্রাম মেল	...	...	বৈকালে ৪—৪১ মিনিট
ঢাকা মেল	...	...	রাত্রি ১—৪৯ মিনিট
দার্জিলিং মেল	...	...	বাংলা ২—৪৩ মিনিট
সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	...	...	রাত্রি ৩—৫ মিনিট
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	...	...	ভোর ৫—৫০ মিনিট

( কার্তিক মাসে সময়ের সামান্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব )

দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্তগণ কলিকাতা হালিসহর নৈহাটী ও রাণাঘাট প্রভৃতি স্টেশন হইতে অনেক ট্রেনেই চুয়াডাঙ্গা পৌঁছিতে পারিবেন। প্রধান প্রধান ট্রেনের সঙ্গে মোটর সার্ভিসের যোগ আছে।

চিহ্নিত লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত এম, এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া  
( অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি )

## সংবাদ ও মন্তব্য

—\*#()\*#\*—

মঠাধিপতি শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে অবস্থিত করিতেছেন।

বিস্ত ৬ই ভাদ্র মঠাধিপতি শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্মদ্বাদশম অন্ন বর্ষে, মঠাধিপতি শ্রীমৎ আশ্রম হইতে এবং উচ্চালন, জগদীশ, বীরবেতি, প্রভৃতি স্থানে বধা-রীতি অনুষ্ঠান হইয়াছে।

উক্ত ভবিষ্যে বঙ্গীয় সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গীয়া সারস্বত আশ্রমের বার্ষিক উৎসবও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। আর ৫০০ নরনারায়ণ খেচরার প্রসাদ পাইয়াছে।

অপরূপে সবজজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হইয়াছিল। ইহাতে আশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ ও “কবিত্তালয়” প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

আশ্রমের পত্রিকা আশ্রমের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। প্রয়োজন, বোধ করিলে গ্রাহক-গণ পূজাবকাশ উপলক্ষে টিকানা পরিবর্তন হাবীর ডাকঘরেই করিয়া লইবেন। পত্রিকার অগ্রাণ্ডি সংবাদ দাসশ্রমে জানাইলেও প্রতীকার করা হইবে।

—\*#()\*#\*—

## দানপ্রাপ্তি-স্বীকার;

শ্রী শ্রীঠাকুরের জন্মস্থানে আশ্রম-স্থাপন

উপলক্ষ্য—

(পূর্বানুষ্ঠিত)

শ্রীহরিশ রাও (সংগৃহীত আসাম) কর্তৃক  
সংগৃহীত ৫৯, শ্রীঅন্নদাচরণ মহাশয় হিত পড়ঃগাদা,  
মেদিনীপুর ৫০, শ্রীশঙ্করাথ দালাল বড়-  
নাঙ্গাল, কলিকাতা ২৫, শ্রীবাধাশ্রম মিত্র  
ঠাকুরা, বর্ধমান ২০, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ২য়  
মিত্রপুর, ময়মনসিংহ (২য় দফা) ১৫, শ্রী-  
সারদাচরণ দাস বৈশাখগিরি, চট্টগ্রাম ১০,  
শ্রীপর্যাটচরণ আচা হুগলী, (১ম দফা) ১০,  
শ্রীতারানাথ দাসমণ্ডল ধুবড়ী, ১০, শ্রীশরৎ  
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর, (৩য় দফা)  
১০, শ্রীকবীভূষণ মিত্র হাওড়া, (১ম দফা)  
১০, শ্রীঅমৃতকুমার মজুমদার দ্বিতীয় ময়-  
মনসিংহ ৫, শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন চৌধুরী  
ময়মনসিংহ, ৫, শ্রীশ্রাদ্ধাচরণ সিংহ দত্তব-  
বাজার ময়মনসিংহ, ৩, শ্রীবাখালরাজ খাড়া  
নয়েন, মেদিনীপুর ২, শ্রীব্রজপদ মণ্ডল  
ডায়মণ্ডহারবার, ২, শ্রীহরিশোহন পাল  
রায়সিকি, বনিশাল ২, শ্রীমাহেশচন্দ্র বর্মণ  
চাঁদপুর, বগুড়া ১১।

\* (শ্রীযুক্ত হরিশ রাও-সংগৃহীত)

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সরকার ১০, শ্রীকৃষ্ণলাল  
দত্ত ১০, জনাব আনিউজান দোকানদার  
১, শ্রীকাজিম আলী ঠিকাদার ২, শ্রীমহেশ-  
চন্দ্র গতিধা ১, শ্রীগঙ্গানাথ বরগোহাই ১,  
শ্রীলক্ষ্মীনাথ গগই ১, শ্রীমিনারাম গগই ১,  
শ্রীকমলচন্দ্র গগই, ১, শ্রীদিননাথ গগই  
শ্রীচুর্গেশ্বর বরগোহাই ১০, শ্রীনবীনচন্দ্র গগই  
১০, শ্রীআইতমসিংহ ঠিকাদার ২, শ্রীউমেশচন্দ্র  
পাল ১০, শ্রীবোক্তানাথ রাও ১, জনৈক  
শ্রী ১, শ্রীহরিকান্ত গগই ১, শ্রীভলিআমন  
ঠিকাদার ১, ডাক্তার এস্কে সরকার ৩,  
শ্রীকামেশ্বর কোঠার ১, শ্রীমথুরামোহন পাল

১০, শ্রীকনকোক্ত পাল ১০, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার  
পাল ১০, শ্রীআর্যমোহন মাণিক্য ১, শ্রীঅন্ন-  
চন্দ্র দে ১, শ্রীনীরোদচন্দ্র দাস ১, শ্রীমহেশ-  
চন্দ্র দাস ১০, শ্রীচন্দ্রমণি দাস ১০, শ্রীস্বরেন্দ্রকুমার  
পাল ১, শ্রীমুখ্যনন্দ চন্দ ১০, জনাব গুল  
নবাব সা ঠিকাদার ২, শ্রীআইতমস রায়  
ঠিকাদার ৫, শ্রীরামনিবাস ছবিলাল সিংহ  
দোকানদার ২, শ্রীচিদিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
১০, শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার ১, শ্রীপ্রসন্নকুমার  
দে ১০, শ্রীগিণীশচন্দ্র দত্ত ১০, শ্রীদত্তকৃষ্ণ ত্রিপাঠী  
১০, শ্রীনীরোদব্রজ ভট্টাচার্য ১, শ্রীকিমচন্দ্র  
গগই ১০, শ্রীমুহিরাম বরগোহাই ১, শ্রীমদন-  
মোহন ঘোষ ১০, শ্রীশশধর বিশ্বাস ১০,  
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ আচার্য ১০, শ্রীনরসিংহরাম থালা  
ঠিকাদার ২, শ্রীদলবাহাদুর ছত্রি ঠিকাদার  
২, শ্রীভৈরববাহাদুর ছত্রি দোকানদার  
২, শ্রীদলবাহাদুর রায় দোকানদার ৩,  
শ্রীবিশ্বনাথ দাস দোকানদার ১, শ্রীকমলচন্দ্র  
দত্ত ১০।

সারসংক্ষেপ-মতে

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল দাস হেড ড্রাকটস্-  
ম্যান মার্টিন এণ্ড কোং ১০, রায় বাহাদুর  
শ্রীযুক্ত এসমোদচন্দ্র দত্ত মিনিষ্টার আসামপ্রদেশ  
৮১/৫, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত একজি-  
কিউটিভ ইন্জিনিয়ার শিলং পানৌ ৬৮/০,  
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল  
ভূপূর্ণ কনকগুডেটার ফরেস্ট বিভাগ ৪২,  
শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র বরমা শিলং প্রবাসী ৫,  
শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ দাস ডিঃ পিঃ এন্ড জি  
আসাম ৩, শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রকৌশলী  
সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুণী বিভাগ ১১৮/১০,  
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় ২১, শ্রীযুক্ত  
কামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ২১, শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্র  
চন্দ্র বসু ২১, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত এসমদে  
ভট্টাচার্য ২১, শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র দাস ২১,

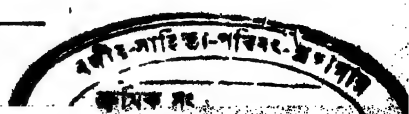


শ্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর মুখার্জী ২১, শ্রীযুক্ত গণেশ-  
চন্দ্র দাস ২১, শ্রীযুক্ত বীণেশচন্দ্র দাস ২১,  
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ শাস্ত্রী, ২১, শ্রীযুক্ত গণপতি  
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্কসর ২১, শ্রীযুক্ত কালীসদয়  
ভট্টাচার্য্য ২১, শ্রীযুক্ত বমানাথ দত্ত ২১,  
দাস সাহেব শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মচন্দ্র দত্ত ২১,  
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গুহ ১৮/০, শ্রীযুক্ত মুক্ত-  
নাথ দেব ওভারসিয়ার শিবচাঁট শিল্প প্রবাসী  
১৮/০, শান্তি নিকেতন মেম ১৮/০, শ্রীযুক্ত  
কিমাংসুমোহন দাস দেওয়ান বিলাসীপাড়া  
এষ্টেট ২১০, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল শিকদার  
সদয় নারায়ণ বিলাসীপাড়া ২১, শ্রীমতী সুকু-  
মারী চৌধুরাণী পক্ষকোয়ার পাঁচআনী এষ্টেট  
রূপসী ২১, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে সবকাব  
খাগড়াবাড়ী ২১, শ্রীযুক্ত বলনাথ গোসাঁট  
সব ইন্সপেক্টর বকো থানা ২১, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-  
মোহন বর্ষণ ততশিলদার বর্ষণডাক্তা কাছারী  
২১, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র তামুলী চেড্ মাষ্টার  
পলাশবাড়ী ১৮০, জনৈক ভদ্রলোক ১৮/০ ।

এক টাকা করিয়া —

শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ আচার্য্য  
চিন্মু বোর্ডিং শিল্প, শ্রীযুক্ত রীজনাথ ফুকন,  
শ্রীযুক্ত দিবাকর গোস্বামী ও ভূষণ চন্দ্র শাস্ত্রী,  
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্ত গঙ্গি,  
শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র  
দে, শ্রীযুক্ত নৈকট্যচন্দ্র চন্দ্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-  
মোহন সেন ভূতপূর্ব চেড্ মাষ্টার শিল্প  
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর  
ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত  
বালুচন্দ্র দাস ওপ্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশ্বর  
নিবাস, শ্রীযুক্ত বামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত  
শ্রীযুক্ত বীণেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ  
চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত শ্রীমতীসুন্দর  
চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিহরী দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত ভট্টা-  
চার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর মুখার্জী, শ্রীযুক্ত বর্ষণ

দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ঘোষ এম্ ডি, শ্রীকালীন্দ্র  
দাস, শ্রীকেশব দাস, শ্রীমতিলাল মিত্র,  
শ্রীমদমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমদনাথ  
মুখোপাধ্যায় শিল্প প্রবাসী, শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ  
চৌধুরী, শ্রীমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, ডাক্তার শ্রীপুল্লী-  
বিহারী দেব, ডাক্তার শ্রীপ্রদেবচন্দ্র পালিত,  
শ্রীকানকীনাথ চৌধুরী, শ্রীশ্রীমদচন্দ্র দত্ত,  
শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র বিলাসীপাড়া, জনৈক ভদ্রলোক  
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শশিভূষণ দত্ত, শ্রীসুকুলচন্দ্র বর্ষণ  
ততশিলদার মহামায়ার স্থান, শ্রীশ্রীকান্ত মিত্র  
বগড়ীবাড়ী তিনআনী, শ্রীশ্রীমদনাথ চক্রবর্ত্তী  
উকিল ধুবড়ী, শ্রীশ্রীমোহন দত্ত উকিল  
ধুবড়ী, শ্রীকমলাকান্ত শাস্ত্রী চেড্ মাষ্টার  
ধুবড়ী হাইস্কুল, শ্রীভবানীকান্ত দাস উকিল  
ধুবড়ী, শ্রীঅপূর্ণকুমার ঘোষ উকিল ধুবড়ী,  
ভূমিদেব দাস উকিল ধুবড়ী, দাস বাহাদুর  
শ্রী বর্ষণমোহন দত্ত ধুবড়ী, শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-  
প্রসাদ সেনগুপ্ত বাহাদুর কোং বর্ষণবাড়ী,  
শ্রীযুক্তদনারায়ণ বকো গৌরীপুর, শ্রীপ্রদেব  
চক্রবর্ত্তী প্রাইভেট সেক্রেটারী গৌরীপুর ষ্টেট,  
ডাক্তার শ্রীব্রজেনচন্দ্র দাস গৌরীপুর, শ্রীপূর্ণ-  
চন্দ্র ঘোষ নাকির গৌরীপুর ষ্টেট, শ্রীলক্ষ্মীমোহন  
ঘোষ এ্যান্ডার্সন সাক্সন এ. " শ্রীচন্দ্র  
চক্রবর্ত্তী ততশিলদার খাগড়াবাড়ী ডিবি, "  
অনাথবন্ধ ততশিলদার ততশিলদার খাগড়াবাড়ী  
কাছারী পক্ষকোয়ার ষ্টেট, " নীলকান্ত শাস্ত্রী  
বকো কন্ট্রোলিং অফিসার, " গোবিন্দচন্দ্র দাস  
চেড্ মাষ্টার কৃষ্ণাই উচ্চপাইমারী স্কুল, "  
" মীতানাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণাই, বাহার, "  
দুর্গানাথ শাস্ত্রী বকো গোসাঁটী উজানীবাহার ।  
সংগ্রহীত—জেল বোড চেষ্টে ৬০/০,  
লাকনী পট্টািতে ১৯০, কৃষ্ণাই ডিবিতে ২৮/০,  
পাঁচআনীর আমলাগণ ১১০, ধুবড়ীতে ১০,  
তিনআনী কাছারীতে ১০, পক্ষকোয়ার ১০  
বর্ষণবাড়ী ৮০ ।



৩ ৩২ সং



# আশ্বিন-দ পঞ্চ

১২শ খণ্ড সমাপ্তি সং ১৯৮	আশ্বিন	প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা
----------------------------	--------	---------------------------

আনন্দলহরী

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য)

অহা অহা বামং বপুঃপরিভূগুন মনসা,  
শরীরাদ্বিঃ শস্তোরপন্নমপি শঙ্কে হতমভুং।  
তথা হি অদ্ভুতং সকলমুৎসাহভং ত্রিনয়নং,  
কুচাক্যামানতঃ কুটিলশিশুড়ালমুকুটম॥

হরের মা বাম-বপু হরি তব তৃপ্ত নহে হিয়া,  
আধখানি ছিল বাকী, তাও বুঝি নিয়াছ হারিয়া;  
তাই তোর ত্রিনয়ন, ছায় তমু অরুণ আভায়—  
ছুটা স্তনভারে নভা—বাকী শশী মুকুটে লুকাই।

জগৎ সূৰ্কে ধাতা হরিকাবতি ক্রুদ্রঃ ক্ষপয়তে,  
 তিরক্ষুৰ্কেষতঃ স্মমপি বপুর্নাশঃ হৃগয়তি ।  
 "সদাপূৰ্ব্বং নৰ্ব্বং তদিদমনুগ্রহাতি চ শিব-  
 স্তবাজ্জামালস্বা ক্ষণচলিতস্রোদ্ৰালতিকস্রোঃ

কোটায় ভুবন ধাতা, রাখে হরি, ক্রুদ্র করে নাশ,  
 অচঞ্চল তমু ঈশ চেয়ে থাকে নয়ন উদাস ;  
 নিখিলে জড়ায় শিব—এ সখার কোথা হতে মুরু ?—  
 আজ্ঞাছলে যবে তোর কেঁপে ওঠে দুটী বাঁকা ভুরু ।

ব্রহ্মাণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিব-  
 ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণস্বার্থা বিরচিতা ।  
 তথা হি স্রবাপাদোদবহনমণিপীঠস্য নিকটে,  
 স্থিতা হেতে শশ্বমুকুলিতকরোত্তমসমুকুটাঃ ॥

আকুল হৃদয়ে যদি পূজি তোর ও রাঙা চরণ,  
 ত্রিগুণ ত্রিদেবতার পূজা তবে হবে অকারণ ;—  
 তারা তো রয়েছে মাগো, মণিময় তব পাদপীঠে  
 ঠেকায়ে মুকুটখানি চিরকাল কৃতাজ্জলিপুটে ।

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চস্রং ব্রজতি হরিরাপ্রোতি বিরতিং  
 বিনাশক্ষীনাশো ভজতি ধনদো ষাতি নিধনম্ ।  
 বিতঙ্গা ঋাহেন্দ্রী বিততিরাপি সখীলতি দূশাং,  
 মহাসিংহান্নেহ স্মিন্ বিহরতি সতি স্রবপতিরসো

বিরিঞ্চি পঞ্চোতে মিশে, হরি করে লীলাগম্বরণ,  
 অতলে কুবের ডুবে, মরণেরও ঘটে যে মরণ ;—  
 তল্লাহীন ইন্দ্র-আখি সারি সারি মুদে মহা ঘুমে  
 সে প্রলয়ে জাগে সতি পতি তব সুধামুখ চুমে ।

সুখামপ্যাস্বাদ্য • প্রতিভয়জরা-মৃত্যু-বিনাশীং,  
 বিপদেষু বিশেষে বিধিশতমখীঢ়া দিবিসদঃ ।  
 কল্পাসং স্বং ক্ষেপ্তং কবলিতবতঃ কালকলনা •  
 ন শঙ্কোস্তমূলং জনানি তব তাড়কমহিমা ॥

অরিভয়-জরা-মৃত্যু-বিনাশন অমীরস পিয়া,  
 বিধি বা বাসব হোন্—সুরেরও মা দুৰু দুৰু হিয়া !  
 গরাসি গরলে শস্ত্র-এড়ালো যে মরণ-পরশ,  
 তার মূলে আছে বুঝি মাগো তব সরস রতস ।

জপো জপঃ শিষ্যং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং  
 গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাঢ্যাহুতবিধিঃ ।  
 প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা,  
 অপৰ্য্যাপৰ্য্যায়স্তব ভবতু সম্মে বিলসিতম্ ॥

জপনা হবে মা জপ—শিল্পকলা মুদ্রাবিরচন,  
 গতি তোরে প্রদক্ষিণ—অশনে মা আহুতি-অৰ্পণ ;  
 শয়নে প্রণাম তোরে—সুখ যত আত্মনিবেদন—  
 যা কিছু আমার বলি, সকলি যে তোরি মা পূজন ।

দদানে দীনেভ্যঃ শিষ্যমনিশানাশ্বানুসদৃশী-  
 মমন্দং সৌন্দর্য্যস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি ।  
 তবাস্মিন্ মন্দ্যস্তবকসুভগ্নে ষাভু চরণে,  
 নিমজ্জন্-অজ্জীবঃ কল্পণচরণৈঃ স্বহৃচ্চরণতাম

সৌন্দর্য্যস্তবক-চ্যুত-বিকিরিত-মকরন্দ-ধারা  
 মন্দ্যস্তবক-তোর চরণে মা লীন দীন যারা—  
 অতুল সম্পদভাগী তারা যদি হয়েছে অমর,  
 করণ-চরণ হয়ে হয়ে কেন থাকি না ভ্রমর ।

মা !

—\*:#(0#\*:—

মৃগয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা করনা-দামনা ভূমি-  
সাং করে যায়--সে চিরায়ের আবেশ লাভ  
করবে বলে। আঘাতে 'হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ' হয়ে  
গেলে তবুই তো দিয়ে নতুন গঠন সূত্র হয়।  
চিরায়ী মায়ের রাগা পা দুখানি যে 'হৃদয়ে' ধরে  
রয়েছে, তার জাঁপি যত অশ্রুসজল হয়,  
ততই সে মাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। বাইরের  
দৃষ্টিকে অন্ধ করে তবে মা ভিতর আলো  
করে দাঁড়ান। আজ জগৎ কি হয়ে আছে,  
কোথায় আছে, কেমন আছে—তা ঠিক ঠিক  
জানব, যদি একটাবার সকল দুয়ার রুদ্ধ  
করে হৃদয়ের যত কামনা, করনা, উচ্ছা,  
অহংকার নিয়ে তাঁর পারে অঞ্জলি হই। আপ-  
নাকে যে দিয়ে রেখেছে, নিজস্ব যে ভুলে  
গেছে—ভারই তরে মায়ের হৃদয় সর্বদা  
ব্যাকুল। তাঁর আলীশ্রীয়া শিরে ধরে জগতে  
নেবে এসেছি, এ অমৃতভূতি যার নিরন্ত নাই,  
তার আমিত্বই নন্দন। আমি থাকব—কিন্তু  
মায়ের আমি হয়ে। নিজকে ভোগা মানে  
নিজকে তাঁর বলে জানা।

#

ভূমি প্রাণে বাই জাগিয়ে দাও মা, তাই  
বিশ্বাস করি—তোমাছাড়া আর কারো ত  
হতে চাই না আমি। তবে যে ভুলে বাই, তবু  
যে ব্যথা পাই, সে ভূমি দাও বলে নয়—  
আমরা নিই বলে। ভূমি তো মা হৃদয়ের  
সকল বেদনা চলে দিয়েই রেখেছে—কত  
অত্যাচার কত নিষ্ঠাভ্রম অবিরত বুক পেতে  
সইছ—এ অবোধ যে সে কথা জানে না।

তোমার দিকে চাইবার অবসরও যে তার  
ছিল না—কেবল সে নিজকে নিয়ে মত্ত রয়েছে  
বলেই যা তোমার করুণা, তাই তাঁর বৃকে  
ব্যথা হয়ে গেছে। এ ব্যথার শেষ নাই—  
জগৎ জুড়ে কেউ না কেউ তোমার জন্ত  
কঁাদছেই; শেষ হতে দিতেও চাই না—  
চিরকাল যেন এমনি করে কঁদে কঁদেই  
যেতে পারি—কেমনা তোমার পাবার যে  
আঁকুলতা, এ ব্যথা তারই মাতা।

ও-ও তো তোমারই, এক মুষ্টি মা—হৃদয়  
জুড়ে যত বিকোভ উঠছে, সবরে মাঝেই  
যে তোমার নৃত্যের ছন্দই আমি পাই।  
অপরায়ী সন্তানের বক্ষে যে আশ্রয় জলছে,  
সেই তো তাকে শুদ্ধ করবে, রিক্ত করবে—  
তবে না তোমায় মনে পড়বে। তবে আর  
তোমা ছাড়া কি আছে জগতে? যা আছে,  
আলো-আধার, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সবর  
মাঝেই যে ভূমি কি এক বাঁধন দিয়ে রেখেছে—  
যাকে ধরি, গেই যখন মিলিয়ে যার, তখন  
তোমার কোণেই ফেলে দিয়ে যার। এ  
বাঁধনে বাঁধা আছি জেনে কত বড় মুক্তি  
যে পেয়েছি, অহুতাপ আর বার্থতার জগদল  
পাখরট। কত হাঙ্কা যে হয়ে গেছে, তাবলে  
অবাক হয়ে বাই। আমি তো কিছুতেই বুঝতে  
পারি না—তোমার স্বাধীন না হয়ে কেমন  
করে আবার স্বাধীন হওয়া যায়—আর সে  
স্বাধীনতার সুখই বা কিসের?

#

৭ যদি ভূমি মাই দেবে, তবে এমন কঁাদাবে

কেন? কাঁদিয়ে দাও বলেই যা আমনা পাই শুধু তাকেই পাই না—তার চেয়ে এমন অনেক কিছু বেশী পাই। বাস্তবিক যার অভাবেই হৃদয় কাঁদছিল; কল্পনায় যাকে নির্দারণ কবেছিলাম, ভাষায় যাকে প্রকাশ করে-  
ছিলাম, সে তার চেয়ে অনেক ছোট, অনেক তুচ্ছ। জগতে আমাদের যা প্রকৃত অভাব, তার যে প্রকাশ হয় না এবং তা যে চিরন্তন সত্য—তা বুঝি তথনি। বাস্তবিক যা দিবার তা তুমি দিয়েই রেখেছ—তবে যে কেন্দ্রে আমি, যা সত্য, তা সহজ হবে বলে।

✱

কি দিয়ে তুমি কি কর, কিছুই জান না—কেবল প্রাণের ব্যাকুলতাতেই তোমাকে বিশ্বাস করি। এই যে হৃদয় জুড়ে তোমার আকর্ষণ—তোমাকে দেখলে, তোমাকে ভাবলে এই যে প্রাণের অব্যক্ত আবেগ—এর চেয়ে সত্য হয়ে আর কখনো তে তুমি দূর দাও না মা! দেখা দেবে কি না জানি না—জানতেও চাই না—কেন না তবু আমার কল্পনার অতীত। কেননা করে কোন বৈশেষ এলে আমার ভাল লাগবে, তা তুমিই জান—যে ভাবনায় আকুল হওয়ার চেয়ে নির্জন কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। ভাল এক জগতই ভাল যে, চক্ৰকাল তুমি ঐ রূপেই হৃদয়ে এসেছ—আমার শক্তির উপর বিশ্বাস আর তোমার উপর দাবী যখন এক হয়ে গিয়েছে, তখন তোমায় পেয়েছি। কি আমার বলব ম—নগে যে শেষ হয় নী—প্রাণে শুধু এই ধ্বনিও উঠেছে—মা, মা! তুমি যাছ—এত নিকটে আছ যে ধারণাট করতে পারিনি। যখন সব ভুলে গিয়ে চরণে মিশে যাব, তখনি পাব।

সে দিন কি আসেনি? তা জানি না—

কিন্তু জানি আসবে। এমন একদিন জীবনে হবে, যখন বুঝি, চিরকাল তোমার চরণে লীন হয়েই আছি—লীন হয়েই থাকব। আমাকে তখন আর জগৎ থেকে আলাদা ভাবনা—জগতের ধূসর স্থপতি আমার স্থান, সবার পাওয়াতেই আমার পাওয়া হবে।

✱

কেল তোমারি প্রতীক্ষায় নিয়ত ব্যাকুল কাম্পিত হৃদয়—এই তো আমার আনন্দময় জীবন। তোমার স্তম্ভামৃতদারা যে চিরতরে সন্ধানের অঙ্গুরে অঙ্গুরে প্রবহমান—যাকে তুমি জানিয়ে রেখেছ, সে-ই একথা জানে। এনে যা আসছে, তাই মিলিয়ে যাচ্ছে, অটুট রয়েছে শুধু এত আনন্দের আবেশ—তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে যে নির্ভিড় রূপের বন্ধন, তারই স্বাভাবিক উন্মাদনা—কণিক উজ্জ্বল-সের স্তম্ভতার চেয়ে, যার অমৃতত্ব কোটীগুণ তীব্র, অল্পময় উজ্জ্বল। এ আনন্দ চলে জগতের কাউকে বাক্ত করতে চলে না—বাক্ত হবার পথও নাই। কেননা জানি, জগতে এ দুই-ই সত্য—এক তুমি, আর এক আমি; আমি যদি আমার বাধা না হই, নিজের মংল-বাজীর চেয়ে আদর্শের আহরণ, তোমার আদেশের ধীরে বাদ আমার কাছে বেশী স্মরণ হয় তবে তোমাকে আমি অবাদে পাব। এমন গাণ্ডি ক'রনে আসবে না, যা তোমা থেকে আমাকে চিরতরে বাক্ত করতে পারে।

✱

আজ সে বুঝি, ব্যাকুলতার পরিস্রবিতা ছিল অমৃতত্ব শাট। মায়ের আসন দেই খানে। তাঁর দিক থেকে যা আকর্ষণ, আমা-দেহ প্রাণে তাই ব্যাকুলতা ব্যাকুল হয়ে

চাইতে চাইতে একমিনি গিরে সেই অমৃতভূতির  
 রাজ্যে মায়ের কোলে গিরে পড়বই পড়ব  
 জীবনের যা কিছু সাধনা, তারই লক্ষ্যে এত  
 আত্মসমর্পণ। মায়ের কোল ছেড়ে এসে  
 আমার আমোদে মেতে আছি—তাই শান্তি  
 পাচ্ছি না। নাও যে আমার ভাব নাই তাব-  
 ছেন—তাই অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাব  
 স্পন্দন উঠছে। এত ব্যাকুলতাই পছন্দ। এত  
 পছন্দ থরে চলতে চলতে যতই স্বার্থ ভুলব,  
 ততই অগ্রসর হব।

\*

তিনি নির্বিশেষরূপে জগদ্ব্যাপিনী হলেও  
 বিশেষ বাসরে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। এত  
 একটা দিনে একটা মুহূর্তের ব্যবধি  
 কোটা হৃদয়ের যেতুল ভেঙ্গে যায়, কত  
 কোটা কণ্ঠ যে একই মুহূর্তে “মা মা” রবে  
 ধ্বনিত হয়ে উঠে, কোটা হৃদয়ের আবেগ  
 ধনীভূত হয়ে যে অব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি করে—  
 এই অমৃতভূতই মায়ের বিশেষ পূজা।  
 সেদিন আমি আমারই হৃদয়কে জগন্ময় ব্যাপ্ত  
 দেখতে পাচ্ছি—মা সেদিন যেমন আমার,  
 যুগপৎ তেমনি আমাদের। একা ডেকে যখন  
 ডাক্তার পাই না, বিধের বড় ভক্ত, অমৃতভবে  
 তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে তখন  
 ডাকি। এত মিলনের আয়োজনই পূজার  
 শ্রেষ্ঠ উপচাষ।

\*

না গো, এটি তরুণ হৃদয়ের ত্ববিত আবেগ  
 কেনে সার্থক হবে—কেনে প্রাণের বাধা  
 তোমার দ্যাব্তময় পরশ পেয়ে থিতু হব।  
 পলে পলে অজ্ঞপরাভয়ের ঘেঁ বেদনা প্রবর্ত  
 সাধকের জীবনকে কতবিকৃত করেই আত্মপ্রকাশ

অর্জুন, কণে, তার পেছনে তোমার অনোখ  
 অমূল্যমূল্যে, মেহমতাময় দৃষ্টির কিরণ-  
 সম্পাত কবে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারব!

\*

দেয়ার কবে, পেছনে আমি দাঁড় করিয়ে  
 তোমার নাম মুখে আনব, তোমার পূজা  
 করব—এতেই তো আমার জীবনের সাধকতা  
 নথ। তা যদি হয়, তবে কেন প্রাণে এমন  
 উদ্বেগ আসে? “নাম করেও সে নামকে কেন  
 হৃদয়ের বাণীরূপে পাই না—তোমার নামও  
 তো কখন কখন বর্ণসমষ্টিমাত্র হয়ে ভাষা-  
 ভায়ে চোঁকে আক্রান্ত কবে রাখে। এমন  
 কেন হয়? কেন তোমার কথা ভুলে গিয়ে  
 আনন্দের আধারে ঝাঁপিয়ে পড়ি?  
 তোমাকে ডাকা, তোমাকে ভাবা যদি আমার  
 স্বভাব না হলে, তোমার পেয়ে আনন্দের যদি  
 না হলাম—সে শান্তি তুমি না দিলে তো  
 আমাকে ধরে রাখতে আমি পারব না।  
 আমার সকল অশক্তির মাঝেই তোমার  
 মণীশক্তি সঞ্চারিত হবে—আমাকে আমি  
 বতটুকু তোমার উপর ছেড়ে দেব, ততটুকুর  
 তারই তুমি নেবে—এ বিশ্বাস, এ ভরসা  
 প্রাণে কেন দিয়েছ, যদি আশঙ্কায় চিরকাল  
 তা কণ্টকিত হয়েই থাকবে? আর আমি  
 আমি ভাল লাগে না—একবার তেমন  
 সজ্ঞাভাবে আমিটাকে চূর্ণ করে দাও মা।

\*

জীবনের সাধ-আফ্লাদ, করুণা-জরনা  
 সকলি বিসর্জন দিয়ে আমি যেন শুধু তোমার  
 করে থাকতে পারি—এই আমার হৃদয়ের  
 সাধ। কোন বাহ্যাই তো তুমি অপূর্ণ রাখনি  
 মা—আমার প্রয়োজন আমি কতটুকু বুঝি—

যা না চেয়েছি, তাও তো তুমি আমার সময়ে  
সবি দিয়েছ। সন্তানের প্রাণে মঙ্গলময়ীরূপট  
যে তুমি বিরামিত আছ—তখন কেন এমন  
আশঙ্কা, নিজের জন্ত নিজের কেন এমন  
ব্যস্ততা? আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা অনিচ্ছার উপ-  
রেও কি আর কোন ইচ্ছা ক্রিয়া করে না।  
যে ইচ্ছা যখন আমার মাঝে আমি ছিল না  
তখনো তাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে  
এনেছে? আমার এ অহংকার কয় মুহূর্তের  
জন্ত? মুহূর্তের আঘাতে যখন সমস্ত চূর্ণ-  
বিচূর্ণ হয়ে যায়, গর্ভোদ্ধৃত উচ্চশির যখন  
তোমার আদেশের পরতলে বিলুপ্ত হয়ে  
পড়ে, তখন কোথায় থাকে এ আমার উচ্ছ্বাস,  
কোথায় থাকে কল্পনার অভিশাপ? মিথ্যা  
আমিটাকে এত বিশ্বাস করতে পারি, আর  
তুমিরূপ সত্য যে আমার অন্তরে ধ্যানস্তিমিত  
শান্ত সমাহিত হয়ে রয়েছে পলকে পলকে  
যার শক্তি মাতৃস্তনের মত নীরবে ক্রিয়া করে  
জীবনের ভিত্তি সংগঠন করে আসছে, তার  
উপর বিশ্বাস করতে পারি না? আমি যদি  
আমাকে ছেড়ে দিই, তবু তো তুমি বৃকে  
করে রাখ—তাতেও তোমার মহিমা বুঝতে  
পারি না?

#

ঐ কেমন রহস্য? কেন নিজের উপর  
এমন আকর্ষণ? এ আকর্ষণকে 'বে আরো  
তলিয়ে নিজেরই ভিতরে তোমাতে সুসম্পূর্ণ  
করতে হবে; এ নইলো তৃপ্তি নাই—তৃপ্তি  
থাক না থাক, এ না করে যে আমি পারব না  
জানি। বারবার আঘাতের করুণ স্পর্শ দিয়ে  
তাই যে তুমি জানিয়েছ মা। হৃৎপিণ্ডে আমার  
জীবনে তোমার দেওয়া কত বড় স্থান, এ

থেকে তাই, বুঝেছি। দিনের পর দিন  
তোমার রূপা এই বোধের ভিতর দিয়েই  
চিত্তে উজল হয়ে উঠছে। হৃৎপিণ্ডে জীবনকে  
সত্য এবং সজ্জ প্রাণান্তির অধিকারী করে  
তুলেছি।/মাগো, তোমার রূপা যে জীবনে  
কত রূপে লীলাময়, ভেবে অবাক হয়ে যাই,  
পুলকে মন-প্রাণ কাণে কাণে উবেল হয়ে ওঠে।

আমি কিছুট হারাইনি মা—শুধু হারিয়ে  
ছিলাম তোমাকে। আমার বাঁ চারিরেছে  
ভেবে মনের হৃৎপিণ্ডে একদিন কাতর হয়েছি—  
আজ দেখেছি, সে ক্ষতি আমার ক্ষতি নয়—  
পরম প্রাপ্তি; বঞ্চনা নয়—চরম তৃপ্তি।  
নিজে থেকে তোমার পূজা করিনি বলে জোর  
করে তুমি পূজা করিতে নিয়েছ;—সর্বস্ব  
যদি আমার গিয়ে থাকে, তবে তোমার  
চরণোদ্দেশ্যেই গিয়েছে, আমার জীবনের  
আত্মজ্ঞার বলি অঞ্জলি হয়ে তোমার চরণেই  
শোভা পেয়েছে।\*

#

আমাকে আমার করে স্থান নই মা—  
তোমার করেই স্থান। তোমার ডাকের অন্তর  
পূর্ণ করে 'বিশ্ব ছড়িয়ে পড়া, বিশ্ববাসী তাই-  
দের তোমার জ্ঞানে জান', তোমার প্রেমে  
পাওয়া—এই মা তোমার পূজা। পুত  
একাগ্র চেষ্টিয় ইচ্ছনে, অনির্বাক্য তপস্তার  
অনলে আত্ম-সংস্কার করে নেওয়া—এ শুধু  
সেই শক্তিই লাভ করবার জন্ত, যে শক্তিতে  
বর্ণার্থভাবে তোমার পূজা করা যায়। করুণা-  
ময় জননি, আমার এই কবর—আত্মনিবেদনের  
আনন্দই যেন আমার জীবনের সর্বস্ব হয়,  
শরনে-বর্গনে-জাগরণে অবিরত তোমার পূজাই  
যেন আমার জীবনে জীবনীশক্তিরূপে বিরাজ  
করে। , ও শান্তি:



# প্রেম ও কৰ্ম

—:[:#]:—

জগতে কৰ্মও আছে, কৰ্মবিৰতিও আছে।  
 বপাৰ্থস্থ কৰ্মবিৰতিতে না কৰ্মের পরি-  
 পূৰ্ণতা; এ কথা প্রচণ্ড কন্মীও স্বীকার  
 করেন। তবু লোক “কৰ্ম করে—করে  
 হাঁপিয়ে মরে; এ শুধু কামের তাড়না।  
 কামই কৰ্মকে সঞ্জীবিত রেখেছে। ভোগ  
 কামের অধীন নয়। কামের পরপানে কৰ্ম-  
 বিবর্তির উদার আশ্রয়েই ভোগের উদ্ভাস।  
 ভাবকের মন সংসার কোলাহল হতে দূরে  
 থেকে একান্ত বিবিক্ততা মাঝে আনন্দের  
 আশ্বাদ পেতে চায়; তার মূলে এই অনতিস্ফুট  
 অপ্রাকৃত বেদনা। কৰ্মগ্রস্ত তার মাধুর্য  
 বুঝতে পারে না। কামের তাড়নায় কৰ্ম-  
 বিকারে যে উদ্ব্যস্ত, তার ভোগের অবসর  
 কোথায়? অরুণোদয়ের সলাহ হাসি, সৌর-  
 করেজ্জল ধরণীর সৌন্দর্যসুখ, সন্ধ্যার করুণ  
 বৈরাগ্য—সব তার চোখের সামনে অপকৃপ  
 মারা বিস্তার করে চলে যায়—কিন্তু সে যে  
 অন্ধ; ভোগের উপকরণ থাকলেও কামকের  
 ভোগসামর্থ্য কোথায়?

কিন্তু কৰ্মও তো জীবনের একটা সত্য;  
 শুধু কৰ্মবিবর্তিতে বিশ্রাম করা তো সম্ভব নয়।  
 বিশ্রাম আর শুভতা—তুয়ের সীমা নির্দেশ  
 করবে কে? ‘ভগবান’ সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি  
 করেছেন আবার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন।  
 সাধারণ মানুষের কথাই বলছি—কত পান্থার  
 মাঝেই তাকে দিন কাটতে হয়। যেমন  
 শুধু কৰ্ম নিয়ে থাকলেও চলে না, তেমনি  
 শুধু সৌন্দর্য্য উপভোগ নিয়ে থাকলেও চলে

চলে না। দুয়ে সামঞ্জস্য হলে তবে জীবনে  
 রসের সঞ্চাব হয়। কি করে তা সম্ভব?

প্রথমতঃ কৰ্মের বিষ নষ্ট করতে হবে।  
 লক্ষ্য যখন প্রিয়প্রীতি, আত্মা যখন দেহের  
 আনরণে আবৃত, তখন কামের তাড়নায় কৰ্ম  
 —এ কথা সত্য। কিন্তু আত্মার উদ্ভাসনে  
 কৰ্মের রূপান্তর হয়। লক্ষ্য যেখানে পরার্থ-  
 পরতা, আত্মা যেখানে অনাবৃত মহিমায় ভাস্বর  
 —কৰ্ম সেখানে অভাবের তাড়না হতে প্রসূত  
 নয়, কৰ্ম তখন স্বভাবের প্রেরণায় উৎসারিত।  
 এই কৰ্ম সেবা; সেবা বতাব, অতএব  
 মুক্তি সিংহদার, বন্ধনডোর নয়। এমনি  
 কামনাচীন নির্লিপ্ত কৰ্মের জোয়ারে যে ভেসে  
 চলেছে, তার ভোগের স্বরূপ ও উপায়  
 কি? সেই কথাই এখন বিচার্য্য।

কামের তাগিদ যখন জোরে আসছে,  
 তখন সৌন্দর্য্যভোগের স্পৃহাকে যদি অজ্ঞের  
 মাঝে তুলিয়ে দেওয়া যায়, তবে একটা  
 অনির্লচনীয় রসের আবাদন পাওয়া যায়।  
 একটা লৌকিক উদাহরণ দিই। ঘরের বউ  
 ঘরকন্নার কাজ করছে, আবার তারই মাঝে  
 এক ফাঁকে এরের সাথে চোরাচাউনীর গিনি-  
 ময় হয়ে গেলে, তাঁদের কোনে হাসির  
 বিজ্ঞাপন চমকে গেল। ঘাঁদের মাঝে হৃদয়ের  
 বন্ধনই সত্য, অজ্ঞের অজ্ঞে ঘাঁরা পরস্পরকে  
 স্নেহের পাকে জড়িয়ে পেরেছে, এমন মিষ্টি  
 হাসির সাথে চোরাচাউনী তারাই হানুতে  
 পাগে। তখন শুধু মুখোমুখী একান্ত নির্জনে  
 পরস্পরকে পাওয়া নয়—এ পাওয়া তার

চেয়েও গভীর ; তাই চোখের চাওয়া কণিকের হলেও সেই পলকে সমস্ত প্রাণ কেঁপে ওঠে। কেননা পাওয়া তখন বাইরকে ছেড়ে অন্তরকে স্পর্শ করেছে। বুকের মাঝে এমনি করে পেলেই বাইরের পাওয়ার জন্ত আর ব্যাকুলতা হয় না। তখন বাইরের একটুখানি ছোঁয়াই অন্তরের স্পর্শমণির স্পর্শে সোণা হয়ে ওঠে।

কন্ঠের মাঝেও ভাবের সৌন্দর্যালক্ষ্মীকে ঠিক এমনি করেই পেতে হবে—সংসারের বাস্তব কোণাহলের মাঝে রসিকযুগলের চোরা চাউনির মত। তাই তো বলি, চোখের পাওয়ার চেয়ে বুকের পাওয়া বড়! এরই একটা প্রাকৃত দিক দেখ। নরনারীর মাঝে দৈহিক আশঙ্কালিপ্সী আছে এবং তার তাড়নাও নিত্য কম নয়। এই আশঙ্কালিপ্সিকে যতই হীন চোখে দেখি না কেন, স্বীকার করতেই হবে, এর মাঝেও দেহের অতীত একটা কিছু আছে। কামের পাংসুফালে প্রেম আচ্ছাদিত রয়েছে, সেই তো রসের যোগানদার। একথা সত্য, যারা কামুক, তাঁরাও এট প্রেমকেই চায়; অমৃতের লোভী তারাও, তবে কিনা এঁটো শান্ধী পেতে তা পান করতে চায়। যারা দেহমুগ্ধ, তারা দেহ দিয়েই প্রেমের তীব্রমধুর আবাদন পেতে চায়; তাই সাধারণ নরনারী ভালবাসার পরস্পরের দেহের নৈকটা খোঁজে। অবশেষে এট নৈকটা রসণ স্মৃতি পর্য্যবসিত হয়।

এ-ও প্রকৃতির খেলা। প্রেমের সাধনা করতে গিয়ে যখন আমরা তার কাম-পরিণতিটাই বড় নজরে দেখি, তখনি তো ভুল হয়ে যায়। তখনই বুকের ভাণ্ডাকে চোখের পিপাসার নামিরে আনি—আর,

সেই হতে জ্বালা শুরু হয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ কন্ঠের সঙ্গে বিরোধের দ্বন্দ্বপাতও এইখানে। কণ্ঠস্রোত আর সহজভাবে তখন বইতে চায় না—সবার পেছনে একটা স্বার্থ, একটা লালসা প্রচ্ছন্ন থেকে কন্ঠকে কোণি বক্র করে তোলে। আত্মস্বার্থে মানুষ তখন নির্জনতা খোঁজে—কোলাহল এড়িয়ে বেতে চায়। এ তো স্বার্থপরতা—আত্মঘাতেরই নামান্তর।

বাইরের পাওয়াটা বিকার, ভিতরের পাওয়াটা মৃত্যু, এই বোধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জন্মাবে, ততক্ষণ শান্তি নাই, তৃপ্তিও নাই। কন্ঠের বা কামের অধঃস্রোত গেরে প্রাকৃত মানুষ নেমে যায়। নরনারীর আসঞ্জেই দেখি, ভাব হতে রূপ—রূপ হতে হাণ, লীলা, দিলাস এবং পাংগোষে অঙ্গসুগ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—এট হল প্রাকৃত ভালবাসার পরিণতি। প্রেমে নববাসনের শুরু রমণে তার চিতারোহণ। কামতৃপ্তিতে এক পর্ব শেষ হলে আবার গোড়া হতে প্রেম দিয়েই অভিনয় শুরু হল। কবীরের অর্থাৎ এমনি “কোড়ীকে ফেঁকামে অনমূল জীবন” মাটা হয়ে যায়। আর যে পর্য্যন্ত সবটুকু নিঃশেষে ধ্বংস না হয়ে যায়, সে পর্য্যন্ত মানুষের কামনার শান্তি নাই।

কিন্তু রসিক সাধক চলে বিপরীত পথে, তাকে উন্নীত পেতে যেতে হয়। শুধু রূপকের কথা নয়—সত্যি কথা এট যে রমণসুখ তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। একটু চাঁকনি, একটু স্পর্শ—এট তখন হয় বিলাসের চরম। অর্থাৎ ওটুকু উপলক্ষ্য মাত্র। বাইরের ওটুকু হ্রস্ব ধনে অন্তরে তখন রসের লীলা চলতে থাকে—আর সে লীলার গীতা পরিদীপা থাকে না। এই হল অধ্যাত্মরমণ বা রাসলীলা—এতে তাড়না নাই,

প্রেরণা আছে—এ স্বভাবের ক্ষুধা, অভাবের বিকোভ নয়। আর কামের শেষ আছে, প্রেমের তো নাই। সেই চোরা চাউনীতে মনে করে দেখ না কেন। একটা চাউনীতে বুকে যে চেটে উঠল, তার আর শেষ নাই; প্রিয়তমের বুকের কুলে আঘাত করে আবার তা তারই বুকে ফিরে আসবে—আব এমন করে অনন্তকাল ধরে ঢুকল ছেঁগ চেটে এব দোল খেলতে থাকবে—যদি এর মূলে কাম-গন্ধ বা দেহপ্রীতি না থাকে। যেখানে দেহগন্ধ ঘোটেই নাই, অথচ প্রেম আছে, সুখ আছে—সেখানেও ছয়ের শেষও নাই। ভালবাসা যদি দেহ আশ্রয় করে থাকত, তাহলে দেহের সজ সজ্ঞে তারও শেষ হত। কিন্তু প্রেম নিরাশ্রয়, অতএব অমর। তবে সে যে দেহ আশ্রয় করে, কখনও না দৃষ্টিতে, স্পর্শে চুষনে, আলিঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করে—এ তার বিলাস! প্রেম যেখানে আত্মার আশ্রিত, সেখানে এই চুষনে আলিঙ্গনে দেহ ধন্ত হয়ে যায়—রাজার করুণাকটাক্ষে প্রজা\* যেমন ধন্ত হয়। তা না হয়ে এই যে প্রাকৃত কমলীলায় দেহের হুকুমে রাজসিংহাসন ছেড়ে প্রেমকে নেন্দে আসতে হয়েছে, ভেবেছ কি এই অম-ক্যান্দার কোনও শাস্তি নাই?

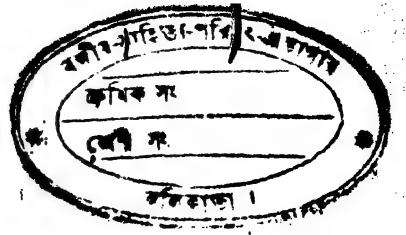
হে ভাবুক, এই তার তোমার কণ্ঠে আরোপ কর। প্রেমে যেমন দেহ আর আত্মার সন্ধি হয়েছে—তোমার ভাবে আর কণ্ঠে

ভেদনি সন্ধি হোক। তোমার আনন্দলোলুপ চিত্ত নিরন্তর ভাবোন্মুগ হয়ে থাক—সেবার অন্তরালে মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময়ে অনন্ত চিনা-কাশ ব্যাপে সুখের হিল্লোর জ্যোতির লহরে লহবে কেঁপে যাক—তুমি ধন্ত হয়ে, জগৎ তোমাকে পেয়ে ধন্ত হবে।

যদি ভালবাসতে চাও, তবে দেহমনবুদ্ধির সংস্কার দিয়ে প্রিয়জনকে চেও না। রাজ ওদের ভাবাই তোমার কাণে বাজছে, কিন্তু এই ভাবার আড়লে আত্মার যে ভাব অগত্য রয়েছে, তুমি তাকেই ব্যক্ত করতে চেষ্টা কর। আজ যদি রূপলালসা বা স্পর্শলালসার আকারে প্রেম তোমার মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তুমি তাই তার চরম দান মনে করো না—রূপ ও স্পর্শকে অতিক্রম করে তুমি ভাবে পৌছানার চেষ্টা কর। বস্তুকে অগণ্ড পর্থা-বসিত কর—ভাবের সন্ধান পাবে। হৃদয় সং-স্কারে আবদ্ধ থেকে না—সমস্ত সংস্কারকেই ত্র্যক্ষের আনন্দচেতন। রূপে প্রত্যাক কর।

জগতে যা কিছু সমস্তই ভাবের প্রতিমূর্ত্তি। দেহ ইন্দ্রিয় মনের সংস্কার নিরপেক্ষ থেকে শুদ্ধ ভাবকে ধারণা করতে শেখ, দেখবে একটু-খানি চোরা চাউনীতে, বুক কেঁপে ওঠে কিনা। 'এই হল সহজ জীবনের সিদ্ধি—কণ্ঠের মাঝেই কণ্ঠবিরতির অমৃত আনন্দন—এই আধারেই প্রেমের পরম প্রকাশ।





## ভক্তির শ্রেষ্ঠতা

সমস্ত সাধনপথের মধ্যে ভক্তিপথটি শ্রেষ্ঠ, এই কথা অবিসংবাদিত না হইলেও এক সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের কথা বটে। দীর্ঘকাল আচার্যগণকে এই কথার যথার্থতা নিরূপণ করিতে হইবে।

আর্য্যসভ্যতায় নিকারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মাঝে যথাক্রমে চারিটা সাধনায় আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে আমরা দেখিতে পাই—কর্মের প্রাধান্য। যাগযজ্ঞ, মন্ত্র, দেবতা ইত্যাদি লইয়া সাধনায় এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। তাৎপর্য্য কর্মপন্থা মলিন হইলে কিম্বা তাহারই পরিপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপন্থার উন্মেষ ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। বেদনির্দিষ্ট সনাতন পথ এই দুইটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড তাহার সাক্ষী। উপাসনাকাণ্ড নামে তৃতীয় কাণ্ডের অস্তিত্ব অনেক প্রমাণ করেন বটে, কিন্তু নানা কারণে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপরোক্ত দুই কাণ্ডেরই পৌষক বলিয়া মনে করি। সে বাহা হউক, বেদনির্দিষ্ট জ্ঞানপন্থার বিশেষণে অথবা বৈদিক জীবনধারণপ্রণালীর স্বার্থতায় তৃতীয় যুগে এক অভিনব বিচারপন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বেদে ইহার বীজ থাকা সত্ত্বেও সাধনপ্রণালীতে উহা বৈদিক সনাতন রীতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। মহর্ষি কপিল উহার প্রবর্তক। বৃত্তির অন্তঃকোচোদ্যায় আত্মতত্ত্ব নিরূপণই ইহার লক্ষ্য। এই দর্শনের যে অংশ

বিচারের সহিত যুক্ত রহিয়াছে, তাহা সাংখ্য এবং যাহা সাধনার সহিত যুক্ত, তাহা যোগ নামে পরিচিত। লক্ষ্য হিসাবে উভয় পন্থায় পার্থক্য বড় অল্প। তাই সংক্ষেপে আমরা উভয়কে যোগমার্গ বলিয়াই অভিহিত করিব। পৌরাণিক যুগের আদিভাগে এই যোগবিজ্ঞান বহুল প্রচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। কালে যোগবিজ্ঞান হইয়া আসিলে সর্বসাধারণের উপযোগী ভক্তিধর্মের প্রচার হয়।

বর্তমান যুগে ভক্তিধর্মেরই জরাজরকার। কালিক পরিণতি অনুসারে উহাই আজ আমাদের জাতীয় ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাণের আত্যন্তিক ক্ষুরণ ব্যতীত কর্মপথে সিদ্ধলাভ সহজ নহে; বিশেষতঃ কর্মপথের সকলতা সমস্ত সমাজের সার্বভৌম একমুখী শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তজ্জের মাঝে কর্মদর্শনের একটা অন্তঃসলিলা ক্ষণবারা আমাদের দেশে আজও বহিতেছে বটে, কিন্তু বেদপন্থী সমাজের শাসন প্রণ হইয়া যাওয়ার জাতীয় ধর্মরূপে কর্মপন্থাকে আবার সজীবিত করিয়া তোলা একরূপ অসম্ভব। উপনিষদ জ্ঞানেরও আশ্রয়। কাল মুহূর্ত্ত প্রচার আছে বলিতে পারি। কিন্তু মানুষের দেহ অশুদ্ধ, মেধা নিম্ন, প্রতিভা ম্লান, বৃত্তি অসংযত ও বিনীত, তাই উপনিষদ জ্ঞানের সত্যত্ব সোময়স এ যুগের ধাত্তে সহিবে না। যোগপন্থার দিকে লোকের আগ্রহ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে শুধু অশৌ-কিকের প্রতি কৌতূহলমগ্নতঃ। বস্তুতঃ

যোগের উপযোগী দেহসামর্থ্য, শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রায় কাহারও নাই। সুতরাং বর্তমান যুগের পক্ষে যোগেরও তাদৃশ উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিশেষেই অগত্যা তত্ত্ববন্ধি আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

তত্ত্ববন্ধের শ্রেষ্ঠতাকে অনেকপ্রকার বাধবিতণ্ডা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে। কিন্তু বস্তুরূপে কোনও পথের শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা একটা আপেক্ষিক তথ্য মাত্র। সকল যুগে সকলের পক্ষে একই সাধন কখনও উপযোগী হইতে পারে না। সাধন ভ্রমণে অধিকারিত্বের অবশ্য স্বীকার্য। যে সাধনার বাহ্যিক অধিকার, তাহা অবশ্যই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। এ কথা বুঝাইবার জন্য অধিক বাক্যবিতণ্ডার কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা আমার পক্ষে উপযোগী, তাহা অপরের পক্ষে উপযোগী না-ও হইতে পারে। কিন্তু সে কথা না বুঝিয়া যদি আমার পথের সহিত অপরের পথের তুলনা করিয়া আমারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে বাই, তাহা হইলে তাহাতে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। তবে আমার পথ অধিকাংশের পথ, অতএব যুগোপযোগী, এবং সেই হিসাবে অস্তান্ত কষ্টসাধ্য পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ যুক্তি চলিতে পারে বটে। যেখানে সাধনার ফল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ এবং উদাসীন, সেখানে একমাত্র সংখ্যাবাহিত্বের দাবী ছাড়া আর অন্য দাবীতে কেঁজিতিয়া যাইব, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে; কেননা মীমাংসার সিদ্ধান্ত এই যে, যেখানে দৃষ্টকল রহিয়াছে, সেখানে অদৃষ্টের কল্পনা অস্বচিত। আর এই যুগোপযোগিতার দাবী যে একটা কথার কথা মাত্র,

ইহা ভাবিয়া ক্ষণ হইবারও তো কোনও কারণ নাই।

দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন, সা তু কৰ্ম্মজ্ঞানমোহোভ্যোহপি অধিকতর—ভক্তি, কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিকতর। এই আধিক্যের তিনি তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ ফলরূপজ্ঞা—ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরস্য অভিমানম্—ঈশ্বর অভিমান সহিতে পারেন না; তৃতীয়তঃ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্—ঈশ্বর দৈন্য ভালবাসেন। এই তিনটি কারণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু তাহার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। কোনও পথকে খাটো করা বা কোনও পথকে বাড়াইয়া তোলা সত্যাস্থেয়ীর লক্ষ্য হইতে পারে না। অধিকারী দেখিয়া পথ নির্দেশ করিতে হইবে ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু আমরা যেরূপ অধিকারী, দেবর্ষি নারদকেও সেই পর্যায়ভুক্ত করিয়া তাহার উক্তিকে তাঁহারই পক্ষে প্রয়োগ করিতে গেলে একটু বিপর্যয়ের কাশক্ষা আছে। আমরা জানি, সাধারণ্যে দেবর্ষি নারদের সম্বন্ধে—শুধু নারদই বা বলি কেন, অধিকাংশ ঋষি বা অট্টার্বী সম্বন্ধে—একটা বিপর্যস্ত ধারণাই প্রচলিত আছে। আমরা ভুলিয়া যাই, ঋষিরা যুগপ্রবর্তক, গুরু;—অধ্যাপিত মানবসমাজের পক্ষে যে ব্যবস্থা কলাগঠন, তাহারই বিধান তাঁহারা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই বিধান উল্টাইয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইলে তো বড় বিপদের কথা। নিগূর্ণপদে প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য নিরাধিকারী শিষ্যকে গুণময়ী সাধনার উপদেশ

দিলেন, আর উপযুক্ত শিষ্য অমনি সন্ধান লইল, গুরুদেব স্বয়ং এখনও সেই সাধনা করেন কিনা ! বর্তমান সমাজে এরূপ হস্তাঙ্গদ ব্যাপার মুহূর্ত্তঃ ঘটিতেছে। দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনিয়া তাঁতাকেও আমাদের দলে টানিয়া না আনি—ইহা যেন লক্ষ্য থাকে। ভক্তির উৎকর্ষ যে যুগোপযোগিতায়, আমাদের পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত কারণ এবং দেবর্ষিও এই দৃষ্টিতেই ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই কথাটা সর্বদা স্মরণ না রাখিলে বহু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্ভব হইবে। দেবর্ষি ভক্তিধর্মের আচার্য্য বা গুরু ; তাঁহার স্বরূপের পরিচয় শিষ্যের অধিকার নির্দেশ হইতে নয়। সে পরিচয় যদি কেহ পাইতে চাহেন, তবে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র সপ্তম অধ্যায় জুড়িয়া সনৎকুমার ও নারদের যে কথোপকথন রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। দেবর্ষি নারদ যে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তিধর্মের প্রচার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস সেখানে আছে। ঐতিহ্য প্রামাণ্য সর্বাপেক্ষা বলবৎ, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন।

একুণ্ণে বর্তমান যুগে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সন্ধ্যা দেবর্ষি যে তিনটি বৃত্তি দেখাইরাছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া। প্রথমতঃ তিনি বলিতেছেন, ভক্তি সমস্তেরই ফলস্বরূপ, অতএব শ্রেষ্ঠ। এই কথার একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আছে, তাহা ফলের উৎকর্ষ বিচার করিয়া। অর্থাৎ কর্মে, জ্ঞানে, যোগে যে ফল লাভ হয়, তাহাতেও মানবের পূর্ণতা হয় না, ভক্তি তাহারও পরবর্তী ফল, অতএব শ্রেষ্ঠ। এই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ আমরা পরে করিব, কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, যে কোনও সাধনার ফল

সন্ধ্যা আমরা অজ্ঞ ও উদাসীন, স্তব্ধতা কল নিয়া বিচার ও উৎকর্ষাগর্ভ নিরূপণ আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের বিচার অধিকার নিরা—কেননা, বর্তমানে অধিকারের কথাটাই আমাদের গোড়ায় বৃষ্টিয়া রাখা প্রয়োজন। সেই হিসাবে বিচার করিলে দেখি, যুগান্তরমুক সাধনার বিবর্তনে অধুনা ভক্তিই আমাদের সুসাধ্য—কর্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথ কোন পথেরই সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা আমাদের নাই। অথচ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী পূর্বযুগান্তরিত সাধনসমূহের সংস্কার আমাদের মাঝে অবশ্য থাকিবে। উপযুক্ত গুরুর নির্দেশানুযায়ী ভক্তির সাধনা করিলে কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সংস্কারসমূহ যথাকথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হইয়া পরিণামে তাহার ভক্তিরই পরিপূষ্টি সাধন করিবে। অতএব সামান্যতঃ কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ফল যে ভক্তি, সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাই উপলব্ধ হইবে। এখন মতিবিপর্যায়ের যুগে ভক্তিতে অধিকার নিরূপিত থাকিলেও কর্ম-জ্ঞান যোগাদির সংস্কার প্রবল হইয়া তাহাতে সাময়িক ক্রটি উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং বর্তমান সমাজে আমরা অচরহঃ তাহা দেখিতেও পাইতেছি। তাহাদের প্রতি দেবর্ষির এই অমৃতমিষ্ট উপদেশ—

‘‘রাহা, কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি বড় বড় সাধনার কথা শুনিয়া তুলিয়া যাইও না ; আমি জ্ঞান, ভক্তিভেদে তোমার অধিকার, তাহাই তোমার সহজ পথ। তুমি ক্রিয়াকুণ্ড ক্রিয়ী, জ্ঞান আওড়াইয়া, নাক টিপিয়া বাহা পাইবে, তাহার চেয়ে বেশী পাইবে ভক্তিধার—সমস্ত আচার তাহাতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার বিশ্বরণে পরম বাকুল হইয়া।’’

এই কথার প্রতিধ্বনি স্বরূপ পরকণ্ঠেই

মহর্ষি আবার বলিতেছেন, “দেখ, ভগবান অভিমান সহিতে পারেন না। তুমি ক্রিয়া-কাণ্ড করিবে—কোথায় তোমার বীৰ্য্যশক্তি, কেষ্টশক্তি বা কায়শক্তি? তুমি জ্ঞানের বলি আওড়াইবে—কোথায় তোমার সাধনচতুষ্টয়, অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহবাস? তুমি যোগ করিবে—কোথায় তোমার দেহ-সামর্থ্য, উৎসাহ, প্রজ্ঞা, অনলসতা? তবুও যে তুমি বলিতেছ, আমি এ করিব, তা করিব—এ শুধু তোমার অভিমান। আর এই অভিমানেই তোমার অন্তরের ঠাকুর আঁড়াল হইয়া বাইতেছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সমস্তই পুরুষকারের পথ—ব্রহ্মীভাবের সাধনা। তুমি বীৰ্য্যহীন, পৌরুষের বড়াই করিলে চলিবে কেন? বামনে চাঁদের প্রতি হাত বাড়াইলে পাইবে কেন? পরম পুরুষ কখনও মিথ্যা পৌরুষের অভিমান সহিতে পারেন না। এই যুগে পুরুষত্ব প্রচ্ছন্ন, সর্বত্র প্রকৃতিরই প্রাবল্য। অতএব তুমিও তোমার জীবপ্রকৃতিরই অমু-বর্তন কর। তাহাই তোমার পক্ষে সহজ সাধনা। প্রকৃত পরম পুরুষকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সার্থক। তুমি প্রকৃতিভা-ভাবাপন্ন, অতএব আত্মসমর্পণই তোমার দায়। অভিমান সে ধর্ম্মের বৈরী। যদি পুরুষ হইতে পারিতে, বাধা ছিল না। যাহা হওয়ার সাধ্য

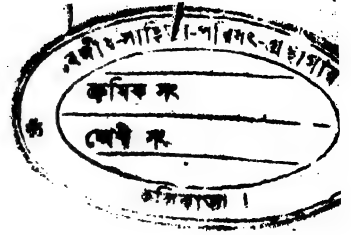
নাই, তাহার অভিনয় করাই তো অভিমান। সত্যস্বরূপ অভিমান সহিবেন কি করিবা?

“স্বভাবতঃ তুমি দীন। তাহাই তোমার প্রকৃতির সত্য। সত্যস্বরূপ এই সত্যকেই ভালবাসেন। তুমি দীন হইয়া তাঁহার ভজনা কর, অভিমানে অন্ধ হইয়া প্রেমের কারবারে মেকী চালাইতে চেষ্টা করিও না—দীনের ঠাকুর তোমার এই দৈন্তের ডোমেই বাধা পড়িবেন।”

অন্তরে নিদারুণ দৈন্ত আর মুখে প্রাণ্ড অভিমান—এই তো এ যুগের ধারা। এ হেন জীবের পক্ষে ভক্তির উপদেশ ছাড়া আর কি শ্রেয়স্কর হইতে পারে? ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু অধিকার হিসাবে বিচার করিয়াই জীবকে বলিতে হয়, “তুমি দীনাতি-দীন—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের বড়াই ছাড়—সব সঁপিয়া তাঁহার শরণ নাও, তাঁহার জন্ত ব্যাকুল হও, তাহা হইলে সব পাইবে। তোমার মত অধিকারী কর্ম্ম করিবা, জ্ঞান যজিবা, যোগ সাধিবা আর কি পাইবে ছাই?”

কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের যে সমস্ত সাধনা ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইল, সেট সমস্ত সাধনার ফলের সতিত মিলাইয়া একবার বিচার করাও প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পরবর্তী প্রবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব।





## ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[ স্বামী রামতীর্থ ]

বেদান্ত ভাববাদীকে বলছেন, জগতের নামরূপ বা বস্তুর গুণ ধর্ম যে বিষয়ীর স্পন্দন ভিন্ন সম্ভব নয় তোমার বলছি, সে কথা ঠিক। কথাটা আবার বলছি। বিষয়টা ভাবী গোদামেলে, তোমরা মন দিয়ে শুনো। বেদান্ত বলছেন, “বিষয়ীর ক্রিয়া ছাড়া যে নামরূপ সম্ভব নয়, বস্তু গুণ ধর্ম যে মন বুদ্ধি বা বিষয়ীর স্পন্দনের উপর নির্ভর করে, সে কথা ঠিক। এ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নাই। কিন্তু তুমি যে বলছ, তোমার এই ছোট্ট মনটীর বাইরে কিছুই নাই, সে কথা কিন্তু ঠিক নয়।” আমার বস্তুবাদীকেও বেদান্ত বলছেন, “ইন্দ্রিয় বহিভূত কোনও বস্তুর ক্রিয়া মাত্র হতে যে প্রাতিভাসিক জগতের উৎপত্তি, তোমাদের এ কথাও ঠিক।” জানই তো, বস্তুবাদীরা বলেন, বাইরের কোনও বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে অভিজ্ঞত করলে তবে প্রাতিভাসিক জগতের সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তুর ক্রিয়া হয়, তাতেই আমরা দেখি। বেদান্ত বলেন, “হাঁ, সে তো ঠিক কথা;” বাইরে থেকে কিছুই আসতে না পেলে আমরা তো কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারি না। বস্তুবাদীর কথা এ পর্যন্ত ঠাট্টাই হটে, কিন্তু বস্তুবাদী যখন বলে, বিষয়ীর স্পন্দন শূন্য বহিঃসত্তার অভ্যাস—একমাত্র এর উপরই আমাদের প্রত্যক্ষ নির্ভর করেছে, তখন কিন্তু ভুল বলা হয়।” কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলি।

যে কোনও বিষয়ী বা বিষয়ের কথাই ধর,

না কেন? ধর এই খেলিগটা পেঙ্গিলটার রং এলা কোথা থেকে? হয়ত বলবে, বিষয়ীর ক্রিয়া আর বহিঃবস্তুর প্রতিক্রিয়া দুয়ের সংযোগ হতে রঙের উৎপত্তি। শদি তুমি রং কাণা হও, তাহলে আর পেঙ্গিলের এই রঙটা দেখতে পাবে না। পেঙ্গিলের এই রঙটা একটা গুণ বা ধর্ম। ধর পেঙ্গিলের ভাব আছে। তার ব্যতিক্রম হয়, রঙেরও ব্যতিক্রম হয়। চোখ যদি কামলালোগগ্রস্ত হয়, তবে পেঙ্গিলটার আর একটা রং দেখা যাবে। যদি এখানে এর ওজন না নিয়ে আরও উচুতে, কোনও গ্রহান্তরে বা খনির গর্ভে এম ওজন নিতে, তাহলে সমান ওজন পাওয়া যাবে না। যে খিলিগটার ওজন লওনে নেওয়া হয়েছে, সেইটাকেই আবার ভারতবর্ষে ওজন করলে সমান ওজন পাওয়া যাবে না। ওজনের কম বেশী হয়, রঙের পরিবর্তন হয়।

একই জল—শীতকালে ছুঁলে লাগে ঠাণ্ডা; আবার গ্রীষ্মকালে লাগে গরম। কেন? কারণ; অনুভবতা বিভিন্ন তাপমণ্ডলে থেকে স্পর্শ করছে, অথচ এদিকে জলের তাপ প্রায় সমানই রয়েছে। তবে যে তাপের তারতম্য পোঁছোচ্ছে, সে কেবল আমাদের হাতের তাপ কম-বেশী বলে। কাজেই দেখছি, বিষয়ীর প্রভেদ, অনুভবী বিষয়ের ধর্মেরও প্রভেদ হয়ে থাকে।

এখন বল দেখি, এই পেঙ্গিলটা কিসে তৈরী? বাঁকলে প্রভৃতির মতে এটা শুধু কঁতকগুলি ধর্মের সমষ্টিমাত্র। যদি এই ধর্ম-



গুলি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে পেন্সিলের কোনও সম্ভাব্য পক্ষে না। ক্যান্টের মতে গেছনে বস্তুসত্তা বলে একটা কিছু আছে; প্লাটোর মতে এর গেছনে আছে একটা ভাবসত্তা। এতে ধর্ম আছে। এই ধর্মগুলি মূলে বিষয়ীর স্পন্দন মাত্র। কিন্তু আবার বলি, যাত প্রতিঘাতে এই ধর্মগুলির বোধ হওয়ার পূর্বেও তো কোনও বাস্তব সত্তা সেখানে ছিল। যদি বল তো কথাটা ভেঙ্গে আরও স্পষ্ট করে বলি। অশ্রু বেদান্তও বলেন যে বিষয়ীর স্পন্দনবশতঃ পেন্সিলে এই সমস্ত ধর্মের উদ্ভব হয়েছে; কিন্তু কথা এট, বিষয়ীর স্পন্দনই বা উদ্ভব হল কেন? এই তো সমস্যা। ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত এমন কোনও সত্তা নিশ্চয়ই তা হলে ছিল, যা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়ে প্রতিহত হয়ে তার মাঝে স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে এবং তাইতে এই সমস্ত ধর্মের উদ্বোধন হয়েছে। বিষয়ীর স্পন্দনের পূর্বে এই ধর্মগুলি যে মনের উপর প্রতিহত হয়ে মনের কোনও ক্রিয়াকে উদ্ভিত করে তুলেছিল, একথা তো বলতে পারি না। এমন বলতে পারি যে, মনের যাত-প্রতিঘাতের পর যখন ধর্মের উদ্বোধন হয়, তখন বাইরে এমন একটা কিছু আছে, পেন্সিলে এমন একটা বাস্তব সত্তা আছে যা তোমার চোখের উপর ক্রিয়া করে দৃষ্টির অমুভূতি এনেছে, কানের উপর ক্রিয়া করে শ্রবণের অমুভূতি এনেছে, জিহ্বার উপর ক্রিয়া করে স্বাদের অমুভূতি এনেছে বা হাতের উপর ক্রিয়া করে স্পর্শের অমুভূতি এনেছে। বাইরে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যা চোখ, কান বা নাকের উপর ক্রিয়া করছে। পেন্সিলটাকে যদি ধাও, তাহলে তোমার অমুখ করবে। তবে কি করে বল যে বাইরে বাস্তব বলে কিছু নাই?

বাইরেও বাস্তব বলে একটা কিছু আছে; মানুষের ইন্দ্রিয়ে যখন তা আঘাত করে, তখন মনে তার খবর পৌঁছায়, মন আবার তার প্রতিঘাত দেয়। তখনি দৃশ্যপটের ওপর বস্তু-ধর্মের ছায়া ভেসে ওঠে। বা'পারটা ঠিক এই রকম। এই একটা হাত, আর এই আর একটা হাত; এক হাতে কখনও তালি বাজে না। 'এই শোন, তালি বেজে উঠল (এই বলে স্বামিজী হাততালি দিলেন)। এই ব্যাপারের এক ঠিক ছিল যাত, আর এক-দিকে প্রতিঘাত; ফলে হল শব্দ। একটা বেহালায় তার রয়েছে; আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে, তারটা বেজে উঠল। তোমার আঙ্গুলে ছিল যাত, তারে ছিল প্রতিঘাত—ফলে শব্দ হল। একদিক থেকে একটা টেউ আসছে, আর একটা আসছে ওদিক থেকে—ফলে সংঘর্ষ হল—ফল হল ফেনা। ছ'ধারের যাত প্রতিঘাতে ফেনার সৃষ্টি হল। এই একটা দিশলাইর কাঠি রয়েছে—আর এই একটুকুও বেলে-কাগজ; কাগজটার ওপর কাঠিটা ঘসে দাও—আগুন জলে উঠবে। এ ও তো ছ'ধার থেকে যাত প্রতিঘাত মাত্র। বিদ্যাতের এই হল ধনাত্মক প্রান্ত, আর এই হল ঋণাত্মক প্রান্ত; দুটা যদি কাঁচাকাছি হল, অমনি বিদ্যাতের ফুলকী দেখা গেল—আগুনাজ হল। ছ'ধারের যাত প্রতিঘাতে এই ব্যাপার ঘটে।

তাই বেদান্তের মতে বুদ্ধির অন্তরালে নিরপেক্ষ বস্তুসত্তা একটা আছে—তাই হচ্ছে আত্মা। তোমার মার আত্মার বস্তুসত্তা—আর জগতের প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর বাস্তবসত্তা। এই পেন্সিলটাতেও সত্য আছে—যাকে তোমরা নিরপেক্ষ বাস্তব-সত্তা বল, যা তোমাদের কাছে অজ্ঞেয়, যা গুণ-

ধর্মের অসীম। বহির্দর্শনে যে সত্য বা ব্রহ্মবস্তুর সকলের মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, আর তোমার বুদ্ধির অন্তরালে যে ব্রহ্ম লুকিয়ে আছেন—এটাই দুটি যেন দুটি হাত। যে মুহূর্তে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল, অমনি বস্তুর গুণ বা ধর্ম অভি-বাস্তব হল। একদিকের একটা ঢেউ আর একদিকের একটা ঢেউএ ধাক্কা খেল—আর অমনি গুণধর্মের কেনার সৃষ্টি হল। বলতে পারি, বুদ্ধিতে আছে অস্তি-প্রাস্ত, আর রস্তুতে আছে নাস্তি-প্রাস্ত; দুটি প্রান্ত পরস্পর সমু-খীন হলে গুণধর্মের নীলাভূমি এই বিশ্বের রূপ ফুটে ওঠে। বেগানের ভাষায় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগে বস্তুর দর্শন হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য হচ্ছে—বুদ্ধির অধিষ্ঠিত আত্মা আর বস্তুর অধিষ্ঠিত আত্মা; হুঁএর ঘাত-গতিঘাতে প্রতিভাসের সৃষ্টি।

ভাববাদীরা যে বলেন, বিষয়ীর স্পন্দন ছাড়া দর্শন হতে পারে না, সে কথা ঠিক; কিন্তু আগার এ কথাও যে বস্তুনিষ্ঠ, এই স্পন্দন স্বতঃই ফুটেছে আর তাইতে প্রতিভাসের সৃষ্টি হচ্ছে, সে কথা কিন্তু ভুল। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে বিজ্ঞানের একটা অসম্ভবীয় সত্যকে আশ্রয় করতে হয়। বিজ্ঞান বলছে, বিপরীত কেন্দ্রে তুল্যবল ক্রিয়া না হলে প্রতি-ক্রিয়াই যে অসম্ভব। তাই ভাববাদীরা যখন বলেন, বিষয়ীর স্পন্দন হুঁএই জগতের সৃষ্টি—তখন এ কথা তাঁরা ভুলে যান যে লেখাও প্রতিস্পন্দন না'জাগলে স্পন্দনটাই যে হতে পারে না। কাজেই বস্তুবাদীরা যে বলেন, এই জগ-তের একটা বাস্তব সত্য আছে শুধু বিষয়ীর খেরালের ওপর এর অস্তিত্ব নির্ভর করছে না, সে কথাও খাঁটা। আবার তাঁদের এইটুকু কথাই শুধু খাঁটা। কিন্তু তাঁরা যখন বলেন যে

এই প্রাতিভাসিক জগৎ স্বতঃই বাস্তব, এর আর অন্ত কোনও আশ্রয় নাট, তখন কিন্তু ভুল করা হয়, কেননা এই যে জগতে বাসার খেলা, হেদের বৈচিত্র্য, গুণধর্মের সমাবেশ—সমস্তই যেমন বিষয়ীর স্পন্দনের উপর নির্ভর করছে, তেমনি বিষয়ের বাস্তবতার উপরেও নির্ভর করছে।

এখানে একটা গুরুতর আপত্তি ওঠে। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি। কিন্তু অনন্তের মাঝে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া কি করে সম্ভব? লোকে যেমন কথায় কথায় বলে, আমরা তেমনি ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি। কুটস্থ চেতনকে যখন বুদ্ধ বা বিষ-য়ের সঙ্গে যুক্ত বলে অনুভব করছি, তখনই ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি। যে বিষয় প্রতিক্রিয়া বা অভিব্যক্তি সৃষ্টি করছে, কুটস্থ সত্য তাত্ত্বিক যখন যুক্ত, তেমনি বিষয়ীর বুদ্ধি, মন ইত্যাদিও যুক্ত। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝ। এই পাতটার মাঝেও আকাশ আছে, ওটাতেও আকাশ আছে। পাতবিক পক্ষে আকাশ সর্বত্রই এক বস্তু, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুতে তার আবির্ভাব বলে তুমি তাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে পার। এই ক্রমালটাকে নিয়ে যেমন নাড়াচাড়া কর, আকাশ নিয়ে কিন্তু তা পার না। আকাশ অবিভাজ্য, তা সর্বত্রই এক; আকাশের মাঝে ভাগের কল্পনা করা চলে না। কাঁটও বগলু, আকাশ বিষয়গত বা বিষয়গত, তার ছেদ সম্ভব নয়। তেমনি ব্রহ্ম বা অনন্তব্যবস্তুকেও খণ্ডিত বা ছিন্ন রূপে ধারণা যায় না; কিন্তু যখন এই জগতের বিষয়সম্পর্কে তাঁর কথা বলি, তখন তাঁকে বিষয় কিংবা বিষ-য়ীর সহিত যুক্ত বলে ভাবতে পারি এবং একই সত্যকে ক্রিয়া কিংবা প্রতিক্রিয়ারূপে বিভিন্ন

বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলতে পারি। যেমন আমার হাতের আকাশ এই শত্রুটির আকাশে দিকে এগিয়ে এক একে দু'য়ে যোগ হল। তাতে হাতের আকাশ আর ঘট্টের আকাশ এক হয়ে গেল। যদিও মূলতঃ আকাশ একই ছিল, তথাপি তোমার দৃষ্টিতে ঘট্টের আকাশ আর হাতের আকাশ তো ভেদ হয়ে গেল।

তাই বোদান্ত বলছেন, যে ব্রহ্ম বিষয়ীতে অধিষ্ঠিত, তিনিই এখন বিষয়ে অধিষ্ঠিত স্বগন্তার সঙ্গে এক হয়ে যান, তখনই বিষয় আর বিষয়ীতে সংযোগ হয়।

বাস্তবিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আত্মাতে হয় না, অবাচ্ছিন্ন আত্মাতেই তা সম্ভব। ধর, এই দিক হতে একটা জলের ঢেউ আসছে, আবার আর এক দিক থেকে আর একটা

আসছে। এ ঢেউটাও যেমন জল, ও ঢেউটাও তেমনি জলই বটে, দুটো ঢেউএ যখন সংঘর্ষ হবে, তখনও তা জলই থাকবে, কোনও পরিবর্তন হবে না, অথচ তার মাঝেই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া হবে। এই ঢেউএর অবচ্ছেদে যে জল ছিল, আবার ওই ঢেউএর অবচ্ছেদে যে জল, সেই একই জলের অবচ্ছেদক ভেদে সংঘর্ষ হওয়ায় ফেনার উৎপত্তি হল। তেমনি বুদ্ধি দ্বারা অবাচ্ছিন্ন ব্রহ্ম যখন বিষয় দ্বারা অবাচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হন, তখনই জগতের নাম, রূপ, গুণ ধর্ম ইত্যাদি ফুটে ওঠে। একটা হাতের সঙ্গে যখন আর একটা হাতের ঠোকাঠুকি হয়, তখন দুটো হাতে একই শক্তি থাকে বটে, কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতে ফল হয় শব্দ। দুটো হাতেই এক শক্তি, কিন্তু তবু দু'য়ে সংঘর্ষ সম্ভব হচ্ছে। (ক্রমশঃ)



## বৈরাগীর মন

—: { # } :—

জীবনকে আকড়ে ধরে যে গড়ে আছে, সে জীবনের স্বাদ পাননি। জীবন বিকাশ, সুরণ—চঞ্চলের গতা; অচঞ্চল সড়তানয়। মৃত্যু বিকাশের পথ; শক্তির সুরণ স্রবণে। যে মরণের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, জীবনের অনন্ত-আবাদ সেই পেরেছে—সেই বীৰ্য্যলাভ করে শক্তিমত্ত হয়েছ। হলোহন পান করে তাই তো নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়;

অশিবেশ কুহু কালকূট মরণ, শিবের তাই অলঙ্কার।

অশিবেশ জীবন কি? অবিরাম অন্ধ ধ্রুবাদগার আর তারি মাঝে হ' একটা ফুলিঙ্গের কণিক দীপ্তি। তাকে উৎসাহ বল, বীৰ্য্য বল, স্বর্থ বল—কিন্তু তার মূল্য কতটুকু? বৈরাগী দেখেন, কলসনা জলনা কামনা-বাসনার উদ্বেলিত এই তো জীবন; চরম ভূপ্তি তার

মাঝে কোণায়? অসংশয় প্রাপ্তি কোণায়? তবে কার ভয়ে, কিংবদন্তির ভয়সায় এর তোয়াজ করা? একটা তন্ত্রিয় যদি আজ বিকল হয়ে যায়, তবে এই বহির্জগতে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে যাবে। তন্ত্রিয়গণে আজ জ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাই জগতে নিরাশ্রয় নষ্ট, এটাই ইন্দ্রিয়ের সংস্কারকে পুঁজি করেই সুখ-দুঃখের হাটে নেমেছি। কিন্তু মহাব্রহ্মে যেদিন তন্ত্রিয়ের নির্বাণ হবে, সেদিন আশ্রয় পাব কোথায়? এই সুনিশ্চিত প্রলয়ের বিভীষিকা জীবনের লালসাকে সংযত করে না কি?

তাই বলি, খণ্ড আলোকের দীপ্তি চাই না—অনির্বাণ জ্যোতিঃের আশায় চাই অমানিশার অন্তহীন আধারে বাঁপ দিতে! তাই বলি, নাট—আমার কাছে এ জগৎ একান্তভাবেই নাই। নাট দেহ—নাট মন—নাট চিত্ত উত্তরোল আশা-আকাঙ্ক্ষার নূপুর-নিষ্কণ। রূপ নাই—অরূপও বৃথি নাই! কিন্তু অস্মি আছি। বিষয়ী মনের নির্বাণে যে বিরাট আধার ফুটে উঠেছে, সেই পরম স্নিগ্ধ গ্রাম-লতাকে রক্তে রক্তে পূর্ণ করে আছে অনির্বাণ অহঙ্কার। তার সর্বত্র শান্তি, সমাধি, নির্বোধ।

একদিকে ফিরে বলেছিলাম নাট, আবার আর একদিকে ফিরে দেখছি, নাই কেন—বুকভরা সবই তো আছে। এ যেন অমাবস্তার বিপরীত পৃষ্ঠে পূর্ণচন্দ্রের রজতোচ্ছ্বাস। কিন্তু বা আছে তা কি শান্ত, কি নিথর! একটা অণুও সেখানে পরিপূর্ণতার মহিমায় জ্যোতির্ময়। সবাই পূর্ণ সেখানে—কেননা ত্রুটির দৃষ্টি যে পূর্ণ। তাই সেখানে ক্ষুদ্রতম কুঁড়ি স্নন্দর, পূর্ণপ্রফুল্লিত কুসুম স্নন্দর, ঝরে পড়া পাপড়িও স্নন্দর। সেখানে অপূর্ণ জানে,

তার নিশ্চিত পরিণাম পূর্ণভায়; তাই তার মাঝে ব্যস্ততা নাই, কামনার বিক্ষোভ নাই—কিন্তু প্রাণের পরিপূর্ণ স্পন্দন আছে। তাই সেখানে দীপ্তি নাই, বন্ধন নাট—সবই সেখানে স্নন্দর।

সৌন্দর্যের পিপাসা তোমার প্রাণে নাই? আছে। তাই তো ভগবান্নের নিশানা। কিন্তু সে স্নন্দরকে ভোগ করবে কি দিয়ে? এই দেহ-মন বুদ্ধির ভিক্ষা দিয়ে? না, তা হবার নয়। পূর্ণতাকে গভীর দিয়ে অবিকৃত রাখা চলে না। তাই বলি, দেহ মন বুদ্ধি ছাড়তে হবে। একান্ত নিরসন দ্বারা নয়—পরিপূর্ণতা দ্বারা। তারা যা, তাই থাক—অহংকে তার উজ্জ্বল তুলে নাও। হয়ত কিছু সংস্কার থেকে যাবে; তখন চাই নিঃস্বপ্ন আঘাত—অভিনবের সৃষ্টিবাসনায় তখন প্রলয়ের আবাহন করতে হবে। সংসারদৃষ্টিতে প্রলয় অন্ধকার—তাই প্রবর্ত সাধকের কাছে বৈরাগ্যের বিভীষিকা। কিন্তু অহংকে অটুট রাখতে পারলে আবার এই অন্ধকারের বুকেই সৃষ্টি ফুটে উঠবে। কিন্তু এবার বাইরে নয়—ভিতরে। সে দর্শন নিত্য দর্শন—কেননা কামনার স্পন্দন তখন নিরুদ্ধ; খণ্ডের প্রলয়ে অখণ্ডের আগরণ সেখানে; তাই এক বাষ্টির বিলয়ে অনন্ত কোটা বাষ্টির উদয়—সবার মাঝে একই অহংএর অধিষ্ঠান। চকলের অক্ষত নৃত্য, অচকল তার রঙ্গপট, আর এক। এই বিশ্বাস—এক কক্ষ, সহস্র গৌপিনী; তবু দৃষ্টিতে এক, কিন্তু লীলার অনন্ত ফাল।

এই দৃষ্টি ফুটলে জগৎ আবাব দেখা দেয়—অভিনব হয়ে। সে কেমন? তখন দেখি, সবই আছে; মেয়ের বাগর পিতৃবন্ধে মেহের সুধার সঞ্জীবিত হয়ে যেমন করে থাকে।

কামনা নাই, কিন্তু অনির্বচনীয় আনন্দের আনন্দ। মন বলে, সবাই সুখী হোক জগতে—কুত্র কুত্র মানাভিমানের চাকণো—স্বল্পপরি-সর প্রেমাত্মিনয়ের পুঙ্কে—হর্ষে, লাজে, বেদনায়।—সবার মাঝে সবাই আনন্দে আজ প্রাণের হিল্লোল জাগিয়ে তুলুক!

আমি হাস আছি এই অপারসমুদ্রের তীরে উন্নয়নের মত। নরের ভোগা বিধাতৃ ঢালা রসায়নে আমার স্পৃহা নাই—কিন্তু তবুও অনু-ভব করছি, সে বিধাতৃ যেন আমারি বন্ধ মথন করে উঠছে। আমার নাই কিছুই, অথচ আছে সবই। তাই অন্তরের ভাষা আজ মোনে সুপ্ত—অটল শাস্তিতে, পরিপূর্ণ প্রেমে নিস্তব্ধ আমি!

নাই বলে যে মুখ করে দাঁড়িয়েছে, তারই দায়িত্ব বেশী। বৈরাগ্যের তুলসী অটল হয়ে বসে থাক। চলে না—চলে না। নেমে আসতেই হয় এ জগতে, নইলে আনন্দ তো পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু আসতে হয়, বৈরাগীর মনটা নিয়ে—যে মনটা থেকেও নাই!

লোকের বলে বৈরাগী ভিখারী; জানে না—সে রাজা, কুবের তার ভাগুরী। সে তো নিতে আসেনি—দিতেই এসেছে। সঞ্চয় করবে সে কার জন্য?—বার বার নাই, দোর নাই—আছে বলতে কিছুই নাই। আবার নাই বলেই বার সর্বটুকু আছে—সেই বা সঞ্চয় করবে কি, সঞ্চয় করবে কার জন্য? সব আছে বলেই সে খুদকণাটুকু ছাড়া আর কিছুই নিতে জানে না। সে নেওয়া তার অভাবের পূর্তির দরুণ নয়, তোমার দানকে সার্থক করবে বলে।

হে সাধক, এই বৈরাগ্যের সাধনাই

তোমার জীবনে একান্ত হোক। নাতিমাত্রের সাধনাতেই আজ নিজেকে নিঃশেষ করে দাও—বাইরে হারিয়ে বুকের মাঝে সবাইকে কিরে পাবে আবার। সেই সব নৃপুত্রের যিগি কিগি আবার হরত শুন্তে পাবে, কিন্তু সাবধান, মনে রেখে—চাইতে গেলেই পাবে না। যে রাগিণীর আলাপ শুরু হয়েছে, নিঃশব্দ হয়ে তাই শুনে যাও—চীৎকার করে তার রসভঙ্গ করোনা।

দাও আজ সবার দেনা-পাওনা চুকিয়ে—কার ঋণ রেখে না আর। দে বা চায়—তাঁই তাকে দাও কল্পতরু হয়ে। সবার আশা পূর্ণ হোক—তোমার আশার বিবোধে অতৃপ্ত ডেকে আনা কেন। সবার আশা পূর্ণ হলে যে পরমতৃপ্তি, সেই অমৃতেই তো তোমার রাঙভোগ!—তাঁথৈ থৈ থৈ নৃত্য চলুক তোমার নিশ্চল বকের উপর—নাচুক এবার শ্রামা উলঙ্গিনী—প্রতি রোমকূপ হতে অনন্ত মিলনের আনন্দ পারা জগতে ছড়িয়ে পড়ুক—তুমি শুধু দেখে যাও!

এমনি করেই চলতে হবে—এই কথাটুকুও আজ মনে করিয়ে দিতে হয়, কেননা তুমি পথিক। তবে এসো পথিক কামনাহীন প্রশান্তির পথে, জগৎকে ত্যজ করে তার তন্ত্রমুষ্টি গায়ে বেঁধে এসো সন্ন্যাসী, এসো উরাসী, এসো ধোয়ী অতএব এসো বিপুল ভোগী। শুধু এই এক কুত্র আধারে ভোগে নয়—এই অনন্ত জগৎ ভোগ করে অনন্ত তৃপ্তিতে নিখর আবার অনন্ত অতৃপ্তিতে অনন্ত সৃষ্টির বাগদার বিকৃত হয়ে ওঠে—আবার অনন্ত মাঝে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়ে যাও। জীবন আর মরণ—রমের দুটা পানমাজই তোমার—কেন না মন যে বৈরাগী।

—\*:\$()\$:—

এক পিণ্ডার্থীর চিন্তাটা কাহার, না বিশ্বাসের  
উদ্বেক করিবে! একটা ঘটনাতে তীর্থযাত্রার  
চরিত্রের এক বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেবার তীর্থরামের বি এ পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছু গোলযোগ ছিল। তাণ্ডা ছাড়া সাংসারিক নানা অশান্তিতেও তাঁহার পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। পরীক্ষার পূর্বে তীর্থরাম তাঁহার আচার্য্য ধন্বামলকে লিখিলেন—  
“পশু দিন পরীক্ষা শুরু হইবে—কিন্তু এবার যেন কেন আমার ভয় ভয় করিতেছে।” পরীক্ষার ফল ব্যতিরিক্তই দেখা গেল, তীর্থরামের আশঙ্কা সত্য। হঠাৎ—পরীক্ষায় তিনি পাশ করতে পারেন না। তীর্থরামের মত ছেলে পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন—তাঁও আবার তিন নম্বরের জন্য ঠাংয়েজী পরীক্ষাতে—এ কথা যেট শুনিল, সেই আশ্চর্য্য ঘটল। ইংবেজীতে তাঁহার বিরূপ অসামান্য অধিকার ছিল, তাহা কখনও অবদিত নহে। কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অধ্যাপকদের ইচ্ছাতে বিশ্বস্তের আর পরিসীমা, ছিল না। ছোট্ট-চরিত্র করিয়া তাঁহার, ইংবেজীর কাগজ আবার পরীক্ষা করািবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহাও—কোনও ফল হইল না। এই ব্যাপারে অধ্যাপকদের একতরফ পক্ষের প্রচলিত হইয়াছিল যে বিশেষ আন্দোলন করিয়া তাঁহার পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সেটনার চহনে এই নিয়ম প্রবর্তন করাটেলেন য, কাচার—একটি পরীক্ষাপত্রে যদি পাঁচ নম্বর কম পড়ে এবং অন্যান্য পত্রে যদি

বেশী নম্বর না থাকে, তাঁহা হইলে সেই চাক্রকে পাশ করিয়া দিতে হইবে। ইত্যাদি ভবিষ্যতে নিম্নাধীদিগের উপকার হইল বটে, কিন্তু তীর্থরামের সম্বন্ধে কোনও প্রতীকার হইল না।

এই ব্যাপারে তীর্থরাম অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। এতদিন যে বৃত্তি পাঠিয়া আসিতেছিলেন, পরীক্ষার ফল ইওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এখন আর এক বৎসরের দরুণ কলেজের বেতন, খাওয়ার খরচ, পরীক্ষার ফিস্‌ তিনি কোথায় পান? তাঁহার মেসো শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্ল পড়াশুনার তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। পিতা যে বিরূপ ছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তীর্থরাম ভগ্নহৃদয়ে শ্রীযুক্ত রঘুনাথজীকে লিখিলেন, “মেসোমহাশয়, যদি তীর্থরাম নিজের ইচ্ছামত আর পড়াশুনা করিতে না পারে, তাহা হইলে জানিবেন, সে শীঘ্রই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।” চিত্ত যখন এইরূপ দুর্নিবার চিন্তাশ্রোতে উবেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনও তিনি একান্তে চিত্তহৈর্য্যের জন্য পরমাত্মার নিকট করুণ প্রার্থনা করিতে ভুলিতেন না। এই সময়ের অবস্থা তিনি নিজেই এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

“ফেল্‌ হওয়ার কথা শুনিয়াই আমার মনল উপর যেন বজ্রাঘাত হইল—মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার হৃদয় দীর্ঘ হইয়া যাউতেছে। এখন কি করিবে, তাহার কোন দিশাও তিনি পাইলেন না। উদ্বেগু এত বাড়িয়া গেল যে অপর্যবে তাঁহার মেসোমহাশয়কে এক চিঠি লিখিয়া বসিলেন যে রামচন্দ্রস্বরূপ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন। কোন দিক দিয়াই

শান্তি পাটবার পথ রহিল না। পিতাঠাকুর তাঁহা গোড়া হইতেই নারাক, তাঁহার কাছে যে কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ ভরসা মনে জাগিল না—অন্ততঃ তখন এরূপ কোনই সম্ভাবনাও দেখা গেল না। এখন একমাত্র আশ্বাসের স্থল, ভগবান—একান্তে যাইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মাথা কুটিয়া কাঁদা ও প্রার্থনা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? হৃদয়ে, শোকের আগুণ জ্বলিতেছে—আর হুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা গলিয়া পড়িতেছে। রামের হৃদয় ভেদ করিয়া করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল—

অমেষ মাতা চ পিতা অমেষ

অমেষ বন্ধুচ সখা অমেষ।

অমেষ বিজ্ঞা দ্রবিশং অমেষ

অমেষ সর্বকং মম দেবদেব ॥

“ক্রমে কাঁদিতে কাঁদিতে হুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, নয়নজলে বসন ভিজিয়া গেল। পরমাত্মার উদ্দেশে করুণ বলাপ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বিগলিত চিত্ত হইতে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

“কুন্দনকে হম্‌ ডলে হৈ

জন্‌ চাহে তু গলা লে,

বার ন হোঁতো হম্‌কে

লে আক্‌ আজ্‌মা লে।

জেসে তেরী খুশী হো

সব নাচু তু নচা লে,

গব ছানবীন্‌ কর লে

হর তোর দিল জমা লে।

লাদী হৈ হম্‌ উসীমে

জিস্‌মে তেরী রজা হৈ,

রহা যুঁভী বাহবা হৈ.

ওঁ বঁভী বাহবা হৈ!

রা দিল মে অব খুশ হোক

কর তমকো প্যার প্যারে,

রা তেগ খেঁচ আলিম

টুকড়ে উড়া তমারে।

জীতা রথে হমকো

রা তনসে সির উত্বারে

অব রাম তরা আশিক

কহতা হৈ যুঁ পুকারে।

রাজী হৈ হম উদীর্ঘে,

জিস্মে তেরী মজা হৈ,

রহা যুঁভী বাহবা হৈ,

ওঁ বঁভী বাহবা হৈ!

—আমি তো সোণার ডেলা মাত্র, তোমার যখন খুসী তুমি আমাকে গলাইয়া নাও না কেন! যদি একথা বিশ্বাস না হয় প্রভু, তবে নাও—আমাকে পরখ করিয়া দেখ। আমার সব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লও, সব রকমে দেখিয়া তোমার মনের সন্দেহ মিটাইয়া লও।—যেমন করিয়া তোমার খুসী—সব নাচে নাচাইয়া লও। যা তোমার মরজী, তাতেই আমি খুসী। আমি এখানেও বলি, বাহবা!—ওখানেও বলি বাহবা!

মন তোমার যদি খুসী হয় খাঁকে, তবে হে প্রিয়, প্রাণ ভরিয়া আমা! আদর কর; নইলে যদি ইচ্ছা হয়, হে নিষ্ঠুর, তলোয়ারের মুখে আমার টুকরা টুকরা করিয়া ফেল। তুমি আমাকে বাঁচাইয়াই রাখ আর দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্নই কর—রাম যে এখন তোমার প্রেমের কান্দাল, এট কথাই প্রাণ খুণিয়া গেলছে। যা তোমার মরজী, তাতেই আমি

খুসী। আমি এখানেও বলি বাহবা!—ওখানেও বলি বাহবা!

আত্মসমর্পণের কি উজ্জ্বল, কি মধুর চিত্র। —একদিকে জ্ঞানার্জনের আকুল-শয়ান, আবার আর একদিকে হৃদয়বিধারী ব্যাকুল বেদনী—দুয়ের মণি-কাকন সংযোগে ছাত্র-জীবনের কি অপূর্ণ আদর্শই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তীর্থরামের ছাত্রজীবন—শুধু ছাত্রজীবনই বা বলি কেন, তাঁহার সমগ্র সাধন জীবনের একটা রহস্য সঙ্কেতের কথা বলিয়াই আমরা তাঁহার জীবনের এই পর্ব শেষ করিব।

আমরা এই কথা বার বার বলিয়াছি, তীর্থরামের জীবনের অভিব্যক্তির একটা সহজ ধারা আছে—ভারতবর্ষের সনাতন জীবনধারার সহিত পর্কে পর্কে তাহার মিল রহিয়াছে। ছাত্র তীর্থরাম যে অবশেষে বেদান্তকেশরী স্বামী রামতীর্থে পরিণত হইলেন, ইহার মূলে যে দিব্যপ্রেরণা রহিয়াছে, তাহার উৎস কোথায় এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। যখন এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি, তখন শ্রীযুক্ত পূরণসিংহের লিখিত জীবনচরিতখানাই আমাদের উপজীব্য ছিল। পূরণসিংজী তীর্থরামের জীবনের এই অধ্যায়টা কেন জানি না, আড়ালে আড়ালে রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছেন—এ কথা স্মরণে আমরা বলিয়াছি। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী ধর্ম্মধর্ম্মকেই তীর্থরামের উপদেষ্টারূপে লোকসমক্ষে চিত্রিত করিয়াছেন—এবং ধর্ম্মমন্ডলের প্রতি তীর্থরামের তীব্র মনো-বেগকে বালমূলভ ভাবের বিকার বালম কটাক্ষ করিয়াছেন—স্বয়ং ধর্ম্মমলকেও that uncanny sort of person বলিয়া প্রজ্ঞপ



করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার এই প্রকার মনোভাব সম্ভবতঃ তাঁহার বিকৃত পাশ্চাত্যশিক্ষারই ফল। আমরা যথাস্থানে ইহার সমালোচনা করিয়া শ্রীমৎ ধন্যমলের সহিত শ্রীমৎ রামতীর্থের সম্বন্ধের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূরণসিংহজী তীর্থরামের সাধনজীবন সম্বন্ধেও নানা অদ্ভুত ও অসম্বদ্ধ পৌরাণোক্তি করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

ধন্যমলের সহিত তীর্থরামের সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমরা কেবলমাত্র শিষ্যদ্বন্দ্বের ঐকান্তিকতার কথা বলিবারই অবসর পাইয়াছি— প্রমাণভাবে গুরুশক্তি-সম্ভারের কোনও বিশেষণ লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। স্বামী রামতীর্থের মত যুগাদর্শ মহাপুরুষের জীবনের একটা দিক এইরূপে অন্ধকারচ্ছন্ন হইয়া রহিল, তাহা ভাবিয়া আমরা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। পূরণসিংহজী রামতীর্থের জীবনের অভিব্যক্তিকে স্বতঃস্ফুরণবাদের সহায়তায় ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হইত, স্বামী রামতীর্থের সাধনলব্ধ সত্য যদি ভারতের গনাতন বাণী হইয়া-পাকে, তবে তাহার অভিব্যক্তির ধারাও দর্শনোক্তভাবে জাতীয় সাধনার ধারারই অনুরণন করিবে। অর্থাৎ রামতীর্থের বাণীও যিনি মহাপুরুষের বাণী চয়, তবে তাহার মূলে গুরুশক্তির লীলা না ভারতের রূপা নিশ্চয়ই থাকিবে। আমরা ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু পূরণসিংহজী লিখিত কাহিনীতে এই সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিতই 'পাই' নাই। সম্প্রতি গুজরাতি ভাষার স্বামিজীর একখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে

হিন্দী, উর্দু, মরাঠী, টংরেজী প্রভৃতি ভাষার স্বামিজীর জীবনী সম্বন্ধে বাহা কিছু এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই সার সঙ্কলন করা হইয়াছে। এই গুজরাতি জীবনীতে আমরা তীর্থরামের জীবনকাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশটুকু পাঠিয়া পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়াছি— মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণনার যে নূনতা ছিল, শ্রীভগবানের চচ্ছায় তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে। পূরণসিংহজী তাঁহার লিখিত গ্রন্থে এ কাহিনী যে কেন গোপন করিয়া গেলেন, তাহা বিশ্বাসের বিষয়। নোধ চয়, আধুনিক রুচি-সঙ্গত নয় বলিয়া তিনি এ কথা চাপিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সহানুষ্ঠান পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার মনোমত না হইলেও অন্ততঃ প্রতিবাদ ভালও তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিতে ভো পারিতেন। তীর্থরামের সম্ভ্রমের রূপালাভের কাহিনীটা তাঁহার গুজরাতি জীবনচরিতে ত্রিনিমিত্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ইচ্ছাসম্বন্ধে ব্যক্ততা প্রযুক্ত আমরা ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না। বাহা হউক, পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা কাহিনীটা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

“এই সময় বালক তীর্থরাম যেমন অবিবাহিত পরিশ্রমসহকারে বিদ্যার্জনে রত ছিলেন, তেমনি অপর দিকে গুরুশক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা পূর্ব্বেতন্ম-কৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে একাগ্র করিয়া জ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকারলাভেও যত্নবীণ ছিলেন। যেমন অত্যন্ত মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায়, তেমনি বালক তীর্থরামেরও বার বৎসর বয়সে ভবিষ্যজীবনের অপরূপ রূপরেখা স্পষ্ট হইয়া না উঠিতেই এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামতীর্থ যখন হিমালয়ে একান্তবাস করিতেছিলেন, সেট সময় তাঁহার জনৈক ভক্তকে তিনি কৃপা করিয়া এই কাহিনী শুনাইয়াছিলেন।

“ভক্ত ধন্যরামজীব নিকট থাকিবার সময় এক দিক দিয়া তাঁহার চিত্ত যেমন নিরন্তর প্রভুভক্তিপরায়ণ ছিল তেমনি বাহ্য ব্যাপারে অনেকটা নিরুবেগ ও অতৃপ্তিতও ছিল। একবার এই প্রকার ধ্যান-তন্ময় অবস্থাতে তাঁহাকে বাজারে যাঁতে হইয়াছিল। সেখানে সহসা একটা সৌম্যকাস্তি, উজ্জলশ্রী ও দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সন্ন্যাসীও একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তীর্থরামের ইচ্ছা হইল, একবার তাঁহার কাছে গিয়া চরণস্পর্শ করিয়া তাঁহার সহিত ছুট চারিটা কথা বলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, হৃদয়ের কেহই কোনও কথা না বলিয়া শুধু পরস্পরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে একদিকে চলিয়া গেলেন।

“কিন্তু দৈবের গতি অচিন্তনীয়। তীর্থরাম সম্বন্ধে এই মহাপুরুষের গাথা কথিতব্য ছিল, তাহা ‘পাজারভর’ লোকজনেও মাঝে কনিবার কোনও উপায় ছিল না—তাঁহার দক্ষিণ কানু কুল দেশ ও কালের প্রতীক। এখানে তিনি বাজারের কাজ সাংগ্ৰহ্য তীর্থরাম বাড়ী আসিয়া দেখেন, সেট সন্ন্যাসীটা আরও কয়েকজন সাধু-গজ্ঞানের সহিত পূর্বেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সাধুরা তখন বেদান্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, শ্রোতার শাস্ত চিন্তে তাহা শ্রবণ কার্যতঃ ছেন, জিজ্ঞাসুরা আপন আপন জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত

করিতেছেন। তীর্থরাম সাধুগুণীর দর্শন স্পর্শ করিয়া তাঁহার আন্তরিক জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার অপূর্ণ প্রয়োগ পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি সাধুগুণীতে শ্রদ্ধা করিয়া শ্রোতাধিগের সহিত বসিয়া গেলেন। তখন অনিরাম শাস্ত্র কথ্য চলিতেছে—বেদান্তের হ্রুহ তত্ত্বসমূহ অতি প্রাজ্ঞ ও স্নোচক ভাষায় ব্যাখ্যাত হইতেছে। বক্তা সেট সন্ন্যাসী। জিজ্ঞাসুদিগের সমস্ত চিত্ত তাঁহার উক্তিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ততক্ষণে তীর্থরামের হৃৎ চক্ষু বহির্বা অপ্রসার্য পড়িতেছে। ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল। ভগবানের বরহ, আত্মমূভবের অভাব ও আপনায় দৈন্ত্যভাবে পীড়িত তাঁহার চিত্ত এমনই এলা-চ্য পড়িল যে তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার দেহ থাকিয়াও নাই। ক্রমে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া ‘মাটিতে’ ঢলিয়া পড়িলেন।

“এই ব্যাপারে শাস্ত্রালোচনা বন্ধ হইয়া গেল। সকলের দৃষ্টি তীর্থরামের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এবার বছরের বালকের মুকোমল চিত্তেও উপর বেদান্তের মত গম্ভীর বিষয়ের এমন আশ্চর্য্য প্রভাব যে ভাবাবশেষে সে মুর্চ্ছ হইয়া যায়—এত ব্যাপার দেখিয়া সকলেও অত্যন্ত বিষয় বোধ করিলেন। কেত কেত মনে করিল, এই কৃশকায় বালকটা বোধ হয় দেবের হর্ষলহা হেতু অমন করিয়া মর্জিত হইয়া পড়িল। সকলে-রগেণ ছিটা দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইল। কিছুকণ পরে বালকের চৈতন্যসংকার হইল। অক্ষুটস্বরে ত—ত—ত— বালকে বসিতে তীর্থরাম চোখ মেলিলেন। এমন সময় সেট মহাপুরুষ তীর্থরামের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার মস্তকে বীজ বহনস্ত স্থাপন করিয়া

ঘীরে ঘীরে তাঁহার কাণে কি জানি কি বলি-  
লেন—আর অমনি তীর্থরাম বিদ্রুৎকিতের  
স্তায় অতি নিখুঁত হস্তচলিতকারে একেবারে  
সেই মহাপুরুষের চরণে নুটাইয়া পড়িলেন।

“পরবর্তীকালে রামতীর্থ যখন বশিষ্ঠাশ্রমে  
অবস্থান করিতেন, তখন কথাক্রমে বলিয়া-  
ছিলেন, সেই মহাপুরুষ মূর্ত্যভঙ্গে তাঁহার কানে  
কানে “তত্ত্বমসি—তত্ত্বমসি—

তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের উপদেশ  
করিয়াছিলেন। এইরূপে এক অজ্ঞাতনামা  
মহাপুরুষের কাছে দ্বাদশবর্ষ বয়সে তীর্থরাম  
বেদান্তের দীক্ষা পাটখাছিলেন।”

আমরা কাহিনীটা যথাযথ লিপিবদ্ধ  
করিলাম। অভিজ্ঞ পাঠকের নিকট ইহার  
তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ নিম্নরূপে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত



## কর্মযোগ

ভগবান্ গীতার বলেছিলেন, “কর্ম চোক  
অকর্ম হোক, আর বিকর্ম চোক—সবার  
মাঝেই তোমার বুঝবার মত কিছু না কিছু  
রয়েছে—কেননা কর্মের গতি অতি গহন।”

কথাটার সহজ তাৎপর্য্য এই বুঝি, গুণের  
বিক্ষোভ ছাড়া যখন কর্ম করা সম্ভবপর নয়  
এবং এক গুণের সঙ্গে আর এক গুণের সহচার  
যখন অবশ্যস্বাবী, তখন কোনও কর্মই দোষ-  
বর্জিত হতে পারে না। অথচ কর্মের মাঝে  
কোনও দোষ না থাকে, এটা সম্ভবই হইছে।  
কর্মই দোষ আছে কি না আছে, তার বিচার  
হয় ফল দেখে। কর্মের ফল চাটতে নাই—এটা  
বড় কথা। কিন্তু ফল তো শুধু বাইরেই নয়, ফল  
ভিতরেও যে আছে। আমার কর্মে বাইরে  
নিক্ষেপ হতে পারে—সেটা হল দৃষ্ট ফল;  
আবার সেট কর্মই আমার সংস্কারেরও কিছু  
অঙ্গ-বঙ্গ হয়—সেটা হল অন্তর্দৃষ্ট ফল।

ফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকার অনেক সোয়া-  
স্তির কারণ; কেননা বাইরেটা যখন আমার  
আয়ত্তে নয়, তখন তার ভালমন্দ ভেবে নিজে  
বিত্রস্ত হয়ে লাভ কি? সাধারণতঃ কর্মের  
ফলভাগ বলতে আমরা এটুকুই বুঝি। কিন্তু  
এর পরেও কথা আছে।

বাইরের ভাবনা না হয় ছাড়লাম, কিন্তু  
আমার নিজের ভাবনা? কর্মের দ্বারা যে  
সংস্কারের তালোড়ন আমার মাঝে হবে, তাকে  
ছাড়তে হবে না কি?—আমরা বলছি—হাঁ,  
তাও ছাড়তে হবে; আর কর্মজনিত সংস্কার  
ভাগাই তো হচ্ছে আসল ফলভাগ। এমন  
কি, এ কথাও বলা যেতে পারে, ভিতরে যদি  
কোণায়ও সংস্কার পুঞ্জি না হয়, তাহলে বাইরে  
যদি লোকদৃষ্টি কর্মও করি, ফলের চিন্তাও  
আসে, তাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু সে হল  
বড় কথা, কর্মের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যই

কি করে পৌঁছাতে হবে, তারই সঙ্কেত চাই !

প্রথম সঙ্কেত এট—খাটিবে নিজের জ্ঞান  
নয়, পরের জ্ঞান। কতকগুলি জিনিষে আমার  
নলে দানী আছে। সেই দানীগুলো ছাড়তে  
পারলে তবে যথার্থ আমিহ সন্ধান পাওয়া যায়।  
আমিহ দেহ যখন বলছি, ততক্ষণ বাস্তবিক  
আমিহ দেহে—তারই স্মৃতিরূপে কাতর, তারই  
তোয়াগে অহরহঃ ব্যস্ত। কিন্তু যদি দেহ  
হতে ‘আমিহ’ ছাপ তুলে নিয়ে ভাবি, দেহ  
আমিহ নয়—পরের বা জগতের, তখন আপা-  
ততঃ একটা ফাঁস হতে মুক্তি পাই—আমিহ  
তখন আরও একটু গুহাহিত ও স্বস্তিযুক্ত হয়।  
হয়ত তখন কল্পনাজলনাগুলো আমার, বাসনা-  
কামনাগুলো আমার—(হোক না সে জগতের  
কাজ কর্ণ বলেই।) আবার এগুলো  
হতে আমিহকে তাড়াতে পারলে, সে গিয়ে  
হয়ত সাধুবুদ্ধিকে আশ্রয় করবে। তখন  
কল্পনাজলনার বাড়াবাড়ি থাকবে না, অগত  
অকণাভাসের মত একটা স্নেহ প্রকাশে চিত্ত  
আলোকিত থাকবে। কিন্তু এতে বিষয়সম্প-  
র্কের একদিক মাত্র জানা থাকে—কেমন করে  
উঠছি, তা জানব। কিন্তু কি আনন্দে নেমে  
ছিলাম, তা তো জানি না। সুতরাং এই  
সাধুবুদ্ধিও পরপারে আমিহকে ঠেলে দিতে  
হবে। সেখানে গেলে অটুট আশ্রয়,  
তরঙ্গদোলার আর ভয় নাই—এই হল আমার  
যথার্থ স্বরূপ।

কিন্তু এই ‘অবস্থা’ পেতে হলে আগেই  
বলেছি পরার্থপর হতে হবে। আমিহকে  
যখন এক এক ধাপ তুলে আনব, তখন সেটা  
যে নিরুদ্ধ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, তা নয়—বরং  
সে স্তরে যে কাজ চলছিল, সে কাজ পূর্বানমেই  
চলতে থাকবে। দেহ ছেড়ে আমি যখন

মনের আশ্রয় নিল, তখন কি দেহ গড় হয়ে  
যাবে? তা তো নয়—তার কর্ণ যেমন ছিল,  
তেমনি থাকবে, বরং সঙ্গীর্ণ আমিহের বাধা  
না থাকায় জগতের কর্ণশৃঙ্খলার সঙ্গে যোগ  
হয়ে তার বেগ আরও বাড়বে। আর এট  
বেগ বা শক্তির ক্রিয়াতেই দর্শক আমিহ  
আনন্দ। এমনি করে আমিহ এক এক স্তর  
পার হতে থাকবে, আর সেই স্তরের বিভূতি  
সমস্ত বাধা হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণপ্রসূতিত শত  
দলের মত বিকসিত হয়ে উঠবে। এতে দেহ-  
প্রাণ-মনেরও মুক্তি ও সোয়াস্তি—আমিহেরও  
তাই। পরার্থপরতা বা পরের জ্ঞান খাটার  
মানে এই।

এমনি ভাবের মনন করবে—একটা  
নিঃস্বাসও আমার ভোগের জ্ঞান নয়—কেবল  
প্রাণীপের মত পরকে আলো দিয়ে, তেজ দিয়ে,  
প্রেম দিয়ে ত্যাগে, সার্থক হওয়া। এটুকু  
হল কর্ণের মর্মসঙ্কেত। কর্ণের যে বাইরে  
ভিতরে ছ’রকম গলদের কথা আগে বলে-  
ছিলাম—তা হতে মুক্তি পাবার পথ হল এই।  
যাকে কর্ণ বলি বা কর্ণবিরতি বলি বা অপ-  
কর্ণ বলি—তার মূল রহস্যই এই। এই কথা-  
টাই ভগবান্ তলিয়ে দেখতে বলেছেন। অক-  
র্ণের নৃত্যে হবে এটুকু যে, যদি কর্ণবিরতি  
মানে আমার জ্ঞান খাটা নয়—এট হয়, সে  
ভাল; যদি তার মনে জড়ত্ব হয়, তাহলে বিপদ  
আছে। আমার আমিহ জগতের হয়ে তারা  
খাটছে, কিন্তু ‘আমিহ’ কিছুই করছি না—কোনও  
সংস্কার গ্রহণ করছি না। এই হল অকর্মে  
সিদ্ধি। আবার আর এক দিয়ে ঠিক এইটাই  
কর্মে সিদ্ধি। ফলে আমার স্পৃহা নাই—তাই  
অকর্মে; আল, কর্ণের খতাবজ ফল বিবেচনার  
ভাণ্ডারেই সঞ্চিত হচ্ছে, সবাই তার ভাগ

পাচ্ছে—এই হল বথার্থ কর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু—তা হচ্ছে বিকর্ম বা অপকর্ম বা অহঙ্কারের গোলামী। সংক্ষেপে কর্মরহস্য এই।

এখন এই সঙ্কেতকেই কি করে সিদ্ধ করা যায়, তাহার দরুণ আরও কিছু সঙ্কেতের প্রয়োজন। যেখানে পরের জন্ত খাটা, সেখানে অভিমানের অভিকিত আনির্ভাব খুঁই সম্ভবপর। আত্মসার্থে খাটার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অহংকে ভুলে থাকি, কিন্তু পরার্থে সামান্য খাটলেও যে সুনির্মল আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, অহঙ্কারের স্পর্শে তা সহজেই কলুষিত হয়ে ওঠে। এই অভিমানকে রুদ্ধ করতে হলে আপনাকে স্তব্ধ করতে হবে। বুঝতে হবে, ভাবতে হবে—আত্মা একমাত্র চৈতন্তরূপ, আর দেহ-মন-বুদ্ধি জড় মাত্র। আমরা জানি, এ কথাটা সাংখ্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত, অগ্নান বদনে তা মেনেও নিই—কিন্তু সিদ্ধভাবে ত্যাগন করি না। অভিমান যখন আত্মপ্রকাশ করবে, তখন সে দেহ-মন-বুদ্ধিরই আশ্রয় নেবে অর্থাৎ দর্শনিক বিচারে যারা জড় বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, তাদের মাঝে চৈতন্তের অবতাস এনে দেবে। চৈতন্তের সম্পর্শে দেহ-মনের মিথ্যা সজীবনই তো অভিমান। যদি ভাবি—শুধু আমি আছি—স্বত্ববুদ্ধি অং মাত্র বর্তমান—আর সেই আশ্রিতে দেহ জড়, মন জড়, বুদ্ধি জড়, এই সত্য হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে যায়, তবে সংস্কারের কোন কারণই থাকতে পারে না। একেই বলি দেহ-মনের নিঃস্পন্দ অবস্থা বা সমাধি। আত্মচৈতন্তকে সদাঙ্গপ্রাণ রেখে কর্মক্ষেত্রে এমন নিঃসত্ত্ব নিঃস্পন্দ হবার অভ্যাস

কর্মেতে হবে। পূর্ববেগে যখন কাজ চলছে, তখন চর্চাৎ একেবারে নিজকে সবলে তা চোখে বিচ্ছিন্ন করে নাও। ফলাফলের ভালমন্দের চিন্তা মোটেই করো না—একটা আনন্দের সর্কাবগাহী প্রাণে অস্তুর এলিয়ে পড়বে—আত্মার অনাবিল আনন্দশিহরণের একটু রেশ পাবে। এমনি করে শুদ্ধতার নিজকে অভ্যস্ত করতে হবে।

এ হল ভিতরের কথা। বাইরের জগতে আবার এই ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কতকগুলি আচরণে সিদ্ধ হতে হবে। এ সবাবি মূলে থাকবে সেট বিবিক্ত নিক্ষিপ্তভাব, তুমি সব কিছুতে থেকেও যেন নাই। এমন কি যা আজ তোমার একান্ত কামা, কাল তার একান্ত পরাভব দেখেও তুমি ক্ষুব্ধ হচ্ছ না। আচারের বন্ধনে চিত্তকে নামিয়ে আনলে সকলরকম বিরোধী অবস্থার দরুণই মনকে শৈথিল্যে রাখতে হবে, এ কথাটা যেন স্মরণ থাকে।

পরার্থে উৎকৃষ্টপ্রাণ আদর্শ কর্মীর আচরণ এই—

(ক) আচরণে তুমি আদর্শ হবার চেষ্টা করবে। জগতে সবাই আদর্শ জানে না—তুমি তাদের সামনে চলে দেখাও, শেখাও!—অহংকার নিয়ে নয়, বৃকভরা গেম নিয়ে। যদি বল, আমি অধম, সে তোমার মহাত্মম। নিজের প্রতি যার প্রভা নাই, সে কখনো পরের আদর্শ অনুকরণ করবারও যোগ্যতা অর্জন করেনি। বড় হবার মুখে চললে তবে বথার্থ বড়কে চেনা যায়—কেমনা নজর তখন উঁচু হয়। সুতরাং “আত্মনি প্রজ্ঞা”—চরিত্রসাধনের এই মূলমন্ত্র করতে হবে। এই প্রজ্ঞার তোমার মাঝে জীবন্ত আদর্শ গড়ে তুলুক—তুমি জান,

তোমার একটা মুখের কথা, একটু চোখের ইঙ্গিত—জগতে তারও মূল্য আছে। তাই ভাগ না করুক, মন্দ যে করতে পারে, তা শো স্বীকার কর? তবে আর ভাগও যে করতে পারবে না—এ অশ্রদ্ধ টাট বা পোষণ কর কেন!

(খ) স্মরণে রেখো, মূল জগতে কোনও পরিবর্তন আনবার চেষ্টা ধরা! তাব দরুণ জগতে কোনও বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, না—নিজকেও অধঃপাতিত করে না। প্রেম মূল্য শক্তি—সেই শক্তির মতিমায় অমতাকে জয় কর—দেহের জোরে নয়, তর্কের তোড়ে নয়।

(গ) যে জঁতায় করছে, তার কল্যাণ কামনা কর। যদি তার ব্যবহারের পরিবর্তন চাও—তবে বলপ্রয়োগ করে না, যুক্তি জাতির কন্যা না—বল ও শিমু! সমস্ত প্রাণের শক্তি নিয়ে দেউ অনন্ত করুণাময়ী বিশ্বজননীর কুল্যাণী মূর্তিকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর শক্তিতে শক্তিমত্ত হয়ে বল—ওঁ শান্তিঃ; বাহ বলের চেয়ে আত্মবল শ্রেষ্ঠ।

(ঘ) দেহদ্বারা চিত্ত কর—চিন্তাদ্বারা চিত্ত কর। এমন কাজ না! চিন্তা করবে না, যাকে জগতে অদিতাশক্তির প্রচার হয়। তুমি সত্যের প্রচারক—জগদম্বা তোমার সহায়।



## মায়ের দেখা

মায়ের দেখা চাও তুমি, তবে পাও না কেন?—শুধু তোমার অসিদ্ধাসের দরুণ। অহরহ তাঁর দেখা পাইতেছ, পাইয়াও বুঝিতে পারিতেছ না—এই তো তোমার দুর্দৈব। অভিমান করিয়া কেহ বল, মা নিষ্ঠুর তাই এমন করিয়া, কাঁদায়। সন্তানের কান শুনিয়া মায়ের গাণ স্থির রহিয়াছে—এ কি কোথাও দেখিয়াছ, বা শুনিয়াছ? তুমি নিশ্চয়ই পীকার করিবে, জগন্মাতাই যে হয় এক কণিকা লইয়া কী জগতে অগণন মাতৃ-মূর্তির সৃষ্টি হইয়াছে—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ হাতে মানুষ পর্যন্ত অসংখ্য সন্তান মায়ের স্নেহসুধারসে সঞ্জীবিত ও গৃষ্ট হইতেছে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে এই জীবধাত্রী মাতার

অপরিসীম মমতার কথা স্মরণ করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এট মা যদি এমন হয়, তবে সেই মা কেমন! যার ছায়াতে এমন করিয়া মমতার সূদা বারিয়া পড়ে, আঁখিকোণে অশ্রুশ্রবল প্যাকুলতা করিয়া পড়ে, সেই মায়ের চিন্ময়ী কায়া কেমন! ওরে অগোপ, ওরে অজিহ্মানী, তবু তুই বলিবি, মা নিষ্ঠুর!

‘হাঁ, জগতে হুঁ পাও তুমি, সে কথা স্বীকার করি। হয়ন্তু ব্যথার জ্বালায় ছটফট করিতেছ একটু ভাঙ্খু, কনিদারঙ তোমার কেঁচ নাই। তখন কাঁদিয়া দেখা না পাইলে অভিমান করিয়া বল, “লাকলে পরে বিত্ত দেখা সর্বনাশী বঁচে নাই,” কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করি, এই অশ্রুস্তব গাতনার

মাঝেও সেই অভিমানভরা মাতৃসম্বোধনেই না তোমার তৃপ্তি! সংসার যখন বিমুখ, তখন সেই নানাস্থানগট না তোমার তৃপ্তি প্রাণের একমাত্র রসায়ন! আমি সোজা কণায় বলি, মা যদি নাই থাকিবে, সন্তানের জন্ত তার প্রাণ, যদি নিরন্তর সস্তাপিত নাট হইবে, তবে মা নামে এত মধু কেন? তবে কেন অবোধ সন্তান আঁকুণ হইয়া আকাশের পানে হুঁহাত বাড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া নিগদিত কণ্ঠে ফুকানিয়া মরে—মা—মা—মা! কে এত ডাক তাহাকে শিখাইয়াছিল? কোথায় সে এই সঞ্জীবন মন্ত্র পাটয়াছিল? জীব যখন মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রথম সৃষ্টির আলো দেখিতে পায়, তখন অনাহত প্রেণার ওঙ্কারের অবভাস লইয়া কে তার আঁকুল কণ্ঠে এই সুধামাখ্য নাম ফুটাইয়া তোলে, মা—ওমা! হৃৎপিণ্ডিত হইয়া ডাকি—মা! ভয়ে চকিত হইয়া ডাকি—মা! শ্রাস্ত দেহে বিশ্রামণনে চলিয়া পড়িতে ডাকি—মা! নিশ্বাসে আনন্দে আত্মহারা হইয়া ডাকি—ওমা! মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এত জীবনের আগন্তু হইয়াছিল—জানি, অজপার শেষ জপে সেই নামেই এই জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে। এই তো আমার সিদ্ধ মন্ত্র—জীবনের প্রথম উন্মেষে জগৎগুরু মহাদেব এত নামের সঙ্গেই তো আমার চेतনার সঞ্চার কবিত্ব দিয়া ছিলেন। তারপর সারা জীবন ধরিয়া মুখে হৃৎপে, সম্পদে বিপত্তিতে—এই নামকে আশ্রয় করিয়াই অজ্ঞাতসারেও মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি—অবশেষে একদিন এত নামেই চিরবিশ্রাম লাভ করিব। এমন করিয়া মাতৃমন্ত্রে জীবনের প্রত্যেকটি সিদ্ধি গাঁথা যায়—সে বলিবে, মা নাই।

ভাই, যদি নাম থাকে, আর সেই নামে যদি তৃপ্তি পাও, প্রাণের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিবার সিদ্ধমন্ত্র যদি সেই নামটই হয়—তবে অকপটে বিশ্বাস করিও, নামী আছেন; আর সেই নামীট নামের সহায়ে তোমার মাঝে ফুটিয়া উঠিবার জন্ত নামে এত মধু ঢালিয়া দিয়াছেন। মা যে আছেন, পরমস্নেহে যে আমার জড়াইয়া রহিয়াছেন, তার একমাত্র প্রমাণ মায়ের নাম। যে নামে জীবের জন্ম-গত অধিকার, যে নামে পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত সহজ সিদ্ধি! মাতৃনামের মহিমা যদি বুঝিয়া থাক, তবে সহজেই মাকে দেখিতে পাইবে—মুখের ভাষা, বকের ভাষা, চোখের ভাষা এক সুরে বাজিয়া উঠিবে। যদি দর্শন চাও, তবে নামে শ্রদ্ধা রাখ। যত বাজে সংস্কার মন হইতে মুছিয়া ফেল, শুদ্ধমাত্র নামের আশ্রয়ে চিত্ত সমর্পণ কর; দার্শনিক বিচার ভুলিয়া, লৌকিক বুদ্ধির বালাই ছাড়িয়া কেবল তার-স্বরে, অতল্লেখচিত্তে, প্রাণ মন একতান করিয়া ডাক—মা—মা—মা! বর্ষণে যেমন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অরূপ সত্তা রূপরেখায় ফুটিয়া উঠে, তেমনি নামের অভিবাতে মায়ের চৈতন্য রূপ হৃদয়ের অক্ষরকার আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিবে। মাকে দেখার উপায় এতটাই সহজ।

সহজ উপায় বলিয়াটই হয়ত সংশয় আসিবে। কি! সে সব সংশয়ের সহিত কি করিয়া লড়িতে হয়, জান? যুক্তি দিয়া কখনও সংশয় খণ্ডন করিতে বাইও না, ঠিকিবে; নিজের যুক্তির গোলোকধাওয়ায় নিজেই ফাঁপন হইয়া আরও সংশয়ের জালে জড়াইয়া পড়িবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—সংশয়কে সংহার করিবার অমোঘ নজ্র এই

মাঝের নাম! শুনিয়াই, মাঝের নাম করিলেই মা ছুটিয়া আসেন; সঙ্কল্প করিয়াছ, মাঝের নাম করিলে; এর মাঝে সংশয় আসিয়া উঁক দিয়া বলিয়া গেল—তাও কি হয়? আমি বলি, ওর কথায় মোটেই কাণ দিও না—কোন যুক্তি শুনাইও না, শুনিতে চাচিও না—বজ্র-ফোটনে শিশু যেমন হুট কাণ চাপিয়া ধরে, তেমনি সংশয়ের একটু রেশ কাণে বাজিয়া উঠিতেই কর্ণকুহর রুদ্ধ করিয়া তাৎক্ষণিক বলিয়া ওঠ—মা—মা—মা! এক একটা একপুঁয়ে ছেলে থাকে—চকিতের মত সে মাকে যদি একবার দেখতে পাইল, অমনি সর্ব্বনেশে কান্না জুড়িয়া দিল; মা যতই দূরে সরিয়া যাউন, কান্নার বেগ ততই দিগ্বিধিত করিয়া তুলিলে, খেঁগায় ভুলিলে না, কাজের ওজর বুঝিলে না, ধনক মানিলে না—কেবল প্রাণপণ জেদ ধরিয়া মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া কাঁদিলে—মা—ও মা—!—! সে ছেলের না কি না আসিয়া পারে? সাধ্য কি তার! ছেলেব আত্মকণ্ঠেব এক একটা ধ্বনিতে মাঝের বুকে যে মুষলের ঘায়ের মত বাজিতে থাকে! চিন্ময়ীর সুধমাখা পরশ যদি চাও, তবে ওই জেদী ছেলের মত হও, সুবোধ ছেলেটির মত পথের যুক্তি শুনিয়া, পথের উক্তি মানিয়া সব গোয়াইও না।

✱

মাজুবেব বুদ্ধি হটয়াছে এক বালাই। অদ্বৈতাদের এই তো গোড়া। যার যত বুদ্ধি বেশী, সে তত অদ্বৈতাদামী। বুদ্ধিতে দর্শন-শক্তিকে অন্ধ করিয়া দেয়। কচি শিশু আপন মনে হাসে, চোখ টিপে—লোকে বলে দেব-তার সঙ্গে খেলা করিতেছে। কথাটা মিথ্যা নয়। শিশুর বুদ্ধির বড়াই নাই, তাই দেবদর্শন তার পক্ষে সহজ। ছেলেভুলানো কত গল্প,

আছে—আমরা বয়স্ক হইয়া তাহা অবস্থাস করি, আর ভাবি, ছেলেগুলো কি বোকা! সাত সমুদ্র, তের নদী, সোণাব পাতা, তীরার ফুল—সব তার চোখে সত্য হইয়া ভাসিয়া উঠে, অগ্নিদেহের রাজপুত্রে হাটেতে কোণাও তাহার বাধে না। আমরা বলি, ও সব ফাঁকি। হয়ত তাই। কিন্তু ছেলে যে সরল বিশ্বাসে তা দেখিতে চায় এবং দেখিতে পায়, আমি তাহাকেই বলিহারি যাচ। কই, গুরুব বাক্যে আমার অচিনদেশের গাতমহল্লা রাজপুত্রে তো অমন করিয়া সত্য হটয়া উঠে না। গুরু বলিয়া দিগেন, জ্যোতিঃসমুদ্রে, জ্যোতির্ম্ময়দীপ তাতে জ্যোতির্ম্ময় পুত্রেতে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে ওই দেখ জ্যোতির্ম্ময়ী তোর মা! আমি কিন্তু চোখ বুজিয়া কেবল অন্ধকারই দেখিতে পাই। কখনও না ভাবি, ও সব কবি কল্পনা। মনের আধার তাতে আরও ঘনাইয়া আসে। ভাবি, চিরকালই কি এমন ছিলাম? আজ যে চোখ বুজিলেই আধার দেখি, কই ছেলেবেলায় মার কোলে শুইয়া যখন রূপকথা বিচিত্র কাহিনী শুনিতাম, তখন তো চোখ বুজিয়া সবই দেখিতে পাইতাম। তখন চোখ মেলিলে দেখিতে পাইতাম সাতরঙা আণোর মাযার রচা এক জগৎ, আণার চোখ বুজিলেও দেখিতে পাইতাম কল্পনার জীবন্ত প্রতিভাসে গড়া আর এক জগৎ। আজ, বুদ্ধি পাকিয়া আমার এ কি হৃদয়া হইল! বাইরে আমার ক্রাণ খাড়া, চোখে পলক নাই, হিসীবেব কড়ির একটা এখার ওখার হইতে পারে না, অঁর ভিতরের দিকে তা কাইলগেই, আমি অন্ধ, বয়ির। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসসমুদ্র এক বিগাট নাস্তির গহবরে তলাইয়া যাট—এই বুদ্ধি থাকিতে শেষে আমি হইলাম নাস্তিক!



এই বুদ্ধির ফেরেই মাকে দেখিতে পাই না। নটলে শাস্ত্রবাক্য তো মিথ্যা হইবার নয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—“যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনে অভিযায়তে।” তবে চক্ষু বুলিয়াও তাহাকে পাই না কেন? শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিতৈব মা জগন্মূর্তিঃ—তবে বাইরে চোখ মেলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? আমার ভিতরেও যেমন আধার, বাহিরেও তেমনি আধার। এ কি বুদ্ধির ফের নয়?

আজ সহজ দৃষ্টি হারাটয়াছি, তাই আমি চাই কিছুত-কিমাকার দর্শন। আবার সে চাওয়ার একটা ধাণা আছে কি? মায়ের নাম নিয়া কত বড়াই করি, কিন্তু এখনও কি আমি স্থির করিয়াছি, মায়ের কোন রূপটী আমি চাই? ভগবান্ বলিয়াছিলেন, যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থৎ যাহাদের কিছু হটবার নয়, তাহাদেরই বুদ্ধি কুল-কিনারা নাট, বুদ্ধি ডালপালায়ও অন্ত নাট। আমারও তো ঠিক সেই দশা। মুখে বলি, মা-টী চাই মনের মত, কিন্তু মন কি আমার মায়ের দিকে আছে যে তার আঁকাঙ্ক্ষানুযায়ী অরূপাকর সে রূপে ফুটাইয়া তুলিলে! একমুণী বুদ্ধি নাট বলিয়াই অবিশ্বাসে আর মন ছাটয়া গিয়াছে—গুরু বাহা বলেন, তাহাতেই একটা খটকা থাকিয়া যায়, অথচ নিজেও স্থির করিয়া একটী কিছু ধরিতে পারি না। মা গো, আমার এ দুর্গাত কবে দূর হইবে মা!

লোকে বলে, সাধন কর-তবে পাইবে। এই তো আমার অন্তঃসবট খুলিয়া বলিলাম। এই সম্বল নিয়া সাধন করি? আমি কি বুঝিয়াছি, কি/পাটয়াছি, যে তাহাট ধরিয়া সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করি। সাধনের কথা শুনিয়া একদিন গুরু হাসিয়া বলিলেন, “তুই ধরনি শক্তি হয়ে পামন!” ভাবিয়া দেখিলাম, তাই তো। সাধন তো কর্ম্ম! যে কর্ম্মের

সঞ্চয় লইয়া জগতে আশিদ্ধাতি, তাহারই ঠেলা সর্ম্মলাটেতে পারিতেছি না, আবার নূতন করিয়া কর্ম্ম জুটাইব? কে জানে, তাহার সর্ম্মিলাম হইবে কি? কর্ম্মশাল এড়াইতে হইবে, তাই যদি সত্য হয়, তবে সাধনপাশ এড়াইতে হইবে না কি? গুরুকে গিয়া কণাটা জিজ্ঞাসা করিলাম, তান হাসিয়া বলিলেন, “ঠিক, সে বেটা কত গড়া প্রাণায়ামের বশ, তার কোনও চুকিনামা তোকে লিখিয়া দিয়াছে কি? গুণা তীতা, কর্ম্মাতীতা যে, সে তোর কর্ম্মে বাঁধা পড়িবে—এত বড় অভিমান তোর?” তবে উপায়? “উপায় শুধু তার নাম! যুক্তিতর্কের ধার ধারিস্ না, অতিবুদ্ধদের কথা শুনিস্ না, কেবল শিশুর মত সরল পন্থে অনুভব কর—সে আছে, তোকে বুকে কারয়া, মনেও শত পাকে জড়াইয়া আছে। নিজের বকের স্পন্দনে তারই বকের স্পন্দন শুনিতে পাটব, নিজের নিঃশ্বাসে তারই স্রবভিগ্নদের অনুভব পাইব, প্রতি গৌমকূপে তারই স্রুতরূপে অমঙ্গলপরশ পাইবি! তুই শুধু আকুল কঠে ডক—মা—মা—মা! জানিস্ ওই নামে ব্রহ্মাও ভাণ্ডারীও বুকে গোলপাড় ওঠে, শুনে ফীরের ধাতা আগনি ছুটে! ওগে এ অভাগা—তুই-ই শুধু মাকে চাস্—এই তোর বড়াই! সে কি তোর চাম না? ছেলে মাকে ভুলতে পারে—মা কি কখনও ছেলেকে ভুলে!”

এ কথা যে দিন শুনিয়াছি, সেট দিন হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছি—আর কারও কথায় ভুলিব না। মায়ের তত্ত্ববিচার যে করে, সে ছেলে তো ভারী জ্যাঠা। আমি জানি পাওয়ার একমাত্র পথ—শিশুর মত কঠে মধুর মতাতালিয়া মাথের পণ্য গলাইয়া ডাকা—মা—ওমা—মা!

## আরণ্যক



“যজ্ঞেন বাচঃ পদাশ্রয়মায়নং তামস্বিনন্দনং ঋষিষ্য প্রবিন্দ্ভাম্ ॥”

— ঋগ্বেদ সংহিতা—৩২।৮

যে গুণগুলি আমার ভাল লাগে, সেগুলি যার মাঝে দেখি, তাকে ভাগবাসতে ইচ্ছা হয়। যেখানে আমি মুগ্ধ হচ্ছি বাস্তবিক পক্ষে মোহের বস্তু সেখানেই আবদ্ধ নয়— তা আমার মাঝেই। সৃষ্টিকর্তা প্রথমে নিজের মাঝেই জগৎ কল্পনা করেন, তার পর বাইরে তা রূপ ধরে ফুটে ওঠে। শিব চোখ বুজে যে সৌন্দর্য ধ্যান করলেন, বাইরে তাই পার্শ্ববীক্ৰমে তাঁর কাছে প্রকাশিত হলেন। সৌন্দর্য বাইরে নয়— ভিতরে। কল্পরী তো মূগের নাভিতেই থাকে, কিন্তু সে তার গন্ধে আকুল হয়ে সারা বন খুঁজে বেড়ায়— মানুষের দশাও অমনি।

✽

মানুষ সেট, যার মানের হুঁশ-০ রয়েছে অর্থাৎ যার আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত সচেতন। এট আত্মসম্মানজ্ঞান আসে আত্মার মহিমা-জ্ঞান থেকে। এক দিন যে সূমা ছিল, আজ সে নিজেকে মনে করছে ক্ষুদ্র, কিন্তু তবও বৃহত্তর সংস্কার তার মাঝে রয়ে গিয়েছে। তাই সে অপরের কাছে মাথা নোয়াতে চায় না। যার মাঝে এই সংস্কার যত প্রবলভাবে জাগ্রত হবে, তার মাঝেই আত্মসম্মানজ্ঞান বেশী ফুটবে। তাই মানুষ অপর জীবের

তুলনার নিজের মান নিয়ে বেশী বাস্তব। যার মাঝে চৈতন্য-পুরুষ যত জাগ্রত, তাঁর কাছে সৃষ্ট চৈতন্য মানুষ মাথা হেঁট করবেই। ভাট এট আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ কবাই হল বড় হও-য়ার প্রধান উদ্যোগ। আত্মার মহিমাজ্ঞান সেদিন স্পষ্ট হবে, আত্মসম্মানের গোরণ যেদিন আপনি আসবে। তার আগে কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির গোলামী করা।

✽

বিনয় হচ্ছে অপর সকল মনের চাবি। এ চাবি থাকলে সকলের ঘরে প্রবেশ করা সহজ হয়। বিনয়ের উৎপত্তি নিরাভিমান থেকে। অভিমানট মানুষকে ছোট করে। একমাত্র বিনয় দিয়ে মহাশক্তিমানের সকল শক্তি আত্মগত করা যায়। মানুষ ভাবে যে মাথা নোয়ালেই বুঝি সে খাটো হবে, কিন্তু দেখেও দেখে না যে ধনুকের দণ্ডটার প্রান্ত ছটা সন্ধ্যাতেই তার জোর বাড়ে।

✽

দলের যিনি নেতা, অপরের কাছে তাঁর আনন্দবনধিগ্রহ সৃষ্টি হতে হবে। অতি ব্যাথাভরও তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রাণ ছুড়িয়ে আনন্দ পেয়ে যাবে। তিনি যেমন দুর্বলের আশ্রয়, অত্যাচারীর দণ্ডদাতা, ভেদনি

আনন্দের প্রতিমূর্তি। তাঁর কাছে অপরাধ করে লোকোবার ইচ্ছা হবে কেন? বরং তাঁর হস্তে নিজকে সমর্পণ করে অপরাধ স্বীকারের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠবে। প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে অপরাধের তিন এমন নিশ্চিত নির্ভয় করবেন।

#

এক দিকে আমরা নিতান্ত ছোট, আর এক দিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে সবাইকে বাদ দিয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই—সে দিকটাতেই আমি বিন্দু মাত্র, সেখানে আমি সঙ্কুচিত, আমার মত ছোট আর তখন কেউ নাই। আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে ধরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, সেট ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বড় আর কে?

#

নিজকে যতই দীন বলে জানতে পারব, তাঁর প্রেমকে ততই বড় করে বুঝব। জান গেলে মানুষ নিজকে জ্ঞানী বলে গর্ব্ব করে থাকে, কিন্তু প্রেম পেলে নিজকে অতি তুচ্ছ, অধম বলে গ্রেনেও আনন্দ হয়। তাঁর কাছে ভিখারী সাজতে হবে, চিরদিনের জন্য ভিখারী। একটুখানি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা পেয়েই যদি নিজকে ধন্য মানি এবং অহংকারে ফেঁপে উঠি, তবে ত নিজের পেয়েই অল্প ভিক্ষা নিয়ে ক্ষমায় হতে হবে। তাঁর কাছে যে অনন্ত ভাণ্ডার। অভাব পূরণ না হতেই, ফিরে আসলে নিজের ভাণ্ডারটি অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই স্বাধীন মনিলে ডুবে যেন আকুল বিকুল করে প্রাণ বিসর্জন না দিই। পাত্র যতই

গভীররূপে শূন্য হবে, সুধারসে ততই তা ভরে উঠবে। চাই শুধু দীনতা, আর হীনতা।

#

যে চিন্তা এসে ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়, তারই নাম কুচিন্তা। যে কর্ম্মে মানব নিজকে হারিয়ে বসে, হৃদয় দেবতার কথা স্মৃতি পথে ক্ষণেকের তরেও উদিত হয় না, তারই নাম কুকর্ম্ম। ঠিক ঠিক কর্ম্ম করা হবে কখন? যখন অনর্গল অবিশ্রান্ত কার্য্যশ্রোত পড়েও নিজকে স্বতন্ত্র রেখে প্রবর্ত্তনিতাপ দিকে অচল লক্ষ্য থাকবে। নিরাসক্ত না হলে ঠিক ঠিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না। কাজ কর্ম্মে জড়িয়ে পড়া কাজের উদ্দেশ্যে নয়, কাজের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করা। তাই মানব এক দিকে কর্ম্ম কচ্ছে, আর এক দিকে মুক্ত হচ্ছে। মানবের কর্ম্ম এবং লক্ষ্য দুইট আছে অল্প প্রাণীর তা নাই। গাছ ফল দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে, কিন্তু জানে না কেন দিচ্ছে। কেবল কর্ম্ম তাতে বর্ত্তমান—লক্ষ্য নয়। মানুষ জানে কর্ম্মে ফল আছে, মুক্তি অবশ্যজ্ঞানী, তাই আরাম নাই, বিরাম নাই—প্রাণ হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল কর্ম্মেরই সাধনা।

#

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়জালে আবদ্ধ করে রাখে, কিন্তু চিত্ত যদি একটিবার কোনমতে বিষয়ের ভিতর থেকে বিষয়হীন ভগবানের পরশ পায়, তবে গুটিপোকা যেমন গুটি কেটে বের হয়, তেমনি আসক্তিও আপনাকে কেটে যায়।

#

“চক্রেৎ পরিবর্তন্তে স্থানি চ স্থানিচ।”  
সুখ-দুঃখের চাকা কেবলই ঘুরছে, এর মাঝে  
এক জন ঞ্জ হয়ে বসে আছেন। তাঁকেই  
শল্ব ভগবান। লক্ষ্য স্থির করতে হবে সেই  
ঞ্জের দিকে মন দিয়ে—চলার দিকে নয়,  
তাঁর মন কেবল চলতেই থাকবে। চক্রে  
অহরহঃ ঘূর্ণিপাকের মাঝে লক্ষ্য দেখা বড়  
শক্ত, কিন্তু সম্ভব যদি চাই, প্রথমে স্থির  
করতে হবে লক্ষ্যটিকেই।

✱

জগতে ধ্বংস নাই কারো, সবই লীন হয়ে  
অদৃশ্য হয়ে যায় মাত্র। ছোট আর বড় দুটো  
জিনিষের যখন মিশ হয়, তখন ছোটটি বড়টির  
মাঝে ডুবে যায়, তাতে ধ্বংস কিংবা বিলোপ  
সাধন হয় না। একেই যেখানে আদিপত্য,  
অপরেণ পরাজয় সেখানে অবশ্যস্তাবী। এক  
বিন্দু জল যখন সাগরে মিশে, তখন তাকে  
আলাদা করে জল বলা হয় না, সাগরের জলই  
বলা হয়। আমি যখন বড় “আমির” সঙ্গে  
মিশে যাই, তখন “আমি” যে হারিয়ে যাই  
তা নয়, তারই আমি হয়ে থাকি। আমার  
স্বর্গীয় আমি নিমেষে অপসারিত হয়ে যায়,  
তখনই আমি মুক্ত।

✱

“ত্যাগেন ভুক্তীণাঃ”—ত্যাগের দ্বারা ভোগ  
করণ—আসক্তি দ্বারা নয়। ত্যাগ মানে,  
কামকে ত্যাগ প্রেমের জন্ত, দুঃখকে ত্যাগ  
সুখের জন্ত, এমনি ছোটকে ত্যাগ বৃহৎ এর  
জন্ত। নিজকে রিক্ত করার জন্ত ত্যাগ নয়,  
পূর্ণ করার জন্তই। কাম কেবল খণ্ডের,

প্রতি আসক্ত, স্বর্গীয় জাগরণ আবদ্ধ; আর  
প্রেমের বানধন জগৎজোড়া। তাই প্রেমিক  
পাপী পুণ্যবানকে এক দৃষ্টিতে দেখছেন। পূর্ণ  
হওয়া মানে, সামঞ্জস্য রেখে চলা।

✱

বোধই হচ্ছে তপস্তার মূল, আর তার বাধা  
হচ্ছে রিপু। প্রবৃত্তি যখন অসংযত হয়ে উঠে,  
তখন চিন্তেও সাম্য থাকে না—বোধ হয়ে  
যায় বিকৃত। এজন্যই ব্রহ্মচর্যের সংযম দ্বারা  
বোধ শক্তিকে বাধা মুক্ত করা। সাময়িক  
উত্তেজনা এসে লোকের চিত্তকে, বুদ্ধিকে  
সামঞ্জস্য দ্রষ্ট করে দেয়, তা হতে বাঁচিয়ে  
বুদ্ধিকে সোজা পথে চলতে দিতে  
হবে। সত্যের প্রতি আস্তরিক টান, প্রবৃত্তি  
দমন করার প্রবল ইচ্ছা, এ দুটো যেখানে  
বর্তমান, সিদ্ধি সেখানে অনায়াসসাধ্য।

✱

যেখানে অনেক মানবের সম্মিলন, সেখানে  
বিচিত্রবুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত আপনি জেগে  
ওঠে। ষাট প্রতিঘাতে মানুষের অন্তরের  
নিগূঢ়তম শক্তির বিকাশ হয়—চিত্ত নির্মল  
হয়ে যায়। শক্তি জেগে উঠলে ক্ষেত্রও  
তার জন্ত, তৈরী হয়ে আসে।

✱

জীবন চলছেই দোটানায়, এন্ডিকে আক  
ষণ অত্ন দিকে বিকর্ষণ। তেমনি সুখ দুঃখ  
সম্পদ-বিপদ। একটিকে ছেড়ে যেন অন্যটি  
বাঁচে না। সুখ দুঃখ জালা যন্ত্রণা মহাপুরুষেরও  
আছে, তবে তাদের এতাপে তাঁরা উদ্বাহ

হয়ে পড়েন না। শত্রু এসে যদি প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে ত তাহেই পরাজয়। যাকে আমরা অমঙ্গল বলে থাকি, সে এক হিসাবে আমাদের মঙ্গলের জন্তই। কেননা ওতে আমাদের সাহসের বৃদ্ধি হয়, সতর্কতার শিক্ষা হয়। ঔষধ খেতে ভয়ত নিত্যন্ত কষ্টকৃত কিন্তু ওতেই রোগ-আরাম হয়। আগুনে পুড়েই জ্ঞান হতে অব্যাহতি পাই, জলে ডুবেই ডুব শিখি। দুঃখ আসে জাগাতে, অভিজ্ঞত করতে নয়। তাই প্রেমিকের নিকট দুঃখের দাক্ষিণ্য আশাও প্রিয়তমের সোহাগের মত মধুর। বিরহ এলেই ভগবানের কথা জব্বর তন্ত্রে বেজে উঠে।

✽

বিধি-নিষেধের ভয় থাকলে, জ্ঞান, ভক্তি ক'র কিছুই ঠিক ঠিক ভাবে ফুটে উঠে না। বিধি নাই নিষেধ নাই প্রাণে যে প্রেরণা আসছে তদনুযায়ী ক'র করে যাব, সহজ স্রোতে জীবনতরী চালাব, এ হল প্রাণখোলা মানুষের কথা। ভয় থাকলে সঙ্কোচ আপন আসবে।

সঙ্কোচ থাকলেই ঠিক ঠিক ভালবাসা, অনুভব সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই মহাপুরুষেরা বলেছেন, “সুখা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। প্রকৃত প্রেম প্রীতি হলে, বিধি-নিষেধের সাধ্য কি’ যে কাউকে বেঁধে রাখতে পারে। ধনলাম হাতে পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে, শরীরের উপর নানা নির্যাতন করা হল, এতে তার হবে কি, মনকে ত আর বাঁধা যায় না। প্রেমের যোগ যে মনে মনে, তাই প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে পড়েও নিশ্চিন্ত। আইন বিধি কার জন্ত? যারা সহজ পথে চলতে চায় না। আপনি ধরা দিলে তার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হবে কেন? বিধি নিষেধ হচ্ছে জগৎকর্তার ওয়ারেন্ট। ধরা দেই না বলেই প্যাঁদা পুলিশকে পাঠিয়ে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়। ছলে বলে কৌশলে, ভগবান যাকে যেভাবে পারেন, সেট ভাবে টেনে আনেন। তবে অমূল্য স্রোতে চলে, তরী সহজে উজিয়ে যায়, আর প্রতিকূলে গেলে বেগ পেতে হয়। বেগ পেয়েই আবার অমূল্যে ফিরতে হয়।



## নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে সশিষ্যে তাঁহার পদার্পণ উপলক্ষ্যে আগামী ১লা কার্তিক হইতে ৩রা কার্তিক পর্য্যন্ত একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং যে সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাঁহাদের নাম ও আনুষঙ্গিক ব্যায়াদি নির্বাহ জ্ঞাত জন প্রতি ৫ পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে; এরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কুতুবপুর পল্লীগ্রাম, উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তগণের বাসস্থানের বন্দোবস্ত ও আহাণ্য সংগ্রহ পূর্ব হইতেই করিতে হইবে। ৬ মাইলের ভিতরে উপযুক্ত কোন হাট বাজার নাই। বিশেষতঃ অগাধ আশ্রমে ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষ্যে সমাগত ভক্তদের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবার ভার যেরূপ আশ্রম সংশ্লিষ্ট সদস্য ও ব্রহ্মচারিবর্গ লইয়া থাকেন, কুতুবপুরে সেরূপ ভার গ্রহণ করিবার কোন লোক নাই। এই সমস্ত কারণে পুনঃ ভক্তগণের নিকট নিবেদন যে যাহারা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাহার অনুগ্রহপূর্বক জন প্রতি ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন; এই টাকা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার পর দিলে চালবে না। যাহারা পূর্বের টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের বাসস্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবার কোন প্রকার দায়িত্ব আমাদের থাকিবে না। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে পাকা মন্দির প্রস্তুত হইতেছে; কয়েকখানা ঘরও প্রস্তুত হইয়াছে; এই আশ্রমটি অল্প কোনও আশ্রম অন্তর্গত নহে, ইহা সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীর পীঠস্থানস্বরূপ। আশ্রমটি স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। তাই সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আমাদের প্রার্থনা বৈষ্ণবদিগের নিম্নাংকল্পে প্রত্যেকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্যদানে আমাদের উৎসাহিত করিবেন।

যাহারা উৎসবে উপস্থিত হইবেন, তাঁহার সঙ্গে বিছানা বিশেষতঃ মশারি আনিবেন। সম্ভবপর হইলে নিজ ব্যবহারের জ্ঞাত কেহ কেহ লঠন ও ঘটা আনিলে ভাল হয়।

## কুতুবপুর আশ্রমে যাওয়ার পথের বিন্যাস—

গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল পথ মেহেরপুর যাইবে। মোটর ভাড়া জন প্রতি ১ এক টাকা, ১ ঘণ্টা সময়ে যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে, নৌকাতে ২ ঘণ্টা, কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌঁছা যায়; মোটর ভাড়া জন প্রতি ১০ আট আনা।

প্রধান প্রধান ট্রেনগুলি চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছবার সময় নিম্নে লিখা হইল।

শিলিগুড়ী প্যাসেঞ্জার ও আসাম মেল	...	...	প্রাতে ৯—৫৮ মিনিট
চট্টগ্রাম মেল	...	...	বৈকালে ৪—৪১ মিনিট
ঢাকা মেল	...	...	রাত্রি ১—৪৯ মিনিট
দার্জিলিং মেল	...	...	রাত্রি ২—৪৩ মিনিট
সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	...	...	রাত্রি ৩—৫ মিনিট
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	...	...	ভোর ৫—৫০ মিনিট

( কার্তিক মাসে সময়ের সামান্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব )

দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণগণ কলিকাতা হালিসহর নৈহাটি ও রাণাঘাট প্রভৃতি স্টেশন হইতে অনেক ট্রেনেই চুয়াডাঙ্গা পৌঁছিতে পারিবেন। প্রধান প্রধান ট্রেনের সঙ্গে মোটর সার্ভিসের যোগ আছে।

চিঠিপত্র লিখিবার ও টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীঅগ্নিনীকুমার দাসগুপ্ত এম্. এ, বি এল, সবজজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

( অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি )

# সংবাদ ও মন্তব্য

—\*#()\*#\*—

## আশ্রম-সংবাদ

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্তমানে পুরীতেই আছেন।  
তদীয় জন্মভূমিতে উৎসব ও আশ্রমস্থাপন-অন্তে মধ্য-  
বঙ্গালী সারস্বত আশ্রম (জয়দেবপুর, ঢাকা) ও  
পূর্ববঙ্গালী সারস্বত আশ্রম (ময়নামতী, কুমিল্লা)  
পরিদর্শন করিতে যাইবেন, এরূপ কথা আছে।

## গ্রন্থপরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—অতি ক্ষুদ্র পকেট সংস্করণ।  
—শ্রীযুক্ত হৃদীকেশ ঘোষ দ্বারা কলিকাতা ৭নং পৌর-  
মোহন মুখার্জীর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য—  
১০। অতি পরিষ্কার বাঙ্গালী অক্ষরে গীতার মূল  
মাত্র ছাপা হইয়াছে। নিতা গীতাপাঠীর সঙ্গী হইবার  
সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

“চট্টগ্রাম জেলার উত্তর ব্রাহ্মণডেঙ্গা নিবাসী  
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী নামে একটা যুবক কিছুদিন  
যাবৎ আসাম সারস্বত মঠ সেবকভাবে অবস্থিতি  
করিতেছিল। ইদানীং অত্র আশ্রমে প্রেরিত হইয়াছিল।  
মাঘমাসে আসি তাহাকে আশ্রমের ভার দিয়া চট-  
টারং পশ্চিমোত্তর ভারতে গমন করি। সন্ততি আশ্রমে  
আসিয়া যোগেনের বিরুদ্ধে গ্রামবাসী গুরুত্বাধিপতির  
নিকট নানা কথা শুনিয়া এবং অর্থাধি সম্বন্ধে বিশ্বাস-  
ঘাতকতার প্রমাণ পাইয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদায়  
করিয়া দিয়াছি। আমাদের মঠ ও আশ্রমগুলির  
সঙ্গে তাহার আর কোনও সম্বন্ধ রহিল না। তাহার  
কৃতকার্যের জন্য অতঃপর আর আমরা দায়ী নহি।

• (সাক্ষর) শ্রীমতী শুদ্ধাঙ্গিনী  
অধ্যক্ষ, দক্ষিণবঙ্গালী সারস্বত আশ্রম (হালিসহর)



## দানপ্রাপ্তি-স্বীকার

—:|\*#|:—

শ্রীশ্রীকুরের জন্মস্থানে আশ্রম-স্থাপন

উপলক্ষ্যে—

(পূর্ণানুষ্ঠান)

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র রায় ধিতপুর (২য় দফা) ৫০০  
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র পাল চৌধুরী মুন্সীগঞ্জ ৫০০  
শ্রীক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী হাওড়া ৫০০  
শ্রীউমেশচন্দ্র গোস্বামী তাড়াস ৩০০  
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আকিয়াব ২৫০

শ্রীপ্রগল্বকুমার দাস চট্টগ্রাম ২৫০  
শ্রীশ্রীমতী দাস মৌলবীবাগার ২৫০  
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী  
কুলদাসন্দরী ঘোষ তুরা ২০০  
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য চট্টগ্রাম ২০০  
শ্রীশিবদয়াল পাল আলীপুরজঙ্গল ১০০  
শ্রীহরিশচন্দ্র দাস ময়মনসিংহ ১০০  
শ্রীপ্রজ্ঞাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোরাডী চতুর্থদফা ১০০



শ্রীচন্দ্র চন্দ্র শীল	চট্টগ্রাম	১০	শ্রীমতী শঙ্করী দেবী	ফরিদপুর	২
শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা		১০	শ্রীধীরকানাথ সিংহ	কুচবিহার	১
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমস্তীপুর		১০	শ্রীমতী বিরজামন্দরী গুহ	বগুড়া	১
শ্রীচরণদাস রায় বগুড়া (১ম দফা)		১০	শ্রীমতিলাল বিশ্বাস	ফরিদপুর	১
শ্রীগগনচন্দ্র দাস	শিলং	১০	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল	ফরিদপুর	১
শ্রীমৃতাঙ্গর আনা	মেদিনীপুর	৫	শ্রীনাগরচন্দ্র পোদ্দার	ঐ	১
শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার	আলীপুর	৫	শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়	চক্রধরপুর	১
শ্রীবসন্তকুমারী বায়	জগৎদী	৫	জনৈক সেবিকা		১০
শ্রীনীলাল চট্টোপাধ্যায়	হুগলী	৫	মধ্য-বাস্তাবা সারস্বত-আশ্রমে—		
শ্রীকরণসিদ্ধ প্রামাণিক সাঁওতালপরগণা		৫	শ্রীকল্লিণী সিং		৫
শ্রীঈশানচন্দ্র দেব	জগৎদী	৫	কে, এল বক্রা		৫
শ্রীনিঃসঙ্গদ পাল	গোয়াড়ী	৫	এস. এন্ দাগুপ্ত		২
শ্রীহরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত	বগুড়া	৫	শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর উগেন্দ্রলাল কাজিলাল		২
শ্রীশরচন্দ্র নিয়োগী	ঐ	৫	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য		১
শ্রীতারানাথ দাস মণ্ডল ধুবড়ী (২য় দফা)		৫	শান্তিনিকেতন মেছ		১
শ্রীমুনাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	হুগলী	৫	শ্রীগলতলাল মিত্র		১
শ্রীমতিলাল চক্রবর্তী	কলিকাতা	৫	শ্রীতথোনাথ সোম		১
শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	পাবনা	৫	শ্রীমনোরঞ্জন গোস্বামী		১
শ্রীমতীশচন্দ্র চট্টাচার্য	কলিকাতা	৪	শ্রীহুনাথ বটব্যাল ও দক্ষিণাচরণ তফাদার		১
শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী	চট্টগ্রাম	৩	চাকা মেস		১০
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৪ পরগণা	২	লাবান ডাক্তার		১০
শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়	ফরিদপুর	২	শ্রীনিম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	লাবান	১০
শ্রীবগারীমোহন শর্মা	জগৎদী	২	শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত		১০
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কর্মকার	পুটীয়া	২	শ্রীশশধর মজুমদার		১০
শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ সেনশর্মা	চট্টগ্রাম	২	শ্রীরোহিণীকান্ত ভট্টাচার্য		১০
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পুতুঙ	বগুড়া	২	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী		১০
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ দাস	ঐ	২	জনৈক আশ্রম হিঠেবী		১০
শ্রীহরিনাথ কর	ঐ	২	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		১০
শ্রীমৃধীরচন্দ্র রায়	ঐ	২	শ্রীনিভাইচাঁদ দাস		১০
শ্রীশশীকুমার দাসগুপ্ত	ঐ	২	শ্রীহরিদাস দত্ত		১০
শ্রীললিতচন্দ্র গুহ	ঐ	২	শ্রীযামিনীরঞ্জন চক্রবর্তী		১০
শ্রীমতী শরৎশর্মা গুপ্তা	ঐ	২	শ্রীমৃণালবন্ধু রায়	বাহ্যানিবাস	১০



৩ তৎ সৎ



# সাহিত্য-দর্পণ

১৯শ বর্ষ } কাবিক { দ্বিতীয় খণ্ড  
সমষ্টি সং ১৯৮ } { প্রথম সংখ্যা

ইন্দ্রায়

—\*—

[ স্বাধেদ-সংহিতা—৩।৩।১ ]

—\*()#\*—

[ পিঞ্চামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্ট প্ ছন্দঃ ]

—\*—

ইন্দ্রং দুহ স্বামিকোশা অভুবন্  
ষড্ভাষা শিক্ষ গৃণতে সখিভ্যঃ ।  
দুর্মায়বো দূরেবা মর্ত্যাসো  
নিষজিনো, রিপটংবা হস্তাংসঃ ॥

দূত হও হে বাসব, আছে অরি আগুলিয়া পথ;  
বন্ধু যারা, স্তুতি গায়, তাহাদের 'পূর মনোরথ';  
হিংস্র অতি দুর্ভগতি রিপু যত—নিকট মরণ  
তুমি মৃত্যু সে সবার—তবু তুণ করেছে ধারণ।

স যোষঃ শৃঙ্গেবমৈরমিত্রৈর্  
 জহী ন্যেঘশনিং তপিষ্ঠাম ।  
 স্বশ্চେমথস্তাধ্বিরুজা সহস্র  
 জহি রক্ষো মঘবন্ রত্নস্রস্র ॥

ঐ এল রিপু যত, শুনি তাই ভীম গরজন,  
 বহিষ্ঠালা বজ্র তব, হে বাসব, কর প্রহরণ ;—  
 মরমে পীড়িয়া মার, খণ্ড কর, চূর্ণ কর কায়,  
 ধ্বংস কর রক্ষকুলে—যজ্ঞে যেন বাধা না ঘটায় !

উদ্ধৃহ রক্ষঃ সহস্রুলমিত্র  
 স্বশ্চা মধাং প্রত্যগ্রং শূনীহি ।  
 আ কীবতঃ সললুকং চকর্থ  
 ব্রহ্মাধ্বিষে তপুর্নিং হেতিমস্যা ॥

আসে ইন্দ্র রক্ষঃ যত, মূল সহ ফেল উপাড়িয়া,  
 ছিন্ন কর মধ্যভাগ—অগ্রভাগও দাও না ছিঁড়িয়া !  
 আসে যত ব্রহ্মধেয়ী, দূর হতে নাও খেদাড়িয়া,  
 মর্ষদাহী প্রহরণ শত্রু পরে দাও না ছুঁড়িয়া !

অস্তুয়ে বাজিভিশ্চ প্রণেতঃ সঃ  
 যন্মহীনিষ আসৎসি পুর্বাঃ ।  
 স্বায়ো বস্তুরো স্বহতঃ স্যামা-  
 শ্চৈতঃ ভগ ইন্দ্র প্রজাপন্ ॥

সবার নায়ক তুমি, হে বাসব, আসিয়াছ কাছে,  
 স্বস্তি হোক, অশ্ব সহ অন্নভার আসিতেছে পাছে !  
 তোমারি করুণাবলে বিত্তরাশি করি যেন ভোগ,  
 পুত্র পাই ননোমত—আজি ইন্দ্র হোক শুভযোগ ।

আ নো ভর ভগামন্দ্র দুঃখস্ত  
 নি তে দেশস্য ধীমহি প্রনেকৈ ।  
 উর্ব ইব পপ্রথ্যে কামো অস্মৈ  
 তন্মা পূন বসুপতে বসুনাং ॥

দাতা তুমি হে বাসব, দীপ্ত কর ভাগ্য সবাকার,  
 নিত্য করে তব দান, আমাদেরো কর না আঁধার ।  
 বাড়ব অনল সব কামনা যে দিনে দিনে বাড়ি—  
 তুমি তো গো সম্পদের অধিপতি,—পূর্ণ কর তারে ।

ইমং কামং মঘবা গোভিনশ্চৈ-  
 শ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ ।  
 স্মর্যবো মতিভিস্তভ্যং বিপ্রা  
 ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্ ॥

গোধনে তুরঙ্গে আর ধনধাত্তে পূর মনস্কাম,  
 দীপ্ত হোক গৃহখানি, বিশ্বমাঝে রটে যাক্ নাম—  
 কুশিকের কুলে যত আছে বিপ্র স্বর্গ-অভিলাষী,  
 কুশাগ্রমতিতে তারা তব তরে রচে স্তবরাশি ।

আ নো গোত্রা দদুর্হি গোপতে গাঃ  
 সমস্মভ্যং সনহো যন্ত বাজাঃ ।  
 দিবক্ষা অসি ব্রহ্মভ সত্যশুভ্রো-  
 ২স্মভ্যং স মঘবন বোধি গোদাঃ ॥

গোপতি বাসব তুমি, গোত্র ভেদি বহাও গো-ধাব,  
 আশুক মোদের তরে যাহু অতি অন্ন ভারে ভার ।  
 তুমি বাজাকল্পওরু, সত্যবীৰ্য্য, ছেয়েছ' দু্যলোক,  
 জাগো দেব মঘবন, আশিপাতে বিতর আলোক ।

## ❀ প্রকৃতি-পূজা ❀

—: { # } :—

নিত্য সা জগন্মূর্তিঃ 'মায়ের মূর্তি এই নিত্য জগন্মূর্তি। এই জগৎকে স্থল অচেতন ভাবিশাই তো আমবা হুঃ পাই, বিরহের সম্বাপে পুড়িয়া মরি। এই সাক্ষাৎদৃষ্ট রূপ তাহারই রূপ, এই অমৃতভূতিতে বাহার অস্তর উজ্জ্বল হইয়া আছে, মায়ের দেখা পাইতে তাহাকে আতি-পাতি করিয়া খুঁজিতে হয় না। বিশ্ব প্রকৃতিই তাহার কাছে মায়ের প্রাণীক, নিরস্তর প্রবহমান কালই তাহার পূজার প্রকৃষ্ট সময়। পশুতন্ত্রেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘলিয়াছিলেন, প্রাচীনকালে আর্থোরা প্রকৃতির পূজা করিত; আমরা তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্য—তাই লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিয়া-ছিলাম, "ও মা, তাই তো, কি বেয়া!" কিন্তু এখন মনে হয়, প্রকৃতির পূজা করিব না তো কার পূজা করিব? নিজের অঙ্কারের? প্রকৃতির বিচিত্র আবর্তনের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, তাহার পূজা আমরা করিব আর কি—তিনিই যে পূজিতার বেশে নিত্য চোখের সম্মুখে জুটিয়া উঠিয়া প্রাণে অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছেন! প্রকৃতির শিশু এই মানব—নিশেষ বিশেষ ঋতুতে প্রকৃতির প্রেরণায় প্রাণে উন্মাদনা অনুভব করে, তাহারই স্বাভাবিক রূপ দেয় সে পূজার আয়োজনে। এ পূর্ণাত্ম তাহার মনঃকল্পিত পূজা নয়—এ যে মা-ই করুণা করিয়া তাহার নিকট হইতে পূজা আদায় করিয়া লইতেছেন—সন্তানের কলাপের নিমিত্ত। নতুবা আমরা কি তাহাকে চিনি, না জানি, যে পূজা করিব!

অবোধ সন্তানকে পূজা করিতে না শিখাইলে সে কি করিয়া বুঝিবে, কখন কি করিলে তাহার কল্যাণ হইবে?

শরতের পরিপূর্ণতার মাঝে শরৎবাণীর অর্চনা হইয়া গিয়াছে। কে এই পূজার প্রেরণা প্রথম অনুভব করিয়াছিল, তাহা লইয়া ইতিহাস বাগ্মিতত্ত্ব করিতে থাকুক। আমরা দেখি, এম পূজায় বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতির কি অপরূপ সামঞ্জস্য—বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে। বর্ষাব অবসানে ছদ্ম্বিনের ঘনঘটা ঘুটিয়া গিয়া শরতের নির্মল আলোক যখন দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া শ্রামায়মান শতক্ষেত্রে লুটাইয়া পড়ে, তখন বাস্তবিকই যে কবির ভাষায়—"মা বলিতে প্রাণ করে অনিচান, চোখে আসে জল ভরে।" পুরাণকার বলেন, এই সময় দেবীর অকালবোধন, নইলে প্রকৃতির জাগরণ বসন্তের স্পর্শে। হাঁ, কথাটা ঠিক। কিন্তু জীবনে অকালবোধনের কি প্রয়োজন নাট? বর্ষাবোধে এই বাংলাদেশে বর্ষগুরু প্রকৃতির সহসা পরিপূর্ণ নির্মল মাতৃমূর্তিতে প্রকাশ—এই সহসা জাগরণের একটা অপূর্ণ মহিমা প্রাণে অপরূপ পুলকের সঞ্চারণ করে না কি! আরও একটু রহস্ত এই, এই পুলকচঞ্চলতা শুধু বাংলার নয়—আর্যাবর্ত জুড়িয়া। অকালবোধনের উদ্গাপক ছিলেন শ্রীধামজন্ম; উৎসবের দিনে আমরা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু উত্তরাণ্ড ভুলিতে পারে নাই। তাই এই অকালবোধনের উপলক্ষে তাহার শোধ্যাবতার শ্রীষষ্ঠজন্ম

বিজয়োৎসবে মাতিয়া উঠে। পূর্বকালে রাজা  
রাও নাকি এই শরৎকালে দীর্ঘকমে বাহির  
হইতেন—সুপ্ত ক্ষান্তশক্তি শরতের স্পর্শ সহসা  
জাগিয়া উঠিত। উত্তরাংশেও রক্ষ প্রকৃতি—  
সেখানে পৌরুষের জাগরণ স্বাভাবিক, শক্তি  
নদে মত্ত হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া দশপ্রহরণ  
ধারিণীর অকালবোধনও কিছু আশ্চর্য্য নয়।  
কিন্তু এই সুজলা-সুফলা শস্ত্রশ্রামণী বাংলা  
দেশে মাকে ভিন্ন রূপে দেখা দিতে হইয়াছে।  
আমাদের বোধন—শৌর্য্যবীর্যের নয়, স্নেহ-  
মমতায়। শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া আমরা  
মায়ের হাতে দশপ্রহরণ দিত বটে, কিন্তু সভ্য  
বলিতে কি, বাঙ্গালী জানে, ওগুলা একটা  
উপলক্ষ্য মাত্র। আগমনীর সান্নিধ্যই যে স্মরণ  
নাগিয়া উঠে, মহাশয়রমঙ্গিনীর আগমনসূচক  
ভোগীনিবাদের সহিত তাহার মোটেই মিল  
নাই—সে স্মরণে মনকামায়েণ সেট প্রবাসী  
মেয়েটার গুণ কেবল আকুল হইয়া তাকাশ-  
বাতাস কাঁপাইয়া কাঁদিয়া ফিরে। বিজয়ার  
দিন শত্রুজয়ের প্রচণ্ড উল্লাসে বাঙ্গালী মাংস  
উঠিবার কল্পনা করে না—ভোর না হইতেই  
অঙ্গনতলে বিরহী শব্দের শিঙাধ্বনি শুনিয়া  
বিদায়পথায় তাহার বৃক্ক ভিতরটা দ্রুত দ্রুত  
করিয়া উঠে! থাক না মায়ের হাতে দশ  
প্রহরণ, আমরা কিন্তু পূজা করি—একটা  
মিলনাকুলা বিরহবিধুরা সম্বৎসর ধরিয়া প্রবাসী  
আদরিণী মেয়ের।

এইখানে ব্রহ্মিতে পারি, প্রকৃতিপূজার কি  
পরম সার্থকতা। ছে ভাবুক, একবার শরতের  
বাংলায় শ্রামলভূমিতে ফেনায়মান কাশকুসুমের  
উচ্ছ্বাসের মাঝে দাঁড়াইবা ভাবিয়া দেখ দেখি,  
কাঁধকে তোমার মনে পড়ে? দিগ্বিকরের

অভিযানে এই শ্রামসম্ভার পদদলিত কবিয়া  
ঘাইতে কাহারও ইচ্ছা হয়—না প্রবাসী তন-  
য়াকে ছুদিনের গুণ ঘরে আনিয়া বৃক্ক চাপিয়া  
চোখের জলে স্নান করাইতে ইচ্ছা হয়।  
বাস্তবিক শরতের বাংলা মেয়েরই রূপ বটে।

প্রকৃতিপূজার আর এক পর্ব তাহার  
পরের পূর্ণিমাতে। সে ভিগিতে লক্ষ্মীর আগ  
মন। ভাবিয়া দেখ দেখি, ঠিক উপযুক্ত  
সময়টাতে শ্রীর আবাহন হয় না কি? মায়ের  
পূজা আধ জ্যোৎস্নায় সম্মীতে, আগ লক্ষ্মীর  
পূজা পূর্ণিমাতে—ভয়ের তাৎপর্য্য আছে।  
সম্মীর জ্যোৎস্না কিশোরী জ্যোৎস্না—মায়ের  
নব যৌবনের রূপ। যাঁহারা বৈষ্ণব রসসাহি-  
তোর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন,  
কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকে কেন অপ্রাকৃতমাধু-  
র্য্যে লীলাভূমি বলা হয়, কেন রসিকেরা  
বলেন, “বয়ঃ কৈশোরকং ধোয়ম্।” অপ্রাকৃত  
পেমণীলাব অসমোদ্ধি মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিবার  
এই উপযুক্ত কাল। স্থানাভাববশতঃ ইহার  
বিস্তার এখানে করিলাম না, মরমী পাঠক  
অমুভরে তাহা বুঝিয়া লইবেন। শুক্লপক্ষে  
জ্যোত্সাবিতানের বয়ঃসন্ধিতে নিত্য রসময়ী  
মুর্তিতে মায়ের আবাহন, চৈত্রমী মহাশক্তির  
আরাধনা—কোন্ কবি, কোন্ ভাবুক ইহা  
অপেক্ষা উপযুক্ত কাল করনা করিতে পারিত?  
আর শ্রী আবাহন, লক্ষ্মী সম্পদের অর্জনা—  
পূর্ণিমার পরিপূর্ণ রক্তাক্সাসে, ইহাও ঠিক  
হয় না কি? নিত্যপাগলীশক্তি সম্বন্ধিগ  
উপাসনা, “করিয়াছ সপ্তমীতে, ইহার পর  
শ্রীলাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাবধান, পূর্ণিমার  
জ্যোৎস্নাপ্লাবনে ভাসিয়া যাইও না, আরাম  
শয়নে চলিয়া পড়িও না—মনে রাখিও আজ

পূর্ণিমা, কিন্তু কাল হইতে কৃষ্ণপক্ষের শুরু। এ সপ্তমীর চাঁদ নয় যে কলায় কলায় বাড়িয়া উঠিলে, এ পূর্ণিমা চাঁদ, ক্ষয়ের নিশানা তাহার বুকে অতি সুস্পষ্ট। 'অনোদ, কোজাগরী পূর্ণিমাতে আগিয়া থাকিতে হয়, সে কি শুধু ধন রত্নের লোভে? কিছু হারাটবার ভয়েও কি আগিয়া থাকিতে নাই? অকালবোধনে মাকে জাগাইয়াছ, তাঁহার আবাহন বুঝা হইবার নয়—পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য তোমার মিলিবেই। কিন্তু এই পার্থিব সম্পদের মোহে ভুলিলে চলিলে না যে, ঠিক আজিকার কনক-কাস্তামোদের প্লাবনের পরেই কৃষ্ণপক্ষের মৃত্যুকরাল ক্রুটি উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছে! আজিকার রাত্রি সতর্ক থাকিতে হইবে, ঐশ্বর্যের মাঝে আগিয়া থাকিতে তইবে— নতুন তোমার কপালে শ্রীর চঞ্চল' নাম নিদারুণভাবে সার্থক হইয়া উঠিলে।

পার্থিব সম্পদভোগের চরমে যে উঠিয়াছে, ঐশ্বর্য তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। চন্দ্র পরিপূর্ণ হইয়াই ক্ষয়ের মাঝে চলিয়া পড়ে। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কামনার প্রতিকল্প—উচ্চ বেদের কথা। কামনা পূর্ণ হইয়াছে—এইবার ক্ষয়ের পাল। প্রাণের আকুলতার মাকে নামাইয়া আনিয়াছিলে, অকালবোধনে চকিতের মত একবার তাঁহার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য মূর্তি দেখাইয়া তিনি লুকাইয়া পড়িয়াছেন—এইবার কামনারক্ষয়ের দাধনা দ্বারা চিত্তকে রিক্ত করিয়া চিরন্তনরূপে বুকের মাঝে তাঁহাকে পাঠিতে হইবে যে! তাই যদি বলিতেছেন, পূর্ণিমার অমৃতচন্দ্র চন্দ্রিকা-সম্পাতের মাঝে যদিওই অমাবস্তার সর্বগ্রাসী আধারের কল্পনার নিজেকে ক্ষতান্ত কর— বুঝাইও না। কামনার পরিপূর্ণিতে যে আনন্দ,

সেও মায়েমই রূপ, কিন্তু সে রূপ অনিত্য। নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে কামনারক্ষকের মাঝে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে জ্যোৎস্নার জগৎ প্লাবিত দেখিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছ, কিন্তু একবার উজ্জ্বলচোখ চাহিয়া দেখ দেখি, তারকাগুলি সেখানে নান। এই জ্যোৎস্না কেবলমাত্র তোমার এই ক্ষুদ্র জগৎটিকে প্লাবিত করিয়াছে—কিন্তু নীলাকাশে অনন্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অমৃতভূতিকে স্নান করিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ তোমার কাছে প্রকাশিত, কিন্তু অনন্তের অমৃতভূতি যে অস্পষ্ট। 'ইহার পাশে অমাবস্তার নিরাট আধারের পরিকল্পনা কর—দেখিবে তোমার এই ক্ষুদ্র জগৎ আধারের পরিপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু মাথার উপর চাহিয়া দেখ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আভাস আকাশ ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুলনা কর, করিয়া বল, কোনটা চাও? সুখের প্রাণে তোমার সান্ত জগৎ ছাপাইয়া থাক, এই চাও, না এ জগতের সকল আলো নিভাইয়া দিয়া অনন্তের অপরিসীম রহস্যময় সত্তার মাঝে ছাপাইয়া পড়িতে চাও? মনে রাখিও পূর্ণিমার পিছনেই ক্ষম—কিন্তু এই অমাবস্তার আধারের পরেই এক এক কলা করিয়া জ্যোৎস্নার বিকাশ। তুমি কি চাও? আপাতস্বথকর কিন্তু পদাধীনে বিষময় কিছু, না আপাতহঃখময় কিন্তু পরিণামে অমৃতোপম কিছু?

শ্রামাপুঞ্জ প্রকৃতিপুঞ্জের আর এক মূর্তি প্রকটিত। বলিয়াছি, কামনার ক্ষয় চাই, এই জগৎ ভোলা চাই—তবে অনন্ত জগতের আভাষ মিলিবে। অনন্ত আধারে যে ভয় পায় না, চেতনাকে সেখানে অবিলম্ব রাখিতে

পারে, সেই প্রকৃতির রহস্যকে বুকের মাঝে  
বন্দী করিতে পংসে। শ্রামা ঘনকুসুম, বিগলিত-  
চিকুরা, দিগ্‌বগনা; কিন্তু আধাররূপী চৈত-  
্ত্বের দিকে চাহিয়া দেখ—কি শুভ, সংযত,  
তপস্কার মূর্তি! অমাবস্য়ার আঁধারে শুধু  
তো মিলাইয়া যাওয়া নয়—সাক্ষি-চৈতন্তের  
মহিমায় ফুটিয়া থাকা—এই তো সিদ্ধি। অমা-  
বস্য়ার আঁধার বটে, কিন্তু জ্ঞান সেখানে  
সমুজ্জ্বল। প্রলয়ঙ্করীর উপাসনা বটে, কিন্তু  
দ্রষ্টা যে মৃত্যুঞ্জয়।

ইহার পরেই জগদ্ধাত্রীপূজা—প্রকৃতিপূজার  
আর এক মূর্তি। আঁধার হইতে, আবাক্ত  
হইতে জগতের নিত্য নিকাল যদি দেখিতে  
চাও, তবে মায়ের জগদ্ধাত্রীমূর্তির দিকে  
চাহিয়া দেখ—নবমীর অনন্তিসুট আলোকে  
রজোমূর্তি মায়ের রাগরক্ত প্রতিমা।

হেমন্তকাল প্রকৃতির পরিপূর্ণতা। ইহার  
পর শীতে প্রকৃতি আত্মশক্তি সংহত করিয়া  
অবাক্ত হইয়া অবস্থান করিবে—আবার বস-  
ন্তের স্পর্শে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিবে।  
সেই নবজাগরণে প্রকৃতিপূজার আর এক পূর্ণ  
আরম্ভ হইবে। কিন্তু সে পূর্ণ সিদ্ধজীবনের

বিলাস। সমগ্র হইলে বারান্তরে তাহার কথা  
বলিব।

প্রকৃতির দুইটা কাল সমস্ত জগৎ জুড়িয়াই  
অতি শ্রদ্ধা ও অতি মনোরম। একটি শরৎ—  
আর একটি বসন্ত। এই দুইটাতোই চিন্তুর  
দুই প্রহ প্রকৃতিপূজার বাবস্থা রহিয়াছে।  
শরতের পূজার কথা এবার বলিলাম। টকা  
সাধকের পূজা—তাই অকালবোধনে ইহার  
সূত্র। আমাদের সাধনামাত্রই অকালবোধন  
নয় কি? হুর্গোৎসবে, শ্রামাপূজার, জগদ্ধাত্রী-  
পূজায় যথাক্রমে সত্ত্ব, তমঃ ও রজোগুণের  
পূজা সমাপ্ত হইল। গুণের পূজায় গুণ আরম্ভ  
হয়। ইহার পর বসন্তে প্রকৃতির নবজাগরণে  
গুণাভীতির আনন্দ-বিলাস। শরতে প্রকৃতি  
পরিপূর্ণা—অতএব মাতৃস্বরূপিনী, সাধক  
তাহার কুংকিত। বসন্তে প্রকৃতি নব-  
যৌবনা—সিদ্ধজীবনের পরমানন্দস্বরূপিনী।  
শরতের পূজা জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষার;  
বসন্তের পূজা জ্ঞানীর বিলাস।

বান্ধাপী মাতৃসাধক। তাই শরতের পূজায়  
তাহার, এত আকুলতা।





# বৈরাগ্যমেবাভয়ম্

—\*❧\*—

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ভয়ং। আমরা, ঋষির বংশধর, সেই স্রবাস্তে ক্ষীণ কণ্ঠ হলেও যথাসাধ্য চেষ্টায়ে ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করে এসেছি এতকাল। কিন্তু আজকাল বৈরাগ্যসাধনার বিরুদ্ধে নানাসংস্কৃত দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। বারংবার অতি বিজ্ঞ, তাঁরা মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলছেন, “অতিরিক্ত বৈরাগ্য সাধনাত্তই দেশটা মাটি হতে বসেছে। এ দেশের জলবায়ু মোলায়েম, পোরাক সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয় না, কাজেই তব্ধচিত্তা আর তার সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনাটা বয়স না পাকতত এসে ছুঁতে পড়ে। ওই তো হচ্ছে আদর্শ মরণের লক্ষণ।” মনে হয়, এমনধারা অপূর্ণ যুক্তি ইচ্ছাপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থে পর্যাপ্ত স্থান পেয়েছে। এতে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে কি কমে, তা স্থল-মাস্টাররাই বলতে পারেন।

কিন্তু এই কথাটা ভজম করতে একটা জায়গায় আমাদের খটকা লাগে। যাদের মুখে বৈরাগ্যমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, তাঁরা বোধ হয় মালেরিয়াজীর্ণ পাতুক্ষীণ বংশধরদের কথা মোটেই ভাবতে পারেন নি। নইলে আধুনিক ঐতিহাসিকরাই যেমন সাক্ষ্য দেন, সেকালে দেশের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে প্রাচীনদের পক্ষে বৈরাগ্যের ধূম ধণ! কোনও রকমেই নির্গদিত হত না। কিন্তু আমরা দেখছি আর এক দিক দিয়ে। যখন দেশে স্বাস্থ্য, সম্পদ, বিজ্ঞার অভাব ছিল না, জাতির সংহতি ছিল, নিত্য নূতন শিল্প ও কলার আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন চলছিল,

কত্রিয়ের শৌর্য দেশ হতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হাচ্ছিল, তখনকার পূর্ণ প্রাচুর্যের মাঝে দাঁড়িয়েই যে ঋষি প্রচার করলেন—“বৈরাগ্যমেবাভয়ম্”—এটা কি সংসারের সঙ্গে একটা বিরোধের সূচনা। না সত্যাত্মত্বের অমোঘ পেরণা? জীর্ণ দেহ, ক্ষীণ ইন্দ্রিয়, সংসারাতুর মন নিয়ে সংসারক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠপদর্শন কনবার পূর্বে যদি কেউ উপদেশ দিয়ে যায়, “ভায়া—বৈরাগ্য মেবাভয়ম্”, তাহলে তার বৈরাগ্যসাধনাকে কাপুরুষতা বলে গাল দিতে পারি। হয়ত আজকাল আমাদের মুখে বৈরাগ্যের বুলির মর্যাদাও কতকটা তাই দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্ম সবল দেহ-মন-প্রাণ নিয়েও যদি কেউ ঠিক ওই বুলিই আওড়ায়, সংসারের বৃকে দাঁড়িয়ে বজ্রনির্ঘোষে ওই বাণীই প্রচার করে, তবে তার উক্তিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; অতি সংশয়বাদীরও মনে হয়, ভোগ-সামর্থ্য থাকতও যে ভোগ হতে নিমুখ হয়ে দাঁড়ায়, তার দর্শন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখ, বৈরাগ্যের বাণী যারা প্রথম উচ্চারণ করেছিল, তাঁরা কি ধাতের মানুষ ছিল। ভেবে দেখ, এ বাণী কক্ষমেঘ বাণী না সক্ষমেঘ বাণী। তার পর এ সিদ্ধান্তকে গাল দিতে হয় দিও, কোনও আপত্তি করব না।

কতকগুলি সত্য আছে, যা চিরন্তন। মানুষের অবস্থার রকমফের হতে পারে, কিন্তু তার জন্ত সত্যের রূপ বদলায় না। আমরা বলি, প্রবল আধ্বাজাতির সবলকণ্ঠে উচ্চারিত বৈরাগ্যের বাণী এমনিতর একটা, মহাসত্য।

জগতে এখনো এ বাণীর অপেক্ষা আছে।  
 চর্যাকার কণ্ঠে এ বাণীর ভাষানো শুনে গাল  
 দিতে পার, কিন্তু এ সত্য তো চর্যাকারিকার  
 জ্ঞান নয়। সংসার কণ্ঠে এ বাণী শুনে  
 বলতে চলে, মনুষ্যজীব চরম ক্ষুধিত—এই  
 মহাসত্যের বিকাশ—মানবজাতির পরম নিমিত্ত  
 এই অভয় বৈরাগ্য। ভোগী কাপুরুষ, মৃত্যু-  
 লাঞ্ছিত—যথার্থ পুরুষ বৈরাগী, সে মৃত্যুঞ্জয়।

ভোগ করবার একটা লালসা সবার  
 মাঝেই আছে ; ভোগে আনন্দও আছে।  
 তাই সাধারণ মনুষ্য অবাক হয়ে ভাবে, ভোগ  
 যদি ছাড়তে হল, জীবনে তাহলে থাকল  
 কি ? এইখানেই বৈরাগীর সঙ্গে তার বিরোধ।  
 কিন্তু আনন্দই যদি সমস্ত জীবনযোনি-প্রসঙ্গের  
 মূল নিদান হয়, তাহলে বৈরাগীও কি এই  
 আনন্দের রসায়ন পান করেই বেঁচে থাকে না ?  
 বিষয়সংস্পর্শজনিত কষায় আনন্দ ভোগীর, আর  
 নিঃস্বর্ণ আনন্দ বৈরাগীর—হুয়ে এই প্রভেদ।

অনাসক্তিরও একটা আনন্দ আছে, তা  
 আপ্তকামেরই নামান্তর। ভোগের মূলে আছে  
 চেষ্টা—পাণ তাতে ক্ষুধি লাভ করে, কিন্তু  
 মন সংশয়ের দোষায় দুলতে থাকে। অথচ  
 প্রাণ পাণন চেষ্টায় ভোগী তী প্রেরণে  
 আনন্দ পাবে না। এই জ্ঞান ভোগে হুয়ের  
 উদয় কোথা হতে হয়, তা সে বুঝতে পাবে  
 না—তাই শেষে সিদ্ধান্ত করে, মাছের সঙ্গে  
 কাঁটা থাকবেই, ওটুকু অনিবার্য। কিন্তু  
 বৈরাগী হেসে বলেন, তাই বা থাকবে  
 কেন ?

কোনও একটা বস্তু যদি পূর্ণরূপে অধিগত  
 করতে না পারি, তবে তাকে প্রতি যে আকর্ষণ  
 অনুভব করি, তারই নাম আসক্তি ; আসক্তি  
 অল্প মধুর, কেননা আত্মশক্তি সেখানে  
 বস্তুশক্তির কাছে পরাজিত। আর, কাউকে  
 পূর্ণভাবে নিজের মাঝে পেলে, সমস্ত নানতার

আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে, সেই বস্তুর উপর  
 থেকে আপনা হতে সমস্ত আসক্তি চলে যায়,  
 অথচ অনির্জনীয় আনন্দে অন্তর জিহ্বালিত  
 হয়ে ওঠে ; একেই বলি প্রেম—এ রস শুধুই  
 মধুর, অস্ত্রের লেশমাত্র এণ মাঝে নাট।  
 এখানে বস্তুশক্তি আত্মশক্তিরই কক্ষিগত—  
 তাই বস্তু আর বৈরাগীকে আকর্ষণ করতে  
 পারে না, পাওয়ায় জ্ঞান উগ্র চেষ্টাও দেখা  
 যায় না। কিন্তু এই চেষ্টার বিরতি প্রাণের  
 দৈব হতে নয়, প্রাণের পূর্ণতা হতে—মনের  
 অপরিভাষিত হতে নয়, তার সর্বজনীন পরিণতি  
 হতে।

যদি দেখি, বৈরাগ্যের প্রেরণার কেউ  
 আসক্তিকে পরিহার করেছে, কিন্তু প্রেম তার  
 শূন্য স্থানকে পূর্ণ করেনি, তবে তার সাধনাকে  
 পথভ্রষ্ট মনে করব। বৈরাগ্য চর্যাকার নয়,  
 নিরানন্দ নয় ; প্রেম আনন্দের নিদান।

বৈরাগ্যসাধনা আপাততঃ স্থগিত রাখা  
 প্রয়োজন কি না—এ প্রশ্ন মূর্ততার পরিচায়ক।  
 তাহলে এমন কথাও বলতে পারি, বর্তমানে  
 আমাদের অসঙ্গ কম, সুতরাং ভগবানও যদি  
 কিছু কালের জ্ঞান বিশ্রাম গ্রহণ করেন !  
 চিন্তন সম্ভার বিনাশ নাট ; আধারকে  
 শুদ্ধ কর, আধারের গুণ আপনি নিঃস্বর্ণ দেখতে  
 পাবেন। আধারশক্তি পূর্বেও প্রয়োজন ছিল,  
 বর্তমান হুজুগের যুগেও নিঃস্বর্ণই প্রয়োজন।

অভয় কে ?—যে রাজরাজেশ্বর। যথার্থ  
 প্রেমিক কে ?—যে রাজরাজেশ্বর হয়েও দীন  
 ভিখারীর সঙ্গে মৈত্রী তরিতে কুণ্ডা বোধ করে  
 না। অভয় ও প্রেম সম্মিলিত হয়েছে বৈরা-  
 গীর মাঝে। তিনুই বৈরাগীর আদর্শ শব্দ—  
 যিনি রাজরাজেশ্বর অথচ ভূতনাথ, সংহর্ষা  
 অথচ মঙ্গলময়—যার অনাসক্তিতে বিশ্বের  
 তাঁর কর্তৃত্ব।

## সাংখ্যের প্রমাণ-বিচার

[ সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী ]

[ সাংখ্যানাদীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম -  
এই তিনটি প্রমাণ মাত্র স্বীকার করিয়া  
পাঠকেন। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা  
ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। ( সাংখ্যতত্ত্ব-  
কৌমুদী-১৮শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ও তৎপূর্বে  
দ্রষ্টব্য )। অজ্ঞাতবাদীরা কেহ ইহা অপেক্ষা  
কম, কেহ বা ইহা অপেক্ষা বেশী প্রমাণ  
স্বীকার করিয়া থাকেন। আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠা  
করিতে হইলে পরপক্ষের পত্তন প্রয়োজন।  
একগণে আচার্য্য তাহাটী করিতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছেন। ]

[ প্রমাণকারিকার শেষে “আপ্তব্রতীরাপ্ত-  
বচনং তু” এই বলিয়া ] যে “তু” শব্দটি উল্লেখ  
করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা আগম প্রমাণকে  
অনুমান হইতে পৃথক করা হইয়াছে। [ দেশ-  
বিষয়ক প্রত্যক্ষ ও অনুমান নার্যক দুইটি  
মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন; তাঁহার মতে  
আগম প্রমাণ অনুমানেরই অন্তর্গত, ইহাকে  
পৃথক বলিয়া স্বীকার করিব; কোন প্রয়োজন  
নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষীয় এই, বাক্য  
উচ্চারিত হইলে ] বাক্যের যাহা অর্থ, তাহাটী  
প্রমেয় বা ধর্মার্থ বোধের বিষয় হইয়া থাকে।  
[ একগণে, আগম অনুমানেরই অন্তর্ভূত, এই  
যুক্তি স্বীকার করিলে বলিতে হয়, উচ্চারিত  
বাক্যকে লিঙ্গ বা হেতু স্বীকার করিয়া তাহা  
হইতে বাক্যার্থরূপ সিদ্ধি বা সাধ্যের অনুমান  
করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক, তাহা যুক্তি-  
সহকি না, তাহা বিচার করিতে হইবে। ]

বাক্য বাক্যার্থের ধর্ম নয় যে বাক্যার্থের  
অনুমানে বাক্যকে লিঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে  
পারে। এমন কথাও বলা যাইতে পারে না  
যে বাক্য বাক্যার্থ প্রতিপাদন করিতে গিয়া  
কোনও নিশ্চিত সম্বন্ধবোধের অপেক্ষা রাখে,  
কেন না কোনও অভিনব কবি [ যদি ] অদৃষ্ট-  
পূর্ব বাক্যসমূহ দ্বারা অনন্তভূতপূর্ব কোনও  
বাক্যার্থ প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলে  
[ নিরূপিত সম্বন্ধ না থাকায় ] কোনও অদৃষ্ট-  
পূর্ব বাক্য হইতে অনন্তভূতের অর্থের বোধ  
সম্ভবপর হইত না।

[ আচার্য্যের এই কথার তাৎপর্য্য এই,  
পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, বাক্য হইতে বাক্যার্থের  
অনুমান হয়। লিঙ্গ বা ব্যাপ্তিনিশ্চিত চিহ্ন  
দ্বারা অজ্ঞাতবস্তুর বোধ অনুমান প্রমাণ দ্বারা  
হইয়া থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে, বাক্যকে এত-  
রূপ লিঙ্গ ধরা যাইতে পারে, কেননা বাক্য  
বাক্যার্থবোধের কারণ। যেমন ধূমদর্শন অগ্নি-  
বোধের কারণ, তেমনি বাক্যও বাক্যার্থ-  
বোধের কারণ। কিন্তু ইহার উত্তরে, আমাদের  
পক্ষীয় এই যে ধূম যে বহ্নির লিঙ্গ, তাহা  
ধর্মদর্শনভাবে আশ্রয় করিয়া; ধূম বহ্নির  
ধর্ম, তাই ধূম বহ্নির পরিচায়ক। কিন্তু বাক্য  
বাক্যার্থের ধর্ম, এমন কথা কি বলা যায়?  
তাহা হইলে বাক্যকে বাক্যার্থের অনুমাপক  
বা পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করি কিরণে ?

[ প্রতিবাদী ইহার উত্তরে বলিতে পারেন,  
না হয় স্বীকার করিলাম, বাক্য ও বাক্যার্থের

মধ্যে পর্য্যদর্শিত্যে নিহতমান নাট। কিন্তু উভয়ের মাঝে একটা সম্বন্ধ তো আছে? যেমন ধুম অগ্নির সহিত সম্বন্ধ, অতএব ধুম হইতে অগ্নির অনুমান হইয়া থাকে, সেটরূপ শব্দও তো অর্থের সহিত সম্বন্ধ, তবে শব্দ হইতে অর্থের অনুমান হইবে না কেন? বিশেষতঃ জৈমিনি তাঁহার মীমাংসাদর্শনে শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ তেঃ স্পষ্টরূপেই প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, শব্দ ও অর্থের মাঝে যে নিত্য সম্বন্ধের কথা জৈমিনি বলিয়াছেন, তাহার অনুভব স্পষ্ট-প্রত্যয় সাপেক্ষ। স্থূলতঃ আমরা দেখি, শব্দ ও অর্থের মাঝে সম্বন্ধ নিত্য হউক না হউক, অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহার ছাড়া সে সম্বন্ধ প্রমাণ করার কোনও উপায় নাই। বালক শব্দার্থের নিত্যসম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা শেখে না, বুঝে না; সে ভাষা শিখে বস্তুব্যক্তির মুখে প্রয়োগ শুনিয়া, ব্যবহার দেখিয়া। সুতরাং শব্দার্থের নিত্য-সম্বন্ধ থাকিয়াও তো শব্দার্থবোধে তাহা আমাদের কাছে আসিতেছে না। তার পর থাকের অর্থ পদের অর্থের অপেক্ষা করিতেছে। এখানে যে শব্দার্থবোধের কোনও অপেক্ষাই নাই, তাহা তো স্পষ্ট। কেননা, কোন পদগুলি কি ভাবে সংজ্ঞায়িত হইবে, এ বিষয়ে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম কেচ করিয়া দিতে পারে কি? যেখানে নিয়ম নাই, সেখানে নিরূপিত সম্বন্ধও নাই। পদগুলি যেমন তেমন করিয়া সংজ্ঞায়িত হইয়া একটা বিশিষ্ট অর্থ বোঝানই থাকে। ইহার মাঝে নিরূপিত সম্বন্ধের অপেক্ষা কোথায়? ভাষা জীবন্ত; নূতন অর্থ বুঝাইবার জন্য নূতনবাক্যের সৃষ্টি হইতেছে। নিরূপিত সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই যদি শব্দার্থের

বোধ সম্ভব হইত, তাহা হইলে একপস্থলে তো অর্থজ্ঞানের কোনও সম্ভাবনাট থাকিত না। এত সমস্ত আলোচনা হইতেই প্রমাণ হয়, শব্দার্থবোধ অনুমান বলি সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে।]

প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ দুইট পলাইয়াছে। তাহা ছাড়া উপমান প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমাণের কথা স্মৃতিবাদীরা বলিয়া থাকেন, তাহা পূর্বেই প্রমাণ-সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

[নৈয়ায়িক উপমান নামে একটা পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ এই—কোনও ব্যক্তি অপর এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়া, বনে গরুর মত এক রকম গজ আছে, তাহাকে গরয় বলে। দৈন্য বনে এক দিন এত রূপ একটা প্রাণী দেখিতে পাইয়া পূর্বেই অভিজ্ঞ হইয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধারণা হইল—এই যে গোরুর মত জানোয়ারটা ছুটিয়া গেল, এই তো গরয়। এইরূপ অভিজ্ঞের নির্দেশ অরণ্যে কারয়া সাধারণ জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক যে বস্তুজ্ঞান, তাহাও উপমান প্রমাণ সাপেক্ষ।

[সাংখ্যবাদী বলেন, উপমান বলিয়া পৃথক একটা প্রমাণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব, ইহার সমস্তগুলি অজ্ঞত পূর্বেই প্রমাণ-সমূহের অন্তর্ভুক্ত।] যেমন ধর, উপমানের একটা অঙ্গ “যেমন গে”, তেমনি গরয়”—এই অভিজ্ঞ-বচন। এই বাক্য হইতে উপর জ্ঞান ‘আগম্য’ প্রমাণ সহজে পাইয়া থাকি। তার পর আছে, গরয় শব্দ গে-সদৃশের বাক্য, এই জ্ঞান; ইহা অনুমানের অন্তর্গত। অনুমানের প্রকার এই—অভিজ্ঞেরা যে বিষয়ে

যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; অন্য কোনও ভাষণার্থ না থাকিলে তাহা সেট বিষয়েরই বাচক হইয়া থাকে; যেমন 'গো' শব্দ গোশব্দ বাচক। এইরূপে অভিজ্ঞেরা গোশব্দে গবয় শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন, সুতরাং উহা তাহারই বাচক। [ এইরূপ সংজ্ঞাসংজ্ঞা-জ্ঞান, যাহা নৈমায়িকের মতে উপমানের ফল ] তাহা বাস্তবিকপক্ষে অসম্ভব মাত্র। তার পর গবয়টা চোপের সামনে আসিয়া পড়িলে যে গো-সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়, তাহা তো প্রত্যক্ষ। ঠিক এইরূপ যুক্তিতে স্থিতিতে উৎকৃষ্ট গোপিণ্ডে যে গবয়সাদৃশ্য জ্ঞান, তাহাও প্রত্যক্ষ বটে কি। কেননা, সাদৃশ্য যে গোতে এক প্রকার, আবার গবয়ে আর এক প্রকার, তাহা বলা চলে না। সাদৃশ্য কি? এক জাতীয় বস্তুতে সাধারণ ভাবে যে অসংখ্য সংযোগ রহিয়াছে, অপর জাতীয় বস্তুতে যদি তাহাই প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবে তাহাকে সাদৃশ্য বলা যায়। উভয়তঃ সাধারণ সংযোগ কখনও এক বটে দুই হইতে পারে না। গবয়ে যদি ঐই সাধারণ সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে গোতেও তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতে হইবে। সুতরাং উপমানকে পূর্ণক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন নাই।

[ আচার্যের মতে উপমানকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি প্রকার প্রাণের ঘাটবে—অভিজ্ঞের উক্তিবোধ, সংজ্ঞাসংজ্ঞা জ্ঞান, সাদৃশ্য জ্ঞান। এই তিনটি প্রকারে যথাক্রমে আগম, অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহায় অধিগত হইয়া থাকে। উপমান তিনটি প্রমাণের মিশ্রণ মাত্র—নতুন কিছু নহে। কিন্তু এই

মিশ্রণের অপূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়াই নৈমায়িক ইহাকে পূর্ণক প্রমাণ বলেন, ইহাও বিবেচ্য। ]

[ মীমাংসক অর্থাপত্তি নামে একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যবাদী বলেন, ] অর্থাপত্তিকেও পূর্ণক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। আচার্যেরা অর্থাপত্তির এইরূপ উদাহরণ দিয়া থাকেন। “চৈত্র ঘরে নাই, অথচ বাঁচিয়া আছে; ইহা চটতে সে যে বাঁচিবে আছে, ইহা না দেখিয়াও আমরা কল্পনা করিতে পারি।” এইরূপ কল্পনাই অর্থাপত্তি। [ নৈমায়িক ব্যক্তির একী অনুমান দ্বারা অর্থাপত্তির কাজ চালাইয়া নিতে চান। কিন্তু মীমাংসক বলেন, অর্থাপত্তির প্রামাণ্য অনুমান অপেক্ষা দুর্বল, উহা বিষয়ের উপপত্ত বা সম্ভাবনাকার জ্ঞান বিষয়ান্তর প্রমাণ করা মাত্র—ইংরেজী ভাষায় যাহাকে Hypothesis বলে। সুতরাং উহাকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। ]

সাংখ্যবাদী বলেন, অর্থাপত্তি অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত। [ অনুমানের জ্ঞান ব্যাপ্তিগ্রহ প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও তাহার অভাব নাই। ] চৈত্র যখন অব্যাপ্তক বা পরিচ্ছিন্ন, তখন সে এখানে না থাকিলে অজ্ঞাত আছে; আবার অব্যাপ্তক বলিয়াই সে যদি এখানে থাকে, তাহা হইলে অজ্ঞাত নাই। [ ইহাট হইল গৃহে না থাকা ও বাহিরে থাকার মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রকার। ] দৃষ্টান্ত আমাদের নিজের শরীর। [ যখন ব্যাপ্তিও পাইলাম, উভয়ব্যাপ্তি দৃষ্টান্তেরও অভাব রহিল না, তখন ] “দোখতোছি, চৈত্র গৃহে নাই” এই লক্ষ্য হইতে, “দোখতোছি, সে বাহিরে আছে” এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। [ পাঠক “দোখতোছি”

কথাটা লক্ষ্য করিবেন। মীমাংসক দুইটা দর্শনই যে তুল্যার্থক, তাহা স্বীকার করিবেন না—সুতরাং অর্থাপত্তিকে অগ্রহণ বলিতে চাহিবেন না। সাংখ্যবাদী কিন্তু দুইটা দেখাই এক বলিতেছেন।]

সাংখ্যবাদীর এই অগ্রহণকে পণ্ডন করিবার জন্য—প্রতিবাদী বলিতেছেন, চৈত্রের বহির্ভাব অগ্রহণ করিতে গিয়া তুমি তাহার গৃহভাবকে হেতু বলিতেছ। কিন্তু গৃহভাব অসিদ্ধ; হেতু অসিদ্ধ হইলে অগ্রহণ হয় না। কিন্তু অসিদ্ধ, তাহা বলিতেছ। বাহিরে আছে কথার অর্থে কোথাও না কোথাও আছে। কোথাস্থ আছে তাহা বলিতে তো গৃহ

কেও বুঝিতে পারে? সুতরাং কোথাস্থ আছে বলিতে পারি। তাহা হইলে যবের নাই, এই কথা তো কাটা যায়। হেতুর উত্তরে সাংখ্যবাদী বলিতেছেন, চৈত্রের কচিং সস্তা হারা তাহার গৃহভাবের অপলাপ হয় না, বাহ্যতে গৃহভাব অসিদ্ধ হইয়া বহির্ভাবের হেতু না হইতে পারে; এমন কি চৈত্র যবের নাই, হেতুতে তাহার সস্তারও অপলাপ করা হয় না, যে সস্তা অসিদ্ধ হইয়া বহির্ভাবকেও খণ্ডিত করিলে [অর্থাৎ যে মোটেই নাই, সে বাহিরেই বা থাকে কি করিয়া?—সে যবের নাই এই কথার উপর নির্ভর করিয়া এমন কথাও বলা যাউতে পারে না।] ক্রমশঃ

## শ্রুতি-স্মৃতি



আচার, নিদ্রা ও মৈথুন, এই তিনটিই মধ্য কেবল মৈথুনভাগ করণেই যে হয়, তা নয়। মৈথুন ষাণক ও বুদ্ধেরও নাই, তাহলে তাহাও তো যোগী হত। পশুভেদে আহার করে, পানীভেদে পেট ভরে যায়, ঘুমায়। মানুষও যদি এই নিয়মে থাকে, তবে তার আর কি হবে?

\*

বাসনাট কল্পমৃত্যুর কারণ। যার যত কামনা-বাসনা, সে তত বন্ধনের জোগাড় করছে। কাজেই কিছু বাসনা করতে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, নইলে নিজের কাজেই নিজে

বদ্ধ হতে হবে। যে বন্ধন যা কিছু বাসনা করলে, ভগবান্ ক্রমে তা পূর্ণ করবেন, কেননা তিনি কল্পগ্রক। কিন্তু বাসনার পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান হবে না। এমন কি আধ্যাত্মিক বিষয়েও, যোগ করণ, কি সাধন করণ, এমন কোনও সঙ্কল্প কখনও করণে না। তাহলে সেট সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পূর্ক পর্যন্ত শুক্ল কৃপা উপলব্ধি হবে না। উপনিষদেও ঠিক এই কথা আছে—“না-শান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈব-মাপ্নুয়াৎ” শব্দবাচ্যতা বলছেন, অশান্তমানস মানে যার সাধনসঙ্কল্প রয়েছে।

নিজের চিত্তে ঢেউ থাকলে জগতের সকল  
ঢেউ এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। আর  
নিজের চিত্ত স্থির হয়ে গেলে জগৎ রহস্য  
আপনা থেকে প্রকাশ হয়। চিত্ত উদার কর,  
আপন চিত্তকে বোধ্য, তাহলেই সব ঠিক হয়ে  
যাবে।

\*

উপযুক্ত অধিকারী না হলে, গুরুসাক্ষ্যে  
বাস করার বিপদ আছে। যাবা কাছে থাকে,  
তারা অনেকটাই আপন লক্ষ্য ভুলে গিয়ে  
কেবল বড় বড় বচন শেখে, আর অবশেষে  
তাদের জন্ম মকভূমি হয়ে যায়। তখন তারা  
একুল-ওকুল ঢুকুল ভাবায়। সংসারের কিছু-  
তেও তাদের মন বাসে না, এদিকেও মন যায়  
না, মাঝপান থেকে পতন হয়ে যায়। অতএব  
সানধান।

\*

সঙ্গীতের রাগিণী অমূল্য, কিন্তু ভাবলোক  
তারা মূর্ত্তিমতী। এখানে কোন রাগিণীর গান  
শুনলে সে আনন্দ হয়, সেখানে সৈ রাগিণীকে  
দেখলে ভাই হয়। এখানে যার মূর্ত্তি আছে,  
সেখানে তা অমূল্য, আর এখানে যা অমূল্য  
সেখানে তার মূর্ত্তি আছে। ভাবলোকে  
দাস্ত, সখ্য প্রভৃতি ভাবগুলি মূর্ত্তিমান। শিব  
সম্বন্ধেই ধর—নন্দী ও ভূদী, বিবেক ও বৈরাগ্য  
—জয়া ও বিজয়া শান্তি ও ক্রীতি ইত্যাদি।  
ভাবলোক কোনও গুণের অধীন নয়; এক  
মাত্র প্রেমিক সেখানে যেতে পারেন। গোপ  
দ্বারা বা অন্ত কোনও তত্ত্ব দ্বারা ভাবলোক  
জানি যায় না—এ'লোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে।  
জগৎ রহস্য আর্য্য হলও ভাবলোকের সন্ধান  
পাওয়া যায় না—এমন কি সমাধিস্থ যোগীও সে

লোকের খবর পান না। কেবলমাত্র ভাবগ্রাণী  
প্রেমিকভক্তের সে লোকে অধিকার।

\*

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ফাল্গুন মত।  
ফাল্গুন যেমন ছেড়ে দিলে তার সমানশ্রেণীর  
বায়ুস্তম্ভ পর্য্যন্ত উঠেই স্থির হয়ে যায়, এ-ও  
তেমনি। যার ময়লামাটি যতটুকু কেটেছে,  
সে ততটুকু ওপরে উঠেই স্থির হয়ে যায় এবং  
ক্রমে আগার ওপরে উঠতে থাকে। এমনি  
করে ক্রমে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক  
প্রভৃতির তত্ত্ব জানতে পারে। যোগীও  
তেমনি যার যতটুকু সামর্থ্য, সে সেট চক্র  
পর্য্যন্ত উঠতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডটাই ভেদ  
করলে আর তাকে ফিরতে হয় না।

\*

যাবা ঈশ্বরকেটী, তাঁরা নির্দিষ্ট কতক  
গুলি কাজ করার জন্য অবতরণ করেন। সে  
কাজ তাঁকে করতেই হয়। কাজেই এক  
দিক দিয়ে তিনি প্রকৃতির অধীন। যিনি অব  
তার, তিনি স্বৈচ্ছাধীন। নির্দিষ্ট কোনও  
কার্য্য তিনি বাধ্য নন। প্রকৃতি তাঁর অধীন।  
ইচ্ছামত তাকে খেলিয়ে তিনি কাজ করেন  
যান।

\*

সংসারে কর্ম্ম কামনাময়, তাই কর্ম্ম  
সেখানে বন্ধন ঘটে। আর গুরুগৃহে কর্ম্মের  
কামনা না থাকার কোনও বন্ধনই নাই। গুরু-  
গৃহের কর্ম্ম কেবল গুণকর হয়; সাধনজনও  
তো গুণকরের অন্ত। গুরুগৃহের কর্ম্ম বাটী  
ভার্যে ধরলে জগতের, আর সমষ্টিভাবে ধরলে  
তাঁর। সুতরাং গুরুর কাছে থেকে সাধন

ভজন নিয়ে করলে যা হত, তাঁর সেবা করলেও  
ঠিক সেট ফলই পাওয়া যাবে।

\*

সন্ন্যাসী কাকে বলি? যার ছেড়ে যার  
কুটীরে আসক্তি, গরদ ছেড়ে যার নেংটিতে  
আর কবলে আসক্তি, সে তো গৃহীত চেয়েও  
অধম। সকল রকম আসক্তি ভাগ করা  
প্রকৃত সন্ন্যাস। যিনি পরকে অমৃত বিলিয়ে  
নিজে হলাহল পান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী।  
যিনি পনের গলার মণিচান ছলিয়ে দিয়ে নিজের  
গলার ফণিচান ধারণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী।  
যিনি জানেন, আমি এই রক্ত-মাংসের খাঁচা  
আশ্রয় করে চলেছি, একে সোণা দিয়েই  
মোড়া আর কাঁথা দিয়েই কড়াও, দুই-ট  
সমান, তিনিই সন্ন্যাসী।

\*

শিষ্য মনেব ভুলে গুরুকে ছেড়ে যায়, কিন্তু  
জানেন না, গুরু বৎসভাণ্ডা গাভীর মত তার পথ  
চেয়ে থাকেন। নিজের ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্যকে  
বিলিয়ে দিয়ে তার কর্তৃফল নিয়ে জন্মগ্রহণ  
করতেও সে গুরু প্রস্তুত।

\*

ভগবানকে যোগে স্নানভাবে দেখা যায়,  
আবার তত্ত্বসাধনার স্থলভাবে দেখা যায়। তবে  
যে ভাবেই হোক, একবার তাঁর দর্শন পেলে  
নিজের ইচ্ছামত তাঁর কাছে আবদার করা  
চলে। স্নানদর্শনে নিজেকে স্নানভাবাপন্ন করে  
নিতে হয়, আবার স্থলদর্শনে তাঁকেই স্থলভাব  
গ্রহণ করতে হয়। তবে তাঁর কৃপা ছাড়া  
কিছুই হয় না।

\*

সেবক হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত  
হয় না। তোমার কতটুকুই বা প্রার্থী—আর

সেই প্রার্থের চটফটানিতে অস্থির! সেবকের  
সেবক, দীনের দীন হয়ে থাক, তবে আর তার  
ওপর কোনও পরীক্ষা আসবে না, নইলে  
বাড়ে এমন বোঝা চাপবে যে ষাড় জুড়ো  
হয়ে যাবে।

\*

ভগবান বিশ্বপতি হলেও ডাকলে আসেন।  
কেন আসেন? জীবকে সুখ দিতে। কেন  
না জীব অতি দুঃখী, অতি দীন, তাই তিনি  
দয়া করত আসেন। নচেৎ তিনি যদি দণ্ড-  
মুণ্ডের কর্তা হয়ে, নির্দীকায় হয়ে আসতেন,  
তবে তাঁর জন্য জীবের প্রাণ কেন ব্যাকুল  
হবে?

\*

দর্শনাত্তের জন্য যে সন্ন্যাসী হয়, সে ভণ্ড।  
সন্ন্যাস পরহিতের জন্য। আপনাকে তাগতি  
প্রকৃত সন্ন্যাস। কৃদ্র কর্তৃগণকে মতাকর্তব্যের  
কাছে বলি দেওয়াই সন্ন্যাস।

\*

ভগবানের উপাসনা মানে ভগবানের মত  
হয়ে যাওয়া। যে যার উপাসনা করে, সে  
তাতেই পরিণত হয়। যিনি দেবতার উপা-  
সনা করেন, তাঁকে দেবতার মত থাকতে হয়।  
যে শিশু সাধনা করে, তাকে নিজেও শিশু-  
চের মত আচার করতে হয়।

\*

সাধুদের সময় সময় যে ক্রোধ দেখা যায়, তা  
প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ নয়। কারণ পরের অনিষ্ট  
ইচ্ছার ক্রোধের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সাধু কারও  
মন্দ ইচ্ছা করেন না। তাঁর ক্রোধ সাময়িক  
বিরক্তিমাত্র এবং তা জীবের মঙ্গলের জন্য  
হতে পারে। (ক্রমশঃ)





## ভাব ও বস্তুর সমন্বয়

[ স্বামী রামতীর্থ ]

নির্বিষেণ সত্য বুদ্ধিতেও যা, বিধেও তাই বটে, কিন্তু বুদ্ধি বা বস্তু যখন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন হৃদয়ের পেছনেই থাকে এক মহাসত্য—সে সত্য আত্মা। জগতে যা কিছু আছে, তার পেছনে যে একই সত্য নিহিত রয়েছে, এক কথাটা ভাল করে গোধান হয় না। ধর, একটা কলম রয়েছে। কলমে কতগুলি গুণ বা ধর্ম আছে, আবার তার অধিষ্ঠানরূপে একটা বাস্তব সত্যও আছে। একটা বস্তুসত্তা যে অধিষ্ঠানরূপে রয়েছে, একথা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয়, কারণ তা না হলে এই গুণগুলি তো আপনা আপনি এসে জোটেনি; নিশ্চয়ই বুদ্ধির ওপর কোনও একটা ক্রিয়া হয়েছে এবং সেই ক্রিয়ার প্রতি ক্রিয়াস্বরূপে বুদ্ধিতে গুণের স্ফূরণ হয়েছে। কলমটার গুণগুলির নাম দিলাম মনে কর ক আর তার অধিষ্ঠান সত্তার নাম দিলাম খ। কলমটা হচ্ছে তার গুণগুলির সমষ্টিমাত্র। এত ধর, একটা টেবিল আছে। টেবিলের গুণগুলির সমষ্টিতে টেবিল হয়েছে; তাহলে টেবিলটা হল যেন কগ+খ;—খ হচ্ছে নির্বিষেণ বস্তু সত্তা। জিজ্ঞাসা করতে পার, কলমের বেলার যে খ, টেবিলের বেলাতেও যে সেই খ, তার প্রমাণ কি? হয়ত এমনও হতে পারে, যা কলমটার গুণগুলির অধিষ্ঠান, তা টেবিলের গুণের অধিষ্ঠান নয়। যখন কলমের গুণ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়েছিল, তখন যে অধিষ্ঠানের প্রেরণার ক্রিয়া হয়েছিল, টেবিলের

গুণ প্রতিফলিত হওয়ার সময় সে অধিষ্ঠানের প্রেরণার ক্রিয়া হয়নি। ধর এই দ্বিতীয় অধিষ্ঠানের নাম দেওয়া গেল খ। এই একটা পিয়ানো রয়েছে; এর অধিষ্ঠানকে অভ্যন্তর অধিষ্ঠান হতে পৃথক্ করবার জন্য নাম দিলাম খ''; হয়ত এর বস্তুসত্তা কলম বা টেবিলের বস্তু সত্তা হতে পৃথক্। একটা মানুষ রয়েছে; তার অধিষ্ঠানকে বললাম খ'।

এখন হয়ত বুঝতে পারবে, প্লাটোর কোথার ভুল হয়েছিল। এট যে অধিষ্ঠানসত্তার কথা বলা হল, প্লাটো একে প্রত্যেক বস্তুতে বিভিন্ন বলে ধরে নিয়েছেন, তুমিও তাকে বিভিন্নই বলছ। এই ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করা যেতে পারে। এর মাঝে একটা ছেঁড়াভাস রয়েছে। এ কলমটার বর্ণ, আকৃতি, কাঠি—প্রভৃতি ধর্ম তোমার বুদ্ধিরই প্রতি-ক্রিয়ার ফল। তাহলে প্রমাণ হল বুদ্ধির প্রোতঘাত হওয়ার পর এই সমস্ত গুণের উদ্ভব হয়েছে। তাহলে অধিষ্ঠান সত্তা এই সমস্ত গুণের পূর্কৃতাবনী অর্থাৎ তাদের অতীত: খ' বা খ'' এরও তাহলে গুণাণীত।

তাহলে ভেদ আসে কোথা থেকে? একটু স্থির হয়ে ভাব দেখি। জগতে যত কিছু ভেদ, সব গুণের ভেদ। এই খড়্গটা আর এট পেন্সিলটার গুণের কোনও উল্লেখ না করে কি তুমি এদের পার্থক্য নিরূপণ করতে পার? খড়্গের টুকরাটা যে কলম হতে পৃথক্, তা জান কি করে? শুধু গুণের আলোচনায়। খড়্গটা

শাদা; এ একটা গুণ। খড়্গটা ভঙ্গুর, এ-ও একটা গুণ। সমস্ত ভেদ তাহলে গুণের ভেদ। এখন অধিষ্ঠান খঁকে যদি তুমি খঁহতে পৃথক বল, তাহলে উভয়ের মাঝে গুণের ভেদ স্বীকার করবেই পৃথক বল্হ। তাহলে যা গুণাতীত বা নির্বিশেষ ছিল, তাকে আবার তুমি বল্হ গুণের অধীন। যদি অধিষ্ঠান-সত্তাতে ভেদই সম্ভব হয়, তাহলে একটা অধিষ্ঠান হতে আর একটা অধিষ্ঠানকে পৃথক করতে গিয়ে তাদের গুণের অধীন বলে করণা করতে হয়। ঠিক এখানেই ভুল হয়। গোড়ায় তুমি বলে এসেছ, অধিষ্ঠান গুণের পূর্বভাবী অতএব গুণাতীত; আর এখন বল্হ কি না অধিষ্ঠান গুণাধীন। তাই বলা-ছিলাম, অধিষ্ঠানকে যদি বিভিন্ন বণে মনে কর, তাহলে সেটা তোমাদের মতভ্রম। প্রথমে বল্লে, অধিষ্ঠান গুণের অতীত; শেষকালে কি না নিজেই নিজের কথা কেটে আবার তাকে গুণের এলাকায় নামিয়ে আন্হ। ভুল তো এখানেই।

যা এই খড়্গটার অধিষ্ঠান, তাই যে ওই পেন্সিলটার অধিষ্ঠান নয়, এ কথা বলবার তোমার উপায় নাই। তোমার মন-বুদ্ধির পেছনে যে অধিষ্ঠান-তত্ত্ব, সেই তত্ত্বই যে ওই গরুটা বা ভেড়াটার অধিষ্ঠান নয়, এ কথা তুমি বলা কি করে? এই টেবিলটার অধিষ্ঠান যে আত্মা, সে যে তোমার আত্মা হতে পৃথক, তা বল্হে পার না। সঁবাণ মূলে সেই এক, আত্মতীর অনন্ত, অপরিণামী, নির্বিশেষ সত্তা।

একটা উদাহরণ দিয়ে কণাটা বুঝিয়ে বলি। সামনে দেখ্ছ, ধ্বংসে সাদা একটা বেওয়ারী। তোমরা তেঁা সগাই বসে আছ; কেউ উঠে গিয়ে দেওয়ালটার ওপর বৃত্ত,

ত্রিভুজ, বৃত্তাভাস প্রভৃতি জামিতিক ক্ষেত্র আঁকতে আরম্ভ করলে। কেউ হয়ত গিয়ে একটা মহাঘূর্ণের চিত্র আঁকতে শুরু করলে; কেউ হয়ত আত্মীয় স্বজন স্ত্রী-পুত্রের চিত্র আঁক্হ; কেউ অংক কিছু আঁক্হ। কিন্তু সমস্ত ছবিগুলির পেছনে তো একই অধিষ্ঠান। তেমনি এই জগতে যা কিছু দেখ্ছ, তার পেছনে একই অধিষ্ঠান। এট ছদ্মিতে দেখ্ছ একটা ঘোড়া, একটা গরু, একটা হাতী, একটা মানুষ। কিন্তু সব ছবি আঁকা হয়েছে ওই শাদা দেওয়ালটার ওপরেই। তেমনি এক আত্মা, এক অপিনাশী সত্তা সবার পেছনে। স্বপ্নে একটা গরু দেখ্লে, কি একটা ঘোড়া বা মানুষ বা স্ত্রীলোক দেখ্লে; কিন্তু জান্ছ, এ সমস্তই আত্মার পটে আঁকা চিত্র মাত্র। যখন জাগ্লে, তখন দেখ্লে, স্বপ্নের গরু, ঘোড়া, মানুষ তেঁা কোথায়ও নাই।

যে সমস্ত গুণের সমবায়ে এই জগৎ, তাদের তত্ত্ব কি? এই প্রাতিভাসিক জগৎ এই সমস্ত গুণের সমন্বয় মাত্র, কিন্তু নির্বিশেষ-তত্ত্বের ওপর তার প্রতিষ্ঠা। এর পর একটা খুব সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থাপ্হ হবে; তোমরা হয়ত সেটা এখন বুঝতে পারবে না,—আগে কয়েকটা বক্তৃতা শুনে বুঝবে। সমস্ত গুণই নির্বিশেষ-তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ঠিক এই গুণের অনুমণ করবেই বলা যায়, নির্বিশেষ-তত্ত্বেরও তেঁা তাহলে দাবণা-গুণ একটা আছে। তাহলে নির্বিশেষকে তো আর নির্বিশেষ বলা চলে না, কেন্হ সর্বিশেষকে ধারণ করা রূপ বিশেষগুণ তেঁা তীতে আঁছ। তাহলে নির্বিশেষ আর নির্বিশেষ দুটো না। এ কথা আমাদের পাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর

দাঁড়িয়ে বসছি। যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে তোমরা বলছ যে, এট দৃষ্ট জগৎ ভাবিক, তেমনি 'আমরাও উৎকৃষ্টতর বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে বসছি, চরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার' পেলে দেশ কাল গুণ সব লীন হয়ে 'যায়'। নির্বিশেষত্বের দিক থেকে দেখলে এই সমস্ত গুণ তো কোনও কালেই ছিন্ন না; অবার গুণের দিক দিয়ে দেখলে, তাদের সমস্ত নির্ভর করছে নির্বিশেষ অধিষ্ঠানের ওপর। এই হল একটা বড় রহস্য, তার উদ্বেগ প্রয়োজন। এই রহস্যকেই বলা হয় আত্মা। তদদৃষ্টিতে যা নির্বিশেষ, তা নির্বিশেষই, তা গুণাতীত; কিন্তু গুণগুলি তো নির্ভর করছে নির্বিশেষের ওপর। এই সমস্তার সমাধান হলে জগতের সকল সমস্তারই সমাধান হবে।

এগুলো শুধু তর্কের কথা নয়। ইউরোপীয় দার্শনিক এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে শুধু তর্ক করে থাকেন; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকের সে পন্থা নয়। তাঁদের মতে শুধু তর্ক দ্বারা যা নিরূপিত হয়, তার সত্যতা অর্দেক প্রমাণিত হয় মাত্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তার সত্যতা ণা হলে তার সত্যতা পূর্ণ হয় না। এই যে নির্বিশেষ অমুভূতির কথা বললাম, শুধু বুদ্ধি সহায়ে বুঝতে গেলেই দেখি, এ তত্ত্ব কত কত মধুর। আর এ যদি একবার অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে পারি, তাহলে এ যে

হবে, সকল মাধুর্যের খনি! এর উপলব্ধি বাস্তবিকই প্রয়োজন। যদি এই অমুভূতিতে প্রাণবন্ত হতে পারি, অর্থাৎ অনুভব করতে পারি যে একই তত্ত্ব সবার অধিষ্ঠান, তুমিই সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাহলে তুমি দেহ মনের অতীত। এ দেহ তো বিশ্বাসী নয়—হৃদিক থেকে ছটা ঢেউয়ের সংঘর্ষে এত বেচক্রপ বিশ্বহেরা উত্তর হয়েচে মাত্র। তুমি তো এই ফেণপুঞ্জ নও। তুমি সেই নির্বিশেষ সত্তা—যার মাঝে সমস্ত জগৎ, নির্খল বিশ্ব-ব্রহ্মও তরঙ্গায়মান। এই অমুভূতিতে সকল বন্ধন হতে মুক্ত হও। এ কি পরমাস্তর্য্য নয় যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েও নিজেকে জানতে পারছ না? তুমিই যে নির্বিশেষ পবনতত্ত্ব, তুমিই যে সবার অধিষ্ঠান—এ তোমার পক্ষে অসংবাদ নয় কি ভাঙে? এখন এই অমুভূতিতে তোমরা সিদ্ধ হও—মুক্ত হও!

এই হোক তোমার নিয়তি!—দেহ গেল রেণু হয়ে পুণে মিশে যাক, আর অনন্ত মরণ আমায় সম্পূর্ণ করে রাখুক। সবার চক্ষু আমার চক্ষু—সবার শ্রুতি আমার শ্রুতি—সবার হাত আমার হাত—সবার মন আমার মন! আমি মৃত্যুকে গ্রাস করেছি—সমস্ত ভেদ শোষণ করে নিয়েছি!—আহা কি মধুর, কি তেজস্বর্ণ, কি শিখর আনন্দ এই মরণের! ত ত ত।



## কর্ম, যোগ ও ভক্তি

ইতিপূর্বে বলিয়াছিলাম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ইহাদের ফল বিচার করিয়া সাধন-জগতে ইহাদের আপেক্ষিক স্থান নিরূপণ করিবার একটা চেষ্টা অনেকস্থলেই দেখা যায়। এই চেষ্টার স্বরূপ ও সার্থকতা বিচার করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে পূর্বের একটা কথা মনে রাখা ভাল, সাধনজগতে অধিকার-ভেদ সর্বত্র; সুতরাং নিরপেক্ষভাবে কোনও পন্থার উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করার চেষ্টা বুণা। পূর্বের এ কথা বলিয়াছি, আবারও এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, কেন না সাম্প্রদায়িক সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বটি সহজেই আমা-দের মন হইতে উন্নিয় যায়।

কর্মপন্থার ফল স্বর্গ। স্বর্গ বলিতে কি বুঝিব, মীমাংসকেরা তাহার একটা মোটামুটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, স্বর্গ অমৃতত্ব এবং বিচার ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, উহা প্রলয়পর্যন্ত স্থায়ী। প্রলয়ান্তে আবার নূতন সৃষ্টির উদ্বোধনে পুনর্ব্বার দুঃখালয় ও অশান্ত এই মর্ত্যলোকের ফিরিয়া আসা অনিবার্য। উপনিষদও বলিতেছেন, কর্ম দ্বারা যে লোক পাওয়া যায়, তাহার ক্ষয় আছে, কেননা, তাহার মূল নিদান কর্মই যে, ক্ষয়িষ্ণু। অনিত্য দ্বারা নিত্যবস্তুকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানী বলিবেন, কর্মের মূল অজ্ঞান, সুতরাং উহা উত্তরোত্তর বন্ধনেরই কারণ হইবে; চাই জ্ঞান—উহাই মোক্ষ; অজ্ঞান হইতে উহা মিলিতে পারে না। যোগী বলিবেন, অবिवেক ভিন্ন কর্ম হইতে পারে না;

সুতরাং কর্ম বলিতে তাহার সংস্কার থাকিয়া যাইবে; সমস্ত কর্মের যুগপৎ পরিপাকও সম্ভবপর নয়, সুতরাং ক্রমান্বয়ে সাধিত কর্ম হইতে পুনঃ পুনঃ জাতি, আয়ু ও ভোগের বিধান হইতেই থাকবে; চতুর্থে স্পষ্টতঃও অনিবার্য, কেননা নির্দোষ কর্ম অসম্ভব। অতএব কর্ম হতে কৈবল্য অসম্ভব। ভক্ত বলিবেন, কর্মের মূলে কামনা, সে তো আত্ম-সুখলাভেরই নামান্তর; আমি যাহাকে ভাগবাস, তাহার সুখেই সুখী; ফলাভাসীরা রাখিয়া কি পনের সুখসাধনে কৃতকার্য হওয়া যায়? কাজেই কর্ম আমার পন্থা নয়, কর্ম-লভ্য ফলকেও আমি একটুখুঁই বড় লাভ মনে কর না।

এই সমস্ত যুক্তিতে কর্মপন্থার অপকণ সহজেই প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক শুধু প্রকৃতির সহজাত প্রেরণার অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া আত্মমানবশতঃ ফল কামনা পূর্ব্বক আমরা যদি কর্ম করি, তাহা হইলে সংসারচক্র হইতে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায়ই থাকে না। এরূপ কর্মই তো সকলে করিতেছে। মূলে এই ভাব বজায় রাখিয়া কর্মে যত আড়ম্বরই করি না কেন, তাহা বন্ধনের কারণ তো হইবেই। সুতরাং কর্মপন্থা যে দুষ্ট, ইহা অযৌক্তিক নহে।

অথচ প্রশ্ন হয়, কর্ম যদি অশেষ দোষ-দুষ্ট হইল, তাহা হইলে ইহার সার্থকতা কোথায়? বিশ্বের বনিয়াদই এই কর্ম দিয়া গড়া হইল কেন? মুক্তির যত বড় পাত-

নামাই করি না কেন, তাঁরাও গোড়াতেই এই বন্ধনের বাবস্থা কেন? সমস্ত জগদ্ব্যাপার টাকে যদি একটা অগণিত সত্যরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে কর্ম দোষের আঁকন হইলেও তো তাহাকে যেখানে একটা স্থান দিতে হয়। আর এক কথা। কর্ম ও অকর্ম স্বভাবিকরূপেই আমাদের বুদ্ধির কথা। কিন্তু ঐশ্বরিকবিশ্বানে স্বভাবিকরূপের স্থান হইতে পারে না—কেননা সমস্ত নিবোধের সামঞ্জস্য-রূপেই তাঁহার অধিষ্ঠান। আমরা বুদ্ধির গুণত্ব দ্বারা যেখানে বিচ্ছেদ দেখি, বাস্তবিক সেখানে রত্নিয়াছে একটা একটানা পরিণতি। আলো হইতে অঁধার, জন্ম হইতে মৃত্যু, সৃষ্টি হইতে প্রলয়, কর্ম হইতে অকর্ম—সমস্তই একটা সংহতি ও পরিণতির প্রায়শ্চিত্ত। “সুতরাং ইচ্ছাধর্মের মাঝে বিবোধ কোথায়?”

এই বিচারে আমরা কর্মকে ভাগ করিতে পারি না—তবে তাঁহার রূপান্তর ঘটাইতে পারি। মোক্ষপন্থীরা সকলেই তাহা করিয়াছেন; জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত কেহই কর্ম বর্জন করিতে পারেন নাই, করা সম্ভবপরও হয় নাই। তবে বিরূপ কর্মের তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন; ইহা কর্মদর্শনের পক্ষেও বিরুদ্ধ ন্যাপায় হয় নাই, কেন না কর্মসম্বন্ধে স্বাভাব্য ও বৈচিত্র্য আছেই, ইহাও ‘কর্মের কর্ম’। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ-বুদ্ধিকে অপ্রবুদ্ধি, অজ্ঞানতার আলম্পনারায় ব্যক্তির সম্যক গ্রহণ করিতে না পারিয়া। একেবারে কর্মভ্যাগের ফতোয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে এবং জড়ভূত ধর্ম, ইহা প্রচার করিয়া নিজের ও দেশের সর্বনাশ করিতেছে। আমরা জানি,

কর্ম সাধকের সাধন সহায়, সিদ্ধের বিলাস। জ্ঞানপন্থী অজ্ঞান নিবসনে, যোগপন্থী অভ্যাসের সাধনায়, ভক্তিপন্থিক সেবাব্রতের উদ্বোধনে সর্বত্রই কর্মের সহায়তা গ্রহণ করিতেছেন। আর সিদ্ধের তো কথাই নাই। অবশ্য ভগবানের চেয়ে বড় সিদ্ধ বা মুক্ত কেহ সম্ভবতঃ নাই। তিনিই শ্রীমুখে বলিতেছেন “শিনলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই, তবুও আমি কর্ম খইয়াই আছি। আমি যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে এরা উচ্ছন্ন যাইবে।” বাস্তবিক ভগবানের কর্মই তো এই বিরাট সংসার—এই বিচিত্র লীলা।

এই বিচারে ইচ্ছাই প্রতিপন্ন হয়, যদি কোনও ফলকে লক্ষ্য করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিকই অপকৃষ্ট। সকাম কর্ম ফলদৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, অকাম ভক্তি-সাধকের পক্ষে তাহা হয়। কিন্তু নিকাম কর্মের কোনও ফল না থাকায়, তাহা বিশেষ-ধর্মেরই তৃপ্তির নিদান, কেননা উহা তাঁহারই আনন্দের ব্যঞ্জনা। সুতরাং এই দিক দিয়া নিকামকর্ম বা সেবা ভক্তির তো বিরোধীই নহে, বরং উচ্চ হাজার গাণ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে কর্মের পরেই জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ নিরূপণ করা উচিত। কিন্তু বিষয়ের সাধারণত্ব হেতু আমরা তাঁহার পূর্বে যোগের সহিত ভক্তির ক্রি সম্পর্ক, তাহাও আলোচনা করিব। শাস্ত্রাদিতে বহুস্থলে যোগকেও কর্ম বলিয়া ধরা হইয়াছে। এমন কি কর্মপন্থা বলিতে যোগপন্থা বুঝায়, ইহাও বহুস্থলে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য আছে। বাস্তবিক যোগ আস্তর কর্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। সাধন বলিতে একমাত্র যোগ ও তত্ত্বকেই বুঝায়; উভয়েই

কর্মপথ। একটা অস্বর্জন, অপবিত্রা বহির্জন। কিন্তু উভয়ই নৈমিত্তিক উপকরণ। পক্ষেই ইত্যাদি কর্মপন্থা বর্তমান। এই পন্থার সাহায্যে ঔপনিষদ জ্ঞান বা ভক্তির পন্থার 'পান্দ' সুস্পষ্ট। যোগ বা তন্ত্রে যেমন একটা বৈশাখ্য পথ ধরিয়া একটা নিশ্চিত লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হইবার জন্য নীতিমত কোডোড সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, ঔপনিষদ জ্ঞান বা ভক্তিতে সেক্ষেপ কোনও প্রকৃতি সাধন পন্থা নাই। অবশ্য সমস্ত সাধনপন্থাতেই স্বকৃপার অপেক্ষা আছে, কিন্তু তথাপি এই দুইটা পন্থাতে কৃপার উপর যতখানি নির্ভর করিতে হয়—সহজভাবে অনায়াসে সাধনভিমান বিনর্জিত হইয়া অস্বর্জনের আশ্রয় অগ্রসর হইতে হয়, অপন চত্বিত্ত সেক্ষেপ গা ভাষান দিয়া নিশ্চিত হইয়া চলিবার উপায় নাই। এই জন্য যোগেরও সাধনাপেক্ষা আছে বলিয়া তন্ত্রের জায় উচ্চ ও শাস্ত্রাভিত্তিক কর্ম বলিয়া কীর্তন হইয়াছে। “যোগঃ কর্ম স্মারকশালম্”

যোগের ফল আত্মদর্শন। নামাস্তর কৈবল্য। উচ্চ উপায় বিবেক, বুদ্ধিনিবেদন। আত্মা সচ্চিদানন্দ-বদনস্বরূপ। সামান্ত্রিক্যঃ আমিত্য সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের অন্তর্ভুক্তি সকলোই আছে। আমিত্যের লোপ কেহ করিতে চাহে—সে এখন যেমন আমিত্য হইতে না কেন। অস্বর্জনের অভাবও, কোথায়ও হয় না—স্বপ্তপ্তরও জ্ঞান হয়। নিজের প্রতি সকলের প্রীতি অবিসম্বাদী। স্মরণঃ আস্তি, ভাতি, প্রীতি এই তিনটা ভাব সর্বাবগাহী। নিজকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই পাই; বস্তুসত্তা আমার সত্তার অপেক্ষা রাখে, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত বস্তুর মূলতত্ত্বও ইহাই নিরূপিত হইবে।

ভাষা হইলে আস্তি, ভাতি ও প্রীতি, অর্থনা সং. চৈত, আনন্দ—ইহাই পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্ব যেন স্বর্য়াকরণের মত নিরনৌকৃত হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে—এই প্রকার অস্বর্জিতও জ্ঞান। কিন্তু স্বর্য়াকরণ যেমন এক জায়গায় বস্তুত হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহা চাইতেই ক্রিয়মালা বিসর্পিত হইয়াছে, সেটরূপ সচ্চিদানন্দের বস্তুত অস্বর্জিত পরমতত্ত্ব। শুধু তত্ত্ব বিশ্লেষণ কারণেই সমগ্র জগতের একটা ব্যাখ্যা হয় ন। বিশিষ্ট তত্ত্ব কারণে সংশ্লিষ্ট হইয়া লোক-পন্থাভাগের নিমিত্তীভূত হইল, ইহাও দর্শন করা প্রয়োজন। একই স্বর্য়াকরণ সমস্ত জায়গায় সমভাবে ছড়াইয়া গেলেও শিশিরবিন্দুতে পাড়িয়া অকৃৎসিক্রিতে থাকে, আলো যেন জমাট বাঁধিয়া সমস্তের মাঝে বাষ্টির স্ফুটন করে। ইহাই আত্মার বিশেষত্ব। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত বৌদ্ধিক। বুদ্ধিতে চাইলে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য আপনাই, আধার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জমাট বাঁধিয়া যান। এত বোকমস্তেই বা ব্যস্তিফুরণে-ছাই আত্মশক্তি। আত্মা সর্বত্র আপনার উপযোগী দেহ গাড়িয়া লইতেছেন, চন্দ্রিয় গাড়তেছেন, মন-বুদ্ধির স্ফুটন কারণেছেন। দেহ-মন-বুদ্ধি বিকার; যাহারা অবৈবেকী, তাহারা মনে করে এই বিকারের খাঁচায় আত্মা বন্দী হইয়া ইহাদের মতই মরিয়া মরিয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে। তাহা পাশ্চাত্য ধর্মদর্শন দার্শনিকেরা পণ্ডিত মনে করেন, প্রাকৃত সংহতিই আত্মতত্ত্ব। কিন্তু যোগী বলেন, দেহের দিক দিয়া দেখিতেছ কেন, বিপরীত দিক হইতে দেখ। দেহের প্রয়োজনে আত্মা অধিষ্ঠান, তানয়; আত্মার প্রয়োজনে দেহের

উদ্ভব। তুমি বল, কথটা 'বুঝিতে পারিতেছি না'; তোমার এষ্ট আত্মা বস্তুটা কি? যোগী বলেন, বুঝিতে হইলে দেহ, প্রাণ, মন ইত্যাদির তরঙ্গ রোধ করিয়া দাও—কেবল হইয়া যাও, একা হইয়া যাও, আত্মস্বরূপ বস্তুতে পারবে। বৃত্তিতরঙ্গ স্বাভাবিক; একা হইতে গেলেই তাহার নিরোধ আবশ্যক। হাত আত্মদর্শনের পক্ষে পিন্ধক, বৈরাগ্য অপারগাধ্য। সমস্ত স্পন্দন রোধ করিয়া স্থির হইতে হইবে, ইহাট যোগীর লক্ষ্য। জগতের স্পন্দন রোধ করিতে পার না, কাজেই আমার স্পন্দনই রোধ করে; এষ্ট নিশ্চেষ্ট হো ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। এষ্ট ভাবিয়া যোগী ক্রমে ভিতরের দিকে চুকিয়া গেলেন। মোটামুটি যোগপন্থায় ইহাট সাধন ও ফল।

ভক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? যোগে দেখিতেছি, নিরোধ দ্বারা 'একটা দিক চাপিয়া যাওয়া' হইয়াছে। ইহাতেও সত্যের সব দিক ধরা হইল না। বুদ্ধিগাম আত্মা জমাট হইয়া লোকসৃষ্টির পরন করিলেন। লোকে লোকে, জীবে জীবে আত্মতত্ত্বের দিক দিয়া মাজাতোর ক্ষুরণ। কিন্তু লোক সৃষ্টি হইলেও সম্বন্ধতত্ত্বের আত্মদান তো ইহাতে পাইলাম না। এষ্ট জীবে জীবে লোকে লোকে আকর্ষণ কিসের? প্রেম, শ্রীতি, মমতা—এগুলি কোথা হইতে আসে? জ্ঞান দার্শনিক চিক্কেলের (Hickel) মত বলব কি. ভালবাসা আর কিছুই নয়—দুইটা কোষের সম্মেলক সাক্ষাত্য মাত্র (Affinity between two cells)? তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, একটা কোষ আর একটাকে চায় কেন? সাক্ষাত্য নিরূপণ এক কথা, আর মাধুর্যের আত্মদান আর এক

কথা। 'এক দিক দিয়া বিবেক-দর্শনের নিকট কোনও জ্ঞান পাতবার উপায় নাই।'

ভাস্কর দর্শন অনুভূতের এষ্ট নূনতা পূর্ণ করিয়াছে। ভক্ত বলিলেন, শুধু সাক্ষাত্য নিরূপণ করিলেও হইল না—নিগ্রহও যে সম্ভব। আর নিগ্রহ কি? ভাবের ব্যঞ্জনা, প্রেম শ্রীতি আনন্দের প্রস্রবণ। উহা আছে, উচ্চা ক্ষুণ্ণ, উচ্চা আনন্দময়। অতএব জগতের মন্যসত্তা শুধু সংসার ঘটাওয়া আনন্দত ইন নাহ, সেই সংসারকে রূপ দিয়া এবং রূপে রূপে আকর্ষণ দিয়া শ্রীতিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে আমি বল সম্ভদানন্দবন-নিগ্রহ। তোমার আমিত্বকে অতিপ্রায় বল; আর বল, আমিহকে কেহ বিনষ্ট হোগতে চায় না। এষ্ট আমিহ যদি বিশেষণের আনন্দ হয়, তাহা হইলে কথটা খাটা। তবে ব্যবচারণাত্মকে অটুট ভাবে ধরনা না থাকিলে এই তত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রৎ থাকে না। কিন্তু সহজ জীবনে দেখিতেছি, লোকে পনের জগৎ আপনাকে পীড়িত করিয়া, আত্মবিসর্জন দিয়া, নিজকে মুছিয়া ফেলিয়া কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ পায়। আমরা তাহাকে 'বলি ভালবাসা। শুধু অহং-এর ভীত অনুভূতিতে সে আনন্দ কোথায়? জানি, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তুমি বলিলে, বিসর্জনের ক্রিতর দিয়াই বৃহৎ আমি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমি তো সে লাভ খতাইয়া আপনাকে বিসর্জন করিতে যাই নাই। কিসের আকুলতায় অতিপ্রায় দেহ-মন প্রাণ সব বিগাইয়া দিই? এই মহাসত্যের একটা স্থান তো চমম অনুভূতিতে থাকা চাই। তাই বলি, শুধু সংহতির নিদান খুঁজিলে হইবে না, আত্ম-

বিসর্জনের নিদানও খুঁজিতে হইবে। তাহেই না তোমার দর্শন পূর্ণ হইবে।

• ফল হিসাবে এখানে আমরা ভক্তের মনের উৎকর্ষ বা পূর্ণতা দেখিতে পাচ্ছি। যোগী যাহা চাড়িয়া গিয়াছিলেন, ভক্ত আবার তাহা কুড়াইয়া আনিয়া প্রাক্তর সূত্রে মাল্য গাঁথিয়াছেন। কিন্তু এটখানেক সতর্ক হইতে হইবে। সব জুটাইতে গিয়া আবার সংসার মাজাইয়া না বসি। আজকাল আমাদের ঠিক এট বিপদ হইয়াছে। সংশ্লেষণস্থী বলিয়া ভক্তির নজীবে সংসারকেই পাকা করিবার জন্য আমরা বিমমত চেষ্টা করিতেছি। ভক্তের সংসার মায়িক সংসার নয়, উচ্চ চিন্ময়ের আনন্দ নিকেতন, ভাবরাজ্যে তিনি সংসারী। এট দেখ, এই রূপ নিয়া বিলাস নয়—চিন্ময়দেহ, চিন্ময়রূপ চাই। তাই দেখিতেছি, আত্ম-চৈতন্যকে বিবিক্ত করিবার প্রয়োজন আছে, হইবে।

বিবেক বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে। গোরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্বে শঙ্করের অবতার প্রয়োজন ছিল। এই হিসাবে চিন্ময়ভাব দ্বারা অন্তপ্রাপ্তি হইবার জন্য আত্মবীকরণ অবধারণ উদ্দেশ্যে বিবেকের প্রয়োজন ভক্তিসাধকেরও আছে। প্রাক্তর জনের বিবেক-বৈরাগ্যহীন ভক্তি ভগামী মাত্র।

যতক্ষণ পর্যন্ত সাধনাপেক্ষা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্ত সাধনাতেও কর্ম ও যোগের স্থান রাখিবে হইবে। তখন ফলের তারতম্য স্বরণ কারিয়া বিজ্ঞের মত নাসিকাকূক্ষণ করিলে চলিবে না—কেননা ফল সম্বন্ধে আমরা সকলেই অনভিজ্ঞ, সুতরাং আমাদের পক্ষে সে নজীর আনিয়া বিচার করা মূর্থতা মাত্র—এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অতঃপর জ্ঞানের সচিৎ ভক্তির সম্পর্ক নিরূপণ করিতে হইবে।

## শিক্ষা-সংস্কার

মানুষ বড়ই করে বলে, নিজের চোখে না দেখলে সে কিছুই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু রহস্য এই, জগতের বারো আনা কাজই বোধ হয় কেবল পরের কাছে শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করে চলছে—ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা তা বিবেচনা করবার দরুণ মাথা ঘামাতে বড় কেউ রাজী নয়। শিক্ষা-সম্বন্ধে এমনিধারা সংস্কারাক্রান্তার প্রাবল্য কতখানি, সেই সম্বন্ধেই একটু দিগদর্শন করাতে চাই।

শিক্ষাকে খুব ব্যাপক অর্থে নিলে তাকে অপরিশুদ্ধ জীবনের উৎকর্ষসাধন বলতে পারি। দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা—এই নিয়েই তো জীবন। শিক্ষার ফলে এরা পরস্পরের অবিরোধে সুসমঞ্জসভাবে কাজ করুক, এই আমরা চাই। এখন দেখা যাক, তার দরুণ আমরা কি ব্যবস্থা করেছি।

প্রথমতঃ দেহের কথাই ধরা যাক। খুব স্থূলভাবে দেখতে গেলেও বলতে পারা যায়,



দেহের পোষণ ও ক্ষয় নিবারণ দৈনিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্য মানুষকে বড় বিশেষ কিছু করতে হয় না—প্রকৃতি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সুখার তাড়না দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তার ভাগিদে সৈদিকিকার শিক্ষাটা আমবা বেপরোয়া ভাবেই অধ্যয়ন করে নিচ। অসুখঃ আমাদের মনে হয়, ভদ্রসমাজের মাঝে যদি কাংশ স্থলেই ক্ষিদে পেলেই এবং অনেক সময় না পেলেও খাওয়া—এই হচ্ছে দৈনিক উৎকর্ষের সব চেয়ে সরস উপায়। আহার সম্বন্ধে অল্প কিছু ভাববার বিষয় যে আছে, সে ধারণাই অনেক বাপ-মায়ের নাই। আহার সংযম, পূর্ক, তিথি, ইত্যাদিতে বাছনিচর করা ইত্যাকার সেকলে কুসংস্কারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; আজকাল ডাক্তারী মতে যে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে নানা নজর ও পুস্তিকা প্রচারিত হচ্ছে, তাও শুধু সাময়িক কৌতূহল উদ্বীপন করা ছাড়া আমাদের আন কোনও কাজে লাগে না। তবে ইদানীস্থ উপবাসের ফলে, বোধ হয় রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হচ্ছে।

‘এনাজী’ বাড়ার জন্য আমিষাচার প্রয়োজন, না সাম্বিকতা বৃদ্ধির জন্য নিরামিষ আহার প্রয়োজন, সে তর্ক না হয় থাক। আহার সম্বন্ধে একটা বৈষম্যের কথাই আজ ঠিকিতে জানাব। বোধ হয়, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাতেই স্বীকার করবেন, শিশুর পাকস্থলী আর বয়স্কের পাকস্থলী সমান শক্তিসম্পন্ন নয়। আহাের দরুণ যে গুণের ক্রিয়া হয়, ডাক্তারী হিসাবে বলা যেতে পারে, উভয়ের পক্ষে তা সমান ফল প্রসব করতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে বাবা যখন ছেলেকে পাতের কাছে নিয়ে খেতে বসে তুল্যপরিমাণে—এমন কি

আদর্শ বাণবার দরুণ মাত্রা ছাড়িয়েও—মাছ, মাংস, ডিম, পোঁদা, ঝাল, লবণ ইত্যাদি গেলাতে থাকেন, তখন কি সেটা বাপ-মায়ের কর্তব্য পালন করা হয়? খুব নীচু জাতের মাঝে দেখেছি, বাবা হুঁকোয় হুঁদশ টান দিয়ে সেটা ছেলের দিকে আগিয়ে দেয়, ছেলেও পিতৃভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ বিমিত্র ভাবে দম লাগায়। ভদ্রলোকেরা এট পিসদৃশ ব্যাপার দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, ছেলের বাপকে আশঙ্কিত করবে বলে গাল দেন, তাও জানি। কিন্তু ওঁর ব্যবহারে আচরণের সঙ্গে তাঁদের আচরণে মূলতঃ পার্থক্য কোথায়, সেটা জানতে ইচ্ছা করে। আহার সংযম বড়দের না ও প্রয়োজন হতে পারে, কেননা তারা শক্তিসম্পন্ন; (বাস্তবিক তাই কি?) ; কিন্তু কচি ছেলে-মেয়েও সংযম প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করা চলে কি?

দেহের উৎকর্ষের দরুণ দৈনিক পরিশ্রম প্রয়োজন—এ নীতিবাক্য আমরা সবাই জানি। ইস্কুল-কলেজে জিমনেসিয়াম আখড়ার অভাব নাই, তাও দেখেছি। কিন্তু পরিশ্রম যে ভদ্রলোকের ইচ্ছিত নষ্ট করে না, এ কথা কি আমাদের মাথায় ঢুকেছে? মুখ দিয়েছেন, যিনি আহাের দেবেন তিনি—খুব নির্ভরশীলের কথা। কিন্তু আহাের প্রাসটি ভগবান একেবারে মুখের কাছে এনে তুলে ধরলেও বোধ হয় একটু কষ্টস্বীকার পূর্কক হাঁ করে সেটা গিলতে হয়। এতে প্রমাণ হয়, নিছক বেঁচে থাকবার জন্যও পরিশ্রম দরকার। সমাজের শ্রমবিভাগ হয়ে সে পরিশ্রমটা যদি হাতে ও মাথায় ভাগাভাগি হয়ে যায়, অর্থাৎ হাতে খাটে তো মাথা খাটে না, মাথা খাটে তো হাত খাটে না, এমনি হয়, তাহলে

সেটাকে কখনও স্বাস্থ্যকর বলা চলে না। বর্তমান সমাজে অর্থাৎ সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এটো শ্রমবিভাগ হয়ে আসছে দেখছি। কিন্তু তাতে অশান্তি বাড়ছে বই কমছে না। ভারত-সম্রাটের মস্তিষ্ক করে এসেও চাণক্য তাঁর ক্ষুদ্র কুটারের গৃহস্থালীর কাজ নিজ হাতে করতেন, এ চিত্রের মাঝে একটা মহিমা ও কলাগণক্টি রয়েছে। ঘরে ভাত থাকলেই তাকিয়া ঠেস দিয়ে থাকতে হবে, এমন ভাসিনিক বিন্যাস ধনীর সেবা টংরেজদেরও নয়। তাঁরা খেতেও পারে যেমন, আবার তেমনি অন্ততঃ নেচে-কুঁদেও সেটা হজম করতে পারে। আর আমরা বিলাসিতা হচ্ছে—অরুচির আহার, অজীর্ণ, আলোড়গার ও ইন্ডিসের তাড়না।

ইকনমিস্টের দিক থেকে খেতে খাওয়ার নীতিটা সর্বত্র বাহাল হওয়া সম্ভব না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এটাকে আমরা অপরিহার্য মনে করি। এই ধরিত্রীকে সুজলা-সুফলা করতে পরিশ্রমের দরকার হচ্ছে। সমষ্টিভাবে ভাবতে গেলে সে পরিশ্রমের গোরব আছে, তাতে মনুষ্যত্বের পরিচয় মেলে। এই গোববময় কর্মভার হতে শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা কেন? কেন আমাদের মাঝে এই বিসদৃশ ধারণার সৃষ্টি হয় যে লেখাপড়া শিখতে পারলে আর হাতে পায়ে খাটতে হবে না? গরীব চাষী কেন এষ্ট সর্ব্বনেশে ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলেটাকে জাত ব্যবসা ছাড়িয়ে লম্বা কৌচা ঝুলিয়ে ইকুলে পাঠায়? আমরা যে শ্রমবিমুখ শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ করছি, তার এই বিপরীত পরিণাম দেখে কি নিজেদের অকর্মণ্যতার নন্দন লজ্জায় মগ্ন হইত হয় না?

যেমনে দেখে স্বভাবতঃই শক্তির ক্ষুধি

হয়। আমাদের দেশে ছেলেদের সে সময়টো কাটে ঘরের কোণে কেতাব নিয়ে মুখ গুজড়ে বসে। ছেলেদের মাঝে যারা একটু মিলিটারী মেজাজের, তারা স্পোর্টের দিকে হয়ত ঝুকে পড়ে। অঙ্গচালনায় দৌড় আমাদের ঐ পর্য্যাপ্ত। জ্ঞান আবার দেখি, খেলার মাঠে জীড়নেন শতগুণ দর্শক—দেখাটাই তাদের অভি্যাস। শিক্ষাজীবন পাব হয়ে গেলে হয়ত এইটুকুও অনেকের থাকে না। একটা জাতির শক্তি-সংগঠন হিসাবে এইটুকু চর্চা নিতান্তই নৈরাশ্র-কব। তা ছাড়া স্পোর্টের চর্চাতে যে বায়বাহুল্য ও চিত্তচাকল্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বর্তমান নিঃস্বপ্ন ও শক্তিহীন সমাজের পক্ষে এমনিতর রাজোচিত ব্যয়ন খাতসহ হবে কি না, সেটাও বিবেচ্য। আমাদের আসল ক্ষোভ এই জায়গায় যে, যে শক্তির চর্চা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে উপযোগী, সমাজের উদগতির কারণ, তার সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চারিত না করে শুধু অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শে স্বেচ্ছাসী গোষণের লোভ আমাদের হয় কেন? নিতান্ত দুর্বলকায়, আলস্তপরায়ণ, পরমুখাপেক্ষী জাতির পক্ষে শ্রমবিমুখীনতা বা জীবনসমস্তার সমাধানশূন্য ব্যসনচর্চাই কি সমধিক উপযোগী? সেবা-বৃত্তির উন্মেষ আঙ্গকালকার ছাত্রসমাজে দেখা যায়। কিন্তু এটুকু অধিকাংশই শুধু বাইরের চেষ্টায়; শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন ও সাহায্য তার মাঝে কতটুকু?

তার পর আবার একটা কথা আছে শক্তিরক্ষা। সে সম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বাস্থ্যপরীক্ষার কমিশন বসে ছেলেদের দাঁত

দেখা হল, জিহ্বা পরীক্ষা করা হল, চোখের

পাঠা উটান হল—মস্ত বড় একটা তালিকাও হয়ে গেল। খুব ভাল কথা। হিব হল বারো আনা ছেলেরই স্বাস্থ্য খারাপ। নিশ্চয়ই ভয়ের কথা। কিন্তু তেতু কি, তা নিরূপিত হয়েছে? দোষটা গড়াইছে খাওয়া-দাওয়ার কুব্যবস্থা, ব্যায়ামের অভাব, ছোট চরফের বই তৈরাদিব ওপর। এরা সহকারী এটে, কিন্তু আসল অপরাধী যে, তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছেন না, বই ছাড়া আরও দোখ বুঝে অছেন। আপন ঘরের পলক সবারই জানা আছে, আর সব ঘরেই যে একই ভাল, তাও কিছু অজানা নাট। কিন্তু তবু কেউ তাতে হাঁড়ি ভাঙছে না। গলদ কোথানে; তার পলক চরিত্র কবিরাজমশায়েরা কিছু জানেন; আমরাও দিনের পর দিন তার করণ কাহিনী শুনিছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে খোলাখুলি দুটো কথা বলবার ব্যবস্থা বিভাগেই হবার কি যো আছে, না তেমন একখানা বই টেক্সটবুক-আউন্ডে ঢোকবার যো আছে? অমনি অশ্লীলতার দায়ে বাঁধা পড়তে হবে! এমন সভ্যতার মালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছা হয়।

দৈনিক উন্নতি তো এই পর্য্যন্ত, তার পর এলো মানসিক উন্নতি। সেখানেও দেখি, সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, সর্বদা পনের অমুকরণ, আর সে অমুকরণ অপর জাত সেটা হয়ত পঞ্চাশ বছর আগে ছেড়ে এসেছে, তারই। প্রথমতঃ দেখছি, যা জীবনে কোনও দিন কাজে আসবে না, এমন কত গল্প বাজে বিষয় ছেলেদের পড়ান হচ্ছে। কোনও জায়গায় হয়ত কানের স্ক্রিনিংটাকেও মিথ্যা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এমনভাবে শেখানো হচ্ছে, যাতে সেটা অকস্মাৎ হয়ে যাচ্ছে। নিজের

মেশো সেটা ভাল ছিল, সেটাকে ছেড়ে পনের ভালোর অমুকরণ করতে গিয়েই আজ জাতও যাচ্ছে, পেটও ভরছে না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, অতশিক্ষা। বিজ্ঞাটা খুব বড়, অতি দরকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তারও এক অঙ্গ শুধু বিজ্ঞা হিসাবেই অমূল্যলনযোগ্য, কতক অংশ মাত্র ফলিত। আজ তালু যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে এই ফলিত অংশ-টুকুকে ছোট্টে বিশুদ্ধ বিজ্ঞার অংশটুকু অথবা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠশালার শুভঙ্কর নির্ধারিত হয়েছেন, তাঁর জায়গায় Todhunter, Hall & Stevens এঁরা আসার জমিয়ে তুলছেন। এঁরা অনেক নতুন জ্ঞান দিতে পারেন স্বীকার করি, কিন্তু সে জ্ঞান যদি আমায় কাজে না এল, তাহলে তার দরুন সময় ব্যয় করে লাভ? অবশ্য শুভঙ্করের মাঝেও যে বাহুল্য নাই, তা বলছি না, আমাদের মতে তারও সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ এই যে নিত্যকার জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত উপযোগী। বর্তমান ব্যবস্থায় ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত অঙ্ক কষে এর পর আর তার বিন্দুমাত্র অমূল্যলন না করেও বিজ্ঞা-ধুরন্ধর হওয়া চলে। তাই যদি হয়, তাহলে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত বা অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে কি লাভ হয়? যদি এর পরে অঙ্কশাস্ত্রেরই আলোচনা করতে কার ইচ্ছা যায়, তাহলে ওই বকেয়া বিজ্ঞাটুকু আয়ত্ত করতে তার তো বেশী বেগ পেতে হবে না। অঙ্কটা নির্ভর করে theoryর ওপর; মাথা একটু পাকলে সেগুলি আয়ত্ত করতে বেগও পেতে হয় না, আমোদও লাগে। অথচ কচি মাথার কঠিন

কসরত করিতে গিয়ে অধিকাংশ ছেলের পক্ষেই অঙ্কে বিতীষিকা করে তোলা হয়। ঘরকরা কর্তে ক'জনার Complex Fraction, Surd আর Simultaneous Equation-এর দরকার হয়? বিত্তা হিসাবে এগুলো চর্চা করবার অবসর পরে খুব মিলতে পারত। অথচ ছোটদের পক্ষে এই সমস্ত বোঝা হাক্কাকবলে তারা আরও দুটো কাজের কথা শিখতে পারত।

ভূগোলের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশের জেলাগুলোর বিশিষ্ট খবর, এমন কি তার অবস্থান পর্যন্ত অনেক ছেলের জানা নাট, অথচ মাডাগাস্কার আর কামস্কাট্‌কায় কয়টা নদী আছে, সে কথা তারা মুগ্ধ রাখতে বাধ্য। হয়ত এতে জ্ঞানের প্রসার হয়, চিত্র মার্জিত হয়, কোতুহল উদ্দীপ্ত হয়।—আমরা বলি, সব বাজে কথা। ভূগোলকে একেবারে বিচিত্রাধরিনীর ছবি রূপে ফুটিয়ে তুলেছে ওদেশের লোকেরা; যেমনি এই লিখেছে, ছবি একেছে, প্লান করেছে; তাদের ছেলেরা শেখে, আমোদ পায়, অথচ জানতেও পারে না যে এতখানি শিখেছে। আর আমরা তাদের পাঠ্যতালিকার সঙ্গে আমাদের পাঠ্যতালিকার মিল রেখে যা পড়চ্ছি, তাতে ভূগোল নাম শুনে ছেলের গায়ে জ্বর আসে। এ পর্যন্ত এণ্টা দেশের সর্বোচ্চমানের একখানা ভূগোল-বৃত্তান্ত বাংলায় বেরিয়েছে? ভূগোলপাঠ নামে যে বইগুলি ছেলেদের পাঠ্য, তার এমন বিচিত্র ছাপা, এমন বিচিত্র ছবি, যে অক্ষর-গুলো যেন পিঁপড়ের সার হয়ে ছেলেদের চোখ কামড়ে ধরে—বেচারীরা পড়বে কখন?

ইতিহাসেরও এই দুর্দশা। নীচের দিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য। কিন্তু সেখানে ভারতবর্ষকে চিত্রিত করা হয়েছে, মানুষ যেমন সিংহের ছবি আঁকত। বক্তারীর বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে আক্ষেপ করে বক্তিমচন্দ্র বলেছিলেন, সিংহ যদি মানুষের ছবি আঁকত, তাহলে বোধ হয় সেটা অগ্র রকম হত। শুধু এই ব্যাপার নয়, কত ব্যাপার সম্বন্ধেই আমরা অপূর্ণচিত্র ইতিহাসে আঁকা আছে। Marsden-এর ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে আর্থারদের উপাসনার আর দ্রাবিড়দের সর্পপূজার যে ছ'খানি নোংরা ছবি ছোটবেলায় দেখেছিলাম, তার ছাপ মন থেকে মুছে ফেলতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আর্থার বলতেই ওই চোয়াড়ের মত চেচারার মনে পড়ে যেত; আর যে দ্রাবিড় দেশ ভারতীয় সভ্যতার মিস্ত্রী আদর্শকে এখনো সজীবিত রেখেছে বলে গৌরব অনুভব করি, ওই সর্পপূজার ছবিখানায় সে গৌরববোধকে যে কতকাল কুণ্ঠিত করে রেখেছিল, তা বলবার নয়। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে মিতা নূতন তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে, অতীতের কত গৌরবময় অধ্যায় উদঘাটিত হচ্ছে,—ঠিক তার সঙ্গে সমানে ভাল রেখে আমাদের বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানো হয় কি? এট যে সেদিন মহেঞ্জোদারোতে ঐক অত্যাঙ্কত আবিষ্কৃত সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ওলট-পালট হয়ে যেত বসেছে—এর খবর আমাদের ছেলেরা পেয়েছে কি? আমাদের বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাসের লক্ষ্য প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসা—মাত্র সে সম্বন্ধে একখানা পুঁথি পর্যন্ত প্রবেশিকার পাঠ্য। এট মূল্যবান তথ্যটা ছেলেদের মনে মুদ্রিত করবার জন্য ইতিহাসে হিন্দুকে চিত্রিত করা হয়েছে অর্ধসত্যরূপে,

আর মুসলমানকে অত্যাচারীরূপে। এ যে মন্দ ব্যবস্থা তা কি বলবার যো আছে।

তার পর যে দেশের যে খাত, ইতিহাসে তাই ফুটে উঠবে। ইংলণ্ডের খণ্ড ইতিহাস আছে, আবার হান্স মর্সসত্যটি উদ্ঘাটিত করে গবেষণাও করা হয়েছে; কলেজে দুই-ই পড়তে হয়। কিন্তু হুঁচকানী ভারতমাতার মর্ষ কথা ব্যক্ত করবার কেউ নাই, কেউ করলেও সেটাই ইতিহাস নয় বা বিখ্যাতের পাঠ্য নয়। ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে গণ-প্রাধিকার কথা মনে জল্ জল্ হয়ে রয়েছে; ইতিহাসের সবগুলি ঘটনা ঐ তথ্যটিকে সুস্পষ্ট করবার জন্য সাজান হয়েছে। আর ভারত-বর্ষের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়ে মনে জেগেছিল, আলেক্সান্ডারের সময় হতে আরম্ভ করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা কেবল গুঁতো খেয়েই এসেছি; এতে যদি গৌরববোধ করবার থাকে করতে পার! আলেক্সান্ডারের শৌর্য্যকাহিনী মনে উজ্জ্বল হয়ে জাগে, কিন্তু তার অব্যবহিত পরে যে সেলুকসকে নাকানী-চুবানী খাইয়েছিলেন, সে কথা তো মনের মাঝে তেমন হয়ে বাজে না। যে দাক্ষিণাত্য প্রকৃত হিন্দুগৌরবের লীলাভূমি, আর্য্যবর্ষের সংঘর্ষের চিত্রের কাছে তার চিত্র নিতান্তই ফিকে! তার পর মনে পড়ে, পাঠান রাজ-বৈর বিস্তৃত বিবরণ শেষ করে এসে হুঁপুঠান এক অধ্যায়ে পড়েছিলাম—ক্রীষ্টচৈতন্য, নানক, রামানন্দের কথা। শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল সম্বন্ধে তেমনি হুঁচক ছাড়া, পরীক্ষায় প্রশ্ন হত—Write short notes on... তখন থেকে মনে হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে পাঠান, মোগল, তাতার, ইংরেজের ইতিহাস। তার

মাঝে হিন্দুর কথা, আর্য্যসভ্যতার কথা Short notesএর উপযোগী মাত্র। এই ধারণা নিয়ে হিন্দুধর্ম আলোচনা করতে হত। আজ পাঠান মোগলের শাসনকাহিনী কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, বুদ্ধ-শঙ্কর-গৌরান্দ-নানকের মহিমায় হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, দেশের সত্যকার ইতিহাস কোথায় তা জানতে পেরে জীবন সেটাই ইতিহাসিক সত্যের প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। ছোটবেলার এ ইতিহাস জানতে দিলে না কে? Greater Indiaয় যে গৌরবময় বিচিত্র কাহিনী দিনের পর দিন আনিষ্কৃত হচ্ছে, তার জ্ঞান থেকে ছেলেদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে কেন? গবেষণার বিষয় ইতিহাসের অন্তর্গত হতে পারে না, এই ভয়ে কি? কিন্তু অধুনা পাঠ্য ইতিহাসে 'কতটুকু সত্য, আর কতটুকু নিছক কল্পনা ও নির্জলা মিথ্যা কথা, তার হিসাব কি জানা নাট?

তার পর আর একটা কথা, ভাষা শিক্ষা। মনে পড়ে, ইস্কুলের পাঠ্য তালিকায় Second Language বলে একটা ঘর থাকত। কোন্ ভাষা সহজে আয়ত্ত হয়, সেটাই হিসাবে যদি তাদের খোঁজাখুঁজি নির্ণয় করতে হয়, তাহলে বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে অপ্রশিক্ষণীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে সংস্কৃত হত First Language, আর ইংরেজী হত Second Language। অন্ততঃ কোনও আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন বিদেশী হয়ত তাই মনে করত। কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃত হচ্ছে Second Language। সংস্কৃত শিক্ষা কঠিন—এ আর্নাড়ীর কথা; আমরা জানি, ইংরেজীর চেয়ে সংস্কৃত শেখা সোজা। না পড়ে শুধু শুনে মোটামুটি সংস্কৃতের অর্থ-বোধ ভারতবর্ষের যে কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু না পড়ে শুধু শুনে ইংরেজী

বোঝা যায় না। দেশীভাষার বার আনা প্রথম শব্দ মূলে সংস্কৃত; আর ইংরেজী একটা শব্দও মাতৃভাষার সঙ্গে মেলে না। তবুও ইংরেজী শেখা সহজ হয়, আর সংস্কৃত শেখা কঠিন। 8th Class থেকে 1st Class পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য, ব্যাকরণ, অমূল্যবাদ, অমূল্যলনী ইত্যাদিতে রোজ ৩ ঘণ্টা, তা ছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, মায়' সংস্কৃত পর্য্যন্ত—(কোনও কোনও কলেজে বাংলা পড়ানো হয় ইংরেজী ভাষায়, এ ও দেখেছি।) ইংরেজী ভাষায় শিখিয়েও কুলায় না। আর তার তুলনায় 5th Class থেকে এক ঘণ্টা করে সংস্কৃত পড়ানো হয়—তাও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে। তবুও বলতে হবে ইংরেজী সোজা, সংস্কৃত কঠিন। Herbert Spencer বলেন, বারো বছরের আগে ছেলেদের কোনও বিদেশী ভাষা শেখানোই উচিত নয়, তাতে মেধার হানি হয়। কিন্তু আমাদের ছেলেরা আর ছুদিন পরে বোধ হয় বর্ণপরিচয় পড়বার আগে Spelling Book নিয়ে বসবে।

অত্র ইউরোপীয় জাতির কথা ছুড়ে দিলাম, জাপানীরা Second Language হিসাবে ইংরেজী পড়ে; কোনও ইউরোপীয় জাতির চেয়ে ইংরেজী তাদের কাছে নিশ্চয়ই বেশী কঠিন, কেন না ভাষাটা নিঃসম্পর্কীয়। কিন্তু তবু তাদের চলে যায়, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে তারা আমাদের চেয়ে উন্নত। অথচ তাদের ইংরেজী শেখার বরাদ্দ সপ্তাহে ২ ঘণ্টা। আর আমাদের ছেলেদের Spelling Book চোঁটে নিয়ে মায়ের পেট থেকে পড়েও নিস্তার নাই। কাগজে পড়েছিলাম, একটা জাপানী ছেলে নাকি আমাদের দেশের কোনও মহামহো-

পাধ্যায়ের কাছে ভুল ইংরেজী বলেছিল। তিনি বলেন, তুমি শিক্ষিত ছেলে, ইংরেজীতে ভুল করলে? সে অমনি ছাতি ফুলিয়ে বলেছিল, "What do I care?" কিন্তু অমন 'ডোন্ট কেয়ার' কি আমাদের 'করবার সাধ্য আছে? তাহলে পিতৃপুরুষের শিঙলোপই বা হয়ে যায়!

ছেলের বটুকু হজম হবে, ততটুকু শিখতে দিতে হবে—এটা সার্বভৌম রীতি। সেই হিসাবে আগে বাংলা, তার পর সংস্কৃত, তার পর ইংরেজী, এই আমাদের ভাষা শিক্ষার ক্রম নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা একেবারে বিপরীত।

তার পর আর একটা ভাববার বিষয়, মৌলিক চিন্তার উন্মেষ। একটা স্বর্ণপেলে তার সম্বন্ধে আলোচনা করে একটা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা ইংরেজের স্বভাব; আর তার পেছনে ফেউ ধরা আমাদের স্বভাব। অথচ এই অতিমাত্রায় শাস্ত্রশাসিত দেশেও একটা বিষয় নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় যতখানি তন্ন তন্ন আলোচনা হয়েছে, তা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষার ফলে দিন দিন চিন্তা-শক্তি আমাদের লোপ পাচ্ছে, তার কাবণ কি? কেউ কি ভাবে না? ভাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই ভাবকে ব্যক্ত করবার সঙ্কট ছেলেদের শেখানো হয় না। একে তো মাতৃভাষার সঙ্গে যোগ সামান্য, তাহলে ইংরেজী বলবার কায়দা হ্রস্ব করতই দিন গুজরণ। ছেলেরা ভাবকে 'ভাষায় ফুটিয়ে' তোলেই বা কখন? তার পর প্রাণের মাঝে একটা ধাক্কা পেলে তবে ভাব আগে; সে ধাক্কা পাওয়ার মত উত্তেজনা বিভ্রাটের গভীতে কোথায়?

নিখালয় তো নয়, যেন কারাগার। দেশে যে ব্যাপারটা সব চেয়ে তুমুল, তারই হাওয়া নিখালয়ের মাঝে সাকুলারের ভয়ে ঢুকতে পারে না। ছেলের চিত্ত-চঞ্চলা নিবারণের উদ্দেশ্যেই যে এ ব্যবস্থা হয়েছিল, তা নয়; তাহলে এর কুফলের প্রতিবেদক কোনও বীর্যবন্ত রসায়নেরও ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাই বা কোথায়? নিখালয়ে দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান সীমাবদ্ধ, ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কোনও উন্নত কল্পনার অবকাশ নাই, এমন কি জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতাকে মুখ ফুটে বলে একটু সোয়াস্তি বা আশার আলোক পাওয়ার দরুণ আচার্য্যের সমস্তকু পর্ষাস্ত নাই;—এমনস্থলে ভাব কি ভুঁট ফুঁড়ে গজাবে?

তা ছাড়া শিক্ষা হিসাবেই এ বিষয়ে কত গলদ। ভাষা শেখানো ভাবকে মূর্ত করণের অন্ত; শুধু ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করালে তা হবে? পরীক্ষায় Essay Paper আছে; শুধু সেগুলো গম্বলন করে একথানা বই ছাপালে মন্দ হত না। তাহলে Young Bengal-এর মনের চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যেত। চিন্তাকে পক্ষু রেখে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা—এই হচ্ছে বর্তমান শিক্ষানীতিতে সব চেয়ে মারাত্মক গলদ। শিক্ষায় তো মুখ ফোটাচ্ছে না—অতি সূক্ষ্মশীল ফুটন্ত মনকে বোবা করা হচ্ছে। অথচ কত স্বল্প চেষ্টায়, ক'চিৎ মনে ভাবের ঢেউ তোলা যায়, সে তো অজানা নয়। শক্তির এই নিদারুণ বন্ধাত্ব দেখে কি করে চুপ করে থাকা যায়?



## কামনার সিদ্ধি

কামনা করা জীবের স্বভাব। আমরা চাই কত কিছু, কিন্তু সব পাই না; পাই নানালি-রাই দুঃখ পাই। একটা কথা আছে, যদি কামনার পরিপূর্তি দেখিতে চাও, তব্বে মোটেই কিছু কামনা করিও না। কথাটা একটা হেঁয়ালীর মত। কিন্তু এই হেঁয়ালীর তাৎপর্য্য আছে। জীব তাহার স্বভাব পাইয়াছে শিব হইতে। জীবে যে কামনা রহিয়াছে, তাহার বীজ ভগবানেও নিশ্চয়ই আছে। ভগবানের কামনার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে, জীবের কামনাকেও অখণ্ডিত করা যায়।

দুইটা কথা আছে, কামনা আর সঙ্কল্প। মূলে একই বস্তু অর্থাৎ বাসনা, কিন্তু আধারভেদে কাহারও কাছে কামনা, কাহারও কাছে সঙ্কল্প। কামনাতে পরমুখাপেক্ষিতা আছে; সঙ্কল্প বলিতে কিন্তু আত্মশক্তির সুরণেরই ইঙ্গিত পাই। যাহার দুর্বল, তাহার কামনা করে, আবদার করে; আর যাহার সবল, তাহার সঙ্কল্প করে। বাসনার আগুন বখন সকলের বুকেই পোরা রহিয়াছে, তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য, চিন্তে যেগুলি কামনার আকারে লালন করিতেছি, সেগুলিকে সঙ্কল্পের

আকার দেওয়া। এই তত্ত্বটা প্রাচীন ঐচ্ছ-  
বিধির মূলে ছিল। এখনও পূজার্ত্তনাম মূলে  
সকল করা হয়। দেবতার কাছে শুধু ক্যাঙলার  
মত আবদার করা নয়, আত্মশক্তির উপর  
নির্ভর করিয়া দাবী করা, তবেই সিদ্ধি। সকাম  
যজ্ঞের মূল কথা এই। আজকাল আমরা  
কেবল কামনা করিতেই জানি; পৃথিবীতে যে  
সব জাতি কাম্যজগতে সিদ্ধিলাভ করিতেছে,  
তাহারাও সকলী।

কামনাকে সকলে পরিণত করা কামনা-  
পূরণের প্রথম উপায়। এ উপায়কে নির্দোষ  
বলা যায় না। সকলেও বাধা আছে, কেন  
না ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। চেষ্টা হয়ত আমার  
আয়ত্ত, তবুও ফল তো আমার হিসাবের  
বাইরে। তাই ঐচ্ছিত ফল না পাইলে সকলী  
পুরুষেরও হুঃখ হয়। তবে কাম্যকের হুঃখ  
তাহার চেয়েও বেশী, কেননা কাম্যক ছেঁড়া  
কাঁথায় শুটয়া কেবল লাগ টাকার স্বপ্ন দেখে;  
সকলী অন্ততঃ পুরুষকায়ের তীব্র আনন্দটুকু  
ভোগ করে। তবুও ফলদৃষ্টি থাকায় তাহার  
হুঃখ আছে। এই জ্ঞত বলিতে হয়, সকলও  
সদোষ। এর চেয়েও যদি সকলসিদ্ধির কোনও  
উন্নততর উপায় থাকে, তাহা হইলে তাহারই  
সন্ধান প্রয়োজন। মানুষ পুরুষকায় পর্য্যন্ত  
উঠিলেই তাহার যোগেই হইল। এর পরেও  
কিছু পাইতে হইলে ভগবানের মাঝে তাহার  
সন্ধান করিতে হইবে।

উপনিষদে ভগবানকে বলা হইয়াছে সত্য-  
সকল, অর্থাৎ তাহার সকল ও ফলে অবিনাশাব  
সম্পর্ক। কথাটা আমরা শুনিয়া নিশ্চিত  
হই এবং সত্যসকল পুরুষের উদ্দেশ্যে কাম-  
নার কাঁছনী গাহিতে থাকি। ভগবান সত্য

সকল জানিয়াও তাহার কাছে আবদার  
করা মূর্থতা বই কি? যিনি সত্যসকল তিনি  
খোষখোয়ালী নন; হয়ত তাঁর খেয়াল আছে,  
কিন্তু সেটা যে আমার কামনার সঙ্গে মিলিবে,  
তা নাও হইতে পারে। না মিলিলে মিলাইবার  
কোনও উপায়ও নাট, কেননা সত্যসকলীর  
সকল ও ফলে অবিনাশাব সম্বন্ধ। তাইতে  
বুঝি, সত্যসকলী পুরুষের কাছে কামনা করিয়া  
বড় বিশেষ লাভ নাই। তাঁর মনে যা আছে,  
তিনি তাই করিবেন; তাহা হইলে আমার  
হাত পাতাটাট তো বুঝি। লোকে না বুঝিয়া  
মননসিক করে, ঘৃষ দিয়া ভগবানকে খুসী  
করিবার চেষ্টা করে। যার কর্ম্মাধীন, সকাম  
উপহারে তাহাদের মন টলিতে পারে। কিন্তু  
তাঁহার ভগবানের কর্ম্মচারী মাত্র। আমরা  
লোভী, স্বার্থপর, তাই কর্ম্মচারীদের কুসলাইয়া  
কাজ হাঁসিল করিতে চাই, তোষামোদ করিয়া  
বলি, “হে ঠাকুর, তুমিই ভগবান, আমার  
এইটুকু করিয়া দাও।” সিধান বজায় রাখিয়া  
তাঁহার যদি পারেন, তো কিছু উপকার করিয়া  
দেন; কিন্তু সেটাও অনিশ্চিত। এরূপস্থলে  
নিশ্চিন্ত ফলের আশা করা যায়, যদি কর্ম্মস্থত্রে  
গতি জানা যায়। তখন দাবী করা চলে,  
বলা চলে, এই তো আইনে রহিয়াছে, তবে  
তুমি দিবে না কেন? বৈদিক যজ্ঞ এমন  
আইন কাছনের স্ফানের উপর, আপন হৃ-  
দায়ীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তখনকার  
চাওয়ার ধরণটাই ছিল বীরের মত। তাহার  
ফলও হইত। এখন শুধু নিষ্ফল কামনা—  
আর বুঝি মানসিক।

ভগবানের কাছে যদি চাহিয়া কিছু পাও-  
য়ার না থাকে, তাহা হইলে কি করা যাইতে  
পারে, সেটাই সমস্যা। একটা ভরসা আছে,



তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। শুধু তোষামোদ করিয়া তাঁহাকে তাই বলি না, যেমন ভিখারী যাহাকে তাহাকে বলে, “এ মালীক, এ রাজা বাবু!” বাস্তবিক তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। কিন্তু কায়কের তাহাতেও বড় সুবিধা হইবে না। কল্পতরুর কাছে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তারও একটা হিসাব আছে। আমাদের চাওয়া তো পাক জলে ভুড়ভুড়ি উঠার মত, একবার একটু চাপ পড়িলে আর বিরাম নাট, কেবল ভুড়ভুড়ি উঠিতেই থাকিবে। বাঞ্ছাকল্পতরু সবগুলিরই হিসাব রাখেন, তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে সবগুলিরই জোগান দিবেন। কিন্তু তুমি এতগুলি নিরা রাখিবে কোথায়? তাই তোমার চাওয়ার দোষেই ঠিক সময় মত জিনিষটা পাওনা, মাঘ মাসে কষল চাহিয়া সেটা পাও আবাচ মাগে!”

তাঁহাকে বাঞ্ছাকল্পতরু বলি এই জন্য যে আমার ভিতর যে বাসনা জাগে, তাহা তো তাঁহারই অনাদিসিদ্ধ বাসনার ত্রিাকরূপ। তাঁর বাসনা আর ফলে অবিনাভাব, আমার বেলায় ছরে বিচ্ছেদ, তাই দুঃখ। আর তাঁর হইতেই আমারও বাসনার উদ্ভব, তাই তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। বলিতে পার, তাঁর হইতেই যদি সব, তবে দুঃখ কেন? আমি বলি, জীব আর শিব তবে প্রভেদ কেন? সেই প্রভেদ নিয়াই তো সংসার। জীবের সংসারটা কি? সেটা সর্বদাই সরিতেছে। তাহা হইলে আজ যাহা দুঃখ, তাহাও থাকিবে নাও কেননা দুঃখটাও সরিতেছে। বাস্তবিক এইটাই হইল তত্ত্ব। এত কামনা-বাসনার দাহ, এত প্রাণ-পাতী প্রচেষ্টা, এই শোক দুঃখ মৃত্যু—এ সবই

কেবল সেই আনন্দলোকের দিকে, সঙ্কল্প-শিঙ্কের পরমতৃপ্তির দিকে সরিতেছে—তাই একে বলি সংসার।

পরিণামে কল্যাণ নিশ্চিত, এই ধারণা যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল, আশাভঙ্গের মনস্তাপ তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। সে জানে, ছেলে যাহাই আবদার করে, বুদ্ধিমান পিতা সব সময় তাহাট দেন না। ছেলে কখনও কখনও কাঁদিয়া কাঁদিয়াও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই জন্য অসার কামনার পেছনে ভগবান শাস্ত্রের ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছেন। খুদী মত চাহিয়া না পাঠিলে আপনিই কামনার বন্ধন টিলা হইয়া যায়, তাহার উপর নির্ভরতা আসে।

কিন্তু বলিতেছিলাম, আমাদের কামনা আর ভগবানের ইচ্ছা, ছয়ের মাঝে কোথায়ও একটা যোগ আছে। কেননা আমাদের যাহা কিছু, সকলট তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছে। তাই শুধু সঙ্কল্প দ্বারা আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অথবা নির্ভরতা ও সন্তোষ দ্বারা কামনাকে, নির্জিত করা ছাড়াও তৃতীয় পন্থা একটা থাকি। সন্তত। কামনা না করিলেই কামনার সিদ্ধি—এই হৈমালীর সমাধান সেখানেই আছে। ঠিক এই রীতিতে বাক্সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার কথাও এই প্রসঙ্গে খুটুটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পুরাণাদিতে দেখিতে পাঠ, ঋষিরা শাপ বা বর যাচা দিতেছেন, তাহাই কলিতেছে। এটাকে একটা আজগুবি ক্ষমতা ভাবিয়া অনেকেই মনে করে, ঋষিরা বৃষি ক্রোধ বা লোভের বশবর্তী হইয়া, ঐরূপে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু আসল কথা

তাহা নয়। যাহারা সর্বত্র সমদর্শী, তাঁহাদের ইষ্টানিষ্ট বলিয়া তো কিছু নাই। তবে তাঁহারা একরূপ বলেন কেন? তাঁহারা যাহা সত্য অনুভব করেন, তাহাই বলিয়া যান, মাত্র, অবিবেকীয় ভাগ্যেই তাহা শাপ বা বররূপে ফলিয়া যায়। বাক্য চিন্তারই বহির্বিকাশ মাত্র। চিন্তা সকলেই করে। কিন্তু একটু নিজেব মাঝে তলাইয়া দেখিলেই শোকা যায়, অসার বাজে চিন্তায় আমাদের ভিতরটা একেবারে পোরা। একটুখানি সত্য ঘটনাকে অবগদন করিয়া আশা বা আশঙ্কার উত্তেজনায় কলন-দ্বারা তাহাকে আমরা পল্লবিত করিয়া তুলি। জলে তরঙ্গ থাকিলে যেমন জলাশয়ের তলদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি মনের এই আন্দোলনে একটা ঘটনার পরিণতি কি হইবে, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরিণাম-চিন্তাচীন ব্যাপার বাক্যে প্রকাশ করিলে কাকতালীয় হ্মারে তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। এই ক্ষুদ্র যাহারা বহু-ভাবী, তাহারা প্রায়ই মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। শুধু অতীত ঘটনাকে যথাযথ প্রকাশ না করণই মিথ্যাভাবণ নয়, ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে অসার কল্পনাও মিথ্যাভাবণ।

যদি'কেহ আশা-আশঙ্কারূপ বৃত্তি নিরোপ করিয়া সমাহিত চিত্তে একটা ব্যাপারকে দর্শন করে, তবে তাহার কার্যাকারণ পরম্পরা তাহাব' নিশারদবৃত্তিতে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিবে—ইহা অট্টোমাতিক কথা নহে। এই আশ্রয়সমাদানের অবস্থা আরম্ভ হইলে, চিন্তা নিশ্চয় হইবে সে চিত্তে কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা বস্তুনিষ্টের ভাবনা উদ্ভিত হইতেই পারে না। যাহা যথার্থ, তাহাই সমাহিত চিত্তে জাগিয়া থাকে এবং

তাহাই বাক্যে প্রকাশিত হইয়া অমোক্ষলয় হুজনা করে। এইরূপে বাক্যসংযম বা চিন্তা সংযম হইতেই বাক্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ঠিক এই রীতিতে সঙ্কল্পসিদ্ধিও হয়। মান-বের খণ্ড ইচ্ছা আর' জীবনের অখণ্ড তচ্ছা, দুইয়ে সামঞ্জস্য হইলেই 'তচ্ছাপূরণ' সম্ভবপর হয়। অদৃষ্ট বা ভবিষ্যৎ আমরা সকলেই মানি। অদৃষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে হুঙ্গ শক্তি, সমস্ত জীবের কষ্টের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। সেই কর্ম্মফলের টানা-পড়েন না জানা থাকিলে অদৃষ্টকে আয়ত্ত করা যায় না, স্তব্ধতাঃ অদৃষ্টে শক্তির বিপরীত কোনও প্রচ্ছন্ন কর্ম্মবীজকে অঙ্কুরিত করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সত্ত্বঃ সত্ত্বঃ সার্থক হয় না। এই জ্ঞাত কামনা করি-য়াও কামনার পরিপূরণ হয় না। কিন্তু চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করিলে, নিজের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা কর্ম্মপরিচ্ছেদকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টাটা ছাড়িয়া দিলে, ঠিক যখন যে বাসনা করিবার, সেইটাই সঙ্কল্পের আকারে চিত্তে ভাসিয়া উঠিবে এবং তাহা সফলও হইবে। সঙ্কল্পসিদ্ধির ইহাই রহস্য। এই জ্ঞাতই বলা হয়, কামনায় সিদ্ধি পাইতে হইলে কামনা ছাড়।

সাধারণ লোক একটু বিশেষ কামনাকে জড়াইয়া তাহাব'ট সিদ্ধি আশ্রয়ে, স্তব্ধতাঃ কামনা ছাড়িলে সেই কামনার সিদ্ধি হইবে, এই অযুক্ত আশা উৎপন্ন চিত্তকে ফেলিয়া নাগে বলিয়া কামনাত্যাগে কামনাসিদ্ধির যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারে না। যদি কামনা ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহাও সম্পূর্ণ ফলবুদ্ধি-বিসর্জিত হইয়া ছাড়িতে হইবে, সিদ্ধি কামনাকেও দূর করিয়া সহজ প্রজ্ঞা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অবিবেকী

এই অবস্থাকে বড় ভয় করে। কামনার পরি-  
তৃপ্তিতে সে সুখ মনে করে, সুতরাং কামনা  
ভাগ ভাচার ক'ছে পরিপূর্ণ হ্রঃের খনি  
বলিয়া মনে হয়। এই ছান্টে সংসারমায়ার  
নীল। কামনা ত্যাগে যে কি অপার আনন্দ,  
যাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই, মহ-

তের ক্রপায় বা ভগবানের ক্রপায় জ্ঞানের  
উন্মেষ না হইলে—এই আনন্দের সম্ভাবনা কেহ  
পায় না, বুঝিতে গেলেও বুঝিতে পারে না।  
ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন, “জগতে কামনার  
তৃপ্তিতে যে সুখ, কিম্বা স্বর্গাদিতে কামতৃপ্তিতে  
যে মহৎ সুখ, কামনাত্যাগের সুখের তাহার  
যোগভাগেরও এক ভাগ নয়।”



## আরণ্যক

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবায়মায়ান্ তামম্ববিন্দন ঋষিষ্য প্রবিষ্টাম্ ॥”.

—ঋগ্বেদ সংহিতা—৩২৮৮

যত কিছু সাধনা, মনঃচিত্তস্থৈর্যের জন্ত।  
নহিলে অসাধনের ধনকে কখনও কোনও সাধনা  
দিয়ে ধরা যায় না। যোগ কর, চিত্তনিরোধ  
হবে; তাঁকে ভাসবাস, তাতেও এক দিন  
তাঁতেই চিত্ত সমাহিত হবে। হ্রঃের মাঝে  
প্রথমটা আয়াস-সাপেক্ষ, দ্বিতীয়টা স্বাভাবিক  
ভাব-প্রাণ চিত্তের স্ফূরণ। অথচ পৌছে দেয়  
সেই অসীমের কাছে। কিন্তু কেমন করে যে  
কোন পথ দিয়ে তিনি টেনে নিলেন, তা টেরও  
পাওয়া যায় না। ভাসবাসার গমনি মহিমা।

✽

ভাল না বেসে মানুষের দিন চলে না।  
কোনও মানুষ বা ভাবের কাছে সে আশ্রয়  
দিয়ে নিজেকে কতকটা না ভুলে সে থাকতে  
পারে না। অথচ এই অপরিহার্য আশ্রয়বিশ্বাস  
যদি তার জেনে শুনে, প্রথম থেকে ভগবানের  
জন্ত হয়, তাহলে কিন্তু সে অনেকটা এগিয়ে

যায়; ভগবানও তার জন্ত আরও দশ পা  
এগিয়ে এসে কোলে টেনে নেন। কিন্তু  
মানুষ তো সে দিকে যাবে না—মহামায়ার  
বঁধন যে তাহলে কেটে যায়!

✽

সাধনার অবশ্য ছোট বড় ভেদ করণা কর;  
যায় না। অধিকারীভেদে সোজা বা কঠিন  
হয় বলেই ছোট বড় আখ্যা দিই। কিন্তু  
দেশকালের অবস্থানুসারে স্বভাবতঃ অধিকাংশ  
মানুষের মাঝে যে ভাবটা প্রবল দেখা যায়,  
তখনকার যুগে সেট ভাবের সাধনাট সজ,  
সুগম বা বড় বলে মনে হয়। আসল কথা  
হচ্ছে সাধনার লক্ষ্য নিয়ে—সাধনার ছোট বড়  
নিয়ম নয়। সেট দিকে যেতে পথের বিচার  
যখন করি, তখনই কোনটা সোজা রাস্তা, তাই  
খুঁজতে পারি। কিন্তু যার প্রাণে সেই লক্ষ্যের  
জন্ত আকুলতা জেগেছে, তার পথ আর

নিজে বেছে নেবার অপর থাকে না। এরা  
জগৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আপন হাত ধরে  
দিয়ে যায়। কাজেই যতক্ষণ পথের পিচায়  
করছ, ততক্ষণ তাঁকে ভাবলে কাজ হবে  
শেষী। ভোলামন আসল ফেলে নকল নিয়ে  
মজতে চাইছে বলে সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মজবে ?

✱

মায়া বলতে এক অপরিজ্ঞাত রহস্য।  
কেন যে কি হল, তা বোঝার যো নাই; অথচ  
হচ্ছে যে, তা স্পষ্ট অমুভব করছি। ভক্ত বল,  
যোগী বল, বৈদান্তিক বল, কেউ একে  
স্বীকার না করে পারেন না। কেউ নিজের  
শক্তিতে এর হাত থেকে নিস্তার পান না।  
এর কাছে রেচাই পেতে হল, যিনি একে  
চিনেছেন তাঁকে, যাঁর মায়া তাঁকেই ধরতে  
হবে। একজনের কাছে এমনি আপনাকে  
নিঃশেষে সমর্পণ না করে গতাস্ত্র নাই। যদি  
সব দিতেই হয়, থাকেই দাও, একমাত্র ভাল-  
বেসে দিও, তবে সেই হবে সব চেয়ে সরল ও  
শ্রেষ্ঠ সাধনা।

✱

সবাই কাজ করছি বটে, কিন্তু নির্দেশারা  
হয়ে। কিসের প্রেরণায় কার জন্ত অমন  
সব ভুলে গেলে মরি, তা হো একবার  
ভাবি না—সে তব্ব জেনে নিয়ে যদি ঠিক  
ঠিক কাজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু ওই  
কাজেই অমন ভূতের বেগার খাটা থেকে  
নিষ্কৃতি দিতে পারে। তখন কাজের মূল্যে  
ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষার দারুণ মোহ টুটে  
যাবে। এক দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে  
নিরলস কর্মে তখন দেহ-মন নৃত্য করবে,  
তাতে ছন্দ থাকবে, কিন্তু পুরস্কারের লোভ  
থাকবে না—হার-জয় থাকবে, কিন্তু শিশুর  
ক্রীড়ার মত তাতে বুকে কোন ছাপ বসবে না।

মনের চারপাশে কত কথা, কত ভাবনাই  
এসে জোটে; আবার সমুদ্রে জোয়ারের  
পর ভাটাই মতন যেমন এসেছিল, তেমনি  
চলে যায়। কিন্তু এসমস্তের মাঝে ঠিক  
একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ধরে থাকতে পারলে  
কোনও ধাক্কা এসে মুসড়ে দিতে পারবে না।  
সুখ-দুঃখের ছাঁকনি দিয়ে যাচাই হয়ে সব ধুয়ে  
মুছে যখন শুধু একটা লক্ষ্যে চিত্ত তরঙ্গ হবে,  
তখন প্রকৃত আনন্দের স্বাদ মিলবে। দুঃখের  
কবলে পড়েও তখন আর পিচলিত হবার ভয়  
থাকবে না। তা বলে দুঃখ যে আসবে না,  
তা, কিন্তু নয়; এসে সে আলোর কাছে  
আপন আধার-সত্তা হারিয়ে যাবে।

✱

দুঃখ আসবে, সাংসারিক ঘটনাচক্রে  
মায়ায় প্রভাবে সুখ-দুঃখে নিঃশেষিত করতে  
চাইবোঁ। এ চিরন্তন-খালি মুছবার নয়।  
কিন্তু শুরু বলেন, তোমাকে তার মাঝে পড়ে  
'হাহতোস্মি' করতে হবে কেন? ওর চাক  
ঘুরছে আর তুমি মনে করছ যে তুমিও ওই  
চাকার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা। এইখানেই তো ভুল।  
কোনকে 'বসে দেখ না, কেমন সুন্দর ঘুরছে।  
না—সংস্কার নিয়ে এসে আছ যে তুমি  
ওক ঘুরছ; পিছনে ফিরে দেখ না—তুমি  
স্বয়ংই রয়েছ, ঘুরছে শুধু ওই চাকটা, তার  
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংস্কার নিয়ে তোমার মন বুদ্ধি  
ইত্যাদি। এখন থেকে বিপরীত দিকে ভাবতে  
শেষ দেখি। মুখে বলছ আমার দেহ, মন,  
বুদ্ধি—আর কাজের বেলায় আবার তাদেরই  
“আমি” বলে ভুল হচ্ছে। কাজেই দেখছ,  
ভয়টা বা আঘাতটা আসল-নয়; আসল হচ্ছে  
তোমার ভুলটা। সংশোধন করতে হবে  
তাকেই কর।



## সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিপতি শ্রীমৎ পরমহংসদেব শীঘ্রই মঠে পদার্পণ করিবেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাস তাঁহার মঠেই অবস্থান করার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতুমিতে আশ্রম স্থাপনোলক্ষ্যে মহোৎসব নির্বিশেষে ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণী অন্তর প্রকাশিত হইল।

### ঠাকুরের চিঠি

এই “ঠাকুরের চিঠি” শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য ও ভক্তগণকে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ কয়েকখানি চিঠির সমাবেশ মাত্র। বিষয়ে অনাসক্তি, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ইহার ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। বিরলে বসিয়া আপন প্রিয়জনকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত এই চিঠিগুলিতে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সকল কথাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই চিঠিতে তাঁর উদ্ভুদ্ধ শিষ্যের প্রাণের ব্যাকুলতার লক্ষণ আছে, তাঁর ‘হৃদনিকুঞ্জের পোষা দোহেলা’দের কলকণ্ঠের ললিত কাকলির কথা আছে, শোকসমুপ্ত নিরাশ প্রাণের জগৎ শান্তির নির্ঝর আছে, আর সাধকের—বিশেষতঃ গৃহস্থ সাধকের আদর্শজীবন গঠনোপযোগী সকল বস্তুই বিত্তমান রহিয়াছে। যে কোনও একখানি চিঠির অন্তর্মিহিত সত্য জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিলেই মানব ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিবে। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—উত্তরবঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম,  
পোঃ—বাগড়া।

## শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমিতে



আসাম সারস্বত মঠ ও বাঙ্গালার সারস্বত আশ্রমগুলির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজক্যচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজ তদীয় জন্মভূমি নদীয়া জেলা মেহেরপুর মহকুমার কুতবপুর গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্কার প্রায় তিন শত ভক্ত শিষ্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে হাকিম, উকিল, ডাক্তার, জমিদার, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তদুপলক্ষে কুতবপুর গ্রামে ১লা, ২রা ও ৩রা কার্তিক মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই কয়দিন গ্রামটা মহা পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। কুতবপুর ও তন্নিকটবর্তী ১০।১২ মাইল দূরের শত শত লোক মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সে বিরাট লোক সমাগম না দেখিলে অমুভব করা যায় না। তাঁহার ভক্তশিষ্যগণ অসংখ্য খুলিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রায় সহস্রাধিক লোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের নেতা ও যুবকগণ সর্বাঙ্গতঃ করণে শিষ্যগণের কার্য্যে যোগদান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ পাকের তৈজসপত্রাদি, সামিয়ানা, সতরঞ্চী প্রভৃতি যোগাইয়াছেন। সমাগত শিষ্য, ভক্ত ও দর্শনার্থীগণকে আপন আপন বাটীতে স্থান দান করতঃ কয়দিন নিজের কাজ কর্ষ ছাড়িয়া

তাঁহাদের সেবা-যত্ন ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহ কোন কারণে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিমুখে কর্তব্যপালন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল বি, এ, ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ পাল ডাক্তার মহাশয়ের 'নেতৃত্বাধীনে ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক দিব্যরাজ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন ও বিরাট মহোৎসবের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন। মহাপুরুষের জন্মভূমি-অধিবাসীবৃন্দের সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা-প্রদর্শিতা আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। জীবনে এক্ষণ দৃশ্য দেখিবার আর সুযোগ হয় নাই।

মহাপুরুষের জন্মভূমি দর্শনের স্মৃতির স্থায়িত্ব-বিস্তারের জন্ত তাঁহার পৈত্রিক ভিটাতে ভক্ত, শিষ্যগণ একটা পাকা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। ৩রা কার্তিক পূজা, হোম, পাঠাদি পূর্ব্বক মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঐদিন সমগ্র গ্রামবাসীদের প্রসাদ গ্রহণের জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বেলা ১০টার সময় একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নদীয়া জেলার অবসরপ্রাপ্ত সব জজ্ শ্রীযুক্ত উমানাথ ঘোষাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেহেরপুর হইতেও বহু ভক্ত-লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মল্লিক বাহাহর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র

সেন ওষ্ঠ, প্রবীণ উকিল ত্রিযুক্ত জীবনকৃষ্ণ  
মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকটা উকিলের নাম  
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশবাসীও মহাপুরুষের  
স্মৃতিরক্ষার্থ স্থানীয় বিদ্যালয়টাকে “ত্রিনিগমানন্দ  
মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়” নামে অভিহিত  
করিয়াছেন। জেলা বোর্ড হইতেও মহাপুরুষের

নামে কুতবপুরে একটি দার্তব্য চিকিৎসালয়  
স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই মহোৎসবে  
মহাপুরুষের ভক্তশিষ্যগণ সহস্রাধিক টাকা  
ব্যয় করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ যে সকল  
সঙ্গীত ও কবিতায় তাঁহাকে আবাহন ও অভি-  
নন্দিত করিয়াছে, নিয়ে তাহা প্রকাশিত  
হইল।

( ১ )

জয় জয় নিগমানন্দ !

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী, এলেন জন্মভূমি,

সঙ্গে লয়ে ভক্তবৃন্দ।

দরশন আশে, দলে দলে মিশে,

পুরুষ রমণী কুতবপুর আসে ;

আজি এ নগরী যেন ব্রজপুত্রী,

সবে লয়ে ব্রজানন্দ ॥

নামাদি কীর্তনে নগর ভ্রমণ,

মধ্যে ভক্ত ঘেরি যত ভক্তগণ,

কেহ নাচে গায়, কেহ বা বাজায়,

প্রেমেতে হইয়ে অন্ধ ॥

ষড়রিপু জিনি ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ,

ভক্তভাবে প্রভু হলেন অবতীর্ণ,

প্রেমরসে মাখা ভক্ত প্রাণ সখা,

নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র ॥

এ হৃদয়ানন্দ মহানন্দে ভাসে,

ভক্তগণ সঙ্গে ভাব-প্রেমরসে.

রাজরাজেশ্বরে বসায় অস্তুরে

পূজি ও চরণারবিন্দ ॥

( ২ )

প্রেমের আকর এসেছ ঠাকুর !

কান্ডালে করুণা করিতে হে,

প্রেম বিতরিতে মরু সম চিতে

পতিতে তাপিতে তারিতে হে ।

“জয়গুরু” নামে অমিয় ঢালা

হেরিলে সে রূপ জুড়াবে জালা

( তাঁর ) রাতুল চরণে পরাণ দাঁপিলে

ভাবনা পলায় দূরেতে হে ।

করি “তাঁর” কথা অমৃত-পান

জাগিয়া উঠিছে অবশ পরাণ,

হতাশ হৃদয়ে তীব্র আশা জাগে

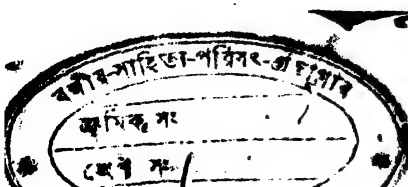
“তাঁহারি” মধুর নামেতে হে ।

সবে মিলে আজি কর জয়গান

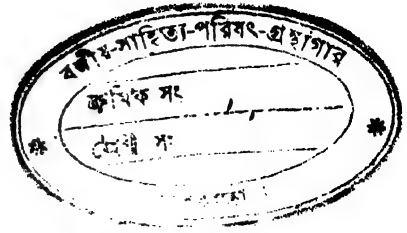
আনন্দে মাতিবে সবার পরাণ

চির শান্তি পাবে, হৃদয় জুড়াবে,

ভবেরি ভাবনা রবে না হে ॥



৩ তৎ-সং



# আর্ষ-দর্পণ

১৯৭৭ বর্ষ } অগ্রহায়ণ { দ্বিতীয় খণ্ড  
সমষ্টি সং ২০০ } দ্বিতীয় সংখ্যা

ইন্দ্রঃ সোমপঃ

[ স্বপ্নেদ-সংহিতা—৩।২।৯-১০ ]

—\*ঐ(ঐ)\*—

[ দ্বিধামিত্র ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ]

—\*—

ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমং  
মাধ্যন্দিনং সৰনং চারু যতে ।  
প্র প্রথ্যা শিপ্রে মঘবনুজীশিন্  
বিম্ভা হরী ইহ নাদস্বয় ॥

থে বাসব সোমপতি, এই দেখ রাখিয়াছি, সোম—  
নিজারিয়া মধ্য দিনে তব তরে করি চারু হোম  
পূরিয়া কবল ছুটি, মঘবন, শুধে নাও রস,  
বাঁধ ছোথা তুরঙ্গমে, এস হেথা—জাগাও হরষ !



গর্বাশিরহং অস্থিনামুদ্ভ স্তব্ধং  
 পিবা সোমং ব্রহ্মিমা তে মদাহ।  
 ব্রহ্মাকৃত্য মারুতেন গণেন  
 সজোমা রুদ্রেস্থপদা ব্রহ্মস্ব॥

মস্থ্যুত তাজা সোম—গব্যরস মিশায়েছি তায়,  
 মত্ত হও করি পান—দিই ঢেলে যত প্রাণ চায় ?  
 সাথী যত মরুতেরা—নিয়ে এসে; রুদ্রগণে আরো—  
 বসে যাক্—স্তুতি,গা'ক্—ঢালো কণ্ঠে ঢালো যত পারো !

ষে তে শুভ্রং যে তবিশীমবন্ধিন্-  
 নচ'ন্ত ইন্দ্র মরুতস্ত ওজঃ।  
 মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত  
 পিবা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র॥

শুভ্রমিহা বীণ্য তব বাড়ায়েছে বাহুবল যারা,  
 ওই সব মরুতেরা এলো বুঝি পেয়ে তব সাড়া !  
 দুপুরে নিঙারি সোম ; রুদ্রগণে দাও না গো ডাক্—  
 বজ্র হাতে সাথী-সাথে পিও রস—রাঙা হোক্ নাক !

মনুষ্মদিন্দ্র সবনং জুহ্বানোঃ  
 পিবা সোমং শশ্বতে বীৰ্য্যাস্ত্র।  
 স অা বহুৎস্ব হর্যাস্ত্র যজ্ঞেঃ  
 সন্ন্যুভিরাপো অর্গা সিসর্ষি॥

এই যে নিঙারি রস; এসো ইন্দ্র যজ্ঞে যথা আস,  
 হোক্ চিরবীৰ্য্য লাভ, পিও সোম,—বড় ভালবাস !  
 নিয়ো এসো মরুতেরে—পূজ্য তাঁরা, হে হরিবাহন !  
 প্রচণ্ড গুরুত্ব ধারা শূন্য হতে কর বরিষণ।

ইন্দ্রস্য কৰ্ম মুকুতা পুরাণি  
 ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে ।  
 দাধান্ন য পৃথিবীং তামুতেমাং  
 জজান সূর্য্যামুশসং সুদংসাঃ ॥

করেছে যে কত কৰ্ম ইন্দ্র, বল কে করে গণন,  
 বাধা দিবে ব্রতে তার দেবতার ভাবে না কখন ।  
 এই পৃথ্বী, ওই ব্যোম—একা তারে ধরে রেখেছিলো—  
 অপরূপ কীর্তি তার—উষা আর রবিরে স্বজিলো !

হুং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র  
 মদায় সোমং পবনে ব্যোমন ।  
 যদ্ব দাবাপৃথিবী আবিবেশী-  
 রথাতবঃ পূৰ্ব্ব্যঃ কারুধায়াঃ ॥

আবেশিয়া রয়েছ যে হে বাসব ছায়া আর ভূমি!  
 তুমি কৰ্মবিধাতা যে নিখিলের, চিরন্তন তুমি—  
 কোথা হতে এ মহিমা ?—জানি তাহা ;—সত্ত জনমিয়া  
 মহাব্যোমতলে তুমি গত্ত হলে সোমরস পিয়া !

আপূর্ণো অস্ম্য কলশঃ স্রাহ  
 সেক্তেব কোষং সিম্বিচে পিবথ্যে ।  
 সমু প্রিয়া আবহব্রতন্ মদায়  
 প্রদক্ষিণিদতি সোমাস ইন্দ্রং ॥

এই দেখ পূরেছি কলশ, ইন্দ্র, নিবেদি তোমায়—  
 উগারি' মযক হেন ঢেলে দিই, পান কর তায় ।  
 উদ্মাদক সুধা এ গে, ইন্দ্র তারে বড় ভালবাসে—  
 প্রদক্ষিণ করি তাঁয় পাত্র যেন ঘুরে ঘুরে আসে ।

## অসাধনের ধন

—{#}—

সাধিরা কাহাকেও মা পাঠাতে হয় না, বাপ পাঠাতে হয় না। মুখে যাঁগাকে বলি বাপ-মায়ের চেয়েও আপন, তাঁতাকে পাঠাতে হইল কেন যে সাধন প্রয়োজন হয়, এই একটা রহস্য। তবে সংসারে এমনও দেখিয়াছি, কাহারও বাপ মা থাকিতেও যেন নাট; সেটা বাপ-মায়ের দোষ নয়—দোষ সন্তানের। যে স্নেহের মান রাখিল না, বাপ-মায়ের মর্যাদা রাখিতে জানিল না, সন্তানের গৌরবে ছাপ পূর্ণ করিতে পারিল না, তাহার তেঁ বাপ-মা থাকিয়াও নাট। কিন্তু তবুও দেখি, এমন হস্তভাগা ছেলের জন্মও বাপ-মায়ের পাপ কাঁদে! এই ~~কি~~ সংসারের সত্য হয়, তবে জানিও, সারাসারের তত্ত্বও এট; কেননা এখানে বাহা ছায়া, সেখানে তাহা কায়।

বেদ বলিতেছেন, স্বয়ম্ জীবের বুদ্ধি-শক্তি, ইন্দ্রিয়-মন সব উন্টাযুগী বসাইয়া দিয়াছেন; তাই জগতে সে নিজের চোখ দিয়া সকলের যুগ দেখে, কেবল আপনার মুখটাই দেখিতে পায় না। এ যে শুধু সংসারীরই উন্টা বুদ্ধি, তা নয়, দেখিতেছি, সাধকেরও সেই উন্টা বুদ্ধি। দানাস্তে একগরও ভগবানের নাম লইল না, সংসারের একটা কাণাকড়িন্ হিম্মন মিলাহতে সাত সের তেল প্যাড়ল—এমন দোক আচে; তাহাদের উপর রাগ হয় না, কেননা ধর্মিষ্ঠেরাও বলিবেন, তাহারা বোকা। কিন্তু যে নাকি তাঁহার নাম লইতে শিখিয়াছে, অন্ততঃ শিখিবার চেষ্টায় আছে, তাহার আড়ম্বর দেখিয়া গায়ে আলা ধরিয়া যায়। কেননা, এরা

মিজেরের কাছেই কবুল করিয়াছে, যে এরা সংসারীর চেয়েও সেয়ানা; মহাকনের বাণীও তাহার সার দিতেছে—“যে জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর্দা” কিন্তু বাপরে, সে ভজনের কি বেজ্ঞ আড়ম্বর! ছেলে যেন বায়না ধরিয়া বসিয়াছে, সে মনের মতন মা গড়িয়া তুলিবে!

শাস্ত্রিক সাধা যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি নিজে; আগে নিজের চরকায় তেল দাও। তুমি যাহাকে চাহিতেছ, তিনি যে অনাদিসিদ্ধ গো! তাঁহাকে আগার তোমার মতলবমত গড়িয়া তুলিবে কি? হাঁ, মনের মতনটা হইয়া আসিলে প্রাণ খুসীতে নাচিয়া উঠে, তা জানি; কিন্তু এও জানি, সেটাও একটা কামনা। কাম যেমন সৌন্দর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া, আত্মার খুড়ুকাৎ অতৃপ্ত রাখিয়া কেবল একটা স্থল পিণ্ড মাত্র হাতের কাছে আনিয়া দেয়, এই মনের-মত পাওয়ার কামনাও তেমন হাতের লক্ষী দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে শিখায় শুধু। নইলে যিনি এত কাছে যে তাঁহাকে আপনার হইতে আপনার বল, অন্তর্যামী বলিয়া গালা পড়, তাঁহাকে ধরিবার জন্ম এত বড় ফাঁদ পাতিতেছে কেন? পরমহংসদেব বলিতেন, অজ্ঞানীর ঈশ্বর হোথা হোথা, আর জ্ঞানীর ঈশ্বর হোথা-হোথা।

মা-টা যদি আজ মেয়েটা হইয়া আসিত, তাগ হইলে বুদ্ধি, তোমার বুকের আলা জুড়াইত, তাই তাঁহাকে মেয়ের রূপে পাইতে আজ তোমার এত আকিঞ্চন। কিন্তু এই যে

মেয়েটা তোমার কোলে বুকে জড়ায়  
রহিয়াছে, সুখামাখা ডাকে পরাণ গলাইয়া  
সোহাগ কাড়িয়া নিতেছে, এইটাই যে সেট  
মা-টা নয়, তাই বা কি করিয়া বুঝিলে! আরে  
অবোধ, এই যে সে—তোমার চোখের সামনে,  
বুকের মাঝে! তবু তুই চোখ বুজিয়া বুক  
চাপড়াইয়া মরিতেছিস্, বলিতেছিস্, সে  
কোথায়—সে কোথায়!—দেখা দাও—প্রাণ  
যায়! পাগল!—সে কি আড়াল হইয়া রহি-  
য়াছে, যে সাধ্যসাধনা করিয়া ডাকিয়া আনিতে  
হইবে?

এত কাছে সে রহিয়াছে, তবুও তাহাকে  
কেহ দেখিতে পাইতেছে না—এই তো মায়া।  
লোকে বলে, মায়াতে নাকে দাড়ি দিয়া জীবকে  
সংসারচক্রে ঘুরাইয়া মারিতেছে। আমি দেখি-  
তেছি মায়া যে নাকে ডগল দাড়ি দিয়া সাধকে  
সাধনচক্রে ঘুরাইয়া মারিতেছে! জ্ঞানের  
অভিमानে, সাধনার অভিमानে দিন দিন সে  
দূরে সরিয়া যাইতেছে—আর ভ্রান্তিতেছে, এই  
বুঝি ঘাটে আসিগাম। জানি, ভগবান্ যে  
অতি সহজ, অতি কঠোর, সে কথা সহজে  
কেহ বিশ্বাস করিলে না; বিশ্বাস করিলে  
তো মায়ার আবরণ খসিয়াই যাইত। কেহ  
হয়ত আবরণ করিলে, এত কাছে যখন,  
তখন দেখাইয়া দাও না কেন! তুমি নিজে  
যদি চোখ বুজিয়া থাক, তাহা হইলে দেখাইতে  
পারে কার বাপের সাধ্য! সুখা দেখাইতে  
প্রদীপের প্রয়োজন হয় অন্ধের। যার চোখ  
আছে, সে ভোরের আলো ঘরে পড়িতেই  
প্রদীপ নিবাইয়া দেয়।

কি সংসারক্ষেত্রে, কি অধ্যাত্মক্ষেত্রে, স্বর্কৃত  
দেখিতেছি কর্ম বলবৎ। সংসারে এমন

লোক আছে যাহাকে মাথার ঘাম পায়ে  
ফেলিয়া হুঁমুঠা অন্নের জোগাড় করিতে হয়;  
কাক বা জমিয়া অর্থাৎ ক্ষীর সব খাইয়া অক্ষতি  
ধরিয়া যায়। এক জন প্রাণপণ পাটিয়া প্রাণটী  
টিকাইয়া রাখে, আর এক জন পিনা খাটুণীতে  
ফাঁপিয়া উঠে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাই। কেউ  
বা সেখানে ফকির হইয়া জন্মায়; তাই  
খাটুণীর আর অন্ত নাট; কেউ ণী সেখানে  
রাজার ছেলে—না চাহিতেও তার সব আসিয়া  
জোটে। তবে সংসারে আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে  
প্রভেদ এই যে, সংসারে রাজা হইতে গেলে  
অনেকখানি কাঠ-খড় পোড়াইতে হয়; আর  
এখানে রাজার ছেলে হইতে গেলে বাজলাজে-  
শ্বরকে শুধু বাবা ডাকিলেই হয়। কিন্তু সেট  
সহজ ডাকটাই যে কার মুখে আসে না—এই  
তো গৈরো।

জানিয়াছি, কোনও এক মহাপুরুষের এক  
শিষ্য ছিল, সে জেদ ধরিয়াছিল, মালা জপিয়া  
ভগবান্ পাঠিলে। মহাপুরুষ তাহাকে বুঝা-  
ইয়া বলিলেন, তোর অত-শতয় দরকার কি  
বাপু—আমি বলিতেছি, অমনি তোর সব  
হইবে। সে বিশ্বাস করল না, লুকাইয়া মালা  
জপ করিতে বসিয়া গেল। মহাপুরুষ দেখিতে  
পাইয়া একদিন মালা কাড়িয়া গাইয়া গজার  
চরে ফেলিয়া দিলেন। আর একদিন গজার  
ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখেন,  
লোকটা মালাগাছি কুড়াইয়া আনিয়া এক  
ঝোপের আড়ালে বসিয়া জপ করিতেছে।  
সেই দিন তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গে  
সকলকে বলিলেন, মহামায়া এখন জপের  
মালা হইয়া উহার কাঁধে ভর করিয়াছেন, ওর  
আর কিছু হইবে না।

ভগবান্ খুঁজিতে গিয়া মানুষ গুরু করে। গুরু করার অর্থ তো এই বুঝি যে, আমি ভগবানকে জানি না, চিনি না, পাওয়ার পথই বা কি বলতে পারি না; তাই যি পাঠ-রাছেন, তাঁতার কাছে আসিয়াছি, তিনি যাহা বলিবেন, তাই অকপটে বিশ্বাস করিব। (নতুবা তাঁহার কাছেই বা আসি কেন?) কিন্তু দেগিয়াছি, মানুষের কর্ম এত বলৎ গুরুর কাছে আসিয়াও নিজেব মতলবী বুদ্ধি ছাড়িতে পারে না। গুরু যদি বলিলেন, তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, শুধু এটী জপ কর গিয়া। শিষ্য ভাবিল, অত বড় হোম্ণ-চোম্ণা ভগবান্, তাঁকে বশ করিব এটুকু মন্ত্রদিয়া? নিশ্চয়ই আসল জিনিষটী উনি আমায় দিলেন না—আমায় ঠকাইলেন! যেন লোককে ঠকাইয়া নিপাথে নিয়া যাওয়াই গুরুর ধর্ম। কেত বা বলিল, কেউ-এন তো দিলেন না, শপথজ্ঞ তো দিলেন না। সেমানার বুদ্ধি কি না, গুরু যে ফাঁকি দিয়া সহজে কাজ সারিবেন, সেটা হইবার ঘো নাট!

কেত তরত চোখ তটী কপালে তুলিয়া বলিলে, ওমা, বিনা সাধনে কি কিছু হইবার যে আছে? তাই যদি হইত, তাহা হইলে ঠেকে এত সাধনে ভজন করিতে হইল কিসের জন্ত? আমি বলি, তাঁহাকে এত সাধন-ভজন করিতে হইয়াছে আমাদের মত অসহায়, পঙ্গু জন্ত। তাঁহাকে করিতে হইয়াছে বলিয়াই তো আর আমাকে করিতে হইবে না—ভয়সা শুধু তাঁর অহেতুক ফালদাস। এক জন লঠন জালে, পাঁচ জন লঠনধারীর পেছনে পেছনে সেট আলোতে পথ দেখিয়া চলে। রেলের ইঞ্জিনটাই হাঁসফাঁস করিয়া

ছোট্টে; পেছনের গাড়ীগুলিকে কয়লাও চিবাঁইতে হয় না, জলও গিলিতে হয় না। তবে শিকলে শিকলে যোগ থাকা চাই, চাকায় তেল থাকা চাই।

যদি নিতান্তই কর্মপাশ না কাটাইতে পার, তবে সেই কর্ম দিয়া তোমার নিজের চাকায় তেল দাও—নিজে ভাল হইবার চেষ্টা কর। কর্ম দিয়া সাধন দিয়া ভগবানকে বশ করা যায় না, তাহা হইলে তিনিও জীবের সামিগ হইয়া পড়িতেন। সাধনা শুধু আমার মনের ময়লামাটি ঘুচাইবার জন্ত, ভগবানের মন পরিষ্কার করিবার জন্ত নয়। সব সাধন-পন্থাষ্ট মূল কথাটা এই। জ্ঞানীয় কাছে যাও, তিনি বলিবেন, জ্ঞানই মোক্ষ, জ্ঞানই ব্রহ্ম; কিন্তু সে জ্ঞানের সঙ্গে তো কর্মের কোনও সম্বন্ধ নাট; তবে তোমার মনের ময়লা ঘুচাইবার জন্ত কর্মের প্রয়োজন হইতে পারে বটে। ভক্তের কাছে যাও, তিনি বলিবেন, যে ভক্তি নিতা-সিদ্ধ, তাহার আবার সাধনা কি? “নিতাসিদ্ধস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধাতা।” তোমার হৃদয়কে তাহার প্রকটনের উপযোগী করিতে যদি কিছু দরকার হয় করিতে পার। সঙ্গুরু বলিবেন, “অয়মেব তি তে বকৌ যং সমাধিসমুত্তিষ্ঠসি” —এই যে মুক্তির জন্ত সমাধি সমাধি করিয়া অস্থির হইয়াছ—এইটাই তোমার বন্ধন। একটা কথা মনে পড়ে। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, জপ করিব কি করিয়া—মোটই যে মন স্থির হয় না বলি, মনই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে জপ করিবার প্রয়োজন? মন স্থির করিবার জন্তই না জপ। স্থির মনই তো ভগবান্। তাঁহাতে আমাঠি ব্যবধান অস্ত্র কোথাও নাই—শুধু ব্যবধান এই মনের। মনটী মরিয়া গেলেই

আলোকে যেমন করিয়া আলো মিশাইয়া যায়, তেমনি করিয়া তিনি আর আমি মিশিয়া যাটব। এই মর্মান্বস্ত হৃৎজনকে আশুলিয়া রহিয়াছে বলিয়াই না তাঁহাকে এত আপনার ভাবি।

তার পর আর একটা কথা। ঠাণ্ডা পাওয়ার কোনও মূল্য নাট—পাটতে হয় তিল তিল করিয়া তবৎ দখল পাকা হয়। এই তটল প্রকৃতির আইন। শুধু বহিঃপ্রকৃতির আইন নয়, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিও এই রূপটি বলে। অথচ আমরা সংস্কার নিয়া বসিয়া আছি, খুব থানিকটা কসব করিয়া ঠাণ্ডা একদিন তাঁহাকে পাটব। বীজ ঠাণ্ডা ফলবন্ত গাছ হইয়া উঠে না; উষার সূর্য্য এক লাফে মধ্যাকাশে চড়িয়া বসে না; ক্রম সম্মা পূর্ণাবয়ব মাস্তব হইয়া যায় না। কিন্তু যে দিন যে বীজে যে সঙ্কল্পের স্ফূরণ শুরু হয়, সেট দিন হইতে সমস্ত বাধা-বিলম্ব জয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য একটা অদম্য প্রেরণা তাহার মাঝে জাগিয়া উঠে। তাহাকেই বলি প্রাণ। ভগবানকে পাটবার জন্য তাহার প্রাণে এই ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, সে জানে তলে তলে পাটবার রহস্য কত মধুর। সে বোঝে, যে দিন হইতে পাটবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সেইদিন হইতে পাওয়ার সূত্র হইয়াছে। যে সাধন হিসাবে যম্যনয়নের ব্রত গ্রহণ করিল, মনে করিয়াছিল, সে কিছু পাটল না? প্রতিদিনের তপস্যায় মন যতই মরিয়া আসিতে থাকবে, ততই যে রাজরাজধর সে শূন্য স্থান জুড়িয়া বসিবেন—এ যে গামিতিক সম্ভার ছায় অকাটা। কিন্তু সাধারণ সাধক, মনে করে এ আমার বৃথা সাধনা--তাঁহাকে পাটলাম না। এ তো মতা

নয়—এ হচ্ছে সংশয়। এই সংশয়ই তাঁহাকে বৃথাতে দেয় না যে তাঁহাকে পাটতে হইলে একটুকু সাধনারও প্রয়োজন থাকিতে পারে না—শুধু চাইলেই, তাঁহাকে পাওয়া যায়।

কৃষক বীজ পুতিয়া অঙ্কুরের অপেক্ষা করে; অঙ্কুর বাহির হইলে সযত্নে বড় করিয়া তোলে। তার পর যে দিন তার ফুল ঝরিয়া ফল ধরে, ফল পাকে, সেই দিন সে মনে করে—এতদিনে যাচা চাহিয়াছি, তাহা পাটয়াছি। সে ফল কি, তাহা জানে, তাই বীজনোপণের দিন হইতে এত দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসর তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু তুমি কি এমন করিয়া ভগবানকে ফলের মত পাতে চাও? তিনি তো ফলের মত স্নেহের ও নন, যে পাটয়াছ কি না পাটয়াছ, তাহা যাচাই করিয়া লহবে। আবার তিনি ফলের মত অস্বস্তি নন যে বীজদশায় তাঁহার সন্তা নাট বলিয়া নিজকে অকৃতার্থ করে। তিনি এমন কোনও পৃথকশর্তও নন যে বীজ হইতে তাঁহাকে একেবারে আগাদা কোঠায় ঠেলিয়া রাখবে। তিনি বীজ, তিনি অঙ্কুর, তিনি ফল, তিনি ফল—অনাদি অনন্ত আনন্দের প্রবাহ তিনি! তাঁর স্মতারের একপ্রাণ জড়াইতে পারিলে যে সবটাই বুকের মাঝে জড়াইয়া যায়।

তাই বলিতেছিলাম—পাওয়া কঠিন নয়, পাওয়া খুবই সহজ; পাটয়াই আছি। কিন্তু জানি না—জানিতে চাই না। তাই অসাধনের ধনকেও সাধনার কাঁসে বন্দী করিতে চাই। ওপারের আলো গজাল পুরিয়া আনিয়া অন্ধকারের বেড়া ডিঙাইয়া তুমি এ পারে ঢালায় দিবে—তাঁই এত সাধ্যসাধনা? মিনা পরিশ্রম! অন্ধকারের আড়াল ভাঙ্গিয়া দাও—আলোর বুকে আলো গলিয়া মিশিয়া যাটবে—সব সহজ হইবে।



## শ্রুতি-স্মৃতি

সাধন-ভজন করে নান্য স্থানে ঘুরে পুরুষ-  
কারের চূড়ান্ত কবে যখন হতাশ হয়ে পড়ে,  
তখনকার নির্ভরই প্রকৃত নির্ভর। তখন  
গুরুকৃপার জগ্ন 'আকুলতা' হয়। অনেক  
সাধনাবস্থাতে এমন জায়গায় এসে  
ঠেকে, যেখান থেকে বহু চেষ্টাতেও আর  
উঠতে পারে না; সেখানে গুরু ধাক্কা দিয়ে  
তুলে দেন। নির্ভর করতে চাই বললেই নির্ভর  
হয় না; নিশ্চয়্যাত্মিক বুদ্ধি নিয়ে নির্ভর  
করতে হয়।

✱

ভাবের সাধন খুব উচ্চ বটে, কিন্তু ভাব  
ঠিক রাখতে হলে অমুগত হয়ে সাধন করতে  
হয়। শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে শ্রীকৃষ্ণকে  
পাওয়া বাবে না, তাহলে তুমিই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে  
বাবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পেতে হলে বাধার  
ভাব নিতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে সখ্যরূপে  
পেতে চলে শ্রীদাম সুদামের অর্জুগত হয়ে  
সাধন করতে হবে। বাৎসল্যভাবে তাঁকে  
পেতে চলে যশোদার ভাব নিতে হবে  
—এমনি।

✱

বৈষ্ণবের ভাবের সাধনাত্মিক মধুর ও  
বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু সাধন করতে হলে  
উপযুক্ত অধিকারী হওয়া চাই। শুধু ভগবানকে  
বাবা বললে কি ভাব হয়? আপন বাবাকে  
যে ভক্তি করতে শিখেনি, ভগবানকে বাবা  
বলে সে আর কি পারে?

✱

আত্মসত্তা বিশ্বসত্তাতে মিশানোর নাম  
নির্কারণ। 'নিজের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অস্ত-  
ভব করাই নির্কারণ—উচ্চ আপন অস্তিত্বের  
বিনাশ নয়।

✱

আমিদের সংস্কার ও খামসিট জাতিভেদের  
কারণ। যার আত্ম একেবারে সঙ্কুচিত ও  
অচার ব্যবহার অনার্যের মত, সেট শূদ্র—  
ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হলেও সে শূদ্র। আর যার  
আত্ম জগৎ বাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তিনি নীচ-  
কুলোদ্ভব হলেও ব্রাহ্মণ। পুরাণে লোমশমুনির  
আখ্যান আছে। তাঁর একটা করে লোম  
থস্লে একটা ইন্দ্রপাত হয়। এমনি করে কত  
ইন্দ্রপাত হলে তবে তাঁর দেহগতন হবে,  
বৃদ্ধত হ'ল পার। কিন্তু তাঁর দেহে থাকবার  
ইচ্ছা নাট। তুট তাঁর প্রতি আদেশ হল,  
তুমি চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ কর, তাহলে তোমার  
লোম ঝরে যাবে। তিনি এক সদাচারী  
চণ্ডালের পাড়ী অন্নগ্রহণ করলেন, কিন্তু তাতে  
তাঁর কিছুই হল না। তার পর তিনি এক  
কদাচারী ব্রাহ্মণের ঘরে অন্নগ্রহণ করতেই  
তাঁর শরীরের সব লোম ঝরে পড়ল। তখন  
বোকা গেল, ব্রাহ্মণ হলেও বাস্তবিক সেট  
চণ্ডাল।

✱

প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনেও শূদ্র, বৈষ্ণু,  
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ হয়ে থাকে। মানুষ যখন  
প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দেয়, নিজের কিছু  
মাত্র স্বাধীনতা থাকে না, তখন সে শূদ্র। যখন

সে এটা চায়, "ওটা চায়, মুক্তির জন্য প্রাণে  
পিণাসা জাগে, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি আসে  
না, তখন সে বৈশ্র। যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে  
লাড়াই করে তাকে দমন করতে চেষ্টা করে,  
তখন সে ক্ষত্রিয়। আর যখন প্রবৃত্তি দমন  
করে নিজে স্বাধীনভাবে চলতে পারে, তখন  
সে ব্রাহ্মণ।

✱

যে আত্মবলি দিয়েছে সেট শিষ্য, আর  
মিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা, তিনিই গুরু।

✱

যখন যাগযজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তন ছিল,  
তখন স্মৃতিজগতের সঙ্গে স্থূলজগতের সম্বন্ধ  
হয়েছিল। তাই কাম্যাকর্ম দ্বারা দেবতাদেব  
সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা যেত। তার পর  
বুদ্ধদেব কর্ম হতে আরও উন্নত আদর্শ স্থাপন  
করেন, তখন কারণ জগতের তত্ত্ব আবিস্কৃত  
হয়। এ অবস্থা সুবৃন্তির মত; এ ছাড়াও  
যে আরও কিছু আছে, লোকের তার সন্ধান  
পায়নি। তুণীয়ানন্দের কথা সাধারণের তখন  
অজ্ঞাত ছিল। তার পর শঙ্করাচার্য্যের আবি-  
র্ভাব হলে তিনি জীবের সমুদায় আরও উচ্চ  
আদর্শ স্থাপন করলেন, তখন তুণীয় লোকের  
কথা সাধারণে প্রচার হল। প্রত্যেক অ-  
তারের কাজ ঠিক সিঁড়ির ধাপের মত, কেউ  
কাক থেকে আলাদা নয়।

✱

অদ্বৈতবাদীকে সব ছাড়তে হবে, কেবল  
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছাড়া। কারণ গুরুই যথার্থ  
অদ্বৈতবাদী জানী, আর শিষ্য অজ্ঞানী। মত  
দিন শিষ্য গুরুরূপে পরিণত না হবে, ততদিন  
এই সম্বন্ধ থাকবে। আর গুরুর অবস্থা লাভ

করলে আর কোনও ভেদ থাকবে না, সব  
একাকার হয়ে যাবে।

✱

গুরু যেন কাঁচপোকা আর শিষ্য তেলা  
পোকা। যতদিন শিষ্য কাঁচপোকাতে না  
পরিণত হবে, ততদিন গুরু কিছুতেই তাকে  
ছাড়বেন না।

✱

ঠিক কামনা শূন্য হওয়া যায় না। তবে যে  
কর্ম নিজ স্বার্থের জন্য করা যায়, তা কাম  
আর যা প্রেমের সঙ্গে পূর্ণের জন্য করা যায়,  
তাঁই নিকাম।

✱

সাংখ্যের টীকাকার বলেন, বৈতন্যাদ ভিন্ন  
আর কোনও উপায় নাই, কেননা আত্মা  
সর্বব্যাপী—স্বতন্ত্র আত্মা আত্মাকে কিরূপে  
দর্শন করবে? আত্মা-সাক্ষিরূপ যদি দগা  
হয়, তাহলেই বৈতন্য আনি চল। এ প্রশ্নের  
উত্তর এই যে মন স্বপ্নাবস্থায় নিজেই নানারূপ  
সৃষ্টি করে—নিজেই বাব হয়ে নিজেকে ভয়  
দেখায়। ঐমনি করে একই মন যদি দ্রষ্টা ও  
দৃশ্য হতে পারে, তবে আত্মাও কি আত্মার  
সাক্ষিরূপ হতে পারে না?

✱

মানুষকে ভগবান বলে না চিনার পূর্বে  
সংসার করা বৃথা।

✱

যুম মগা তামসী-বৃত্তি। যুম মানুষের সংজ্ঞা  
অবস্থা নষ্ট করিয়া তাকে অধিকার করে  
নেয়। যুমের মাঝে কাগ্রং থাকলে তাকেই  
বলে যোগনিদ্রা, উচ্চাট সমাধি। প্রায়কালে  
মহানিদ্রা এসে জগৎকে গ্রাস করে ফেলে;



নিদ্রাও তেমনই প্রতিদিন জীবকে গ্রাস করছে। আত্মার আর নিদ্রা, এটো দুই টে সাধনপথের বিশেষ কণ্টক। দিবানিদ্রা বিশেষ অনিষ্টকরক।

✱

একমাত্র তুমিই জীব; আর সকলকেই ভগবান বলে জানবে এবং ভাববে।

✱

যে চিরন্তন পয়ামী, তার সংবাদপত্র পাঠ করা উচিত নয়, কারণ চিরকে যত রাজে জিনিষ দেবে, ততই সে বিক্ৰিষ্ট হয়ে পড়বে, শেষে ভাক স্থির করা কঠিন হবে। বেশী শাস্ত্র পড়াও এটো জন্তু দোষব। একজন নিরক্ষর চাষাকে নির্জ্ঞান কিছু দিন বাথাল তাব ক্ষুদ্র মন শীঘ্রই সাম্য হয়ে আসবে কিন্তু একজন শিক্ষিত লোকের তা হবে না, তাব মান নানা রাজ্য কণাট জাগবে।

✱

মন ভাবে। হাক যদি রাজে জিনিষ দাও, তাহলে সে চঞ্চল হয়ে পড়েবে, তাব তৃপ্ত হবে না। কিন্তু জিনিষের মত জিনিষ একবার দিলে সে আন তা ছেড়ে উঠতে চাইবে না।

✱

নিরাধিকারীর কাছেই ভগবান, বিরাট; ক্রমে তিনি ছোট হয়ে আসেন।

✱

গুরু কাউকে বেশী, কাউকে কম কৃপা করতে পারেন না, তাহলে তিনি সদৃশ নন। তাঁর কৃপা অহেতুক বলেই সকলের প্রতি সমান। জলের মত তিনি কৃপা ঢেলে দেন, যেখানে বতটুকু গর্ত আছে, সেখানে ততটুকু

জল ঈর্ড়ায়। যে যেমন অধিকারী, সে তেমনই গুরুকৃপা পায়। সাধন-ভজন দ্বারা মন তৈবী হতে পারে, কিন্তু গুরুকৃপা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

✱

ভগবতের সমস্ত জীবই ভগবান। তাদের জন্তু প্রাণ ঢেলে দিতে পারলে তাদের সেবায় বড় হতে পারলে ভগবান নিজেই তোমাব কাজ করবেন, তোমায় কিছুই করতে হবে না।

✱

কালী নেংটা কেন? তাঁকে কাপড় পরতে হলে তাঁর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে তাঁকে আচ্ছাদন করতে হবে। তাও তিনি; সুতরাং কালী নেংটা। তিনি কাল কেন? প্রাণের সমস্ত তাঁকে নয় হয়, তাই তিনি কাল; কাগতে সমস্ত বং লগ হয়। কালীতাব ইত্যাদি ভবময়ী অর্থাৎ জ্ঞানময়ী মূর্তি; আব রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি ভাবময়ী অর্থাৎ মনোময়ী মূর্তি।

✱

আধ্যাত্মিক উন্নাত হচ্ছে কি না, তা কি করে দেখা যাবে? ভক্তের যতটুকু ভক্তি হতে থাকবে, ততটুকু সে নিজেকে ভক্তহীন, দীনাতি-দীন মনে করবে। জ্ঞান হচ্ছে কি না, তা নিজে গিচার করে দেখতে হয়। আগে আমি জগৎটাকে কি ভাবে দেখতাম, এখনই বা কি ভাবে দেখছি, এটো সব তুলনা করে বুঝতে হয়।

✱

গুরু মহাজন, শিষ্য নিঃস্বল খাতক। সুতরাং গুরুই দাতা, শিষ্য কিছুই দিতে পারে না। তবে শিষ্য উপযুক্ত হলে গুরুকে মূলধন ফিরিয়ে দিতে হয়।

✱

অদ্বৈতজ্ঞানে<sup>৩</sup> পরিণতি না হলে মুক্তি হয় না। এ জগতের অণুপরিমাণও ব্রহ্ম। সূত্রাং জগতের একটি পরিমাণও বাদ পড়লে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না।

✱

ভগবানের একটি বিশেষ মূর্তি দেখলেই কি হবে, বা শুধু জ্যোতিঃ দেখলেই বা কি হবে? জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত না হলে ও সমস্ত দেখার কিছু লাভ নাট।

✱

তত্ত্ব জেনে কাজ করলে অতি সহজেই ফল লাভ করা যায়; শুধু জড়ের মত কাজ করে গেলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। সাধারণ ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়, ভগবান্, তোমারি কৃপা হলেও হতে পারে, সে তোমার টেকা। আর জ্ঞানমিশ্রা প্রার্থনায় জোর থাকে—কেন তাঁর কৃপা হবে না, নিশ্চয়ই হবে!

✱

জলের নীচে কলসী ডুবিয়ে রাখলে যেমন হয়, আমরাও তেমনি ভগবানের মাঝে ডুবে আছি। কিন্তু পাত্রেই স্থল-দুঃখের সঙ্গে নিজকে জড়িয়ে বন্ধ হয়ে আছি। বাস্তবিক আমাদের উপাদান,তো ভগবান্ হতে ভিন্ন নয়। আমরা ব্রহ্মময়ীর সম্ভান, আমাদের নিগননন্ কেন আসবে? আমরা যে আনন্দের টংস!

✱

৳-গৌরী জ্ঞানময়, রাধাকৃষ্ণ ভাগময়। ৳র রাধা, গৌরী কৃষ্ণ। ৳রা সম্বোধনে হতে। শিব নিগুণ, শক্তি কর্মময়ী; রাধা নিগুণ, কৃষ্ণ কর্মময়। তাই শিবের নিকট, গৌরী ঘোড়চক্রে,আবার রাধার নিকট কৃষ্ণ ঘোড়চক্রে।

রাধা শুধু প্রেমময়ী, শক্তিময়ী নন। বৈষ্ণবী মারা—লক্ষ্মী ও সরস্বতী, যথাক্রমে বক্ষণশক্তি ও আদারণ শক্তি। একা লোক সৃষ্টির কর্তা; শিব মঙ্গলস্বরূপ রায়কর্তা। মুরগেই মঙ্গল। সরণের কোলেই মা আছেন।

✱

শূল, হুস্ম, তারণ বা বোদ্ধ, আর মহাকারণ যেমন জগতের, তেমনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আর তুরীয়-জীবের নিত্যাত্মভূত। শূল শরীরের সঙ্গেও এই প্লান মিলে। শালুযের দেহের কটিদেশ পর্যায় শূলজগতের প্রান্তিক, ওব মাঝে বিশেষ কোনও যন্ত্রাদি নাট, শুধু আঁতান, নিদ্রা, মৈথুনরূপ জীবভাবের কেন্দ্র; কটি হতে গলদেশ পর্যায় হুস্মাবস্থার সঙ্গে মেলে; মস্তক কারণ; তান উর্দ্ধে মহাকারণ।

✱

নাট্যাকিনয় জ্ঞান নিয়ে করা হয়; আর সাংসারাকিনয় অজ্ঞানভাবেই করে, তাই না এত জমে। মতিরায় অভিনয়ের কর্তা, রচয়িতা চুট-ঠুট; ভগবানও তাই। মতিরায় আশ্রয় কখনও নিজে সাজ নিয়ে আসবে না; এত হল অন্তর। রাম সীতার জন্ত কেঁদে, আর শ্রীকৃষ্ণ আসবে নেমে কত কীর্তি করে খুব অর্চনায় জমিয়েছিলেন। অভিনয় করছি জ্ঞান, রেখে আসার মাতানোই মজা।

✱

শূলদেহ, হুস্মদেহের মাতৃগর্ভস্বরূপ। যেমন মাতৃগর্ভে জীবের পুষ্টি সম্পূর্ণ হলে দেহ গর্ভ হতে বের হয়, তেমনি হুস্মদেহীও উপযুক্ত সময় হলে দেহরূপ গর্ভ হতে বের হয়ে পড়ে।

জীবের জন্ম হলে যেমন মায়ের নানীনাড়ীর সঙ্গে একটা সংযোগ থাকে আর সেটা বেটে দিতে হয়, অক্ষদেহীও তেমনি শরীর হতে বেরুলে ঘূড়ীর স্ততার মত একটা সংযোগ থাকে, ওটা না ছেঁড়া পর্য্যন্ত আবার দেহে ফিরতে পারে। অক্ষদেহও আবার কারণ দেহের গর্ভস্বরূপ এমনি করে ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে। দেহের মাঝেও এমনি বিভাগ আছে—আপাদমস্তক সগটাই স্থূল; আবার মূলধান হতে মস্তক পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম; আবার মস্তক হল কারণ।

✱

মা আছেন, আর তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়, এই দুটা কথা বিশ্বাস করতে পারলেই হয়। তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী—নিরাকার হলেও ভক্তের মনোময়ী মূর্তিতে আছেন।

সবাইকে তিনি সমান কৃপা করেন, তবে আবারভেদে সেট কৃপা বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যেমন শুকনা কাঠে আগুন দিবা মাত্র জ্বলে ওঠে, তেমনি সত্ত্বশুদ্ধ ভক্তের ভিতরে মা সচক্ষেই জাগ্রৎ হন। ভিজাকাঠে আগুন দিলে ক্রমে তার রস মরে গেলে তবে আগুন ধরে। বিশ্বাস করতে পারলে একদিন অশ্রু মাথের কৃপা উপলব্ধ হবে। মায়ের কৃপা হলেই মাকে পাওয়া যায়। নইলে সাধন-ভজনরূপ ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা কি অনন্তশক্তিকে বশ করা যায়? জোনাকী কখনও সূর্য্যকে প্রকাশ করতে পারে?

✱

প্রাণে ভাব জাগলে ভাবের বস্তু যে তাহেই আশ্রক না কেন, শুধুই 'আনন্দ' দিয়ে যায়।  
(ক্রমশঃ)



## গুরু কেন ?

এ প্রশ্ন আমাদের দেশে সাধারণ লোকে করে না, কেননা তাহাদের আদর্শমোষিত সংস্কার রক্ষিয়াছে, গুরুর নিকট তইকে মন্ত্র লেখতেই তইবে, নতুবা তাহের জ্ঞান শুদ্ধ হইবে না। এই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া একটা গুরুগিরির বাণসায় পর্য্যন্ত সমাধে চলিত নতিয়াছে। সেটা যে সর্ব্বাংশে খাঁটি ও সপ্রয়োজন, সে কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক সমাজসংস্কারের মত না বুঝিয়া না শুনিয়া তাহার উপর খড়্গহস্ত হওয়াও

সাজে না। অনিয়াদী বংশের মানুষ গরীব তইয়া পড়িলে আর সকলে তাহাকে তুচ্ছ-তাক্ষীণ্য করিতে পারে, কিন্তু সে বংশের রক্ত-ধারা যাহার ধমনীতে বহিতেছে, সে পারে না।

গুরু কেন—এ প্রশ্ন যাহারা গুরুকে আকুল তইয়া খুঁজিয়াছেন, খুঁজিয়া পাইয়াছেন এবং পাইয়া কৃতার্থ তইয়াছেন, তাহারাও করেন না। গুরুত্ব হিসাবে বা মানমর্যাদা হিসাবে, এমন লোকও এদেশে নিঃসৃত কম নয়।

তবে এ প্রশ্ন কারা করেন ?—বাঁবা মিথ্যা সংস্কার নিষা চোখ বুজিয়া থাকিতেও রাজী নন, আবার সন্তোষ তীব্র আলোককে নিজের চোখে যাচাই করিয়া লইবার শক্তি বা সাহসও বাঁহাদের নাই, তাঁহারাষ্ট মাঝপান হইতে এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। এ তর্ক শুনিয়া সংস্কারাক্রমে পিয়া উঠে, জ্ঞানী শুধু হাসেন। বুদ্ধির পরিণতি না হইলে শুধু তর্ক করিয়া সব তত্ত্ব বোঝা যায় না। তবুও সংস্কারীয় সংশয় নিরসনের জন্য কখনও তর্ক করিতে হয়, ইহা সভ্য সমাজের রীতি।

কনি মনের আনন্দে গাহিয়াছিলেন, “শুধাবো না পথ কোনও পথিকে !” কণা, টার অর্থ সম্পূর্ণ—অর্থাৎ সেট একট প্রশ্ন “গুরু কেন ?”, কিন্তু আমরা অরগিক, বুদ্ধিতে পারি না ভজনগানের মাঝে হঠাৎ এই খোঁচাটা কার প্রতি এবং কিসেরই বা প্রয়োজন ! দুধের হাঁড়িতে এই গোমূত্রবিন্দু প্রক্ষেপ কেন ? বাস্তবিক যে পথিক, যার চলার এখনও বিরাম হয় নাই, চলার শেষে কি আছে, তাহাও যে জানে না, তাহাকে তো কেহ গুরু বলে না, বা তাহার কাছ পথ জিজ্ঞাসা না করিলেও তো কিছু আসে যায় না। তবে যদি বল, আমরা কেবল চলি, কেবল চলি—তাঁই আনন্দ, চলার শেষে কি কোথাও আবে ? আর কোনও মানুষ কি চলার শেষ করিতে পারে ? এমন কথা শুনিলে বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হয়। মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে এত হীন ধারণা এ দেশের লোক করে না। তাহারা মানুষকে ভগবান্ যার ভগবানকে মানুষ করিতে ভয় পায় না। “সেই তিনি এই হইয়াছেন”—এট পরমানন্দময় বস্তুত্বের কথাই তাহাদের বেদগুরু উপ-

নিষদ- শুধু ঐচ্ছানিকের জড় বিবর্তন শুনিয়া বা চর্চের জঁহর কাদার ভাল ছানিয়া গগৎ গড়িয়াছেন জানিয়া তাহারা খুদী হইতে পারে না। নর-নারায়ণকে যাচাইও এক সময়ে আবদ্ধ করিতে পারে, তাহা বা বলিতেও পারে নবের চলার সীমা আছে, নারায়ণে তাহ সমাপ্তি ; এ কথা নরের সীমার দিক দিয়া। কিন্তু নারায়ণের চলার সীমা নাই, অগণিত নবের বিগ্রহে আনন্দে চলিয়া চলিয়া চলিয়া-ছেনই ; এট অসীমের ছোঁয়াতে নরও বুদ্ধি অসীম হইয়া উঠে, বুদ্ধি বা সীমানীন না-বা-য়ণকে বৃক্কের সীমায় বন্দী করিয়াই রাখে ! এঁই তো ভেদাত্মক তত্ত্ব যাকে ঐচ্ছক বলেন অচিন্মা, কিন্তু অনাস্বাদ্য বলেন না। যে নর-নারায়ণের এট রহস্য জানিয়াছে, সে জানে পথিককে পথ শুধাইবার কোনও প্রয়োজন নাই—তবে মানুষকে শুধানোর প্রয়োজন আছে। না শুধাইলেও এমন মানুষ আছে, যাঁহারা যাচিয়া পথ বলিয়া দেয়। ‘গুরু বড় পাগল !’

গুরু কেন ?—এট প্রশ্নের একটা কবিত্ব-ময় ভঙ্গী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

“আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, দেখ শচীশ, আমার বোধহয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার যার উপর ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

“শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ কর, বিদ্রী, চুপ কর—সহজকে কিসের দরকার। ফাঁকিট সহজ, সত্য কঠিন।

“আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাটবার জন্তই ত পথ দেখাইবার—

“শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো এ

তোমার ভূগোল বিবরণের সভা নয়—আমার অর্থ্যায়মী কেবল আমার পথ দিয়াই আনা গৌণ করেন—গুরুর পথ গুরুর অঙ্গিনাতেই গাওয়ার পথ।

“শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, বর্ষের নিম্নে, শ্রেয়ঃ, পরমেশ্বর ভগবানঃ কথাটার অর্থ কি। আর সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মানে, বাঁচায় না। আমার ভগবান্ অজ্ঞের হাতেও মুষ্টিভিক্ষা নছেন; যদি তাঁকে পাঠ তো আমিও তাঁকে পাঠব, নইলে নিম্নঃ শ্রেয়ঃ।

“তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সচক্ষে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি, সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয়, সে অন্ত্রের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

“শচীশ অল্পানমুখে বলিল, আমি কবি।”

শ্রীবিলাস শচীশের সঙ্গে তর্ক করিয়াছিল, বন্ধু বিপন্ন ভাবিয়া অস্বাচিতভাবে তাহাকে হিতোপদেশ দিতে গিয়াছিল; তাহার দক্ষণ সে যতখানি না নাকাল হইয়াছে, গুরু যে শচীশের মুখে মার খাইয়া তার চেয়ে বেশী নাকাল হইলেন, এটুকু কল্পনা করিয়াই অনেকে খুণী। বুদ্ধ ভারতবর্ষের এট এক আফিঙের মোতাজ—গুরুবাদ; ‘কবিত্বের চাবুকে যদি এ নেশা ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে বেচারার রক্ষা পায়!

শচীশকে আমি দোষ দিই না। সে তাহার প্রাণের অনুভূতিকে ব্যক্ত করিয়াছে বই তো নয়। কিন্তু ভাবি, শ্রীবিলাস কি বোকা, স্বজন্মে আপন মতটা পরের ঘাড়ে চাপাইতে

গেল। একটু আকোণ থাকিলে বুঝিতে পারিত, শচীশের যখন গুরুর দরকার হইবে, তখন আপনি সে খুঁজিয়া নিবে, মাঝখান হইতে আমি কেন ফোড়ন দিতে যাই। শেষ পর্য্যন্ত শচীশের কি হইল, খুঁজিয়া পাটলাম না। তার শেষ কথা এই—“হাঁকে আমি খুঁজিতেছি, তাঁকে আমার বড় দরকার, আর কিছুতে আমার দরকার নাট।”

টিক এই কথাতেই গুরুর রাজী মাং হইয়া গিয়াছে। কবি ছাঁসিয়া, তাই খোঁচা দিয়াই থামিয়া গিয়াছেন, বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাট। শচীশ এখনও সন্ধানী, আসল বস্তু এখনও পায় নাট—সে যদি গুরুকে প্রত্যাখ্যান করে, তাতে গুরুত্ব অপ্রমাণ হইয়া যায় না। কবির কল্পনাও সত্যের সন্ধান করিতেছে মাত্র, তাই পাতের মুখ দিয়া শুধু মনের সংশয়টা ব্যক্ত করিয়াই সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশে এমন নির্দোষও আছে, যাহারা এট কল্পনার সংশয়কেও বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া নিতে ধিঁধা করিবে না। তাহাদেরই বলি, সত্যের পথে শচীশের মত “ডোন্ট কেয়ার” করিয়া চল, তাহাতে আপত্তি নাট, বরং এট ‘অতিমাত্র পরমুখাপেক্ষীর দেশে একটু মাধটু স্বাধীন-চিন্তাতাকে প্রশংসার চোখেই দেখি; কিন্তু শেষ ফলটুকি হয়, দয়া করিয়া সেটটাও বলিয়া যাটও।

কবি শচীশের মুখ দিয়া যত কথা বলাইয়াছেন, তাহার সকলের জবাব এক কথায় হইয়া যাইত, শচীশ যদি মানুষ চিনিত, মানুষের মান বুঝিত। “এই মানুষে সে মানুষ আছে”—এ কথা বিশ্বাস করা কি সোজা! আর বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়াই তো প্রাণের ঠাকুরটা কাছে থাকিয়াও এত দুর্দে!

একটা কথা এ যুগের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 'হটয়া' আছে—সে দক্ষিণেশ্বরের কথা। মানুষ আসিয়া সেখানে মানুষকে প্রাণ করিয়াছিল, 'তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?' উত্তর হটয়াছিল, "হাঁ, দেখিয়াছি—যেমন তোমাকে দেখিতেছি, 'তার চেয়েও স্পষ্ট দেখিয়াছি।" "আমাকে দেখাইতে পার?" "হঁ, পার।" তার পর একবার অস্তিম মুহূর্ত্তে সেট মানুষট 'আবার মানুষকে বলিয়াছিল, "দেখিতে চাও তো দেখ—আমারই মাঝে।" এট চরম স্পর্ধাযুক্ত স্পর্শম আন্দলের পারতা—"হাঁ, আমার মাঝেই তোমাকে আমি তাহাকে দেখাইব"—যিনি বলিতে পারেন, তিনি গুরু। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত কথা বলিয়াছিলেন, যুগে যুগে সকল গুরুই শিষ্যকে এত কথা বলিয়া আসিয়াছেন, 'এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে তিনি এই কথা বলিয়াছেন, আরও বলিতেছেন এবং বলিবেন।

তার পর শচীশের এক একটা কথাই ধরি। পনের উপর ভর দিয়া সাধনাকে গৃহ্য করিতে তার অপত্তি আছে, কেননা সেটা ফাঁকি, সত্য কঠিন। তাহা হ'কথাতেই দাঁত, নির্ভর করার সত্যটা যে কত কঠিন, তাগা শচীশ জানেন না; অন্ততঃ তাহার পক্ষে যে কঠিন তা তো স্পষ্টই দেখিতেছি। দক্ষিণেশ্বরের হটয়ার একবার পরখ হইয়াছিল। শিষ্য বলিল, "আমি ছপার নান্ন নিতেও গাজী নহ।" গুরু বাগলেন, "দরকার। ক, তুই আমার বকলম দে, তোমার সব ভাব আমার।" শিষ্য বলিল, "আচ্ছ, তোমায় সব ভাবই দিলাম।" এর পর সেট শিষ্যের মুখেই শুনি, "মেয়েটা মরিয়া গেল, কিন্তু কাঁদিতে পারি না; কেব-

নই মনে হয়, কাঁদিবার ভারও তো আমার নয়, তাও যে আর একজনকে দিয়া দিয়াছি; অথচ আমার থেলা, বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে চায়, কিন্তু পারি না।" একেই বলে পনের উপর ভর দেওয়া। খুব সোজা, নয় কি? তাই তো শ্রীকৃষ্ণ আঠারো অধ্যায় গীতা পড়াইয়া অর্জুনকে শেষকালে বলিয়াছিলেন, "আমার উপর সব ছাড়িয়া দাও—তবেই মুক্তি। আর এটী হইল গুহ্য হটতে গুহ্যতম কথা—হাতক অতপন্নীকে এই সঙ্কেত শুনাটও না, তাহারা বুঝিতে পারিবেন না।"

তার পর অস্থর্যামীর পথ আর গুরুর পথে শচীশ তাল গোল পাকাটয়া গুরুর উপর অভিমান করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু গুরুর পথ আবু অস্থর্যামীর পথ যে এক, তাহার খেয়াল নাই। যে এখনও নিজের আঙিনাটুকু ডিলা হতে পারে নাই, তাহাকে তো কেহ গুরু বলে না। উপনিষদ্ যে "অন্ধেনৈব নীরমান যথাক্রমঃ" বলিয়া আঙিনাগেবীদের নিন্দা করিয়াছেন, শচীশের কি তাহাও জানা ছিল না? বেশী কথা বাড়ানার প্রয়োজন নাই—গুরু কেমন করিয়া পথ দেখান, তাহা হিন্দুরা যাহাকে জগদগুরু বলিয়া থাকেন, সেই শঙ্করাচার্য্যের একটা মাত্র শ্লোক উল্লেখ করিয়া দেখাতেছি। দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুর স্তব করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুযুবা।  
গুরোস্ত মোনঃ ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত হ্রিসসংশয়াঃ ॥

—"আশ্চর্য্য ব্যাপার। বট গাছের নীচে গুরু বসিয়া আছেন। শিষ্যেরা বৃদ্ধ—আর গুরু হইলেন যুবা। গুরু চুপ করিয়া আছেন—

উহাট তাঁহার উপদেশ; কিন্তু শিষ্যদের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাউতেছে।”

গুরুর মৌন কি করিয়া শিষ্যের সংশয় ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহা ভূক্তভোগী ছাড়া আর কাহাকেও তো বুঝান যায় না। দক্ষিণেশ্বরের গুরু বহিরহৃদের কাছে বুড়ি বুড়ি উপদেশ বিতরণ করিতেন, আর তাঁহার ষাটশ গোপালকে লইয়া কেবল ছেলেমানুষী করিতেন—আঙিনার কথাটা তখন নেহাৎ ঢাকা পড়িয়া থাকিত। অথচ শেষকালে পথ না দেখাটয়া দেওয়া সবেও তাঁহারাই দেখি আঙিনা পার হইয়া গেল। এটা কি অস্ত্র-ধার্মীর পথ নয়?

শচীশ মুষ্টি ভিক্ষার কথা তুলিয়াছিল। এ-ও সেই একই ধরণের ছেঁদো কথা। গুরু মুষ্টি ভিক্ষা দেন না, পুরুষস্বক্তের পুরুষের মত আপনাকে দান করেন—আর শিষ্যকে নিঃশব্দে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। নরেন্দ্রনাথ একবার পওহারী বাবার ধর্ম্ম নিতে গিয়াছিলেন। পওহারী বাবা কিছু মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহাকে স্বীকার করিলে নরেন্দ্রনাথের স্থূলভঃ কিছু অধর্ম্ম হইত না; কিন্তু নির্ভার ক্ষতি হইত, একটু স্বস্মৃতিস্বপ্ন দুর্বলতায় তাঁহাকে বিকল করিয়া দিত। গুরু তাঁহাকে সে সময় বাঁচাইলেন, বলিলেন, “তোমার পথে তুমি চল, পরধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছ কেন?” বোধ হয় শচীশের মতে এট উপদেশ শোনাও পরধর্ম্মাশ্রয়ের সামিল, অতএব ভয়ানক! যাহারা সদগুরু পাটয়াছে, তাহারা জানে, গুরুর মাঝে জুলুহবাজীর এক রতি মাত্র নাট—তিনি সহজ মানুষ, সহজ তাঁর আকর্ষণ। তিনি স্পষ্টই বলেন, “জানি সব, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলি না, বলিলে সাধুদ

থায় না।” ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে সেই শঙ্করাচার্য্যের এক কথা—“বয়ঃ ন বিনদামহে আমরা কারু সহিত বিবাদ না।” এটো তো গুরুর কথা। শিষ্যের সঙ্গেই না তাঁর বিবাদ কোথায় যে সে বেচারার স্বধর্ম্মনাশের ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল।

অন্তের কাছ থেকে কবিত্ব ধার করিয়া কবি হওয়া যায় না। কোনও গুরুই গুরুত্ব ধার দেন না। তবে তাঁরা লঘুকে গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন—সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা রাখেন না। কবি কখনও কবির অসম্মান করেন না। সুতরাং একজন কবি হইলেই যে আর সকল কবির সম্মান পরিহার করিবে হইবে এমন কোনও কথা নাট। শচীশ কবি—এই বোধটুকু তাহার পৌকষের পারচায়; কিন্তু পূর্বের পলিয়াড়ি—ইহার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাঠলে খুসী হইতাম। কিন্তু কবি আমাদের কাছে সে অযোগ্য দেন নাট। ভালট করিয়াছেন। নতুবা অসত্যকে ভয়ত আরও পল্লবিত করিয়া তোলা হইত।

শেষকালে একটা কথা বলিতে চাই। বাঙালী আঁপন খুসীতে চলিয়া ভগবান পাটয়াছেন, তাঁহার সেই বস্তুটা পাটয়া কি করেন, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করে! অর্থাৎ যে আনন্দ তাঁহারা পাটিলেন, তাহা পন্থকে দিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় কিনা; কিম্বা ভেমন সম্পষ্ট কোনও ইচ্ছা মনেব মাঝে না থাকিলেও সেই আনন্দ তাঁহাদের দেহ মনের গণ্ডী ভাঙিয়া বাটরে ছুড়াইয়া পড়ে কি না! পড়ে নিশ্চয়ই। প্রমাণ কবির নিজের কথা—“পথের পণিক সেও দেখে যাবে, তোমার বারতা মোর মুখ ভাবে।” হৃদয় ডাক

চাড়িয়া বলিতেও ইচ্ছা করেন, “ওরে ভৈরব! দেখে যা, আমি কি অপকৃপ বস্ত্র পেয়েছি!” হঠাৎ সেট ডাক শুনিয়া কেহ আসিয়া জোটে, সেবা করে, লুটাইয়া পড়ে। —

যদি তাই হয়, তাহা হইলে কবি যাহার ভয় করিতেছিলেন, ঠিক সেটাই তাঁর ভাগ্য ফলিয়া যায়; অর্থাৎ নিজের গুরু না মানিয়াও তিনি পরের গুরু হইয়া বসেন। এতে পমাণ

হয়, গুরুগিরিও মাহুয়েন স্বভাব, ঢেলাগিরিও স্বভাব। সুতরাং চাক্রিক আধ্যাত্মিক সংস্কার কর না কেন, ও ছুটা থাকিয়াই যাইবে। উপ-নিষেদও দেখিয়াছি আছে; অথচ সেখানে ঐশ্বর্যবাদের ভরা আসর। কবির শরীশ যদি শেষকালে শ্রীনিবাসের গুরু না মানিয়া যাইত, তাহা হইলে কি বলিয়াছি; তখনই গুরু কেন—এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইত।

## বীজমন্ত্র ও ভগবদ্ভাব

বীজ অগ্রে, কি বৃক্ষ অগ্রে—এই প্রশ্নের সমাধান তোমার আমার কাছে না হইলেও যোগিগণ ইহার শেষ সিদ্ধান্তে পৌছাইয়াছেন। যাহাদের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে, তাঁহার বীজ ও বৃক্ষকে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন না। কারণ বীজ ও বৃক্ষ স্বরূপতঃ এক—স্থলদৃষ্টিতে প্রভেদ প্রতীতি মাত্র। যাহা কখনও ছিল না, তাহা কখনও আসিতে পারে না। যদি একটা ক্ষুদ্র বট বীজের ভিতর বিশাল বট বৃক্ষ তাহার প্লাকাও কাণ্ড প্রভৃতি লইয়া গুপ্ত না থাকিত, তবে স্থলে উহা কখনও প্রকাশিত হইতৈ পারিত না। স্থল হইতেই স্থলের প্রকাশ; স্থল্য অব্যক্ত—স্থল ব্যক্ত। যদি কোন যোগী দায় যোগপথে ঐ বৃক্ষকে সংকোচ করেন, তবে ঐ বিশাল বটবৃক্ষ পুনরায় বীজাকার ধারণ করিবে। তুমি আমি এরূপ ভেদ করিতে পারিব না; কারণ আমরা স্থলেই নিত্য বাস করিতেছি। তোমার হাতে যে ছাড়াটা আছে,

যখনই উচ্চা গুটাও, উচ্চা ভ্রমণে ছড়ির কার্গ্য করিবে; আবার সম্প্রসারণ করিবে। উচ্চা রোদ-তাপ নিবারণ করিবে। এই বীজ ও বৃক্ষের ভেদবুদ্ধি যখন অগতঃ হইয়া উত্তরকে একট বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মিবে, তখনই মাত্র বীজ মন্ত্র ও তৎপ্রতিপাত্ত দেবতাকে অভিন্ন ভাবিতে পারিবে এবং তখনই মাত্র মন্ত্ররূপে দেবতার প্রকৃত আরাধনা হইবে। বলিতে পার, বীজ জড় বস্ত্র, ইহার সহিত দেবতার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু এ জগতে সঞ্জীব বস্ত্র একে-বারে জড় নহে। যদি একেবারে জড় হইত তবে সে বীজ কখনও অকুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারিত না। যেখানেই প্রাণের স্পন্দন আছে, সেখানেই চৈতন্য ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কার্গ্য করিতেছে।

কিন্তু বীজ একেবারে জড় না হউক—মন্ত্র ত শব্দমাত্র; শব্দ জড়। দেবতার সহিত শব্দের সম্বন্ধ কি? শব্দ ভাষার প্রতীক মাত্র।



আর দেবতা তদ্বাক্যক স্বীকৃত ভাবের প্রকাশ মাত্র। তবে তাঁহার প্রকাশক শব্দ ও শব্দ তাঁহার আনুষঙ্গিক ভাব ব্যতীত থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাবের ভেদ অচিস্তনীয়। এই ভাব জগতের যাবতীয় জীবের ভিতরই অল্পবিস্তর বর্তমান। গান্ধী হাম্বারন করিলে বৎস তাহার সমীপস্থ হয়। কপোত কপোতীকে ভালবাসা দেখাইবার সময় তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশক শব্দ করে। শব্দই ভাবের প্রতীক বলিয়া বারদীর ব্রহ্মচারী বামিনীর সচিত্র ভাবনিমিত্ত করিয়া সগা স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাহার শাবকগুলি বহুদিন পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। ভাব বাহিরে আসিলেই শব্দরূপে প্রকাশ পায়। একটু প্রাণধান করিলে জগৎটাই যে কাহারও ভাবের উৎস বা ভাবের স্থল প্রকাশ, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মন্ত্র ভাবসংহতি-আত্ম হইলেও তাহা তদ্বদর্শী মহাপুরুষের মুখ হইতে নিঃসৃত না হইলে বাধকের নিকট সম্পূর্ণ নির্জীব। এই নির্জীব মন্ত্র তুমি যত ভাবে যত বৎসরট জপ কর না কেন, উহা কখনই সঙ্গীততা প্রাপ্ত হইবে না। বটবীজ কাকের উদর হইতে প্রসূত্রে পাড়লেও অক্ষুর উদ্গত হয়—তৎপূর্বে হয় না।

দেবতার 'সমস্ত ভাবের প্রতীক, তজ্জগৎ প্রাতি দেবতার বীজ পৃথক্। অবশ্য দেবতার বিভিন্ন ভাবের প্রতীক হইলেও যে কোন দেবতাকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদ ভাবে উপাসনা করিলেই ভগবানের উপাসনা হয়। একমাত্র প্রাণই ভগবানের বাচক। ভগবদ্ভাবের বিশেষ বিশেষ অবস্থাসমূহের বীজ বিভিন্ন। এই সূক্ষ্ম বীজ কেহ সৃষ্টি করে

না। যদি কেহ বলেন, এই সমস্ত বীজ কোন ঋষি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে সমস্ত তত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়—কারণ শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "মন্ত্ৰোচ্চঃ।" সুতরাং মন্ত্রের কেহ স্রষ্টা নাট। ঋষিগণ স্বপ্ন ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন সেই সমস্ত ভাবের প্রতীক মন্ত্র তদবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল; ঋষিরা ত্রুটি মাত্র। তাঁহারা এই সমস্ত মন্ত্র উদঘাপন করতঃ তাহাদিগের সজীবতা আনয়ন করিয়া জগতে এক এক সময় লুপ্তপ্রায় ভাবধারা প্রবাহমান রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা দোষেতে পাই যে বীজ মন্ত্র অনাদি ও নিত্য এবং ভাবভেদে বীজ অনন্ত। কিন্তু যে বীজই তুমি জপ কর না কেন, দৃঢ়তার জন্ত পুনরায় বলিতে হইতেছে যে তাহা গুরুপঙ্কজ লব্ধ হওয়া চাই। "গুরুপঙ্কজলব্ধ" শুনিয়া অনেকে আবার ভগবান ও জীবের ভিতর ঘটক নিয়োগের কথা ভাবিয়া নাশিকাকুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ গাণতাত্ত্বিক মুসলমান ধর্ম—যাহা পৌরাণিকতাকে "আদৌ স্থান দেয় নাট—সেই ধর্ম আলোচনা করি, তবে দোষেতে পাই যে তাহারও গুরুপঙ্কজতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাহারা আল্লাহ সহিত সাক্ষাৎ যোগ রাখিতে চান, তাহাদিগকে মহম্মদ হাদিসে যে যোগকণ্ঠের সংকেত করিয়া গিয়াছেন, সেট প্রাণ অবলম্বন করিতে গেলে "মুশিদ" স্বীকার করিতে হইবে। সে মুশিদ ও মুরীদের সম্বন্ধ হিন্দুর গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ মাত্র। মুরীদের হাত ধরিয়া কোরাণ পাঠাচ্ছে তাহাকে মুশিদ বলিয়া স্বীকার করিলে মুশিদ "মোরা-কাবা" অর্থাৎ ধ্যানের বসিয়া মুরীদের হৃদয়ের সমস্ত হৃৎকলতা ও মালিছা অধিকারী হিসাবে যোগবলে ধুঁতয়া দিয়া মুদ্রিতচক্ষু মুরীদের

হৃদয় হঠতে খতঃ উখিত “জালা” রূপ মহা পবিত্র শব্দ শুনাটয়া তাহাকে উপদেশ প্রদানান্তে ছাড়িয়া দেন। ইহাট ঐ সম্বন্ধের শেষ নহে, আরম্ভ মাত্র। মুরীদ যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করুক না কেন, মুরশিদ “মারোঁ” মাঝে “কাশফ” করিয়া অর্থাৎ যোগবশে দেখিবেন যে মুরীদ কি করিতেছে ; প্রয়োজনবোধে দূবে থাকিয়া শক্তিসঞ্চার করিবেন।

সদগুরু নীজমন্ত শিষ্যে নিষেকন করিলে বৃষ্টিতে হটবে যে পুণিগত জড় বীজ শিষ্যের পক্ষে সজীবতা লাভ করিয়াছে। গুরু মন্তদান করিয়া কি উপায়ে সেই সজীব বীজে অচিরে অক্ষুব উদ্যত হয়, তাহার কোশল শিখাইয়া দেন ও সাধনার শক্তিসঞ্চার করেন। কিন্তু যে উপায়ে বীজ অচিরে মচ-মহীরুহ হইয়া বহু বহু জীবকে নিদাষতাপ হইতে মুক্তিলাভ দিয়া দানে সজীবিত ও ভূপ্ত করিতে পারে, সে উপায়টা কি ? আচার্য্য বলিয়াছেন, “মন্ত জপকালে মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে অর্থাৎ ইহাদের একত্র সংযোগ না হইলে শতকলেও মন্তসিদ্ধি হয় না।” এমন এত কথা তাৎপর্য্য কি ? শিব বলিলে সাম্প্রদায়িকতা আঁটসে; কিন্তু পরমশিব বলিলে আমরণ চিন্মাত্র বৃত্তি। সে চিন্মাত্রকে তুমি হুরি বল, রাম বল, শিব বল ক্ষতি নাই। গুরুপাদট কোন মুদ্রাযোগে খাসের তালে তালে অর্থাৎ প্রতি নিঃখাসের সঙ্গে সঙ্গে জপ করিতে হইবে। প্রাশ্বাসের সঙ্গে জপে কোন ফল হয় না, কারণ বায়ু বাহরে চলিয়া যায় এবং বায়ু সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; সুতরাং মন বহিষ্কৃত হইয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে খাসের

তালে তালে মন্তজপের ভিতর প্রাণায়াম ব্যাপারটা খুব প্রচ্ছন্নভাবে সুসংগত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এইরূপ তালে তালে জপে খাসের একটা, পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া যায় ও ক্রমে খাস ছোট হইয়া ভিতরেই বহমান হওয়ায় প্রাণবায়ুর আয়াম বা বিস্তার লাভ হয়। কিন্তু শক্তিকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীকে মূল্যধারে রাখিয়া বায়ুকে ও পরমশিবকে একত্র করিয়া জপ করিলে সে জপ নিষ্ফল হয়। খাসের তালে তালে যেমন জপ করিলে, তেমনি গুরুপাদট মুদ্রা বিশেষযোগে কুণ্ডলিনীশক্তিকে ও শিবসম্মিত করিয়া জপ করিতে হইবে। পদমশিব, শক্তি ও বায়ু—এই তিনকে একত্র করিয়া জপ করিলেও কিছু হইবে না, যদি মন অন্তর নিরাজ করে। তজ্জন্তই আচার্য্য সর্ব্বাঙ্গেই “মন” উল্লেখ করিয়াছেন। মন শিব, শক্তি, বায়ুকে লইয়া বস্ত্র গাঁকিবে।

সভক্তি মন্তজপ ভাবের সাধনা মাত্র এবং ভগবদ্ভাব মাত্রই অপ্রাকৃত। যেখানেই ভাবে ভগবানকে অঞ্জলি দেওয়া যায়, সেইখানেই তঁহার অঙ্গহ্রতি সাধকের হৃদয়ের মালিন্য নাশ করে। ভক্তিযোগে মন্তজাপক হও, বাহ্যজগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাক, সাধন সময়ে সেট সমস্ত সৌন্দর্য্য সম-বায়ে তোমার ইষ্টদেব-দেবীকে কল্পনার দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়া মন ব্যাপ্ত রাখ। যদি তুমি মন্তজপের ভাবে পবিত্র হইয়া কোন অন্ধ খজ্র ক্ষুধাগ্রস্ত সন্তানের ক্রন্দনে মাতার করুণা দেখিয়া থাক, যদি ছত্ৰাশনের জ্বালা ভিতর পুত্রের কল্যাণে কোন মাতাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থাক, তবে সেই স্নেহ নিংড়াইয়া জমাট করিয়া তোমার মায়ের মূর্ত্তি গড়িয়া তোল—তবেই না তুমি বাৎসল্যরসে পুষ্ট।

হইবে। এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়াই মন্ত্র জপে জগন্ময় মনোময় মূর্তিতে আনিভূত হন। কিন্তু দৃঢ়তার অভাবে সাধকের সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। সাধক যৈ পথটী অবলম্বন করুন না কেন, সে সাধক গৃহীতে হউন বা বনবাগীহী হউন—মনের বল, সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাবে কেহই অভীষ্টলাভে কৃতকার্য হন না। সিদ্ধি লাভ লক্ষ্য থাকিলে সাধকমাজেরই বুদ্ধদেবের দৃঢ়তার অনুকরণ করিতে হইবে; তবেই না তিনি সাধন ফল বুঝিতে পারিবেন। যৈমন নির্জন মনোরম স্থান চাই, তদ্রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া রাখিতে হইবে যে সিদ্ধি লাভ না করিয়া আসনভাগ করিব না। বুদ্ধদেব যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

“ইহাসনে শুষাতু মে শরীরং  
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়কং যাতু।  
অপ্রাপ্য বোধিঃ বহুকল্পদুর্লভং  
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥”

তদ্রূপ প্রত্যেক সাধকের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যে এইরূপ দৃঢ়তা সহকারে সংযত থাকি হইয়া নিজের ভিতর ভাব জমাট রাখিয়া অন্তর্ভাষণ একেবারে বর্জন করিয়া মন্ত্রকে সত্য করিয়া তুলিতে চায় ও পুষ্টিকর সাত্বিক আহাৰ গ্রহণ করিয়া শরীরকে সাধনযোগ্য করিয়া তুলে, সেই সাধকে প্রথমতঃ সাত্বিক ভাবের ক্ষুদ্রী হইতে দেখা যায়। সাধন সময়

তাহার শরীর মুহুমূর্তিঃ গোমাক্ষিত হয়, নেত্রে অশ্রুধারা গড়াইয়া যায়। মাঝে মাঝে মন্ত্রধ্বনি—মুপূরধ্বনিতে তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে ভাবিত হওয়ায় এক প্রকার নেশাগ্রস্তের ভায়া মাঝে মাঝে তাহার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইষ্টদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গণিয়া ভ্রম হয়। তার পর এই জন্মে এক দিন না এক দিনে এই স্থূল জগৎটা একটা প্রাচলিকার মত ধীরে ধীরে তার সমুখ হইতে সরিয়া গিয়া এক অভিনব ভাবরাজ্যের আবির্ভাব হয় ও “তস্মিন্ দৃষ্টে” সেই সাধকের ভববন্ধন বুচিয়া যায়।

কিন্তু মন্ত্র না হইলে কি সিদ্ধিলাভ বা আত্ম সাংস্কার হয় না?—হয়। তোমার আমার না হইতে পারে। উচ্চতম অধিকারী মন্ত্রের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ মহাসদ ইহারা কি কোন মন্ত্রের উপাসক ছিলেন? উচ্চতম অধিকারী ধ্যানস্থ হইয়া যে চিন্তাতরঙ্গগুলি তাহার মনকে বালাপালা করে, একে একে তাহাদিগকে দূর করিয়া মনকে শূন্যগত করে। এ পন্থাটা গীতার উক্ত আছে—

“যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চকলমস্থিরম্।  
তত্তত্তাতা নিরম্যৈতদাস্থ্যস্তো বশং নয়েৎ॥”

তার পর এমন দিন উপস্থিত হয়, যে দিন চিন্তে আর কোন চিন্তাতরঙ্গ উপস্থিত হয় এবং যে ক্ষণে চিন্তা নিস্তরঙ্গ হয়, তৎক্ষণাৎ সত্য প্রতিফলিত হয়।



## জ্ঞান ও ভক্তি



জ্ঞানের সচিৎ ভক্তির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, উচাই বিচার্য। বিচার করিতে গিয়া দেবর্ষি নারদ তিনটি পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, কাহারও মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন, কাহারও বা মতে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের আশ্রিত; কিন্তু আমরা বলি, ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ, উচাকে অপর কিছুই অপেক্ষা নাই। এই তিনটি পক্ষ দ্বারা কোন কোন অবস্থাকে দেখা করা হইতেছে, উচাই এখন আমরা দেখিবে।

স্পষ্টই দেখা যাউক—প্রথম দুইটি পক্ষ ভক্তিকে সাধারণ উপস্থিত করা হইয়াছে। ভক্তি জীবপুরুষের স্বয়ংসিদ্ধ সত্য, এই মতের সচিৎ উচাই আণাতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাহা স্বকণ্ঠে শুণের আনবণে তাহাও আবর্তিত হইয়া বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয়, এবং দ্বাপারে উচা একটী মৌলিক তত্ত্ব। অর্থাৎ জ্ঞান বা ভক্তি, যাহাই আমরা স্বকণ্ঠে উচ্চ না কেন, বর্তমানাবস্থায় অজ্ঞানতার সামান্যতঃ অসম্ভাব দৃষ্টান্ত—উচা বারংবারক ভাবে সত্য। আপনার সিদ্ধজীবনে স্বকণ্ঠের পরিপূর্ণ প্রকাশ বর্তমান বৈরাগ্য অপেক্ষাও তীব্রতরূপে প্রস্তুত এ তত্ত্বও পরিমার্গিত দৃষ্টিতে সত্য। এই দুইটি আণাতবিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে হইলে হয় দ্বৈতবাদসম্মত পরিণামবাদ অথবা অদ্বৈতবাদসম্মত মায়াবাদ ছাড়া আর কোনও মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—উচা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রের আঁকার করিবেন। সকলেই জানেন, এক দিক দিয়া

জীবের জীবন যেমন অকাটা, অপবদিক দিয়া তাহার শব্দও তেমনি অকাটা। উচার মীমাংসা এই তত্ত্বের পানে যে জীব ক্রমশঃ গিয়ে পরিণত হয় এবং এই পরিণামই প্রকৃতি। উচা দ্বৈত সিদ্ধান্ত। আবার এ-ও বলিলে পারি—পরিণামের যে ব্যাপারকে তত্ত্ব মনে করিতেছি, উচা ভাস্কর্য্য মাত্র; ভাব ভিন্ন বস্তুই অস্তিত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উচা হইলে সর্ববিশেষ পরিণামের অসীম তত্ত্বই একমাত্র সত্য এবং অব্যক্তের ব্যাপারস্বরূপ পরিণাম সেই অব্যক্তেরই মায়াবিজ্ঞান মাত্র। উচা অদ্বৈত মত। এই দৃষ্টিতে অপরিণামী তত্ত্বকে স্বয়ংসিদ্ধ আঁকার করা হইতেছে; উচার বিশেষণ যে কোনও পরিণামসম্বন্ধী সংস্কার ভাস্কর্য্য মাত্র। যিনি এই পথে চলিবেন, তাহাকে সিদ্ধভাবের মনন করিতে হইবে, সাধকভাবের নয়—দৈব সাধনা চহতে উচার এই পাথক।

মৌলিক দুইটি প্ৰত্যয় এই কারতম্য হইতে জ্ঞান ও ভক্তির ফলস্বরূপ এবং সাধনাপেক্ষায় কি প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পারি। পূর্বোক্ত বিচারে, প্রমাণিত হয়, যে ভক্তিকে দেবর্ষি ফলস্বরূপ বলিয়া সাধনাপেক্ষাতীন বলিতেছেন, তাহার অদ্বৈততত্ত্বই একটী ভঙ্গী মাত্র। উচার কথা আমরা পাবে বলিব। যে ভক্তিতে জ্ঞান সাধন অথবা অজ্ঞাতাশ্রয়রূপে জড়িত রহিয়াছে, উচা দ্বৈতবোধ বা প্রাকৃত পরিণামী অবস্থা মাত্র; সিদ্ধস্বরূপের সচিৎ উচার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে হয় উচাকে পরিণামের

অন্য স্তর অথবা মায়াবিশুদ্ধি বলা ছাড়া অন্য কোনও রূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না। ভক্তিপন্থীর অনেকে গগনদ্রহের এত অস্থির তৎ-  
ত্ব ধারণে না পারিয়া মাস্তানাদ জানীরই একচেটিয়া সম্পত্তি ভাবিয়া মায়ায় নাক্ষেপণ্য উঠেন। কে জানে উহাও মায়ায় প্রভাবিত না!

তাহা হইলে দেখিতে, আমাদের বিচার এই বৈতাবস্থা হইতে; অর্ধেকতর বিচারের অবকাশই নাই। এই বৈতাবস্থায় জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে কি না ইহা বোধ্য। পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, পরমতত্ত্বের তিনটি ক্ষুদ্র জীবের নিত্যমুহূর্ত্ত—আন্ত, ভাতি, প্রীতি বা সং, চিৎ, আনন্দ। কথায় আমরা তিনটিকে পৃথক পৃথক করিয়া প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু অমুহূর্ত্তে উহার পরস্পর নিবিড় হইয়া গড়াইয়া রাহিয়াছে, ইহা বানহ অস্তমুখী হইতে চেষ্টা করিলে, জ্ঞানই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষঃ যাহা অমুভবসিদ্ধ, তাহার অব্যক্তর প্রমাণ সংগ্রহ পিড়ষনা মাত্র। তবুও স্থল দুইটি সঙ্কেত উল্লেখ করিতেছি। প্রথম কথা, সত্তার বিলোপ আমাদের কল্পনাগীত। বস্তুনিগমের সত্তাকে নিলুপ্ত ভাবিতে পারি, কিন্তু নির্বিশেষে সমস্ত সত্তার বিলোপ অচিন্ত্য। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শূন্যেরও একটা স্বাভাসিকী সত্তা রহিয়াছে। আন্তর প্রমাণে সর্বশূন্য স্রুপ্তিতেও সত্তা বিলোপ হয় না। এই এক কথা। দ্বিতীয় কথা—জ্ঞান আছে, কিন্তু আনন্দ নাই, অথবা আনন্দ আছে কিন্তু তাহা অজ্ঞান, এরূপ কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। অপর্য্য এই তথ্যের পূর্বকোটিতে কেহ সংশয় করিতে

পারে, হৃৎকের জ্ঞান কি আনন্দময়? কিন্তু তর্কের কোঁকে ইহা ভুলিয়া গেলে হইবে না, যে আমরা অমুহূর্ত্তর স্বরূপ নিয়া আলোচনা করিতেছি, উহার আধিকার (Scope) নিয়া নয়। আনন্দকে বিষয়রূপে দর্শন করিতেছি না—বিষয়রূপেই উহারে আলোচনা করিতেছি। বর্তমান বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আনন্দকে বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করা কঠিন, তাহা পান; কিন্তু এইরূপে জ্ঞানকেও মোহ হইতে বিষুক্ত করিয়া বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। দুইটা কথা একত্র জুড়িলে ইহা প্রতিপন্ন হয় স্বরূপ চেনা কঠিন। ইহা আমাদের পূর্ব যৌক্য। সুতরাং এই অচেনা অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যে স্বরূপের বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

সং, চিৎ ও আনন্দে আনিভাব হইলে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জ্ঞান চিৎ, ভক্তি আনন্দ। সুতরাং ভক্তিতে জ্ঞান নাই, জ্ঞানে ভক্তি নাই, ইহা হইতে পাবে না। তবে আমাদের এই ভ্রান্তি উপস্থিত হয় কোথা হইতে? জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়া। জ্ঞানাত্মানী ভক্তিকে দূরে খেদাইয়া দেয়, বলে আমি সেহ সুতরাং ভালবাসি কাহাকে? কিন্তু এ-ও ভোঁ একপেশে কথা হইল, পূর্ণ জ্ঞানীর কথা হইল না। এত অহংটাকে উঁচাইয়া তৎস্বরূপে পৌছাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেছি, সব জানিলাম; কিন্তু তৎস্বরূপ যে অগণিত অহং-এ আনন্দে ভাসিয়া পড়িতেছেন, তিনি যে এই অহং-এর মেলাকে ভালবাসেন, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? তুমি যদি তিনি, তবে তুমিও প্রেমিক,

কেননা তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসেন, মুখা  
তাঁহার বড় ভাল লাগে, তাহাকে তিনি বুঝ  
করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভালবাসাও ভক্তির  
এক বিভাব, পরম পুরুষের আনন্দ। হয়ত  
আধুনিক ভক্তিবাদী সে কথাটা ভুলিয়া যান,  
তাই উপনিষদ-জ্ঞানের সহিত বিরোধের  
আশঙ্কায় কুটিল ভাব অগল্বন করেন; ভুলিয়া  
যান যে ভক্তি ভালবাসা ইত্যাদি দ্বিষ্ট সম্বন্ধ;  
শুধু ভক্তই ভালবাসেন না, ভগবানও ভাল-  
বাসেন; আর যে জানী ভগবান হইয়া যান,  
তিনিও ভালবাসিতে জানেন। তাঁরপর প্রকৃ-  
তির পরম ব্যাকুলতা যে-ভাক্ত্যে পরিচয়,  
সে-ভক্তি যে জ্ঞানসম্পর্কশূন্য, একথা বাতুল ভিন্ন-  
অন্ত কেহ বলিবে না। প্রকৃতির প্রেম জ্ঞানকে  
লক্ষ্য করিয়াই ছুটিয়াছে—জ্ঞানের আলোকেই  
তাঁহার পথ সমুজ্জ্বল। এ ব্যাপার যে সমস্ত  
জগৎ জুড়িয়া নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি—  
তবুও বলি ভক্তিতে জ্ঞানের স্থান নাই!

এই যে দ্বন্দ্বগুলি উপস্থিত হয়, এগুলি  
সাধক-রাগ্যের গুণগোলা। এই সমস্ত বিরোধ  
শুধু আমাদের বুদ্ধির দোষ। আমাদের বুদ্ধি  
খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত—কেননা  
পরমপুরুষের বহুভাতিমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা  
যদি বুদ্ধিকে তাঁহার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি  
জোড়া দিয়া ধারণা করিতে বলা হয়, তাহা  
হইলে তাঁহার আর খই মিলে না, সে একে-  
বারে নিষ্পন্দ হইয়া যায়। উহাই জ্ঞান বা  
ভক্তি—মনোবচনের অতীত, বুদ্ধির পরপার।  
যেমন পরমতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া বলিলাম,  
সং, চৈৎ এবং আনন্দ। তাঁর পর বাটখারা  
লইয়া ওজন করিতে বলিলাম, কোন বস্তুতে  
কতটুকু সত্তা, কতটুকু চৈতন্য, আর কতটুকু

আনন্দ; তাঁর 'পর' তাঁহার গণন, হরণ,  
পূরণ ইত্যাদি করিলাম; ক্রমেই হিসাব  
বাড়িয়া চলিল, আর তত্বকথা স্থপাকার হইতে  
লাগিল। কেহ কেহ—এমন বোকা যে এই  
কিছুরগুলিকেই জ্ঞান বলিয়া ভক্তির সচি-  
তাঁহার বিরোধ করনা করিয়া পসে। কিন্তু  
জ্ঞান না যে জ্ঞানও কণাশ্বরূপ উহাও বুদ্ধির  
অতীত, উহা সংশ্লেষণরূপ আন্তরানুভূতি। সচ্চি-  
দানন্দকে বুদ্ধিইয়া বুকে ভুলিয়া নাও দেখি—  
কোথায় থাকিবে সংখ্যা, পরিণাম আর  
পরিমাণ! সব তখন একরস হইয়া যাইবে।  
ইহাই জ্ঞানের অদৈত, ভক্তির অদৈত—ইহাই  
স্বরূপতত্ত্ব, অনাদিসিদ্ধ বস্তু।

সাংখ্যের ত্রিগুণের কথা স্মরণ কর।  
আচার্য্যেরা বলেন, তিনটি গুণ বহু ব্যক্তির  
সমষ্টি; উহারা নানাদিকভাবে মিশ্রিত।  
এইগুলি হইল সৃষ্টির তত্ত্ব। আবার ত্রিগুণ  
প্রকৃতির ধর্ম নয়, স্বরূপ; ত্রিগুণের সম-  
পরিণামে প্রलय—অব্যাক্তবস্থা; উহাই প্রকৃতি।  
ব্যাক্তবস্থা বিশিষ্ট বুদ্ধি দিয়া দেখি, কিন্তু  
অব্যাক্ত প্রকৃতিকে দর্শন করিতে হইলে বুদ্ধিকে  
একমুখী করিয়া সমাহিত (Focussed)  
করিতে হইবে। ইহাই সাংখ্য মত। পাঠক  
লক্ষ্য করবেন, ঠিক অমুরূপ যুক্ত ও চিন্তা-  
প্রণালী ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণেও প্রযুক্ত হইয়াছে।  
পরমতত্ত্বের সংশ্লিষ্ট ধারণা (Synthetic con-  
ception) শঙ্করের অদৈতবাদ; আর উহার  
বিশ্লিষ্ট ধারণা (Analytic conception)  
রামানুজের বিশিষ্টাদৈতবাদ। সাংখ্যে যে  
রীতিতে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, বেদান্তে সেই  
রীতিতে পুরুষের বিশ্লেষণ। বিশ্লিষ্ট তথ্যই  
স্বরূপ তত্ত্ব হইতে পারে না—উহা জ্ঞানও

নচে, ভক্তিও নহে। 'সংগঠিতধারণাই যথার্থ তত্ত্বাববোধ—উচ্চাট অদ্বৈত'। দ্বৈত উচ্চাটে গর্ভিত। এই অনুভবে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হয়—সাধনায় নয়, সিদ্ধির অনুরূপতায়।

সাধনায় ন্যান্যধিক্য থাকিবেত। দ্বৈতধর্মী তাহারই ছোট্ট পুঙ্খ উদাহৃত করিয়াছেন। "জ্ঞানকে ভক্তির সাধন মনে করা।" এই কথার বাবহারিক অর্থট প্রাণ করিতে হইবে, কেননা ইহা বৈকল্যমূলক কথা। এখানে জ্ঞান বা ভক্তির সিদ্ধান্তরূপের প্রতি উল্লেখ নাই। জ্ঞান বলিতে এখানে বুদ্ধি বিচার, তত্ত্বনিরূপণের ইচ্ছা, ভক্তি বলিতে বুদ্ধি বাকুলতা, প্রাপ্তির ইচ্ছা। পাঠিতে হইলে জানিতে হয়—এ তো সহজ বুদ্ধির কথা। অগস্ত্য জ্ঞান চরমে পাওয়া এবং জানা একই কথা, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা কি তাহা বুঝিতে পারি? পারি না বলিয়াই পাইবার চেষ্টা করি, যদিও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত মতে আমরা তাহাকে পাইয়াই আছি। সে সিদ্ধান্ত অদ্বৈত জীবন্ত প্রকৃতি হয় না বলিয়াই প্রাপ্তি থাকে আমাদের লক্ষ্য এবং সেট প্রাপ্তির উপায়কে বলি সাধন।

এই হিসাবে সামান্যতঃ জ্ঞানকেও প্রাপ্তির সাধন বলিয়া স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। ভগবান্ সৰ্ব্বদে আমাদেব সামান্যতঃ একটা ধারণা পর্যান্ত নাই, একটা উন্নত সংস্কার পর্যান্ত তাঁহার সৰ্ব্বদে পোষণ করিতে শিক্ষা করি নাই। এরূপ অবস্থায় ভক্তির উন্মেষ যে কোথা হইতে হয়, কিংবা জ্ঞান কি করিয়া সে ভক্তির বিরোধী হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভগবানের সৰ্ব্বদে মানব কতদূর অজ্ঞ হইতে পারে, সে সৰ্ব্বদে কল্পনার খাদেব সেই কুলির কথা মনে পড়ে, যাহাকে

ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিল, "তার নম্ব কত?" বলা বাহুল্য, এরূপ লোক সর্বদেবে সর্বকালেই সম্ভব। আমরা যে এত শিক্ষার অভিমান করি, আমাদের ধারণা সুস্পষ্টভাবে বিচার করিলে ঐ কুলির ধারণার চেয়ে বিশেষ উন্নত বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জ্ঞান বিশেষ করিয়াই তো ভক্তির সাধক, পোষক, উন্মেষক। মহর্ষি গর্গ যে "বৎকথায় অনুরাগকে" ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা জ্ঞান সাধনেরই সূচনা হইতেছি না কি? তাঁহার কীর্তন, মনন, আলোচন দ্বারা সাংসারিকভাবে তাঁহারই জ্ঞান অর্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে এবং উচ্চাট আলোচনা এবং আলোচ্য বিষয়েব প্রতি অনুরাগ স্ফুর্ত হইয়া দেয়। এই অনুরাগই যদি ভক্তির বীজ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে তাহার সাধন বলা চলে না কি?

ফল কথা, কোনও একটা মতবাদের দৌক্তিকতা নিরূপণ করিতে হইলে আপাতদৃষ্টে অগস্ত্য দ্বারা তাহার বিচার করিতে হইবে; দ্বৈত বা দ্বৈতবাদ চরমকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেবল মতের সঙ্গে মতের সংঘর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিলেই কিছু অধ্যাত্মিকের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যাইবে না। বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা, তাহাতে জ্ঞানশূন্য ভক্তির অধিকারী কয় জন, বিশুদ্ধ ভাবাবেশ পরিণাম কার্য্যের শক্তি বা কয়জন্য আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কি জ্ঞান, কি ভক্তি সিদ্ধির কোঠায় পৌছাইলেই বিচারের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধনদশায় উভয়ই বিচার না থাকিয়াই পারে না—ইহা

মনোবাজার 'অলঙ্ঘ্য' আইন। উঠাই, লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানকে যিনি ভক্তির অঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সাধকের অঙ্কিত করেন নাট; তাঁহার বাণীও সাধনার একান্তেব, পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

তার পর সাধনার কথাটি বলি। পাইব হইলে জানিতে হইবে, কী প্রথম অধিকারীর কথা। অধ্যাত্মরাজ্যও শিশু আছে, ভগবানের প্রতি লোভ জন্মায়। নিম্নে তত্বে তাহাদিগকেও ভগবানের কথা জানাইয়া দিতে হয়। শিশুর মত অধ্যাত্মরাজ্য প্রথম প্রবেশে সাধকের হৃদয়ে। জজ্ঞাসাচ্ছ জাগে। উপযুক্ত গুরু পণ্ডিতালনে এই জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়া যখন বুদ্ধির কণ্ঠে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, তখন সাধকের এই বোধ জন্মায় যে জানিতে জানিতে একদিন তাঁহাকে পাইব, এ তো নয়; জানার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহাকে পাইতেছি। এই ভাবই হইল জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির অত্যাশ্রয় সম্বন্ধ। জানিলে পাইব—এই মনোভাবে প্রাপ্ত সাধ্যরূপে দূরে থাকে, জানার চেষ্টাটাই একান্ত হইয়া দেখা দেয়। ইহার কথাতাই দেবর্ষ বলিতেছেন—  
“তস্যা জ্ঞানেনৈব সাধন-মিত্যেক।” এত ভাবের পরিণতি দেবর্ষের পরবর্তী উক্তিহেতু প্রকাশ পাইতেছে—  
“অন্যোন্യാশ্রয়স্বমিত্যেক।”  
এখানে জানাও পাওয়া—জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের হাত ধরিয়ঃ চলিয়াছে। সমস্ত

বাপারটাকে এখানে পরিণাম দৃষ্টি দিয়া দেখা হইতেছে। যেমন দেহ বাড়ি, মনের পরিণতি হয়, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যের শিশুরও পরিপুষ্ট হইতেছে—ভার্যার জ্ঞানের পুষ্টি প্রেমকে পুষ্ট করিতেছে, প্রেম পুষ্ট হইয়া নূতন জ্ঞানের তোরণদ্বার উদ্বাটিত করিয়া দিতেছে। এইরূপ একটা অঙ্গাঙ্গিভাব আশ্রয় করিয়া পরিণাম ঘটা সাধকের অন্তর্ভূত সম্বন্ধ; কিন্তু এ অবস্থা 'দৈত-গর্তিত'; পদ্ধতিমমাজ্জৈত হইল।

ইহার পরের অবস্থাত ভক্তির অবয়বস্থা; তখন জানিতে জানিতে পাইতেছি, একরূপ চিত্তপরিণামেরও চঞ্জিত নাট—একেবারে সুস্পষ্ট অন্তর্ভূতি পাইয়াছি—পাইয়াই আছি। এ অবস্থায় সাধাও নাট, সাধনাও নাট—কৌনও দৈতের তরঙ্গভঙ্গ নাট। এই নিশ্চল সমাধিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই দেবর্ষ বলিতেছেন—স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারীঃ—ব্রহ্মকুমারেরা বলেন, ভক্তি স্বয়ং ফলরূপ অর্থাৎ তাহা পরমপ্রাপ্তি। সেখানে আর বলিবার কঠিনার কিছু নাই। জ্ঞানও ঠিক এইরূপ স্বয়ং-ফলরূপ। এত সিদ্ধান্ত। এখানে জ্ঞান ও ভক্তি একই কথা—উভয়ে বিরোধ কোণায়? দুইটা দলে একটা চণকের উৎপত্তি, ইহাকে বিরোধ বালনে? সাধকবৃত্তিতেও যে উভয়ের বিরোধ করনী শুধু আধকাংশেই বিন্যতির ফল মাত্র, সে কথা পূর্বেই বর্ণিয়াছি।



## ❀ सोहम् ❀

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]

— ❀\*❀ —

একটা ভারী কোণা মস্ত আছে—সবারই সেটা জানা থাকার কারণ। মস্তটা হচ্ছে, **সোহ-হম্ (Soham)**। ইংরেজীতে So মানে এমনি, কিন্তু সংস্কৃতে So অর্থে সেই। আর সেই বলতে সর্বত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয়। ভারতবর্ষে খ্রী কখনও স্বামীব নাম ধরে ডাকে না। সে জানে, জগতে একটামাত্র পুরুষ আছে, আর সে হচ্ছে তাব স্বামী। তাই স্বামীকে সে বলে “সেই” বা উনি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার কাছে আর কেউ নাই। কাজেই স্বামীই তার ভগবান, আর তাই দিনরাত ভগবানের চিন্তাতেই সে বিভোর। তেমনি বেদান্তীন কাছেও “সঃ” বলতে একমাত্র ব্রহ্মকে বুঝায়, আর ব্রহ্ম তার সব জুড়ে রয়েছেন। একমাত্র সত্য আছে জগতে সে হচ্ছে আমার আত্ম-স্বরূপ। এই ভাবটা সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে।

“হম্” বলতে ফারসীতে “আমি”কে বোঝায়। ইংরেজী Soham কথাটার H অক্ষরটা বাদ দিয়ে একটা I শেষে জুড়ে দাও কথাটা দাঁড়াবে, So-am-I—সেই আমি, আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আমার ভিতর দিয়ে সদাক্ষরিত, কেননা যা কিছু আছে, সব তিনি। এই মন্ত্রে ওম লুকানো আছে। S আর H ছেড়ে দাও, থাকবে OM। শ্বাসের সঙ্গে স্বভাবতঃই সোহহম্ মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, স্ত-রাং মন্ত্রের অর্থটা সর্বকণের জন্য আমাদের

মন জাগরুক রাখা উচিত। শ্বাসের ওপর নজর রেখে সোহহম্ মন্ত্রে তাকে নিয়মিত করে গেঁথে নাও। এটা একাধারে শরীর, মন ও আত্মার রসায়ন। শ্বাসের সঙ্গে ছুটা ক্রিয়া চলে, একটা প্রবেশ আর একটা নির্গমন। নিঃশ্বাসের সময় বলি সোহ, আর প্রাশ্বাসের সময় বলি হম্! শিক্ষার্থীর পক্ষে কখনও কখনও ওঙ্কারজপের চেয়ে সোহহম্ মন্ত্র জপ করা সুবিধা—কেননা সোহহমে ওঙ্কারও গোপা আছে। বহন স্পষ্ট উচ্চারণ করছি না, তখনও মন্তব্য ভাবনা করতে হয়, অন্তরে অন্তরে তার চিন্তা করতে হয় আর বাস্তবিক ভাবে শ্বাস ফেলতে হয়।

এটা সবার পক্ষেই একটা পথঃ প্রেরণা। জড়ের মোহ হতে মুক্ত করে এই মন্ত্র মানুষকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করে। সোহহম্—সোহহম্। বিশ্বের সর্বত্রই ছন্দোবদ্ধ গতির প্রকাশ। সংস্কৃতে সত্যতাকেও তাই বলে; সোহহম্—আমি সত্যপ্রকাশ! আমিই আলো দিচ্ছি—আমি দাতা, গ্রহীতা নই—দেহ শুধু, বিনিময়ে কিছু নিই না। হৃদয় কার কাছে থেকে কড়া চিঠি পেলাম, কিম্বা কোনও ঈর্ষাধারণা লোকের বিষেষপূর্ণ চিঠি পেলাম। তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠা, দুঃখ কান, মাথা ঘামাতে বসে পড় না। তোমার ব্রহ্মে অপ্রতিষ্ঠ থাক তখন অটল থাক। যে তোমার সব চেয়ে ক্ষতি করছে, যৈত্রী ও

করণার সঙ্গে ভারত মনন কর। তারাও তোমার তুমি—আর তুমি কখনও তোমার অশুভ কামনা করতে পার না। আমি সনি তার সনিতা—জ্যোতিঃ আমি, শক্তি আমি, মহিমা আমি। কে আমার অনিষ্ট করবে? আমি তো আমার অনিষ্ট করতে পারি না—সে যে অসম্ভব। পরেও মিথ্যা ধারণাকে অতিক্রম করে ওঠ—ও সব তুচ্ছ। ভগবান তোমার বকে থেকে কথা কহে, ভাবেন, কাগ কলেন! ব্রহ্মের প্রকৃষ্টি থেকে পরা শাস্তির অধিকারী হও! আমিই যে সনিতা—জগতের আলো আমি।

পূর্ণ শক্তিশালী তুমি, এই অশুভবে দ্বন্দ্ব হও। ঠিক জেনো, যত কিছু বাধাপ্রতি, সবার মূল কারণ হচ্ছে দেশের সীমান্তা নেপ্তি ক্ষুদ্র-মুহূর্ত্ত এর তোয়াজ। এই চিন্তাতেই আমরা ঢর্কল হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি। এই রোগ দূর করতে হলে নির্জন ঘরে বসে ভগবানের কাছে আকুল হয়ে কঁদতে হবে আর বুক ঠুকে প্রবৃত্তিকে বলতে হবে—দূর হ সয়তান—দূর হ! এমন অবস্থায় নিজকে ভাবিত করতে হবে যেন এই দেহ তোমার কোনও কালেই ছিল না—তুমি ব্রহ্মস্বরূপ তুমি দেহ নও! যদি নিজে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ থাক, তাহলে অপরের ফন্দী-বাজী বা চিন্তায় তোমায় ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। এই যে দেহটাকে তোমায় এত সাধ্য সাধনা করছ—এ যে একটা মনীচিকা মাত্র। আমিই ব্রহ্ম। জান এই কথা? মিথ্যা ধারণায় আস্থা রেখো না—সত্যে বিশ্বাস কর। তত্ত্বমসি—কুচিন্তা বা প্রলোভন তোমার পুণ্য সংস্পর্শ হতে শত যোজন দূরে থাকবে। তোমার সামনে এসে দাঁড়ায় এমন সাধা কি

তাদের! তুমি পুণ্য, তুমি পুণ্য এইটা ভাব দেখি। রোগ কোথায়? আশা রেখো না, ভয় রেখো না, দায় মাথায় নিও না। কর্তব্যের দাড়িতে বাধা হয়ে কাজে হাত দিও না। কর্ম আবার কি? সে তো তোমারই সৃষ্টি! রাজাধিরাজের মত কর্ম কর। সব তোমার কাছে হবে ছেলে-খেলা। তাই মুক্ত হয়ে আনন্দ নিয়ে কর্ম কর।

ব্যাপি হ'র কম। আমাদের ভাবীয় তাকে বলি আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরীণ, আর আধি-ভৌতিক বা বাহ্যিক। সোজাসুজি এ দুটো হচ্ছে পিণাচব্যাধি আর গাঙ্করব্য্যাধি, পুরুষ-ব্য্যাধি আর স্ত্রীব্যাধি। কথাটার অর্থ কি জান? স্ত্রীব্যাধি বলছি সেটগুলোকে, যেগুলো আমাদের ভিতর থেকে হয়। বাসনা-কামনা আসক্তি এইগুলো হচ্ছে স্ত্রীরোগ। আর পুরুষব্য্যাধি হচ্ছে যে সব দৈব-আপৎ পরের কর্মে বা প্রভাবের দরুণ আমাদের ওপর এসে চাপে। মানুষকে কেমন করে আরাম করতে হয়, বল দেখি? পুংরোগের জন্য তোমার তত ভাবনা নেই, আধিভৌতিক বিকারের দরুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে না। বাসনাতাই তোমায় খুঁড়ে খাচ্ছে; যে মুহূর্ত্তে ওদের হাত হতে পরিজ্ঞান পাবে, সেট মুহূর্ত্ত হতে আধিভৌতিক ব্যাধিও দূরে পালাবে। কিন্তু মানুষের ভুল হয় এইখানে যে, সে নিজের কাজের হিসাব রাখে না। নিজের বাসনা কামনার দরুণ যে বিপত্তির সৃষ্টি হয়, তার দিকে তার বড় খেয়াল নাই। বাইরের ভয়টাই লোকে আগে দূর করতে চায়, তাই গোড়াতাই বে-হিসাবে কাজ শুরু হয়। মানুষ চায় আগে অবস্থার সঙ্গে লড়তে। যে পুংব্য্যাধি পরের সংস্পর্শে জন্মেছে, তাই তাগা আগে দূর করতে চায়।

বেদান্ত বলেন, বাসনা-কামনা তো তোমারই  
হর্ষলতা।

তোমাতে যে প্রকৃতির অংশ একটা আছে,  
বাটের প্রভাবকে সেট ধরে টেনে আনে।  
একটা কুকুরের মূখে এক টুকরা মাংস আছে,  
তা দেখে আর সব কুকুর ছুটে আসে তা কেড়ে  
খেতে। জ্বরোগ আগে আরাম কর, পুংব্যাধি  
আপনা হুতেই দূর হয়ে যাবে। জ্বরোগ  
সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবার আরও কিছু আছে।  
তোমরা সবাই এখানে আছ। কেউ যদি  
সর্বতোভাবে পবিত্র থেকে থাক, সমস্ত  
প্রলোভনকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে থাক, অস্ব-  
নিহিত ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভূতি পেয়ে বলতে  
পেরে থাক—“দূর হ সমস্তান, তোর দান  
আমি চাই না”—তাহলে তার কাছে আমার  
একটা কথা বলবার আছে। আমি জ্ঞানি,  
এ জগতে কারু কামনা বাসনা বা কারু প্রলো-  
ভনে কোনও দিন তার কোনও অনিষ্ট করতে  
পারবে না। কোনও শক্তি তাকে উৎপীড়িত  
বা পদদলিত করতে পারবে না—কেননা  
আমুয় ব্যাধি হতে সে যে মুক্ত। যখনই আমরা  
হর্ষলচেতা হয়ে কেবল চর্যমুখ খুঁজি, তখন  
কি হয়? শত্রুপক্ষের যত কুচিন্তা, সব প্রলো-  
ভনের আকার ধরে আমাদের গ্রাস করে  
ফেলে। যদি মূখ-শান্তি চাও, ব্রহ্মানন্দ ভোগ  
করতে চাও, তাহলে প্রবৃত্তিকে মেনে ফেলতে  
হবে। এই মৃত্যুই জীবন, এই মৃত্যুই জীবন।  
অমৃতভব কর যে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ—এখনি—  
এখানেই! তারতবর্ষে গিয়ে ব্রহ্ম হবে, এমন  
মূলভূমি বুদ্ধি ফেঁদে না। কাটো বাঁধন; আর  
বাঁধন যখন কাটেতেই হবে, তখন ঠাণ্ডা মাথা,  
আর প্রশান্ত মেজাজ নিয়ে লেগে যাও  
কাজে!

কোনও কামনা আমার নাই। আমার  
অভাব নাই, ভয় নাই, আশা নাই, দায়  
নাই!

একটা বৃত্ত আঁকলাম ক। এটা যেন  
একটা কপিকল আর তাতে সূক্ষ্ম একটা  
রেশমী সূতা ঝোলান আছে। সূতাটার দুই  
প্রান্তে দুটা তার বাঁধা একটা ১০ ছটাক  
আর একটা ৬ ছটাক। ধর, ছয় ছটাকের  
সঙ্গে আর চার ছটাক ভার বেঁধে দিলাম।  
ছয় আর চার হল দশ, দুদিকেই দশ। কপি-  
কলটা মোজা করে ধর, কোনও ভারই নড়বে  
না। তার চার ছটাকীটা সরিয়ে নাও, এক-  
ধারে থাকল দশ, আর একধারে ছয়। এখন  
ছয়ধার ভার সমান থাকবে না? ফলে কি  
হবে? দশছটাকী নেমে যাবে, ছয়ছটাকী  
উঠতে থাকবে এক মুহূর্ত পরে আবার ছয়  
ছটাকের সঙ্গে চার ছটাক জুড়ে দিলাম, আবার  
দুদিক সমান হল। ফল কি হবে? সবাই  
বলবে, ভারকেন্দ্র সমান থাকবে, কোনটা  
ভারই নড়বে না। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না,  
ভার দুটা ওঠা-নামা করতেই থাকবে। প্রথম  
প্রথম মনে, ছয়, এক মুহূর্ত পরে যদি ভার  
দুটো সমান করে দেওয়া হয়, তখন তাদের  
কৌণিক সামলে যাবে। রাম যখন বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন, তখন  
ছেলেরা সবাই বলেছিল, ভার দুটো থেমে  
যাবে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখানো হল, তা  
হয় না। ছেলেরা দেখল। ভাব দুটো সমান  
হয়েও ওঠা নামা করছে, নেমে যাচ্ছে না।

এ থেকে বুঝতে পারছি, প্রথমেই যদি  
ভার দুটা সমান হত, তাহলে তারা নড়ত  
না—আদিম স্থাপত্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকত।

কিন্তু একবার গতি শুরু হলে পর ঠুথুরের ভাণ সমান করে দিলেও গতিরোধ হবে না।

তারপর ছয় ছটাকী আন দশ ছটাকী ভাণ ছটাকে ছধারে কুলিয়ে যেখে দুই সেকেন্ড কাল স্থতাটা চলতে দিই, আবার দুই সেকেন্ড পরেই একটা চার ছটাকী জুড়ে দিয়ে তার ছটাকে সমান করি, তাহলেও কিন্তু স্থতার গতি রোধ হবে না। এমন করে তিন সেকেন্ড পরেও যদি তার ছটো সমান করি, স্থতাও গতি রোধ হবে না।

কিন্তু এর মাঝে একটা কথা আছে। হিসাবে দেখা যাবে, এক সেকেন্ড পরে তার ছটার বেগ হয়েছে সেকেন্ডে চার ফিট করে। ছধারের সমান ভাণ যদি এমনি করে বজায় রাখা যায়, তা হলে দুসেকেন্ডের গাড় বেগ দাঁড়াবে সেকেন্ডে অট ফিট করে। তিন সেকেন্ড পরে সমান ভাণ থাকলে বেগ হবে সেকেন্ডে বার ফিট করে; চার সেকেন্ডে হবে ষোল ফিট করে ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অসমান ভাণ থাকতে প্রত্যেক সেকেন্ডের অন্তর বেগে তারতম্য হচ্ছে। আর সে তারতম্যের পরিমাণ হচ্ছে আদিম বেগ + ৪। এমনি করে সেকেন্ডে চার ফিট করে বেগ বেড়েই চলেছে। কিন্তু আদি-বেগ একই থেকে যাচ্ছে।

আবার দেখি, বেগ সঞ্চাব করবার পূর্বে যদি তার ছটাকে সমান করে বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে স্থতাটা আর চলে না। কিন্তু চার ফিট বেগ সঞ্চাব করবার পর যদি তার ছটাকে সমান করে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে স্থতাটা চলবে, কিন্তু আর বেগ সঞ্চাব হবে না। যেমনি দুই সেকেন্ড পরে

তার ছটো সমান করলে প্রাক্ক বেগ হবে আট ফিট, কিন্তু আর তা বাড়বে না। তিন সেকেন্ড পরে তার বেগ হবে বার ফিট, কিন্তু ষাট আর বাড়বে না। এক সেকেন্ড পরেই বেগ বৃদ্ধি হয়, তাকে গণিতে বলে Acceleration.

এইখানে একটা মজা দেখা। যখন তার ছটো সমান করে দিলে পর আবার তাই বেগ ওপর কোনও শক্তির ক্রিয়া থাকে না। যদি তার ছটোর ওপর কোনও শাক ক্রিয়া না করে, তাহলে নিশ্চল নির্দিষ্ট থাকে যাওয়ার পর আর তাদের মাঝে কোনও পরিবর্তন হওয়াও হো সম্ভব হয় না। নিশ্চলতা যদি আদি অবস্থা হয়, তাহলে ছধারের ভাণ সমান হওয়াতে আর চণবার উপায় থাকবে না। যদি এক সেকেন্ড চলার পর তার ছটো সমান করা হয়, তাহলে এত নিয়মালুযায়ী পারদ বেগটা থেকেই যাবে। তার ছটো সমান করিতে আদিম নিশ্চলতা বা প্রারম্ভ বেগ বাড়ি হয় না, কিন্তু বেগেও আদি আকর্ষণ কোনও তারতম্য হয় না। দুই সেকেন্ড পরে তার ছটো সমান করলে পর প্রারম্ভ বেগ থেকেই যাবে। তিন সেকেন্ড পরেও তাই হবে, অর্থাৎ প্রারম্ভ বেগ থেকেই যাবে, কিন্তু তার আর কোনও তারতম্য হবে না।

এখন সিদ্ধান্তের কথা পর। সিদ্ধি অর্থে ছধারের তারকে সমান করা। তারার মাঝে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সিদ্ধি। বাইরের শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই সিদ্ধি। ভূমি আর তখন ঝড় ঝাপটার খেলনা নও। ভূমি স্বপ্রতিষ্ঠ। তাই যদি হয়, তাহলে বেগের

ক্রমবৃদ্ধি (acceleration) নিবারণিত হইল ;  
কিন্তু প্রারম্ভ যে বেগ, তা থেকেই গেল। এই  
প্রারম্ভ বেগকেই আমরা বলি পূর্বাধাস। সে  
থাকেই থাকে কিছু নড়াতে পারবে না।  
সিদ্ধপুরুষদের মাঝে কারও প্রারম্ভ বেগ হয়  
খুব কম থাকে, তাঁদের দেহ দিয়ে জগতে  
মহৎ কোনও কাজ হয় না। আবার কারও

প্রারম্ভ বেগ হয়ত প্রভূত পরিমাণ থাকে, তাঁরা  
মুক্ত, কিন্তু তাঁদের দেহের স্বর চলতে থাকে ;  
আর সেই দেহ দিয়ে জগতে কত আশ্চর্য্য ও  
মহৎ কাজ নিষ্পন্ন হয়।

তুমি ব্রহ্ম! এই অমৃতভাতে সিদ্ধ হও—সং  
হবে।

ও ও—ও

## সাংখ্যের প্রমাণ বিচার

এখন প্রশ্ন এ, চৈত্র গৃহে নাট, অথবা দার্শ-  
নিকের ভাষায়, চৈত্রের গৃহাসক্ত তাহার  
সন্তানমাত্রের বিরোধী ন? কেবলমাত্র তাহার  
গৃহে সন্তান বিরোধী? [বিরোধ কোথায়  
সম্ভব? যেখানে বিষয় অথবা অধিকার এক,  
অথচ নিপত্তীত বৃত্তির সমাবেশ, সেখানেই  
বিরোধ হইতে পারে। এত ক্ষেত্রে কি তাহা  
হইয়াছে? প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, হাঁ, হই-  
য়াছে; কেনন, চৈত্রের সন্তান গৃহ ও গৃহের  
বাহির উভয়ই সমাজতঃ প্রবৃত্ত, অতঃপর সেই  
সন্তান সহিত বিশেষভাবে গৃহে অসন্তান  
বিরোধ কেন না হইবে? কোথায়ও আছে—  
এই কথা বলিলে যখন নির্ণেয় কোনও স্থল  
নির্দেশ করা চলে না, তখন “কোথায়ও” বলিতে  
তো গৃহকেও বুঝাইতে পারে এবং তাহাকে  
“গৃহে নাট,” এ কথাও তো বাধিত হইতে  
পারে।] কিন্তু ঠিক এই বথার উত্তরে আমরা  
বলি, যেখানে হোক, একখানে আছে এ  
উক্তি সহিত “গৃহে নাট” এ উক্তির বিরোধ

হইতে পারে না। কেননা উভয়ের বিষয় ভিন্ন।  
যেখানে হোক আছে বলিলেই খরও আছে,  
একপ সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না।] প্রতিপক্ষ  
বলেন, বেশমাত্র জ্ঞান দ্বারা (অর্থাৎ চৈত্র  
যেখানে হোক আছে এই জ্ঞান দ্বারা) তাহার  
গৃহাসক্ত বিশেষ স্বর্ষক সংশয়াপন্ন হয়, অতঃপর  
দেখ, বুঝাও বিষয় সমান বলিয়া কচিংসন্তান  
সাহিত গৃহাসক্ত বিবেচ্য হইয়াছে। আমরা  
বলি, এ ধারণা ভুল; কেননা, চৈত্র যে গৃহে  
নাট, ইহা প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে;  
অধুনা তাহার গৃহে সন্তান পার্শ্বিক মাত্র অর্থাৎ  
তাহার সামান্য সন্তান দ্বারা গৃহে সন্তান সম্ভাবিত  
হয়মাত্র, তাহার নিশ্চয়তা অবধারিত হয় না।  
অতএব বেশমাত্র জ্ঞান হইতে তাহার গৃহ-  
সন্তান সাংখ্যিক-জ্ঞান মাত্র। প্রমাণজ্ঞানের  
সাহিত সাংখ্যিকজ্ঞানের বিরোধ কি করিয়া  
সম্ভব? কেননা উভয়ের অধিকার যে ভিন্ন।  
দুইটা জ্যামিতি প্রমাণ-নিশ্চিত হইলে সন্তান এবং  
অসন্তান বিরোধ সম্ভব হইত। কিন্তু প্রমাণত

অসত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট-সত্তার বিরোধ কোথায় ?]

আবার চৈত্রেয় প্রমাণ নিশ্চিত গৃহাভাব কি করিয়া পাস্কিক গৃহসত্তাকে বাধিত করিয়া তাহার সামান্যসত্তাকেই বাধিত করিলে এবং গৃহসত্তার সাংশয়িকত্বট বা দূর করিবে ? গৃহাবচ্ছেদে চৈত্রেয় অসত্তা উক্ত গৃহাবচ্ছেদেই তাহার সত্তার বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু তাহার সামান্য সত্তার বিরোধী হইবে এক কি করিয়া ? কেননা অবচ্ছেদক বিভিন্ন হওয়াতে উক্ত প্রকার অসত্তা সামান্য-সত্তার পক্ষে উদ্-  
গীন মাত্র বিরোধী হইবে না। অতএব চৈত্রেয় গৃহে অসত্তা সিদ্ধ লিঙ্গ ; তাহা হইতে তাহার বহির্ভাব অসম্ভব, তথা কিছু মাত্র অযৌক্তিক নয়।

কেহ কেহ অর্থাপত্তির এই লক্ষণ করিয়া থাকেন যে উহা বিরুদ্ধ দুইটা প্রমাণের বিষয় বা অধিকার ব্যবস্থিত করিয়া দিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে। [যেমন চৈত্রেয় সত্তা এবং তাহার গৃহে অসত্তা দুইটা বিরুদ্ধ প্রমাণ বিষয়। চৈত্রেয় বৃত্তিঃসত্তা দ্বারা উভয়ের বিরোধ প্রশমিত হয়। অতএব চৈত্রেয় বৃত্তিঃসত্তা অর্থাপত্তিঃপ্রমাণগম্য।] আমরা বলি এ মত টিকিতে পারে না, কেননা এহ উদাহরণের সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, অবচ্ছিন্ন এবং অনবচ্ছিন্নে বিরোধ হয় না। অর্থাপত্তির বাদ অত্র কোনও উদাহরণ থাকে, তাহাও অসম্ভবেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। অতএব, অর্থাপত্তি যে অসম্ভব প্রমাণেরই ভেদ মাত্র, তাহা সিদ্ধ হইল।

[মীমাংসক ও বৈদ্যাসক অতাব বা অসম্প-  
র্কি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন,

ভাবপদার্থ বিষয়েস্ত্রিয় সংযোগ দ্বারা জানা যাতে পারে ; কিন্তু অতাব জানা যাটবে কি করিয়া ? ভূতলে ঘট আছে—এখানে ঘট বিষয়, চক্ষুনিষ্ক্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং ঘট প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু “ভূতলে ঘট নাই”—এই নাস্তি জ্ঞান হয় কি করিয়া ? নাস্তিজন্যকে উৎসাহিত করিতে পারে এরূপ ইন্দ্রিয়সংযোগও হো সম্ভবপর নয়। অতএব অভাববোধের জন্য অনুপলব্ধিরূপ বিশেষ একটা প্রমাণ বৃত্তি স্বীকার করা আবশ্যিক। অভাব প্রমাণের পক্ষে চৈত্রেয় মোটামুটি যুক্তি এই।]

সাংখ্যিকাব বলেন, অভাবও প্রত্যক্ষ হয়। [কেননা অভাব তো একটা পরিণাম বই আর কিছু নয়। এ কথা তুমি অশ্রুতি স্বীকার করিবে যে, যাটা আছে, তাহার অসত্তা এবং যাটা নাই তাহার সত্তা কখনও প্রমাণিত হইতে পারে না। তবে জগতে কোথায়ও একটা কিছু আছে, আবার নাই—এই ভাব আসে কোথা হইতে ? আমরা বলি উহা পরিণামেরই প্রকাশ বিশেষ। আলোক এবং অন্ধকার, জীবন ও মরণ, সত্তা ও অসত্তা, চৈত্রেয় মাংস একান্ত বিরোধ দেখিতেছি কেন ? সমগ্র দৃষ্টান্তে এক অংশ সত্তা দ্বারা অনুবিন্দিত করিয়া দেখ। উহাই আমাদের শাস্ত্রে কথিতঃপ্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্বদা স্বতঃ পরিণামিতা হইতেছে। পরিণামের একদেশে চক্ষু রাখিয়া কণাস্তরে আবার তাহার আর একদেশে চক্ষু স্থাপন করিয়া আমরা বলি—এই ছিল—এই নাই। কিন্তু বাস্তবিক যাহা এখন তোমার কাছে নাই, তাহা, সত্তারই স্বয়ং অব্যক্ত পরিণাম মাত্র। যাহা স্থল,

তাহাই ক্রমে স্বল্প হইতে হইতে অবশেষে নাস্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং একই বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব তাহার পরিণাম ছাড়া আর কি হইবে? এটি হইল সাংখ্যদর্শনের পরিণামবাদ। ]

ইহা হইতেই আমরা বলিতে পারি, ভূতলে ঘটাত্মক, ভূতলেরই পরিণাম মাত্র উহা উহার "কৈবল্যলক্ষণ পরিণাম। [ কথাটা এই—যদি তুমি অচঞ্চল হইয়া বসিয়া রাখিয়াছ, সমুখস্থ ভূতল তোমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এতক্ষণ তোমার চিত্তসত্তা বৃত্তিরূপে ওই ভূতলাকারেই পরিণত হইয়াছে। এই সময়ে ভূতলে একটা ঘট আনীত হইল। বাহ্যদৃষ্টিতে ঘট একটা নূতন বিষয়। কিন্তু সাংখ্যদৃষ্টিতে ঘট ওই ভূতলেরই একটা বিশেষণ মাত্র, অর্থাৎ তোমার চিত্তকেও এখন ঘটরূপ বিশেষণ দ্বারা অন্তর্গত হইল। এখন তোমার চিত্ত = ঘটাদি ভূতল। চিত্তের দিক হইতে উহা একটা পরিণাম ছাড়া আর নূতন কোনও বিষয় নহে। ক্ষণকাল পরে ঘট অপনীত হইল। তখন তোমার চিত্ত আবার রিক্ত ভূতলাকার গ্রহণ করিল। বস্তুদৃষ্টিতে ঘটাত্মক নূতন একটা বিষয় উৎপন্ন হইল। কিন্তু সাংখ্যদৃষ্টিতে চিত্তসত্তা আবার কেবল ভূতলে পরিণত হইল। এইরূপ ভূতলের ভূমিকায় বসে বিষয়ই অক্ষয়ক বস্তু না কেন, তোমার চিত্তেরই উহাতে ক্ষণে ক্ষণে বৃত্তিভেদ হইতে থাকিবে। ইহাকে চিত্তেরও পরিণাম বলিতে পার, অথবা ভূতলরূপ ভূমিকারও পরিণাম বলিতে পার। ঘট কিম্বা ঘটাত্মক উভয়েই উক্ত ভূমিকার বিশেষণ বা পরিণামের ভেদ মাত্র। যখন ঘট ছিল, তখন

বৈশিষ্ট্যলক্ষণ পরিণাম, যখন ছিল না, তখন কৈবল্যলক্ষণ পরিণাম। এইমাত্র প্রভেদ।

এইরূপে সমস্ত ভাবটী ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, কেবল মাত্র চিৎশক্তি বা দৃশ্যাত্মক অপরিণামিনী। পরিণামের ভেদগুলি এক এক টি দ্রব্য দিয়া আমরা ধরিয়া রাখিতেছি মাত্র। সুতরাং প্রকৃতির সর্ববিধ পরিণামই মূলতঃ প্রত্যক্ষগোচর। অভাবও একটা পরিণাম। অতএব অভাবও প্রত্যক্ষ গোচর। অতএব অনুপলব্ধ নামে পৃথক প্রমাণ স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নাই।

[ সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষের Psychological analysis-এর উপর গঠিত। মোট কথা এই, বিষয়ের ভূমিকা প্রয়োজন। নিভূমিক বিষয় হইতে পারে না, তেমনি নিভূমিক বৃত্তির সম্ভবপর নয়। ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত কথা। এই ভূমিকাতেরই আমরা প্রকৃতির আভাস পাই। যাহা কিছু দেখি, তাহা এক অনবচ্ছিন্ন ভূমিকারই পরিণামভেদ। সুতরাং ভাব ও অভাব একই ভূমিকার বিষয়ের ব্যক্তি ও অব্যক্তাবস্থাভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব যাহা ভাব-গ্রাহক, তাহাই অভাব-গ্রাহক—ইহাই সাংখ্যদৃষ্টিতে সার কথা। বৈদান্তিক ও মীমাংসক অনচ্ছিন্ন বিষয়ের দ্বিক দিয়া প্রমাণগতিকে যাচাই করিতে চাহেন। এই ক্ষুদ্র অনুপলব্ধিকে পৃথক বলিয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। তা ছাড়া সর্বশূন্যেরও একটা অনুভূতি আছে; উহাকে দৃশ্যরূপে সমুখে রাখিতে গেলে কৈন প্রমাণের আশ্রয় লইব, ইহাও একটা সমস্যা। বৌদ্ধ শূন্যবাদ সম্বন্ধে এই দিকটাই উপাস্থত করিয়া দর্শনের এক নূতন ধারা খুলিয়া দিয়াছিল। তাহার

সমাধানের জন্যও বেদান্তকে অনুগলকি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইয়াছে।]

আর একটা প্রমাণ স্বীকার করা হয়, সম্ভব। যেমন খারীতে (পরিমাণবিশেষ)'দ্রোণ বা আড়কের (স্বল্পতর পরিণাম) সম্ভাবনা। উহাও অসম্ভব মাত্র। খারীত দ্রোণত ছাড়া থাকিতে পারে না বলিয়াই খারীতে দ্রোণাদির সম্ভা জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তার নিম্প্রয়োজন।

সর্বশেষ প্রমাণ ত্রিভুজ বা কিস্বদন্তী। কে বলিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু পরম্পরা-

ক্রমে একটা প্রণীত চলিয়া আসিয়াছে, যেমন "প্রাচীনেনা বলেন শুনি" "এই বট গাছে ভূত আছে" ইত্যাদি। একে তো ইহাকে প্রমাণই বলা যাইতে পারে না, কেননা যখন ইহার বক্তার নিশ্চয়তা নাই, তখন উহা সাংখ্যিক জ্ঞান মাত্র। যদি কোনও আশ্চর্য্যাক্ত প্রমাণ হইত, তাহা হইলে তো উহা আগম। সুতরাং ত্রিভুজও একটা অতিরিক্ত প্রমাণ নয়।

উদ্ধৃতিতে সিদ্ধ হয় যে প্রত্যক্ষ, অসম্ভব ও আগম ছাড়া আর কোনও প্রমাণ হইতে পারে না।

## আরণ্যকে



"যজ্ঞেন বাচঃ পদবায়মায়নু তামস্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।২।৮

এ জগতকে দুটো কাচের ফুটো দিয়ে দেখেই মনে কান্যের লহর উথলে উঠে, আর যদি নিজকে বিশ্বতচ্ছকুঃ রূপে অনুভব করে লৌকিক ও অলৌকিক সমস্তই দেখতে 'শেখা যায়, তবে যে কি অসীম আনন্দ, তা কল্পনা হয় কি? এখন কল্পনাও হয় না বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের স্বরূপ ঐ সর্বোত্তম আনন্দময় অবস্থা। আর আমরা কি না চোখ বুজে জগৎটাকে অন্ধ কার, হুঃখময় বলে ভাবছি।

✽

ইন্দ্রিয়ের মাঝ থেকে যে সুখ আমল পাব, তাই তাঁর রসে ভরা হইবে উঠবে—নইলে

আমার সুখকে তাঁর মিলনপথকে শুধু কণ্টক-গহনই, করে তোলে।

✽

তুমি যখন দারুণ হুঃখে বিমল হইবে জগতের দিক থেকে মুখ বিকৃত করে ফিরে রয়েছ, তখন হয়ত আর এক জন আনন্দে জগতের প্রত্যেকটা বস্তুর রসিয়ে রসিয়ে শব্দ নিচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জগতের কোনও দোষ নয়। সে যেমন, তেমনই রয়েছে। তোমরা হুঃজনে হৃদিক থেকে তাকে যেমন দেখছ, ভেবেছ সে দেখতে এমনি। আসলে তা নয়। যে যেমন চশমা দিয়ে একে দেখে, সে তেমনই দেখতে পায়। কাজেই হৃদয় দেখতে হলে



নিজের চশ্মা বা চোখ আগে সুন্দর কর।  
পৃথিবীকে চন্দ্রাবৃত করার প্রয়োজন নাই।  
নিজের পায়ে জুতা পরে দাঁড়ালেই পৃথিবী  
চন্দ্রাবৃত বলে দেখি হবে। আপনি ভাল তো  
জগৎ ভাল। কাজেই কারণ কথা বা ব্যব-  
হারের কটুতা নিয়ে নিজের মনে শুধু হুঃখ না  
করে, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দিয়ে  
হৃদয়টা সুন্দর কর, দেখবে সবাই ভাল, মিষ্ট  
ভাবী, সবাই সুন্দর!

#

জগতে যা কিছু পাবার আছে, তা নিয়ে  
বোঝাই হলোই যে পূর্ণ হয়, তা তো নয়--যখন  
আমি কিছু চাইবার থাকবে না, তখনই না  
আনন্দ!

#

কামনা করবে কতটুকু? তোমার কল্পনায়  
যতটুকু আসে, ততটুকু চেষ্টা নয়। তাই পাও-  
রার জন্ত না হয় আশ্রয় চেষ্টা করলে, প্রার্থনা  
করলে। 'কলে যদি পেলো, তবু ঐ কতটুকু;  
আর সেও নির্দিষ্ট কতকটা সময়ের জন্ত।  
নির্দিষ্ট কাল ফুরালে আবার সেট সেট। আর  
যদি তাঁতে সব কামনা সমর্পণ করে দিতে  
পারি, তবে যে তিনি অতাবনীযরূপে আমা-  
দের পাত্র পূর্ণ করে দেন। আমরা কতটুকু  
বা চাইতে জাতি, আর কতটুকুই বা ধারণা  
করতে পারি? তিনি যে নিজে অসীম সুন্দর,  
তাই তাঁর রাজ্যে গিয়ে পড়লে সবই অসীম  
সুন্দর, মহানু করে তোলেন। তাই সাবধান,  
নিজের বুদ্ধির দোষে হুঃখে পড়ে কখনও  
প্রার্থনা করো না যে ঠাকুর, আত্মার এ হুঃখ  
দূর করে দাও, আমরা অমুকটা দাও--বরং  
বলো, ঠাকুর, আমরা এ হুঃখ সেন তোমার  
হাতকেই পিছনে দিচ্ছি। আমি যেন

সমস্তের পিছনে ঐ মঙ্গলহৃৎকেই আমার  
জীবনমুর্কষ, সুখ-দুঃখে পরিচালক বলে  
হৃদয়ে ধারণ করতে পারি। আমার তোমার  
তত্ত্ব জানিয়ে দাও, তোমার প্রতি ভালবাসা  
জন্মিয়ে দাও।

#

আলেক্সান্ডারের কাছে দণ্ডী বলে-  
ছিলেন--"মাতৃগর্ভ থেকে আমি যে সম্পদ  
নিয়ে এসেছিলাম--সেই সরল প্রাণ, গজ্জাতীন  
তরু, শঙ্কতীন হৃদয়--সব আমি অটুট  
রেখেছি।"

#

যার ভিতরে যে বীজ রয়েছে, সে তাই  
নিয়ে তদনুকূল কূলে জন্মগ্রহণ করেছে।  
সারাটা জীবনে তার কিছু না, কিছু ছাপ  
থাকবেই। তা বলে হতাশ হওয়ার কোনও  
কারণ নাই। আজীবনই যে সংস্কার নিয়ে,  
রিপু নিয়ে তাড়না ভোগ করতে হবেই, এমন  
নাও হতে পারে। প্রথমতঃ একবার আশ্রয়  
চেষ্টা কর। যদি সিদ্ধ না হলে তবে "যত্নে  
কৃত্তে না সধ্যতি কোহত্র দৌষ?" কিন্তু তখন  
কর্তব্য তাঁর ঐ অশ্রয়চরণে সমস্ত সমর্পণ করে  
দেওয়া। তা হলে তিনিই তখন যেমন খুসী,  
তেমনি করে গড়ে দিবেন। শুধু তাঁর পায়ে  
নীচে কাদার তাল হয়ে পড়ে থাকতে হবে।  
কিন্তু প্রথমে আশ্রয় চেষ্টা না করলে সমর্পণ  
ঠিক হয় না। তিনিও এসে গ্রহণ করতে  
পারেন না। না দিলে তিনি নেন কি করে?

#

দেহের পীড়া, মনের পীড়া--তাতে ভাবছ  
তুমি যে আত্মা যিনি, তিনি শুদ্ধ পীড়িত।  
আর অমনি আত্মনাদে কণ্ঠ বিদীর্ণ করছ।

এ ভুল এখন থেকে ভাঙতে চেষ্টা কর, শ্রীশঙ্কর তোমার সহায় হবেন। আর যদি অমন ভাবে ভুলতে না পার, যাতে তুমি বা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হয়, এমন মনোমোহনকে ভাবতে ভাবতে সব ভুগে যেতে চেষ্টা কর। তুই উপায়ের ভুল ভাঙতে পার। যেমনটা ভাল লাগে, তাই কর। এ ভিন্ন রূপা আর্জিনাদে কোনও লাভ নাই।

\*

প্রেমকে ছেড়ে জগতে কে বেঁচেছে জানি না—মানুষ আপনাকে বিসর্জন না দিয়ে শাস্তি পায় না—কেননা! তিনিই যে এ লীলার স্রোতের মাঝে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে এর আনন্দরসসাদা পান ক'চ্ছেন!

\*

যতই চেষ্টা কর না কেন, “আমি” বোধ যায় না। একে নিঃশেষ দূর করতেও হবে না—শুদ্ধ বা স্তব্ধ করতে হবে মাত্র। তাঁর “আমি” হয়ে থাকলেই শুদ্ধ “আমি” হল। ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে যত দূর চিন্তা করতে পার, সমস্তটা ব্যাপে “আমি”র ধারণা কর। এমনি করতে করতে আসল “আমি”র খোঁজ মিলবে। জিনিষ যদি পেতেই হয়, তবে আসল জিনিষই তো ভাল। নকল নিয়ে ভুলে থাকলে একদিন তো ঠকে গিয়েছ বলে পস্তাতে হবেই। তবে এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভাল।

\*

জগতের সবাই বলেছে—“ওরে মানুষ, তুই অতি তীন, তুই কীটের কীট—তোর আর উপায় নাই!” আর শুধু আমার ভারত বলেছে—“মানুষ, তুমিই সেই—তুমিই সচ্ছিদা-

নন্দময়!” মাতৃশ্বের এত বড় পূজা, এত বড় সম্মান আর কোন জাতি করেনি।

\*

প্রেমের তিনটি রূপ। তার প্রথমটির অভিব্যক্তি হচ্ছে—“জন্মান্তর যতঃ” এ কথা ভেবে শুধু আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া—সব রকমে!

তার পর হচ্ছে “তত্ত্ব সমন্বয়ঃ”—এখানেই আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। এখানে—

“হৃদয় আমার চার যে দিতে

কেবল নিতে নয়—

বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার

যা কিছু সঞ্চয়!”

তৃতীয় হচ্ছে সংশ্লেষণের পথে—“লোকবন্ত লীলাকৈবল্যম্”—তাঁর বাহকে অবলম্বন করে, আবার নিজের ভিতর মাতৃশ্বের বিকাশ করা। এই হচ্ছে জীবমুক্তি।

বাগ্মিত্ব তিনটাই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু সীমার মাঝেই তাঁকে পেলে তো হবে না—অসীমের মাঝেও পেতে হবে, দেখতে হবে সেই—

“অরূপ তোমার রূপের আলো

জাগায় হৃদয়পুর!!”

\*

পথে চলছে একজনের আহ্বান শুনে। যেতে যেতে যাকে পাচ্ছ, ডাক দিয়ে যাচ্ছ; কেউ এলো ত ভাল, নইলে একাই চল। যাদের সময় হয় নাই, তারা ডাক শুনেও কেন? আর তোমার সঙ্গে তো সেই আহ্বানকারী এক জন রয়েছেনই, তবে আর চিন্তা কেন? আপশোষ কেন? ডাক দিতে হয় দাও, কিন্তু কারও কাননা রেখে ডাক দিও না।

টিক জেনের তোমার চেয়েও শতগুণে ওস্তাদ  
এক জন সকলকে টানছেন। তোমার কামনা  
হবে শুধু তাঁর জন্ত, যার কাছে যাচ্ছ।

\*

আমরা 'সৎ'রূপেই বা দেখতে পাই কবে ?  
আমরা "আছে" বলি, শুধু থাকবে না জেনেই।  
অনন্তের বাঞ্ছনার মাঝ দিয়ে সৎস্বরূপকে না  
দেখলে কি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় ?

\*

ভগবানের চিন্তাও পরশমণি। সে পাথরে  
ছোঁয়ালে তোমার এতদিনকার এত চেষ্টাসমূহও  
যে রিপূর তাড়নার ভূমি মলিন হয়ে পাথর হয়ে  
রয়েছে, সে রূপ পদলে যাবে। তখন সোণা  
হয়ে গিয়ে জগৎটাই সোণা দিয়ে গড়া বলে  
মনে হবে। তাই যত সব হুঁট বাসনা রয়েছে,

৬

সব ত্যাগে সমর্পণ কর; এতিনি নিজেই  
বলেছেন যে, শত ছুরাচার করেও তাঁকে এক-  
মনে ভজতে পারলে, সেই হবে সাধু ও সম্যক  
ব্যবসায়ী।

\*

উপনিষদ তাঁকে বলেছেন—“মহন্তয়ঃ বজ্র-  
মুগ্ধতম্!” কিন্তু সে উগ্ধত বজ্রও শাস্ত হয়ে  
আসে—বর্ষা জামার প্রিয়তমের হাতে আমার  
হাত থাকে; মাহুকের দুর্কলতার জয় এখানে—  
ভোগের তৃপ্তি এখানে—ত্যাগের ওদাসীত্ব  
এখানে—এই প্রেমের রাজ্যে !

\*

“ঈশাবাস্তবমিদং সর্বং”—কিন্তু তা করতে  
হলেই “ত্যাগেন”;—সিগকে ছেড়ে না গেলে,  
তাঁকে দিয়ে আচ্ছাদন করা কেন করা ?



## বিশেষ দ্রষ্টব্য.

গত ১৯শে কার্তিকের “হিতবাদী”র ক্রোড়পত্রে “অবতার” নামে একটি গল্প প্রকাশিত  
হইয়াছিল। গল্পটি সর্বশ্রেণীর সাধুদিগের কুৎসায় পরিপূর্ণ। ভ্রুংখের বিষয়, উহাতে আসাম-  
বঙ্গীয় সারস্বত-মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের পবিত্র নাম সংযোজিত  
হওয়ায়, পরহিদ্ভাষেবী একশ্রেণীর নির্বোধ পাঠক উক্ত গল্পকে সত্য ঘটনা মনে করিয়া নানা  
অলীক জননাচার্য্য রসনী কণ্ঠ্যন করিয়া আত্মতৃপ্তি অশ্রুভব করিতেছিল। আমাদের গৃহস্থ  
গুরুতাইদিগের মধ্যে কেহ কেহ একরূপ অসম্বদ্ধ অলীক রটনার কারণ কি, তাহা জানিবার জন্ত  
“হিতবাদী”র সম্পাদকের সহিত সংলাপ করেন এবং তাঁহাকে চিঠি লেখেন। সম্পাদক মহাশয়  
সকলকেই প্রকৃত বাপার জানাইয়াছেন। তাঁহার লিখিত চিঠিগুম্হের মধ্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ  
ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত চিঠিখানি অবিকল মুদ্রিত হইল।—

• হিতবাদী-কাব্যালয়  
৭০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট  
কলিকাতা

২রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সাল

সম্মান-নিবেদনমিদং

আপনার ১৬/১১/২৬ তারিখের পত্র পাইয়া বড় দুঃখিত হইলাম। “অবতার” একটি গল্প; গল্প হিসাবেই উহা লিখিত। • ব্যক্তিবিশেষকে ইঙ্গিত করিয়া উহা লিখিত হয় নাই। এই গল্প প্রকাশিত হইলে একজনেরও মনে দারুণ বাধা লাগিবে এ সম্বন্ধে যদি একবারও আমাদের হইত, তাহা হইলে উহা আমরা প্রকাশই করিতাম না। অধুনা শুণ্ড সন্ন্যাসী নানা নিকটে দেখা যায়—অনেক স্থলে এই শ্রেণীর সাধু-নামধেয় ব্যক্তির অনাচারের বিষয়ও জানা গিয়াছে। লেখক ইহারই ছায়া লইয়া গল্পটি লিখিয়া থাকিবেন। কাহারও মনে বাধা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—বিশ্বাসপন্থন সরল হিন্দুকে সাবধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে হিতবাদী ছাপা হইতেছে, হুতরাং প্রকৃত বিষয় পাঠকবর্গের গোচর করিবার সুযোগ এ সম্বন্ধে ঘটিল না। এই গল্প পাঠে কোন মতঃ ব্যক্তির সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা কাহারও জন্মিতে পারে উহা ভাবিতেও এখন আমরা সজ্জা বোধ করিতেছি। যাহা হউক, অজ্ঞাতনামের কৃত কীর্তির জন্য আমরা আপনার নিকটে পুনরায় ত্রুপ প্রকাশ করিতেছি জানিবেন। ইতি।

বশব্দ

শ্রীপাঁচলাল মল্লিক ম্যানেজার

পুঃ—আপনি যে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ নামে করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এই গল্পের লিখিত নিগমানন্দের কোন সংশব নাই। গল্পের নাম কল্পিত নাম মাত্র।

উহা ছাড়া বিগত ১০ই অগ্রহায়ণের “হিতবাদী”তেও তাঁহারই একই ত্রুপ প্রকাশ করিয়া লিখাছেন—

“\* \* স্বামী নিগমানন্দ শত শত ব্যক্তির গুরু, তিনি বাঙ্গালায় বহুজন্মান্তঃ কোনও প্রকার আকার-ইঙ্গিতে তাঁহাকে হয়ে প্রান্তপন্ন করবার চেষ্টাবৃত্তি ‘হিতবাদী’র জায় লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত ও কর্তব্যনিষ্ঠ সংবাদপত্রের থাকিতে পারে না। সকলের মনে রাখা উচিত যে গল্প গল্পমাত্র, কল্পিত কথা—উহার কোন অংশ সত্য নহে।”

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ “হিতবাদী”—সম্পাদক আশুগাবুকে পুনরায় যে চিঠি দিয়াছেন, তাহাতে এই কথাটি বিশদ ভাবে বুঝাইয়া পুনরায় লিখাছেন, “গল্পলেখকও

\* \* আমাদেরকে জানাইয়াছেন যে কাহাকেও ইঙ্গিত করিয়া বা কাহাকেও অপদস্থ করিবার জন্য তিনি এই গল্প লিখেন নাই। \* \* আমাদের সরলভায় ও কথায় যদি আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তবে তাঁহার গল্পটি আপনাদের গুরুদেবকে ইঙ্গিত করিয়া লিখিত হয় নাই, এই কথাও বিশ্বাস করিয়া লইতে পারেন। গুরুনিন্দা কেহই সহিতে পারে না—আমরাও পারি না। এ জন্য কেশব চাঁদ ধারণার বশবর্তী হইয়া আপনারা বিচলিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতেছি। যাহা হউক, আমাদের কাছে প্রকৃত কথা শুনিয়া আপনারা এই অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনার ক্ষান্ত হইবেন বলিয়া আশা করি। \* \* \* দৈববিধ্বংসের জ্ঞানীদের যে মনঃকোষ জন্মিয়াছে, তাহা অতঃপর বিমুখ হইলে এবং আপনার গুরুভাতৃগণকে এই বিষয় লইয়া পুনরায় আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলে আমরা সুখী হইব।”

১৭ই অগ্রহায়ণের “হিতবাদী”তেও তাঁহারই বিষয়ে ত্রুপ প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর গৃহস্থ গুরুভাইগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এক লম্বা লম্বা আর অধিক পীড়াদীড়ি না করেন। যদিও এই ত্রুপাচারে আমাদের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী গুরুভাইগণ অক্ষেপণ করেন নাই, তথাপি গৃহস্থ গুরুভাইদিগের পক্ষে উহা যে মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এক্ষণে ভবিষ্যতের জন্য আমরা তাঁহাদিগকেও এ কথা স্মরণ রাখা বলি যে,—“হস্তী যেন বাজারম্, কৃতা ভূকে হুজার।”

# ভক্ত-সম্মিলনী

—:~:—

আগামী পৌষ মাসের ১১ই, ১২ই ও ১৩ই তারিখে পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগীয় খড়কুশমা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত সম্মিলনীর ১২শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আগাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও তাহার শাখা আশ্রম সমূহের পৃষ্ঠপোষক, পট্টালক ও ভক্তগণকে সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য মাদরে আহ্বান করিতেছি। কাছাকেও পৃথক পত্র দেওয়া হইল না। সকলেই বিছানা পত্র সঙ্গে আনিবেন। মঠাধিপতি পরমহংস শ্রীমৎ পরমহংস-স্বামী খড়কুশমা আশ্রমে উপস্থিত থাকিবেন। খড়কুশমা গ্রাম মেদিনীপুর জেলায় এবং সেজল নাগপুর রেলওয়ের গড়বেতা স্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত স্টেশন হইতে আশ্রম পর্যন্ত বেশ বঁধা রাস্তা আছে। স্টেশন হইতে আশ্রমে যাওয়ার জন্য ছে-দেওয়া গরর গাড়ী স্টেশনে পাওয়া যাউবে এবং মটর-বাসের বন্দোবস্ত করা হইবে। পূর্ব বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা, উত্তর বাঙ্গালা ও দক্ষিণ বাঙ্গালা বিভাগের ভক্তগণ হাওড়া স্টেশন হইতে গড়বেতা যাত্রা করিবেন। হাওড়া হতে গড়বেতা স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া—প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ২১০ দুই টাকা ছত পয়সা ও এক্সপ্রেস ট্রেনে ২১০ দুই টাকা দশ আনা। হাওড়া হইতে গড়বেতা যাওয়ার দুইখানি থু ট্রেন আছে—একটি গোমো প্যাসেঞ্জার হাওড়া

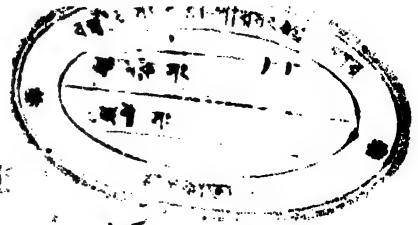
হইতে সকালে (কলিকাতার সময়) ৭-৩৪ মিনিটের সময় ছাড়ে ও বেলা ৩টার সময় গড়বেতা পৌছায় এবং অপর ট্রেন রাতি এক্সপ্রেস রাত্রি ১—৪৪ মিনিটের সময় ছাড়ে এবং রাত্রি ৩টা, সময় গড়বেতা পৌছায়। ১০ট পৌষ হইতে এই দুই ট্রেনে সমাগত ভক্তগণকে আশ্রমে লইয়া যাওয়ার জন্য গরর গাড়ী ও মটরবাস স্টেশনে প্রস্তুত রাখা হইবে। উক্ত ট্রেনে গমনেছু ভক্তগণের মধ্যে কেহ আগমনে কলিকাতায় পৌছিলে বড়বাজার সিদ্দুরিয়াপাটন মোড়ে দর্শনশালায় এবং তাহার সম্মুখস্থ ১৫০ নং ভ্যানিসন রোডে শ্রামাদত্ত ভূটিয়ার দর্শনশালায় বিশ্রাম করিয়া যথাসময় ট্রেন ধরিতে পারেন। আশ্রমে যাওয়ার গরর গাড়ীর ভাড়া ১০/০ দশ আনা। একখানি গাড়ীতে ১ দুই জন বেশ যাতে পারিবেন এবং মটরবাসের ভাড়া জনপ্রতি ১০ আট আনা হইতে পাবে। পশ্চিম বাঙ্গালার ভক্তগণ নং উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তসম্মিলনীর আহ্বান কনিয়াছেন। অশা করি, সমুদয় বিভাগীয় ভক্তগণ তাঁহাদের মহাত্মভূতি ও উপস্থিতির দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবেন। ততি

শ্রী ভক্তগণপ্রিত—বিনীত

সেবকসুন্দর



১৩২ সং



# আই-দ পণ

সংস্করণ-১৩২০

১২শ বর্ষ	}	পৌষ	}	দ্বিতীয় খণ্ড
সমষ্টি সং ২০				তৃতীয় সংখ্যা

হরিবাহনঃ

—\*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩২।১৭-১৮ ]

—\*()#\*—

[ দিখামিত্র ঋষিঃ—চান্দ্রো দেবতা—[ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ]

—\*—

তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানা  
 ষাহি বাস্তু ন নিষুতো নো অচ্ছ ।  
 পিনাস্যন্ধো অভিস্রষ্টো অশ্বে  
 ইন্দ্র স্রাজা রারিমা তে মদাস্তা ॥

রথে বোড়া দুটা হয়, হে-আসব, আমাও ক্ষণিক,  
 তারপর বারু হেন এস ছুটে আগাদের দিক  
 রাখিয়াছি সোমরস, তাই কিগো করিবে না পান  
 শিও, ইন্দ্র !—সিই ঢেলে—বয়ে শাক আনন্দ-তুফান ।

উপাজিরা পুরুহুতা সল্লী  
 হরৌ রথস্থ ধূর্ধ্ব। যুনজি।  
 দ্রবদ্, যথা সংভূতং নিব্বতশ্চিদ্,  
 উপেমং যত্তমা বহাত ইন্দ্রম ॥

তোমারে যে ডাকে সনে, তাই হের সাজায়েছি রথ,  
 ধুরায় যুড়েছি ষোড়া—ছুটে যাবে কত দীর্ঘ পথ।  
 নিখিল ছানিয়া যথা করিয়াছি যজ্ঞ আয়োজন—  
 আশুক ছুটিয়া তারা ইন্দ্রে তথা করিয়া বহন।

উপো নব্বতশ্চ শোণা কপ্পা।  
 উতেমন ভ্রং ব্রহ্মতঃ স্বেধাবঃ।  
 প্রসেতামশ্রা নিমুজ্জেহ শোণা  
 দিবো দিবো সদৃশীরা ক্র শানাঃ ॥

অবিজয়ী যুবা অশ্ব—নিয়ে এসো আমাদের হেথা;  
 ঋদ্ধ তুমি, কল্পতরু—হরি নাও ভক্ত-মনোব্যথা।  
 লাল ষোড়া দুটি হেথা থাক, ঘাস—দাও ছেড়ে দাও;—  
 আছে ভালো ভাজা যব, তাই তুমি দিনে দিনে খাও!

ব্রহ্মাণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজি  
 হস্তী সখাস্রা সমমাদ আশু।  
 স্থিরথ রথং অর্থমিস্রাশ্রিতষ্ঠন  
 প্রজানন বিদ্বা উপসাহি সৌমিন ॥

রণভূমে সাথী তব ওরা দুটি জানি হে ঘাসব;  
 যুদ্ধক্ষেত্রে রথে তাই গাছি গাথা বাড়ায়ে গরম।—  
 টলিবে না রথখানি, যুদ্ধে দেব তার আসি চড়—  
 জান তো সকলি শুণী, এই সোম—ধর পাত্র ধর।

মা তে হরী স্বপ্না বীতপৃষ্ঠা ।  
 নি বীরমন্ যজমানাসো অন্যো ।  
 অত্যায়াতি শস্মতা, বহুং তে  
 অরুং স্মৃতেভিঃ, কৃণবাম সোমৈঃ ॥

ঠিকরে ফিরণ পিঠে—সোমন্ত এ দুটী তব হয়—  
 তুধিবে এদের আর কেহ, বল এ-ও প্রাণে সয় ?  
 আর সবে থাক পড়ে, এস ইন্দ্র আমাদের কাছে—  
 নিঙারিয়া দিব সোম—কত পিবে ?—এত রস আছে !

তবাহুং সোমস্রমেহবাঙ  
 শস্ম তমং স্মননা অন্য পাহি ।  
 অস্মিন্ যজ্ঞে বহিন্যানিষদ্য।  
 দধিস্বে মং কটের ইন্দুমিস্রম ॥

এ সোম তোমারি তরে ; এসো হেথা, নাও না আসন !—  
 যতকাল চায় প্রাণ, কর পান—খুসা হোক মন ।  
 বিছায়ে দিয়েছি কুশ যজ্ঞভূমে—বস এই ঠাই—  
 চৌয়ানো রয়েছে সোম—ভর পেট, আর কিবা চাই ?

স্তীর্ণং তে বহিঃ স্মৃত ইন্দ্র সোমঃ  
 কৃতা ধানা অন্তনে তে হসিভ্যাম্ ।  
 তদোকসে পুরুশাকায় ব্রহ্মেণ  
 মরুতভ্যং তুভ্যং স্মৃতা হনীংশি ॥

ছেঁচা, আছে সোমরস, কুশাসন রেখেছি সাজিয়া ;  
 ঘোড়া-দুটি খাবে তাই সব ক'টী রেখেছি ভাজিয়া ।  
 বস হোথা, কলতর ! ভাবি শুধু, কত শক্তি তব—  
 মরুতেরা হল সাথী !—ধর এই হবি অভিনব !



## সহজ স্থিতি ও ভূতহিত

আলোক আর আধারকে আমরা পরস্পরের বিরোধী বলি; কিন্তু বিজ্ঞান আবার এ-ও প্রমাণ করিয়াছে যে, যেখানে আলোক দুঃখ তীব্র, সেখানে আমাদের চক্ষু অন্ধ। তাহা হটলেট দেখি, জগতের আপাতাবিরোধী শক্তির মূলেও এমন কিছু নিহিত আছে, যাহা বর্তমান সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য এক নিমিষে চটয়া যায়। এই সর্বসমঞ্জস্যের অগাহিত থাকাই জীবনের যথার্থ মার্মকতা।

আধ্যাত্মিক জীবনের এমন অনেক আপাত-বিরোধী তত্ত্ব দোখতে পাওয়া যায়; বাস্তবদৃষ্টিতে তাহাদের বরূপ অসমর্থন করা বড়ই কঠিন। একটা কথা আছে, যোনিভাঙ্গ অজ্ঞান আর যিনি পরমজ্ঞানী, দুইয়ের আচরণে কোনও তফাৎ দেখা যায় না; উভয়ের আচরণকেই আমরা সহজ-সহজ বলিতে পারি। সাধারণ লোকেও চক্ষু-এই সহজ স্থিতির কোনও মূল্যই নাহ—যদিও জগতের মাড়ে পনের আনা লোকের সহজভাবেই জীবন কাটাতেছে। নিত্যন্ত অভ্যস্ত বস্তুর প্রতি মানুষের অভ্যাসের উৎসাহ থাকে না, তাহ সহজ জীবনকে বিকৃত করিবার উদ্ভেদনায় অধিবন চাইতে পারিলে মানুষ যেন আর কিছুতেই স্বাস্থ্য পায় না। এত জন্তই দেখি, অজ্ঞানীর কাছে সিঁহের চেয়ে সাধকের মান বেশী। যে সাধু চটয়া সাধুদের বিজ্ঞাপন সর্বদা জুটাইয়া তুলিতে না পারিল, তাহার সাধুর সম্বন্ধে লোকেও সন্দেহের আত্মপ্রাণ। তুমি-আমি খাই-দাঁই-মুখ, সাধু-ও তাই

করেন, তবে আর উভয়ে পার্থক্য কোথায়—অজ্ঞানীর কাছে এই এক মহাসমস্তা। সমস্ত থাকিতে সাধুরও গা-ঢাকা দিবার সুযোগ ঘটয়াছে, সুতরাং এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁহার তো বলবার কিছুই নাহ।

তা ছাড়াও কথা আছে। সাধুদের মাঝে একটা আইনহ আছে, পারত-পক্ষে তাঁহারা কোনও বিক্ষোভ ঘটাইবেন না। যেমন পরম-হৃৎসদের বলিতে, কারু ভাব নষ্ট করেনা। মহাশুদ্ধদের চারজ আগোচনা করিয়া দেণ, তাঁহারা লোকের ভাবের দিকের কথাটাই বিস্ময়গম্যছেন, অভাবের দিকটায় নজর দেন নাহ। একাদিন ভাব উদ্ধুক্ত চটয়া অভাবের ভিত্তি পর্যন্ত নড়াচড়া দিয়াছে; কিন্তু তাঁহা বলিয়া অভাবের বিরুদ্ধে অভিযান করাটাই তাঁহাদের দম্ভের নয়। শঙ্করাচার্য্য আসিয়া গোটা ভারতবর্ষ ওলটপালট করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক বিধি নিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাহ; সেজন্ত আধুনিক সংস্কারপন্থীদের কাছে এখনও তাঁহাকে গণ্যনা সাহসে চাইতেছে। খ্রীষ্টের জন্মের বস্ত্রের দেন গোটা সাহস দিয়াছেন, কিন্তু কল্যাণীদের প্রতীকার নিয়া মাথা-বামাটতে বসেন নাহ। অপর এই সমস্ত ভাবপ্রাণের পর সমাজ আবার শুদ্ধ চটয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাবকে কার্যে পরিণত করিতে গিয়া মানুষ জীবনকে অভিনব ব্যক্তিরূপে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছে।

৭ ভূতহিত বলিয়া একটা কথা আছে, তাহা

সাধুদের সঙ্গে একবারে মাখামাখি। সন্ন্যাস  
পন্থের শাসন, এই ধর্ম “আত্মনো মোক্ষার্থং  
জগদুত্তায় চ”; বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে  
জগতে ছড়াইয়া পড়িতে আদেশ দিয়া বলিলেন,  
“চরত ভিক্ষণে বহুজনহত্যায় বহুজনসুখায়  
চ।” কিন্তু এই ভূতহিতৈষণা হঠাৎ ভাঙি  
মানকে অলোদা গাথা বড়ই শক্ত। যখন ঠিক  
ঠিক সাধুর জন্মায় নাই, লক্ষ্যহীন হইতেছে  
মাত্র, তখন ভূতহিতের বাতিকটাই বোধ হয়  
ভূতের মতন ঘাড়ে চাপিয়া বসে; তার  
তাড়নায় আত্মহিতের দিকে তখন আর লক্ষ্য  
পাকে না। সাধুর সংস্কারে আর অসাধুর  
সংস্কারে তফাৎ এখানে। গীতাতে দুইটি  
কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একবার  
বলিতেছেন, দেখ, তোমার যদি আর কোনও  
কাজ না থাকে, তবুও একটা কাজ আছে—  
পরের কাজ করা; আমার কিছু করিবার  
নাই, তবুও দেখ, আমি পরের কাজ লইয়াই  
আছি। আবার এই কথার সঙ্গে সংগত  
বলিতেছেন, তোমাকে এই কথাও বলিয়া  
রাখি, যাবা বোকা, শুধু নিজের কাজ নিয়া  
আছে, তাহাদের বুদ্ধি ফাঁক করিয়া দিও না।  
দুইটি কথার সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। পরের  
কাজ করিতে হইলে, অথচ পরের বুদ্ধি বাঁচিবে  
চলিবে না—এটা একটা সমস্যা নয় কি?  
বাহার দেশহিত, সমাজহিত ইত্যাকার হিত-  
সাধন-ব্রত নিয়া মাথা ঘামাইতেছেন, তাহারা  
গীতার এক উপদেশের মধ্য অবধারণ করিয়া  
দেখেন কি? সাধু-অসাধুর পরপ তাহা  
হইলে এখানেই হইয়া যাউত।

পরের বুদ্ধির না বাঁচিয়া পরের হিত  
করিতে, হইলে নিজের হিতটী পাকা হওয়া

চাই। গীতাও এই কথাটি বলিতেছেন।  
গীতাতে আছে স্থিৎপ্রজ্ঞের কথা। পরের  
বুদ্ধিকে অবচলিও নাখিয়া, হিত করিবার সাধা  
যদি কাহারও থাকে, তবে সে একমাত্র স্থিৎ-  
প্রজ্ঞেরই আছে। “তিনি কিছু না করিয়াও  
সব করেন, এ যেমন মতা, সব করিয়াও কিছু  
করেন না, এও তেমনি মতা। এই ভাবে  
জীবন-সিদ্ধ হইলে তাহা মহাপুঙ্ক্তির আধার  
হয়, কিন্তু বাটবের দৃষ্টিতে তো তার মাঝে  
বিশেষ কিছু ফোটে না। তাই সাধারণ  
লোকের সন্দেহ থাকিয়াই যায়, এমন সাধুকে  
নিজেরই বা কি লাভ, আর পরেরই বা কি?

পরের বুদ্ধি না বাঁচিয়া পরের কাজ করা—  
সাধকজীবনের এই হটল বাদর্শ এবং সমস্যাও  
বটে। বলিয়াছি, হিত করিবার গোলুপতাটাই  
আমাদের বৈশী; তাই ঘেন-তেন-প্রকাণে  
হিত করাটাই চাই, ইত্যাহত যদি বুদ্ধি বিজোতী  
হইয়া উঠে, হটক, মতা দ্বারা ভাঙাকে জয়  
করিব—এই হটল এক ভ্রমীর সাপকের  
মনোভাব। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,  
উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের এই যুৎসু ভাবটা  
বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। বদেশী আন্দোলনে,  
অসহযোগ আন্দোলনে বিপ্লবী কাপড়  
পুড়ল, জাতিভেদ উঠিয়া গেল, হিন্দু-মুসলমান  
এক হইয়া গেল—সমস্তই কেবল গায়েন জোরে  
পরের হিত করিবার আছিল। ফল কি  
হইল, তাহা কাহারও অবদিত নাই। কেন  
যে “চকিতে ফল ফল্গ না”, তাহার কারণ  
রহিয়াছে” কিন্তু ওই গীতার উপদেশে। তবে  
প্রথম যৌবনে লড়ায়ে-বোড়ার মত অসহিষ্ণুতা  
বেশী হয়, এটা যৌবনের ধর্ম—যদিও যৌবনের  
শিক্ষাও এটা, এমন কথা বলিতে পারি না।

তৎপরে বিষয় আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এত যুগ্মস্ত ভাবটাকে পৌরুষ বলিয়া বাহ্য দিয়া শক্তির অথবা অপায়েয় সমর্থন করা হইতেছে। কাগজে-পত্রে কেবলই দেখি, পরের ত্রুটি করিবার উগ্র-বাসনা, আর তাহা পেছনেই পরের উপর নিম্নদান আঘাত !

এই মনোবৃত্তিতে আমবা কিণের পরিচয় পাই ?—দেখি, মাহুষের শুভেচ্ছা থাকিলেও সে অসন্তোষ, উচ্ছ্বল, আত্মশক্তির অপ্রতিষ্ঠ এবং উদারদৃষ্টি-হীন। একটা কথাই সামককে গোড়া হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখিতে হইবে—তাহার নিজস্ব সম্পত্তি কিছুই নাই, নিজের বলিয়া যাহার বড়াই করিতেছে, সে করতরুর ভাঙনের দান, তাহার যোপাঞ্জিত কিছু নয়। বরং আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, যেটুকু সে কল্যাণ শক্তি বলিয়া মনে করে, সেটুকু পরাংপরের প্রেরণা—আর যত অকল্যাণ সমস্তই তাহার বিকৃতবুদ্ধির অপচয়। পরিতোষ শুভেচ্ছা তোমার মাঝে জাগিয়াছে, খুঁই ভাল কথা ; কিন্তু মনে রাখিও, এ তোমার-বাহ্যবাহী নয়। মায়ের মতন যিনি জগৎকে বুকে জড়াইয়া রাইয়াছেন, তাঁহাও স্মরতি অমুখ্যানে একটু অভ্যাস তোমাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। প্রথম দৃষ্টিতেই এত পনের শুভেচ্ছাকে বিশ্বজনীন ইচ্ছার প্রতীকরূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে ইচ্ছাকে যেমন অমুক্তোজিত রাখা চলিবে, তেমনি আবার তাহাকে অমোঘ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অটুল বিশ্বাসও জন্মিবে। যে জগৎকে মঙ্গলময়ীর মঙ্গলবিধান বলিয়া জানে, নিজকে তাঁহার যন্ত বলিয়া মানে, সে অপরকে আঘাত করিয়া ভাল করিতে ইচ্ছা না, বা রাতারতি

জগৎটা ভাল কাঁটার জেদে উত্তেজিত হইয়া উঠে না।

একটা কথা না হয় ভাবিয়া দেখ, মূঢ়বুদ্ধি বলিয়া যাহাদের উপর তোমার করুণা হইতেছে, তাহাদের বুদ্ধি যে নিজস্ব নয় এ কথা তো তুমিই স্বীকার কর ? যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কারের উদ্বোধন না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রীণ পরাধীন, অপরের হাত দরা। তাই যদি হয়, তাহা হইলে কি মূঢ় বুদ্ধির উপর কাহারও ক্ষোভ হয়, না একথা মনে হয় যে সে কেবল মন্দের দিকেই চলিয়াছে ? সে যখন অপরের ইজিতে পরিচালিত হইতেছে, তখন নোখা-পড়া করিতে হইলে তাহার পরিচালকের সহিত করা উচিত। কিন্তু অভিমানে অন্ধ সংস্কারেচ্ছ কি তাই করে ? জৈধরেচ্ছা আর নিজের বাণী ইচ্ছা, দুইয়ে সংঘর্ষ হইলেই এমনি উগ্র পরহিতৈষণা জাগিয়া উঠে। তাই বলিয়া তোমাকে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিতে-ছিলাম। তোমার ইচ্ছাও যে জৈধরেচ্ছা, তাহাও স্বীকার করি ; আবার সংস্কারগীর মূঢ়ও যে জৈধরেচ্ছা-প্রসূত, তাই বা স্বীকার না করি কেন ? এত হইটী তর্কে সমজগতাবে সম্পূ-র্টিত কবিয়া ধারণা করিতে গেলেই আর কোথাও অভিমানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদি তোমার শুভেচ্ছাকেই বড় করিয়া দেখা তাহা হইলে তুমি যুগ্মস্ত পরোপকারী হইয়া উঠিলে, তহা একেবারে অবধারিত, এবং পরিণামে কুফল ফলাও অনধারিত। আবার সংস্কার্য ব্যক্তির মূঢ়কেই যদি অটল সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার কর্মহীনতা জড়ত্ব অবধারিত—ইহাও পতনের মূল। কিন্তু এত উভয়

কোটিকে যদি যুগপৎ ধারণা করিতে গেখ, তাহাতে হইলে মনে হইবে, কোথায়ও তো তোমার অহমিকার অস্তিত্ব নাই—অজ্ঞানও তাঁরই সৃষ্টি, আবার তার বিক্ষেপে উদ্ভূত জ্ঞানও তাঁরই সৃষ্টি—তিনিই সৃষ্ট, তিনিই জ্ঞানদাতা—তুমিও তাঁর! তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তো কিছুই নাই!

ইহা সহজ স্থিতি। এটি অবস্থায় আসিলে পবের বুদ্ধি না খাঁটিয়া পরের জ্ঞান খাটা যায়। লোকে তখন কবিতা বলে, অহা, শঙ্করাচার্য্য মোটে বক্রিশ বছর বাঁচিলেন,

তাইতে এত; আর বেশী বাঁচিলে না জানি কি হইত। এট যে ক্ষোভ, এটা কিছু শঙ্করাচার্য্যের নয়—বোকার ক্ষোভ। শঙ্করাচার্য্যের বক্রিশ বছরও যেমন পূর্ণ, বক্রিশ লক্ষ বছরও তেমনি পূর্ণ। আত্মকন্ডে এমন পূর্ণতাবোধ না আসিলে ভূতহিত করা চলে না; আর ভূতনাথের সঙ্গে যোগ না হইলেও এটি পূর্ণতাবোধ আসিতে পারে না। আবার সন্ন্যাস পূর্ণ হইলে ক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া উপকার—করিবার বার্তিকও জন্মে না। সাধুর আন সাধকের ভূতহিতে এটি তফাৎ।



## শ্রুতি-স্মৃতি

—:|\*|:—

ভগবানের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ, তার বিচার করলেই ভক্তির উদয় আভাবিক। পাপমুক্ত প্রয়োজন চিন্তাশক্তি, তার ফলে, ক্রমে বিধাস।

✱

সংসারে সবাই দাস্ত, সর্বা, বাৎসল্যভাবের সাধনা করছে, কেবল মোড় ফিরিয়ে দিলেই চল। ছেলেবেলায় সবাইই দাস্তভাব—কেবল দেখি দেখি রব; যুবতে সখ্যের উন্মেষ, জীতে সখ্যের পুষ্টি; তার পর সন্তানের বাণ-মা হলে বাৎসল্যের বিকাশ। সংসারীদের এই সব ভাব তো সহজেই হয়; তবে জ্ঞানের সঙ্গে তার অনুলীন করতে পারলেই এ আনন্দ-বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়।

✱

বৈবয়িক আগন্তি যখন ভগ্নবৎসুগী হয়, তখনই তা ভক্তি।

✱

চৈতন্ত অগময় কোষ ভ্যাগ করলেই তস্তা হয়; প্রাণময় কোষ ভ্যাগ করে মনোময় কোষে এলে স্বপ্ন; তার পর বিজ্ঞানময় কোষে সূক্ষ্মদর্শন, অপের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে; তার পর আনন্দময় কোষে সুষুপ্তি। এ অবস্থায় খুঁট আনন্দ, কিন্তু মনের অভাব হেতু জাগলে পর আর কিছু গ্রহণ থাকে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর আধবর্টা সুষুপ্তি হলেই, শরীরের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যায়, তার কারণ ঐ আনন্দ। আনন্দই সবার রমায়ন।

যুম তামসীবৃত্তি ; চিত্ত যত উন্নত হইবে,  
যুম তত কমি যাবে। যোগীর প্রায় নিদ্রা  
থাকে না।

\*

প্রকৃতির অনুকূলে চলেলে যে জীব তিন  
জন্মে মুক্ত হইত, সেট জীব নিজ কর্ম দ্বারা  
একজন্মেই তার বাঁধন ছিঁড়তে পারে ; আবার  
যার এক জন্মে মুক্ত হবার সম্ভাবনা, কামফলে  
তার সাহচর্য লাগতে পারে। 'এই জন্ম  
কামকে বিধন চেয়েও বড় বলে।

\*

ব্রহ্মচর্য্য সাঁতার শেখা, গার্হস্থ্য সাঁতার  
দেওয়া ; ব্রহ্মচর্য্য যুদ্ধ শেখা আর গার্হস্থ্য যুদ্ধ  
করা। তাই ব্রহ্মচর্য্যে বিধিবিধানের কড়া কড়ি।  
গার্হস্থ্যে শুধু ব্রহ্মচর্য্যের বিধি নিয়ে থাকলে  
হবে না—কর্ম করা চাই।

\*

ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়-প্রাপ্তির নাম সুখ,  
আর তার বিপরীতই দুঃখ। সাংসারিক সুখ  
বিষয়-সাপেক্ষ। বিষয় অনিত্য, সুতরাং  
সুখও অনিত্য। তাহলে বিষয় নিরপেক্ষ সুখট  
প্রকৃত সুখ। সে সুখ কোথায় ? ভূমিট  
সুখস্বরূপ, এই অনুভূতিতে। আত্মবিশেষ্ট  
সুখস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কখনও অকারণ  
আনন্দে মন উড়লে উঠে, 'ওট হচ্ছে আত্মা  
নন্দের আভাস।

\*

ভগবানকে চার একমে আরাধনা করা  
যায় ; শূদ্রভাবে বাহু পূজা দ্বারা, বৈষ্ণবভাবে  
জীবসেবা দ্বারা, ক্ষত্র্যভাবে ধর্ম্মরক্ষা দ্বারা,  
আর ব্রাহ্মণ্যভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান দ্বারা।

\*

শ্রদ্ধার সহিত যা দান করা যায়, তাই  
শ্রদ্ধা। দশ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিই দশপূরক। ইচ্ছা-  
শক্তির বলে সৃষ্টি হতে পারে, মূলে রয়েছে  
প্রেম। তাই পুত্রের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে  
পিতামাতার উন্নতি হয়ে থাকে। পুত্রই পিতা-  
মাতার সর্ব্বাপেক্ষ প্রিয়, এই জন্যই পুত্র শ্রদ্ধার  
প্রথম অধিকারী ; এই বিচারে ক্রম শ্রদ্ধা-  
ধিকার নিরূপণ হয়ে থাকে। ভুলোকের  
অহোরাত্র ভুলোকের এক মাস—শুরুপক্ষ  
দিন, কৃষ্ণপক্ষ রাত্র ; তাই মাসিক শ্রদ্ধার  
ব্যবস্থা। সলোকের অহোরাত্র ভুলোকের  
এক বৎসর—উত্তরায়ণ দিন, দক্ষিণায়ণ রাত্র ;  
তাই সাংসারিক শ্রদ্ধা ব্যবস্থা।

\*

যখন সাধকের প্রতি অনুগমনাগুণে টেট-  
ফুটি হয়, তখনই মধুর ভাব। গোপীভাব  
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—উহাই বেনাস্তের সাক্ষিভাব ;  
উহাতে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই ভাব আত্মদান  
হয়।

\*

ভগবান্ সাক্ষদানন্দ-বিগ্রহ ; তিনি গুণময়  
কৃষ্ণদেহে আনিষ্ট হইতেন মাত্র। ব্রজলীলায়  
তঁার পূর্ণ আবেশ ; 'মথুরায় গুণময় দেহের  
ক্রিয়া। 'বেমন জড় জগতের বিকাশ করবার  
জন্ম সূর্য্যের আগা প্রয়োজন, হয় না, শুধু  
তার কিরণ এলেই হয়, তেমনি ব্রন্দাবনলীলায়  
তঁার কিরণ মাত্র এসেছিল। নিত্যজগৎ নষ্ট  
কিছু শূন্য করে তিনি ভুবুন্দাবনে আস্তে  
পায়েন না, তাহলে নিত্যা-বুন্দাবনের মাহাত্ম্য  
থাকে না।

\*

যে ক্রম রস-গন্ধ ইত্যাদি গুণের স্রোতে  
গা ভাসিয়ে চলেছে, সেট শাক্তধর্ম্ম পদ্ধতীব।

যিনি ঐ গুণকে 'বশীভূত' করবার জন্তে যুদ্ধ করছেন, তিনিই শাস্ত্র; আর যিনি বশীভূত করেছেন, তিনি বৈষ্ণব।

\*

উত্তম অধিকারীর ব্রহ্মভাব, ইনি জ্ঞানী; মধ্যম অধিকারীর ধ্যান, ইনি যোগী; অধম অধিকারীর পূজা, ইনি কৰ্মী; অধমাদম অধিকারীর বাহ্য অনুষ্ঠান—তাঁকে সাধারণে বর্ষ্য।

\*

গুরুস্বের ভক্তিমার্গ, বিষ্ণু তাঁর আদর্শ; সন্ন্যাসীর জ্ঞানমার্গ, তাঁর আদর্শ শিষ্য। গুরু বলতে শিষ্যকেই বোঝায়, যিনি সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্বপ্রকৃতিকে বৃকে করে রেখেছেন।

\*

“গৃহী হোক নবভার জ্ঞান”—সাধুদেব দোহাতে এর নিন্দা আছে। জ্ঞানভাব ধরে কখনও সংসার করা যায় না বা হাজার জ্ঞানের অনুশীলন করলেও ঠিক সংস্কার ছাড়া যায় না। তবে ভক্তিভাব নিয়ে পঞ্চভাবের সঙ্গে ভাব মিশিয়ে আত্মোন্নতি করা যায়। জ্ঞানী ভাববে, আমি দেহ নই, মন নই ইত্যাদি, এই ভাব ধরে তাকে গুণের অতীত হতে হবে। কিন্তু গৃহীর সংস্কারে এ ভাবের সাধন তো হতে পারে না।

\*

স্রীপুরুষ জ্ঞান থাকতে প্রেম হয় না।

\*

এ অগতে সমস্তই ভগবানের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। মেথন তাঁর নিজ কাজ করছে, তাতে ঘৃণার কিছু নাই; আমার সাধু উপদেশ দিচ্ছেন কি ধর্মোচরণ করছেন, তাতেও গর-

বের কিছু নাই। মূলে সব এক, প্রভেদ শুধু ব্যবহারে। ভালমন্দ বিচারও ব্যবহারে।

\*

গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে সমস্ত সাধন বিফল। গুরু নিরূপ-কলাতীত। কলা ব্রহ্মশক্তি; নিরূপাদ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, জগতের সৃষ্টির কারণ। গুরু তাঁরও উপর; এই দৃষ্টমান সমস্ত জগৎ গুরুর বিকাশ হলেও গুরু তাঁর উর্দ্ধে।

\*

জগৎবিচারে অদ্বৈতভাবের পুষ্টি হয়। আমার দেহ, পশুর দেহ, বৃক্ষলতা সবই এক অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি মাত্র, সুতরাং তেজ কোণায়? তেমনি মন-বুদ্ধিও তো মূলে এক, শুধু কতকগুলি তরঙ্গের বাহ্য ক্রিয়া হয়ে বিভিন্ন বোধ হচ্ছে। যদি নিস্তরঙ্গ হয়, তাহলে মূলে সবই এক বস্তু। সুতরাং আমি স্থলদৃশ্য-কারণে এক, সর্বব্যাপী, অনন্ত।

\*

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্থল-দৃশ্য কারণের অবস্থা—প্রত্যেকেই খণ্ড মহাশক্তির আধার মাত্র। এই শক্তি-ত্রিতয়ের সমষ্টি মহাশক্তি—আত্মশক্তি ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান, সবাই ব্রহ্মরূপ; কিন্তু অজ্ঞানচ্ছন্ন আছি বলে ঐ ত্রিশক্তি বড় লোকের পাড়ীর আয়ার মত আমাদের নিয়ে খেলা করছে, ধমকাচ্ছে, শাসন করছে ইত্যাদি। ছেলে বড় হলে, কি মায়ের কোলে বা কাছে থাকলে দাগীর আর তাঁর ওপর কোনও হাত থাকে না। তেমনি আমাদের জ্ঞান হলে কিবা মায়ের কোঁপা হলে ওই সব শক্তি দাগীর মত আমাদের আজ্ঞাধীন হবে।

চোর চুরি করে, তাতেও ভগবানের তৃপ্তি, আর ধার্মিক দান করে, তাতেও তাঁর সমান তৃপ্তি। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক সত্ত্ব কোথায়? লম্পট লম্পট্য করছে আর 'সাধু' পতিব্রতা স্ত্রী ত্যাগ করেছে উভয়েই সেই অনন্ত পথের পথিক। এই সাধুও কোনও ক্ষম্যে ঐ সব বিষয় ভোগ করে এখন নীতশ্রদ্ধ হয়েছে; ওই লম্পটও একদিন কামিনী কাকনের মোহ

হেঁড়ে সাধু হবে। সবই ব্রহ্মের পরিণতির স্তর। নিম্নস্তরের ভাবগতিকে অধর্ম, পাপ ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার উচ্চ স্তরগতিকে পুণ্য, সং, ধর্ম ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট সবট সমান, তিনি সাক্ষি-স্বরূপ। যাত্রাগানে যেমন রাজাও সাজে, ভৃত্যও সাজে—মূলে কিন্তু কোনটাই সত্য নয়। (ক্রমশঃ)



## অরূপে স্বরূপ

মনে হয়, এখনট যদি মাকে পাইতাম! চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, আর মুহূর্ত্তকালের জ্ঞাতও যেন বিলম্ব সহিতেছে না—অরূপদেবদনার বিদীর্ণপ্রায় বৃকখানি ছই হাতে চালিয়া ডাকিতেছি—মা, মা! এষ্ট আকুলতায় যদি সাড়া না পাওয়া যায়, তবেই অভিমানে বৃক ভরিয়া উঠে—অশ্র-ছলছল চক্ষু হুটী উদ্ধে উৎক্লিষ্ট করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলি—পাখানী!

কে না বলিবে বিরহ-বিষ, 'অপ্রাপ্তির বেদনা সতিয়া বাঁচিয়া থাকা মরারই সমান! আবার কে না বলিবে, এই বিরহই অমৃত, বাহাকে ভালবাসি, তাহাকে বৃকের কাছে পাই নী বলিয়া যে ঝুরিয়া মরি, তাহাতেই দূর নিকট হয়. অরূপের অন্তরাল, কালের ব্যবধান—সব ঘুচিয়া যায়। কঁদিতে কঁদিতে

জীবনভরা সঞ্চিত সকল অশ্রু যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখনই মনে হয় কান্নার সমুদ্র পার হইয়া এষ্ট তো মিলনমন্দিরের দ্বারের আসিয়া দাঁড়াইলাম!

এই যে পাই না বলিয়া হুঃখ করি, আবার সেই হুঃখের রসায়নেই অন্তর রসিয়া উঠিল অমৃতভর করি—এ হুটী উপলক্ষিকে মিলাইয়া যে কি বলি, তাহা বলিতে পারি না। বিরহে, যে রূপে নাট, সে অরূপে মধ্যাত্তিক সত্য হইয়া দেখা দেয়, স্মৃতি ও কল্পনার স্বপ্নাবরণ ঘুচিয়া গিয়া; আগ্রহের জীবন্ত প্রকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—এই তথাকে কি বলিব? এষ্ট কি মায়ার নয়—যাটা আছে, অথচ নাই? এই কি কল্পনা নয়—যাটা হুঃখের মাঝেও অমৃত চালিয়া দেয়, ব্যথা—একেবারে দূর করে না, কিন্তু তাহাকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়া তোলে? তখন দীর্ঘ-

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলি, “মা-গো ! এমন ক’রিয়া  
জন্ম জন্ম ধরিয়। তুমি আমাকে কঁাদাইও,  
তবেই বুকের মাঝে তোমাকে পা’ব !”

রূপ যে পাইতে চায়, হুঃখ তা’হারই—  
সেই অভ্যাস দ্বারা বিরহের মাধুর্য্য ঢাকিয়া  
রাখে । রূপে তৃপ্তি হয় না কেন, তাহা নোখ  
কি ? তুমি নিজে যে অরূপ, তাই রূপের  
পাগল হইয়াও তোমার স্বস্তি নাট। যে দেহের  
কীট, তাহার কথা বলিতেছি না—সে অভাগা  
রূপও আশ্বাদন করিতে জানে না, শুধু উদ্ভে-  
জন্যর আবেগে ধসিয়া পড়ে। সে দেহ হইতে  
নিজকে আরও গভীরে অন্তর্য্যব করিয়াছে,  
কল্প-বগতের শিল্পী যে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা  
করিয়া দেখ, তাহার কোনও রূপ আছে কি  
না। ভাবুক বলিলে, তাই ত, অরূপই যে  
আমার স্বরসিকী সত্তা—আমার কাছে যে  
রূপহীন বলিয়াই আমি উদার, সর্বমর্গ-  
বগাতী, আনন্দের প্রস্রবণ ! কিন্তু মায়ার বিচিত্র  
লীলায় এই অরূপের মাঝে অমুরাগের রাঙা  
আভাস রূপের সম্ভাব্যতা ফুটাইয়া তোলে—  
তখন নিজে অরূপ হইয়াও চাই অরূপা রূপিনী  
হইয়া দেখা দিচ্ না কেন ! আমার দুটি চোখ  
দিয়া তারই নীলোৎপল-নয়নের মধুরিমা পান  
করি—আমারও যে আঁখি রহিয়াছে, সে অমু-  
ভূতি নাট বা থাকিল ! এই নিপর্দায়ের মধ্যে  
পড়িয়াই অন্তরের ভাবরাশিকে মুক্তি দিতে  
চাই ; ভালবাসি বলিয়াই আবদার করি,  
মা টা আমার মাটির মেয়ে হইয়া আসুক !

যে প্রতিমা চায়, তাকে পৌত্তলিক বলিয়া  
তোমরা গালি দাও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,  
কান হৃদয়ে প্রতিমার সিস্কলা নাট ?—অর্থাৎ  
রহস্য এট, যার বুকে এই রূপের আকুলতা,

নিজের কাছে সে অরূপ। অরূপ রূপকে যাঁজা  
করে, তাই মায়া এত মধুর লাগে ; রূপ যদি  
রূপকে চাহিত, দেখ যদি দেহের, আসক্তলিপ্সায়  
তথ্য হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সে কামিনার  
ক্রেদ দিয়া কি ভাবের মুষ্টি গড়িয়া তোলা  
সম্ভব হইত ?—

তা’হা হইলে কথা এট, অরূপ রূপের  
ভিত্তি, এট, বিরহ ব্যাকুলতা হইতেই  
প্রতিমার সিস্কলা ; এইটুকু সেই সৃষ্টির  
সত্যও। আর যে রূপাভিমান নিয়া রূপের  
সৃষ্টি করিতে যায়, সেট যথার্থ পৌত্তলিক।  
তা’ই বলি, প্রতিমার ভাবুক ভক্তই মায়ার  
সত্য জানিয়াছেন ; তোমরা যাহারা রূপাভি-  
মানে মত্ত হইয়া বাহির হইতে কলরব করিতেছ,  
তাহারা মিথ্যা দ্বারা আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছ  
শুধু !

কিন্তু বলিয়াছি, এই রূপাকাঙ্ক্ষাও মায়া।  
মায়া বলিয়া যে তা’হা মিথ্যা, তা’হা বলিতেছি  
না। রসিক জানেন, মায়া সত্য, অতি অপরূপ  
অনির্কটনীয় সত্য ; সে সত্য না হইলে মিথ্যার  
সৃষ্টি করিত কে ?

তবে কি সত্য দুইটা ? ভয়ে ভয়ে বলি,  
হবেও বা ! তুমি মিথ্যা অহং নিয়া যে সত্য-  
মিথ্যায় মিথুন সৃষ্টি করিতেছ, ভগবান শঙ্কর  
বলিবেন, ইহাও জনস্ত, অতএব সত্য। আবার  
যেদিন মিথ্যা-অহং মুছিয়া ফেলিয়া নিখিল সত্য  
মিথ্যাকে আপনার মাঝেই সমগ্ররূপে অমু-  
ভব করিবে, সেই দিনই পারমার্থিক সত্যের  
সাক্ষাৎ পাইবে। তবে কি মূলে দুই ?—তা  
ছাড়া আর উপায় কি ! এক বলিলেই কি  
তুমি বুঝিতে পারিবে ? যখন এক বুঝিবার  
যোগ্যতা জন্মিলে, তখন আর বুঝির বালাই  
থাকিবে না।



এইখানে আসিয়াই দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়।  
রূপ অরূপের আলোকে মিশিয়া যায়—ভাবের  
সঙ্গে ভাবের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিজ্ঞানময়  
স্পর্শ-শিহরণে অদ্বৈতের অমৃতভূতি জাগে!

রসিক বলেন, এট অমৃতভূতিই সত্য, আর  
এই জগৎ রূপ চাহিয়াও তোমার তৃপ্তি নাই,  
তাহাকে অরূপে পরাবর্তিত না করিতে পারিলে  
তোমার মিলন যে সম্পূর্ণ হইবে না। বৈষ্ণব  
যে বলেন, “যাই যাই নেত্র পড়ে, তাই! তাই!  
ইষ্ট ক্ষুরে”—সে রূপ দ্বারা রূপের আচ্ছাদন  
নয়, অরূপ দ্বারা রূপের সম্পূটীকরণ। বির-  
হকে গভীরভাবে যে অনুভব করিতে পারে,  
সেই রূপকে অরূপে নিমজ্জিত করিয়া  
মিলনানন্দের সমাহিত হইতে পারে। তাই  
রাধার শতবর্ষের বিরহ বৃন্দাবনমীলার চরম  
পরিণতি, গোমের অদ্বৈত ভঙ্গিমা। রূপাধেয়ী  
বৈষ্ণবপন্থীর তাই চরম বিশ্রান্তি বেনোত্তে।

বিরহের ব্যাকুলতাকে জড়ের মত আস্থা  
দান করিয়া উহাকে হৃৎস্পর্শ করিয়া তুলিও  
না; চিন্ময় প্রভায় আপনাকে প্রভাসিত  
করিয়া তোল—ব্যাকুলতা সুরের হইবে।  
আপনার অরূপ প্রতিষ্ঠার অটল থাক, কামনার  
দংশন আর পীড়া দিবে না। রূপে রূপে  
কামের অতৃপ্তি, রূপে অরূপে তৃপ্তি-অতৃপ্তির  
দ্বৈত-মিশ্রণ; আর অরূপে অরূপে অদ্বৈতের  
পূর্ণ তৃপ্তি। সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত নিখিল  
বিশ্ব এট রহস্যের সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে!

অরূপে রূপের বাঞ্ছনা আছে, তাহা  
স্বীকার করি। কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা  
কোথায়? অরূপ রূপাশ্রিত, না রূপই  
অরূপের আশ্রিত? নিজের অন্তরের মাঝে  
তলাইয়া বুঝিয়া তারপর জবাব দিও!

হউন আমার চেষ্টা, হই আমি স্বয়ং—সবার  
চরম পরিণতি অরূপে, এট সত্যটা তাহা চাইলে  
পাইলাম। কিন্তু রূপে যে আমি আটকা  
পড়িয়াছি—তোর মোহ কাটাই কি করিয়া?

আধুনিক সমাজে কেত কেত বলেন,  
অরূপে তোমার ভাবনাকে নিশ্চিষ্ট কর, পৌন্ড-  
লিকতা ছাড়! • কিন্তু কথা এট, নিজে পুতুল  
হইয়া পৌন্ডলিকতা কেত ছাড়িতে পারে কি?  
মাতৃসত্ত্ব যে শিশুর জীবন, সে মাতৃস্নেহে তার  
আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া পাইলেই কি বাঁচিয়া  
থাকিতে পারে? তার যে স্নেহও চাই, স্তম্ভও  
চাই! তাই প্রতিমাভাবিত বুদ্ধিকে প্রতিমা  
ছাড়িতে বলা মানবচরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ  
কলা ছাড়! আর কিছুই নয়! • মানুষের পরি-  
ণতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যাহার নাই,  
সেই এমন কথা বলিতে পারে। রূপমুঢ়ের  
এই নিগরীত প্রয়াসকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা  
বলিতেছেন, অবাক্তং হি গতিহংশম্।

তবে রূপের মায়া কাটাইবার উপায়?—  
আগে আপনাকে কেহ করিয়া অরূপের সাধনা  
আরম্ভ কর। নিজকে অরূপে ভাবিত করিতে  
পারিলে ইষ্টরূপেও আর মোহ থাকে না—সে  
ইষ্ট তোমার যাহাই হউক না কেন। তোমার  
প্রাথমিক রূপ দেহ। আগে দেহ দূর করিতে  
হইবে—দেহের বিনাশে নয়, তাহার বিকাশে।

প্রকৃতির একটু আইন রহিয়াছে, পূর্ণতা  
অরূপের সিদ্ধি। দেহকেই উদাহরণ ধর।  
দেহের স্বাস্থ্য যখন অটুট, দেহের অমৃতভূতি  
তোমার তখন অতি ক্ষীণ। তাপসী রাবেয়া  
শিরঃপীড়াগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে মাথায় পটা  
বাঁধিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “এত দিন তো  
তোমার মাথার খোঁজ ছিল না, আজ এক

বেলায় অম্মুখেই ওটার অস্তিত্বের মিশান উড়াতে হটল ৭" তবেই দেখি, অস্বাস্থ্যই আশ্ববিরোধী সস্তার উদ্ভাবক। তাহা হইলে এই সূত্র পাঠ, দেহরূপ দূর করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার অমোঘ উপায় ঋষি-প্রদর্শিত ব্রহ্মচর্য্য। প্রাকৃত পদার্থ স্বচ্ছ থাকে তোমণে নয়, পোষণ এবং পেষণ উভয়ের সমন্বয়ে। এই বৈজ্ঞানিক সংকেতই ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মবিহার।

কিন্তু শুধু দেহেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। দেহরূপ দূর হইলে প্রাণ জাগিবে। সূক্ষ্মদেহ পশুর উদ্দামতা তাহার প্রাণের অস্বস্থ পরিচয়—প্রমাণ মনের অবনতি। তাই প্রাণের উত্তেজনাকেও সূস্থ করিতে হইবে, ইহাও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। ফলে ফুটিবে মনের আধিপত্য। আপনাকে ডিজাটয়া

ঘাইবার একটা প্রয়াস তাহাতে কাগে—নিজের মানস রূপের কাছে কত সাধক কাব হইয়া রহিয়াছে। ইহাও মনের অস্বাস্থ্য। ফল অগভীর ব্যাপ্তি, তাহাতে অজ্ঞের প্রতিভা বলিয়া ভ্রম কণে। মনকে সূস্থ করিতে বিজ্ঞানকে উবুদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণ মানুষের গাত এই পর্য্যাপ্ত। বিজ্ঞানের অস্বকীর্ষিঃ পরিণামকে আনন্দদ্বারা সূস্থ রাখিতে হইবে এবং আনন্দকে সূস্থ রাখিতে হইবে। চেতনা দ্বারা। চৈতন্যের সংকেত। দেহ, প্রাণ, মনকে সূস্থ অতএব রূপাভিমান-বর্জিত কর—এই সংকেত আপনা হইতে বাক্যে পরিণে; তখন অল্পভূতি হইবে, অরূপ সচ্চিদানন্দই তোমার স্বরূপ। তোমার ইষ্টও তাই। সমে সময়ে প্রীতি। রূপের বিরহেই অরূপ-ধিগন বা স্বরূপসিদ্ধি।



## সিদ্ধির সংকেত

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]



ভগবানকে এখন এই দিক দিয়ে বাধ্য করছি, শোন। সর্বস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করে আছে এক জুগের সমুদ্র—তার মাঝে অতি স্নিকুমার ও সুশোভন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, তার কয়েকটা পাঁচে একখানা পালক রয়েছে। হাজারটা তার কণা, তাই হল যেন ছাতা। এই সমুদ্রশয়াম এক অতি

কয়লীরকান্তি পরমাসুন্দরী দেবী—ভগবানেরই প্রিয়া তিনি। তমুখানি তাঁর স্বচ্ছ, নয়ন অর্ধমুদ্রিত, ওষ্ঠে মধুস্মিত। অতিসম্বলণে তিনি ভগবানের পদ-সম্বাহন করছেন। এই দেবী প্রতিমা এক অতি আশ্চর্য্য পদ্মের ওপর আসীন—কমলাসনা হয়েই তিনি ভগবানের , সেবা করছেন। জুগনার চোখে চোখে মিলক

হল— পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা বিভোর হয়ে আছেন।

জান এই যুগলক্লেশের অর্থ কি ? এতে দেবী সচ্চিদানন্দকপিণী— ওট দেবীভারতী শ্রী, মহিমা তিনি। তাহলে এর অর্থ হল এহ, যুক্তপুঙ্খ বিরকাল পরে অনিমেষ নয়নে আপনায় মগ্নমান পান, নাবণোব পানে তাকিয়ে আছেন; আব জগৎ যখন তাঁর কাছে নিমজ্জিত, তখনই ~~কিন্তু~~ মুক্ত। তিনি সমস্ত সৰ্ব্বকণ্ড বন্ধনের অহীত, সৰ্ব্বপাশযুক্ত তিনি—জগতে তাঁর আব কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট নাই।

সমুদ্র হল অনন্তের প্রতীক। তবে একে ভ্রমের সমুদ্র বলা হল কেন ? ভ্রমের কিনারা গুণ আছে। তখন লঘু (সুতরাং ভ্রমের নিপন্নীত, কেননা ভ্রমঃ গুরু), তখন শাদা অর্থাৎ আনন্দময়, আবার তখন পুষ্টিকর অর্থাৎ শক্তিস্বরূপ। তাহলে ভ্রমের সমুদ্র অর্থে অনন্ত জ্যোতিঃ, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি। যুগলেন প্রতিষ্ঠা এর উপরেই।

সাপের অর্থ-কি ? সাপ অর্থে সব গেলেও যে থাকে। সাপিনীর শত শত ভিন্ন হয়, কিন্তু হওয়'মাজেই সে না কি সেগুলো পেয়ে ফেলতে থাকে। সব যায়, শেষকালে এক থাকে। এই অনন্ত জ্যোতির্ময় আনন্দঘন শক্তির সমুদ্রে অমৃতরূপ একমাত্র পিবাঞ্জিত হয়েছেন। সেট এক বিধা বিভক্ত—দুইয়ে, স্বমহিমায় স্থপ্রতিষ্ঠ, স্থনিষ্ঠ, স্থশান্ত, সুন্দর। ওম্!

রাম দুটো কথাই প্রাণ তোমাদের বিশেষ লক্ষ্য করতে বলছেন—

‘(১), ক্ষুদ্র অহংএর পরিহার (২) সত্য অহংএর যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

**প্রথমতঃ—**পরিহার বা তাগকে বেদান্ত বলেন সম্পূর্ণ বন্ধ-শৈথিল্য যা নাকি আয়েস, বিশ্রাম। যখনই সময় পাবে, চেয়ারে বা খাটে দেহটাকে সটান ছুঁড়ে ফেলে দাও—যেন এ'গোবা কোনও দিনই তোমার বটেতে হয়নি; একটা পাথরের ছড়ি যেমন তোমার কাছে অচেনা—অনাখীর, এ-ও'যেন তাই। দেহটা জড়পিণ্ডের মত কিছু কাল পড়ে থাকুক, তোমার চিন্তা বা বাসনার খিঁচু-নীতে যেন তাকে পাড়া বাধতে না হয়—কোথাও যেন বিন্দুমাত্র টান না ধরে। দেহ আঁকড়ে পড়ে থাকবার বাসনাকে একে পারে সম্পূর্ণ বর্জন কর। মনের মাঝেও যেন কোনও ভাবনাচিন্তা না থাকে, এমন কি দেহের বাসনাও না। সব বাসনা ছেড়ে দাও একবারে! এমনি বাধন আলগা করাকেই বলে ত্যাগ।

**দ্বিতীয়তঃ—**ব্রহ্মসম্ভাব। তাঁর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা হোক। যা তাঁর অভিপ্রায় বলে বুঝেছ, তাকে তোমার অভিপ্রায় ভেবে গণ্য করতে চেষ্টা কর—তাতে আশ্রয় নুত, আশ্রয় ছঃখ। নিধিকে দেহ আর তার পারিপার্শ্বিক হতে উর্দ্ধে ভাব—মনের উর্দ্ধে, মস্তকের উর্দ্ধে, সিদ্ধ-অসিদ্ধির আশা-আকাঙ্ক্ষার উর্দ্ধে। নিজেকেই সর্বব্যাপী অনন্তশক্তি বলে অনুভব কর—স্থল-স্থল-কারণের অতীত, অধ্যাসের অতীত, লোকলোকান্তরের আচ্ছন্নত পরমানন্দ ব্রহ্মহীন রাম তুমি। যে স্বর স্বভঃই করে কুটে ওঠে, সেট স্বরে প্রণব গান কর—আর ভাব তুমি আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ শুধু! তাহলেই সর্বব্যাপি, সর্ব অভিযোগ দূর হয়ে যাবে তোমার। জগৎটা বোঝা হয়ে বৃকেন

ওপর চেপে থাকে না যেন। জগতে যৌক্তিক বা সামাজিক যত কিছু ভাবের অভিব্যক্তি, সমস্ত তোমার ভাবেরই ছায়া মাত্র—যে শক্তির নিঃখাসে বা আভাসে এই জগতের সৃষ্টি, সে শক্তি তুমিই—এই ভাব দিনরাত ভাবনা কর। তুমি-বা ভাবছ, জগৎ ঠিক তাই।

তোমার উদ্দেশ্য সকল হয় না কেন, জান ? যে তোমার অতি আগুন, তার কথায় তোমার আস্থা নাই; আর পনের কথা যত অস্থির আর ধোঁয়া-ধোঁয়াই ছোট না কেন, তুমি সশস্ত্র বিনয়ের সত্য সেগুলো গলাধঃকরণ কর। আত্মাই যে তোমার সব চেয়ে আপন। রামের এই উপদেশ, তোমার গরজে তুমি বাঁচ, পনের মতের ওপর নির্ভর করে নয়। স্বাধীন হও। বিনি মহাপ্রভু, আত্মস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অমৃত্যুযায়ী, শুধু তাঁরই সেবার জীবন উৎসর্গ কর। হাজার মানুষকে, অগণকে খুসী করা কখনো তোমার সাধো কুলাবে না—আগ শতকরা রাবণকে খুসী রাখার গরজট না তোমার কি ? তার কাছ থেকে কি কোনও ধার পেয়েছ তুমি ? -তা তো নয়। তুমিই তো তোমার নিরাশ্র। তাই অগণমনে তান ধর—কে, শুনে এলো না এল, তার তোমাকে মোটেই রেখে না। তোমার অস্তিত্ব যদি খুসী হল, তাহলে সংসারও খুসী হবে—হঠাৎ বাধ্য সে! এ যে আত্মা। পরের খাতিরে নিজের জীবনে মেকই চালাবার কি প্রয়োজন বল ত ?

রাজার ছেলে পানের ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলছিল। ছেলেদের খুঁজে বার করতে তাকে ভারী বেগ পেতে হচ্ছিল। এক জন কাছে দাঁড়িয়ে দেখাছিল, সে বলে, “ছলে

গুলোকে খুঁজে তুমি হারানো চক্ক কেন ? তুমি রাজার লে, ছকুম কবলেই তো সব এক জায়গায় এসে জুট হয়,” তাই জবাব হচ্ছে, তা করলে আর খেলায় মজা থাকে না। তাই রাম এগিয়ে, তুমিই দীনজানয়ার মালাক, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বময়; কিন্তু সব করে যখন চোর হয়ে তোমার প্রজাদের খুঁজে বের করতে নেমেছ (প্রাণাতিক যত ভাব আর জানতে তোমার প্রজা বহু আর কিছু নয়), গোটা জগৎটা যখন তোমার লুকোচুরী খেলার আসর, তাহলে খেলার বোর্ড ভেঙে দিয়ে রাজার ছকুম জার করে সব পণ্ড করে দেওয়া তো আশীর্বাদার হবে না। যে ভূমিত গেলে ভূত, ভাবঘাং, বর্তমান একাকার হয়ে যায়, মনুষ্য সহস্র মূর্ত্য নক্ষত্র তোমারই আত্ম প্রতিবিম্বরূপে প্রতিভাত হয়, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ বলে বোদ হয়, সে ভূমিতে গিয়ে বি, এল পাণ কলে ওকালতী করা আর টাকা বেজগানের ফন্দী নাগ করার কথা মনে থাকে কি ? যদি ভাগ্যবত দিবাদৃষ্টি চাও, তবে যে ভূমিতে থেকে দিবাদৃষ্টির আনন্দ বর্ধিত হবে, তা ছাড়িয়ে উঠতে হবে।

মাছ ধরতে গাল ফেলা চল। জালে মাছ পড়ল বটে, কিন্তু টানের চোটে জাল নিয়ে চললো হাবা। খোদার ওপর খোদকারী করতে যেও না—তোমার মতলবটা কি, কেমন করে কি করলে কি হত, এ উপদেশ তাঁকে দিতে যেও না। তাঁর পায় সব তাঁর সঁপে দাও, নিজের অহংটা বিসর্জন দাও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা অহংকে দলিত কর, তাতেই তোমার দেহ-মন আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে, ব্রহ্মবিকাশের যোগ্য আধার হবে। খাঁটা শয়্যা বা খাঁটা জানি হয় ভিতর

থেকে, বাইরের বই পড়ে নয় বা পনের মনের সংযোগ থেকে নয়। যারা পাঠভাষাণী, যারা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়েছেন, তাঁরা যখন একাগ্র ভাবনায় সমাহিত হয়েছিলেন, তখনই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা ছিলেন ইজিপ্টের অতীত, তাঁদের মাঝে কামনা বা ভাড়া ছিল না, মনের আনাচে-কানাচেও তাঁদের তখন একটু স্বার্থের রেশ ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি যেন স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, জ্ঞানের আলো তাঁদের অন্তর হতে স্পৃহিত হয়েই গ্রাহ্য-রাজিকে আলোকিত করেছে বুড়ি বুড় কাগজ-পত্র তাঁদের এক কণিকা জ্ঞানও বাড়ায়নি।

একেই বলে কাজ। কাজ বলতে রাম গোলামের ভাড়াভাড়া খাটুনী বোঝেন না। বোধ্য বলে, আত্মার সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গ রেখে স্পন্দিত হওয়াই যথার্থ কাজ। সত্যের সঙ্গে এই স্বার্থসম্পর্কহীন মিলনানুকেই বেদান্ত বলেন কন্ম; আর অজ্ঞেয়া একেই অকন্ম বা কুঁড়েমির ছাপে দাগী করতে চায়। “সিদ্ধির পথ” নামের বক্তৃতাটা আবার ভাগ করে পড়ে দেখো। ত্রিক বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি নিত্য শ্রমসাধ্য একটা কাজ নিয়েও পড়, তাহলে তাত্ত্বিক যেন খেলায় মত আমোদ। এক দিক দিয়ে যাকে বলে হচ্ছে ঘোর কন্ম, আর এক দিক দিয়ে তা কিন্তু কিছুই না। এই হচ্ছে বেদান্তের শিক্ষা।

হিন্দুর পুরাণে ভগবান হরকমে চিত্রিত হয়েছেন। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটা স্তর থাকে—একটা দর্শন, একটা আচার, আর একটা পুরাণ। দর্শন হচ্ছে পণ্ডিতের জন্ত;

আচার হচ্ছে দেহের জন্ত, বালকদের জন্ত; আর পুরাণ হচ্ছে ভাবকের জন্ত। তিনটা পাশাপাশি থাকবে। একটা যদি পিছিয়ে পড়ে, তাহলে ধর্ম পঙ্গু হয়ে যাবে। হিন্দুর শাস্ত্রে এই তিনের সমন্বয় আছে বলে এখনও হিন্দুধর্ম বিংশকোটি লোকের ধর্ম। যে ধর্মে এর এক অঙ্গ হীন, সে ধর্ম খাঁটি হতে পারে না। হিন্দুতে এই তিন অঙ্গেরই পূর্ণ বিকাশ। হিন্দু পুরাণ হতে রাম তোমাদের পুরুষোত্তমের কথা শোনাবেন। তাঁর কথা সর্বদা চিন্তা করতে হবে।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মসত্তার চৌটি বিভাব দেখানো হয়েছে। একরূপে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে যেন তিনি অতি শুভ্র, অনিন্দ্যসুন্দর, পরম গম্ভীর যুগা পুরুষ—হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে সমাধিমগ্ন, মুদ্রিত নয়ন, বাহুজ্ঞানশূন্য, চিদানন্দঘনবিগ্রহস্বরূপ। তাঁর ক্ষোভ নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই। শুভ্র হিমাচল অর্থে প্রশান্ত, অটল মন।

এই দেবতার পাশেই তাঁর প্রিয়া, আপাদ-মস্তক অরুণরাগ-রঞ্জিতা পরমা সুন্দরী এক প্রতিমা। তিনি পরম পুরুষের জাম্ন অবলম্বন করে একান্ত মনে তাঁর জন্ত সিদ্ধি খোঁটছেন। পরম পুরুষ একবার চক্ষু মেললেন, আর অমনি সেট দেখে দিব্যামাদকতাপূর্ণ সিদ্ধিপাত্র তাঁর মুখের কাছে ধরলেন—তাঁই পান করে যেন তিনি আবার সমাধির কোলে ঢলে পড়েন। এই দেবতার কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে দেবী জগৎ-রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, আর তিনি তার ব্যাখ্যা করছেন। তিনি ছিলেন রাজার মেয়ে, কিন্তু এই মুক্ত পুরুষের সঙ্গে পাবার দরুণ সব ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। এই পরম পুরুষ হিন্দুর শিব, তাঁর প্রিয়া গিরিজা। ওম্ ওম্!

## ভোগ ও যোগ

—:|\*}:—

ভোগ আর যোগ নিয়ে দ্বন্দ্ব মীবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে—প্রমাণ পরিত্তি ও নিবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত সাধনপথ। গতোক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সদয় দেবতার-গংগ্রামের রক্তভূমি হইয়া উঠে; উহাও জানা কথা। সৃষ্টির গাড়াতে দেবতা ও অমর, দুই-ই ছিল; এক পক্ষ গণের পক্ষেই আস্থ-রিক পরিশোধ কামনা করা সত্ত্বেও এখনও দুই-ই জগতে সমান থাকে টিকিয়া আছে। মাথাগুণ্ডি হিসাবে অমরের সংখ্যাটি বেশী দেখা যায়, কিন্তু দেবতার নামে যে তাহার আঁতে কাঁপিয়া ওঠে, এখনও তাই দেবতাদের কাণেও পৌছিয়াছে। তাই দেবভক্তেরা আশা করেন, এক দিন অমরের চিহ্ন নিঃশেষ হইয়া ধরতীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। বিদ্যাতা বোধ হয় অলক্ষ্য হইতে মুখ টিপিয়া হাসেন শুধু!

অমরের রাজা বিরোচন, আর দেবতার রাজা ইন্দ্র দুইজনই প্রজাপতির কাছে গিয়া ছিলেন তত্ত্ব জানিতে। পুরাণকাব বলেন, প্রজাপতি সকলেরই ঠাকুরদাদা, সূত্রাং যষ্ট জীবমাত্রের প্রতিই তাঁহার চিত্ত একটু অতিনিক্ত পশ্রয়শীল। আপনার বদখেয়ালটা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিতেও কেহ ডরায় না, তিনিও কাহারও কথায় রাগ করেন না, বা নাতিদের আবদার পূরণ করিতে বিশেষ রূপ যত্ন করেন না। সে যাহা হউক, বেদের প্রজাপতিও কিন্তু অমরকে খেদাইয়া দিলেন না বা দেবাসুরের মাঝে কোনও গন্ধপাত্তযুক্ত

ব্যবস্থা করিলেন না। বহিলেন, “আচ্ছা, বেশ। কিন্তু তত্ত্ব শিক্ষা তো অমনি হইবে না, ব্রহ্মচর্যা করিতে হইবে। সাধনা চাই, নহিলে জ্ঞান হইবে না।” বত্রিশ বছর ধরিয়া দুইজনেই ব্রহ্মচর্যা করিলেন, ততদিনে চুল দাড়ি নথ সব বড় বড় হইয়া গেল, চেহারা পক্ষ ও রক্ষ হইয়া উঠিল। বত্রিশ বছর পূর্ণ হইতে প্রজাপতি এক দিন তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন, “আজ তোমরা কে, তাহা চিনাইয়া দিব, দুইটা সন্ধ্যা করিয়া জল লইয়া আইস।” জল আনি হইলে বলিলেন, “সন্ধ্যা জলে চাহিয়া দেখ দেখি।” ইন্দ্র বিরোচন নিজেদের অপরূপ মূর্তি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, “আচ্ছা যাও, এখন চুল দাড়ি কামাইয়া স্নানটান করিয়া পরিষ্কার হইয়া আইস।” দুইজনে স্নান করিয়া আসিলে বলিলেন, “এই-বার দেখ দেখি।” ইন্দ্র আর বিরোচন ছায়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“বাঃ!” প্রজাপতি হাসিয়া বলিলেন, “ব্যবস্থাছ?” বিরোচন বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, “হঁ, হঁ, ব্যবস্থাছি।” ইন্দ্রও তাহার কথায় সায় দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, “তবে আর কি! এখন ঘরে যাও।” দুইজনেই বিদায় হইয়া চলিয়া আসিলেন। পানিক পরে ইন্দ্রের মনে কি খটকা হইল, ফিরিয়া আসিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, “না, এ তো সব হইল না।” প্রজাপতি আবার হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তবে আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্যা করিতে হইবে।” এইরূপে ইন্দ্র তিনবার

বিদায় নিয়া তিনবার ফিরিয়া আসিলেন। বিরোচন দেশে গিয়া প্রচার করিল, “দেখ, আমাদের শুদ্ধ নৃপা প্রয়োজন, নতিগে স্থপ নাই। তোমরা সকলে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, সর্বদা নিজকে আমারে রূপতে চেষ্টা করিবে। প্রজাপতির নিকট হইতে আমি এই সংকল্প শিখিয়া আসিয়াছি।” উপসংহারে বেল বলিলেন, “বিরোচনের কথা শুনিয়া অমরেশ্বর শেষকালে দেবতাদের কাছে, মারা পড়িল।”

এই কাহিনীতে ভোগ আর যোগ সম্বন্ধে দুই তরফের কথাই বেশ কোণে গুলিয়া বলা হইয়াছে। প্রথম কথা এই পাঠ, ভোগই বল আর যোগই বল, দুইই প্রজাপতির বিধান। ভোগপন্থী অমর, আর যোগপন্থী দেবতা, দুইয়ের কাছেই তাঁহার দুয়ার খোলা। তিনি এমন কিছু বলিলেন না যে তোমাকে এই পথ ধরিতে হইবে, কি ওই পথ ছাড়তে হইবে। যাহার যেমন রুচি, যেমন বুদ্ধি, সে যেমন পথ বাছিয়া লইবে। দেবতা আর অমর পন্থার লড়াই চণিতে পারে। কিন্তু প্রজাপতির সহিত তো কাহারও লড়াই নাই। সূতরাং গণ্যটা বিচার করিতে হইলে নিরপেক্ষ থাকিয়া করিতে হইবে, কোনও মতলবসিদ্ধির জন্য একপক্ষ টানিয়া বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা, ভোগই বল, আর যোগই বল, সাধনা দুয়েই প্রয়োজন। বিরোচনকেও সাধনা করিয়া ভোগসামগ্র্য সংগ্রহ করিতে হয়। ভোগের মজা লুটিন, অথচ তাহার কড়ি দিব না, প্রজাপতির আঁতনে তাহা বলে না। কর্ম স্বপ্নের ভিত্তি—ভোগীর জন্মও,

যোগীর জন্মও। সংযম সকলেরই প্রয়োজন, ভোগীরও প্রয়োজন। ভোগ নিবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দাও, ভোগে প্রবৃত্তি বজায় রাখিবার জন্মই শ্রেয়স্কর প্রয়োজন। পশুভগ্নতে প্রকৃতি সংযম শিক্ষার ভার নিজের হাতে রাখিয়াছেন, তাই ভোগে পশু সকলে বিবস্ত্র হইয়া যায় না। মানুষ প্রবৃত্তি বলিধা যাহাকে গাল দেয়, অসংযত ব্যবহারে তাহার দ্বারা ইহা হইয়া যায়, অথচ পশুকে অপায় দিয়া তাহার প্রতি অপচার করে। সিদ্ধপুরুষেরা বলেন, “প্রথম জীবনে সংযম সকলেরই প্রয়োজন, নতুবা পরবর্তী জীবনে ভোগও তৎসহ হইয়া উঠে।” পশুভগ্নে দশটা ছেলে রাখিয়াছে; তাহার মাঝে দশটা যে সাধু হইবে, এমন ভরসা করা চলে না। গুরু বলেন, “সে ইচ্ছা দেয় মায়ের সাধু হইবে, সে পাক সাধু হইবে, আর যে চোর হইবে, সে পাকা চোরই হইবে।” মূল কথাটা হইতেছে সংযমের শক্তি। প্রোগ করিয়া কাহাকেও সাধু বানানো যায় না। যে ভোগী হইবে, তাহাকে ধার্মা-বোধিয়া বোধ করিতে গেলে সে ভ্রষ্টাচারে যোগপন্থা কলুষিত করিবে। কিন্তু তাহার ভোগের জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্মও সংযমের সাধনা অতি প্রয়োজন। এই জন্ম প্রাচীনকালে সাক্ষ্যভৌম ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা ছিল। তাই বলিয়া ব্রহ্মচারী মাত্রেই শঙ্করাচার্য্য বনিয়া যাঁহা নাই। ভোগ হইতে যোগে গুণকর্মের পথ ধরিয়া প্রকৃতি সকলকেই টানিয়া নিবেন। এই পথেরও একটা শাসন আছে; উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে নিজেরও কষ্ট, পরেরও কষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য সেই পথের পাথর সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেয়।

প্রজ্ঞাপতি লক্ষ্য নিরূপণ সম্বন্ধে হস্ত  
আর বিরোচনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, কিন্তু  
সংযম শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও শৈথিল্য ঘটতে  
দিলেন না। বেদপন্থী হিন্দুধর্মমাজের হস্ত  
বিশেষতঃ সঙ্গুর আচারও এইরূপ। সেদিন  
কাগজে পড়িলাম, “গুরুর দশা” (উত্তরা,  
আশ্বিন, ১৩৩৩)—হৃদয় বলিলে আরও  
শোভন হইত। লেখক প্রমাণ করিতে চাহেন,  
হিন্দুর গুরু ভাবের ওপর জুলুমবাজী করে,  
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পর্ক করে; এই অপরাধ  
গুরুকে নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিন্তু  
আমাদের মনে হয়, ঠিক গুরুর পাল্লায় তিন  
পড়েন না, পড়িলে অল্প রকম স্বর বাহির  
হইত। শাস্ত্র বলা, গুরু বলা, আমরা তো  
জানি, ভাবের রাজ্যে সবাই আমাদের পার-  
পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন—যা সামাজিক  
বন্ধন, শুধু আচারের। তাও আচার ভাবেরই  
অন্তর্ভুক্ত। তবে তুমি নিজে যদি জড় বনিয়া  
যাও, বন্ধনমুক্তির জন্য মথায়ণ চেষ্টা না কর,  
তাহা হইলে শাস্ত্রই বা তোমার কি করিবে,  
গুরুই বা কি করিবেন?

সে যাহা হউক, আমাদের মূল বক্তব্য  
এই, পরিণাম তোমার যাহাই থাক না কেন,  
গোড়ায় কিন্তু সংযম চাই—এটা প্রজ্ঞাপতির  
বিধান। ভোগীকে এই কথা সর্বদা স্মরণ  
রাখিতে হইবে।

এই কাহিনীতে আর এক শিক্ষা পাঠিলাম,  
পরিণাম সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া  
যাইতে নাই—জিজ্ঞাসাকে সদাজাগ্রৎ রাখিতে  
হইবে। বিরোচন যুগের কথা কাড়িয়া লইয়া  
বলিয়া বসিল, “হাঁ, বুঝিয়াছি”; ফলে মরণ  
হইল তারই। ইহা এত লোলুপ নন, একটু

সম্যকান পাঠিয়াও তাঁহার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইল  
না, তাই তিনি ক্রমে আরও আগাইয়া গিয়া  
সোনার খনি, চীনার খনি, শেষে পরশমণিট  
পাইয়া গেলেন। সাধারণ লোকে আর  
বৈজ্ঞানিক তফাৎ কিছু? সাধারণ লোকে  
চটপট একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে; কিন্তু  
বৈজ্ঞানিক শেষ না দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তকেই  
পাকা করিতে চাহেন না। সাধারণ ভোগীরও  
ঠিক এই দশা; তার আর তর হইবে না।  
যোগী বৈজ্ঞানিকের মত হিসাব করিয়া চলেন।  
সংযমী না হইলে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না।  
ভোগেরও বিজ্ঞান আছে; একদিন এ দেশে  
বৈজ্ঞানিকেরা তাহা নিয়েও কম ঘাঁটাঘাঁটি  
করেন নাহ। যাহারা এ সমস্ত নিয়ে নাড়া-  
চাড়া করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে অসংযমী  
ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।  
অসংযম তো শংকরা সাড়ে নিরানব্বই জন  
লোকের করিতেছে। তাঁহারাও যদি সেট  
পণেরই পথিক হইলেন, তবে আর তাঁহাদের  
নূতন কথা শোনাঁইবার দাবী টিকে কি  
করিয়া? এখন মানুষের সংযম নাই, বিজ্ঞান  
জানবার মত জিজ্ঞাসা নাই—আছে শুধু  
মৃত্যুর মত ভোগে আসক্তি; তাই কোথায়ও  
একটু বাধার কল্পনাতেই কলরব জুড়িয়া দেয়।  
ভোগীর প্রাতঃপ্রজ্ঞাপতির এই আর এক  
টুকু—ভোগ কর, কিন্তু বিজ্ঞান জানিয়া  
করিও; তাহা হইলে ভোগের ভিতর দিয়াই  
যোগের সন্ধান পাইবে।

এখন শেষের কথাটা বলি। শ্রুতি বলি-  
তেছেন, বিরোচনের বুদ্ধিতে চলিয়া অন্তর্বেরা  
শেষকালে দেবতাদের কাছে হইয়া গেল।  
এখন স্মরণ করিতে হইবে, দেবাসুরের মাঝে



লড়াইটা কি নিয়া। হু'মনাতেই চায় স্বর্গের দখল। স্বর্গ জিনিষটা কি? স্বর্গের যে সব দার্শনিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। পুরাণাদিতে স্বর্গের যে সব স্থূল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া ভোগীর রগনা রসসিক্ত হইয়া উঠে-নিশ্চয়ই। দান টান করিয়া কিছু পুণ্যের পুঁজ বাগাটয়া নিয়া একবার সেখানে আড্ডা গাফিলতে পারিলে হয়। কিন্তু এই স্বর্গ নিয়া এত মারামারি করিয়াও শেষকালে কিনা সেখানে দেবতাদের দখলই কায়েম হইয়া গেল! এ কি অশ্রুদের পক্ষে কম আপশোষের কথা?

এইখানে ভোগ-যোগের দ্বন্দ্ব 'মিটিয়া গিয়াছে। অন্যদি অনন্ত ভোগভূমির আধিপত্য তোমারই, যদি তুমি দেবতা হইতে প্রাণ, যোগী হইতে পার। সংযমের শুকতাকেই জীবনের চরম পরিণতি মনে করাও মূঢ়তা। ভোগ তোমার চরম সিদ্ধি; কিন্তু অশ্রুর মত অর্জিত হইলেই তাহা তোমার বিনাশের কারণ হইবে। ভোগ ও যোগে সমন্বয়-সূত্রই

হইল সংযম সংযমের সাধনা পরিণামে আনে নিলেপ। চিত্র নিগিষ্ঠ হইলে ভোগায়ত্তন আপনা হইতেই উদ্‌বাটিত হইয়া যাইবে—চতুর্ভুজ করামলকবৎ প্রতিভাত হইবে। ভাগবত ভোগই আদর্শ—উচ্চার মর্ম্মরহস্য নির্লিপ্ততা। এত রূপ রসের ডালা সাজাটয়া প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন?—সেই পরম পুরুষের। ভোগনাথের স্তিমিত লেটন হইতে অশ্রুরাগের সুষমা একবার যদি তাঁহার পদ্মপাশালোচনের উপর ঝরিয়া পড়ে, তবৈত তাঁহার বসন্ত-পুষ্পাভরণের সজ্জা সার্থক হইয়া উঠিবে যে।—যাচিয়া তিনি সেখানে ধরা দিবে। আর ভোগমত্ত অশ্রুরের প্রতি তাঁহার স্নেযোক্তি—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দপং ব্যাপোহতি।  
যো মে প্রাভবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

অশ্রুর কথিয়া বলে, “সেই দুর্কিনীতাকে কেশাকর্ষণ-বিহবলা করিয়া লইয়া আয়!”—কিন্তু দেবীর রোষদীপ্ত নয়নের বজ্রবহিতে নিমেঘে সে ভয়মুষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়।



## প্রেমের অদ্বৈত

এ কথাবার বাণ বলিয়াছি, প্রেম বা ভক্তি দ্বিষ্ট সম্বন্ধ। কিন্তু তাহার সহিত এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এত দ্বৈত অদ্বৈতেরই লীলাভঙ্গী। স্থূল মিলনট বল, আর বিরহের আকাষে সূক্ষ্ম মিলনট বল, তইই এক হয়, অদ্বৈতের এত অপকল্প ও অচিন্ত্য বিলাসটুই তইল জ্ঞানেন্দ্রের পশ্চরণ। অদ্বৈত শুধু জ্ঞানের একচেটিয়া নহে, তাহা ভক্তিরও পরমোৎকর্ষ; অথবা জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই অদ্বৈত-সম্পৃতিত বৈতদলের দুইটা বিভাবমাত্র—কেও কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

ভক্তির লক্ষণ করিতে দেবার্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, “স। কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।” এখানে সম্বন্ধের জৈব দিকটা নিয়াই পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহার শৈব দিকও একটা আছে। তজ্জন্মে পুণ্যে তাহার বিবৃতি আছে—বেদে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গোড়ার সেট কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ নিয়া আর এত মাথা ঘামাইতে হয় না।

একটা কথা আছে, ভক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। আমরা স্বর্কাস্ত্রকরণে ইহাও সমর্থন করি। সম্বন্ধই জীবের প্রাণ, শুধু জীব নীল কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উহাই মর্ম-সত্তা। বৈশেষিক জগৎকে ভাজিয়া কণুপনমাণ্ডে পরিণত করিলেন। ভাজিবার সময় তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই, কেন না বিশ্লেষণবুদ্ধি দ্বৈত-ভূমিকার জিনিষ, তাহাকে নিয়া কারবার করা সহজ। কিন্তু ভাজিবার পর আর জোড়া দিবার মশলা পুন না। অণুতে অণুতে জোড়া

লাগলে তবে তো সৃষ্টি হইবে। তাহার ক্ষত্র কর্ম প্রয়োজন। কিন্তু প্রাণ না থাকিলে কর্মে প্রেরণা বিবেকে? তাই বৈশেষিককে অদৃষ্ট, ঈশ্বরেচ্ছা ইত্যাদি প্রেরক তত্ত্ব স্বীকার করতে হইল। বৈশেষিকের এত অদৃষ্টই সাংখ্যের প্রকৃতিবিচারে পারার্থ বা পক্ষার্থ প্রবৃত্তি; বৈদ্যাস্ত্রে তাহারই পৌরুষ প্রাক্কল্প সিম্বন্ধা, বাসনা বা মায়া। তজ্জন্মে পুণ্যে তাহার শক্তি। বৈষ্ণবদর্শনে তাহাট ভাস্ক। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঔপনিষদ আদর্শ ভিন্ন আর সর্বত্রই ভক্তির একটা দিক মাত্র ফুটিয়াছে; তাই অদৃষ্ট, পারার্থা, ভাস্ক প্রভৃতিতে কেবল প্রকৃতির মমতার পরিচয় পাই এবং তাহা ধর্ম্যাই বলি, ভক্তি জীবমাত্রেয়ই স্বভাব। এত মমতাবৎ বিপণীত কোটিতে যে অস্ত্রাণ প্রতিষ্ঠা, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় শুধু বৈদ্যাস্ত্রে বা গুরুতবে। বৈষ্ণবদর্শনের গুরু-তত্ত্ববিচারে এ দিকেরও আভাস আছে।

জীব পারমিত বলিয়া পরার্থপ্রবৃত্তা ভক্তি তাহার স্বভাব না হইয়াই পারে না। যাহা পারমিত, তাহা অবশ্যই পরাপ্রিত; বিভূত ব্যতীত কাহারও একান্ত সত্তা সন্তোপপর হইতে পারে না। জীব, জ্ঞান বা কথা; অতএব ভক্তি তাহার স্বধর্ম।

কিন্তু বৈদ্যাস্ত্র বলেন, জীব ব্রহ্ম হইয়া যান—“ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি।” শুধু আত্মবিসর্জনের দিক দিয়া নয়, আত্মপ্রসারণের দিক দিয়াও যে এই বঙ্গীভাবের একটা তাৎপর্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—ঔপনিষদে তাহার যুথেষ্ট প্রমাণ রহি-

যাচ্ছে। 'এই প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অগতির যে পরিধি বাড়িয়া যাউবে, তাহার সহিত জীবের কোণও সম্পর্ক না থাকুক, শবের যে সম্পর্ক থাকিবে, তাহা তেঁা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়। যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনি কিসের সাক্ষী? এই প্রশ্নের উত্তরেই সম্বন্ধ তত্ত্বের আর এক দিক ফুটিয়া উঠে। বৈষ্ণবপন্থী গোড়ামী করিয়া তাহা দেখেন না বলিয়া বৈদ্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চান।

এই সাক্ষি-চৈতন্য যে সর্বত্র সিদ্ধ, তাহান একটা প্রমাণ দিতেছি। বিচারে নিরূপণ করিলাম, ভগবন্তের চরম সাধানধি। সচ্চিদানন্দ—সচ্চিদানন্দধন সচ্চিদানন্দধনবিগ্রহ—অমৃতুতি তহা অপেক্ষা গভীরে যাউতে পারে না। সচ্চিদানন্দধনবিগ্রহই ভগবানু, তহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও কথা হয়, এই ভগবানু আস্বাদ্য কি না। ভক্তের সত্তা অবশ্যই ভগবানের স্বরূপ সত্তা নহে। ভগবানু যদি আস্বাদ্য হন, তাহা হইলে যিনি তাঁহাকে আস্বাদন করেন, তিনিও তেঁা ব্রহ্ম-স্বরূপ-সাক্ষিচৈতন্য। অমৃতুতির এই পরিণতি সহজ ও স্বাভাবিক। বৈষ্ণবপন্থা' মুখে এই কথা স্বীকার না করিলেও তাঁহার শাস্ত্র এই কথাটী বলিতেছে। প্রেমের উৎকর্ষে ভগবানু ক্রমে ছোট হইয় আসেন--শেষে ভক্ত তাঁহান কাণ চাপিয়া ধরেন। এই ধাব লৌকিক দৃষ্টান্তের মূলে যে অলৌকিক ভাব রহিয়াছে, সংসারবিমুক্ত চিত্তে কেহ তাহার ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবেন, প্রেমের বিকাশ অবৈতে পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাৎসল্য-স্বভাব ভক্ত যেমন ভগবানকে স্বচ্ছন্দে গ্রাস করেন, বৈদান্তিকও

তাঁহাটী করেন। মধুর ভাবে না পূর্ণ আত্ম-সংশ্রবণে তহান সমাকৃষ্টি হয়--সেখানে জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বকে পৃথক করিবার আর কোনও উপায় থাকে না।

প্রেমের পর্যট এই, উহা শুধু একাকী আকর্ষণ নিম্ন থাকিতে পারে না। যে অপরের স্বত্বের অনুমান করে, তাহান মাত্র আত্ম-পরের সংশ্রবণে এক নিচ্ছিন্ন ভাবের উদয় হয়। অপরের অনুমানে অপরত্ব প্রাপ্তি স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে শঙ্কা থাকে, অপরের তাহাতে অপ্রোৎসাহিত হইবে কি না। এই শঙ্কা স্বভাবতঃই আমিত্বকে জাগাইয়া রাখে। এইরূপে একের মাঝেই দুইয়ের খেলা শুরু হয়। গোপিকা কৃষ্ণস্থখে সুখী। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণস্থনের অনুমানে তাহার তৃপ্তি হইতে পারে না। চাঁচী ক্রীকৃষ্ণের আগায়ন। তাহা হইলেই গোপিকাকেও জাগ্রত থাকিতে হইবে। অথচ অহস্তার সমর্পণে কৃষ্ণগেবার আয়োজন করিতে হইবে। এই মিশ্রভাবে-পত্তিই প্রেমের অবৈত-ভূমিকা।

বিষয়ী অহং নিসর্জন করিয়া প্রেম অর্জন করিতে চাহে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অহং-এর বিনিময়ে সে পায় বিরাট অহং; শেষের সহিত তাহার নিপত্তি সম্পর্ক অর্থাৎ নিলিপ্ততার সম্পর্ক। তাই সুবদুষ্টিতে মনে হয়, অহং বুঝি লয় পাউল; কিন্তু অহং লয় পায় না, বড় হইয়া মিশিয়া যায়। এই বড় হইয়া মিশিয়া যাওয়ার জ্ঞানও বলা, প্রেমও বলা। বিশ্লিষ্টবুদ্ধিতে উহাকে আমরা চিরিয়া চিরিয়া দেখি, তাই বলি অবৈতের এই জ্ঞান-বিশ্রাব, এই প্রেম-বিশ্রাব। কিন্তু সংশ্লেষণে এই ভেদ-জ্ঞান থাকে না। অথচ তাহার আভাস বুঝি থাকিয়া যায়। তাহ মধ্য ব্যক্ত

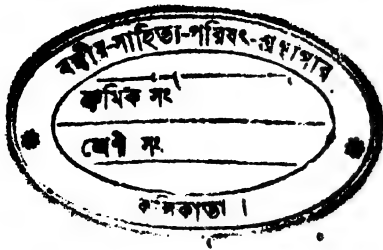
করিতে না পারিয়া রমিক বলেন, অচিন্ত্য-  
কেন্দ্রাভেদ তব্ব। ইহা বৈদ্যবিকের “সদসদভা-  
‘মনির্বচনীয়া’র প্রতিধ্বনি নয় কি ? যাঁহারা  
এই তত্ত্ব বুঝিয়াছেন তাঁহারা ইহা নাকি বৈদ্য-  
বিকের সাক্ষী।

প্রেমের তাঁহাকে পাঠেতে হঠলে আত্ম-  
সংমিশ্রণ করিতে হইবে ; নতুবা শুধু বাক্য  
মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে মাপিলে চলিবে না।  
তাই দেবর্ষি বলিয়াছিলেন, ভক্ষি স্বয়ং ফলস্বরূপ  
অর্থাৎ উচ্চ স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্বর্ত্ত, স্বভাব,  
অল্পবয়সে নিবিড়তন অনুভূতি—উচ্চ স্বয়ং হেতু,  
স্বয়ংই ফল—কোনও পরিণামী তত্ত্ব নয়।  
যাহারা পরমতত্ত্বকে জানিতে গিয়া প্রাণ দিয়া  
বোঝে না, শুধু বুদ্ধির কালোয়াড়ী দেখায়,  
তাঁহাদের পতি কটাক্ষ করিয়া দেবর্ষি নারদ  
বলিতেছেন, “রাজগৃহভোজনা-  
দিশু তথৈব দৃষ্টেহাৎ—ন তেন  
রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তি-  
ক্কা” —কেউ যদি রাজার বাড়ীর  
সকল খবর রাখে, তাহাতেই কি তাহার  
রাজার সন্তিত ভাব হয় ? আর রাজার  
সন্তিত ভাব না হইলে কি রাজার মন ভাব  
উদ্ভিক্ত হয় ? ভোক্তার উপকরণ জানিলেই

কি ক্ষুধা শান্তি হয় ? রাজার ভাতীঘোড়ার  
খবর নাগিলেই রাজাকে জানা যায় না।  
জানিতে হইলে নির্ভয়ে রাজার স্বভাবে অনু-  
প্রবেশ করিতে হইবে। রাজার অবোধ  
ছাওয়ালও তাঁহার পিতৃমর্শে আঘাত দিয়া  
অমৃতপীতবর্ণ বচাইতে পারে, তুমি সভাপণ্ডিত  
হইয়াও কিছু পার না। ভোক্তার আনন্দদনে  
না আত্মসংমিশ্রণে কদা শান্তি হয়, ক্ষুধা  
হয়—উপকরণের তালিকা জানিলে কিছু  
হয় না।

দেবর্ষি যে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে  
একটি সাধা চৈতন্য, অপবনী অচেতন। রাজা  
চৈতন্য, তাঁহার প্রীতি উৎপাদন আমার সাধা ;  
ভোজ্যও অচেতন, তদ্বারা আত্মতৃপ্তি সাধন  
আমার সাধা। উভয়ই এক যোগ—মর্শাব-  
গতন করা চাই। কিন্তু দুইটি দৃষ্টান্তে দুইটি  
সত্যের বিভাব। প্রেমের দুইটি ভঙ্গী, ইহা  
হইতেই প্রমাণিত হয়।

দেবর্ষির চৈতন্য সিদ্ধান্ত—“তস্মাৎ  
সৈবা গ্রাহ্যা মুখুক্ষিত্তিঃ”—যদি  
মুক্তি চাও, তাহা হইলে ভক্তিকেই আশ্রয়  
কর। বুদ্ধি ছাড়, মর্শে পশিয়া যাও।



## অভিভাষণ\*

—:|\*|:—

ভ্রাতৃবন্দ,

অল্প শুভদিনে শুভক্ষণে এই আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তসম্মিলনের ঘুদণ বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে। শ্রীশ্রীকুমাররাজ সজ্ঞপ্তির প্রতীষ্টা, সংশ্লিষ্টা ও সভাপতি-পচার-রূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাণ উদ্বোধন করিয়া অগ্নি-আগম-বজ্রীয় সাধন মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাণ অন্তর্গত বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগে পাঁচটি শাখাশ্রম ও তদন্তর্গত স্বাধীনতালায় ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বঙ্গের অপর চারিটি বিভাগে ক্রমশঃ চারিটি শাখাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার কোন শাখাশ্রম ছিল না। আমাদের স্থানীয় গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও স্বর্গীয় প্রভাকর চৌধুরী এবং তাঁহাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে তাঁহাদের এক পঞ্চ জমি শ্রীশ্রীকুমাররাজের নামে উৎসর্গ করিয়া তথায় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বর্তমান আশ্রমের অনতিদূরে আর একখণ্ড জমিও ঐ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীশ্রীকুমাররাজকে উহা দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ভূমি বর্তমান আশ্রমক্ষেত্র অপেক্ষা নিকট নলিয়া বর্তমান ভূমিখণ্ড আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য উহার রেজেষ্টারি কৃত দলিলের দ্বারা শ্রীশ্রীকুমাররাজের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিন চারি বৎসর পূর্বে হইতে উহাদের ও স্থানীয় অপরাপর

ভক্তগণের উদ্বোধনে ও চেষ্টায় এই স্থান আশ্রম-প্রাঙ্গণের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম হইতেই শ্রীমৎ কুমার চন্দ্রানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে কার্য-নির্বাহের জন্য শ্রীশ্রীকুমাররাজ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। অল্প কোনও জেলার ভক্তবৃন্দের মধ্য হইতে পশ্চিম বাঙ্গালার বিভাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব না হওয়ায় এং স্থানীয় ভক্তগণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কার্যে অগ্রবর্তী হইয়া জমি দিতে স্বীকৃত হওয়ায় এই স্থান দ্রুত হইলেও শ্রীশ্রীকুমাররাজ এইখানে বিভাগীয় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। দ্রুত হইলেও এই স্থান আশ্রম প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত বটে। স্থানটি আতশর উন্মুক্ত ও উচ্চ; এখান হইতে পল্লী অনেক দূরে, তজ্জন্ত স্বাধীনতালায়ের ছাত্রবৃন্দের ও এক্সটার্নগণের কুসংসর্গে দূষিত হইবার সম্ভাবনা খুব কম। আধিকন্তু পশ্চিম বাঙ্গালার বিভাগের মধ্যে মৌনোপুর জেলার ভক্তের সংখ্যা সর্বাধিক। অধিক থাকায় ঐ জেলার অন্তর্গত এইস্থানে বিভাগীয় আশ্রম-প্রতিষ্ঠা হইবার দাবীও অনেক। এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কার্যে স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় প্রভাকর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাণ্ডা, শ্রীযুক্ত যুগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ পাণ্ডা ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ খাঁড়ি অর্থে ও সামর্থ্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ও

\* পশ্চিম-বাঙ্গালার সারস্বত-আশ্রমে ভক্তসম্মিলনের ১২শ বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বি, এল্ কর্তৃক পঠিত।

করিতেছেন। এষ্ট জন্ত তাঁহাদের সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্থ। প্রভাকর চৌধুরী আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কার্যে অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। তিনি গত চৈত্র মাসে আমাদিগকে ছাড়িয়া ইতালোক পরিত্যাগ করায় আমরা সকলে বিশেষ শোকসম্পন্ন হইয়াছি; তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এষ্ট আশ্রমের উন্নতির পক্ষে অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

গত মাঘ মাসে হাওড়া হটতে হাওড়া জেলার সদস্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দাস ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র এবং তমোলুক হটতে শ্রীযুক্ত শংকর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু ও আমি এখানে আসিয়া সাধারণের নিকট আশ্রমের উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্ত স্থানীয় জনৈক বিশিষ্ট ভ্রাতৃলোক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তেওয়ারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটা সভা আহ্বান করিয়া আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধারণের নিকট প্রচার করি। সেট অগতি স্থানীয় জনসাধারণ এষ্ট আশ্রমের দিকে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ভক্তগণের নিকট হইতে ঐ সাধারণের নিকট হইতে দাঁড়া সংগ্রহ করিয়া এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্যের ব্যয় নির্বাহ হইতেছে। স্থানীয় ভক্তগণ অনেক অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন—তন্মধ্যে স্বর্গীয় প্রভাকর চৌধুরীর সাহায্যের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। অর্থ-সংগ্রহ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ শ্রীমৎ কুমার চন্দানন্দ ও স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাল, তমোলুকের ভক্ত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি ও শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু, হাওড়ার ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র, বর্ধমান জেলার সদস্ত শ্রীযুক্ত

গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বীরভূম জেলার সদস্ত শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু পরামণিক অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সজ্ঞ ইহার সকলেই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ। হুগলি জেলার সদস্ত শ্রীযুক্ত ... .. অপরের নিকট হটতে টাকা সংগ্রহ না করিলেও নিজের ১০০ টাকা দিয়াছেন ও আরও ৫০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। বাকুড়া জেলার সদস্ত নানারূপ সাংসারিক বিষয়ে বিব্রত থাকায় এষ্ট আশ্রমের প্রতিষ্ঠা কার্যে কোন সহায়তা করিতে পারেন না। আমরা আশা করি এষ্ট আশ্রমের উন্নতির জন্ত তিনি ভবিষ্যতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

এষ্ট আশ্রমের কার্য এখনও আমাদের সমস্ত অনুরাগী সম্পন্ন হয় না। ঋষি নিষ্ঠা-লয়ের ঘর, সেবাশ্রমের ঘর, একটা উপযুক্ত পাকের ঘর ও একটা বৃহৎ কুণ খনন করিয়া এষ্টখানে ঋষি-নিষ্ঠালয় ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী পাকিয়ার জন্ত একটা ভাণ গৃহের আবশ্যক। এষ্ট সময়ের কার্য সমাধা করিতে অনেক চেষ্টা ও অর্থের প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের রূপা এবং ভক্তবৃন্দের চেষ্টা ও সাধারণের সহায়ত্বই আমাদের ভরসা।

ভক্তবৃন্দ! কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত আমরা এষ্ট শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের চরণতলে এখানে সমবেত হইয়াছি, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সম্ভব হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরদেবের আদেশ পালন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই, তাহাই আমাদিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ঐ ঠাকুরের প্রতি ভক্তি দৈনন্দিন হইলে আমাদের প্রত্যেককে বাহ্যতঃ তাঁহার সেবার

সজ্জান হইতে হইবে, কিন্তু উহা গুরুভক্তির একান্ত মাত্রা। তাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সম্পূর্ণরূপে গুরুভক্ত প্রদর্শিত হয়। তাহার উপদেশ অনুসারে থামাদিগকে চতুর্কর্ষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং উহা সমাধা করিতে পারিলেই প্রকৃত গুরুভক্তি দেখান হইবে। এ চারুণী কার্য্য এই—

- (১) সজ্জনক্তির প্রতিষ্ঠা।
- (২) মায়া-গঠন।
- (৩) গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা।
- (৪) জগতের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান।

আমরা শ্রীগুরুর এই চতুর্কর্ষ উপদেশ পাণন ও তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য সজ্জন বদ্ধ হইয়াছি। মননামতী আশ্রমের ভক্তমাংস-লনীর প্রস্তাব অনুসারে আমরা সমুদয় শিষ্যগণ শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব এই সমষ্টি নামে অভিহিত। শিষ্যগণের দাসস্থান বা কর্ম্মস্থান অনুসারে উক্ত শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—

পূর্ব্ববঙ্গ বা চট্টগ্রামবিভাগের অধিবাসী শিষ্যগণ পূর্ব্ববঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব নামে, মধ্যবঙ্গ বা ঢাকা বিভাগের শিষ্যগণ মধ্যবঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব নামে, উত্তর বঙ্গালা বা রাজশাহী বিভাগের শিষ্যগণ উত্তর বঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব নামে, দক্ষিণ বঙ্গালা বা পেনসিডেন্সি বিভাগের শিষ্যগণ দক্ষিণ বঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব নামে এবং পশ্চিম বঙ্গালা বা বর্ধমান বিভাগের শিষ্যগণ পশ্চিম বঙ্গালা শ্রীশ্রীসারস্বত সেবাসজ্জ্ব নামে অভিহিত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্কর্ষ উপদেশ পালনের জন্য আমরা উক্তরূপ সজ্জন বদ্ধ হইয়াছি। এখন কিরূপে প্রথম উপদেশ অর্থাৎ সজ্জনক্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। মুখে সজ্জন বদ্ধ হইলে কোন কার্য্য সম্ভব হইবে না, কার্য্যাতঃ সজ্জন-ক্তি প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই সজ্জন শক্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র মূল মন্ত্র ভক্তগণের মনো ভ্রাতৃপ্রেম প্রতিষ্ঠা। আমরা এক গুরু-পিতার সন্তান, আমাদের প্রতি উপদেশ এক, শিক্ষা এক, আমাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আমাদের গতি এক—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বর দেব পারিতোষ করতঃ অদোষদর্শী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃজ্ঞানে যাদ ভালবাসিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের সজ্জনক্তি দৃঢ়রূপে প্রাপ্ত হইবে। “সজ্জন শক্তিঃ কলৌ যুগে” অর্থাৎ এই কলিযুগে অল্প বীৰ্য্যবান ব্যক্তিগণ সজ্জন বদ্ধ হইয়া কার্য্য না করিলে কার্য্যাসিদ্ধি সম্ভবপণ নহে। সকলের ভিতর সকল শক্তি, সকল সমৃদ্ধি, সকল সুভাব থাকে না। সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করলে যাহার যাহা অভাব আছে, অপরের নিকট হইতে তাহা পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের নিজের কল্যাণের জন্য গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সংঘবদ্ধ হইতে কৃত-সঙ্গ হইতেই হইবে।

দ্বিতীয় কার্য্য—আশ্রম-গঠন। মানুষ আপনাকে গঠন না করিলে তাহার দ্বারা অপরের হিতসাধন ত দূরের কথা, তাহার নিজের হিতসাধনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা প্রকৃতিবশে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও রিপুগণের দাস হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি চবিত্তার্থতার কথা ধরিলে ‘মহুয়ের’ সহিত পশুর কোন পার্থক্য

নাট। তবে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়?—শম, দম, অভ্যাগের দ্বারা চৈত্রিবৃত্তি ও রিপুগণের দমনন মানুষের মনুষ্যত্ব। ঐ সমুদয় দমন করিয়া করুণা, সুদাতা, মৈত্রী, উপেক্ষা, এই চারি গুণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়। অদোষদর্শী হইয়া সকলের প্রতি সাধামত দয়া প্রকাশ করার নাম করুণা, সর্বদা স্বায় হৃষ্টচিত্ত থাকার নাম সুদাতা, হিংসা ঘৃণা পরিহার পূর্বক সকলের প্রতি বন্ধুত্ব স্থাপনের নাম মৈত্রী এবং ক্ষমা অভ্যাগের নাম উপেক্ষা। এই চারি গুণ প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই আত্মগঠনের ভিত্তি স্থাপন হইবে। আমরা আত্মগঠনে যত্নবান না হইলে আমাদের শ্রীগুরু চরণ আশ্রয় করা বুঝা এবং আমাদের দ্বারা আমাদের নিজ কল্যাণসাধনের বা জগতের হিতসাধনের কোন আশা নাই। সেটো জন্ত আমাদের এটি সারস্বত-সংঘের প্রত্যেককে আত্মগঠন সম্বন্ধে বিশেষরূপে যত্নবান হইতে চাইবে।

তৃতীয় কাব্য—গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। গৃহস্থ শিষ্যবর্গকে গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যত্নবান হইবে। গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠার অর্থ কি?—আমরা যে পরিবারবর্গের মধ্যে আছি, সেটো পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ ও পুত্র-কন্যায় পূর্বের উল্লিখিত মত চারত্রয় গঠিত হইলে গৃহস্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিবারের প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে যদি ভগবদ্ভক্তি, স্বার্থত্যাগ, উদারতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও কানষ্টের প্রতি স্নেহ বিরাজ করে, তাহা হইলে সেটো সংসার শান্তির আলয় এবং তাহাদের ঐতিক ও পারিত্রিক মঙ্গল করায়ত্ত।

চতুর্থ কাব্য—জীবাতিহরকার কার্যের অনুষ্ঠান।

ভগবান্ জগৎরূপে বিরাজিত আছেন। সুতরাং জগতের হিত ও জীবের হিতসাধন করা তাহার আশ্রয় কার্য। এ বিষয়ে সকল দম্ব একমত। জগতের হিত ও জীবের হিতসাধনটো সেবাদম্ব নামে অভিহিত। জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। সেটো জন্ত মানবের হিতসাধনটো সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাদম্ব। এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কি প্রকারে মানবের হিতসাধন করা যাচ্ছেতে পারে। শ্রীগুরুর আদেশে আমরা বেশ বুঝিয়াছি, মানুষকে সংশিক্ষায় শিক্ষিত করাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কার্য। ক্রিষ্ট ও ক্রয়েন সেবা করাও সেবাদম্ব বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত উপকার সাধিত হয় মাত্র—কিন্তু মানুষকে সংশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে তাহার নিজের ঐতিক ও পারিত্রিক মঙ্গল হয় এবং তিনি যে সংসারের, যে দেশের ও যে সমাজের লোক, তাঁহার উচ্চ আদর্শে ও সংশেষে সেটো সংসারের, সেটো দেশের, সেটো সমাজের লোকসকল সংশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সংসার, দেশ ও সমাজকে পরিষ্কার করিয়া তোলে এবং জগতের মহামঙ্গল সাধিত হয়। এই জন্ত মানুষকে সংশিক্ষায় শিক্ষিত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাদম্ব। সেটো জন্ত পন্থাবাদী পুণ্যপাদ গুরুদেব সংশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্ত “শ্বশি-নিভালয়” স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন এবং আমাদেরকে এটি কার্যে উদ্বোধনী চেষ্টার জন্ত উপদেশ দিয়াছেন। সেটো সঙ্গে আর্ন্ত-ক্রিষ্টের সেবার জন্ত সেবাদম্ব প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের উপর দৃষ্টি। তাঁহার পূর্বোক্ত



হতুর্কিম উপদেশ শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে ও জগতে প্রচলিত হইয়া যাচাতে তদনুসারে কার্য্য হয়, তজ্জন্তু শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আসাম-দেশীয় সার-স্বত মঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার অন্তর্গত বঙ্গের পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি শাখাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাচাতে পূর্বোক্ত মঠ ও শাখাশ্রমগুলি উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ যত্নবলি হইতে হইবে। এখনও সকল শাখাশ্রমে ঋষি বিদ্যালয় বা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় নাট। কোন কোন শাখাশ্রমে হইয়াছে। যাচাতে অচিরে প্রত্যেক শাখাশ্রমে ঋষি বিদ্যালয় ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আদেশ মত সংশ্লিষ্ট বিস্তার ও আর্ন্ত-রুষ্টি ও রুগ্মের সেবা হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদের সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এখানে একটি বিষয় আমাদের অত্যন্ত লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যিক। যদিও ভক্তগণের কার্য্যের সুবিধার জন্য পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি শাখাশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে, তাই বলিয়া আমরা পৃথক নহি। আমরা এক, এক কথা সকলকে অমুর্ক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। যদি আমরা বিপরীত ভাব প্রোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের শ্রীগুরুমহারাজের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ তাঁহার মঠ ও শাখাশ্রম পরিচালন-ভার তাঁহার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের এবং গৃহী শিষ্যগণের উপর দিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী সন্মিলনে এক অসাংসদারিক সমাজ গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহীর কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরম্পর পরম্পরের রক্ষক ও সহায়কারী।

আশ্রমের সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ ও ব্রহ্মচারী সেনকবৃন্দ তাঁহাদের উচ্চ চারিত্র স্বাধীনতা ও সহপদেশের দ্বারা সংপণে ও গুরু ভাবে টানিয়া রাখিবেন এবং গৃহিগণ অর্থ ও সামর্থ্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবর্গের সেবা করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও উচ্ছলতা দৃষ্ট হইলে তাগা নিবারণের জন্য ভালভাবে সাধামত চেষ্টা করিবেন। ভ্রাতৃগণ! একবার কল্পনার চক্ষে দেখ দেখি যখন শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের পূর্ব-কথিত ভাব জগতে ও সমাজে প্রচলিত হইয়া সকলে সেট ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহীর সংমিশ্রণে পূর্বের লিপিত মত সমাজ গঠিত হইবে, তখন কি আমাদের কি শাস্তির দিন আসিবে।

পরিচালক সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ ও ব্রহ্মচারী সেনকবৃন্দ এবং গৃহী সদস্যবর্গকে একটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। সে কথা এট, যতপি উচ্চাদের মধ্যে কাহারো হৃদয়ে দোষাত্মক বা পাদাত্মের অভিমান প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা শ্রীগুরুমহারাজের কার্য্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইবে। দাস্তভাবে এবং শিষ্য-বর্গের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিমান হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক সাধামত কার্য্য করিলে শ্রীগুরুমহারাজের দ্বারা তাহা প্রতিপালন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পূর্বোক্ত সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভের উপায় কি? সকল সাধু সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভ, জগতের ও জীবের একমাত্র সুহৃদ ও রক্ষাকর্তা-রূপে যিনি নিরাজিত আছেন সেট ভগবানের কৃপা ও তাঁহার নকট হইতে শক্তি লাভ

ব্যতীত সিদ্ধি আশা নাই এবং তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হইলে তাঁহার প্রাতি ভক্তি এবং তাঁহার চক্ষুস্বরূপ কার্গো যত্নশীল হওয়া একান্ত আবশ্যিক। শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ আমাদেয় চিত্তার্থে আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ ভগবানরূপে বিরাজিত। যদি আমরা তাঁহার প্রাতি একনিষ্ঠ ভক্তি রাখিয়া তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ প্রাতি পালনে কৃতসঙ্কল্প হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই গুরুশক্তি ও ভগবৎশক্তি লাভ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পূর্বোক্তমত সকল কার্যে সিদ্ধি লাভ করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন আমাদের চাট, শ্রীগুরু প্রাতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও তাঁহার আদেশ পালনে ব্যগ্রতা ও তৎপরতা। ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের ডাকে এই শুভদিনে শুভরূপে এই শুভ আনন্দ সম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছি। আমরা কি লইয়া বাটী ফিবিব? “ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিজ্ঞা দ্রবিশং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।”—

শ্রীগুরু প্রাতি এই ভাব লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব। তিনি বাহ্যতে আমাদের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেন এবং তাঁহার শক্তিতে তাঁহার প্রদর্শিত কার্যে আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পার, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে করিতে স্বীয়ভবনে প্রত্যাগমন করিব এবং তাঁহার আদেশমত কত দূর কার্য্য করিলাম তদনুসারে মাঝে মাঝে হিসাব-নিকাশ করিব ও আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিব।

ভ্রাতৃগণ। আমরা অর্পণ অসিদ্ধল-প্রযুক্ত এবং স্থানান্তরিতঃ আপনাদের সকল সুখ-দার বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই, সে জন্য আপনাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে, কিন্তু আপনারা ভ্রাতৃপ্রেমে অমুপ্রাণিত হইয়া আমাদের সকল ক্রটি মার্জনা করিবেন। আপনারদের নিকট এই সাধুনয় প্রার্থনা।

গুরুব্রজা গুরুদিক্‌গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুবৈ পন্ন ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবৈ নমঃ ॥

ও শান্তিঃ



# অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি

[ সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী ]

প্রমেয় সিদ্ধ করিবার জন্যই প্রমাণের লক্ষণ করা প্রয়োজন। [ “মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ” অর্থাৎ প্রমেয়ের সিদ্ধি প্রমাণের সিদ্ধির উপর নির্ভর করে, ইহা জ্ঞানের একটি মূল তত্ত্ব। জ্ঞানদর্শনকে যদি তত্ত্বাবধারণের প্রাথমিক বা গোণ প্রায়স বলা যায়, তাহা হইলে প্রমাণ সিদ্ধির অত্যাশঙ্কিতা শুধু জ্ঞানে কেন, যে কোনও দর্শনে সমভাবে আবিবর্তীয়। প্রমেয়ের সম্বন্ধে সিদ্ধ হইলেও প্রমাণের প্রমাণ-প্রয়োগের উপর তাহার উপলব্ধি নির্ভর করে, ইহা শুধু দর্শনের নয়, আর্ষসামান্য ও একটি মূল নীতি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া দর্শনকে ফলিত করিবার উদ্দেশ্যেই আচার্য্য বিস্তুতভাবে প্রমাণের বিচার করিয়াছেন। অধ্যাত্ম সাধনাত্তেও আমাদিগকে প্রমেয়-সিদ্ধি অপেক্ষা প্রমাণশুদ্ধির দিকেই প্রথমে বিশেষ জোর দিতে হইবে। ]

প্রমেয় দুই প্রকার - ব্যক্ত ও অব্যক্ত। [ ইহা পরিণামবাদের কথা এবং সাংখ্যের বিশেষত্ব। সাংখ্যের মতে সত্ত্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য অসম্ভব, তবে তাহার তিমোভাব বা অদর্শন সম্ভব বটে। সেইজন্য দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়কেই তুল্যভাবে বাস্তবকোটিতে স্থাপন করিয়া আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। ] পৃথিবী প্রভৃতি প্রমেয় ব্যক্ত, কেন না ধূলিলাহিতচরণ ক্রমিক ও স্বরূপতঃই তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইতিপূর্বে যে পূর্বরূপে অনুমানের উল্লেখ

করা হইয়াছে, তাহার সহায়ে ধূমদর্শন দ্বারা বহির্ন অনুমান করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। [ বহি ও ধূমের সহচার পূর্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সেই পূর্বলব্ধ জ্ঞানকে যে অনুমানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বিষয়ের অস্মৃতি কল্পিত হয়, তাহাকে পূর্বরূপে অনুমান বলা যায়। এই পূর্বরূপে অনুমান ও প্রত্যক্ষ, দুইটি প্রমাণই আমাদেব নিত্য-ব্যবহার্য্য। ] যে সমস্ত প্রমেয় ইহাদের সাহায্যে আশ্রিত হইতে পারে, তাহাদিগকে বুঝাইতে শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যে বিষয় লোকে সহজে বুঝিতে পারে না, তাহাকে বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্র। সুতরাং শাস্ত্রপ্রতিপত্ত প্রমেয় বুঝাইবার জন্য কোন প্রমাণ সমর্থ, তাহা পূর্বোক্ত প্রমাণ-সমূহ হইতে আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। কারিকাকার নিম্নলিখিত কারিকার তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি—

সামান্যতত্ত্ব দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং-

প্রতীতিরনুমানাৎ।

তস্মানপি চাসিদ্ধং পরোক্ষ-

মাণ্ডাগমাৎ, সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

—সামান্যতোদৃষ্ট (এবং শেষবৎ) অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতীতি হইয়া থাকে। তাহাতেও যে বিষয় সিদ্ধ হয় না, পরোক্ষ থাকিয়া যায়—আগম হইতে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কারিকাতে যে “তু” শব্দ রচিত হইয়াছে (সামাজ্যতন্ত্র), তাহা দ্বারা সামাজ্যতন্ত্রে অল্পমানকে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণবৎ অল্পমান হইতে পূর্ণক কৰা হইল। সামাজ্যতন্ত্রে অল্পমান দ্বারা পুরুষ-পুরুষ প্রভৃতি সামান্য লিঙ্গিত অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতীক হইয়া থাকে। প্রতীতি বলিতে অধাবসায়কে বুঝায়। আরও স্পষ্ট করিয়া বাকিতে গেলে, চৈতন্য বুদ্ধির ছায়াপাতই প্রতীতি।

[ অধাবসায়, প্রতীতি বা জ্ঞানের এই ধরণটি সামান্যের বিশেষত্ব। চৈতন্য প্রকাশক, অতএব নিরঞ্জন। চৈতন্য নিত্যবসটে। যাহা নিরঞ্জন অথচ নিত্য, তাহা অবশ্যই বাস্তব অর্থাৎ দেশ দ্বারা অনির্দিষ্ট। তাহা হইলে জীবমাত্রকেই সর্বস্বত্ব হয় না কেন? তাহার কারণ বুদ্ধির পরিচ্ছেদ। বুদ্ধি শুদ্ধমত—চৈতন্যের প্রোজ্জ্বল। কিন্তু আত্মবাস্তবের আভাস তাহাতে অনুপ্রসিষ্ট। আত্মবাস্তবের মূলে কণা ও তজ্জনিত অদৃষ্ট সংস্কার। এই অদৃষ্ট-সংস্কারযুক্ত যে শুদ্ধ সাময়িক ক্ষুধণ, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। কিন্তু বুদ্ধিও পরিণামিনী, অতএব চৈতন্যের অপেক্ষা রাখে; নিরপেক্ষ হইলে পরিণাম সম্ভবপর হইত না। বুদ্ধির পরিণামও স্বতঃ অন্তর্ভূত। বুদ্ধির পরিণাম শাস্ত্রিক; কিন্তু অদেপক্ষিত চৈতন্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি প্রকার? বুদ্ধি চৈতন্যেরই অবভাস, অতএব তাহার ভাবিকতা চৈতন্যে প্রতিভাসিক মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধদৃষ্টিতে যাহা তাত্ত্বিক, চৈতন্যের দিক হইতে তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র—দর্শনের চাহি মূল কথা। প্রতিবিশ্বও তত্ত্ব বলিয়া প্রাতিভাসিক হইতে পারে না, যদি তাহার পশ্চাতে বিশ্বের সত্তা না থাকে। পুরুষবুদ্ধি এই জগৎই মথায়োজন

নাহি অন্তর্ভুক্তিতেও উচ্চ সিদ্ধ। পুরুষতত্ত্বের আশ্রয় তাহার নিস্তার করিল। আপাততঃ আমাদের পক্ষে এইটুকু বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, আমাদের প্রতীতি যাহাকে চৈতন্য দ্বারা উদ্ভাসিত বুদ্ধির পরিণাম মাত্র।

[ এই যে অতীন্দ্রিয় পদার্থ শাস্ত্র আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে বলিতেছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বুদ্ধির কারণ প্রকৃতি, পুরুষ তদ্বুদ্ধি। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিতে পাওঁতেছি, প্রকৃতি কণা পুরুষতত্ত্ব সাফল্যকর করিতে হইলে বুদ্ধির পরিণাম পরিণাম থাকিতে তাহা সম্ভবপর নয়। সামাজ্যতত্ত্ব স্বকারণে জীন, সুতরাং তত্ত্বদর্শন কবাইবে কে? এই জগৎই প্রকৃত অগত্য, পুরুষ তত্ত্বের। কিন্তু শাস্ত্র এইটুকু করিতে পারেন যে আমাদের পক্ষে বুদ্ধিকে তিনি প্রকৃতভাবমুখী বা পুরুষভাবমুখী করিয়া দিয়া সামান্যসংস্কারযুক্ত বা বিবেক-সংস্কারযুক্ত করিয়া দিতে পারেন। তাহাতে প্রকৃতি, পুরুষের অবিসম্বাদী বুদ্ধির পরিণাম উৎপন্ন হইয়া চৈতন্যে প্রাতিভাসিক হইবে। উভাদের সামাজ্যতঃ জ্ঞান জন্মাইতে পারে। অতীন্দ্রিয়ের প্রতীতি দ্বারা ইহাকেই আচার্য্য লক্ষিত করিতে চাছেন। বাস্তবিক শাস্ত্র বা উপদেশের সীমাও এই পর্যন্ত। অবাস্তবমীমংস গোচরিত্ব বাক্য, ও মন দ্বারা বাক্য করা যায় না, কিন্তু সাধু-পুণ্ড্রের উপদেশে বুদ্ধিকে তত্ত্বমুখী করিয়া তাহার আভাস অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ]

এখানে যে সামাজ্যতন্ত্রে অল্পমানের কথা বলা হইল, তাহা উপলক্ষ্য মাত্র—বস্তুতঃ সামাজ্যতন্ত্রেরই স্বায় শেখবৎ, অল্পমানকেও

অব্যক্ত তত্ত্ব-প্রতীতির অনুকূল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যা কিছু অতীন্দ্রিয়, তাই কি সামান্যতো দৃষ্ট বা শেষবৎ অনুমান দ্বারা প্রতীত হয়? এমনও তো অতীন্দ্রিয় বিষয় রহিয়াছে, যেখানে কোনও অনুমানেরই প্রযুক্ত হইতে পারে না—যেমন মহাদাঁড়ির আরম্ভকাল, স্বর্গ, অপূর্ব, দেবতা ইত্যাদি। [ মহাদাঁড়ি ক্রমে সৃষ্টি হওয়া

হইয়া থাকিলে পাঠ আদিত বুদ্ধি, অজ্ঞাত; এখন প্রশ্ন এত, শুদ্ধসত্ত্ব ক্রমে ঘনীভূত হইয়া জড় উৎপত্তি হইল, না জড় ক্রমে সমুজ্জল হইয়া বুদ্ধির উদ্ভব হইল? কোনটাকে আদি ধরিব, তা একটা সমস্যা বটে। 'আম'দের পরিণামবাদ বলে, বুদ্ধি হইতে জড়ভূত, এই ক্রমই শাস্ত্রসম্মত। পাশ্চাত্য Evolution-বাদ ইহার বিপরীত পক্ষ সমর্থন করে। অনুমান দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা হয় না, কেননা, এখানে নিরূপিত লিঙ্গ কোথায় যে অনুমান করিব?

[ মজ্জ করিতে হয়, উদ্দেশ্য সর্ব লাভ। স্বর্গ যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? কৰ্ম্ম ক্রিয়াম, অমনি তাহা নষ্ট হইয়া গেল; সময়ান্তরে তাহার কার্য-জননশক্তি কোথায় থাকে? না থাকিলেও বা কৰ্ম্মভোগ কি করিয়া উৎপন্ন হয়? এই জন্ত মীমাংসক অপূর্ব বা অদৃষ্ট (Potentiality) স্বীকার করেন। কিন্তু তাহার প্রমাণ কি?, অনুমান করিব, এমন লিঙ্গ এখানেও নাই। দেবতা আছে, কি করিয়া বুঝিব? এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা মানবীয় ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি দ্বারা হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই এখানে বার্থ।

এই জন্তই কারিকাকার বলিলেন, সামান্যতো দৃষ্ট বা শেষবৎ অনুমান দ্বারা যেখানে বস্তুসিদ্ধি

হয় না, সেখানে আগমবলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্রের প্রমাণ ছাড়া আগমের ক্ষুর্তি হয় না। সুতরাং সাধারণ ভূমিকার ন্যায়ের কাছে উহা অত্যাশ্চর্য্য ছাড়া কিছুই নয়। তাই কেহ তাহাতে অপিশ্বাস করে, কেহ বা গোঁজাখুরী বলিয়া উড়াইয়া দেয়। শুধু হিন্দুর ধর্ম নয়, জগতের সকল ধর্মেরই এত অবস্থা। ]

উক্ত "কারিকাতে "তস্মাদ্" এইটুকু বলি লেই হইত। কিন্তু "চ"কারের উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় যে অনুল্লিখিত শেষবৎ অনুমানের সমুচ্চয়ও কারিকাকারের অভিপ্রেত।

[ পূর্বপক্ষী সমস্ত কথা মানিয়া লইয়াও বলিতেছেন, "আচ্ছা, না হয় তাহাই হইল, [ অর্থাৎ যেখানে প্রত্যক্ষ ও পূর্ববৎ "অনুমান থাকে না, সেখানে সামান্যতোদৃষ্ট বা শেষবৎ অথবা আগম প্রমাণই না হয় খাটিল। ] কিন্তু থাকেশের ফল, কাছিমের গোম, থরগোষের শিং—এগুলি কখনও প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া, বুঝিতে পারি, আসলেই জিনিষগুলি নাই। তোমার প্রকৃতি পুরুষাদি তত্ত্বও যদি আসলেই না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সামান্যতোদৃষ্টাদ প্রমাণ দ্বারাও কি করিয়া তাহা সিদ্ধ করিব? ]

[ ইহার উত্তরে উত্তরপক্ষী বলিতেছেন, নাই বলিয়াই যে দেখা যায় না, তাহা নয়; অজ্ঞাত-কারণেও তো দেখা না যাইতে পারে। ]

অতিদূরাত্ সামীপ্যাত্ ইন্দ্রিয়বাতা-  
অনোহনবস্থানাৎ ।

সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদ্ অভিভবাত্  
সমানাভিহারাচ্ ॥ ৭ ॥

—অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, মনের অনবধান, সুস্বাদু, বাসধান, অভিভাব, পরস্পর সম্মেলনহেতুও ( বিষয়ের অনুপলব্ধি হইতে পারে । )

“অনুপলব্ধি হইতে পারে” এই কথাটুকু গবের কারিকাতে আছে—সিংহাশ্রমোক্তিত্রায়াণুসারে বর্তমান কারিকায় তাহাকে জুড়িয়া অম্বয় করিতে হইবে । [ সিংহ যেমন কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার পেছনে ফিরিয়া তাকাই, সেইরূপ যে কথাটা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলা হইয়াছে, তাহাকে পূর্ণবর্তী শব্দের সহিত অম্বয় করাকে সিংহাশ্রমোক্তিত্রায়াণুসারে ।

[ কারিকার উল্লিখিত অপ্রত্যক্ষের হেতুগুলি একটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি । ] আকাশে পাখী উড়িয়া যাচ্ছে । পাখীটা আছে, কিন্তু তথাপি অতি দূরত্ব হেতু প্রত্যক্ষ হইল না । চোখে কাজল দেওয়া হইল, কিন্তু অতি নিকটে বলিয়া তাহা দেখা গেল না । কারিকাতে শুধু সামীপ্য আছে—কিন্তু তাহার সহিত “অতি” যোগ করিয়া হইতে হইবে । ইন্দ্রিয়ের অভাব, যেমন অন্ধত্ব, বধিরত্ব—অন্ধ যেমন আলো দেখে না, বধির শব্দ শোনে না । প্রবল চিত্তবিকার দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে বলিয়া, অতি উজ্জ্বল আলোকস্থ বস্তুও কেহ কেহ দেখিতে পায় না, বুঝিতে হইবে মনঃসংযোগের অভাবই অপ্রত্যক্ষের হেতু । পরমাণু ইন্দ্রিয়ের নিকটে রহিয়াছে, তুমি মনঃসংযোগ করিয়াও তাহা দেখিতে পাই না, কেননা উহা অতি সুক্ষ্ম । রাজবাড়ীতে গিয়া রাণীকে দেখিতে

পাওয়া গেল না, কেননা তিনি দেওয়ালের আড়ালে রহিয়াছেন । দিনের বেলায় গ্রন্থ-লক্ষ্য দেখিতে পাইয়া যায় না, কেননা সূর্য্যের আলোতে তাহাদের আলোক অভিভূত থাকে । বৃষ্টির জল পুকুরে পড়িলে আর খুঁজিয়া পাইয়া যায় না, কেননা উহা এক মা হইয়া অশিষা যায় । . .

এখানেও একটা “চ” আছে । তাহাতে বুঝিতে হইবে, কারিকার যাহার উল্লেখ করেন নাই এমন হেতুও সম্ভব হইলে সমুচ্চয় করিতে হইবে । তাহা হইলে অনুপলব্ধি হেতুও প্রত্যক্ষের অভাব স্বীকার করা যাইতে পারে । যেমন তদ্রূপ অবস্থায় দধির অনুপলব্ধি হেতু হৃদে দধি দেখা যায় না । ( সাংখ্যের পরিশ্রমবাদ । )

আমল কথাটা হইল এই । প্রত্যক্ষের অভাব হইলেই বস্তুর অভাব হয়, একথা বলিলে বাড়িয়া বলা হয় । তাহা হইলে একজন লোক ঘর হইতে বাহির হইয়া আর যখন ঘরের লোকদের দেখিতে পায় না, তখন কি সে ধারণা করিবে যে ঘরে লোক নাই ? তাহা তো হয় না । যেখানে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা ছিল, সেখানে যদু প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলেই অভাব নিশ্চয় হয় । অর্থাৎ থাকিলে দেখা যাইত, কিন্তু দেখা যাইতেছে না, অতএব নাই—এ যুক্তি থাকে । প্রকৃতি পুরুষ তো প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, অর্থাৎ থাকিয়াও তোমার লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না ; সুতরাং লৌকিকদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া যে নাই সিদ্ধান্ত করিতেছ—ইহা তো প্রামাণিকের মত যুক্তি করা হইল না ।



## ভক্তসম্মিলনী

—১৫১—

গত ১১ই পৌষ রবিবার হটতে ১০ই পৌষ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দ্বি-সবয় পশ্চিম বাঙ্গালা (মোদ্দীনীপুর—খড়কুশমা) সারস্বত আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১২শ বার্ষিক অধিবেশন যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের সর্বস্থান হইতে জমিদার, পণ্ডিত, চাকিম, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী ও ধারসারী পণ্ডিত সর্পাশ্রয়ী ভক্তগণ সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ছিলেন। বিহান প্রদেশ হটতেও অসংখ্য ভক্ত আসিয়াছিলেন। তবে পূর্ববঙ্গের ভক্তগণ অধিকাংশ আসিতে না পারায় কৃত্রিম বৎসর অপেক্ষা এবার ভক্তসংখ্যা কিছু অল্প হইয়াছিল।

১ম দিবস শ্রীভগবান্ জগদগুরুকে সভাপতি রূপে আহ্বান করিয়া বন্দনা সঙ্গীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ১২টার সময় সভার কার্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি নিখিত অভিনয় পাঠ করেন। অনন্তর ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও গত বৎসরের কার্যাবিবরণী পাঠান্তে মঠ ও আশ্রমগুলির আর নাথ প্রদর্শিত হয়। তৎপরে সৈবক গণের এবং বিভাগীয় ও জেলার সদস্যগণের মধ্যে কাকার দ্বারা নিরূপ কার্য হইতেছে এবং অর্থ সামগ্রীকে ককরূপে সাভাসা করিতে ছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া বেলা সাড়ে চারিটার সময় সভাভঙ্গ হয়।

২য় দিবস যথারীতি বন্দনা সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে সাড়ে ১২টার সময় সভার কার্য

আরম্ভ হয়। পূজাপাদ শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ থামতে অনুপাত্ত ও মনস্ত ভক্তগণের কয়েক পানি গাত্র পাঠ করিয়া উপাশ্রুত ভক্তগণের প'রচরাদি প্রদান করেন। অনন্তর তিনি কক্ষস্থিত হটতে অবসর গ্রহণ এবং মঠ ও আশ্রমগুলির ভার সৈবকগণ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের উপর অর্পণ করিয়া সৈবক ও সদস্যগণের কক্ষস্থিত বারিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল মঠ ও আশ্রম পরিচালন এবং সারস্বত ভাণ্ডার সম্বন্ধে বক্তৃতায়ে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনন্তর আশ্রমগঠন, আদর্শ গৃহস্থপ্রম স্থাপন ও সম্বৎসরিক সম্বন্ধে আলোচনায়ে ৫টার সময় সময় সভাভঙ্গ হয়।

৩য় দিবস বেলা ১২টার একটি সাধারণ সভার আদবেশন হয়। তমলুক উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার মাইত, এম, এল, গির প্রমুখের ও ঠাণ্ডান উকিল শ্রীযুক্ত গৌরনাথ দাস বি, এল - এর অনুমোদনে এবং সর্বসাম্প্রদায়িক সমর্থনে মোদ্দীনীপুরের প্রবীণ উকিল, গড়বেতার বিখ্যাত অগস্তি বংশের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ অগস্তি বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় মঙ্গলপোতার গাণা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ, গড়বেতার কয়েক জন উকিল, শিক্ষক, হইকন ডাক্তার, একজন সর্বজনপ্রিয়—এক কথায় গড়বেতা অঞ্চলের যাবতীয় গণমান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং ৫৬ হাজার সাধারণ ভক্তলোক যোগদান করিয়া-

ছিলেন। প্রথমতঃ মঙ্গলপোতা বালক সম্প্রদায় কর্তৃক একটি আশ্রম মন্দির ও স্নানাদি পাঠ্যে সভাপতি মহাশয় অভিভাষণরূপে হিন্দুধর্ম ও তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃত করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষা বি, এম. শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গোস্বামীপাদ্যয় এল, টি, শ্রীযুক্ত স্বপ্নেন্দ্রমোহন গোস্বামী এম, এ, বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ খাঁড়া প্রভৃতি সমস্ত শ্রীযুক্ত সংগীত পঠার করে মঠ ও আশ্রমাদর্শে প্রাধিকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান শিক্ষার ফল, গারমত মঠ ও আশ্রমগুলির উদ্দেশ্য ও অভাব এবং সাহায্যাদি প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে স্বামী প্রবন্ধানন্দেব আত্মত্যাগ কর্তৃক গোচরীয় তলাকা ও সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় উক্তি মহাশয় কর্তৃক শোক প্রকাশক পস্তাটী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তদনন্তর স্থানীয় জমিদার ও গড়বাজার উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক সভাপতি ও উপস্থিত ভক্তমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সন্ধ্যার পর সভা ভঙ্গ হয়।

এবারের সম্মিলনীর বিশেষত্ব এই যে গণচিমনবাস্তাবার ভক্তগণ বাঙ্গালার অত্র বিভাগেব গুরুভাটদেব নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন নাট। অগচ তাঁটার ৩৩৪ দিন প্রত্যহ উপস্থিত সাধারণকে ও প্রসাদ বিকরণ করিয়াছেন। বিশেষঃ সাধারণ সভার দিন ১৫ হাজার শোক প্রসাদ পাঠিয়াছিল। আর কয় দিন নহবে ঢোল কঁাসীর সঙ্গে মানাই-এব সময়ে পাঠ্যগীত রাগরাগিনীর আলাপ নড়ট মধুর লাগিয়াছিল। কয় দিন আশ্রমটি যেন পুণ্যার্থে পরিণত হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ত বিভাগীয় ভক্তগণ 'মুকুত' অর্থ সাহায্য করিয়া ভক্তসম্মিলনী সর্বসম্মতিক্রমে করিয়াছিলেন। গড়বাজার উকিল স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী উভয়েই স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বাবস্ত-বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আমবা এ পর্যায়ে কোন আশ্রমে একপ সর্বসাধারণের সহায়ত ও সাহায্য পাঠ নাট। আগামী বর্ষে আসাম গারমত মঠে ভক্তসম্মিলনীর ১৩শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

—\*—

## ❀ আগমনী ❀

—:—

( ১ )

জয় নিগমানন্দ জগৎবন্দ্য এস এস তুমি হে।  
কর চির পবিত্র পুণ্যার্থ তোমার এ জন্মভূমি হে।

তব জ্ঞান ও ভক্তি পুত্র-কন্যা,

নাশুক \* ধরার কলুষ বন্যা,

আজি ধন্য হউক এ সারা ধরনী তব পদধূলি চুমি হে।



( ২ )

পল্লী জননি মোর,

দেখে দেখে ওই বিশ্ববিজয়ী পুত্র ফিরেছে তোর ;—

দীন হীন তোর শূন্যভবনে

বিনা আয়োজনে, বিনা আরাহনে,

এত দিন পরে আজি পুনঃ অব মুছাতে নেত্রলোর।

ভরা ভৈরব কুলে,

জীবনের যত সুখের কামনা চিতা পরে দিয়ে তুলে,

যে পুত্র তোরে তেয়াগি জননি

গেছিল, সে আজ এসেছে আপনি

বিশ্বভুবন জয় করি মাগো তোরই ও চরণমূলে।

দীর্ঘ দ্বিযুগ ধরি

যে পুত্র লাগি তপ্ত অশ্রু নীরবে মোচন করি,

অহরহ শুধু চাহি আশাপথ

ছিলি মাগো তুই—সেই মনোরথ

কর মা পূর্ণ, কর মা আজিকে সে তনয়ে বুকে ধরি।

দে মা ওঁর শিরে তুলি

আশিষ মাখান শিশিরসিক্ত শুভ্র শেফালিগুলি ;

স্নেহে সসকরণ অঞ্চল দিয়ে,

মুখখানি ওঁর নেমা মুছাইয়ে ;—

দেখুক দেবতা এ দৃশ্য আজি স্বর্গদ্বার খুলি।\*

\* পরিত্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেবের ভ্রমভূমিতে আগমন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল দ্বারা রচিত। ১নং গানটি গাহিতে গাহিতে গ্রামবাসিগণ খোল-করতাল বাজাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভৈরব নদীর তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। আর ২য়টি শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরে আসন গ্রহণ করিলে তথায় আবৃত্তি করা হইয়াছিল।

## বন্দনা

জয় বজ্র-গগন গৌরবরবি সুধীজন হৃদিরঞ্জন ॥  
 জয় স্বদেশ-সৈন্যক দান-পালক দুখিজন দুঃখভঞ্জন ॥  
 জয় শ্যামল অমল কমলকান্তি অখিল ভ্রান্তিভঞ্জন ।  
 জয় ভুবনমোহন পাপবিনাশন ভুক্ত মনোরঞ্জন ॥

বজ্র গগনে বিমল ইন্দু আমরা মিলিত সকল হিন্দু ।  
 লভিতে তোমার করুণাবিন্দু যাচিছে সতত ভক্তগণ ॥  
 সমীরণ গায় যশের বারতা সাথীগণ তব গায় গুণগাঁথা ।  
 ঈশ্বর সদনে মহিমার কথা গাইছে সতত বন্দীগণ ।\*

\* মুশিদাবাদের জনৈক ভক্ত কর্তৃক রচিত ও ভক্তসম্মিলনীতে গীত হইয়াছিল।

## সাম্বৎসরিক হিসাব

আসাম-রাজ্য সারস্বত মঠ ও অস্ত্রাঙ্গ দাখ	১	মঠ বিভাগে	৫৫০০/১০
সারস্বত আশ্রমগুলিতে গৃহ বৃত্তসর মোট	২	গোলাকী মোট	১২৭৫৬০/৫
১৫২৪২০/২০। ব্যয় হইয়াছে। অন্তর্গত সাধারণ		আশ্রমবিভাগে	১৮২৫৬০/৫
হইতে প্রাপ্ত ৫৮২০০/২০, মঠের আয় ৩৪৪৮-		অতিথি-অভ্যাগতের জন্য	৮০
০০/১০। এং ওলাতি ১১৫০০০ বাদে বাকী	৩	পরিষেবা ও শীতবস্ত্রে	২২২০০/০
আশ্রমেব আয় হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। আর	৪	সেবাবিভাগে মোট	৩৭৮০০
সমগ্র প্রচার বিভাগে ১০২৬২০৫ আয়, অন্তর্গত	৫	ঔষধ-পঁয়াদিতে	৩৫০/০
২৮৫০০০/১৫ ব্যয় বাদে ৬২৪৪০০/০ লাভ হই-		বাহিরের রোগীদের জন্য	—
য়াছে। এই লাভের টাকা হইতে ৪৫৭০/৫		বিশ্রমকে সাহায্য	২১৬০/০
ব্যয়ে সামাজিকসংস্কার সমিতি একটি মেশিনপ্রাপ্ত	৬	শিক্ষাবিভাগে	১০৫/০
প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নে ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত	৭	গুরুনির্মাণ ও সংস্কারাদিতে	২৫৭৬০/৫
হইল।	৮	সেবকগণের সেবা ও ভিক্ষার্থ-	
আসাম-রাজ্য সারস্বত		বাতায়াতে প্রদত্ত	১৪০০/৫
মঠে মোট ব্যয় ৩৮৬২৫	৯	ভৈরবসংক্রান্ত	২০০/০
(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত—৬৬১০/০)	১০	কাপা খরচ ও ট্যাম্পাদিতে	৪২১/১০



চক্রাভী ভাড়াগ, পাননা ১১, শ্রীকালীপদ দাস নাটিনা, নদীয়া (৩য় দফা) ১১, শ্রীনারায়ণ দাস নদী ভাটিসহ (৩য় দফা) ১০১, শ্রীঅক্ষয় কুমার সাঁচা নারায়ণগঞ্জ ১১, শ্রীশঙ্করকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দ্বীপ (২য় দফা) ১০১, শ্রী-অঞ্জনাবজ্ঞন চক্রাভী ধর্মপুত্র, ঢাকা ২৫, শ্রীকুমুদীনীকান্ত সাঁচা ফরিদপুর ৫০১, শ্রীগগন চন্দ্র দেব জগৎগী, ১০১, শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় কুচবিহার (৩য় দফা) ৫১, শ্রীনরেশ চন্দ্র পাকভাটী স্থল, পাননা ১০১১, শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উতালন, বর্ধমান ১০১, শ্রীভৈরবচন্দ্র ভাটগাওঁ ৪১, শ্রীপনেন্দ্র মুখো-পাধ্যায় এ ১১, শ্রীপদ্মপতি দত্ত এ ৫১, শ্রীজেশ্বর চন্দ্র কানা, কুটিয়ালা, মেদিনীপুর ২১, শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মুন্সেব, ১১, শ্রীমুগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমনপুর, মেদিনীপুর ৫১, শ্রীসারদা-চরণ মজুমদার ফুলগাজী নোয়াখালী ২১, শ্রীমুগেন্দ্রনাথ চৌধুরী খড়কুমার ৫১, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী রাধানগর, বর্ধমান ৫১, শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তমলুক, ২২১, শ্রীপদমুখা মেথিয়া বৈষ্ণবচন্দ্র, মেদিনীপুর ১১, শ্রীসত্যপদ দে ভালিত, বর্ধমান ৫১, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় চৌধুরী মাদারীপুর ১০১, স্বধালতা দেবী, এ ১১, শ্রীস্বজ্ঞানেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় জামসেদপুর ৫১, শ্রীনীলারঞ্জন গঙ্গী আগানসোল ৫১, শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস কল্যাণদী, নোয়াখালী ৫১, শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় রাউগঞ্জ, দিনাজপুর (২য় দফা) ৫১, শ্রীভাগপদ চক্রাভী কোতাউগড়, মেদিনীপুর ২১, শ্রীভারদাস চক্রাভী হাওড়া ২১, শ্রীহর্গাচরণ দত্ত সেল্লাপাড়া, ঢাকা ৫১, শ্রীনগেন্দ্রদেব রায় চৌধুরী শ্রীরামপুর ৩১, শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল গোয়াড়ী, নদীয়া ৫১,

শ্রীসংগপদ পাল এ (২য় দফা) ৫১, রাধা-নাথ নাথেন্দ্র এ ২১, রামেশ্বর পাবন জমী ১১, শ্রীসদনোন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৫১১, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত ৫১১, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খুড়ী ১০১, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুড়-পুং ১০১, খড়কুমার আশ্রম ১১, ভাটরাল আশ্রম ২১, শ্রীরাধানাথ দে কুমিল্লা ৪১, শ্রীচুন্নিলাস ঘোষ কুটিয়া, ২৪ পরগণা ২১, গাওঁ দত্ত ভট্টের সংগীত মাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র লাঠী ৩০০, শ্রীউমেশচন্দ্র জোষামী ভাড়াগ পাননা (২য় দফা) ২০১, শ্রীমুগেন্দ্রনাথ বসু তামলুক ১০১, শ্রীভীমাচরণ বসু এ ১০১, শ্রীসারদাচরণ পট্টনায়ক কাক-দীপ, ২৪ পরগণা ৫১, শ্রীপ্রসন্নকুমার সাঁচা লক্ষ্যশাম, ত্রিপুরা, ১১, শ্রীগাবিন্দচন্দ্র সাঁচা এ ১১, শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র বণিক ১১, ময়মনসিংহের জনৈক ভক্তলোক ২১, শ্রীঅশ্বত্থের বন্দ্যো-পাধ্যায় সন্দ্বীপ ১০১, স্বষমাশোভা দেবী এ ৫১, শ্রীচীনাথ মমুমদার এ ১১, শ্রীসুরেশচন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাটিসহ ২১, শ্রীনরীনন্দ্র রায় গোস্বামি, কুচবিহার ২১, নিশাণালী বন্দ্যোবী এ ১১, টুলটুলি বন্দ্যোবী ১১, শ্রীনাথ বসু বারদী, ঢাকা ১০১, শ্রীমহীন্দ্রনাথ মুখা-নগুড়িগড় আশ্রম, আসাম ১১, শ্রীবালাদাস বৈষ্ণব এ ১১, শ্রীরামচরণ ময়না এ ১১, শ্রীচন্দ্র মাইন পাণিগ্ৰাহী দিগদা, মেদিনীপুর ১১, এ (ছোট) মেদিনীপুর ২১, শ্রীচন্দ্রমোহন মাইতি এ ১১, শ্রীঅধরচন্দ্র পাল কোতাউগড়, মেদিনীপুর ১৫১, শ্রীহরপ্রসাদ রায় বগুড়া (৩য় দফা) ১৫১, শ্রীনাগনীকান্ত দে পিরোজ-পুর, শ্রীহট্ট ৫১, শ্রীশ্রীকমলকান্ত সেবাসজব এ ১০১, পিরোজপুর দেবাসজবের সেবকগণ এ ৪১, শ্রীবিন্দুচরণ দাস, খুড়ী ২৫১, শ্রীনাথ

মাতা বলাইমা, ত্রিপুরা ১১, শরৎসুন্দরী দাসী  
 ১শুড়া ২১, শরৎসুন্দরী মজুমদার ঐ ১০, শ্রীকৃষ্ণী  
 কাহ্ন সাহা ঐ ১১, শ্রীকৈলাস-জ্ঞ দাস  
 পড়গোদা, মাদনীপুর ১১, শ্রীধরচরণ দাস  
 ঐ ১১, শ্রীমমরনাথ মণ্ডল বাবলপুর  
 মেদিনীপুর ২১, শ্রীকেনাবাম মণ্ডল ঐ ১১,  
 শ্রীসারুচন্দ্র বোস কলকাতা ২১, শ্রীপ্রবন্ধনাথ  
 বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘাচকন্দী পাবনা ১০১,  
 শ্রীদেবকানাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ২১, শ্রীমণীন্দ্র-  
 নাথ চক্রবর্তী যোগনাথ পাবনা ১১, শ্রীসম্ভ-  
 ক্রমণ চক্রবর্তী ভাড়াপ পাবনা ১১, শ্রীউমানাথ  
 ঘোষাণ পেন্সনপাশু মনজর বঙ্গবন্দর, নদীয়া  
 শ্রীফণীশচন্দ্র চৌধুরী ২৫১, শ্রীকৈষ্ঠনাথ  
 দাস পুটিয়া, বাজসাতী ২৫১, শ্রীসেবীমধন  
 সরকার চক্রবর্তী, রঙ্গপুর ১১, শ্রীনলকরমাণ  
 মিশ্র লক্ষণকাঠি, বরিশাল ১১, শ্রীগোপীনাথ  
 মিত্র ৫১, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ৫১,  
 শ্রীহারকচন্দ্র চন্দ ৫১, শ্রীনবদীপচন্দ্র দেব ৫১,  
 শ্রীশিবানন্দচন্দ্র দাস ২১, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র কুড়ি  
 ১১, শ্রীহরনাথ কুড়ি ২১, মহারানী দাসী ১১

প্রীতিবালা দী ২১, শ্রীকগবজ দাস ১১,  
 শ্রীহারিকানাথ দাস ২১, D. N. S. ২১০  
 M. L. ৫B. ৩১, N. C. P. ২১০ নাম ছাড়া  
 ২১, ছাড়া ১১, বগনান নিমাই জনৈক ভদ্রলোক  
 ২১ নাম ছাড়া ১১ ঐ ১৪১, উৎসব সমর  
 জনৈক ভদ্রলোক ৫১, কুচলিহার  
 মিলানী — শ্রীশ্যামপাগার ১১, ২১, শ্রী  
 নৃসিংনাথনাথ বসুনিয়া ৫১, শ্রীব্রাহ্মণ মরকাত  
 ২১, শ্রীকমলাকান্ত মল্লিক ৫১, শ্রীখুড় পাটকার  
 ২১, শ্রীকেশরীমোহন বসুনিয়া ১১, শ্রীকমলেশ্বর  
 মিস্ত্রী ৫১, শ্রীহুট পুকুরপার  
 হইতে শ্রীবল্লভসী কুড়ি ২১, শ্রীপাণক  
 কুড়ি ২১, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কুড়ি ২১, শ্রীমদনন্দন  
 কাম ১১, শ্রীসমগচন্দ্র কুড়ি ১১, শ্রীমুরেশ্বর  
 কুড়ি ১১, শ্রীশ্যামচন্দ্র কুড়ি ১১, শ্রীকপচন্দ্র  
 কুড়ি ১১, শ্রীমদানন্দ কুড়ি ১১, শ্রীকৃষ্ণদন  
 কুড়ি ১১, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কুড়ি ১১, নন্দনাথ  
 কুড়ি ১১, শ্রীগোবিন্দ কুড়ি ১১, শ্যামমণী কুড়ি  
 শ্রীনন্দন কুড়ি ১১, শ্রীমতীচন্দ্র মরকাত ২১,  
 শ্রীক্ষিতীচন্দ্র চক্রবর্তী ২১, শ্রীগণেশ মর্দার ৫১

## সংবাদ ও মন্তব্য

\*\*\*—

মঠাধিপতি আশ্রম প্রমহৎসদেব বর্তমানে পুরাধামে  
 অবস্থিতি করিতেছেন।

হরিদ্বারে অমৃত কুন্তলোৎসবের কালনিরূপণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে  
 উক্ত আছে—

পদ্মিনীনাথকে মেঘে কুন্তলশিগতে ধরো।

গন্ধাধারে ভবেদ্যুৎসবঃ কুন্তো নাম তদোত্তমঃ ॥

—শ্রীমদ পুরাণ

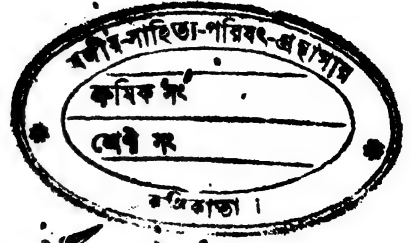
গত ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে নবাব উপলক্ষে  
 কৃত্তবপুর শ্রীশ্রীধরধামে গুরুত্বপূর্ণ পূজা ও ভোগ ইত্যাদি  
 হইয়াছিল। তদন্তে প্রায় দেড় গজ লোককে পিচুড়ি  
 প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আমরা হরিদ্বারের সংবাদে অবগত হইলাম, এবার  
 ১৮ই ফাল্গুন বুধবার শিবরাত্রির দিন হরিদ্বারে শ্রীমদ  
 হইবে। ১৯শে চৈত্র শনিবার অমাবস্তার কুন্তলান  
 হইবে। সাধারণ ২৮শে চৈত্র গোমবার বাসন্তী-বিজয়া-  
 দশমীতে শ্রীমদ শ্রীমদ বিদায় হইবেন।

আগামী ফাল্গুন মাসে হরিদ্বারে কুন্তলোৎসব হইবে।



ওঁ তৎ সৎ



# আমি-দ পল

১৯শ বর্ষ } মাঘ { দ্বিতীয় খণ্ড  
সমষ্টি সং ২০২ } চতুর্থ সংখ্যা

হরিবাহনঃ

—\*—

ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।২।৩-২৪ ]

—\*()#\*—

[ বিখ্যাত ঋষিঃ—ইন্দ্রো দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ]

—\*—

অভি হৃষ্টেব দীপয়া মনীষা-  
মতো্য ন রাজী সুধুরো জিহানঃ ।  
অভি প্রিয়ানি মনুশং পরানি  
কবী'রিত্তানি সংদৃশে স্মমেথাঃ ॥

গুণগানে তর্ক্য হেন মণীষারে উজলিয়া তোলে—  
স্তুতিভার বহি নিতি অখ হেন চলো ছুটে চলো ।  
অতি প্রিয় যাহা কিছু দেবতার খুঁজি-পাতি আনি—  
কবি পানে বিধারিব মেধাদীপ্ত শুভ দৃষ্টিখানি ।

ইনোত পূচ্ছ জনিমা কবীনাং  
 মনোহ্রতঃ সুরূতন্তক্ষত দ্যাম্ ।  
 ইমা উ তে প্রনো বধ'মানা  
 মনোবাতা অথ নু ধর্ম্মনি গ্মন্ ॥

গুরুরে শুধাতে। পাশ্ব, কবিগণ কোথা হতে এলো—  
 কল্পনা-কুশলী যারা বিচিত্র এ দু্যলোক রচিল ।  
 তোমারি প্রণয়গাথা, হে দেবতা, নিতি বেড়ে চলে—  
 মনের সমীরে ছু'লে পাষি নাকি ঠাই পদতলে ?

নিষীমিদত্র গুহা দধানা  
 উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্ ।  
 সংমাত্রাভিমমিরে যেমুরবী  
 অন্তম'হী সম্মতে শাস্তসেশুঃ ॥

কি গোপন মায়া তারা চারিদিকে আজিকে বিছালো !  
 অপরূপ কীর্তি এই—দ্যুলোকে ভুলোকে মিলালো ।  
 অণু দিয়ে ভরি ব্যোম, পৃথিবীরে করেছে অটল—  
 অন্তরীক্ষে রচিয়াছে এ দৌহার মহাসম্মিলন ।

আ তিষ্ঠন্তঃ পরি বিশ্বৈ অভূষণঃ  
 ছিষ্যে। নগানশ্চরতি স্রোতিঃ ।  
 মহত্তদ্রশ্বেণ অমুরস্য নামা  
 বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্মৈ ॥

আসীন আছেন ইন্দ্র, সবে মিলে তাঁহারে সাজালো—  
 সুরূপ বসন হলো—তাঁর ভূষা হলো তাঁরি আলো ।  
 কল্পতরু তিনি দেব, বীর্য্যশালী, সুবিপুলবশ—  
 বিশ্বরূপে অধিষ্ঠান—স্পর্শ তাঁর অমিয়সরস ।

অমৃত পূর্বো ব্রহ্মভো জ্যোত্বানিমা  
 অম্য গুরুত্বঃ সন্তি পূর্বী ॥  
 দিবো ন পাতা বিদথস্য ধীতিঃ  
 ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাতে ॥

চিরন্তন, কল্পতরু, সুমহান্, এই সৃষ্টি তাঁর—  
 ছিল পূর্ব, আছে এবে, এই তাঁর আনন্দবিধার  
 আছে দুই দেব, জানি, দীপ্তকায়, দু্যলোকবিহারী--  
 শুভমতি যজমানে ধনদানে নিত্য-কৃপাকারী ।

তদিন্ত্রস্য ব্রহ্মভস্য ধেনোরা  
 নানভিম্নিরে স্ককম্যং গোঃ ।  
 অন্যদন্যদসূর্য্যং বসানা  
 নি মাস্বিনো মমিরে রূপমস্মিন ॥

বিচিত্র নামেতে খ্যাত কত মত সুপেয় গোরস--  
 কল্পতরু ইন্দ্র তরে রাখিয়াছে বাড়াতে হরষ ।  
 রয়েছে মায়াবী যত, মায়া কত জানে অপরূপ--  
 হুঁহারি শরণ নিয়ে ধরে তান্না কত মত রূপ ।

তদিন্ত্রস্য সবিতুর্নাক্ষিত্রে  
 হিরণ্ময়ীমমতিং স্বামশিশ্রেং ।  
 আ সূষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিত্রে  
 অসীব'ষোষা জনমানি বব্রে ॥

বিশ্ব চলে আঁজাবলৈ, যে দেবের এমনি মহিমা,  
 হিরণ্যায়ী দ্যুতি তাঁরে আছে ছেয়ে—কোথা তার সীমা ।  
 শোভন-রোদসী এই—বিশ্ব যথা আছে অতি সুখে,  
 রয়েছে আঁকড়ি তাঁরে—শিশু যথা জননীর বুকে ।



## সঙ্কট-মোচন

কর্মকে বন্ধন বলে কেন?—কর্মের আবিলতায় মনের ভিতর যয়লা জমিতে থাকে, তাই। সংস্কার বলিয়া একটা মনের ধর্ম আছে, তাহাতে স্বতিকে সজাগ রাখে। এইটাই বড় ভয়ের কথা। আজ যাহা করিলি, তাহা যদি আজট চুকিয়া না যায়, কালও যদি তাহার জের টানিতে হয়, তাহা হইলে ভয় তো হইবেই। বেশীর ভাগ লোকেরই জীবনে স্মৃতির চেয়ে দ্রুততির পরিমাণ বেশী। কর্মের নিয়মানুযায়ী দ্রুততির সংস্কার থাকিয়া যায়। পাপ করিয়াই ঠাট-পা খুটয়া খালাস হইবার উপায় নাই; পাপের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেও ভূত হইয়া সে পেছনে পেছনে তাড়া করে, মানুষের জীবন্তে নরকভাগ শুরু হইয়া যায়। এই দ্রুততির বোঝা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মানুষ একটা কিছু নেশা চায়, যাহাতে মুহূর্তের জন্য সে সব ভুলিয়া যািতে পারে। সংস্কার স্মৃতি জাগাইয়া রাখে, মানুষ তাকে খেদাইবার জন্য বিশ্বাসিতার আয়োজন করিতে লাগিয়া যায়। স্মৃতির জালা বড় জালা! কেন?—কর্ম যে রক্তবীজের মত মরিয়াও মরে না।

আবার স্মৃতির স্মৃতিটুকু বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও মানুষের চেষ্টার বিরতি নাই। স্মৃতি-স্মৃতির মূলে আছে স্মৃতি। চন্দনপাটা খুটয়া ফেলিলেও তার বুক হইতে চন্দনের গন্ধ যায় না। স্মৃতিও তেমনি। একদণ্ডের স্মৃতি ফুলের সৌরভের মত শতদণ্ড তোমার অন্তরঙ্গ করিবে। এ-ও তো সেই সংস্কারেরই কাজ—

এ-ও তো কর্মফল। হৃৎকের স্মৃতি লোপ করিয়া দিবার জন্য মানুষের যতখানি আগ্রহ, স্মৃতির স্মৃতি লোপ করিয়া দিবার জন্য কিস্ত তত আগ্রহ নাই। তাহা হইলে দেখি, সংস্কার এড়াইতে চাহিলেও আমরা সকল সংস্কার এড়াইতে চাহি না। কর্ম বন্ধন হইলেও ফুলের বাধন সকলের কাছেই মিঠা লাগে।

সকলেই চায় হৃৎকের হাত এড়াইয়া চলিতে। হৃৎকের মূলে কর্ম; স্মৃতির মূলেও তাই। কাজেই সমস্ত কর্ম বর্জন করিলে যেমন হৃৎ থাকিবে না, তেমনি স্মৃতি থাকিবে না। কর্মভাগ অর্থে যাহারা কুঁড়েমি নোকে, তাহারা এই কথাটা তলাটয়া দেখে না। তাই বেদান্তের নৈকর্ম্যের সিদ্ধি স্বাভাবিক আনিয়া দিলেও নিকর্ম্যের সিদ্ধি আনিয়াছে শুধু অবসাদ, আর তার পেছনে পেছনে আসিয়াছে হৃৎ। এই জন্য কর্ম-বর্জনে বিপদ আছে। সব কিছু করা চলে না, যাছাই কিছুকি করা করিতে হয়। সে বাছাই কে করিবে? মানুষ নিজে? নিজের বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়াই তো তাহার স্মৃতি-দ্রুতিতে ভাল পাকিয়া যায়, একটা ভাল করিতে সে দশটা মন্দ করিয়া বসে। ইতর প্রাণীর বিচার-বিবেচনার বালাই নাই, তাই তাহাকে ভুগিতে হয়, কম। তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া মানুষ সিদ্ধান্ত করিল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আদি মানবদম্পতী যে পাপ, সঞ্চয় করিয়াছিল আজও তাহার সম্ভান-সম্মতিকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে—চরকাল করিতেই হইবে। অতএব এই সংসার একটা

অভিশপ্ত ক্ষেত্র—পশুশুলভ আদিম নির্মিতার-  
ভূমি হইতে চাত হইয়া মানুষ ঠকিয়াছে।  
অবশ্য এ আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের কথা নয়;  
কিন্তু বর্তমান অধঃপতিত হিন্দুর মনোভাব  
অনেকটা এমনই দাঁড়াইয়াছে। ছেঁড়া কাঁথায়  
সটলে চিংপাত হইয়া পড়িয়া কর্ণ-কোলাহল-  
হীন ইডেন উত্থানের ফলাহারের চিন্তায়  
মগ্ন হইয়া সে আরাম পায়।

পশুতে অন্ডায় কাজ করে কম, মানুষে  
করে বেশী; এমনি একটা ধারণা আমাদের  
মাঝে আছে। এট ঠৈষম্যের তেতু দেওয়া  
হয় এট—মানুষের বিবেকবুদ্ধি আছে, তাহার  
নিজের বোঝা নিজে বহিতে হয়; আর পশুর  
তার প্রকৃতিদেবী স্বয়ং বচন করেন, 'এট জন্তু  
তার বেতালে পা কমই পড়ে।' কাম, ক্রোধ  
লোভভৈরাদি বৃত্তির তুলনায় আলোচনা করিলে  
দেখা যায়, বাস্তবিকই এট সমস্ত পান্থব (!)  
বৃত্তিতে মানুষ পশুকে ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে।  
টহার পরই সিদ্ধান্ত হয়, মানুষ স্বভাবঃট  
উদ্ধৃতি-প্রবণ; মন্দটাই তার সহজে আসে,  
পাপের পথে সহজেই সে পিছলাইয়া পড়ে—  
ভাল হইতেই তার সাধ্য-সাঁধনার দরকার।  
বাহিন দেপিয়া বিচার করিলে কণাটা অসঙ্গত  
বলিয়া মনে হয় না। কুপ্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে  
খুবই সহজ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্তু সর্ব-  
সাধারণের উপযোগী, একটা নীতিধর্মের  
কাঠামো গড়িতে গিয়া ভগবান বুদ্ধদেব প্রচার  
করিলেন, "তোমার" প্রথম কর্তব্যই হইতেছে  
অকুশল কর্ম না করা; দ্বিতীয় কর্তব্য, কুশল  
কর্ম করা।"

দুঃখের হাত এড়াইবার জন্ত বড় বড়  
কথার মারপ্যাচের মাঝে না গিয়া শুধু এই

একটা কথা আঁকড়িয়া ধরাই ভাল "আমি  
যেন অকুশল কর্ম না করি, আমার দ্বারা  
নিজের অকল্যাণ, পরের অকল্যাণ যেন না  
হয়।" উপনিষদেও এই বুদ্ধবচনের অনুরূপ  
কথা আছে—"নাপিরতো হৃশ্চরিতাং—প্রজ্ঞা-  
নেনৈনমাপ্নুয়েৎ"—যে দৃষ্ট 'আচার' হইতে  
বিরত হয় নাই, সে প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে  
পাইতে পারে না। যেমন কাজের সুবিধার  
দরুণ কখনও কখনও মিলিটারী আইন জারী  
করিতে হয় যে, আগে হুকুম তামিল কর,  
তার পর প্রশ্ন করিও, এই শাসনাবলীর সম্বন্ধেও  
ঠিক সেই কথা খাটে। কুপ্রবৃত্তি কোথা  
হইতে আসে, কেন আসে, কে তার প্রণো-  
দক, সে বিষয় পরের কথা; আগে এইটী  
ভ্রম করিয়া ধরিতে হইবে, অকল্যাণ করা  
চলিবে না। এট মোরটুকু বজায় রাখিবার  
জন্তই হিন্দুর এক শৌচ সদাচারের ব্যবস্থা।  
আচার হিন্দুর সাময়িক শৃঙ্খল, হিন্দুসমাজের  
সাময়িক আইন। শুধু চোখ ধুইয়া চলিবার  
ব্যবস্থাটি যে আছে, তাহা নয়; কিছু দূর  
চলিবার পর আচার অভ্যস্ত হইলে তাহার  
তাবৎপরি বঝাইয়া দিবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে  
আছে। রাজা আর মন্ত্রীতে পরামর্শ হয়;  
খাড়া হুকুমটা আসিয়া পৌছে চৌকিদারের  
কাছে। পর পর মুরব্বি ধরিয়া সে কি আর  
ভিতরের খবরটা জানিতে পারে না? কিন্তু  
হয়ত তার কৌতূহ্য নাই, চেষ্টা নাই। তাই  
চৌকিদারীতেই তার জীবনের ইতি। হিন্দু-  
সমাজে আমরা অধিকাংশই এই চৌকিদার  
শ্রেণীর। তবে বিপদ হইয়াছে এই যে, এই  
চৌকিদারদের মাঝে কেহ কেহ বাঁকিয়া বসি-  
য়াছে, "আমল কঁথাটা না শুনিয়া হুকুম তামিল

করিব না ; 'ও সব মন্ত্রী বেটাদের চালাকি !' ফল কি হটবে কে জানে ?

যে কথা বলিতেছিলাম। মেট কথাটা এই, কর্ম ক্ষমতা হইলেও দৃষ্টি বন্ধনই প্রথমতঃ দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়। তাই মানুষের প্রথম কর্তব্য, দৃষ্টি বর্জনপূর্বক কর্ম করা। ইহাতে বিচারেরও প্রয়োজন নাট। পূর্ব পুরুষের অমুদ্রিত সদাচার অবলম্বন করিয়া শক্তিসংগ্রহ কর, করিয়া তর্কাতর্কে ঠেকাটেকা রাখ। আচার অভ্যাস হইলে তার পর বিচার কর। তখন আচারের দোষ-গুণ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিজেই বুঝিতে পারিবে—এমন কথা মনে হটবে না যে এ আচার "ভীরু সম চেষ্টে আছে আড়ষ্ট কঠিন।"

পূর্বেও ইঙ্গিত করিয়াছি, এই ব্যবস্থার মূলে একটা সাংবাদিক কথা রহিয়াছে, যে মানুষ স্বভাবতঃই দৃষ্টিপারায়ণ। মানুষ ও পশু যদি প্রকৃতিরই সম্মান হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির এমন সুন্দর সৃষ্টিকে এত দুর্বল করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কি জনগৌরবমতান পরিচায়ক ? কিন্তু আমাদের মনে হয়, মানুষ স্বভাবতঃই দৃষ্টিপারায়ণ নয় ; আপাতদৃষ্টিতে তার দৃষ্ট-বৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলে তার পারিপাশ্বিকে। দৃষ্টির প্রতি প্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক নয়, বরং নিতান্তই অস্বাভাবিক—প্রমাণ মানুষের সৌন্দর্য্যবিশিষ্টতা। মানুষের বুদ্ধি বেশী বলিয়া সে বিপাকে পড়ে ; তার সমাজ-ব্যবস্থা পশুর সমাজ-ব্যবস্থা অপেক্ষা জটিল আকার ধারণ করিয়া দৃষ্টবৃত্তির প্রচুর অবকাশ রচনা করে। কিন্তু এই বিষয় প্রতিবেদকস্বরূপ সৌন্দর্য্য-বোধরূপ এক অমৃত রসায়ন যদি প্রকৃতি তাহার হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চিত না রাখিতেন, তাহা হইলে পাণের

সংক্রমণে দুই দিনেই মানুষ উজাড় হইয়া যািত। মানুষ ব্যবহারের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া যেখানে রুচিবিকারের পরিচয় দিয়াছে এবং সৌন্দর্য্যবোধকে কুঞ্চিত করিয়াছে, সেখানেই পাপ প্রশ্রয় পাইয়াছে। আবার এত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধের প্রেরণায় মানুষ স্বক্ৰান্তঃই পাপকে ঘৃণা করিতেও শিখিয়াছে।

ক্ষতরাণা অত্মায় হইতে বিবর্ত হইতে চেষ্টা করিয়া কর্মযোগের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে, মানুষের স্বভাব যে দৃষ্টান্তিতর প্রাক্কুল, এই কথাটা জানিতে পারিলে তাহাদের প্রচুর লাভ। নীতিগাণীশেরা মানুষকে পাপী পাপী বলিয়া তাহার অত্মায় প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে এত দুর্বল করিয়া ফেলে যে, পাপী বেচারীরা শেষকালে পুণ্যানন্দেনই একটা গলগ্রহে হইয়া পড়ে। যে অত্মায়কে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কোথায় তাহার মাঝে প্রবল আত্মবিশ্বাস সঞ্চাল করিয়া দিয়া পাপের মোহ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলে, তা না করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্তের লব্ধা ফল শুনাইয়া তাহাকে আরো আঁতকাইয়া তোল, তাহা হইলে খোরাক জোগাইয়া অত্মায়কেই আরও জীয়াইয়া রাখা হয় নাকি ? এই জন্ত বলি, মানুষকে বিচার করিতে বড় ছাঁশিয়ার হইতে হইবে। মানুষের হৃদয় স্নানাস্রের রণভূমি বটে ; কিন্তু সেখানে অমরের বিজয় আকাজক্ষ্য করাই কি দেবদেব পরিশোধ করা ?

দুঃখ যদি এড়াইতে চাও, অকুশল-কর্মের অমুষ্ঠান করিও না—এই হইল তেতিবাচক প্রতিজ্ঞা। ইহার পরের কথাই হইতেছে—সুখ যদি পাইতে চাও, তাহা হইলে কুশলকর্ম

কর। পূর্বেবটী যথাযথ প্রতিপালিত হইলে যে পরের অমুশাসনটী প্রতিপালিত হইল এমন কথা নয়। পূর্বেবটী পঞ্চদশটী ভূমিকা মাত্র। শুদ্ধচিত্ত না থাকিলে সবমুঠানও বিফল। এই জন্য গীতাতোও তিন রকম কর্মব্যক্তি কথ্য আছে—তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী। তমো-রাজকে পবাত্ত করিলে তবে সর্বের সুরণ। তামসীবৃত্তিতে অমুষ্ঠিত কর্মই পাশব-জড়বৎ অমুঠান, আমাদের বর্তমান দুঃস্বাস্থ্যর বা নাকি মূল কারণ। রাজসুবৃত্তিতে অমুষ্ঠিত কর্মে বিফল আছে। বিফোভে অবসাদও আসে,

উদীপনাও আসে। হৃৎপ্রবৃত্তিমূলক বিফোভে অবসাদ—ফণ নরক, মৃত্যু। আর নিবৃত্ত-লক্ষ্য বিফোভে উদীপনা জাগে—শুদ্ধস্ব চিত্তে সংকর্ষণ প্রেরণা জাগে। ইহাই কর্মযোগে দ্বিতীয় স্তব।

শেষ কথা—সংস্কারশূণ্য হইয়া কর্ম করা—যেখানে স্বকৃতি-হৃৎতির বিচাণ বা বিভীষিকা নুট—কর্ম যেখানে জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াও অনাবিল। ইহাট নৈকর্ষ্য-নিজি।



## শিক্ষার সমাপ্তি

সদগুরু আকাজ্জ, যে অমুর্গ ভাগবতী সন্তা তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন, শিষ্যের মাঝে তা মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। গুরু শিষ্যের মাঝে ভগবান্ গড়তে চান না, ফোটাতে চান। চলতি ভাবে আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তার মাঝেও এই তত্ত্বটী নিহিত রয়েছে। মানুষের মাঝে ব্রহ্মের ক্ষুদ্রী শিক্ষা বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। সে বিজ্ঞান সহজ হয় কি কঠিন, তার মতে কি আমাদের জানা আছে?

যিনি গুরু, তিনি সংস্কারমুক্ত পুরুষ, এ কথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ঘরের ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করি সংস্কারবশে। মূলে ছুটা জন্ম এক হয়েও ব্যবহারে এই যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, একে অজুত বলা যায় না কি?

কেন এমন হয়? হয়ত শিক্ষার পূর্ণায়ু রূপটী আমাদের জানা নাই। যতটুকু তাগিম

দিলে মতলবসিদ্ধির অনুযায়ী ম'মুখ গড়তে পারে, ততটুকু দিয়েই আমরা শিক্ষার পাঠ তুলে দিই। কিন্তু প্রকৃতির কাজ চলতে থাকে। কোরকের শিক্ষা ফলের পরিণতিতে সমাপ্ত হয়। অপ্রবুদ্ধ শিক্ষকের তখন দেখা পাওয়া যায়না যে চিন্তাব-নিকাশ করে সব তার কাছ থেকে বুঝে নেবে। কিন্তু অন্তর্যামী তার অপরাধের হিসাব রাখেন। “দ্বয়া হযাকৈশ” বলে কি তখন দায়িত্ব থেকে খালাস হওয়া যায়?

যখন শিক্ষার সমাপ্তা তগিয়ে ভাবতে বাই, তখন কেবলি মনে হয়, এ কি পরপ্রবোধন না আত্ম-উদ্বোধন? জুলুমবাজী না আত্মসমর্পণ? উপকার না সেবা? উপযুক্ত শিক্ষকে, প্রতিষ্ঠ গুরুভাব জাগে—শক্তিসঞ্চয় শক্তিসঞ্চা-রণের শক্তি প্রকট মূর্ত্তি ধারণ করে। প্রবুদ্ধ

অমৃত্যুর অপরের স্তিমিত আত্ম-চৈতন্যকেও প্রদীপ্ত করে তোলে। কিন্তু আত্মাতিমানে অন্ধ যে মূঢ় বোগ্যতার অভিনয় করে পরকে হুঃখ দেয়, নিজেও হুঃখ পায়, তাকে বোঝাবে কে? অগ্রবুদ্ধ আচার্য্যস্বস্ত্রের কোলাহলে শিক্ষার তপোবন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে; আত্ম-প্রাণের আক্ষালনে ঋকশক্তি লজ্জায় স্তিমিত-প্রায় হয়ে থাকে!—প্রাণ জাগাবে কে?

বাস্তবিক সমস্তার সমাধানকল্পে আমাদের যে কিছু করবার আছে, এই ধারণা নিয়ে যে শিক্ষাক্ষেত্রে পা বাড়ায়, বোধ হয় সে ঠকে! সমস্তা নোকা চাই, সমাধান তার পর। বুঝতে হলে ধৈর্য্য চাই, অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করবার মত সমবেদনা থাকা চাই—সর্বোপরি সাহস চাই। অস্ত্রায় দেখানামাত্রই যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তার হৃদয়ল মনোবৃত্তি কাপুরুষতারই নামান্তর। অধুনা আমাদের সমাজে, পরিবারে কাপুরুষতাই শিক্ষকের আসন দাবী করছে।

মামুষ শিক্ষার ফল্গুলা তৈরী করতে পারে না, তা তৈরী করে যুগশক্তি। এ কিগাটা ভুলে গিয়ে যে নিজের সংস্কারকে পরের উপর জয়ী করতে যায়, তার পরাভব স্থনিশ্চিত। অবরদস্তীর জয় পরাজয়ের ভূমিকা মাত্র। পৃথিবীর বড় বড় বিপ্লব তার সাক্ষী। আমাদের বর্তমান হিন্দুসমাজে যে মনোরাঞ্জো প্রচণ্ড বিপ্লব চলছে, এ-ও সেই ভবেষরই উদাহরণস্থল। শাস্ত্র-ব্যবসারী বা নীতিবাগীশ চটলে কি হবে? কাটলের ধর্ম্মে মেকীর জয় টেকে না--এখন যে পক্ষকেই হুঃখ পেতে হোক না কেন।

ধানের ফসল মাটি করে আলুর আবাদ করলে কি হবে? প্রকৃতিতে ঋতুপর্যায় আছে তো? জীবনেও কি ঋতুপর্যায় নাই? ফল

ফোটার রসায়ন জানে প্রকৃতি, মালীর তাতে কোনও বাহাহুগী নাই। সে নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ মাত্র করতে পারে, তাতেই তার আনন্দ। কিন্তু এমন বোকা চাষীও আছে, যারা কাগজে-কলমে লাভের অন্ধ পন্থিয়ে বারোমাসী বীজের ফসল করতে যায় এবং শেষটায় ঠকে নিশ্চিত হয়। শিক্ষার আদ্যেও বারোমাসী ফসল ফলানো আমাদের একটা বাস্তবিক আছে। পাকা চাষীকে বলি, সেইখানে হুঁসিয়ার।

শিক্ষকের কি কোনও কাজ নাই? কাজ আছে বই কি! কিন্তু রুটীনবীধা কোনও কাজ তাঁর হতে পারে না। যিনি রুটীনের বীধনে জীবনটী বীধতে পেরেছেন মনে করেন, তাঁর বজ্রআটুনি ফদকে 'গেরো সার। বিশ্বাস না হয়, হাঁড়ীর খবর নিয়ে দেখবেন। অত্যয় দরকার কি—নিজের মাঝেই স্তব্ধ হয়ে বুঝে দেখুন না কেন। জীবনে বৈচিত্র্য্য দোষের নয়, শুটাই রসায়ন—যদি ভোগ করতে জানি। রসায়নের মশলা জোগাড় করতে হয় আলাদা করে, কিন্তু না মেশালে চমৎকারিত্ব হয় না, তার খোলে না। মেশানোর কার্য্যদা সবাই জানে না। যারা ওপরভাসা চালে চলে, তারা কি করে এই বৈচিত্র্যের রহস্য ও মাধুর্য্য আনন্দন করেন? একমাত্র ধ্যানরসিকই জানেন, বিরোধের মামঞ্জস্ত কি করে হয়। তিনিই যথার্থ শিক্ষক। আনাড়ী শিক্ষক বিরোধ মিটাতে যায় একপক্ষ উচ্ছেদ করে।

আত্মসমাহিতের যে সম্মোহনশক্তি, তাই পরকে প্রবুদ্ধ করে। সনাতন শিক্ষার এই মূল মন্ত্র। যেখানে সমাধির অভাব অর্থাৎ চঞ্চলতা, সেখানে আক্ষালন যত থাকুক না কেন। শিক্ষা বজ্রা—এ ঋব সত্য। যেখানে

চাঞ্চল্য, সেখানেই বিদ্রোহ—এ ও একটা সনাতন সত্য। চঞ্চলা প্রকৃতি বশ হয়েছে অচল পুরুষের কাছে, এ কথাটাও মনে রাখতে হবে।

আমি অবিস্মৃত থাকব—জাগ্রৎ থাকব—  
এই শিক্ষকের প্রাণপাতী সাধনা। এক জন গাহিত্যিকের লেখায় পড়েছিলাম, এক জন আচার্য্যের কথা উল্লেখ করে তাঁর এক ছাত্র বলেছিল, “রাগ তাঁর দেহিনি।” অতীত হলে তিনি এক রকম অদ্বুত হাসি হাসতে থাকতেন। তাঁর তিরস্কার হয়ত সহ্য হত, কিন্তু অতীতকারী যে অদ্বুত হাসি সইতে পারত না।” কথাটা নিছক সত্য। হাসি শুধু সোহাগ বাড়ায় না, শাসন করতেও জানে।

ঋষিরা তপোবনের ছয়ানে দাঁড়িয়ে উদাত্ত-  
কণ্ঠে আহ্বান করতেন, “যাত্রি যেমন দিনের পানে ছোটো, মাস যেমন বৎসরের পানে যায়, নদী যেমন প্রবলভূমিকে অমুসরণ করে, তেমনি ব্রহ্মচারীরা আমার পানে ছোটো আশ্রক।” এই প্রাণের আহ্বানে প্রাণজেগে ওঠে—উপনিষদের সৃষ্টি হয়। এ তো শিক্ষকতার বাবসাদারী নয়। এমনি ডাকে একদিন রামকৃষ্ণ বাংলার প্রাণকে ডেকে তুলেছিলেন। এ ডাক বাঁশীর ডাক, ডাকা তপড়া হাঁক নয়।

নারায়ণকে নরের মাঝে জাগাতে হলে  
তাঁর সেবা চাই। তদর্পিতাখিলাচারতাই সেবা; সমস্ত আঁটার সেই নারায়ণকে উদ্দেশ করেই সমর্পণ করতে হবে। গুরুগৃহে আচার্য্য এমনি নারায়ণের সেবা—নরের সেবা সার্থক করেন। অভক্ত দেখে, শালগ্রাম কুংসিং শিলা মাত্র; সে তো জানে না ভক্তের প্রাণে শিলা বিগ্রহে ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শিক্ষার সাধন যারা করে, তাদের বলি, নত হও, সেনক হও—অভিমান বর্জন কর। নরবিগ্রহে নারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশের জন্য সহিষ্ণু ও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাক। অবশেষে কথায় চলো না। তোমার একান্তিকতা কি ব্রূণা হবে মনে কর? দানবীয় উপচারণে দেবতার পূজা হয় না—এই কথা স্মরণে রেখে সেবার প্রাণ উৎসর্গ কর।

শিক্ষাকে যদি সেবাট বলা যায়, দেবতার পূজাট বলা যায়, তাহলে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার—দেবপূজায় পৌত্তলিকতা পরিচার অতি প্রয়োজন। কথাটা আংক উঠবার মত কিছু নয়। আসল কথা এই, মিজের খুসীমত দেবতা গড়তে যেও না—ওটাকে ভালবাসার লক্ষণ বলে না। তোমার সংস্কারানুরূপ যে দেবতার রূপই কামা হোক না কেন, তাই অপূর্ণ, তাই দোষগ্ৰস্ত। দেবতার সর্গবিধ বিকাশের জন্য উদার অবকাশের রচনা কর, সর্গীর্ণ সংস্কারে তাঁর রূপ সঙ্কটিক করো না।

তবে জানি, রূপের মায়া এড়ানো কঠিন। তাই শিক্ষারও একটা বিশিষ্ট রূপ অজ্ঞাত-  
গারেও হয়ত আকাশ হয়ে পড়ে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রূপকেই একান্ত বলে গ্রহণ করতে নাই। অরূপ হচ্ছে রূপের ভূমিকা। অরূপই আশ্রয়, রূপ তার আশ্রিত। তাই বৈরাগী ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষক কেউ হতে পারে না।

শেষ কথা এই, যদি সেবা করতে চাও, অধিরাম সঙ্গ কর। সজ্জের প্রভাব সেবাকে সার্থক করে। উপরোক্তের উপর ভরসা করে

শিক্ষকতা করা চলে না। নিঃসঙ্গ শিক্ষকতাই তো আজ আমাদের সমাজে এত হাহাকারের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষকের অভিমানও উগ্র হয়ে উঠছে, এটো জ্ঞা। যেখানে কর্তব্যের জ্ঞা, সেখানেই কামনা-বাসনার দোরাখ্য নেই। তাই অকর্ম্ম মানুষই দৈবের ভরসা

নেয়ী করে, আর ভরসা মত জিনিষ না পেলে চটে গিয়ে ভগবানকে গাল দেয়। জীবনসমগ্র জটিল হয়ে গার্হবিয়িক শিক্ষাও এমন বরাভী হয়ে উঠেছে। ফলে আত্মকলহ—উদ্বার সৃষ্টি। সব আপদ্ মিটে যায় যদি সেবকের চিত্ত দিয়ে অহর্নিশ সেবার তৎপর থাকতে পার।

## সেবক-জীবন

—:~:~:~:—

গীতার উপদেশ এই, যে কর্ম্ম বন্ধনের তেতু, তাহাকে মোড় ফিরাইয়া যদি তাহাকে ঈশ্বরীভিমুখী করা যায়, তাহা হইলেই তাহা হইবে মুক্তির সাধন। ঈশ্বর বলিতে কি বুঝি, সে সম্বন্ধে মতবৈধ আছে। উপাত্ত বলিয়া জীবনের একটা কেন্দ্রবিন্দু। কেহ পায়, কেহ পায় না। যে পায় না, তাহার গক্ষে কর্ম্মযোগের উপদেশ কি আকার ধারণ করিবে? তাহাকে বুঝিতে হইবে, সার্থকজ্ঞে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন অথবা দুঃখের তেতু; আর পরার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই মোক্ষের দ্বার। গান্ধীজীভায়ে ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়া যারা নীতিধর্ম্ম গড়িতে যান, কর্ম্মক্ষেত্রে সেবাব্রত স্বীকার ছাড়া তাহাদের আয়ুঃপত্যস্বরূপ দেখা যায় না। পাশ্চাত্যগণের ভাবুকতানিহীন Ethics-এর মতবাদগুলি আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই পরার্থ প্রবৃত্ত হইতেই কর্ম্ম সেবার রূপ ধারণ করে। কর্ম্ম যদি জীবের সহজধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সেবাও তাহার জীব-প্রকৃতির উৎসর্ঘের সহজ উপায়। কর্ম্মমানেই একটা

লক্ষ্য থাকে। কাগানও মতে সে লক্ষ্য সুখ, কাহারও বা মতে জ্ঞান। এ দেশের দার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রবৃত্তির সার্থকতা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার। অনিষ্টপরিহার নেতিমূলক। সামান্যতঃ ইষ্টপ্রাপ্তিকেই কর্ম্মের লক্ষ্য বলিতে পারি। কিন্তু এটো ইষ্ট কে? সর্বত্রই ইষ্ট আত্মা। আত্মা যাচার কাছে যে উপাধিতে প্রকাশিত, তাহার কাছে সেইরূপেই তিনি ইষ্ট। আমার কাছে তিনি দেহরূপে প্রকাশিত, তাই দেহই আমার ইষ্ট; দেহকে ধরিয়াই আমার যোগক্ষেম করিতে হইয়াছে—উহাই আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিদান। এইরূপে কাহারও বা মন, কাহারও বুদ্ধিই আত্মরূপে ইষ্ট এবং উহাই তাহার কর্ম্মের প্রয়োজক। স্বরূপতঃ আত্মা যদি কাহারও ইষ্ট হন, অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় যদি কেহ আত্মরতি, আত্ম-ক্রীড় অতএব আত্মকান হন, তাহা হইলেও তাহার কর্ম্ম থাকে কি না, তাহা একটা সমস্যা। এক হিসাবে তাহার কর্ম্ম আছে, এক হিসাবে আবার নাই। এই জন্ত

কর্মের বিচার হইতে আত্মস্বরূপনিষ্ঠের কথা আপাততঃ আমরাদিগকে বাদ দিতে হইবে। মোটামুটি আমরা দেখিতেছি, যদি আমার আত্মা দেহ, মন, বুদ্ধির উপাধিতে প্রকাশিত হন, তাহা হইলে যে কর্ম আমার দ্বারা প্রবর্তিত হইবে, তাহা কিন্তু স্বার্থমূলক হইবে। ইহাকে সেবা বলা যাউতে পারে না। স্বার্থমূলক কর্ম দুঃখের নিদান, কেননা আত্মার ব্যাপ্তি সেখানে স্বীকৃত হয় না। পাত্যেকের ক্ষাড়েই নিজের স্বার্থ প্রবল হইলে স্বার্থে স্বার্থে সংবাত অবশ্যস্থানী। এতৎ কর্মজগতে নিচরণ করিতে যাওয়া আমরা দেখি, যেখানেই দেহকে বাঁচাইয়া কাজ করিতে যাউ, কিম্বা নিজের মনের সংস্কার বা বুদ্ধির কালোয়াড়ী জাতির করিতে যাউ, সেখানেই অপরের সঙ্গে যে শুধু বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা নহে, সে বিরোধ রীতিমত আমাদের পীড়া দেয়।

এতৎ জগৎ জীবনের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে কর্মযোগী পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। আত্মমুখেছা সমস্ত কর্মের জনক হইলেও এ ক্ষেত্রে আত্মা অতি সন্ধীর্ণ পরিধিতে প্রকাশিত হইতেছেন। কাজেই দেখি, সংসারে কর্ম অর্থই বন্ধন, দুঃখের নিদান। ইহার প্রতীকার করিতে গিয়া কেহ বলিলেন, কাজ নাই কর্ম করিয়া। গীতাকার বলিলেন, এটা স্বাভাবিক রোগের স্বাভাবিক চিকিৎসা। দেহ, মন, বুদ্ধির উচ্ছেদ করা তোমার এক্ষেরায় নয়; তাহার খাটিতে আসিয়াছে, খাটিতে। তাহাদিগকে ছাড় করিয়া রাখিলে, তোমার ক্ষতি, সমাজের ক্ষতি। সুতরাং তাহাদিগকে খাটাও, কিন্তু মজুরী দিও না—তাহা হইলেই তস মবিয় আসিবে; অথচ তাহা দুঃখের

কারণ না হইয়া এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির আনি-  
ডান হইবে। কর্মপ্রবৃত্তি যেমন তোমার প্রকৃতির এক দিক, কলসমর্পণও তেমনি তাহার আর এক অপ্রাশংগ্য গুণ দিক। কর্মকে সেবার পরিণত কর, দেহ-মন বুদ্ধি নজর রাখিয়াও আনন্দ বা মুক্তিরমাধনের ভোক্তা হইবে।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতোছ, সেবারে আত্ম-লক্ষ্যে পর-লক্ষ্যে পরিণত হইতেছে। কর্মে যেমন দেখি, অভিন্ন বা অহংকে সর্বদা জাগাইয়া রাখিতে হয়, নতুবা কর্মে ছোর ভাগিদ থাকে না। সেবারেও তেমনি পবকে সর্বদা চোখের সামনে রাখিতে হয়, নতুবা উহার মাধুর্য ভংগণাৎ অল্প হইয়া উঠে। কেহ বলেন, সেবক যন্ত্র-স্বরূপ। ঠিক যন্ত্র বলিলে সেবকের অমর্যাদা করা হয়। আত্মকর্তৃত্ব নাই—এই হিসাবে সেবক যন্ত্র নটে; কিন্তু তাহার আত্মচেতন্য নিত্য প্রদীপ্ত। যন্ত্র হইলেও সেবক সচেতন যন্ত্র। গীতাতে আছে, ভগবান বলিতেছেন, ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রে চাপাইয়া ঘুরাই-  
তেছেন। ইহাই মায়। যন্ত্রচালিত জীব যখন হৃদয়ে যন্ত্রীকে দেখিতে পায়, তখনই সে সেবক। যখন যন্ত্রী চোখের আড়াল হইয়া যায়, তখন হাঁস-ফাঁস করিয়া কর্ম করিলেও সে-সেবক নয়, জীবাদম যন্ত্র মাত্র। এই জগৎ গীতাতে সেবাকে যোগ বলা হইয়াছে—ইষ্টে সমাহিতচিত্ততাই তাহার লক্ষণ। যন্ত্রীর শ্রীত্যাগে কর্ম, তাহাকে ভুলিয়া শুধু কর্ম করিয়া 'গোলেই মুক্তি হইবে না। মুক্তি যে হইবে না, তাহার প্রমাণ—এমন কর্মীর ছুট-ফটানি বেশী, গিপূর বিস্তার বেশী—হোক না সে যত বড় ভক্ত-ভিত্তি।



এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়া যাঁই বলিয়া আমাদের সেবকজীবনে কতকগুলি সমস্তার সূত্রপাত হয়, অনর্থক ঘটে। প্রায়শঃই দেখি, সেবকে সেবকে বিনিবনাও হয় না—পরস্পর আত্মদোষে অন্ধ হইয়া পরস্পরকে দোষ দেয়। কিন্তু ভানিয়া দেখে না, প্রাণের ঠাকুর আড়াল হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া আজ প্রীতির প্রসবণ শুকাইয়া গিয়াছে—তাই এই দোষদর্শিতা। সকলেই যদি একজনকে ভালবাসে (অর্থাৎ তাঁর সূত্রে স্ত্রী হইবার চেষ্টা করে,) তাহা হইলে তাহার পরস্পরকে ভালবাসিতে বাধ্য—ইহা জামিতিক সত্য (যে সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে একই বস্তুর সমান, তাহার পরস্পর সমান)। উপাস্তকে ভালবাসি বলি, অথচ পরস্পর বগড়া করি--এর মাঝে ভগ্নমি আছেই।

সেবকে সেবকে ঈর্ষ্যা জন্মায়। উপাস্ত-বিস্মৃতির এই আর এক নিদর্শন। সেবার্থ্য ভাগবতধর্ম; পরার্থপ্রবৃত্তি বা ভক্তি তাহার প্রাণ। ভাগবত বলেন, ভক্তির পর ধর্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। তাহার অধিকারী কে?--ভাগবত বলেন, যে মৎ, যে উজ্জ্বলিত-কৈতব ও যে নিম্মৎসর। সেবক হইতে হইলে স্বাপ্নু হওয়া চাই, অকপট হওয়া চাই, আর চাই ঈর্ষ্যাসূন্য হওয়া। ছয়টা রিপূ পর পর সাজানো আছে, সকলের শেষে রাখিয়াছে মাৎসর্য। অনেকে ভাবেন প্রথম তিনটাই প্রবল--পরের তিনট বাজে। কিন্তু আমরা জানি, পরের তিনটাকে 'সামলানুই' সেবার্থতের চরম পরীক্ষা। সেবক কাম, ক্রোধ, লোভকে টুটি চাপিয়া ধরিয়া থেদাইয়া দিতে পারে, কিন্তু

মোহ ছাড়া বড় কঠিন। যদিও বা টেঁটস্থিতে মোহের ঘোর কাটিয়া যায়, তবুও অভিমান ছাড়া আরও কঠিন। কাজ করিয়া ফলটা দিয়াছি ঠাকুরকে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কখন তাঁহার ভোগ হইতে চুরী করিয়া অভিমানের আশ্রয়ন করিতেছি। হয়ত তাঁহার কৃপায় এই দুর্দৈব হইতেও বাঁচতে পারি, কিন্তু শেষ কালে ঈর্ষ্যার হাত হইতে আর কিছুতেই নিস্তার পাই না। "ও বুঝি বেশী আদর কাঁড়িল"—অত্যাংকষ্ট সেবকের বুকেও এই বিষণ্ণ জ্বালা। যদিই বা সে বেশী সোহাগ পায়, তাহাতে যিনি সোহাগ করেন, তাঁরই তো তৃপ্তি, আমি আত্মতৃপ্তির বাঘাতে ক্ষুধ হই কেন?—এ ভাব তো সেবকের চিন্তে জাগে না। এতেই প্রমাণ হয়—লক্ষ্য ভুল হইয়া গিয়াছে—প্রাণের ঠাকুর আড়াল হইয়া পড়িয়াছেন।

সেবকেরা কর্মে বিরক্ত হইয়া পড়ে লক্ষ্য বিস্মৃতির অতি নিরুপ্ত পরিচয়। বোঝা যায়, যন্ত্রীকে ভুলিয়া যন্ত্র বনিয়াছে। আত্মশক্তির অভিমানে অন্ধ বনিয়াছিলে, যেই সে শক্তির পুঁজি ফুরাইয়াছে, অমনি অবসাদ আগিয়াছে। অথচ অভ্যাসবশে বা পারিপার্শ্বিকের চাপে কর্ম চকিতেছেই, তাহাকে এড়াইবারও উপায় নাই। 'কাজেই তখন অফমের শেষ সম্বল বিরক্তি। সেবাতে যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, (আর তাহাই তো হইবে), তাহা হইলে যেখানে উপাস্তস্থতির প্রমত্তমাত্রও থাকিলে, সুখানুই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতেও প্রাণে অমৃত তুফান বহিয়া যাইবে—মনে হইবে, এ যে তাঁর কাজ! ধেন কাজ করিব, তার কি এমত্রে বড় যুক্তি কেউ দিতে পারে?

সেবক উদ্ধত হয়, পরপীড়ক হয়, সংশয়াতুর হয়—ভাষে তাঁর কাজ করিতে গিয়া এটুকু না হইলে চলে না। হয়ত তোমার চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তুমি আনর্শ সেবক। এখানেও সেই উপাস্তবিশ্বাস্তি। সবাই যে তাঁরই সেবক, এই গোটা জগৎটাই যে

তাঁরই পূজার আয়োজন—এ কথা যে এখানে এখানে বোঝে, সে কখনও রুত ও দোষদর্শী হইতে পারে না। সে ফোঁস করে হয়ত, কামড়ায় না—বিষ ঢালে না। বিষ ঢালে না প্রমাণ এই—অপরে তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব বেশীক্ষণ বজায় রাখিতে পারে না। পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস্তি না হইলে এটা হয় না।

## দম্পতী-জীবন

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]

—\*—



বেদান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তির কথা রাম শুনতে পেয়েছেন। সেদিন একজন বলছিলেন, এই যদি হিন্দুদর্শনের শিক্ষা হয়, তা হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ কি, তা বেশ বৈশা মাচ্ছে। আর একজন রামকে জিজ্ঞাসা করল, হিন্দু এত বেদান্ত যদি জগতের সর্বোচ্চ শিক্ষা বা ধর্ম হয়, তা হলে আজ ভারতবর্ষের এই দুর্বস্থা কেন, আর খৃষ্টীয় রাজ্যগুলিরই বা এত সমৃদ্ধি কেন?

এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব রাম এখন দেবেন না; কারণ এ সব আলোচনা করতে গেলে পূর্বনির্ধারিত বিষয়সমূহের আলোচনা স্থগিত রাখতে হয়। এ সব কথার জবাব এর পরের ছ'টার বক্তৃতায় রাম দেবেন, আর সে জবাব এমন চণ্ডের হবে যে তোমরা তাতে অবাক

হয়ে যাবে। তবে বেদান্তের উপদেশ যারা শোনে, তাঁদের প্রতি রামের এইটুকুমাত্র অনুরোধ যে তারা যেন অধীর হয়ে চঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে না বসে। একটু ধৈর্য ধরে বক্তার শেষ কথাটি পর্যন্ত যেন তারা শোনে, এই অনুরোধ।

খৃষ্টানের জেমন বাইবেল, মুসলমানের তেমনি কোরাণ। তাতে এক জারগার আছে—‘অসভ্যচরণ’ কর, পাপ কর—নতপান ও ইন্ড্রিয়াসক্তিতে ডুবে যাও;—তাহলে তোমার সর্বনাশ বনিয়ে আসবে।’ একজন মুসলমান মদ খাচ্ছে আর যথেষ্ট ইন্ড্রিয়বৃত্তি চলিতার্থ করেছে দেখে একজন মোল্লা এসে তাকে উপদেশ দিতে গেলেন, বলেন, ‘ওরকম করলে কোরাণের আদেশ অমান্য করা হয়।’ মুসলমানটা তখন কোরাণ আঙড়িয়ে নলে, ‘দেখন,

কোরাণ বলছেন, খুব মদ খাও আর মজা লুটো। এটো তো কোরাণের আদেশ। মদ খেয়ে ব্যভিচার করতে তো শাস্তিই বলছে, আর বলবেই না কেন ?”

তখন পুরোহিত বললেন, “ভাই তুমি করছ কি ? এর পরের অংশটুকু পড়ে দেখ দেখি—লেখা আছে, ‘তাতে তোমার সর্বনাশ হবে।’ সেটুকু বাদ দিচ্ছ কেন ?” মাতাল জনাব দিল, “জগতে এমন কেউ নাট যে কোরাণের বাক্য অফরে অফরে পালন করতে পারে। আমি না হয় এইটুকুই পালন করলাম। শাস্ত্রের কথা কি সা মানা সম্ভব ? কেউ বা এতটুকু মানে, কেউ বা তার চেয়ে আর একটুকু বেশী মানে—এই যা তফাৎ। সবটা কেউ মানে না ; তবে আর আনি সাটুকু মানতে বাই কেন ? ওই বয়েদের প্রথম অংশটুকু মানতে পারলেই আমার যথেষ্ট হবে।”

রাম কেবল এই অমুরোধ করছেন, ওই মাতালের যুক্তিটা তোমরা দেখিওনা। সাটা স্তোত্র পড়তে হবে, তার পর একটা সিদ্ধান্ত করতে হবে, তার পূর্বে নয়।

রামের একটা সোণার ঘড়ি ছিল ; তার চেনের সঙ্গে নারী খেলনার মাঝে একটা খেলার ঘড়ি ছিল—আসলে, সেটা একখানা চুষক। ঘড়িটা চলত না, কিন্তু কাঁটাগুলি এধার-ওধার করে তাতে একটা বাজানো যেত। সে ঘড়িতে সব সময় বাজত এক, ঐষেতের অবকাশ নাই। তুমিই সেই এক—দেশ, কাল নিমিত্তের অতীত ; তারা তোমার শাসনাধীন, তুমি তাদের শাসনে নও ; তোমার কলনার চাকর তারা।—তুমি,

তিন সব মিথ্যা—এক সত্য, কালের বন্ধন হতে মুক্ত।

প্রশ্ন—দাম্পত্য-জীবনে কেউ সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করতে পারে কি ?

কেউ বলতে পার, এ প্রশ্ন এখন থাক, রামের নির্বীচিত-প্রসঙ্গেরই আলোচনা চলুক ; তার জবাবে বলছি, সব প্রশ্নই রামের নির্বীচিত। যদি এই বিষয়ের আলোচনাটাই শেষ পর্যন্ত শোন, তাহলে তোমাদের উপকারই হবে। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি চমকিয়ে দেওয়ার মত হলেও শেষ পর্যন্ত শোনতে হবে। এ দেশের ভাবের সঙ্গে হয়ত সেগুলো মিলবে না—তাতে রামের বয়ে গেল। রাম শ্রদ্ধা করেন শুধু তোমাদের !

এ প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত বলেন, “ওমুখ দেওয়া হয় রোগীকে, সুস্থ মানুষকে নয়।”

যারা সংসারে অতিনাত্রায় জড়িয়ে পড়েছে, আপদে-বিপদে মুসুড়ে গেছে, তাদেরই তো বেদান্ত বেশী দরকার। যে বিবাহিত হয়ে ধর্ম্মঃ দাম্পত্যজীবন যাপন করছে, সে যত সহজে বেদান্ত উপলব্ধি করতে পারে, অবি-বাহিত ব্যক্তি তত সহজে পারে না। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি অসাদৃশ্য হলে পারবে না। শিগগির পড়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সত্যিকার সম্বন্ধটা না-জানার দরুণ ভাবী ভুগতে হয়। এত গরজের, এত দরদের একটা চর্চা আমরা ছাড়ব কেন ? তবে এই বিবাহের আর এক দিক—বিবাহের আয়োজন নিয়ে—সম্প্রতি আমরা আলোচনা করবো না, এ নিয়ে আর এক দিন বলা যাবে।

“রামের বিবাহের পর ছোট বৎসরকাল স্বামী-

জীতে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন হবেছিলেন—এটা সত্য ঘটনা, বাগাড়ম্বর নয়।

বিবাহে অবনতি ঘটায় না ; তবে বিবাহিত জীবনে দুর্বলতাকে প্রাশ্রয় দিলে অনিষ্ট অবশ্যীভাবী। কতগুলি ভাব লোককে হীন করে দেয়, যথা ভয়, বিষয়াগ্ৰক্তি, রূপ-গ্রহ। “আমি দেহ, আমার জী দেহ” এই ভাবটাই তাতে প্রবল হয়—তখন পরস্পরকে আকৃড়ে ধরে দগ্ধলীষহ জন্মানার জন্য একটা দুঃস্বপ্ন আগ্রহ জন্মে যায়। যাদ দাম্পত্য-জীবনকে এই ভাবে পরিচালন করা হয়, তাহলে সিদ্ধি সুদূরপর্য্যন্ত।

পেনিলোপ একবার কাপড় বুনছে আর খুলছে, এমনি করে তার কাপড় বোনা শেষ হবে আর কবে ? যতটুকু লাভ হল, ততটুকু যে নিত্য খুঁইয়ে ফেলে, সে এভাবে কি করে ? বেদান্ত ঘোষণা করছেন, বীৰ্য্যবন্ত হও, প্রেমে অভিষিক্ত হও, প্রেম নামে পরিচিত কামের দীনতা ও কলুষ হতে মুক্ত হও, দোষাত্মক ছাড়িয়ে ওঠ। এই হচ্ছে কাপড়বোনার সংকেত। কিন্তু তার পরেই যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দেহটির দিকেই নজর দাও, তাহলে সব মাটি। তোমার উন্নতি হবে কি করে ? এতে কি প্রমাণ হয় যে মানুষ বিয়ে করবে না ? তা নয় ; কিন্তু বিবাহের প্রয়োগ করতে হবে অল্প রকম। বেদান্তের শিক্ষা অন্তর দিয়ে গ্রহণ কর। বিবাহকে আত্ম-উদ্বোধনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ কর—এ তোমার মস্ত বড় সাহায্য হবে। যা পথের বাধা ছিল, তা ওপরে উঠবার সিঁড়ি হ'বে। বিবাহ যখন ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব পরিণত হয়, তখন যতবার তোমরা ইন্দ্রিয়

চরিতার্থ কর, ততবার বন্ধন আরও দৃঢ় হয়—আরও অতুলে তোমরা তলিয়ে যাও।

প্রজ্ঞার নারীজাতির নিন্দা করে বলেন, নারী নরকের দ্বার। রাম কিন্তু তার বিপরীত মত পোষণ করেন। পকেটে একটা মদের বোতল পূরে (আপনানা বোতল দেখা যাচ্ছে) রাস্তায় চলতে চলতে একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করল, “মশায়, জেলখানার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারেন—একবার দেখতে যেতাম।” (গেল সম্ভ্রাহে রামও যেতে চেয়েছিলেন!) পাদ্রী হাতে ছিল একটা ছড়ি ; তাই দিয়ে বোতলটা দেখিয়ে বললেন, “ভাট, এতে তো পোজা রাস্তা রয়েছে—এই ধরে ঠিক পৌঁছে যাবে।” নারীর কথাও ঠিক এই সুরে বলা হয়। জগৎটা একটা কারাগার বটে ; বর্তমান দাম্পত্যজীবন ঠিক কারাবন্দনেই লোককে নিয়ে যায়। জী-পুরুষ যদি শুদ্ধ পরস্পরের অবনতি ঘটায়, তাহলে যে ভগবান শাস্ত্র লিখলেন, সেই ভগবানই পুরুষের বুকে এটা শাস্ত্র লিখলেন কেন যে সে নারীকে খোঁজে ? এটা একটা স্বত্বাবিবোধ নয় কি ? এ বন্ধনের মূলে একটা রহস্য আছে। অজ্ঞানই এই মিলন-কাজ্জিকাকে নরকের দ্বার করে তোলে। দোষ অজ্ঞানের, দাম্পত্য বন্ধনের নয়। কি করে এই দোষ মূর করতে হবে, সেই হচ্ছে সমস্যা।

ধর, এই একটা শূন্য রয়েছে। ওকে যদি দার্শনিকবিন্দুর ডাইনে বসায়, ওর মূল্য কমবে, যদি বাঁয়ে বসায়, বাড়বে। অবস্থানসম্পর্কে ওর মূল্য নিরূপণ হবে। তেমনি দাম্পত্য-জীবনেও তোমার মূল্য নির্ভর করছে অবস্থানের ওপর, তোমার ঐক্যের উপর ; নইলে তোমার নিজস্ব মূল্য কিছু নাই।

পুরুষ জীতে আনন্দ 'পায় কেন ? এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে, নইলে এ সমস্যার মীমাংসাহুঁকেনা। সুখের নিগড়ে বাঁধা পড়েই তো মানুষ দাস হয়েছে। দ্রোহান যুদ্ধ তার উদারগণস্থল। এর দরুণই একটা মেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আর একটা করে না। সুখ যে জীবের নিকট হতে পাওয়া যায়, এ ধারণাটা ভুল। এর মাঝে যে জ্বায়েই ফাঁকী রয়েছে, সেটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। জীতে বা জীবের দেহে কোনও সুখ নাই।

প্রাতির বিষয়ে যদি সমস্ত সুখ নিহিত না থাকে, তাহলে স্বামী জী পরম্পরের কাছে সর্বদাই আনন্দের নিদান হবে কি ? আমরা জানি, এ কথা ঠিক নয়। সুখটুকু লুটে নিজে, তার পর তোমার অবস্থা কি হয় ? তখন আর সুখের মাদকতা থাকে না। পুরুষ যখন নিকর্ষীয়, তখন কি জী সুখের পনি ? জী যখন রুগ্না বা অসতী, বা তুমি যখন পীড়িত, তখন সে জীতে সুখ থাকে না। এখানে দুটা বস্তু পাই—বৈত রয়েছে এখানে। দ্বৈত যদি না থাকে, তাহলেই পূর্ণ মিলন, শুধু দেহে নয়, দেহে—মনে—আত্মাতে। তার পর এমন একটা অস্বা অসে, যা নাকি মুখে বাস্তব করা যায় না। দেহ তখন দেহ নয়, জগৎ জগৎ নয়। মিলন তখন স্বর্গ, অভয়, মুক্তি ! কেননা সেখানে বৈত নাই—আছে ঐক্য, অবিভাভ। জগতের শালয় সেখানে—দেহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। ভ্রান্তি আর তখন থাকে না। আমিও দেহ নই—জীও নয় ; আমরা দেহ-মনের অতীত, জগতের উদ্ধে। এই তো 'সিদ্ধি'। বেদান্ত বলেন, তোমরা তখন শক্তি ও আনন্দের প্রতীক, কেননা তোমাদের

আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ এই মিলনে ; বিদ্যাতের ধন ও ঋণ প্রান্তের মত আত্মার দুটা বিভাব মিলনে এক হয়েছে আর সেই সন্ধিস্থলে বিদ্যাতের আলোর মত আলো ফুটে উঠেছে। বিদ্যাতের পূর্ণ আবর্তন ঘটেছে, দুটা পাক এক হয়েছে—তাইতেই আদিম সহজানন্দময় স্থিতি লাভ হয়েছে। অভয়-আনন্দ স্বজনীশক্তি, ব্রহ্ম-সত্তা—এই তো আত্মার সত্ত্ব। শুধু তখনই বলা চলে, “এই মানুষই নরদেহে ভগবান্।” স্বামী ও জী যখন এই মূল তত্ত্বে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন জগৎও সেই রসে বিভাবিত হয়—আত্মা তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম এ সব চর্ছে চাউলের মত, মৃত্যুকেই তার পাক এবং পূর্ণতা। আত্মা এ সমস্তই গ্রাস করেন, কেননা সৃষ্টিশক্তি তাঁর।

আবার অল্প দিক দিয়ে বেদান্ত বলছেন, যে অজ্ঞ, সেই বাইর দেখে মজে, অসত্যকে আশ্রয় করে আত্মাকে অবহেলা করে—ভাবে শুধু বাইরের খোসাটা !

বনের মাঝে একজনে একটা বই দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছে ; বিদ্যৎ চমকালো ; বোকার মত সে ভাবল, ওই বইখানাতে বিদ্যৎ হয়েছে। অল্প রকম বুঝলে সে বুঝবে না—বই আর তার পরেই বিদ্যৎ, দুটোকে সে কার্য্যকারণের সম্বন্ধে এক করেছে। তেমনি মানুষ মিলনে সুখ পাক রাখে, কিন্তু জানে না সে সুখের মূল জীও নয়, পুরুষও নয়—ভাগবতী সত্তাই তার মূল। মানুষ ভাবে তার মূল বুঝি মানুষ !

এই ব্যাপার হতে কি বোঝ ? এটুকু দৃঢ় ধারণা করতে হবে, বিষয় হইত, ইঞ্জিন-

পরতা হতে মন যখন নির্মুক্ত, তখনই সে সুখ  
আস্বাদন করতে পারে ; সে সুখানুভূতি  
একটা প্রচণ্ড শক্তি—আত্মার স্বরূপ। নীচের  
মনটা তখন মরে যায়, তার ঐলাকার  
চোকবারও তো কোনও প্রয়োজন থাকে না।  
ভাগ্যবতী সন্তার প্রকাশই এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-  
নক্ষত্র। সে সমস্ত অনন্তশক্তি-স্বরূপ, দেশ-  
কাল-নিমিত্তের অতীত—মহাসমুদ্রাৎ ; বিষয়  
ভাতে কেণ তরঙ্গ বৃদ্ধদের মত—শৌণিক-  
তরঙ্গের নিচিহ্ন পতীক ত্যাগ। তোমার দেহ  
এই তরঙ্গের মত। সমস্তই জলের ভেদ।  
নদীর দিকে তাকিয়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে  
ডেকে বলছে, “দাদা, দেখ, কত বড় চেউ  
আসছে !” মুগে ওটা জল, কিন্তু তার অভিনব-  
প্রকাশের ওপর জোর দিয়ে বলা হচ্ছে—  
“আমি চেউ দেখাবো—নদী নয় !” তেমনি  
এখানেও সমস্ত একমাত্র ভগবান্ অসীম  
মানস-সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য দেহপিণ্ডের বীচিভঙ্গ।  
তুমি-আমি স্বষ্টি—তা থেকে মানুষ আনলে  
বহু। বৈচিত্র্য বহু—দেহে দেহে সম্ভব  
—একটা চেউ আর একটা চেউএব ওপর  
আছড়ে পড়ছে। বস্তুর মধ্যে বস্তুর সংঘাতে  
আনন্দ নয়, আনন্দ আত্মাতে। চেউ ভাঙলেই  
জল, তেমনি বস্তু ভাঙলেই আত্মা। বেদান্তী  
শিক্ষকে সোণা চেনাবেন ; একটা আংটা  
দিয়ে বললেন, “এই সোণা।” শিশু বলে,  
“গোল আকারটা ঐশাণ ?” না। “রংটা  
সোণা ?” না। “চাকচিক্য সোণা ?” না।  
কি করে তোমার বোঝাব ? আর একটা  
সোণার জিনিস দেখানো হল—শেষে স্বর্ণর  
অবচ্ছিন্ন হল—ছেলে বুঝতে পারল। বৈচিত্র্য  
হতে ধর্ম্মীর ঐক্য জীবনে গঁথে নাও।

বাদশাকে বীররাজ জিজ্ঞাসা করলেন,  
চোখওয়ালা লোক বেশী না কাণা বেশী ?  
তর্ক হল অনেক, শেষে স্থির হল, পরখ কবতে  
হবে। বাদশা ভাবলেন, কাণাই কম।  
একটুকুরা কাপড় নিয়ে মাথায় জড়িয়ে  
জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ? উত্তর হল,  
পাগড়ী। কাঁধে ফেলে বলেন, এটা কি ?  
জবাব হল, খাল। কোমরে জড়িয়ে বলেন,  
এবার ? জবাব হল, ধুতি। বাদশা বলে,  
উঠলেন, “সব দেখছি কাণা ! ও সব কিছু  
না—ও যে কাপড় !”, নানরূপের আড়ালে  
কাপড়খানাট লুকিয়েছিল।

“আত্মানং বিদ্ধি।” সোণা চিন্তে ভাঙতে  
হবে না। ঘট-পট স্ত্রী-পুরুষ সব ভাবছ—কিন্তু  
পেছনে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁর কথা ভাবছ  
না।

বলো না যে বিবাহ ধর্ম্মবিরোধী। সুখের  
প্রকৃত স্বরূপ কি, তা চেন ; বোঝ, আত্মা  
কি। শিদ্ধি যদি চাও, যথার্থ আনন্দ যা,  
মৌলিক তত্ত্ব যা, তারই ভাবনা কর। ভেদ  
ভুলে যাও—বন্ধন খসে যাক—সত্য মঞ্চে  
যাও।

ওম্—এই আমার স্বরূপ ! পরখ চাই।  
এই কি স্বরূপ ? আমি কি এই ? তাই যদি  
হয়, জগৎ একটা তরঙ্গমাত্র, তার পেছনে  
ছোট কেন ? বিদ্যুতের আলো সূর্য্য ফোটে  
না। আধারে বিদ্যুৎ চমকায়, আলো দেখা  
দেয়। সূর্য্যের মাঝে যাও—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ক্ষুদ্র  
প্রাণীপ নিস্ত্রভ হয়ে যাবে। গালাগাল করা  
ঠিক নয়। ডিঙ্গিয়ে না যেতে পারলে ওকে  
চাপা যায় না—তাই বলি ভাই, আসক্তির  
মোহ ছাড়িয়ে ওঠ !

জগৎ একটা উল্লেখ্য। আর উল্লেখ্যের দরকার নাই। তার চক্ষে পাপের মূল; আত্মজ্ঞানে ভয় দূর হয়। শুদ্ধ হও—অন্ত ধর্মপ্রচার বৃথা।

স্বভাবের পথে বিজ্ঞানের মতে চল ভারতবর্ষে স্ত্রী স্বামীকে বাধা দেয় না, এগিয়ে দেয়।

সিদ্ধিলাভের পর রাম আরও দুই-বৎসর ঘরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও বেদান্তের উপদেশ পেলেন—ধূপ দীপ ফুল জল নিয়ে আসতেন, আত্মধ্যানে ডুবে যেতেন। রামের সম্মুখে পূজোপকরণ নিয়ে জাহ্নু পেতে বসতেন, রামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত, তাঁর দেহ যেন নিগ্রহ, রামে আত্মার ভাবনা করে আত্মাতে ভগবদর্শন করতেন, এটো ভাব চড়িয়ে গড়ত, পরম্পর পরম্পরের মাঝে ব্রহ্ম-

দর্শন করতেন, পরম্পর পরম্পরকে আশ্রয় করে সিদ্ধ হলেন। রাম তাঁর জীবনখানি তুলে ধরলেন। কিছু কাল এটো ভাবে গেল। মাসের পর আস কেটে গেল, বিষয় চিন্তা মোটেই মনে আসত না, কামজয় হয়ে গিয়েছিল, পরম্পর পরম্পরকে বুঝতেন—তাঁই ব্রহ্মনেই মুক্ত। স্বামী স্ত্রী সংস্কার মুছে গেল, বাঁধন রইল না। তিনিও ভাবতেন না—এই স্বামী, রামও ভাবতেন না—এ স্ত্রী। তাদের সঙ্গীর্ণতা আর অধিকারবোধ থেকে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি। স্বার্থে স্বার্থে তখন সংঘাত—ফলে বিবাহিত জীবনের বাধা-বিপত্তি। বেদান্ত উপলব্ধি করে ও হতে মুক্ত হও! সম্মান-সম্মতিকে মুক্ত কর। মানুষ্যের দ্বারে হানি হয় না। জগৎ তখন নন্দন। ভগবান কখনও মেকীতে ছোলে ন। ওম্—ওম্—ওম্!



## বুদ্ধির মরণ

কথায় বলে, অনেক দল্লাসীতে গার্জন নষ্ট। আমাদের বুদ্ধিরও সেরে দশ। বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র সংস্কার, বিচিত্র কামনা—তাই বুদ্ধিও বিচিত্র। বৈচিত্র্যের মূলে যে এক, দেখে, তাকেই বলি সমজদার। তেমনি বিচিত্র-বুদ্ধিকেও যে একটাই গুটাইয়া আনিতে পারি মাছে, অধ্যাত্মজগতে সেই বাহ্যদর।

বুদ্ধিকে একমুখী করা অর্থে তাহাকে

মারিয়া ফেলা। তোমার আমার বুদ্ধি তো খণ্ড-বুদ্ধি—তাই তোমার মূলে আমার মিল নাই। অথচ মূলে এক বীজন্তি হইতেই সবার বুদ্ধি প্রেরণী পাইতেছে, বিশ্বাস করি। শুধু বিশ্বাস করা কেন, চোখের সামনে প্রতিদিনকার খুঁটিনাটিতে তাই তো দেখিতে পাইতেছি। যেমন জড়ের কতকগুলি আইন আছে—খুঁজিয়া বসিয়া নিতে পারলেই

তাহার অভ্যাস হঠাৎ বাঁচিয়া যাউ, তেমনি মনোরাঞ্জনেরও কতকগুলি আইন আছে। স্বপ্ন হইলেও সেগুলি জড়ের কায়দাতেই চলে। তবে বৈচিত্র্য হয় কোথা হঠাৎ? জড়ে যেমন উপাদান-মিশ্রণের তাৎকালিক বৈচিত্র্যের উদ্ভব, মনেও তেমনি স্বাভাবিকভাবে বৈচিত্র্য কুটিয়া উঠে। এই হিসাবে সমস্ত জড়ের মূলে যেমন এক স্বীকার করি, তেমনি সমস্ত বুদ্ধির মূলেও এক স্বীকার করিতে তো কোনও বাধা নাই।

এখন বহুস্ত এই, বুদ্ধিকে এক স্বীকার করিব, বুদ্ধি দিয়াই। জড় যখন বুদ্ধির বিষয় হয়, তখন নিচায়ে বড় বেশী বাধে না—কেননা বুদ্ধি ও জড় পৃথক, এ সংস্কার আমাদের পূর্বা-পন্ন থাকে। কিন্তু যখন বুদ্ধিকে অখণ্ড বুদ্ধির সামনে দাঁড় করাইলে তাহার আর খণ্ডতা থাকে না—যেমন অক্ষরকার ঘব হঠাৎ পদী-পকে বাহিরে সূর্য্যের আলোতে আনিলে তাহার আর দীপনী শক্তি থাকে না। পদী-পের এই মরণকে তাহার মুগ্ধ আপারের দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হইবে, এ যে বিনাশ, অতএব ভয়ানক। কিন্তু শিখাব দিক দিয়া বিচার করিলে বুদ্ধি, এ তো তার জ্যোতিঃই উৎকর্ষ।

জীবজন্তুর মায়া কাটানো এই জন্ত মা-যের পক্ষে বড় কঠিন। তাই দেখি, ধুবুড়ার দার্শনিকরাও অষ্টেব্রাদকে ভয় করিয়া চলেন। আচার্য্য গৌড়পান বলিয়াছিলেন, দেহের সত্তা ধরিতা যেখানে টান পড়ে, সেখানে ভয় হইবে, এ তো স্বাভাবিক, কেননা ভয় দেহেরই আছে। কিন্তু দেহের ভয় না আমার ভয়, এটাই বুঝিতে পারাট তো একটা মহাসমস্যা। দেহ আর আমি,

হইটাই যে পৃথক—এ বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে? হেঁয়ালী করিয়া বলিতে হয়, বুদ্ধির মরণ হইলেই এই বুদ্ধি আসিবে অর্থাৎ দেহ-বুদ্ধি গেলে তবে আত্ম-বুদ্ধি আসিবে।

কি করিয়া আসিবে, সে নিতান্ত চিরকাল চালাই আসিয়াছে। সার্বজনন্য যে কত আবিষ্কার হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সমস্ত পণ্ডের মূলেই একটা ফাঁকী আছে—বিজ্ঞাপনের মোহে মানুষ সেটা খেয়াল করে না; কাজেই আসল ছাড়িয়া নকলে মজে। বটেরের বাজারে বিজ্ঞাপন বাড়ির হয়, বিদেশীভাষা শিখাইবার নূতন কায়দা বাহির হইয়াছে—এটাবার আর মাষ্টারের সাহায্য নিতে হইবে না, বরং বসিয়াই শেখা চলিবে। বুট কিনিয়া আনিয়া দেখিও, কেহ বা সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, কেহ বা সংক্ষিপ্ত অভিধান দিয়া পৃষ্ঠা বোঝাই করিয়াছেন। যিনি ঘাই করুন না কেন, সহজেই বা সাহায্যার্থে শিখাই-বার সংকল্পটা মাথা কুটিয়াও কেহ শিখাইতে পারিতেছেন না। সেটা কিন্তু নির্ভর করিতেছে যে শিখিবে, তাহার উপর।

অধ্যায়-জগতেও শোনা যায়, অমুকটা 'সোজা ধর্ম', অমুকটা এই যুগের ধর্ম। কিন্তু মানুষ দিয়া যাচাই করিলে শেষ পর্য্যন্ত কোন-টাই উত্তরিয়া যায় বলিয়া তো মনে হয় না। তলে যে মানুষ মানানারি করিয়া মরে কিসের জন্ত, তা বোঝা কঠিন। ওটুকু বুদ্ধির কারসাজি। ওকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে এত গুণগোল থাকিত না।

সহজ দৃষ্টান্ত দেখি—সময় না হইলে ফল থাকে না। জাঁক দিয়া কলা পীকান্ধে যায়, কীলাটয়া কাঁঠাল, পাকানো ঘাস, কিন্তু সেটা



মানুষের বুদ্ধির ফের। হঠি রসভোগে সেট  
তো ঠেকে। এই যে সময়ে সব হয়, এটা  
একটা মস্ত ভরসার কথা, ভয়েরও কথা বটে।  
কেউ বলবে, ঈশ্বরে যদি হয়, তবে আর এখন  
তাড়াহুড়া কেন? এ'ও বুদ্ধির বালাই।  
বল, তাড়াহুড়া কি তুমি খেয়ালখুশীতে কব,  
'না তোমার ঘাড় ধরিয়া কেউ করাটয়া নেয়?  
অর্জুন বলিয়াছিলেন, ভগবান্, এক কথায়  
তোমার, আমার আর জগতের শাস্তি করিয়া  
দিতেছি। আমি যুদ্ধ করিব না। ভগবান্  
হাসিয়া বলিয়াছিলেন, নৃদ্ধ-বুদ্ধি ছাড়িতে চাও,  
বটে, কিন্তু ওটাই একটা কুবুদ্ধি। তুমি করিবে  
না, তোমার ঘাড়ের করিবে। তার চাইতে মানে  
মানে করা ভাল। আবার যদি বল, अच्छা,  
আমিই করিতেছি, আমিই করিব; সেও ভাঙ্গ  
কথা নয়—তুমিই বা করিবার কে?

এই তো দেখি মহাসমস্তা। কিছু করিব,  
এ বলাও বিপদ—কেননা ফল পরের হাতে।  
করিব না—এ বলাও বিপদ। হয়ত কথা  
রাখিতে পারিব না। এ জায়গায় কি করা  
যায়? বাধ্য হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে  
হয়, হরি, তোমার যা উচ্ছা, করাটতে হয়  
করাও, না করাটতে হয় না করাও। এই  
হটল বুদ্ধির মরণ।

কথাটা বলা সোজা। কিন্তু পাকিতে  
বহুদিন লাগে। দুই কাজেতে সমান রাজী,  
এ কি সোজা বীরত্বের কথা? একেবারে  
খাঁটা মিলিটারী শিক্ষা চাই। বসিয়া আছি  
তো 'আছট, আর যদিই বা বিউগল বাজিয়া  
উঠিল, অমনি আর মাথা চুলকাইবার ফুরস্ত  
থাকিবে না—একেবারে মরণের বৃকে, কাঁপা-  
ইয়া পড়িতে হইবে।

এইবার সমর্পণের কথা বলি। বাস্তবিক,  
যে মরিতে ভয় পায়, সে সমর্পণ করিতে শিখে,

নাহি, উদাসীনও বনিতে পারে নাহি। হাল  
ছাড়িয়া বসিয়া থাকার উপদেশকে কুঁড়েমির  
প্রশ্রয় বলিয়া হয়ত কেহ মনে করে। কিন্তু  
সব ছাড়ার শেষ অর্থটা যে মরণ, এ কথা  
মনে রাখিতে হইবে। শাস্তির পণটা এই  
মরণের ভিতর দিয়াই। দেহের মরণ, ঈশ্রিয়ের  
মরণ, বুদ্ধির মরণ—জীবনের মরণ; এই হটল  
রসায়ন বা শিষায়ন। মরণের জন্ত তৈরী  
হওয়াটাই জীবনের যথার্থ সাধনা।

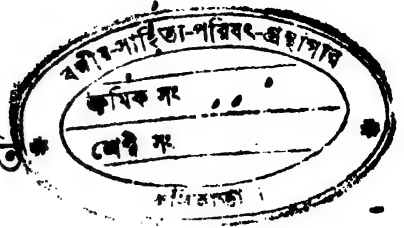
যে মরিতে ভয় পায়, ধর্মের বড়াই করা  
তাগ যাজ্ঞে না। সাধু অসাধু, বৈদাম্বিক  
অবৈদাম্বিক এক আঁচড়ে চেনা যায়। মৃত্যুভয়  
থাকিলে চলিবে না। তাগ জন্তই সংখম,  
তিষ্ঠা, উপরতি।

মরণে যে আনন্দ আছে, সে খে না মরি-  
য়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। যেমন নিদ্রায়  
নিশ্রাম এক সময় নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া  
পড়ে, তখন হাজার ভোগেও জাগিয়া, পাকাটা  
অসহন হইয়া উঠে, তেমনি এক সময় মরণের  
জন্তও জীবন আকুল হইয়া উঠে। মরণের  
বাকীর ডাক যে শুনিয়াছে, সেট জানে, জীব-  
নের সুর সে বাঁধিতে যেমন করিয়া পাঞ্জে,  
এমন আর কিছুতে নয়।

মরণ সত্য, প্রাণ সত্য। বলিতেছি না  
যে বৈচিত্র্য অনাবশ্যক। জীবনের বৈচিত্র্য  
যখন মরণের কোলে ফুটিয়া উঠে, তখনই  
মুক্তি, তখনই আনন্দ—এই আদর্শকে সার  
করিয়া থাক। কিছু-না'ইর বৃকেই সব-কিছু।  
বাস। আজ আকাশের বিরাট শূন্যতা না  
থাকিলে গ্রহ-নক্ষত্রের ফুলশয্যা বিছানো  
হইত কোথায়? মরণই অবৈত, জীবন বহু।  
মরণকে লক্ষ্য করিয়াই খাষি বলিডেছেন  
—“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।” আমাদের  
বুদ্ধিকে ‘মহাকাল’ একের দিকে—টারই  
কোলে টানিয়া নিতেছেন।

## শ্রুতি-স্মৃতি

— ৫৫ —



যোগের দ্বারা যে সমাধি হয়, তাতে একটা ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র জ্ঞান হতে পারে। বেদান্তের জ্ঞানই প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব। বেদান্তের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার পর সমাধি আনবার চেষ্টা করলে যথার্থ স্বরূপজ্ঞান বা পূর্ণ সমাধি হয়ে থাকে। বেদান্ত বেদের অন্ত, সমস্ত জ্ঞানের চরম অবস্থা বেদান্ত। জাগতিক বস্তু হতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করলে আমির অনুভব থাকে; তাকে ধরে, বিচারের পথে বেদান্তের দিকে অগ্রসর হতে হয়।

\*

প্রতিষ্ঠা বড় খারাপ জিনিষ—অজ্ঞাতসারে তা সাধকের মাঝে সংক্রামিত হয়। এমন কি, তাতে ত্যাগ-বৈরাগ্যযুক্ত সাধকের পর্যাপ্ত পতন ঘটায়। ক্রমাগত লোকের কাছে সাধুর সম্মান পেতে পেতে মন ঐ দিকে ঝুঁকি পড়ে। তখন সে সম্মান স্বাভাবিক কাছ থেকে দাবী করে, সম্মান না পেলে বিকার হয়। ভগবানে দাস্তাবে আত্মসমর্পণ না করলে আর অহংনাশের উপায় নাই। তাঁতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তিনি যখন থাকে দিয়ে যা করিয়ে, মনে ইচ্ছা করবেন, তাই করবেন, সুতরাং জীবের অহঙ্কারের কিছুই নাই, কিবা হয় উপদেশ বলেও তা কিছুই নাই।

\*

সমস্ত নারীদেহই জগৎজননীর আধার। আধারকে কখনও ভালবাসতে নাই। কেন্দ্রী-

ভূত সমষ্টি মায়ের রূপা পেলেই বাড়ি আধারেও তাঁর রূপা ও আনন্দের অনুভূতি হয়। কিন্তু ব্যুৎপত্তিও সেই সমষ্টিকেই দেখতে হবে।

\*

ভগবান্ জীবকে সর্বদাই পরীক্ষা করেন, দেখেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও বস্তুতে ওর আকর্ষণ হয় কি না। যদি বাজে জিনিষে তুলিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আর নিজেকে দেন নী। সহজে তিনি ধরা দিতে চান না। যদি সাধক কোনও প্রলোভনেই মুগ্ধ না হয়, তাহলে অগত্যা ভগবান্ নিজে এসে সামনে দাঁড়ান। যার যে জায়গার হৃদয়লতা আছে, তিনি এসে সেই জায়গাটাতেই আগে ধরেন। সাধুগিরির ভাব কি জগতে প্রশংসা ও বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ভাব সাধন-পথের দিম্বম অন্তরায়। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি রেখে এই সমস্ত প্রলোভন হতে দূরে থাকতে হবে। যে অপরকে বঞ্চনা করে, তারও বরং উপায় থাকতে পারে, কিন্তু যে নিজেকে প্রতারণা করে, সেই আত্মপ্রতারকের আর উপায় নাই। এই জন্য সাধককে সর্বদাই প্রলোভন থেকে দূরে থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

\*

তুমি কার থেকে বড়ও নও, কিবা কার থেকে ছোটও নও। তুমি আত্মানন্দে থাক, নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাক। সুখ-দুঃখ সংসারের দ্বাত-প্রতিদ্বাত, সদস্য এ সমস্ত আসবে আবার চলে যাবে, তাদের সঙ্গে

নিজকে কখনও জড়িয়ে ফেলো'না। এ জগতে তোমার হেয়ও কিছু নাই—উপাদেয়ও কিছু নাই। সর্বত্র সমদর্শন কর।

\*

সগুণ মা, নিগুণ বাবা। সগুণ-নিগুণের মিলনাত্মক ভাবই আমি বা ব্রহ্ম। হরগৌরীর যুগলমিলন জ্ঞানের সমন্বয়। গৌরী সগুণ—মহাশক্তি, হর নিগুণ—প্রেমের ভাব। হরগৌরীর ভাবে বেদান্তের সহিত সামঞ্জস্য আছে—এ ভাব অনাদি-সিদ্ধ। তার পরেই রাধাকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দরূপী মা-ই কৃষ্ণ, মাংসে হলাদিনী শক্তিই রাধা। জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে এই সমস্ত মূর্তির আরাধনা না করলে, সে সব সংস্কার সত্য জগতে দূর করা কঠিন। ইষ্ট-মূর্তিতে ভাব মিশিয়ে নিলে আর কোনও ভয় নাই।

\*

নিরালাষ নিকীৰ্ককল্প অবস্থায় প্রকৃত সত্য অর্থাৎ বেদান্তজ্ঞান আপনি লাভ হয়। জীব-কোটা সে সমাধির পর ফিরে না। জীব-কোটা সঙ্কল্প থাকলে ফিরে। ভক্ত যদি জ্ঞানীকে বলেন, আমি দ্বিভূজ মুরলীধর দেখেছি, জ্ঞানী বলবেন, তুমি তোমার মনকেই দেখেছ, কিছা ব্রহ্মকে তোমার মনের আবরণে আব-রিত করে দেখেছ, প্রকৃত সত্য দেখতে পাও নি।

\*

কর্ম দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বর লাভ করা কিছা কোনও সিদ্ধি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সিদ্ধি পাওয়া আর তাঁকে পাওয়া এক কথ্য নয়। তাঁর রূপ

ছাড়া তাঁকে কেউ পেতে পারে না বা জানতে পারে না, তিনিই কেবল তাঁকে জানেন।

\*

যে শক্তি ব্রহ্ম হতে বিকারের দিকে নিয়ে যায়, তাই বহিরঙ্গ শক্তি বা মায়া; আর যে শক্তি ব্রহ্মের দিকে অর্থাৎ নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়, তাই অন্তরঙ্গ শক্তি বা যোগমায়া। \*এই দুই শক্তির খেলাতেই সৃষ্টি এবং প্রলয় হচ্ছে। জীবের স্বাস-প্রশ্বাসেও এই খেলা।

\*

একই আত্মা গুণভেদে জীবাত্মা ও পর-মাত্মা উপাধি লাভ করেন। আত্মা ত্রিগুণ দিয়ে যখন ইচ্ছামত কাজ করান, তখন তিনি পরমাত্মা, আর যখন গুণের সঙ্গে নেমে এসে গুণ দ্বারা পরিচালিত হন, তখনই তিনি আত্মা।

\*

ভুলোক ছাড়া অত্ৰ কোনও লোক থেকে মুক্তি হয় না। অত্ৰ লোকে কেবল সেই লোকেরই জ্ঞান হতে পারে। এক ব্রহ্মাণ্ডের কতী ব্রহ্মাণ্ডও অত্ৰ ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জ্ঞান নাই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোকের ওপরের চারি লোকে থাকলে মুক্তির দেবী হয়, কারণ সে সমস্ত লোকে উচ্চ ভোগে আসক্ত থাকলে এই লোকের কত যুগ যুগান্তর ধৈ অতীত হয়ে যাবে, কত জন যে মুক্তি লাভ করবে, তার সীমাসংখ্যা নাই। অত্ৰ উচ্চলোকবাসী সাধক তা জানতেই পারবে না।

\*

নামজপ খুব প্রয়োজন। সাধনামাত্রই মূলে জপ। ধ্যানে স্থূলজ্ঞান গেলেই নিজের সংস্কার জোড়ে ওঠে, ধ্যানের মূর্তি আর থাকে

না। স্তত্রাং জপের স্তত্র ধরা না থাকলে সামঞ্জস্য দেখে মোহিত হবেন। বোঝা যাক ধ্যানে সফলতা আসবে না। তাঁর নামরূপ আর না যাক, জগতে কিছুই নষ্ট হয় না।

\*

\*

বৈষ্ণবের ভাবের সাধনগুলি খাঁটি বেদা-স্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সখীভাবের যারা সাধন করে, তারা ক্রমে সখীতে মিশে যায়—তখন তাদের সগুণ-নিগুণ ব্রহ্মাত্মক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন হয়। সখীই বেদা-স্ত্রের সাক্ষী চেতা—কেবল নিগুণ নয়। সখীভাবে গাফিলতরূপে থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দেখা যায়।

\*

কোনও কোনও জ্ঞানপন্থীর মত এই যে নির্বিকল্প-সমাধিতে জগতের জ্ঞান থাকে না—জগৎ দেখা যায় না। কিন্তু এ মত ঠিক নয়। তাহলে নির্বিকল্প-সমাধিতে জ্ঞানীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও মুক্তি হয়ে যাবে—জগৎও সেই জ্ঞানীতে লয় হয়ে যাবে। যদি জ্ঞানীর সত্যদর্শনও সত্য হয়, আবার ব্রহ্মময় জগৎও সত্য হয়, তবে সত্যদর্শনে এই জগতের সত্যও বা জ্ঞানী কেন দেখবেন না? যদি না দেখেন, তাহলে বুঝতে হবে, ঠিক নির্বিকল্প-সমাধি হয় নি।

\*

এ জীবনে যত কিছু শিক্ষা বা উপদেশ পেয়েছ, তার কিছুই বুঝা নয়। যখন আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চস্তরে উঠবে, তখন ওই সব শিক্ষা ও উপদেশ আপনা হুতে ফুটে উঠবে। পূর্বে যা ধারণা করতে পারনি, তার অপূর্ণ

এ জগতে সবাই স্বার্থপর—সবাই সুখ চায়—ঠিক ভগবানকে চায় না। ভগবানকে চাই—এ মিথ্যা বাচালতা। যারা গোপাল কি কিশোরমূর্তি চায়, তারাও তাদের মনমত, সংস্কারমত—সুন্দর দেখে তাঁকে চায়। ভগবানের শরীরে যদি সজ্জার মত কাঁটা তত, বিশাল দাঁত থাকত, তাহলে এরূপ মূর্তিকে ভক্ত আলিঙ্গন করত?—না, তা কেউ চায় না—সবাই নিজের মনমত সুখের জিনিষই চায়।

\*

বাংলার কৃষ্ণ, বঙ্গের কৃষ্ণ—আর মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্তি বিচার করলে দেখা যায়, প্রত্যেকে নিজের সংস্কারানুসৃত মূর্তি গড়ে নিয়েছে। মাদ্রাজের ওই সব দিকে গহনার খুব প্রচলন, কাজেই তারা কৃষ্ণকে গহনার ওত চাপ দিয়েছে। কৃষ্ণ তাদের মনমত হয়ে না আসলে তারা তাঁকে হয়ত চিনতেই পারবে না। কাজেই ঠিক-ঠিক ভাবে না ধরলে সত্য-দর্শন হয় না।

\*

ভগবৎদর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয় যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দেখতে পায় মাত্র। তার বেশী সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। (ক্রমশঃ)



## “যচ্চ কামসুখং লোকে !”

—:~:—

যতক্ষণ দেহ-বোধ, ততক্ষণই কাম। কাম দেহেরই ধর্ম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বল-ছেন—ওটা দেহের সনাতন ধর্ম। সে কথা বিশ্বাস করতে পারি না—কেননা দেহধর্মের একটা উন্নত সংস্করণও আছে দেখেছি। সে যাক, মোটের ওপর কাম রয়েছে দেহের একটা পরিণতিকে আঁকড়ে ধরে। তাই কামদমনের পক্ষে দেহের চর্চা করা সকলের আগে প্রয়োজন।

পাঁতঞ্জল বলছেন, শৌচের কথা। “শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা, পবৈরসঙ্গঃ” —শৌচ অনুষ্ঠানে নিজের দেহের প্রতি যত্ন হয়, পরের সঙ্গ করতেও প্রবৃত্তি হয় না। এই ভাবটা ঠিক প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজেকে দেহ থেকে কতকটা আলাদা বলে ধারণা করতে হবে। ভাব অনুশীলনের যুক্তি এই—দেহটাকে সর্বক্ষণ পরিষ্কার না রাখলে যখন মুহূর্তেই এটা ক্লদাস্ত হয়ে ওঠে, তখন আর এর প্রতি এত মমতা কেন! এটা হল প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু দেহশৌচের একটা উৎকর্ষও আছে। শৌচের ফলে মালিন্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরতি জন্মায়—নোংরা জিনিস ঘাঁটতে আদ-পেই ইচ্ছা হয় না। স্নায়ুতন্তুগুলি এত সূক্ষ্ম হওয়ায় মলিন জিনিসের অন্ততাসারে স্পর্শ ঘটলেও দেহ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। এটা অবস্থাতেই পরের দেহের সঙ্গ জড়ায় বলে মনে হয়। কাম দমন তখন স্বাভাবিক হয়।

কিন্তু মনের কামকে তো মারা চাই, অবশ্য দেহ-মনে নিবিড় সম্পর্ক। দেহ যখন

মরে আসবে, মনও তখন মুমূর্ষু হবে। তবুও কোথা থেকে সংস্কার উকি দেয়। এই জ্ঞান দেহের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মনের সাধনাটাও জুড়ে নিতে হয়; তাহলে কাজ পাকা হয়। মনের দিক দিয়ে কামদমনের পস্থা বলছেন, বেদান্ত।

দেহাত্মাভিমানই যখন কাম, তখন কাম দমন করতে হলে খুব তেজের সঙ্গে ভাবতে হবে, আমি দেহ নই! যেমন উকন না পেলে আগুন জলে না, তেমনি দেহের আশ্রয় না পেলে কাম কখনও উদ্দীপ্ত হতে পারে না। এ জ্ঞান লোকে বলে, শাস্ত্রেও বলে, সঙ্গবর্জন করতে, অর্থাৎ পরের দেহ এড়িয়ে চলতে। সে তো ভাল কথা; কিন্তু যে পর্যাস্ত নিজের দেহটা না এড়াতে পারবে, সে পর্যাস্ত পরের দেহ এড়িয়েও ফল হবে না। নিজেকে না হটিয়ে পরকে হটিয়ে রাখা সাফ করার মাঝে অনেক পিপদ আছে।

আমি দেহ নই—খুব তেজের সঙ্গে এ কথাটা বার বার আঙড়াও দেখি, কাম কোথায় থাকে! কাম তো নারীদেহে বা নুরের দেহে নয়—কাম যে তোমার নিজের মাঝে। কামুক নারীর প্রতি লোলুপ; সাধু-স্বস্ত তার নিন্দা করেন। ক্রমে একটা কথা হয়, নারীর সৌন্দর্যই কাল। তখন বৈরাগী চিত্রকরের দল এসে হাজির হন, আর নারী-দেহের সমস্ত সৌন্দর্য খসিয়ে তার কঙ্কাল বের করে খুঁচি হয়ে ওঠেন। পরলোকের বেত্রাবাতের ভয়ে শুক সংযমীর দল যথাসাধ্য

সেই কঙ্কালের ধ্যান করে, আর মনের কোণে আপশোষ পুষে রাখে। কেউ বা হয়ত মুখ ফুটে আপশোষের কথাটা বলেও ফেলে। অমনি সাধুর সমাজে তার ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মের জগতে এমনি করে পরকে ধরে সংযমের উপদেশ চিরকাল চলে আসছে। কিন্তু আগল গলদ যে নিজের মাঝে, সে কথাটা কেউ বুঝছে না।

কামের মাঝে নর-নারী উভয়ের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু নারীকে উপলক্ষ্য করে কথাগুলি লুচি—কারণ এইটাই হয়েছে পদ্ধতি। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি পুরুষের উপলক্ষ্যেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য।

ভগবান্ নারীকে সুন্দর করলেন কেন—এ-ও একটা কৈফিয়তের বিষয় হল। এ কথা কেউ ভাবলে না, শুধু ভোগের জিনিষটা যে সুন্দর হয়, তা নয়, পূজার জিনিষটাও তা সুন্দর হয়। ঘরে ছেলে-পিলে আছে, লোভের বেশে ঠাকুরের ভোগে দৃষ্টি দেবে, সেই ভয়ে কি ঠাকুরের ভোগে ভাল জিনিষ দিতে নাট ? হয় ছেলে-পিলের সামনে ভোগ সাজিও না—নয়ত আরও ভাল কথা, ছেলে-পিলেদের ঠাকুরকে ভক্তি করতে শেখাও, তাঁর সুন্দর ভোগের আয়োজন করে তারা খুসী হোক। কামুককেও এই শিক্ষা দিতে হবে, ভোগের সৌন্দর্য নয়—পূজার সৌন্দর্য দেখে সে তৃপ্ত হোক! তন্ত্রের নামে মানুষ নাকি সটকায়—কিন্তু তার দর্শনের মূল কথাটা এই—যা ভোগ, তার পূজা। নারীকে ভগবান্ সুন্দর করেছেন—ভালই করেছেন, আনন্দময়ী প্রতিমায় শক্তির পূজা হচ্ছে। পূজার সীমারে লোভের দৃষ্টি দিতে নেই। লোভ আছে

জগতে, তাই বলে পূজার পাঠ তুলে দিতে হবে—সেটাও কি একটা কথা হল ?

আমি এক দিক দিয়ে দেখ, নারীর রূপ কাল হল কামুকের কাছে। এক হিসাবে রূপ তো ভোগের জগতই—নইলে তার সৃষ্টি হল কেন ? তবে কিনা ভূতনাথের ভোগ আছে, আমার ভূতেরও ভোগ আছে—যা নাকি ভূভোগেরই সামিল। যা দিয়ে ভোগ করবে, তেমনি ফল পাবে। রূপ দেখলেই দেহ-সুখিত্তি জেগে ওঠে—দেহ দিয়ে ভোগ করতে চাও—তাঁই পড়ে যাও। বেহের ভোগে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু মানুষ কেবল দেহ নয় বলেই, দেহের ভোগেই চরম তৃপ্তি হয় না, আরও কিছু যেন প্রাণ চায়। যে আনন্দ নকল, তার শেষ আছে অর্থাৎ স্নায়ুগুলো তাতে সঞ্জীবিত না হয়ে আসন্ন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিকভাবে তাঁই ভোগের পরেই অবসাদ। এই কাম অপ্রাকৃত হলে উজান বেয়ে চলত, দেহ ভুল হয়ে যেত, স্নায়ুজালের সঞ্জীবনী হত—উৎসব হতে উৎসবে মানুষ মাতোয়ারা হয়ে উঠতো! কিন্তু লোভী সে পথ পায় কই ?

আচ্ছা, দেহের ভোগে দেহটা একে-বারেই খসে পড়ে না, তাহলেও শক্তি ছিল। সেটা আমার আদমরা হয়ে বৈচে থাকে জ্বালানির জন্ত। কেন থাকে জান ? আমার শক্তি তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে জড়িয়ে আছে কিনা! কিন্তু তুমি তো তার খোঁজ পাও নি। তাঁই শক্তিকে ভুল পথে চালিয়ে হুংস পেয়েছ, কিন্তু মগতে পার নি। শুনেছি, কতকগুলি পতঙ্গ আছে, তাদের পুরুষগুলো সূর্যের আলোকে বেশ আনন্দে নেচে বেড়ায়, তার পর একটা মাদী পোকা দেখলেই ছুটে গিয়ে তাতে সঙ্গত হয়, আর ওই একবার আলিঙ্গনেই

সব শক্তি শেষ হয়ে যায়—বেচানী মনে যায়।  
মাদীটাও ডিম্ব প্রসব করে মরে যায়। দেহেও  
যদি একবার রমণেই সব সারা হয়ে যেত,  
তাহলে দেহের রমণে এত জাঁগা থাকত না।  
কিন্তু মাছুষের দেহে দেহাতীত কিছু ফুটে  
উঠেছে বলেই দেহের তৃপ্তিটা তার কাছে  
কিছুতেই চূড়ান্ত হয় না; তাই তার কর্ম-  
ভোগে 'মধুর সঙ্গে হুলও থাকে। হুলটা ভগ-  
বানের "চৌকিদারী" ডাক—"গাঙ্গাওয়ালা  
জাগো।" এই দেহাতীতকে খুঁজে তাঁর  
ভোগের আয়োগন করাই মনুষ্যত্ব। দেহ ভুলে  
যাও—কেবলি ভাব, তুমি দেহ নও, তুমি দেহ  
নও! তখন জী দেহ থাকারও কোনও  
তাৎপর্য্য থাকবে না। তুমি আকাশের মত,  
আলোর মত—তোমার মাঝেই অনন্ত জীব  
প্রকৃতির মিথুন গীতা—তুমি সজীবন, তুমি  
রসায়ন—তোমার প্রেমে ওদের কাম  
সঞ্জীবিত!

এই ভাব যখন আসবে তখন অপরাধী  
এসে জড়িয়ে ধরলেও কাম জাগবে না।  
ব্যষ্টিতে তখন সমষ্টির জোতি: প্রবিষ্ট  
হয়ে অপরূপ মায়ার সৃষ্টি হবে—যেমন শিশির-  
বিন্দুতে পূর্ণ সূর্য্যবিষ প্রতিবিম্বিত হয়ে তার  
মৌল্য বাড়ায়। 'ভাবুক' সেই চাকচিক্য  
দেখেই খুশী। 'তারত' নাম প্রেম।

দেহের মিলনে যে আনন্দ নাই, এ কথা  
কেউ বলবে না। যারা দেহ ছাড়া আর কিছু  
বোঝে না, তারা তো বলবেই ন—দেহস্থখে  
মজ্জতে নিবেদন করেছেন যে শাস্ত্র, তিনিও  
বলবেন না। শাস্ত্রের মাঝেই কতকগুলি  
পিসদৃশ উপমা আছে। প্রপঞ্চাতীত আনন্দ  
কেমন, তা বোঝানার জন্ত অনেক ভাষায়

রমণের উপমা আছে। বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যশাস্ত্র  
তো ওই সমস্ত উপমায় একেবারে ভরা।  
দৈহিক আসক্তিতে যাকে চিত্রিত করা  
হয়েছে, দেহের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকলেও  
সে যে পাকৃত দৈহিক ক্রিয়ার সামিল নয়,  
এ কথা অমাব্যক বস্তুতত্ত্ব-বাদীকে নোঝানো  
বড় শক্ত। ঠিক এই জগতের জী-পুরুষ ভাবই  
যে চরম সত্য নয়, এ সংস্কার দূর হতে বহু  
সাধ্য সাধনার দরকার। আনন্দের মাঝে  
জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ নাই। কিন্তু দেহের  
ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা যার আয়ত্ত হয় নি,  
সে আগে বোঝে দেহ—তার পর বোঝে  
আনন্দ। তাই উপনিষদ যখন বলেন, "ব্রহ্মের  
আনন্দ কেমন জান?—যথা স্ত্রিয়া সম্পরিষক্ত  
ন বাহ্যঃ নাস্তং বেদ—স্ত্রী এসে নিবিড় ভাবে  
জাড়িয়ে ধরলে যেমন বুঝতে পারে না কোনটা  
বাহ্যের, আর কোনটা বা ভিতর—এ-ও  
ভেমন।" এমনি উপমা শুনে কামকের  
রসনা রসমুক্ত হয়ে ওঠে, তুরীয়লোকেও  
একটা গৃহস্থালী পাতা যায় কিনা, সে চেষ্টায়  
কল্পনা উদ্ভাস হয়ে ওঠে। কল্পনার বিকৃত  
অপচারেই চরম পরিচয় পাঠ, যখন দেখি,  
বাঙ্গালীর শিব ভক্তের কলাশে তুরীয়লোক  
ছেড়ে কুঁচুনীপাড়ায় এসে আসর জমিয়েছেন!

শব্দজ্ঞীয় উপমার একটা তাৎপর্য্য আছে।  
সম্বন্ধ সত্য। কিন্তু তাকে বিকৃত করে দেখলে,  
যে দেখে ক্ষতি তারই। প্রপঞ্চাতীত বস্তুকে  
প্রপঞ্চের ভাষায় ব্যক্ত করলে বোকা লোকে  
মন করে, বুঝি জী-পুরুষের মিলনের মাঝেই  
ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ লুকিয়ে আছে!  
এখানেও যেমন মেয়ে-পুরুষের খেলা—ওখা  
নেও বুঝি তাই। তবে এগানকার খেলায় সে

সুখটা পূর্ণোপরি হয় না ভরসা আছে, সেখানে চলে। বাস্তবিক, এমন ধারণা অনেকের আছে।

কিন্তু নির্বোধেরা বোঝে না, উপমা উপমাট; ধরতে হবে কায়াকে—ছায়াকে নয়। চিন্তা কর—কেমনধারা বস্তু, তা কি খেয়াল হয় না? চৈতন্যের কি দান আছে? দার্শনিক ভাষা না স্বীকার করবেন না। অথচ চৈতন্য জমাট বেঁধে যে দেহ চলে, তার রূপচোখে দেখা যাবে কিনা, সে সংশয় অভাবকের মনে একবার আসেও না কি? যেখানে প্রপঞ্চ নাহি, সেখানে মেয়ে-পুরুষ এমনিধারা ফুলে থাকে কি করে? যারা কামচিন্তা আর কামচর্চা নিয়ে ব্যস্ত, দেহের বাইরে আর কিছু যারা বোঝে না—তারা দেহের সুখটা বেড়ে অনন্ত হলেই ব্রহ্ম মিলবে, এহ কথা মনে করতে পারে বটে। তাহ ভাবলোকে কায়ালোকে নামিয়ে আনতে পারলে তবে তাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

কিন্তু শাস্ত্রের ইঙ্গিত বিগত মুখে আসল কথা এট, সেখানকার আনন্দ স্বা-পুরুষের অন্তর্গত কামলীলার নয়—সে আনন্দ এত তীব্র, এত প্রশান্ত, এত নিপুল যে জগতের আর কোনও সুখের সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। মানুষ রমণ সুখটাই বোঝে ভাল। তাই ওরি সঙ্গে উপমা দেওয়া। ভাড়া কামলীলার সঙ্গে কোনও বিষয়ে এর সাদৃশ্যও আছে—ভেদাভেদ, মিলনে বিরত ইত্যাকার কতগুলি চরমত্বের ইঙ্গিত প্রাকৃত বিরমাত্তও পাওয়া যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্র সেই আনন্দকে রমণ সুখের কোটিগুণ বলেছেন। অথচ প্রাকৃত রমণের উপাদান যে নয়দেহ ও নারীদেহ—তা

সেখানে নাই, যেহেতু প্রপঞ্চ সেখানে নাই। বিশেষতঃ দেহস্বীকার গুণময়-ভূমির কথা, কিন্তু ভাব গুণাতীত। এটো জ্ঞান শাস্ত্রীয় উপমা বা লীলা বর্ণনা ব্যতীত হলে ঠিক বিপণীত ধারা ধরে ব্যুত হয়। দেহজ্ঞান না ভুলতে পারলে ও সব রমণের উপমা ব্যুতই পাবা যাবে না—চর্চায় রমণের স্মৃতিটাই কেবল জগে উঠবে, আর তাতে ভাবভক্তি কতটুকু থাকবে, তা সর্বমঙ্গলাহ জানেন। এই জ্ঞান লীলার সাক্ষী সখী—যারা নায়ক-নায়িকার দেহ দেখেছে, নিজের দেহমুখ ভুলে!

একটা উদাহরণ ধরা। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছে, ছেলেপিলের মুখে সবচ মিষ্ট লাগে। বুড়োরা যা একবার মুখে দিয়ে থু থু কপে ফেলে দিচ্ছে, ছেলে তাতেই অমৃতের আশ্বাদ পাচ্ছে। এই জ্ঞান একটা কথা আছে, শিশুর মুখে অমৃত—যা কিছু খায়, তা তার অমৃতের উপস্থরণে আবৃত হয়ে, স্বভাবতঃ অমৃত হয়ে যায়। তুমি-আমি কঠিকে পিক্ত করে ফেলেছি, তাই আজ আচমনের মন্ত্র আওড়িয়েও অরুকে অমৃত করতে পারছি না—অমৃত তার অপিতানও হচ্ছে না, উপস্থরণও হচ্ছে না। এটো হতে ব্যুত পারি, ভোগের সনাতন শক্তি তোমার মাঝেই রয়েছে বটে, কিন্তু তাকে অপচারণে পিক্ত কর বলেই তাতে দুঃখ পাওয়া শক্তি যদি অপিক্ত থাকে, তাহলে অল্প উপাদান থেকেই প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। ছেলেরা সামান্য কথায় তৈসে কুটীপাটী হয়—সুস্থদেহ সুস্থমন যুবকযুবতী সামান্য একটু লাস্তলীলার প্রীতির অমরাবতী স্বজন করে। অপচাণী বৃদ্ধ তা দেখে ঈর্ষা-কষায়িত চোখে বলে “গর জাহেই বাড়া-বাড়ি!” কামের অপচারণার শাস্তি যে কি কক্ষণ ও নিদারুণ—এটো তার প্রমাণ।



আধার বহু শুদ্ধ, অমুভূত তত তীব্র—এটো তাহলে একটা মিরেট সত্য। এ দুয়ের মাঝে ব্যতিরেক মুখেও একটা অমুপাত আছে। তা হতে গণিতের নিয়মেও বলতে পারি—যে আধার-সর্ব্বস্ব অতএব মলিন, তার অমুভূতি জড়বৎ; আবার যে নিরাধার অর্থাৎ দেহ-মন-বর্জিত, তার অমুভূতি তীব্রতম। এই জন্ম দেহাভিমান-বর্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বোঝা যায় না। তাই প্রবাদ আছে—দেহাভিমান-বর্জিত সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাপ্রভু রাস-পঞ্চাখ্যায়ী পড়েননি।

দেহাভিমান-বর্জিত হয়ে তবে আবার দেহ-বিকারের আলোচনা কেন, এ প্রশ্ন হতে পারে। জী-পুরুষের ভাব হতে উদ্দী-

প্ননাও আসতে পারে, উত্তে-জনাও হতে পারে। আগেরটা প্রেমিকের ভোগ্য, পরেরটা কামুকের। মিলন দেখে তার সত্ত্ব উদ্দীপনা হয়, সে কে?—যে দেহের অধীন নয়। তত্ত্বের অতীত না হতে পারলে তত্ত্ব আয়ত্ত হয় না। কামুক বিদেহীর প্রাণের আবেগ বুঝবে কি করে? সে দেখে ভাগবত-ধর্ম্মে মেয়ে-পুরুষের ঢলাঢলি; কিন্তু এটা খেয়াল করে না—ভাগবতের আর এক নাম পরমহংস-সংহিতা। যে রসিক, সে আভাসে কতটুকু আশ্বাদন করে, কামুক গোঁড়াগে নিলেও তা বুঝতে পারে না। এই জন্ম ব্যাসদেব বলেছিলেন কামের সুখের ষোল-গুণ হচ্ছে কাম-নিবৃত্তির সুখ।



## ভক্তির সাধনা

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যা-চাখ্যাঃ—যাঁহার ভক্তিগণের আচার্য্য, তাঁহার ভক্তির সাধন কথা গাতিয়া গিয়াছেন। সত্য বস্তু আলোকের মত ব্যাপক। দীপ-শিখা যেমন শুধু সলিতাতেই আবদ্ধ থাকে না, তেমনি সত্য লাভ করিয়া যাঁহার ফিরিয়া আসেন, তাহারিও সে সত্যকে শুধু আপনাত প্রদয়-কন্দরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। জ্ঞানসারে হউক, অজ্ঞানসারে হউক,

সত্যের প্রভাব বিশ্বময়-ছড়াইয়া পড়ে। মানুষে মানুষে বুদ্ধির অতি নিবিড়। তাই অতিমানুষ মানুষের ভূমি ছাড়াইতে গিয়াও করণ দৃষ্টিতে একবার পিছনপানে না তাকাইয়া পারেন না। তাঁরা জানেন, সত্য সাধ্য নয়—তাহা প্রাপক-ভীত লোকাভীত বস্তু, অতএব তাহা সিদ্ধসম্পদ মাত্র। তথাপি প্রপঞ্চান্তর্গত দুর্ব্বল সাধক চলিতে গিয়া যে কোথায় বাধা অনুভব করিতেছে, প্রাণভরা সমতাধারা তাহা অমুভব

করিয়া তাঁহার সে পথের কাঁটা দূর করিয়া দেন। সিদ্ধের এই সেবা—অজীব হইয়াও জীবের জন্ত এই স্বতঃ-উচ্ছসিত সাধনা জগতের এক অমুপম সম্পদ। জানি, এই দনদীদের উপহাস করিবার, ব্যঙ্গ করিবার পাথরের অভাব জগতে হয় না; কিন্তু আমার এ-ও জানি, যে সাধকের হৃদয়ে সাধাবস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে, সে তাঁহার আহ্বানকে মুক্ত-কুরঙ্গিবীর শ্রবণে বংশীধ্বনির মতই শোনে। সে জানে, এই যে আচার্য্যোপদেশ, এ ত শুধু নীরস বচন-পরম্পরা নয়—এ যে সঙ্গীত! শিশিক্ষু অর্জুনের কাছে শাস্তা ত্রিক্ষণের বাণী তাই ভগবানের গীতা।

ভক্তির 'যে সাধনার কথা আচার্য্যেরা উপদেশ করিয়াছেন, অধিকারীর নিকট তাহা গানের মতই মধুময় হোক।

ভক্তির প্রথম সাধন—বিষয় ত্যাগ ও সঙ্গ-ত্যাগ। সঙ্গ অর্থে আসক্তি। শুধু বিষয়ত্যাগ করিলেই হইবে না—বিষয়ের প্রতি আসক্তি নষ্ট করিতে হইবে। আসক্তি ত্যাগই ষথার্থ বিষয়ত্যাগ। এই দরুণ বিষয়ত্যাগ সার্থক হইবার জন্ত আসক্তি ত্যাগের অপেক্ষা রাখে। তাই দেবর্ষি উত্তরকে একটি সূত্রে আদ্য করিয়া বলিলেন, “তত্ত্বং বিষয়-ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ।”

এইখানে ভক্তিরসিক আচার্য্যপ্রবর শ্রীধরের একটি সঙ্কেত উল্লেখ করিতেছি। গীতার টীকায় তিনি বলিতেছেন, “অত্র চ যানি সাধ-কশ্চ জ্ঞানসাধনানি, তানি এষ স্বাভাবিকানি সিদ্ধশ্চ লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধশ্চ লক্ষণানি কথয়ন্ এষ অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনানি আহ” —সাধকের পক্ষে যা জ্ঞানের সাধন, সিদ্ধের

তাহাই স্বাভাবিক লক্ষণ; অতএব সিদ্ধের লক্ষণ নির্দেশ করিলে তাহা হইতে অন্তরঙ্গ জ্ঞানসাধনের কণাট হইতেছে বুঝিতে হইবে। সিদ্ধের উপদেশের সময় এই কথাটুকু সর্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে। ফল কথা, অন্তরঙ্গ সাধনার নিমজ্জিত না হইলে সিদ্ধ লক্ষণ বোঝা যায় না। সাধনা ও সিদ্ধির মাঝে এই নিগূঢ় সম্বন্ধ।

উপরের সাধনটা বিভাগ করিয়া লক্ষণ করিতে পারি—প্রবর্ত সাধকের পক্ষে বিষয়-ত্যাগ অবশ্য আশ্রয়ণী, যদিও সঙ্গত্যাগ তাহার শ্রেষ্ঠ। আর সিদ্ধের পক্ষে সঙ্গত্যাগই স্বাভাবিক—বিষয়ত্যাগ তাহার অনাস্তর্য্য অস্তিত্ব মাত্র। অর্থাৎ সিদ্ধের অন্তরে যে সঙ্গ-ত্যাগ প্রকৃতিতে অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক বিষয়ত্যাগ দ্বারা অভ্যাসকে দৃঢ় করিবে।

ত্যাগ বৈরাগ্য যে কেবল জ্ঞানপন্থীর এক-চেটিয়া অধিকার নয়, ভক্তিপন্থীকে বিশেষ করিয়া ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বর্তমানে আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে বৈরাগী কথাটা সমাজে কুৎসাবাচক; যাহারা সাম্প্র-দায়িক তণাকথিত “বৈরাগী”, তাহাদের আচরণও অনেক ক্ষেত্রে বৈরাগ্যের একান্ত বিরোধী। বৈরাগ্যের কি করিয়া এক্রপ অর্থ বিপরিণাম ঘটিল, তাহা ভাবিবার বিষয়।

জ্ঞানপন্থীর সম্বন্ধে অপবাদ আছে, তাঁহার জগৎটাকে ন শ্রাং করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে বৈরাগ্যের একটা স্থলতঃ কঠোর অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়া জনসাধারণের মনে বিভীষিকা ও প্রতিক্রিয়ার ভাব বাগাইয়া তুলিয়াছে। জ্ঞানপন্থীর হুঁড়িয়া ফেলা জগৎকে

কুড়াইয়া আনিয়া ভক্তিপন্থী প্রেমের কল্লোলক  
 সৃষ্টি করিয়াছেন। ইষ্টমূর্তিকে সুন্দর করিয়া  
 সাজাইয়া তাঁহার তৃপ্তি—এ স্বাভাবিক। কিন্তু  
 এট ইষ্টতৃপ্তি-সাধনামূলক সৌন্দর্য্য চর্চা  
 করিতে করিতে অলঙ্ঘিতে কোথা হইতে  
 আত্মতৃপ্তির ভাবটুকু ভক্তিপন্থীর মধ্যে আসিয়া  
 ক্ষুটিল! ফলে ইষ্টের ভোগ হইতে কিছু কিছু  
 চুরী করিয়া তিনি তাহা নিম্নের ভোগে  
 লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। যে বৈরাগ্য  
 প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেবার উপকরণ কুড়াইয়া দিয়া  
 ভক্তিকে সজীবিত রাখিয়াছিল, কালে তাহা  
 নিলাসের বিষম্বাসে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।  
 বিকৃত-কৃচি ভক্তিবাদী তখন বলিতে ‘স্বক  
 করিল, ‘সবট যখন ঠাকুরের প্রসাদ, তখন  
 মলা লুটিতে আপত্তি কি? যাহা স্বভাব-নীরস,  
 তারাই রসবর্জনের উপদেশ দেয়। তাদের  
 উপদেশ শুনিয়া শুকাইয়া মরা আমাদের ধর্মে  
 বলে না।’ মনে হয়, আধুনিক ভক্তিপন্থী-  
 দের মধ্যে বৈরাগ্যের অবমাননাকারী এই  
 প্রচ্ছন্ন বিলাস বাসনা অনেকস্থলে সনাতন  
 ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়াছে।

আধুনিক সমাজের মনোভাবগত এই ভাবটা  
 একটা মারাত্মক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। জানিতাম,  
 বাল্মীকী “বৈরাগীর” জাত, এখন সে বৈরাগীর  
 অর্থ বাহাই হটক না বেন। কিন্তু হঠাৎ  
 দেখিতে পাইতেছি, ইউরোপের অনুকরণে  
 বাল্মীকী অভিমাত্রার প্রকৃতির উপাসক হইয়া  
 পড়িয়াছে। বাল্মীকী সাহিত্যে সুন্দরী ধরণীর  
 প্রতি প্রেমনিবেদন, বৈরাগ্যের প্রতি কটাক্ষ  
 রাখিয়া ভেদ করিয়াই সংসারলীলার গুণকীর্তন  
 ওকটা প্রথমে উপলব্ধি বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।  
 এই মনোভাবের প্রাশংসা সমাজে ধরে না,

কিন্তু ইহার মূল কোণায়, তাহা কেহ ভাবিয়া  
 দেখিবেছে না। জগতের প্রতি অত্যধিক  
 আসক্তি ইউরোপীয় জাতির ভক্তিদর্শনের  
 একটা বিশেষ লক্ষণ; অনেকে আমাদের  
 দেশের ভক্তিদর্শনও ইহার আরোপ করিতে  
 চান। কিন্তু উভয়জাতির দার্শনিক চিন্তা-  
 প্রণালীর দ্বারা আলোচনা করিলে দেখি, খৃষ্টীয়  
 ভক্তিদর্শনকে হিন্দুর ভক্তিদর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া  
 নিতে খণ্ডেই আপত্তি থাকিতে পারে। মূল  
 কথাটা এই, খৃষ্টীয় জগৎ একজন্মবাদী আর  
 হিন্দুজগৎ পুনর্জন্মবাদী। এট লইয়াই ‘ইষ্ট-  
 জগৎটার প্রতি উভয় জাতির মনোভাব মূলতঃ  
 বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ইউরোপীয়  
 মন ইষ্টজগৎটাকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া  
 ধরিবে, কেননা পরলোক তাঁহার কাছে  
 অনিশ্চিত ও ভয়াবহ; তাই সুন্দরী ধরণীর  
 স্তবগানে, সংসার-সুখের বিচিত্র কল্পনায়  
 তাহার চিরমগ্ন। কিন্তু হিন্দু জন্মজন্মান্তর  
 ভরসা রাখে বলিয়াই এই ধরণী সুন্দরী  
 হইয়াও তাহার কাছে একান্ত ভোগ্য নয়।  
 বৈরাগ্য দ্বারা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার  
 একটা স্বাভাবিক শক্তি তাহার জাতীয়  
 চেতনায় স্তম্ভ রহিয়াছে। হিন্দুর ভক্তিদর্শনকে  
 খৃষ্টীয় ভক্তিদর্শনের ছাঁচে ঢালিবার পূর্বে এই  
 কথাটা বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিতে  
 হইবে।’ এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, এই  
 যে ভক্তির ছদ্ম আদরণে আসক্তিকে নানা  
 আকারে আমরা প্রাশ্রয় দিতেছি, ইহা অসংযম-  
 জানত ভোগ-সমর্থের অভাবেরই নিষ্কৃত  
 প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।

বাল্মীকী জাতটা হঠাৎ অভিমাত্রার দাবী-  
 করিতে গিয়া বৈরাগ্যের প্রতি খড়গহস্ত

হঠাৎ উঠিয়াছে, দেখিতে পাঠেছি, তাই এটি কথাগুলি উল্লেখ করিলাম। আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যিক পোমেব ত্রাকামী গাহিয়া মনে কনিতেছেন, তাঁহারা ব্যক্তি, বৈষ্ণব মহাজনদের সুরে সুর মিলাইতেছেন। কিন্তু এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বৈরাগী মহাজনেরা কোপীন আঁটিয়া বহুবাস পরিয়া তবে বিশ্বপ্রেমেব পালা গাহিতে সুরু করিয়াছিলেন; এখনকার মত কামস্তুতিকে বিশ্বপ্রেমের গিলটি করিয়া তাঁহারা বাজারে চালাইতে চাহেন নাই।

ভোগাসক্ত, অসংযত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির যেমন জ্ঞান হয় না, তেমনি ভক্তিও হয় না। কি জ্ঞান, কি ভক্তি—উভয়ের পক্ষে বৈরাগ্য সিংহদ্বার। বাহিরে হটক না হটক, মনের মাঝে সংসারটা পরিয়া রাখিয়া যেমন জ্ঞানের সন্ধ্যাস হয় না, তেমনি প্রেমের সন্ধ্যাসও হয় না, এ কথাটাও স্মরণে রাখিতে হইবে। জ্ঞানের রাজা শিব যেমন সন্ধ্যাসী, প্রেমের রাণী গৌরীও তেমনি রাজরাজেশ্বরী হইয়াও সন্ধ্যাসিনী। তবে জ্ঞানের সন্ধ্যাস ও প্রেমের সন্ধ্যাসে অসংখ্য ভেদ দেখা যাইতে পারে, এক বিরূপে বৈরাগ্য, অপর স্বরূপে বৈরাগ্য। কিন্তু সিদ্ধলক্ষণে উভয়ে একই হইয়াও এক। জানীও সহজ মাহুষ, প্রেমিকও তাই। সহজে সহজুই প্রীতি হয়—বৈষ্ণবদর্শনের—তহা একটি নিগূঢ় কথা। কিন্তু ইহা প্রীতি বিষয়-বৈরাগ্য ও কাম-পরিচয় দ্বারা ধৃত, সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট—তহাও একটি নিগূঢ় সত্য।

ভক্তি যদি রস স্বরূপের আশ্রয়ন হয়, তবে জ্ঞানও তাই। ভক্তি সরস, স্নাতক, স্নাতক

বৈরাগ্যাপেক্ষাশূন্য এবং জ্ঞান নীরস, অতএব বৈরাগ্য তাহারই এলাকা, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। কিশোর কিশোরীতে প্রেম পার্থক্য, জ্ঞান ও ভক্তিতে তাই অর্থাৎ উভয়ে ভেদ থাকিয়াও নাই। অভেদ বলিলে মিলন-পেক্ষায় এসম্মুখিতির অভাব ঘটে, তাই পরাক্রম দৃষ্টিতে ভেদ স্বীকার করা হয়; কিন্তু ভেদনিরূপক লিঙ্গও তাই সেখানে নাই। তাই 'পদধাতীত, অব্যক্তলিঙ্গক কিশোর-কিশোরী মিলনকে জ্ঞান ও প্রেমের মিলনের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বিষয়-নিরপেক্ষ ও আসক্তিশূন্য না হইতে পারিলে এই মিলনের রহস্য ধারণা করিতে পারা যায় না। তাই সাধনক্ষেত্রে বৈরাগ্য জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের প্রয়োজক।

সঙ্গত্যাগ বিষয়ত্যাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উচ্চতর বৈরাগ্যের প্রাণ, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সাধারণ অস্মিকারীর পক্ষে এমন সম্ভব হয় না যে, বিষয়কে জড়াইয়া রাখিয়াও সে তাহার আসক্তি পরিহার করিতে পারে। বিষয়ধ্যান করিব, অথচ তাহাতে সঙ্গ জন্মাবে না—এ কেবল গায়ের জোরের কথা নয়। তাই সাধারণ জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া গীতা বলিতেছেন—“ধায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে—বিষয় ধ্যান করিতে করিতে জীবের তাহাতে সঙ্গ উৎপন্ন হয়। “বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ—রসবর্জ্জঃ—যতক্ষণ দেহ অভিন্নান আছে, ততক্ষণ বিষয় ঠেকাইয়া রাখিলে তাহার দূরে থাকে বটে, কিন্তু রস মরে না।” সুতরাং আসক্তিপরিহার যেকৃত কর্ত্তন ধর্ম, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। “রসবীর” সঙ্গ-

থাকে, না করে 'রমণ' অর্থাৎ রমণের কোটিগুণ আনন্দ পায়—ইহা যৌষিৎসঙ্গীর কথা নয়, পূর্ণ ঋদ্ধচারীর কথা। আজ কাল কথায় কথায় লোকে জনক রাজার উদাহরণ দিয়া সংসারের কোলে ঝোল টানিতে চায়। যে জনক বৈরাগ্যের রাজা শুকদেবের আচার্য্য, সচ্চিদানন্দময়ী মানসীকন্ঠার জনক যিনি, তিনি যে আধুনিক সংসারের রিপুতাড়িত "জনক" নন, এ কথাটা দেখালাই রাখিয়া তবে 'তুণনা' করিতে হয়।

প্রবর্তাধিকারীর পক্ষে সঙ্গভাগ অভাস্ত, কনিবার জন্তই বিষয়ভাগ বা সংঘের ব্যবস্থা। গীতার কচ্ছপের উদাহরণ আছে। কচ্ছপ যেমন খোলার মাঝে শরীর গুটাইয়া লয়, তেমনি করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি গুটাইয়া লইতে, হইবে। কিন্তু গায়ের জোরে তা হয় না, টিকেও না। সেই জন্ত গীতাকার গোজা কথায় বলিতেছেন, "সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ"—আমাকে লক্ষ্য করিয়া সংযম করিয়া আমাতেই যুক্ত থাকিবে। জ্ঞান বা ভক্তির রসায়ন না থাকিলে সংযম ফলবান্ হয় না। এই জন্ত প্রবর্ত সাধক যতদূর সম্ভব ভগবানের কথা স্মরণে রাখিয়া গ্রাণপণ বলে। সংযম আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। রূপ-রসের এই আপাত-বর্জনে আপশোষ করিবার কিছুই নাই; চিন্ময়ের আভাস প্রাপ্ত হইলে মুগ্ধের ত্যাগ সহস্রগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে—এই গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস রাখ।

তাহা হইলে ভক্তিসাধনের প্রাথম সূত্র হইল—সংযম সহায়ে আসক্তি পরিহার করিয়া বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করা। দ্বিতীয় সূত্র হইল—অবাস্তব ভক্তনাৎ—নির-

জর ভজন। ইহাও সাধন-সাপেক্ষ। ভক্তির দৈনন্দিন্য বা একটানা প্রবাহ সিদ্ধদের স্বাভাবিক লক্ষণ, কিন্তু সাধকের পক্ষে তাহা সাধন-সাপেক্ষ, ইহা শ্রীধরস্বামী সূত্রানুযায়ী বুঝিতে পারি। ঐক্যবদর্শনে ইহাকে অব্যর্থকালভ নাম দেওয়া হইয়াছে। সাধকের পক্ষে ইহার বিবৃতি আবশ্যক।

\*ভগবানে যাহাদের মন মজিয়াছে, তাহার বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন না। বিষয় চিন্তার আকর্ষণ ডুনিয়া রহিয়াছে, মাঝে মাঝে ছ' এক দণ্ডের জন্য শ্রবণ-বীর্তন করিলাম—ইহাতেই যদি ভাবভক্তির উদয় হইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। ঠিক ঠিক ভাবের উন্মেষ হইলে আর ভগবানকে ছাড়িয়া বিষয়ের দিকে মন মোটেই যাতে চাটিবে না—বিষয়ের স্থিতি তখন বিষয় মনে হইবে। বিষয়কর্মে যাহারা আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারাও অব্যর্থ-কালহর সাধনা করিতে পারে। হাতে কাজ করিব, কিন্তু মনটা থাকিবে তাঁহার পানে। শ্রীমদ্রাহা প্রভু বলিতেন, "নষ্টা মেয়ে যেমন ঘরকন্নার সকল কাজট করে অর্থাৎ মন পড়িয়া থাকে উপপতির সঙ্গে, তেমনি সংসারের কাজ করিয়া যাও।"

"কাহারও সংশয় হইতে পারে, সংসারের কাজ তেঁ-শুধু হাতে করিয়া গেলেই কুলায় না"—তাহার জন্ত ভাবনা-চিন্তারও তো প্রয়োজন। স্তবরাং সকল সময় স্তবের চিন্তা নিয়া থাকি কি করিয়া? কিন্তু এটা একটা মহাপ্রসঙ্গ। নিজের দৈনন্দিন চিন্তাগুলি যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তবে অন্যায়সই বুঝিতে পারিবে—বৃথা চিন্তায়, এলোমেলো চিন্তায় মাথার কত সময় কাটিয়া যায়।

হয়ত মন কখনও যাহা হইয়া গিয়াছে, বাব  
বার তাগা খাওড়াইতেছে, কিম্বা নূন নূন  
কার্যাকারণ বা পারিপার্শ্বিক মনে মনে উদ্ভাৱন  
করিয়া আকাশ-কুসুমের কল্পনায় সাতিয়া  
গিয়াছে। ইহাদের মাঝে শতকরা নব্বুটো  
চিন্তা বর্তমানকালের পক্ষে কোনও প্রয়োজনই  
আসে না। বিষয়ীয় চিন্তাকে কি এই সমস্ত  
বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত করা যায় না? সংসা-  
রের কষ্টপাটকর্তব্য নিরূপণ করিতে, হইবে  
দৃঢ়তা সহিত এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া।  
“এইটো এইরূপ করিব” ব্ৰহ্ম একথা একবার  
ভাবিলেই তো যথেষ্ট; তার পর যখন সময়  
উপস্থিত হইবে, তখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত  
করিলেই হইল। ইহান মাঝে আর বার বার  
“এত করিব—এত করিব” বলিয়া একটা  
সঙ্কল্পেরই রোমস্থান করার কি প্রয়োজন?  
আবার কাজ হইয়া গেলে বার বার ফল-  
কল্পনারই বা কি প্রয়োজন?

“এইরূপ অন্তঃসন্ধান কানলে দেখিতে  
পাটব, বিষয়ের বিলুপ্তি কতি না করিয়াও

আমরা বিষয়চিন্তা কৃত কমাটয়া দিতে পারি।  
বিষয়চিন্তা কমিয়া গেলে আপনি ভগবানে  
নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর আসিবে। তখন  
দেখিব, আমি যদি তাঁহার কথা ভাবি, তবে  
আমার বিষয়ের ভাবনা তিনটি ভাবে। তখন  
বিষয়ের কষ্টের মাঝেও পদে পদে তাঁহার  
করুণার নিদর্শন পাটব। এইরূপে অনাবশ্যক  
বিষয়চিন্তা ছাড়িলে যে সময়টুকু বাঁচে, তাহাও  
কি ভগবানকে দিতে পারি না? তখন তো  
হাতে সংসারের কাজ আর মনে তাঁহার চিন্তা  
নিয়া থাকা চলে।

“রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ‘বুদ্ধজীবেরা জীবন  
চিন্তা করেন না। যদি অবসর হয়, ততলে হয়  
আবোল-তাবোল ফাল্তো গল্প করে, নয়  
সিঁই কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে,  
আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া  
বাঁধছি। হয় তো সময়-কাটো না দেখে ভাস  
পেলতে আরম্ভ করল!’ কি ভয়ানক! এই  
সব অপব্যয়ের চাত হইতে উদ্ধার পাইলে তবে  
না ভাবভক্তি হইবে।”



## সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী.



[ আমরা ইতিপূর্বের কারিকায় দেখা-  
ইয়াছি, উপলব্ধি না হইলেই যে কোনও বস্তুর  
সত্তা অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, তাহা নহে। বস্তু  
এবং উপলব্ধির মাঝে ইন্দ্রিয়-ব্যাপাররূপ দ্বার  
রহিয়াছে। অর্থাৎ সর্গজ্ঞের অনুভূতিকে

আমরা যেরূপ অকরণক বলিতে পারি, অল্পজ্ঞ  
জীবের অনুভূতিকে আমাদের সেরূপ বলিবার  
উপায় নাই। আমাদের নিকট বস্তুর সত্তা  
অনুভূত হইবার জন্য ব্যাপার বা কারণের  
অপেক্ষা রাখে। ‘এই জন্ত বস্তুগত বৈশিষ্ট্য বা

করণগত বৈশিষ্ট্য হেতু বস্তু সত্তার উপলব্ধি  
তাবস্তম্বা চটরা থাকে।

[ একটা উপায় দিলে কথটা বোঝা  
খাটেতে পারে। স্বর্ষের আলোক স্বপকাশ  
এবং সর্বব্যাপী। কিন্তু আমি যদি ঘরে বসিয়া  
একটা জানালামাত্র খুলিয়া দিই, তাহা হইলে  
স্বর্ষ্যালোক সর্বব্যাপী হইয়াও সেই জানালামাত্র  
বস্তুটুকু ধরে, তটুকু মাত্রই গৃহস্থে প্রবেশ  
লাভ করিলে। ফলে আলোকের সর্বতোভাবে  
জ্ঞান গৃহস্থানীর হইবে না। আমাদের দর্শনও  
এইরূপ ইন্দ্রিয়রূপী কাতারনের ভিত্তি দিয়া।  
বাতায়ন যেমন আলোকের সর্বতঃ প্রকাশকে  
ধারণা করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়ও তেমনি  
বস্তুর সার্বভৌম সত্তাকে ধারণা করিতে পারে  
না। সকল প্রকার আগরণ ভাঙ্গিয়া দিলে  
আলো যেমন সকল ঠাই ছড়ায় পড়িলে,  
ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি-সমূহ বোধ করিয়া স্বপাশে  
তাগাদের লয় করিলেও উপলব্ধি সর্বত্র ছড়া  
ইয়া পড়িলে। ইহাই সর্বজ্ঞতা। সর্বজ্ঞতা  
অর্থে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পরস্পর সর্বতোভাবে  
বাপ্তি ও অবিনাশ। জ্ঞেয়কে ঠিক রাখিয়া  
জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়ের পরকলা দিয়া সঙ্কুচিত  
করিয়া আনিলেই আমাদের লৌকিক উপ-  
লব্ধি সৃষ্টি হইল। ইহাতে জ্ঞান যেরূপ  
আগরিত, জ্ঞেয়ও সেইরূপ স্বল্প পরিসর। এই  
পরিসর কমিয়া যাওয়ার কয়েকটা কারণ  
পূর্ব কানিকার উল্লিখিত হইয়াছে।

[ আমাদের উপলব্ধি এইরূপ করণদোষ ও  
বিষয়দোষস্ফুট বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, বস্তুর অশু-  
পলব্ধি তাহার সত্তার অভাব প্রমাণিত করে  
না। সাংখ্যের চরমতত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যক্তি  
অভিজ্ঞাতেও অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই বলিয়া

কি তাহারাই নাই? ইহার উত্তর এই যে,  
প্রকৃতি-পুরুষের আনুভবিক বাপ্তি করণের  
পরিসর দ্বারা ব্যাহত হয় বলিয়াই তাহার  
অশুভূতি হয় না। গৃহের বাতায়ন ভাঙ্গিয়া  
ফেলার মত করণ সমূহ নিলোপ করিলেই  
অথবা যোগের ভাষায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ  
করিলেই তাহাদের সাক্ষাৎকার মিলিতে  
পারে। কিন্তু সেই সাক্ষাৎ অশুভূতির স্বরূপকে  
করণগতীত জগৎজ্ঞানের স্তরে নামাইয়া আনা  
সম্ভবপণ হয় না বলিয়া এই তত্ত্ব চিরকাল  
অসম্ভব, পরমশূন্য ইত্যাদি আগায় অভিহিত  
হইয়া থাকে। অতএব এ কথাও সত্য বলিয়া  
স্বীকার করিতে হইবে, যে পরম অশুভূতি  
আমাদের সর্ববিশিষ্ট অভিজ্ঞার মূল, তাহার  
সামান্যতঃ স্পর্শ আমরা কোন না কোনও  
সময় নিশ্চয়ই পাইয়া থাকি। এই সামান্যতঃ  
স্পর্শ চিত্তের একাগ্রভূমিতে নরোধের অভাব  
লাইয়া সকল জীবের মাঝেই ফুটিয়া থাকে।  
অধ্যাত্ম-জগতের এই সার্বভৌম নীতিকে লক্ষ্য  
করিয়া যোগসূত্রে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, সমাধি  
সর্বভূমিকাতেই সম্ভব। বুদ্ধবৃত্তি ও সমাহিত  
অবস্থায় চেতনায় যে স্ফূরণ, তাহা প্রকৃতি  
পুরুষ বিবেকদর্শনের নিদর্শনমাত্র। ইহারই  
উৎকর্ষরূপে তত্ত্বাবগামী প্রজ্ঞানের কল্পনা  
আমরা করিতে পারি বটে। 'কিছু বাহ্যিক  
করি না কেন, মৃগতত্ত্ব যে লৌকিক বিজ্ঞানের  
অগ্রযাত্রা থাকিবার সময়, ইহা বলাই বাহুল্য।  
কিন্তু তা বলিয়া ইহা একান্ত এসৎ, এ কথা  
বলিবার কোনও যুক্তিই নাই।

[ এই কথাগুলিকে সুস্পষ্ট করিবার জন্যই  
আচার্য্য পূর্বপক্ষরূপে প্রশ্ন করিলেন, ]  
অশুপলব্ধির যে করণগুলি উল্লিখিত হইল,  
ইহাদের মধ্যে কোন কারণবশতঃ প্রকৃতি

প্রভৃতির উপলব্ধি হয় না ? 'তাহার উত্তরে' কারিকাকার বলিতেছেন—

সৌক্ষ্ম্যান্তদমুপলব্ধিনা ভাবাং কার্য্যতন্ত-  
দুপলব্ধেঃ ।

মুহূদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিসরূপং  
বিরূপং চ ॥৮

—সূক্ষ্ম বলিয়াই ইহাদের উপলব্ধি হয় না, ইহারা নাই বলিয়াই নয় ; কেননা কার্য্য দেখিয়া যে ইহাদের উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মুহূদাদি প্রকৃতির কার্য্য ; ইহারা প্রকৃতির অনুরূপও বটে, বিসদৃশও বটে।

যেমন ছয়টি রসের অতিরিক্ত সপ্তম রস নাট বলিয়াই তাহার উপলব্ধি হয় না, তেমনি প্রকৃতি প্রভৃতি নাট বলিয়াই উপলব্ধি হয় না, এই কথা বলিতে আপত্তি কি ? ইহার উত্তরে কারিকাকার বলিতেছেন, অভাবহেতু প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, এ কথা ঠিক নহে। কেন ? “কার্য্য হইতে তাহার উপলব্ধি হইতাইছে কি না।” তাহার বলিতে এখানে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইতেছে। পুরুষকে উপলব্ধি করা যায়, তাহার প্রমাণ “সজ্জীতপার্ব্বত্যং” এই যুক্তিতে পদের বিবৃত করিব (১৭ কারিকা)।

[প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা বলার হেতু আছে।] কোনও বিষয় যদি দৃঢ়তর প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইয়াও অশোগত হইতু প্রত্যক্ষের এলাকায় না আসে, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেখানে খণ্ডিল না—এইরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। সপ্তম রস কোনও প্রমাণ দ্বারা অবধারিত বা নিশ্চিত হইয়া নাট। সুতরাং সেখানে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা আছে এবং সেই যোগ্যতার অভাব হেতুই প্রত্যক্ষ

হইতেছে না।] এক্ষিপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে।

[অভাবজ্ঞান নিরূপিত হওয়ার পক্ষে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা একটি প্রধান সামগ্রী। মীমাংসক ও বৈদান্তিক অনুপলব্ধি প্রমাণ নিরূপণের সময় ইহা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়াছেন। মোট কথা এই, ভূতলে ঘট নাই—এই যে ঘটাত্মা জ্ঞান, ইহাকে কিপন সার্থক বলিব ? ঘট যদি এমন কোনও পদার্থ হয়, যাঁহা কোনও কাণেই কোনও প্রমাতার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাহার অভাবজ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞার কষ্টিপাথরে গুচাই কারণে নিতান্তই মুণ্ডাচীন। কেননা সেক্ষিপ ঘট থাকিলেও বা, না থাকিলেও তা। সেক্ষিপ ঘটের সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তে দ্বৈধ কোনও ভাবে জাগে না, অসম্বন্ধেও তেমন জাগিতে পারে না। এই জন্ত বস্তুর অনুপলব্ধি সার্থক (real experience) হইতে হইলে এক্ষিপ হওয়া চাই যে, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেই বস্তুটি যদি থাকিত, তাহা হইলে উপলব্ধি হইত, নাই বলিয়াই দেখা যাইতেছে না। এইরূপ স্থলেই অভাব প্রত্যয় সার্থক বা real. ইহাকেই অভাব প্রত্যয়ের বা অনুপলব্ধির যোগ্যতা বলে। এই হিসাবে বিচার করিলে, সপ্তম রস থাকিলেও আমাদের জ্ঞান গোচর হইত না, কেননা তাহাকে গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্রিয়ই আমাদের নাট। সুতরাং তাহার অভাব জ্ঞানও নিরর্থক। প্রকৃতির অনুপলব্ধি সেক্ষিপ নিরর্থক নহে। কেন নহে, তাহা আমরা এট কারিকার ভূমিক্যুত্তেই বলিয়াছি।]

যাহা দেখিয়া প্রকৃতির অন্বেষণ হয়, সে



কার্য কি ? “মহৎ প্রভৃতি তাহার কার্য্য।”  
মহৎ প্রভৃতি যে প্রকৃতির লিঙ্গ তাহা ইহার  
দ্বারা প্রমাণ করিব। সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য চর্চাতে  
বৈকল্য হইয়া থাকে। এই কাব্য প্রসঙ্গে  
তাহার উল্লেখ করিয়া আচার্য্য বলিলেন, “ইহা

‘প্রকৃতির সদৃশ’ এবং বিসদৃশও নটো।”  
[ অতঃপর এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ধরিত্রী  
প্রকৃতি হইতে তাহাকে পৃথক বা বিবিক্ত করা  
নাইবে। ] ‘কল্পে, তাহা পরে বলি।

#

## আরণ্যক

—\*

“যন্তেন বাচঃ পদনায়গায়ন্ তামস্বনিন্দন পশিষু প্রবিষ্টাম্ ॥”

—ঋগ্বেদংহিতা—৩২৮

অগতে আর কিছু থাক না না থাক।  
আমার আমি কিন্তু আছি। আর সুবাই  
আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারে।  
কিন্তু আমি আমার হয়ে চিরকাল থাকবই।  
কাজেই এই আমিটিকে খুব ভাল করে বোঝা  
দরকার। আগে একে বুঝে নিয়ে তার পর  
সব কাজ। সব ক্রিয়ার আগে আসল কর্তা  
টার খোঁজ চাও—নইলে ক্রিয়া সম্পন্ন করবে  
কে ? তার পর কর্ম নির্দিষ্ট, সব শেষে  
তা নিষ্পাদন। ঋষিরা বেশ বুঝেই এই  
নিয়মে আমাদের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া পর পর  
ঠিক করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা খুঁজি  
উল্টো দিকে, তাই ফলও হয় উল্টো।

#

ভোগীর ধর্ম-পরায়ণতা কেবল লোক  
দেখানো। যিনি অধ্যাত্মজগতে উন্নতকামী,  
তিনি বাইরের বিধিভঙ্গ সমস্ত ভোগের মাঝে  
থেকেও বেছায় নিজেই তা হাতে বন্ধিত  
করে, দাতার বদলে সেই আসল দাতাকেই  
চাইবেন। অসংযতের যে বুদ্ধি, তা কিন্তু  
দাতার প্রতি ক্রোধে না করে তার দান

নিষেই বাস্তব ; বরং কি কোণে তা আরও  
অধিক আয়ত্ত করা যায়, সেট ফলদীর্ঘ করে।  
কিন্তু পরিণামে ভোগী পায় অক্ষয় মহান  
ব্রহ্মানন্দ, আর ভোগী পায় দুর্দিনের মন-  
ভুলানো অসুখ! ভোগোপকরণ। তাই নিষেই  
সে মজে থাকতে চায়—কিন্তু তাও টিকে না।  
যদি শাস্ত্র মন্ত্রণের অভিলষী হও, তবে সারা  
জীবন দুঃখ-কষ্ট পেলেও আগল লক্ষ্য ভুলো  
না। জেনো তোমার এই জীবনটুকু সেই  
মহাবস্তুর ভুলনার এত ক্ষুদ্র যে এমন অসংখ্য  
জীবন-পাতেও তার বিনিময় হয় না। অগত  
একটা জীবন যথার্থরূপে তার উদ্দেশ্যে  
নিবেদিত হলে, ‘তাকে পাই’ এই দৃঢ়  
বিশ্বাসে শত জীবনের দুঃখের বোঝা এত  
জীবনে বরণ করে নিতে পারলে, সে বস্ত  
এবারেই পাওয়া যাবে।

#

দুঃখ কষ্ট পেয়ে পেয়ে জীবনটাকে পাত  
করে দ্বিগুণ হচ্চেই। ভোগ্য বস্ত পেতে  
হলেও যেমন প্রাণপাতী পরিশ্রম করে তা  
অর্জন করতে হয়, মোক্ষ-বস্ত পেতে হলেও

তাই করতে হয়। উভয়তাই আপাততঃ কিছু কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু জীবনটা তো পাত করবার জন্তই। কিছুতেই একে ধরে রাখতে পারবে না। তবে এমন জিনিস পেতে হবে, যাতে দেহপাতের অমর হয়ে চিরকাল বেঁচে পাকা যায়। সেই হচ্ছে সত্য বস্তু। শুধু তাঁর জন্ত জীবনখানি প্রস্তুত কর—সূর্যের আলোকের মত, তা সকল কামনার উপর দিয়ে তার শাপ্ত আনন্দ-জ্যোতিঃ জীবন ধাক্কা করে দিয়ে যাবে।

✱

সেই ভালবাসি না কেন, দুইটা দেহ তখনও এক হয়ে যেতে পারে না! কিন্তু অধ্যবসায় দ্বারা দুইটা মন কেন, সমগ্র মনের সঙ্গে আমার মনটিকে মিশিয়ে দেওয়া যায়। সকলের অন্তরের সঙ্গে যোগ হয়ে মানুষ অন্তর্যামী হয়ে যেতে পারে। সকলের সঙ্গে যেখানে যোগ, সেখানে সকলের মাঝেও বিশেষ প্রিয়ব্যক্তির বাব পড়ে না। অথচ পূর্বের বিশেষে আর এই নিঃক্রিশেষের পরের বিশেষে আকাশ-পাতাণ্ড প্রভেদ। যাকে ভালবেসেছিলাম, তাকে আগে শুধু ঐ এক গম্ভীর অবয়ব মনে করে যতটো নিবিড় করে পেতে চেয়েছি, কিছুতেই মিশে যেতে বা মিশিয়ে নিতে পারি নাই। কিন্তু নিঃক্রিশেষের মাঝে অখিল গোন্দর্য্য দিয়ে গড়া যাকে চাইছি, সেই তখন বিশেষের রূপ ধরেও অবিশেষ হয়ে যায়। “মা থেকে” অপূর্ণক হয়ে থাকবে।

✱

জীবনের সার ভাগ পূরণ করাত হবে আনন্দ দিয়ে, আর তার জন্তই জগতে আসা, কিন্তু সে আনন্দ কি দুদিনের ভোগেই পর্য্য-

বসিত হবে? যে আনন্দ থেকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রায় চলে, সে আনন্দের কাছে পাকিল ভোগের আনন্দ কীত তুচ্ছ, তা ভালবে কি আর ওতে অবগতন করতে সাধ হয়?

✱

ছোট ছোট কামনাগুলিকে তুচ্ছ করতে আপত্তি নাই, যদি তাদের বিনষ্ট করবার শক্তি থাকে। অগ্নিকণাকে তুচ্ছ বল, কেননা তাকে সহজেই নিবিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র কামনার অগ্নিকণাটুকু এখনই নিবাত্তে না পারলে তাহলে তোমার অধ্যাত্ম-রাজ্যের সকল ইমারৎ পুড়ে ছার-খার হতে পারে।

✱

আমি বড় কিছা খুব ভাল, এ কথা সবাই ভাবে। কেননা এর মাঝে আত্মার সত্য ও মহিমা নিহিত রয়েছে। কিন্তু সে সত্য পিকৃত হয়ে জগতের মাঝে তুচ্ছ বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে। “আমি” যে কত বড়, তা কেউ ভাবতে চায় না—কিন্তু তা ভালবে দেখা যেত, যে বস্তু নিয়ে যার সঙ্গে মারামারি চলেছে, তাঁরা উভয়েই যে তারই জিনিস, বা সে নিজেই। জগতের সবটো যে একচেটিয়া হচ্ছেই আছে। কাজেই পাওয়ার তো কিছুই নাই—বিভিন্ন রূপে সব যে পেয়েই আছি—আমার চেয়ে পূণক লজ্জা কিছু থাকলে তো তাকে পেতে চাইব? কিন্তু এ কথা কেউ জানে না বলেই অহরহঃ ছুটাছুটি করে মরে।

✱

আত্মার মাঝে সকল বস্তুর স্বাদই নিহিত রয়েছে। তার জন্ত কোনও একটাতে মগ্ন থাকলে যে আরও লিপ্ত পড়ে। তাই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মজে যেতে নাই। ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক

তার পুতুল নিয়েই বাস্তু মৈ জানে না যে সে  
স্বয়ং রাজপুত্র বা দেশের রাজা। তবে রাজা  
যদি খেলায় কলে খেলের সঙ্গে পুতুল খেলেন,  
তবে জানব সেটা তাঁর খেলা-খুসীর কাজ,  
তার স্মৃতি-হৃৎখে তিনি পড়ে মরবেন না।  
কেননা খুসীতে খেলায় নেমেও তিনি যে রাজা,  
এই বোধ তাঁর হিতের রয়েছে। সংসারের  
কাজে আমরাই এমন রাজার অনুভূতি  
থাকলে হুঃখ কোথায়?

\*

দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে। একবার  
অসুর মাথা খাড়া করেছে, আবার দেবতা তার  
স্থানে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। জীবনে  
দিনরাত্ত্র এমনি ভাবেরই যাত্রাচলিত করছে।  
এক সময়ে শত চেষ্টাতেই কিছু হয়ে উঠছে  
না, আবার আর এক সময়ে এমন সব ঘেন  
হয়ে যাচ্ছে। 'কোনও চেষ্টা এমন কি একটি  
তুলস্পন্দনও জগতে বিফল হচ্ছে না, কাজেই  
সকল চেষ্টারই ফল অবশ্য এক দিন কল্যাণেই।  
কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবল এই  
আলো-আধারের রংএর খেলা দেখে যাও।  
চেউয়ের তালে তালে তোমার ঐ দেহ-  
মন নৃত্য করবে করুক—কিন্তু তুমি ঠিক হয়ে  
বসে শুধু নাচ দেখ, চেউয়ের ঘায়ে টলে  
পড়ো না।

\*

তোমার-আমার প্রভৃতি সম্বন্ধ যতক্ষণ  
রয়েছে, ততক্ষণই শিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি।  
পরমতত্ত্ব পীড়ালে কিন্তু অবাঙ মানসগোচরম্।  
কিন্তু তবু এই অকা-রন নিয়েই পথম যাত্রা  
সুক করতে হবে। তাই, উপনিষদ আবার

বলছেন, তিনি শ্রোতা, মন্তব্য—তাঁকে  
শোনা যায়, মনে করা যায়; অর্থাৎ এই মন-  
বুদ্ধি নিয়েই প্রথম কাজ আরম্ভ করে এদের  
নষ্ট করতে হবে। তার পর যখন তোমার  
সুদৃশ্যকিরণ পরাচাঠা হয়েও তাঁর নাগাল  
মিলছে না দেখে পাণ অর্তিষ্ঠ হবে, তখনই  
সমস্ত অন্তরারত হবে—ওপারের আলো এগে  
পণ দেখিয়ে নেবে।

\*

প্রত্যেক গ্রহেরই একটি আকর্ষণ-শক্তি  
রয়েছে। আমাদের মন বা চক্ষুকে বাহ্যিক  
স্থল বিষয় বা পৃথিবী নিয়ত আকর্ষণ করছে।  
কিন্তু যদি কোনও শক্তিবলে এই আকর্ষণের  
এলাকা ছাড়িয়ে সূর্য বা পরমতত্ত্বের এলাকায়  
তাকে নিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে পূর্ণ  
বেগে আবার সেট দিকেই তার গতি হবে।  
তাই চাই শুধু এই দৃষ্টিপূর্ণ মাধাকর্ষণের  
ছেদনা। অন্যতর আকর্ষণকে জয় করতেই  
হবে। মন নিষ্ক্রিয় নয়, তাকে এই পুতি-  
গন্ধময় স্থান থেকে তুলে নিয়ে পুষ্পোদ্যানে  
রাখলে এই মনই তখন দেবতা; যোগ্য হয়ে  
সেখানে ফুটে উঠবে। তার পরে কেউ তাকে  
নিয়ে পুজায় দিক বা বিলাসের উপকরণ  
করুক, তাতে সেট চয়নকারীর রুচি বা চোখের  
পরিচয় হবে, ফুলের তাতে কিছু যাও আসবে  
না। তাই অত সাধন-ভজন করে সদ্ধ হয়ে  
কত মহাপুরুষ আমাদের দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে  
বসে রয়েছেন দেখতে পাই। কিন্তু তাঁর  
অবস্থা লাভ না হলে কে তার কর্ম-রহস্য  
বুঝবে।

\*

সাততালার উপর যিনি রয়েছেন, তিনি

নাচের সব দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু নীতের কেউ তাঁর দিকে নজর দিচ্ছে না—আপন আপন পুঁটুগীবাধার বাস্তবায়নের শক্তি হরণ করেছে। ত্যাগী ভোগ ও যোগ উভয়ের

আনন্দে ভগ্নপূর্ণ, ভোগী কিন্তু যোগেণ কোনও তত্ত্বই খুঁজে পায় না। তাহলে বেশী লাভ হল কার ?

#

## দানপ্রাপ্তি

—:~:—

জেলা ময়মনসিংহ—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার চৌধুরী জমিদার নারায়ণউহর ২০১,।

বিহার—পাটনা

শ্রীযুক্ত পি, আর দাস জজ পাটনা চার্জ কোর্ট ২০১, শ্রীযুক্ত এ সেন ব্যারিষ্টার ৪১, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভাটজী উকিল ৪১, শ্রীযুক্ত জ্ঞাননাথ সিংহ (চেয়ারম্যান অব ট্রিউনিসিপালিটি) ১৪১, ডি, এন্ সেন প্রিন্সিপাল পি, এন্ কলেজ ৩০, শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র সাহা স্পার্টস্‌ম্যান অব বিহার উডিয়াম কাউন্সিল ৫১, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গুহ প্রফেসর ইঞ্জি: কলেজ ৩১, শ্রীযুক্ত ডি, এন্, ঠাকুর সেক্রেটারী অব বিহার উডিয়াম কো: অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ৫১, পি, জন্, পিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ৩১, এন্ সি ঘোষ ডাক্তার ২৫০, কে, এন্, রাও ২০১, শ্রীবল্লভ যশোধর ৫১।

দুইটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—এম, এন্, ঘোষ ডাক্তার, হীরালাল দাসগুপ্ত উকিল, সমীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুনীলকুমার বানার্জি, শ্রী প্রসাদ মুখার্জি, মনোরঞ্জন ঘোষ, সতীশচন্দ্র সেন ডাক্তার, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত,

তারাশদ মৈত্র, যোগেশচন্দ্র দত্ত ডিপুটিম্যাজিষ্ট্র, রামঅক্ষয় মল্লিক, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এ, আর, পি, এম, জ্যোতীশচন্দ্র গুহ প্রফেসর ইঞ্জি: কলেজ, ক্রিশ্ণনাথ চাটার্জি চেড্ এসিষ্ট্যান্ট গবর্নমেন্ট প্রিন্টিং, নরেন্দ্রনাথ দাস, অমরনাথ চাটার্জি, ডিপুটি মেকিষ্টার, এম্ এন্ মুখার্জি, অক্ষয়কুমার সেন, ডি, সি, গুপ্ত, বিমানাবধারী বসু, ভুবনমোহন দাস, ইঞ্জিনিয়ার, হর্গা প্রসাদ রাই, হরিশচন্দ্র চৌধুরী ক্রিমিওদে সেন ইঞ্জিনিয়ার, নীলমণি চাটার্জি প্রিন্সিপাল সেন শ্রীহার চক্রবর্তী ডক্টর হরিচন্দ্র গণেশ দত্ত সিংহ মিনিস্টার নওল কিশোর-প্রসাদ উকিল।

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—বিবেকানন্দ দে উকিল ময়ম নথি দে, উকিল, বাক্ষরচন্দ্র মিত্র উকিল সোনালাল বসু উকিল সুরেন্দ্রনাথ দাস উকিল মথুরানাথ সিনা উকিল প্রভাতচন্দ্র ঘোষ উকিল নির্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত উকিল অচলেন্দ্রনাথ দাস উকিল ইন্দ্রভূষণ পিয়ার উকিল গঙ্গাচরণ মুখার্জি উকিল জি, মুখার্জি উকিল দাক্ষণ্যরঞ্জন ঘোষ সুনীলানন্দ সেন, ডাক্তার এম্ পি সার্যাল ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ দাস উমাশঙ্কর মুখার্জি ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডাক্তার প্রিয়নাথ চাটার্জি ডাক্তার ফণীভূষণ মুখার্জি ডাক্তার এস্ কে ঘোষ দস্তিদার ডাক্তার বাখালদাস হাজারা ডাক্তার বি সি সেনগুপ্ত ডাক্তার টি সি বানার্জি ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ডাক্তার আশুতোষ চাটার্জি প্রফেসর পাটনা কলেজ নিবন্ধন নিয়োগী প্রফেসর পাটনা কলেজ ভারকনাথ ভালুকদার প্রফেসর পাটনা কলেজ এস্ ভাট্টাচার্য প্রফেসর পাটনা কলেজ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রফেসর বি এন্ কলেজ রমেশচন্দ্র মুখার্জি প্রফেসর চঞ্জিঃ কলেজ হুগাঁচরণ দাস জ্যোতিষচন্দ্র বানার্জি ভারাপদ মুখার্জি সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত শরৎচন্দ্র সেন অরুণকলচন্দ্র সরকার পি সি আর কান্ত হুগাঁপদ সরকার আর কে দত্ত শশীপদ বানার্জি প্রমথনাথ বানার্জি প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী পঞ্চানন দাস খগেন্দ্রকুমার ঘোষ পরোধচন্দ্র দত্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সতীশচন্দ্র গুপ্ত এস্ সি ঘোষ চারুচন্দ্র চৌধুরী রামনিষ্কু কর্ণকার সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জি রায়সাহেব নলিনীমোহন দাসগুপ্ত বিনয়ভূষণ চাটার্জি দেবেন্দ্রনাথ সিংহ নিখাস ভেমসঙ্গ রায় দেবেন্দ্রনাথ দাস উমেশচন্দ্র পাড়ে সীতেশ্বরজন দাসগুপ্ত ভারকনাথ দেব জেইলার সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য জেইলার ডাক্তার মধুসূদন মুখার্জি বি এম গুহ কালীচরণ কর্ণকার অনিষ্টমোহন বানার্জি রামলাল অপিকারী পি বি মুখার্জি প্রিয়নাথ বসু প্রোধচন্দ্র চাটার্জি বতীন্দ্রনাথ দে প্রমথনাথ চাটার্জি পি সেন গুপ্ত

গাহা

মোহন শ্রীমৎ কৃষ্ণদয়াল গিরি ১৫৮

শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য ডাক্তার ২৮, শ্রীযুক্ত

অনিলচন্দ্র দত্ত ডাক্তার ২৮, মোহন শ্রীমৎ রামদন পুণী ৫৮, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বানার্জি ২৮, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী জেইলার ৫৮, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্তী ২৮, শ্রীযুক্ত কানাইলাল বানার্জি ২৮, মিঃ এ. কেমস্ ১০০, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রমাণ সেন গুপ্ত মনোম ২৮, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কেশবনাথ ২১০, শ্রীযুক্ত ক্ষতিচন্দ্র মিত্র ২৮, মুকুন্দপুত্রের রাজা বাহাদুর ২৮, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র ২৮, শ্রীযুক্ত ভারপ্রসাদলাল রায় ২৮, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ উকিল ২৮, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মল্লিক মানোজার টম্পারিয়াল বালক ২৮, বি. মল্লিক ডাক্তার ২৮।

একটাকা করিয়া—

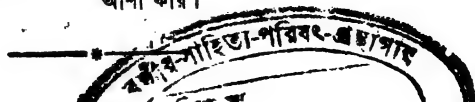
শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল মজুমদার ডাক্তার এস্ গুপ্ত ডাক্তার অশ্বিনচন্দ্র মিত্র জেইল ডাক্তার ভেমস্কুমার চক্রবর্তী উকিল বতীন্দ্রনাথ দাস উকিল হরিদাস বসু উকিল হরিপদ গুপ্ত উকিল গিরিশচন্দ্র সেন জেড্ মাষ্টার পি সি ভট্টাচার্য শিক্ষক ভূতনাথ বসু শিক্ষক নিতাইজনন রায় শিক্ষক পাচুগোপাল চাটার্জি পোষ্টমাষ্টার উমাপ্রসাদ বানার্জি অণীমোহন সেন গুহরলাল সিনা ফণীন্দ্রনাথ সিংহ জ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল উপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল নগেন্দ্রনাথ বসু কালীপ্রসন্ন গুপ্ত চামার সাহ লালবাবু ব্রজবিহারী লাল ত্রিবেণীপ্রসাদ সিংহ রায়প্রসাদ ভালুক মতাই জেড্ মাষ্টার দেউকীনন্দনপ্রসাদ উকিল রায় সাহেব রাধাকিশন বলরাম কিশোর শিক্ষক মৌলভী নবীকৃষ্ণ গা এইচ্ সি এইচ্ স্কুলের শিক্ষকগণ ৩০০, সংগৃহীত ২০০০।

(ক্রমশঃ)

## সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিপতি শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধাম হইতে ৩রা মাঘ তমলুক আসেন; তথা হইতে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে যান। ইতিমধ্যে তাঁহার হালিসহর দক্ষিণ বাকাল্য সারস্বত আশ্রমে পরদর্শি করিবার কথা আছে। এতৎসর হরিবার স্ক্রুজি ত্রিদি বোগদান করিবেন কিনা, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

নানা দুর্বিপাকে গত মাসের পত্রিকা আমরা যথা-সময়ে প্রকাশিত করিতে পারি নাই। সেই অনুপাতে এই মাসের পত্রিকাও বহু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। এক্ষণে অমং দুঃখিত। কাল্জান মাসের পত্রিকা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে গ্রাহকবর্গের হস্তগত হইবে বলিয়া আশা করি।



ও ৩২ সং



# আমি-দ পত্র

১৯শ বর্ষ

সমষ্টি সং ২০০

ফাল্গুন

দ্বিতীয় খণ্ড  
পঞ্চম সংখ্যা

কলিকাতা

## জ্যোতিষবো

—\*—

কগেদ-সংহিতা—৩৩:৪-২৫

—\*()\*

[ প্রজাপতি পুত্রিঃ—বিষদেবা দেবতাঃ—ত্রিষ্টপ চন্দঃ ]

—\*—

মহি মহে দিলে অর্চনা পৃথিবো  
কামো ম ইচ্ছবরতি প্রজানন।  
যস্যোহ স্তোমং বিদথেশু দেবাঃ  
সপর্যাবো নাদস্যস্তে সচাস্যোঃ ॥

বিশ্বল জ্যলোকে পূজ, আর পূজ বিপুল ধরারে—  
অধির কামনা মমকারে খুঁজি ষিদ্ধিরারে বারে।  
যজ্ঞভূমে, মানুষের মূরে আসি স্মৃকণ্ঠ সিলায়,  
বাড়াতে মহিমা যার দেবগণ স্তুতিগাথা গায়! ১১

‘সুবোধা’তঃ রোদসী সত্যমস্ত

মহে যুগঃ সুরিতায় প্রভুতম।

ইদং দিনে নমো অগ্নে পৃথিবৌ

০ সপর্যায়ি প্রযসা যামি রত্নম্॥

‘সত্য হোক্, হে রোদসী, তোমাদের স্বত সনাতন,

কল্যাণে ভূষিত কর—সার্থ কর যত আয়োজন;—

দ্যুলোকে নমিলাম—এই নমি পৃথিবীতে আর—

সাক্ষী তুমি হতাশন—দিমু অন্ন, যাচি রত্নভার।

উতো হি বাহু পূৰ্ণা আবিরিষ্ট

ঋতাবরী রোদসী সত্যবাচঃ।

নব্রশ্চিদ্ বাহু সন্নিথে শূরসাত্তৌ

ববুন্দিরে পৃথিবি বৈবিদানাঃ॥

তোমরা যে চিরকাল করিয়াছ স্বত-সম্বাহন,

ঋগিরা জানেন তাহা, সত্যবাচী যারা পুরাতন।

আজ্ঞা দেখ, হে ধরণী, জানে যারা তব গুণগাথা,—

মহারথি-মহাহবে তোরি পায় নোয়ায় যে মাথা।

ক অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচদু

দেবী অচ্ছা পথ্যাকা সন্মৈতি।

দদুশ্চ এষামবমা সদাহনি

পন্থেবু যা গুহেবু ব্রতেবু॥

সত্যেরে জেনেছে কে? কে এনেছে হেথা তার বাণী?

কে পেয়েছে দেব-পায় নিয়ে যায় সেই পথখানি?

অধোমুখ গৃহ যত ইঁহাদের ওই দেখা যায়—

সন্মোপন ব্রতসাধি গিলে তাহা আকাশের গায়!

কবি নৃচক্ষু অতি শীমচষ্ট

ঋতস্ম্য যোনা বিয়তে মদন্তী।

নানা চক্রাতে সদনং বেঃ

সমানেন ক্রতুনা সহবিদানে ॥

সাক্ষী যিনি জগতের অংশুমালী, চিরন্তন কবি, .

দেখেছেন ঋতমূলে রোদসৌর হর্ষোজল ছবি, .

সমান দৌহার কর্ম, তাই দৌহে বড় ভালবাসা,

বিচিত্র সদন রচে—পাখী যেন বাঁধে বহু বাঁসা।

..

সমান্যা লিখুতে দূরেঅন্তে

প্রবে পদে তত্বতুর্জগৎকে। .

উত অসার্য যুবতী ভবন্তী

আদুর্করাতে মিথুমানি নাম ॥

.

দুটিতে সমান তারা, মেণামেশি—কভু দূরে রয়,

রহে জেগে চিরকাল, প্রবপদে রচেছে আলয়!

তরুণী ভগিনী যেন দুটি তারা মিলে-মিশে থাকে—

এক ঠাই থাকে তাই এ উহারে জোড়নামে ডাকে।

.

বিশ্বেদেতে জনিমা সহবিরক্তে।

মহো দেবান্ লিখন্তী ন বাথেতে।

এজদপ্রবং পত্যাতে চন্দ্রদেকং

পতত্রি বিশ্বনং বিজাতম্ ॥

.

জনমে যা বিশ্বমার্থে, তাহাদের রাখে ঠাই ঠাই,

মহাদেবকূলে বহি এ দৌহার কভু ক্লান্তি নাই!

চকল অথবা প্রব, চরে কিরে কিন্না উড়ে যায়—

বিচিত্র জন্ম, বাস—সবি এসে একেতে মিলায়!





## আত্মরক্ষা

—\*—

আত্মরক্ষার চেষ্টা জীবমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। জরুরী কণ্ঠে পারি, অধ্যাত্ম-জগতেও এই নিয়ম পাটনে। সত্যের প্রতি অনুরাগ যদি মানুষের স্বাভাবিক না হইত, তাহা হইলে সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিত না। অথচ মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব। আত্ম-পুষ্টির চেষ্টা তাহার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সমাজরক্ষার দায়িত্ব দ্বারা সে চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া জ্ঞান, সত্য, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলি স্বভাবতঃই তাহার মাঝে বিকশিত হইয়া উঠে। সমাজের জন্য মানুষ যতখানি কষ্ট ও নির্যাতন সহিতে পারে, তাঁহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিকই অসংকট হইতে হয়। অধ্যাত্মজগতে আত্মরক্ষার চেষ্টা তাহার এই যৌথসংস্কার হইতে উদ্ভূত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখার বিষয়।

মানুষ আত্মার সন্ধান পাইয়াছে। জীবনকে অতীতের স্মৃতি দ্বারা সজীবিত রাখিতে শিখিয়াছে, ভবিষ্যতের আশা করিতে জানিয়াছে। এই সমস্ত গুণে সাধারণ জীব-জগত হইতে সে বহু উর্ধ্বে। তাই সত্যানুসারগ তাহার অন্ততম স্বভাবগুণ। কিন্তু মানুষের মাঝে পশুদের প্রকৃত্বও স্বেচ্ছা-নিত্যা-সামান্য নহে। আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ তাহার সেই পাশব প্রেরণা। পশুও দেবত্ব জন্মের সংমিশ্রণে সাধারণ মানবের চরিত্র গঠিত হইয়াছে। সামাজিক শাসন বা যৌথসংস্কারে মানুষ পশু-স্বৰূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেবত্ব উন্নীত হইতে চেষ্টা করিতেছে—ইহাই বোধ হয় প্রাকৃত-

সাধারণের 'অধ্যাত্মজগতের' কঠামো। এই হিসাবে দেখি, সত্যানুসারগ মানুষের মজ্জাগত হইলেও সে গুণ বিকশিত হয় সমাজের শাসনে। মানুষের অধ্যাত্ম চর্চা কতটুকু নিজের খাতিরে, কতটুকু বা পরের খাতিরে, তাহা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। ফলে কেতাহুক্ষণ চালচলন অধ্যাত্মজগতেও বেমালুম চালায়া যায়—এমন কি যেখানে আমার 'জীবন-দ্বিতী' করিবারও কেহ নাহি, সেখানেও! এই অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া তাহাকে যথার্থ আত্মনির্ভরশীল করিতে শিক্ষা দেওয়া একটা মহা দায়িত্ব।

ভগবান্ মানুষের নগ্ন-দণ্ড নিতান্ত অকর্ণণ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাহার করুণার বিশিষ্ট সঙ্কেত। প্রমাণ হয়, আত্মরক্ষা করিতে মানুষকে গুলির প্রয়োজন হইবে না। ইহা, হইতে একটা বিপরীত সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাই—আত্মপ্রসারণই মানুষের আত্মরক্ষার অমোঘ সঙ্কেত। 'কিঙ্ক গৃহের বন্ধ বায়ু মৃত্যু-নীমে পরিপূর্ণ। তাহার বিস্তৃতি ঘটাইতে হইলে প্রাচীর-স্তম্ভাদি বায়ু চলাচলের পথ করিতে হয়। মানুষেরও নিয়তি তাই। অতঃপর্যায় করুনায় শলাকুর মত নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া কাঁটা বাহির করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। খুঁটে চড় খাইয়া গাল পাতায়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিটশে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, যেমন উনি মেসপাল, তেমনি সেয়ের ধর্ম্মই শিখাইয়াছেন বটে। বোধ হয় খুঁটের কথাটা অতিরিক্ত মোলায়েম

করিতে গিয়া নিস্তেজ ক'রয়া ফেলা হইয়াছে।  
বুদ্ধদেব আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তুমি নিজের  
ক্রোধ না হইয়া অপনের ক্রোধকে জয় কর, মত্যা  
কথা বলিয়া অসত্যকে পরাভূত কর, নিজে  
দান করিয়া কৃপণকে লজ্জা দাও।—এ-এ সেট  
একট কপা, কিন্তু বলিবার মতেজ ভঙ্গীতে  
মনকে উদ্বীণ করিয়া তোলে; বিশেষতঃ  
মনস্তত্ত্ব দিক দিয়া কার্য্যকারণের শৃঙ্খলাটাও  
এখানে স্পষ্ট। গীতার আরও তেজের  
সহিত বলিলেন, “যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ” মনে  
জালা না রাখিয়া অস্ত্রায়কে আঘাত কর।

বিভিন্ন ধর্ম্মের সাংক্ৰান্ত এত সমস্ত বাণী  
হইতে প্রমাণিত হয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা আত্ম-  
রক্ষার মূল-মন্ত্র। অস্ত্রায়কে নির্জিত করিবার  
তিনটা ভঙ্গী উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে;  
—তিনটির মূলেই ওট কথা—তুমি নিজে  
অটল থাক। কেহ আঘাত করিল বলিয়া  
তুমিও আঘাত করিবে? যদিই না কর্তব্য-  
বোধে আঘাত করিতে হয়, নির্ম্মল চিত্ত লক্ষ্য  
আঘাত কর। শেষের কথাটা হুঃসাহসী  
কথা বটে, কিন্তু গভীর সত্য। আত্মপ্রতিষ্ঠার  
চরম পরীক্ষা এইখানে।

আত্মরক্ষার এত নীতি সমাজও পাটে,  
ব্যক্তিগত জীবনেও খাটে। কিন্তু তাহা বুঝা-  
ইবার পূর্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার অগাধ ভাসিয়া বলা  
প্রয়োজন।

সোজা কথায় বুঝি, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থে  
নিজকে বড় করা। সবাই যদি ঠেলাঠেলি  
করিয়া বড় হইতে চায়, তাহা হইলে সংঘর্ষ ও  
অশান্তি অবশ্যজারী। পশু-জগতেও, তাই  
দেখিতে পাই। অথচ সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া  
থাকিবার উপদেশ দিলে চলবে না—ফেন

না সে উপদেশ পালন করিবার সামর্থ্য জীব-  
প্রকৃতির নাই। রবীন্দের বলে ছুঁ দিয়া বাতাস  
ভরিয়া রাখিলে সে বাতাসটা যেমন ক্রমাগতই  
ঠেলিয়া বাতির হইতে চায়, বলিয়া বলটাকে  
ফাঁপাইয়া তাক্সা করিয়া রাখে, মাহুঘের  
ভিতরেও তেমনি একটা কিছু ক্রমাগত ঠেলিয়া  
বীতিব হইবার চেষ্টা করিতেছে। অজ্ঞানের  
প্রাচীরে বাধা পাইয়া উঠা অভিমানের আকারে  
ফাঁপিয়া উঠিয়াছে এবং যেখানেই আঘাত  
পাইতেছে, সেখানেই লাফাইয়া লুপ্তপানে  
উঠিতে চাতিতেছে। তাই বলিতেছিলাম,  
নিজকে বড় করিবার চেষ্টা সকলের মাঝেই  
স্বাভাবিক। একপ ক্ষেত্রে সংঘর্ষ না বাধাইয়া  
কি করিয়া সকলের মাঝে বড় হওয়া যায়, ইহা  
ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

ফাঁপা বলের গায়ে একটা চিত্র করিয়া  
দিলে বলটা চুপসিয়া যাউবে, কিন্তু ভিতরের  
বাতাসটার ব্যাপ্তি অতএব মুক্তি ঘটবে।  
বলটাকে তখন আছড়াইলেও আর সে লাফা-  
ইয়া উঠিবে না। নিঃশব্দে বড় হইবার এই  
সহজ সঙ্কেটটাই খুঁটেন ও বুদ্ধের বাণীতে প্রকাশ  
পাইতেছে। মূল-মন্ত্র আত্মপ্রমাণ না প্রেম।  
খুঁটে বলিলেন, শত্রুকেও ভালবাস। কথাটা  
অসমঞ্জস। শত্রুজ্ঞান থাকিতে ভালবাসা  
আসিলে কোথায় হইতে? তাই ভাবিয়া  
চিন্তিয়া বুঝিতে হয়, এটা একজনকে শত্রুতার  
কথা হইতেছে; তোমার শত্রু থাকিতে  
পারে, কিন্তু তুমি শত্রু-স্বরূপ নও। আরও  
একটু আগাইয়া গেলে গীতার কথায় বলা  
যাইতে পারিবে, অরি, বন্ধু, উদাসীন—সক-  
লের প্রতি সমভাবে পর হও। বুদ্ধদেব বলিলেন  
মৈত্রীভাবনা দ্বারা ব্রহ্মবিহার করা ভাল,  
আমার হৃদয়ের প্রমত্তোত্তাপঃ নিখিল জগৎকে

প্রদানিত করিয়া ছাড়িয়া পড়িয়াছে; আমি কাঁহাকেও হিংসা করি না, এমন কথাও নয়, তার চাইতে বড় কথা—আমাকেও কেহ বেধ করে না—বাস্তবিকই না! আমি কখনাই করিতে পারি না, আমাকে কেহ হিংসা করে কি করিয়া, কেননা মৈত্রীভাবনা দ্বারা আমি হিংসার অর্থট ভুলিয়া গিয়াছি। স্বপক্ষে ভ্রমের কথা, পরপক্ষেও হিংসার অস্তিত্বই আমি জানি না!

বুদ্ধদেবের এই ভাবনার আর তুলনা নাই। শত্রু হইতে আত্মরক্ষার এই অমোঘ সঙ্কেত—শত্রু কথাটার অর্থ পর্যন্ত ভুলিয়া যাও—সর্বভূতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও!

কিন্তু কথাটা আর এক দিয়া ভাবিয়া দেখিতে হয়। খ্রীষ্টনীতি বা বুদ্ধনীতির মূলে আত্মস্বাতন্ত্র্যের কথাটা বড় হইয়া দেখা গিয়াছে। নির্দ্বিকার হইয়া অপরের আঘাত সহ্য করার মাঝে পৌরুষ আছে বটে কিন্তু সামাজিকতা নাই। মৈত্রীভাবনার সমস্ত জগৎ সম্মিলিত হয় আমারই একান্ত অন্তর্ভূতির মাঝে; দ্বন্দ্ব-কোলাহল-পূর্ণ বহির্জগতে এই ভাবনার কোনও বাস্তব ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই না। হয়ত কোনও ক্ষাত্রনীতিবিদ ইহারই মধ্যে *Passive resistance* রূপ ঈর্ষ্যের বলের সন্ধান পাইয়া বক্র ইচ্ছিতও করিতে পারেন। অবশ্য মহত্তম মানবধর্মের দিক দিয়া বিচার করিলে এ কথার জবাব দেওয়া ঘাইড়ে পড়বে বটে, কিন্তু জগতের সঙ্গে একরূপ সমন্বয় বা *synthesis* দ্বারা সম্বন্ধস্থাপনের পূর্বে যদি চহা অপেক্ষাও কোনও অধিকতর অর্থক্রিয়াকারী নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে একবার তাহার পরখ করিয়া দেখিতেই বা আপত্তি কি?

আমাদের মনে হয়, খ্রীষ্টকর্মের নীতি বাস্তব-

জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া উহা আদর্শ হিসাবে অল্প নীতি অপেক্ষা উন্নততর। গীতাকার যে বলিয়াছেন, মনে জালা না পুষ্টি লাড়াই কর—এ কথাটা শাস্তিকামীর পক্ষে ঐতিকটু হইলেও অতি উদ্ভবের কথা। আত্মস্বার্থে অন্ধ হইয়া আঘাত করাকেই মীমাংসার প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় মনে করিয়া থাকে, তাই আঘাত করাটাই নিন্দার কাজ একরূপ একটা দারণা সাধু সমাজে বহুমূল আছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে প্রশ্ন হয়, বাস্তবিকই কি তাই? আঘাত অর্থেই হিংসা এবং হিংসা অর্থই পাপ, একরূপ সমীকরণের কোনও ভিত্তি আছে কি? একদিন বুদ্ধ তার্কিক এই সূত্র ধরিয়া মীমাংসকের যজ্ঞবিধিকে পষ্যাদস্ত করিয়া বেদপন্থাকে ভেদ প্রতিলম্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মীমাংসক জবাব দিয়াছিলেন, হিংসা মাত্রই অন্ত্যায় নয়—যজ্ঞার্থ হিংসা *bonafide* হিংসা, উদ্দেশ্যে পাপ বলিতে পারি না। কথাটা অল্প ভাবে সত্য বটে। আত্মস্বার্থ এবং হিংসা যেখানে জড়িত, সেখানেই পাপ; কিন্তু পরার্থে ভাগের সঙ্গে জড়িত হিংসা পাপ নয়—ইহাই বৈদিক জগতের মনোভাব। ইহার হেতুও আছে। হিংসাবর্জন অসম্ভব; সুতরাং নীতিশাস্ত্রানুযায়ী, কাজ দেখিয়া এখানে পাপ-পুণ্য বিচার করিলে চলিবে না, দেখিতে হইবে অভিসন্ধি। যেখানে ফলাভিসন্ধি নাই, সেখানে কর্মজনিত পাপস্পর্শও নাই; অথচ সামাজিক দ্বায়ে হিংসা প্রয়োজন হইতে পারে। এই সূত্র এবং সত্যবিচারের উপর ভিত্তি করিয়া খ্রীষ্টকর্ম আদেশ দিলেন, “মুখ্যং বিগতভ্রমঃ।” গাণ্ডীশ খসিয়া পড়িলে চলিবে না—কাঁপুনি ধামাইতে

হটেবে; অসত্যের সঙ্গে শুধু Passive resistance নয়, Active resistance ও চাই! অদৃঢ় মনের কোনে জালা রাখিতে পারিলে না।

শ্রীকৃষ্ণ দূর হটেবে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিলেন না; একবারে বিপ্লবের মাঝে নামিয়া সযাসাচীর মত অস্ত্রায়ত্নে আঘাত করিয়া আঘাত ফিরাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হটেবে। এ নীতি কঠিন, অতি কঠিন; কিন্তু অতি সত্য, অতি স্বাস্থ্যকরও বটে।

এতকণ আত্মরক্ষার সামাজিক দিকটা নিয়তি আলোচনা করিলাম। দেখিলাম, যেখানে বিরোধ অবশ্রম্ভাবী, সেখানে নিরোধকে জয় করিবার ক্ষমতা হয় নিঃশঙ্কে উদ্বার হইয়া যাও, বাধার সৃষ্টি করিও না, (খৃষ্ট ও বুদ্ধ নীতি), নতুবা বাস্তবদেবকে জয়ই রাখিয়া নির্যম ও নিবহৃত্য হইয়া প্রাণপণে আঘাত কর—কিন্তু জয়লব্ধি বন্টনের সময় চুপিচুপি সরিয়া পড়িও। আত্মরক্ষার এট ছোট্ট বিধিই সুন্দর—সমাজস্থিতির অত্যন্ত অসুস্থ। সামর্থ্য অনুযায়ী, অধিকারী অনুযায়ী এট ধর্মের সেবা করিতে হটেবে।

কিন্তু যেখানে লড়াইটা আনার নিজের সঙ্গে, সেখানে কোন নীতি অবলম্বন করিব, এমন তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হটেবে। আমার অত্যাচার হটেতেও তো আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হটেবে। সুপর্ব্বক্ষে এ কথাটা চর্জিত করিয়াছিলাম।

অধ্যাত্মজগতের আত্মরক্ষার অর্থে প্রবৃত্তির হাত হটেতে নিজকে বাঁচানো। আপনা হটেতেই প্রবল জাগে, প্রবৃত্তি মোহিনী, তাহার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিব না কেন? উত্তর পাই সমাজস্থিতির মাঝে। আমি সামাজিক

জীব; কিন্তু সমাজ থাকিতে হটেলেই অপ-  
নের প্রবৃত্তির সঙ্গে আমার প্রবৃত্তির একটা  
রক্ষা চাই। কাজেই বাধা হটেয়া আমাকে  
প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিতে হয়। প্রবৃত্তি সঙ্কোচে  
কষ্ট আছে, আবার কেনে জানি না একটা  
আনন্দও আছে। লোকে প্রবৃত্তি সঙ্কোচ  
করিতে দেখিলে, আমাকে বাঁচনাও দিবে,  
অপনের উপর সাধুদের প্রভাবও বিস্তৃত  
হটেবে—অতএব কেন প্রবৃত্তি সঙ্কোচ না  
করিব? এইরূপে দেশের সঙ্গে বিনিময়ও  
করিতে গিয়া প্রবৃত্তিকে খাটো করিতে করিতে  
দেশে নিরুত্তির পরমধর্ম বলিয়া মনে হয়।  
তখন প্রবৃত্তি পূরণ যদি সুশক্তও হয়, তবুও  
তাঁহাকে দেখাইয়া দিই অর্থাৎ প্রবৃত্তি হটেতে  
আত্মরক্ষা করি। আবার কখনও কখনও  
“অবশঃ প্রকৃতিবশাৎ”—প্রবৃত্তিকে ঠেকাইয়াও  
রাখিতে পারি না। কিন্তু ঠেকাইয়া রাখি, এ  
আমার একান্ত ইচ্ছা।—এই ইচ্ছা সাধারণ  
মানুষের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার উচিতাস।

এট প্রচেষ্টার মূলে যে আত্মার গভীরতর  
সত্যানুভূতি অহংকঃ প্রেরণা জোগাইতেছে,  
সামাজিক জীব কিন্তু তাঁহা দেখিতে পারি না।  
তাঁহা চালাটা করিয়া তাঁহাকে প্রবৃত্তি ঠেকাইতে  
হয়; ফলে সে লজ্জা মানুষ না হটেয়া একটা  
কৃত্রিম জীব হটেয়া পড়ে।

আত্মার মধ্যে, সৃষ্টি রাখিয়া কি করিয়া  
মানুষ সহজ হটেয়া গড়িয়া উঠিতে পারে,  
তাঁহার কোনও সোজা পন্থা আছে বলিয়া  
জানি না। সুতরাং সেই পথ বাৎলাইবার  
চেষ্টা করিব না। শুধু একটুকু বলিতে পারি,  
মনের প্রতি শ্রীতি না জন্মাইলে প্রবৃত্তিকে  
সহজ ভাবে পরিচালিত করা যায় না। সংহত  
হিংস্র, অসুর ও হিংস্র—বিশ্ব-সোহাগিনী হুয়ের  
উপরই পা রাখিয়াছেন।

ধনিতা নিলাম, অস্বঃপ্রেরণা বেশ নয়, কেবল সামাজিক শাসন বা যৌথসংস্কার হইতে আমাকে প্রবৃত্তির অভ্যাস আর হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তখন কোন পথ অবলম্বন করা আমার পক্ষে শ্রেয়? বুদ্ধের না শ্রীকৃষ্ণের?

এখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নীতিই সর্বপ্রথমে প্রযোজ্য হইবে। প্রবৃত্তিদমনের একেবারেই সেট কথা—যুগ্মসংগতজ্ঞঃ। আরও কথা আছে—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু, অতএব আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করণে, আত্মাকে অবগত করিবে না। কিন্তু এই বুদ্ধেও তাপ পুসিয়া রাখিলে চলিবে না; অর্থাৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ, কিন্তু হারিলেও বলিতে হইবে গোবিন্দের ইচ্ছা, জয় লাভ করিলেও বলিতে হইবে তাঁরই ইচ্ছা! যদি তাঁর ইচ্ছাই হয়, হারিলেও তো অমুশোচনার কিছুই নাই—আশঙ্কারও কিছুই নাই! প্রয়োজন হইলে আবার লড়িও, কিন্তু জয় পরাজয়ের চিন্তা এবার নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিও। আত্মরক্ষার এই নীতি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত উপযোগী। সামাজিক হিসাবে পরস্পরকে অবজ্ঞা—কিন্তু আত্মাভিমান হিসাবে আত্মপীড়ন

সুসহ হইলে কল্যাণের কারণ। তবু মাত্রা ঠিক রাখা চাই।

আত্মরক্ষার নৌক বিধানও আছে। কিন্তু তাহার আচরণ বড় কঠিন। প্রবৃত্তিকে বাধা দিবারও প্রয়োজন নাই—কিন্তু নিজকে বিবর্তিত রাখ। হাঁস যেমন জলে চরে, কাদা ঘাঁট, পান্না কাটে—কিন্তু পালক দিয়া নিজকে সংবৃত্ত রাখিয়াছে বলিয়া কোথায় পক্ষিগতায় স্পর্শ করে না—এ-ও তেমনি। গরের বেলায় এমনি সংবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে এমনি সংবৃত্ত রাখা, বুদ্ধি ও আত্মার মাথামাথিতেও ঢটীকে ফাটাক রাখা—শুধু সাধকের সাধন নয়, সিদ্ধের বিলাস। এ পথে অনুপম আনন্দ আছে, কিন্তু বিশদও ভীষণ। তাই প্রবর্ত সাধকের এ দিকে পা না বাড়ানই ভাল।

উপসংহারে দুটি কথা। সামাজিক হিসাবে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, বুদ্ধনীতির অনুসরণ কর—মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা জগৎ প্রাবর্তিত কর। আত্মাভিমান হিসাবে যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়—শ্রীকৃষ্ণের নীতি অনুসরণ কর—যুগ্মসংগতজ্ঞঃ। প্রবর্ত সাধকের পক্ষে এই উৎকৃষ্ট পথ।

## আত্মানুভব

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]

—:~:—

নয়নারীকৃপা শ্রিয়তম—

‘প্রশ্ন হয়েছে, জগৎ সৃষ্টি হয় কবে? ‘কবে’ কথাটার অর্থ কি, ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, ওর মানে হচ্ছে, “কোন সময়।” তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়াই, ‘সময়ের সৃষ্টি হয় কোন সময়?’ এমন প্রশ্ন শুনে নিশ্চয়ই হাসি পায়। জগতের আৰম্ভ হয়েছিল কোথায়?—দেশের আদি কোন দেশ? আর একটা প্রশ্ন আছে। জগৎ সৃষ্টি হল কেমন করে? কোনও কোনও ব্রাহ্মণ লোক এসব প্রশ্নের জন্য দিতে যাবে হয়ত। এ ভার আমি তাদের উপরেই দিলাম; ওটা আমার এলাকার বাহরে। কেউ কেউ এসব সওয়ালের ফরমাণ করত দিন গুজাণ করবে—কিন্তু তাতে লাভ? কিছু দূর গিয়ে পামতেই হবে, দেখতে পাবে, সামনে এক পাথরের পাঁচিল, পার হই কান সাধা!

এক জোড়া চিমটা আমার সামনে রয়েছে। চিমটা দুটা এট-সেটা তুলতে পারবে, কিন্তু যে হাত তাদের ধরে আছে উটে গিয়ে সে হাতকে ধরতে পারে না। দেখ, কাল আর নিমিত্ত—এই তিনটিরও সেট অবস্থা। এরা জগৎপার বাধ্য করতে পারে। কিন্তু জগতের পেছনে যে আত্মা রয়েছে, তার সন্ধান পাবে না।

চোখে ছানী হয়েছে বলে চারটা লোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখানে

অস্ত্র করা হবে বলে। চোখে যখন ছানী হয়েছে, তখন তারা তো নিরুপেক্ষ বালী আছে শুধু চারটা ইঞ্জিয়। জানালায় মাদীগুলোর কি রং, তাই নিয়ে একদিন তাদের মাঝে তর্ক শুরু হল। একজন বলে, “আমার ছেলে হুঁড়ুনভাদিগীতে পড়ে, সে এসেছিল; সে বলেছে, কাচ হলো। তাহলে ও তো হল-দেই হবে।” আর একজন বলল, “আমার খুঁড়ো ওচ্ছেন, মিউনিসিপালিটির কামশনার; সো দান এসেছিলেন না? তিনি বলেছেন, কাচটা লাল। ভারী তুখোড় লোক, সব খবর রাখে না।” তৃতীয় ব্যক্তি বলল, “তব মাসতুতো ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলে গিয়েছে কাচ সবুজ। সে বিধান লোক, মিছে বলবে কেন? এমান করে তাদের মাঝে লেগে গেল ঝগড়া।

তার পর তারা নিজেরাই কি রং তা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলে। প্রথমতঃ কাচটা চেটে দেখল, কোনও রং বুঝা যায় কি না। কিন্তু জভেৎৎ বুঝে কি করে? তার পর চুঁকে চুঁকে বাজিয়ে শুনতে চাইল কি রং—কিন্তু তাতে রং বোঝা গেল না। শুঁকে দেখল, হাতড়িয়ে দেখল। কিন্তু কি আপদ, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধে তো কাচের রং বোঝা গেল না!

আমরাও তেমনি ইন্দ্রিয়পথে ইন্দ্রিয়-

তীতকে ধরতে পুঁপুনি না। অনন্তকে যদি  
ইঙ্গিত দিয়েই সবচে পানতু, তাহলে সে যে  
কি আশঙ্কিত ব্যাপার হত, ভবে দখ দেখি।  
তাহলে অসীম নিশ্চয়ই সীমার চেয়ে সসীম  
হতেন। অসম্ভব কথা। বিশ্ব-চৈতন্য বা জৈব  
চৈতন্যের সহায়েই অসীমকে জানা যায়।  
একটা দশলাইর কাঁটি আমার চোখে আছে।  
হীতের চেয়ে কাঁটিটা অবশ্য ছোট। সসীম  
কি করে অসীমকে ধারণা করতে পারে না,  
তা বুঝতে পারলে তো? বা ইঞ্জিরের অণুও,  
ইঞ্জিয় তাঁকে ধারণা করতে পারে না। তুমি  
আশ্বরূপ; তোমাকে বুঝতে তাহলে বাহ্যের  
কিছুই ওপর ভরসা করা চলে কি? এ যেন  
সেই কাণাদের মত কথা হল। তারা নিজেরা  
কেউ জানে না, কাউকে কিং; কিন্তু কেউ  
বলছে লাল, কেননা তাই তাই বলেছে লালও,  
কেউ বলছে হলদে, কেননা ছেলে বলেছে  
তাই ইত্যাদি। আমাকে ফস্ফা বলে বলে  
H<sub>2</sub>Oতে লব্ধ হয়। তাতেই আমার জ্ঞান  
হল? না, তা তো হবে না, সব রসায়ন-  
বিদেয়া এসে সত্য বলেও এ কথা আমার  
কাছে সত্য হইবে না। যখন লেবনটরিতে  
গিয়ে নিজে পরীক্ষা করে দেখি, তখন কঁথাটা  
আমার কাছে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ গোন,  
খুঁট হোন, আর বুড়ু হোন, নিজের অমৃত্য  
ছাড়া কাক প্রামাণ্যে নির্ভর করতে পারা যায়  
না। জানতে হলে নিজে জামতে হবে। খুব  
ভাল লোকের কাছে। নিঃশব্দ অগ্নিজনের  
কাছে শুনতে পার, কাচ লাগ; নিজে না  
দেখা পর্যন্ত সে জানা পাকা হবে না। এক  
ছোকরা বলাহণ, “আমার বাবার পেটের  
আঙুনে তারী তেজ, আমার বাবারটা তিনি  
হৃদয় করে দেন।” তা কি হতে পারে?

তোমার ভাত তোমাকেই হৃদয় করে  
হবে। জগতের মহাপ্রাণ মহাপুরুষদের চরণে  
আমার শত শত নমস্কার, কিন্তু সত্য কথা  
এল—আমার ভাত তাঁরা হৃদয় করে দিতে  
পারেন না,—সেটা আমাকেই করতে হবে।  
আমিই ব্রহ্ম—এ কথা তাঁরা আমার কাছে  
সম্মান করতে পারেন না—সে কিন্তু তাম্বু-  
কেই করতে হবে। কেবল মাত্র বিশ্ব-চৈতন্য  
ভিতর দিয়ে সত্যকে জানা যায়। সে কথা পরে  
তোমাধের এল।

স্বাধীন-ভাবুক নাস্তিবাদী বলে, “আমি  
নিজে খুঁজে দেখছি।” দেখা যাক, সে  
কতদূর নিয়ে পৌছায়। সে বলে আলো আছে  
নিশাটাইর মাঝে। আচ্ছা, তাকে পান কি  
কবে? কাঁটিটাকে সে টুকরো টুকরো করে  
কাটিল, কিন্তু আলো পেল না। শুঁড়ে  
করণ, কিন্তু তবু কিছু মিলে না। দেহটাকে  
নিজে টুকরো টুকরো করলে, জীবনের সন্ধান  
পেল না; অস্ত চূর্ণ করল, কিন্তু প্রাণ  
কোঁপার? সে বলে “যদি সত্য থাকে, তবে  
সে তো আমি; কিন্তু সত্য জানবো তো  
উপায় নাহি।” তার বস্তুকুমাধ্য, সংশয়বাদী  
তবুটুকুই গিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব-চৈতন্য তাতে  
এখনও প্রতিভাত হয় নি। সে যশ চৈতন্যকে  
কতদূর সম্ভব অসীমের সন্ধানে নিয়োজিত  
করেছে—কিন্তু অসীমকে যে তাতে জানা যাবে  
না, এ তো সত্য কথা।

তাই বোধছি, বুদ্ধি-বাণী অসীমের এটুকু  
নাগাল পাওয়া যায়, এটুকু বোঝা যায় যে,  
অসীম কিছু আছে। কিন্তু কি তার স্বরূপ,  
তা বলা যায় না। যেমন পেছন থেকে কেউ  
এসে আমার চোখ টিপে ধরে, তাহলে বুঝতে  
পারি, আমার পেছনে কেউ আছে, আর যে

আছে, সে আমার কোনও বন্ধু, কেননা  
অচেনা কেউ এসে এমন গোমাদা করবে  
না—কিন্তু সে যে কে, তা তো বলতে পারি  
না। এ যেন দেয়ালের গায়ে একটা বলা ছুঁড়ে  
মাথায়, বলটা দেয়াল পর্যন্ত গেল নাট, কিন্তু  
যা খেয়ে ফিরে হল। বুঝি তেমনি অসীমকে  
ভৈদ করতে পাবেন। যদি অসীমকে জানা  
যেত, তাহলে অবৈত গিয়ে বৈত হত; তাহলে  
জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কেউ আর অসীম থাকত না।  
কিন্তু দেখছি, বিশ্ব-চেতনায় বিশ্বাস্যার খাটঠা  
হয়।

এই ত্রিশী চতনার কথা বলবার আগে  
শৈশব-চেতনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।  
শিশুর বিশ্বাস্যত্ব নাই—পিণ্ডাশুভ্রুণ্ডিও নাই।  
নিতান্ত কীট। এই শিশুটী রয়েছে। ও কি  
জানেন? ও নিজকে জানেন, তাই পূর্ব ও  
সম্মুখ কথা বলব, এই বলে কি আমরা বলে  
থাকি? না! শিশুর চারিদিকে যা কিছু  
ছড়ানো রয়েছে, সেগুলো যে চিনবার আগে  
কি আমরা তার প্রসঙ্গ তার কাছে করি না?  
না, তাও ভো নয়। খুব ছোট গোলাক তাকে  
একটা নাম দিয়েছি—সেমন খোকন। বাপ মা  
তাকে খোকন বলেই ডাকে, কত আদরের  
কথা, কত কিছুই কথা তাকে শোনায় বলে  
সোণা অম্বর, মাণিক অম্বর। বাবার কথা  
তাকে বলে, মায়ের কথা বলে। খোকন আর  
একটু বড় হয়ে যখন খেলা করতে আরম্ভ  
করল, তখন নিজেই সে কত কিছু বলতে শুরু  
করল। বাবার কথা মার কথা—বাবার  
শুনতে শুনতে সেও তার অম্বকরণে বাপকে  
মাকে ডাকতে শিখল। খোকনের মুখে  
বাবা ডাক শুনে তার মা বলেন, “ও গো  
শুনছ, খোকন যে তোমার ডাকছে।” বাবা

বলেন, “খোকন, কার্টে আয়।” খোকন  
কি সে ভাষা বোঝে? সে শুধু বাবার হাত  
ধরান। বাড়ানো দেখে, তাঁর আদরের ডাক  
শুনতে পায়, বুঝতে পারে, তাকে কাছে  
যেতে বলা হয়েছে। এত হতে বুঝতে পারি,  
দেশ চেতনা বা শিশু চেতনা পারিপার্শ্বিকের  
সংসর্গ হতে উৎপন্ন হয়। তেমনি বিশ্ব-  
চেতনাও উৎপন্ন হয়, যারা সে চেতনা লাভ  
করেছেন, যারা আত্ম-পতিষ্ঠিত, তাঁদের  
সম্মুখ থেকে। মারা শোক ভাষে মুহুমান,  
তাদের সম্মুখ কণ, আপনি বুকে পাথর  
চাপবে। গমিতরা হাক্সা পায় যাদের, তাদের  
সম্মুখ পাক, বুকের গোম্বা নেমে যাবে।  
এমনির সম্মুখের বিশ্ব-চেতনা উদ্ভীপ্ত হয়।  
এখন প্রকৃতির সম্মুখ কণ, আর মহাপুরুষের  
সম্মুখ কণ—তাঁদের বাণীর সম্মুখ কণ, সম্মুখ হতে  
উদ্ভীপনা আগবেই। বাপ মা খোকনকে  
খোকন-খোকন ডাকতে ডাকতে শেষ কালে  
সে খোকনই হয়ে যায়। “খোকন” না হয়ে  
সে “বুড়া”ও হতে পারিত। গত একটু ঘরে  
তিনটা চারটা ছেলে শুয়ে আছে। খোকনকে  
ডাকলে—সেই মাড়া দেবে, আর কেউ না।  
এত চীৎকারও কিন্তু অপরের ঘুম ভাঙবে  
না—কেননা, তাদের তো ডাকা হয় নি।

ব্রজের মঞ্চ যিনি আত্মার ঐক্য অনুভব  
করেছেন, তাঁকে অজ্ঞানী এসে বলতে পারে  
একটা ঘাগ ঝুটি করতে। বলবে ওয়ত,  
“দেখুন মশায়, আপনি তো নিজেকে ব্রহ্ম  
বলেন। কিন্তু আপনি কি কবতে পাবেন?  
ব্রহ্ম—এই গগনটা পড়েছেন, আপনি তো এক  
গোড়া বাগও গড়তে পারেন না। তবুও  
আপনি হলেন ব্রহ্ম। আচ্ছা দেখান দেখি,  
আপনি কি করতে পাবেন!” খুঁটকে সম্মুখানে



এমনি প্রাণোন্নী দেখাচ্ছে, নয় কি ?  
সমস্তান বলাচ্ছিল, তোমার ভগ্নাংশ যদি সত্য  
হয়, তবে পাচাড় হতে পাঁচিয়ে পড় না কেন ?  
খুঁট তার হৃৎকিত্তে না ভুলে গর্জ্জ উঠলেন,  
“দূর হ, এখান থেকে !” শান্ত তাঁর কন্ঠস্বর  
পড়ে, কিন্তু অনিশ্চয়ীকে তিনি লীলা দেখাবেন  
কেন ? কোটী কোটী প্রাণিত্যর্থোৎ ( mira-  
cle, সিদ্ধান্ত ) অনিশ্চয়ীর প্রত্যয় হবে না ।  
বিশ্ব চেতনার, উদ্দেশ্য তার মাঝে তৎপর চাট ।  
নতুনা সে লীলা বুঝবে কিমে ?

যখন বলি “আমি ব্রহ্ম”—তখন কি অর্থ  
কথাটা বলি ? সে কি এত ক্ষুদ্র অংশকে  
লক্ষ্য করে ? না, তা তো নয় । এত মনকে  
ধরে ? তাও তো নয় । ব্যাপারটো হল এই ।  
—একজন লোক এম, এ, পাণ কবে বিশ্ব-  
বিশ্বাশয়ের উপাধি পেল, রাজা হয়ে রাজপদী  
পেল, এ সব কিন্তু তার স্বরূপের বাইরে  
—এগুলি উপাধি । উড়ে এসে জুড়ে এসেছে ।  
বলতে পারি সাপটা বলালো—কাঁ লাটা  
কিন্তু সাপ নয়, সেটা সর্পশ্বের বাইরে—সাপের  
গুল সেটা । কিন্তু যদি বলি সাপটা দড়ি,  
তাহলে কিন্তু সেটা একবারের আগানো কথা  
হল । আমি রাজা ; রাজা একটা উপাধি,  
একটা পদ । কিন্তু যখন বলি আমি ব্রহ্ম,  
তখন বুঝতে হবে আপটা যেমন দড়ি নয়,  
তেমনি এই ক্ষুদ্র অংশও ব্রহ্ম নয় । না জেনে  
তুমি দড়িটাকে সাপ ভেবেছ, কিন্তু দান্তবিক  
সেটা দড়ি । তেমনি এত ব্যক্তিবোধও  
একটা মায়া—আমি ব্রহ্ম একমে-  
বাদ্বিতীয়ম্, অনাদ্যমনন্তম্ ।

আর একটু বুঝিয়ে বলি । দুটো টেউ  
আছে মনে কর । একটার জল কি আর এক-  
টার জল থেকে পৃথক ? না, জল দুটোর

সমানই । গোটা সমুদ্রেও সেটো একই জল ।  
এখান তার এক রূপ, ওইখানে আর এক  
রূপ । এখানে এক আত্মা, আন ওইখানেই  
কি আর এক আত্মা ? না—একই সন,  
একই অদ্বিতীয় । আত্মারই দেহ ;  
সব আমার ; ভেদ কোণায়ও নাই । বিভিন্ন  
ভাষায় আলোকে বিভিন্ন নাম দিচ্ ; তৎসৎ  
বলে light, অর্থান বলে licht ইত্যাদি ।  
কিন্তু ভিন্ন নামে ডাকলেও আলো তো মূলে  
এক । সব জায়গাতেই সে আলোই—নয়  
কি ? নাম দিলেই কিছু আত্মার ভেদ হয়ে  
যায় না—আত্মা সর্ববিশ্বম্ !

দেহটা একটু সংঘাত । হাতটা যদি পৃথক  
হয়ে গিয়ে বলে, খাবার জোটাই আমি কাজে  
আমি সপ খাব, তাহলে কেনমন হয় ? তখন  
আর মুখে খাবার তোলা হবে না, পেটকে তা  
চক্ষম কবেও চলে না, সমস্ত দেহের পুষ্টিও  
প্রয়োজন নাট—হাত জুড়ে খাবার হাতের  
মাঝে ঢুকিয়ে দিগেই হবে । একটা হামির কথা  
হয়, নয় কি ? হাতে আঠা দিয়ে টাক জুড়ে  
দিলে পার কি ? বালতা এসে হতে কামড়  
দিলে, হাত ফুলে বাথা হল । বাপটা হাতের,  
এই বলে যদি তাকে কেটে ফেলে দেওয়া হয়,  
তাহলে অপর বাপা থাকবে সমস্ত শরীরে  
—কেন না হাতটো যে দেহের সম্মিল । পেট  
যখন খাবার চক্ষম করে, তখন পুষ্টিও ভাগ  
সব শরীরেই যায়—চাতুর ভাগ পায় । সবাই  
একগোট হয়ে কাজ করে । তেমনি যখন বিশ্ব  
হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি, তখনই আমরা  
হঃখ পাট, আরও পর্যন্ত না বিশ্বের সঙ্গে  
আবার যুক্ত হই, সে পর্যন্ত হঃখ পেতেই হয় ।  
এই ব্যাপারের আর গিরিত নাট । বিশ্ব  
চৈতন্য যুক্ত হলে দেখতে পাট, সবাই

পরস্পরের সাপেক্ষ। সব দেহই আমার, ভেদ নাই কোথায়ও।

এক সন্ন্যাসী স্ত্রাকরার কাছে গিয়ে বললেন, “সব চেয়ে ভাল আংটিটা এনে ভগবানের আজুলা পরিয়ে দাও”—বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ঘুরীর কাছে গিয়ে বললেন, “সব চেয়ে ভাল জুতো জোড়া এনে ভগবানের পায়ে পরিয়ে দাও।” দরজীর কাছে গিয়ে বললেন, “সব চেয়ে ভাল পোষাকে ভগবানের দেহটা সাজাও”—মানে “আমাকে সাজাও।” লোকে শুনে বললে, “এ ব্যাটা নাস্তিক—দূর করে দাও ওকে—জেলে দাও।” সবাই এসে তাঁকে মদল, জেলে নিয়ে যাবে বলে। সন্ন্যাসী বললেন, “আচ্ছা, তার আগে আমার ছুটো কথা শুনে তবে কিছা।” জিজ্ঞাসা করলেন, “গুরুগণ কার?” সবাই বলল, “ভগবানের।” “সন্ত-স্বর্ষা কার?” “ভগবানের।” “মাঠ ঘাট সব কার?” “ভগবানের।” “এ কথায় তোমরা বিশ্বাস কর?” সবাই বলে, “হঁ, হঁ, করি বটে কি—এই তো সার কথা।” তখন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, “এই দেহ তবে কার?” ভগবানের। “কার চরণ?” ভগবানের। “কিস্তি আজুলা?” ভগবানের। তারা নিজেদের যুক্তিতেই শেষ কালে এসে ঠেকে গেল—দেখলে, সাধু যা বলেছিলেন, তাই সত্য ঠিক। কাজেই তার আর সাজা হবে কি কবে? ওবা তো অজ্ঞান, সাধু যেমন করে বলিয়ে বুঝেছেন, তেমন করে তারা কি বুঝতে পারে?”

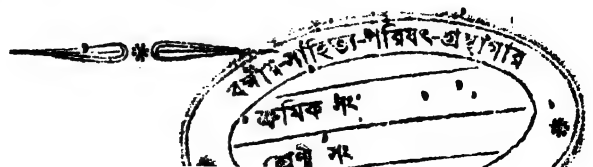
ভারতবর্ষ মানুষ মরণে বলে দেহত্যাগ করল; এ দেশে বঁলে আত্মা ত্যাগ করল। এখানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তার চেয়ে ওখানকার ভাষা বেশী শুদ্ধ—কেননা ওখান-

কার কথায় মনে হয় আত্মা দেহ ছাড়া আর কিছু। তাই সে দেশে এমনও বলে, তার প্রাণ বেরিয়ে গেল—সে নয়।

তিনটা শোক বসে মদ খাচ্ছিল, গেতে গেতে মাতাল হয়ে পড়ল। একজন বলে “একটুখানি চড়িভুক্তি করা যাক না।” তখন একজনকে মাংস ইত্যাদি আনবার জন্ত পাঠানো হল—সবাই একটু ফুটি করবে বলে। মাংস আনতে একজন চলে যেতে আর একজন তার সঙ্গীকে বলে, “ও ভটি, আমার ঘেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।” সঙ্গীটা বলে, “তা বলে কি হয়, বেরুতে দিচ্ছি না তো।” এই বলে সে বন্ধু নাক চেপে ধরল, যাতে প্রাণ না বেরুতে পারে। একেবারে বন্ধু নাক মুগ কাণ সব চেপে সে বসে আছে, প্রাণ বেরুবার যাতে রাস্তা না পায়। ফল কি হল বুঝতে পারছি। কিন্তু মাতালের তো সে ভণ্ড নাই।

কৃষ্ণ যজ্ঞ করছেন। রাজ-রাজদার নিমন্ত্রণ হয়েছে—কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী রাধার নিমন্ত্রণ হয় নি। নারদ বললেন নিমন্ত্রণ করতে, কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, “না।” নারদের কিন্তু কৃষ্ণের ব্যাধার ভাল লাগল না। তিনি নিজে গিয়ে রাধাকে যজ্ঞের কথা বললেন। রাধা বললেন, “তুমি যখন উৎসব কর, তখন বন্ধুবান্ধবের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাও, কিন্তু নিজের কাছে পাঠাও কি? জানি কৃষ্ণ যজ্ঞ করবেন। কিন্তু আমরা যে এক।”

মজল্লার প্রেরণী লয়লা একদিন বললে, আজ শরীফটা ভাল ঠেকেছে না—কিছুতেই সোয়াস্তি হচ্ছে না মেন! হাকিম ডাকা হল। হাকিম এসে সে যুগের প্রথামত লয়লার রক্ত-মোক্ষ করবে বলে বাহুতে অগ্নিঘাত করল, কিন্তু রক্ত বেরুলো না। ও দিকে মজল্লার সেট জাহ্নগ্য হতে পারে রক্ত ছুটল। দুইটা প্রেমিকের একপ্রাণতা এমনিতর!



## কর্মশেষ

—\*—

লোভ না থাকিলে কেউ কর্ম কবিত্তে চায় না, এই দেখি সংসারের রীতি। কিন্তু ভগবান্ কর্মের উপনিষদ প্রচার করিতে গিয়া বড় কঠিন জ্ঞান জারী করিলেন, বলিলেন, তোমাকে আমি মাইনের মজুদী খাটিতে হইবে। ভরসা দিলেন, ইহাতে লোভের কিছু না থাকুক, লাভের আশা আছে। তুমি শেষ কালে তোমাকে পাঠবে অর্থাৎ শাস্তি পাঠবে। লোভ না রাখিয়া কাজ করিলে শাস্তি হয়, একথাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মত ধরয়া লইলে ভাল। চিন্তাবুদ্ধি যদি কথিয়া বলে, কেন ভাল? তাহা হইলে একটা জবাব জোটাইতেই হয়।

আপাততঃ এটুকু গুলিই মনে হয়, ফলে ভরসা করিয়া কাজ যে করি, আমি কতটুকু জানি, কতটুকুই বা বুঝি যে, ঠিক ঠিক ফল কি ফলবে, তাহার আশ্রয় করিতে পারি? তুমি হয়ত জবাব করিবে, এক্ষেত্রেই কি বোঝ না? ভগবান তো আক্ষেপ করিয়া একটা পত্র তোমাকে দিয়াছেন, সেটা কি কিছুই বাৎসরিক দেয় না? আমি বলি, স্বাভাবিক বুদ্ধি নববধূর মতই ভীক, আশা ও সংশয়ে কম্পিত; তাকে নিয়া কর্মের পত্তন অবশ্যই করিতে হয়, কিন্তু ফল সম্বন্ধে পাকা রায় দেওয়া চলে না। “এইটুকু বোঝা যায়, তাই এটুকু করিতেছি, খেবটায় কি হইবে জানি না”—সমগ্রদায় ব্যক্তি এর চেয়ে জোঁক করিয়া গেল, কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু সংসারে হয় কি, বাসনার আবেগে

অনিশ্চিতটুকুকেও আমরা অনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া নিই—শেষে ফল না ফলিলেই বেদার হই। কনিদাজ বড়ীয়া বানস্থা করিয়াই জেদ ধরেন, নিশ্চয়ই আরাম হইবে। কেন, জন্ম-মৃত্যু তাঁর চাতুর্ঘ্য না কি? কোথায়ও কণা ঠিক হয়, কোথায়ও ঠিক হয় না। ঠিক হইলে অসম্মান এক কাঠি বাড়িয়া যায়, ঠিক না হইলে দুঃখের আর অল্প থাকে না।

অনিশ্চয় নিয়া যেখানে কারণ, সমস্ত-গুলি নিমিত্ত যেখানে আমার জানা নাট, সেখানে মনটাকে ভাল মানুষের মত চুপ করা ইয়া রাখা চাই ভাল। তাই হইল, ফলে দিকে না তাকাইয়া কর্ম করা। কেউ বলিবে, এত ল্যাঠান কি প্রয়োজন—কর্ম না করিলেই ক্ষতি হয়, তখন ফলও থাকিবে না, আকাজ্ঞাও থাকিবে না। ভগবান্ বলিতেছেন, “সবু, এত ভাড়াভাড়ি করিও না—মাত্রে সঙ্গোহস্ত অকর্মণী। অকর্মণী বিনিবার দিকে যেন তোমার ঝোঁক না পড়ে।”

ঝোঁক বাড়িয়াও তো উণায় নাই। তুমি কি মনে কর, তুমি কখন ছাড়িলেই কখন তোমাকে ছাড়িবে? তা ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান জ্বানে। কর্মভাগের স্বার্থ পরিচয় হইতেছে মনের শাস্তিতে। কাজকর্ম ছাড়িয়াই শাস্তি পাইয়া গেল, এমন কাহাকেও দেখাইতে পারিবে। ক? হয়ত কাজ করিতে করিতে হাঁপাতীরা পড়িয়াছে, ভাবিতেছে এ ল্যাঠা চুকিলেই বাঁচি। কিন্তু পরখ করিয়া দেখিয়াছি, ল্যাঠা চুকিলেও বাঁচিয়া নাই।

বিশ্রাম প্রয়োজন। বটে—কিন্তু সে আর এক ধরণের। বিদ্রোহের কাণ্ডখানায় দুইটা কনিয়া ডাউনামো থাকে। একটা যখন চলে, তখন আর একটা বন্ধ থাকে; কিন্তু কোনটাই একেবারে ছুটি হয় না, তাহা হইলে বোঁশনাই হইবে কোথা হইতে? আমাদেরও দেহ আর মন—দুইটা ডাউনামো। যখন দেহটা চলিতে থাকে, তখন মনটা নিষ্ক্রিয় থাকে। চাষা ভূষার দেহের খাটুনি পশী, তাই মনটা জড়; সাধারণ সংসারে মেয়েদের দেহের খাটুনি বেশী, তাই তাদের মনটা স্থবির। খাঁজগে নিকের মাঝেই এর পচিম পাইবে। আগার বিপণীও নিক দিয়া একটা সত্য জানিয়া রাখ, যখনই দেখবে, ভাবনা-চিন্তায় মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই শান্ত পাইতে না, তখন যে কোনও একটা কাজে দেহে ডাউনামোটা চালাইয়া দিয়া দেখিও, মন চাক্ষু হইয়া আসিয়াছে। মোট কথা ডাউনামো একটা না একটা চলিবেই। তবে যে মিস্ত্রী হিসাব করিয়া একটা চালায়, আর একটিকে বন্ধ রাখে, সেট ওস্তাদ বটে।

কর্মটা দেখসম্পর্কেই বৃষ্টি ভাল, 'তাঁহ' দেহের খাটুনি এড়াইয়া ভয়ে পলি, ফল দিয়াও দরকার নাই, কাজ দিয়াও দরকার নাই। কিন্তু কুঁড়ের মন নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, এমন উদারীণ হাজার ছাঁড়িয়াও পাইবে না। যে ঘত অকর্ম্মা, তার মন তত কল্পন-পদপ, আশ্রয়মানে সে তত অসমর্থ, সমাজের সে তত বড় শত্রু। তাই ভগবান হুঁসিয়ার করিয়া দিতেছেন, "অকর্ম্মের ভূত, যেন তোমায় না পাঠয়া বসে।"

কিন্তু শেষের দিকে তাকাইব না, অথচ কাজে জড়িতে পারিব না—এ কেমন করিয়া

হয়? হওয়া কঠিন অতএব, অপ্রীতি-সাংকে বটে, কিন্তু তবুও জানিয়া রাখ, এ হয়; আর এ চেষ্টাও শাস্তি। ভগবান নরকে উপমাগুলে রাখিয়া বলিতেছেন, "দেখ, তিনলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই, তবুও আমি কর্ম্ম নিয়াই আছি।" কর্তব্য বলিতে ঠিক কর্তব্য কর্ম্ম বুঝ না—কর্তব্য মানে অপ্রীতি-ফল। ভগবানের এই কথাটা সকল কর্ম্মীরই গোপে রাখা রাখতে হইবে। আমরা কাজ করি, একটা কিছু মনোবাসিত্বের দরুন একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতিতে ভাবাবগুণ মতলব ঘূর্ণিয়া বেড়াইতেছে, কারণ মতলব যে শিল্প হইবে, তাহা ক করিয়া পলি? তাই মনে রাখিতে চেষ্টা, আমি এই গড়িয়া তুলিব—এই আমার কর্তব্য—কাজেই মনুষ্য-কর্ম্ম আমি কাজ করিতেছি, এমন অভিমান মোটেই রাখিতে নাই। আমার কর্ম্ম-বাহ্য কিছু নাই—কিন্তু কাজ আছে। কর্ম্মের এই বড় জবর এক হইয়াছে। এটা জীবনও কথা, শ্রম বৎস কথা। জীব শেষের পথের তো জানেই না; তাই তার করিবার কি আছে? সে শুধু হেডমিস্ত্রীর জোগানদার—গঙ্গা দিব্য কে? আর শ্রম তো জানেনই কি দিয়া কি হইবে, সুতরাং তাঁরও আর নুতন করিয়া করিবার কি আছে? তাই তিনিও চুপ। যন্ত্র চালাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, তাই তাঁর কৃত্য নাই; আমরা অজ্ঞ, তাই আমাদের কৃত্য নাই। তিনি অধ্যাক্ষ, তাই তাঁর কর্ম্মের পরিচয় নাই, আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত, কাজেই আমাদেরও কর্ম্মের পরিচয় নাই। এই ভাবভূমির আধ্যাত্মিক স্বাধোয় অতি অগত্যা।

কর্তব্য নাই অথচ কর্ম আছে, এই হইলেই  
তো বাছাইর কথা আসে। কেননা ডিক্টিনটরি  
আমাকে বুঝিতে দিতেছ না, অথচ কাজের  
ভার ঘাড়ে চাপাইয়াছে—এখানে বুদ্ধি আকুল  
হইবে না? ভগবান্ একটু মিষ্টি হাসিয়া  
বলিলেন, “হাঁ, তা হইবে বই কি! তাই বলি  
বোঝাপড়ার ধার দিয়াও ঘাটও না। কর্মও  
বুঝিতে হইবে, অকর্মও বুঝিতে হইবে,  
বিকর্মও বুঝিতে হইবে। সাধারণ মানুষ  
তিনটা জড়াইয়া বুঝিতে পারে না, সে বোঝে  
একটা। তাই সে ঠেকে। ফলে তার মনে  
হয়, গহনা কর্মণো গতিঃ—কর্মের গতি  
বোঝার মতো নাই। আমিও বলি, বাস্তবিক  
তাই। অতএব বোঝাপড়ার মাঝে যাওয়ার  
কোনও প্রয়োজন নাই।”

• •

প্রশ্ন করিলাম, তবে কাজ করিয়া কি  
করিয়া? ভগবান্ বলিলেন, “সহজঃ কুরু  
কর্ম—সঙ্গং ত্যক্তা” —যেটা তোমার স্বভাব,  
সেটাই কর; তবে তাতেও যৌক রাখিও  
না। তোমার নিয়তি বুঝিয়া প্রসিক বুঝিয়া  
কাজ কর। তোমার স্বভাব বলেতেছে; তুমি  
দিনমজুরী ওয়ারিশ, তুমি কিন্তু বিখকবি  
হইবার বায়না ধরিলে। কথায় বলে দেখাদেখি  
বাক্য নাচে। এখন ক্ষেত্রী হুং হইবে না,  
বুদ্ধি বুলাইয়া ঘাইবে না? তাই বলি, তোমার  
যা স্বভাব, তার অনুকূলে “কর্ম কর—কিন্তু  
যৌক রাখিও না। যৌক থাকি

লেট আর স্বভাবের উন্নতি হইবে না—যুক্তি  
হইবে না।

মানিয়া মিলাম, কর্তব্যবুদ্ধি না রাখিয়া,  
যৌক না রাখিয়া স্বভাবের বশে কর্ম করিয়া  
গেলাম। সে তো সবাই করে; তাহা হইলে  
তুমি আর আমাকে বোঝি কি উপদেশ দিলে?  
ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, “সবাই ঠিক তার  
উল্টা করে। আর গোড়ায়ই যে গলদ রাহ-  
রাছে। তুমি যে করিতেছ আমার কাজ, আর  
তারা করে নিজের কাজ। এক হইল কিমে?  
গোড়াতে যে বলিয়াছিলে, আমি প্রপন্ন,  
শরণাগত—আমাকে বুদ্ধি দাও; আমিও যে  
বলিয়াছিলাম, আচ্ছা, তোমাকে আমি গ্রহণ  
করিলাম, তোমার যাতে মজল হইবে আমি  
তাচ্চ করিব। গোড়ার এই ‘গুরু-শিষ্যের  
স্বীকৃতিটুকু ভুলিয়া গেলে কেন? ওই সম্বন্ধ-  
ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই তো সহজ  
কর্মের সহজ ধর্মের উপদেশ তোমাকে দিলাম।  
এরূপ অভুক্তে কখনও বুঝিতে পারবে  
না। তাহাকে একথা শোনাটতেও নাই।”

শেষে প্রশ্ন—এই সহজ কর্মে দিন গুজরণ  
করিয়া ফল কি হইবে গোবিন্দ? গোবিন্দ  
বলিলেন, “আবার ফলের কথা? সে কথা তো  
গোড়াতেই মন।। তবুও একটা কথা, তোমার  
বলিতেছি—‘সকল কর্ম্মাখিলং পার্থ’ জানেন পরি-  
সমাপাঠে।—যত কিছু কর্ম্ম সবেই শেষ ফল  
জান।’ গুরুসেবার বা গুরুগৃহবাসেরও এই  
শেষ ফল।

## সাধুত্বের সাধনা

—:~\*~:—

বাহারী ঘর-বাড়ী ছাড়িয়াছে, সাধুত্ব কেবল তাহাদের কল্পিত, এমন একটা সংস্কার আমাদেব, সমাজে একমূল আছে। গৃহস্থকে সাধু হইতে হইবে না, এমন কোনও অশুশাসন শাস্ত্রে নাই। অথচ গৃহস্থের মূলে হইটী মারাত্মক কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাঠি— (১) “মশায়, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়া ঘর কার, একটু আদটু চুণী-চামারী না করিলে আমাদের পোষায় না।” (২) দশদ্বীপ যুবক পুত্রকে পিতা-মাতা উপদেশ দিতেছেন, “তোদের এখন পরমকাঙ্ক্ষা, এখন ধর্ম্য-কর্ম্য কি তোদের মাজে ? ও সব গল্পাশ পেরয়ে।” অথচ ঋষি নাকা আছে—“যুগৈব ধর্ম্মবীলঃ স্রাং।”

সাধুত্বকে ক্ষুণ্ণ না করিলে সংসার চলে না, এটা মিথ্যা কথা। সংসার সুখের হয়, ধনের জোরে নয়, মনের জোরে। আর সাধুত্ব অর্থহীন মনের জোর। সুতরাং গৃহস্থকে যখন লড়াই করিয়া সংসার করিতে হয়, তখন তার সাধুত্ব তো বেশীমাত্রাভেই থাকে। এটী এক কথা। আর এক কথা, যৌন ভোগের সময় বটে, কিন্তু সংযম না থাকিলে ভোগ দুর্ভোগ হইয়া দাঁড়ায়। যে বাতুকীণ, অম্পিত্তের রোগী, সংসার ত্যাগের কাছে ভোগের না দুর্ব্ব্যোগের ? সাধুত্ব চাড়া সংযম হয় না। সুতরাং চোত্রেও প্রমত্ত হয়, যথেষ্ট ভোগ করিতে হইলেও সাধুত্ব প্রয়োজন।

বাহারী ঘরে আছে, তাহাদের পক্ষে যে ব্যবস্থা, বাহারী ঘর ছাড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষেও একই ব্যবস্থা। অর্থাৎ সাধুত্ব সবার

পক্ষেই সমান ভাবে প্রয়োজন। গোড়ার এটী কথাটা মনে রাখিয়া, গৃহস্থসী নয়, উদাসী সাধুর কথাই বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

সাধু, শব্দটা যে সমাজে একটা গার্নি-ভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইলেও মূলে একটা কথা আছে। ঠিক সাধুত্ব জিনিষটীক, তথা তলাইয়া গেয়া এং সেই অনুকূলে অটল ভাবে নিজের জীবনকে পারচালিত করা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। এক কথায় বুলিতে গেলে আজন্ম সাধু মানুষ জগতে বড় কম। প্রায়ই মানুষকে দায়ে পড়িয়া সাধু হইতে হয়। যান আজন্ম সাধু, তাঁহার আর ঘর-বাহির বালায় বড় একটা কিছু প্রভেদ হয় না। বৈদিক ভাষায় ইত্যাদের বাল ঋষি। কিন্তু যিনি, অন্তরের চাপে কিম্বা বাহ্যের চাপে পড়িয়া সাধু হন, তাঁহাকে একটা বিশিষ্ট আস্তানা গাড়িতে হয়। পৌরাণিক-ভাষায় ইহাকে বলি মুনি। আজকাল সমাজে মুনিব্রতের সংখ্যাটি বেশী।

এই শেষোক্ত সাধুত্ব একটা ভাবোন্মাদ। কখনও কখনও দেশের মাঝে এমনি বাগদী মতভাব একটা হাড়িয়া বসিয়া যায়, সমাজের বুকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে সাধু ফুটিয়া উঠে—ত্যাগ বৈরাগ্যের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। এতগুলিই যুগসাক; তখনই অবসার হয়। তার পর ঝাঁক ঝাঁকিবার পালা হইল। যারা শেষে আসে,

ভারা চয়ত বলা ফুলট কুড়াইয়া লইয়া যায়  
— দেবসেনায় লাগিবে বলিয়া।

সাধুও যদি মজ্জাগত না হইয়া ভাবোচ্ছাস  
দ্বারা উবেলিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে  
তাঁহাকে লইয়া নানা সমস্যা নষ্ট হয়। সে  
সমস্ত সমস্যা সাধু সমাজেই আপদ থাকে না,  
গৃহস্থ সমাজেও সেগুলি বিসর্পিত হইয়া পড়ে।  
ফলে প্রকৃত সাধুদের প্রতিও মানুষের অশ্রদ্ধা  
ও অনাদর বাড়িয়া থাকে। কিন্তু উপায় নাই;  
শুদ্ধ বিচার করিয়া জগতে চলিতে পারে এমন  
বীর কয় জন আছে? ভাবোচ্ছাসে মত্তাল  
হইয়া মানুষ ঘর বাঁধে, ঘর ভাঙেও। ঘাটনা  
বাঁধে, তাঁহাদিগকে কিছু বলিধে না, আর  
সংখ্যায় মুষ্টিমেয় বলিয়া ঘর ভাঙ্গাদের লাঠি  
লইয়া তাড়া করিবে, টহা নিতা-প্রত্যক্ষ ঘটনা  
হইলেও স্থিরবুদ্ধির পরিচয় নহে। তবে এ কথা  
স্বীকার করি, সংসার-পলাতকেরা যদি  
সংসারীদেহে মাঝে আসিয়া উপজন্ম করে, তবে  
তাঁহারা ফলাফল সর্ব্বাংশে চালাদিগকেই  
ভোগ করা উচিত।

কিন্তু বাণেশ্বরের জলবায়ুও শুণে রম্যতা  
সাধুর পরিমাণ এখানে খুব কম। তাঁহা  
সমষ্টিগতভাবে তাঁহাদের নিখা বিচার করাও  
কঠিন। এ দেশে গৃহপলাতকেরা ঘরের বাটরে  
আসিয়া আবার ঘর বাঁধিতে চিরকাল অভ্যস্ত।  
ইতিহাসেব পাতা উন্টাইয়া দেখ, সংঘের শরণ  
নেওয়া এ দেশের বহু পুরাতন রোগরাজ — এমন  
কি শেখরুগেরও পুরে এই নীতি-প্রচলিত  
ছিল। এই সুপ্রাচীন জাতীয় সংস্কারবশতঃ  
জাতিও বাঙালী সাধু ঘরের বাহির হইয়াই  
ঘর খোঁজে দেখিতে পাই। ফলে ভাবোচ্ছাস-  
প্রণোদিত সাধুগণ সাধুঘরেও একটা সমস্যার

সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় এই  
সংঘেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রূপ  
হইছে। তাঁহা সমাজের এই অভিনব আশ্রয়  
প্রকাশকে দীর্ঘ স্থির ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া  
টহান মর্যাদা নিরূপণ করা আবশ্যিক।

যে সমাজে সাধুদের সাধনা পরিপক্ব হইবে,  
সেই সমাজের একটা পরিচয় দেওয়া প্রথমতঃ  
প্রয়োজন। সমাজ বলিতে আমরা সংহতি  
বুঝি। সাধারণ সমাজ বহু ব্যক্তির সমষ্টি।  
কিন্তু সাধু সমাজ বলিতে আমরা বাঁহাকে  
লক্ষ্য করিতেছি, তাহা বহু ব্যক্তির সমষ্টি না-ও  
হইতে পারে। এমনও হইতে পারে, সাধু  
নামধারী অনেকে যেখানে আছেন, সেখানে  
বাস্তবিক সাধু এক জন, কি দুই জন, আর  
সংগত সাধক। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংহতি  
দ্বারা সাধুদের আদর্শ শিথীভূত হইয়া দেখা  
দিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। তাই সাধু  
সমাজ বলিতে বুদ্ধি ভাবের সংহতি। একটা  
অনির্দিষ্ট নীর শক্তির নিত্যনয় প্রকাশ এক  
স্থানে হইতেছে, তাহাও মূলে হয়ত একজনমাত্র  
সাধু প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব—এই এককের সৃষ্টিকেই  
সাধু সমাজ বলিব। নব্যগত সাধক এই  
ব্যক্তিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন ও এই সাধুশক্তি দ্বারা  
অভিভূত হইয়াই তাহা সাধনা শুরু করে।  
বাহির হইতে এই সাধু সমাজকে চিনিবার  
যো নাই, কেননা তাহা মর্ম্মস্পর্শ বৈশিষ্ট্যের বা  
কাজে-কর্ম্মে নয়, গহজ জীবনের আনন্দময়  
উদার বিকাশের মাঝেই তাহার প্রতিষ্ঠা।  
সাপেক্ষ এই সহজ জ্ঞানের অমূল্যভূত প্রথম  
পায়-আড়ম্বরহীন হইয়াও সাধু তাহা  
কাঁছে বড় মনোরম, বড় তেজস্বর বলিয়া মনে  
হয়। কিন্তু নব্যজাগরণে তরঙ্গ প্রশমিত

হটলে কি করিয়া ভাবের প্যাস বটতে থাকে, এখন তাহাও আমাদের অলোচ্য।

আজন্ম-সাধুর কথা গোড়াতেই ছাড়িয়া দিয়াছি। ভাবোচ্ছাস দ্বারা অল্পপাণি সাধুসংক্রমণ কথাট বলিতেছিলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাও, সাধুত্বের সাধনার প্রথম স্তরের সাধকের মন ভাঙে উজ্জল ও উদয়মান থাকে। তখন সাধুর সমাজে সকলকেই সাধু বলিয়া মনে হয়। এমতাবস্থায় সাধকের অন্তঃকরণে নিত্য সেবার তত্ত্ব বিশেষ ক্ষুধা বোধ করে। নবানুরাগের প্রাণে চিত্ত সবসময় হইয়া উঠে বলিয়া সকলকেই আপন কাব্যলাল্যেতে আকর্ষণ করে, পেরের সেবার নিজেকে বিলাসিয়া দিয়াও যেন ভালগালা ফুটিতে চাহে না। কিন্তু সাধু বৃত্তিতে পানেন, এ জোয়ারের জল, বাহ্যের আকর্ষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে মাত্র। এই সেবার প্রবণ উচ্ছাসের মাঝেও সংসার-সংস্কারের ক্রিয়া অলক্ষ্যে গুরু হইয়া যায়, অতর্কিত আঘাতে সাধকের সাধুত্বের মোহ কাটিয়া গিয়া অসংস্কৃত আদিম রূপটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু এ দিকে সাধুত্বের অভিমান ততদিনে তাহাকে একবারে পাইয়া বসে। ফলে তাহার মনে এই বিচিত্র একটি ভাবের উদয় হয় যে, “এ তো দেখিতেছি, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। আমি ভাবিয়াছিলাম উত্তম সাধু। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, এমত ভাৱ সাধু নয়।” সাধকের এই মনোভাব এই তাহার নিজের সাধুত্বের সূধনাকে পণ্ড করিয়া কবিতা দেয়, অভিমানে অন্ধ হইয়া তাহার দিকে সে নজর দিতে পাবে না। মনে এই কথাটিই সত্য—তোমার মাঝে যতদূর সাধুত্ব, ততদূর পর্য্যাপ্ত তুমিও অন্যকে সাধু বলিয়া

মনে করিবে। কিন্তু তোমার মাঝে অসাধুত্বের বীজ যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তখন হৃদয়েই অপরকে সাধু কাব্যের চোঁটাও উদ্ধাম হইয়া উঠিবে। সুতরাং যখন তুমি সাধুর সমাজে আন সাধু দেখিতে পাহুঁতেছ না মনে করিয়া গুরু হইতেছ, তখন তুমি নিজে যে সাধুত্বের সংস্কারচূত হইয়া পড়িতেছ, সে কথা ভুলিয়া যাহও না। সাধু-অসাধু চিনিয়া ফেলিয়াছি—এই মনোবৃত্ত সাধুত্ব সাধনার একমাত্র পতিকুল। অসাধুকেও সহ্য করিয়া যিনি তাহাকে সাধু কবিতার ক্ষমতা রাখেন, সেই সিদ্ধ সাধুই সাধু-অসাধু চেনেন, তুমি-আমি সে নিজের ভাব করিয়া নিজেই চিত্তবৃত্তিক কলুষিত কবি মাত্র।

সাধুত্বের মূর্খতা লক্ষণ-জ্ঞান জন্মিবার পূর্বে সাধকের মনে অপরের উপর একটা দানী জায়া যায়। সে গোপেন সঙ্গে এই কথাটা ভাবে সাধুর আন্তরিক্যে এমত সাধু হইবে না কেন? তাহা পর, নিজের সংস্কারানুযায়ী কোণায়ও সাধুত্বের স্বর্কতা দেখিতে পাইলেই সে ক্ষোভে আঘাত হইয়া পড়ে এবং অসাধুত্বের নিদন সাধনের আশ্রয়ে অধীর হইয়া উঠে। এই অপরিণত অসহিষ্ণুতা প্রকৃত সাধুত্ব অর্জনের পক্ষে বিষম বাধা। হয়ত সাধক মনে করে, অজ্ঞায় দেখিয়া অসহিষ্ণু হইবার ঐশ্বর্যসম্পন্ন আধিকার তাহার আছে; সুতরাং তাহার এ ক্রোধ পূর্ণাঙ্গনের ক্রোধ (righteous wrath)। কিন্তু এটা যেমত বড় অভিমানের কথা, সে কথা সে ভাবিয়া দেখে না। তা ছাড়া এ কথাটাও সে বুঝিতে পারে না, সাধুর সমাজ ভাবের সংগতি, ব্যক্তিগত সংগতি নয়। এক্ষেত্রে যথার্থ সাধুত্ব



ভাবনিগ্ৰহমাত্র, 'আর সবট' সাধক। সাধু হইয়া তার পর সবট দল বাঁধে নাট—বাঁধিতেও পারে না; দল বাঁধিয়াছে সাধু হইবার ক্ষমতা। স্তত্রাং সবট এখানে সাধক। সাধকে সাধকে গুণতত্ত্ব কল্পিয়া দিঙ্গির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরম্পরে প্রেম না থাকুক, সন্তিস্কৃত থাক। চাই। অসাধু উপর চট্টানারও একটা অধিকার থাক। চাই। গৃহস্থ সাধুর নিন্দায় যখন চয়, তা জানি। কিন্তু সাধু যদি সাধুর নিন্দা করে, তাহা হইলে সেটা হয় আত্মকর্তার গামিখ। তাই সাধককে সর্বদা স্মরণে রাখ। উচিত—সাধুর ক্ষেত্রে সবট সাধু হইতে আসিয়াছে, সাধু হইয়া কেহ দল পাঁকাইতে আসে নাট। এক বনে একটা রাঘব থাকে, পালে পালে বাঘ চলে না। খাঁটা সাধু বাঘের মত একচ্ছত্র রাজা। স্তত্রাং যেখানে সংঘ স্বীকৃত করিতেছি, সেখানে সবট সাধু হইবে, এ দাবী করা ছেলেমানুষী ও আত্মাভিমানের পরিচায়ক।

সাধুদের সমালোচনা করিতে গিয়া সাধক নিজে মস্ত সাধু বলিয়া যান—এট আবার এক বিপদ। আমি সাধু—এ তেজ ভিতরে থাকা চাই, সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এ তেজ খাটাইতে হইবে কাতার উপর। পরের উপর না নিজের উপর। সাধু স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে, কিন্তু পরের উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে গঠবে না। সাধুদের পথ বড় বিষম, পদে পদে নিজেকে যাচাই না করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখিয়াছি, অধিকাংশস্থলেই সাধুদের যাচাইটা হয় অপরের সঙ্গে তুলনা করিয়া। সাধক অপর সাধকের ক্রটিটা খুঁ বড় বড় চরফে নিজের

মনেব মাঝে জাগাইয়া রাখিয়া 'ভাবে', 'আমি তো এমন করি না, অতএব আমি সাধু।' এট মনোভাবের মাঝে একটা স্বতঃবিবোধ রহিয়াছে। যখন বর ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন নিজকে নিঃসঙ্গ করনা কল্পিয়া আসিয়া-ছিলাম। রম্ভা হইয়া যখন ঘুনিয়া বেড়াইয়াছি, তখনও নিজের দিকে তাকানো ছাড়া অপরের দিকে তাকানোর সুযোগ ঘটয়া উঠে নাট—কেননা কাহারও সঙ্গে বর-করা করিবান সুযোগ তো তখন মিলে নাট। সাধুর জীবন বাস্তবিক এট নিঃসঙ্গ জীবন। এ কথা বিশেষ করিয়াই জানি, সাধুর জুড়ি মেলা ভার। এট নিঃসঙ্গ সাধুদের সাধক যখন সাধুর আন্তানায় ঢোকে, তখন সে ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব যে তার সাধনার পক্ষে একেবাঁধেই নিস্ত্রয়ো-জন, এ কথা সে কেন ভুলিয়া যায়? পরের কাঁধে পা ভুলিয়া দিয়া বসাকে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া বলে না—স্বপ্রতিষ্ঠ মানে নিজের পায়ে নিজে ভর করিয়া দাঁড়ানো। তাই সাধুদের যথার্থ সাধক সেট, যে অপরের সঙ্গে যাচাই করিয়া নিজের কাছ নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিতে যায় না; যে জানে, আমি সত্যের সাধক, অতএব জগতে আমি একলা, কারও গুণেরও অনুকরণ করি না, দোষেরও সমালোচনা করি না। চহাচ যথার্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা নতুবা নিজ-মত হইয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করাকে সাধুত্ব বলে না। তবুও অপরের অসাধুত্ব দেখিলে চোখ বজিয়া থাকিতে হইবে—আমি বলি, বাইরের চোখ না বজিতে পার, মনের চোখ ছটা বজিয়া রাখ—সুদৃষ্ট হইও না। নিজেকে বাহ্যিক মনে করিও না। তোমার ভ্রম—তুমি—অপরে তোমার ভুল্য নয়।

অসাধুজীবনকে উৎসর্গ সাধকের দ্বারা, অসাধুজীবন প্রতি ককণা সিদ্ধের সম্ভাব্য ; আর অসাধুজীবন প্রতি ক্ষোভ বা আত্মসম্মতি নিবন্ধের অসাধুজীবন প্রমাণ ।

অনেক জানিয়া-বুঝিয়াও চূপ করিয়া থাকি। যথার্থ সাধকের লক্ষণ । নয়া ভেকওয়াল সাধুনা চূপ করিয়া থাকে, কিছু জানে না বলিয়া । কিন্তু যেই ঘরকন্নার চৌকাঠকি স্তব্ধ হয়, অমনি সাধুজীবন ভেক গিয়া গিয়া নথদন্ত নাতির হইয়া পড়ে, অথচ উভয় পক্ষই মনে করে, আমরা সাধু ; এ বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি । অপনকে উপদেশ দেওয়া, পথ বাংলাটয়া পথে আনিবার চেষ্টা করা—সাধুজীবনের এটা একটা মহাব্যাধি । সবাই ভাবে সাধু ; খাতায় নাম লেখাইয়া মাত্রই বুদ্ধি পরকে উপদেশ দেওয়ার সনদ মিলিয়া গেল । বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি, নয়াবাজার সময় সাত চড়ে যাহার একটা কথা বাতিল হইত না, তদনিন্দা পথেই সে মস্ত প্রচারক হইয়া বসিয়াছে যত্র-তত্র কথা প্রচার করা, গায়ে পড়িয়া উপদেশ দেওয়া তাহার একটা ব্যক্তিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে । যাচাইদেওয়া ভেদ, তাহারই বলি, এইখানে সাধু সাধনা । আত্মজ্ঞান না হইলে উপদেশ দেওয়ার অধিকার মিলে না । সব বুঝি, —এই বড়াইয়েই সাধুজীবনের সমাপ্তি । প্রকৃত সাধু সব বোঝেন, কিন্তু কিছু বলেন না ; তাই মন মহাশূন্য বলিয়াছেন, “জানমাসি হি মেধাবী জড়বস্তুর আচরণ” —বুদ্ধিমান সাধু সব জানিয়া লোকের মাঝে বোকার মত থাকিবেন । যে মুখ-চপল, তার সাধুজীবন বড় বিফলগতি ।

কাতারও নিকট হইতে উচ্চারণ করিয়া আনা চলে না । ছোট ছোট ভেলদেব মাঝে দেখি, যদি কেহ একটা অগ্রায় করিয়া ধর পড়িল, তাহা হলে, সাক্ষাৎ স্বরূপ অমনি বলিয়া বসিলে, “অমুকও যকনি !” অর্থাৎ দোষী যদি একজন সজ্জী জোটাতে পারে, তাহা হইলে তাহার দোষ যেন হাক হইয়া যায় । আমরা বড় হইয়া একে শিশু-স্বলভ নীতিকে সমর্থন করি না । কিন্তু রহস্য এই, সাধু বনিত গিয়াও এই নীতিটাই অনেক সময়ে আমরা মনের কোণে গোপন করি । সাধুজীবনের কাছে সাধুজীবন উপদেশ দেওয়া অধিকঃশব্দে নিপদেব কারণ হইয়া উঠে দেখিতে পাউ । যে উপদেশ দিতে যাঁতে, সাধক সাধু নিষ্কিন্দ্র বনে তাহার সাধুজীবন গীচাই করিয়া তবে তাহার কথায় কাণ দিলে । একরূপ কষ্টিন যাচাইয়ে অধিকঃশব্দে উপদেশের সাধু টেকে না—ফলে উপদেষ্ট সাধু এই ভাবিয়া মনে মনে গজরাইতে থাকেন, “উনি আমাকে উপদেশ দিতে আসিলেন, কিন্তু নিজে কি, তাহা দেখেন না ?” সাধক ভুলিয়া যায়, অভিমান বিসর্জনই সাধুজীবনের পদান নিশানা । আমি সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে আমার পথ বাংলাটয়া দিলে কে—এই তাহার জবাবে পবল, তাহার আত্মশোধনের পথ বড় সঙ্কীর্ণ । প্রকৃত সাধুর জগৎটাই পাঠশালা । অবদূত সাধু হইতে গিয়া একুশজন গুরু করিয়াছিলেন, তাহার মাঝে ত্রিযুক্ত গাণ্ডীও বাদ যায় নাই । সাধক প্রথম যখন সাধু হইতে আসে, তখন সে গুরুগৃহে আসিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহা সবাই তাহার শিক্ষাদাতা । ততদিন চিত্ত

অর্জুনের নিম্নলিখিত আনন্দও সেই পায়। কিন্তু অলক্ষ্যে কোন মুহূর্ত্ত সময়তান তাহার মাঝে ঢুকিয়া তাহাকে গুরুত্বের পদবীতে অভিষিক্ত করে। যে দিন হইতে গুরুগিরি সুরু হয়, সে দিন হইতে আর অপরের নিকট হইতে শিখিবার কিছু থাকে নহে। সাধুত্বের সাধনারও প্রথম হইয়া যায়। সাধু সাধক এইখানে সুবধান।

সাধুর সমাজ একটা ভাণ্ডার মাত্র। প্রতিষ্ঠিত এক কপা বলিয়াছিল। তাহা যেখানে অন্তর্ভুক্ত, কর্ম্ম সেখানে সহজ, সাধনা সেখানে দৈনন্দিন জীবনের সহজ কর্ম্মে ফুটিয়া উঠে—ইহাট আশ-সমাজ বা সাধু-সমাজ বা গুরু গৃহের বিশেষত্ব। কিন্তু এট সহজ কর্ম্মে দিন গুলোর ব্যয় করিয়া সাধু অটল গাঙ্গ দেখিয়াছে অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যে সাধুকে বাহ্য দোষা চিনিবার ঘো নাই, অন্তরের মাঝে নিশ্চয়ই তাহাকে বড় হইতে হয়; কেননা অপরের কাছে তাহার সাধুত্ব দেখাচবার মত কিছু না হইলেও নিজের কাছে তো সাধুত্বের আদর্শ সর্বদাই উজ্জ্বল রাখিতে হয়। কিন্তু নিমিত্তপেক্ষিতা সাধুত্বের এমনি মজাগত যে বাহিরে একটা কিছু অবলম্বন না পাওয়া ভিতরটাকে পচন হইতে নিবারণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। ইহাতেই দেখি, সহজ কর্ম্মের মাঝেও আড়ম্বর আনিয়া এক শ্রেণীর সাধক যেমন নিজের সাধুত্বকে প্রমাণিত রাখিতে চেষ্টা করে, তেমনি আবার উপলক্ষ্যটুকু দূর হইয়া মাত্রই কেহ কেহ অক্ষেপে নিজের অন্তরের সাধুত্বকে পিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বরং তখন “আমরা সহজ ভাবে চলি, অতএব সাধুত্ব আমাদের নিম্নয়োজন” এই

আত্মবিরোধী অভিমানে হৃদয় পুনিয়া উঠে। সহজ কর্ম্মের ফতোয়া পাটগেটে যে অসংগত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, এমন কপা কিছুতেই হইতে পারে না। এট জ্ঞাত যে প্রকৃত সাধু হইতে ইচ্ছা করে, তাহার সমুদায় এট মনোভাব পোষণ করা প্রয়োজন যে, “কাজে কর্ম্মে যাচাই হইবে কেন, আমি যেন মনে-প্রাণে সাধু হইতে পারি। গুরুগৃহের সহজ কর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে সাবধান থাকিতে হইবে যেন সংসার-মূলত অসাধুকনোচিত চিত্তবিকৃতি আসিয়া আমাকে আত্মত্যাগ করিয়া না ফেলে।” সহজ কর্ম্মকে সাধুত্ব সাধনার উপকরণ কল্পিতে হইলে মনকে নিরানন্দ অতএব প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন করিতে হয়, নতুবা সাধুত্ব বজায় রাখা যায় না।

অনেক সাধকের মাঝে সহজ কর্ম্মের উপলক্ষ্যে কর্ম্ম-অর্জুনের বাস্তবিক ঢুকিয়া যায়। সহজ কর্ম্মে সাধুত্বের বিকাশ করতে হইলে জগতের প্রতি একটা দায়িত্ব থাকে। অতএব তখন শুধু আমার মুক্তি, আমার সুখ—এই ভাব-নিয়া থাকা চলে না। কিন্তু অনেকের মনে ধারণা, সাধু হইয়া অর্থে দায় মুক্ত হওয়া। এই ভাব নিয়া সংসার ছাড়িয়া আত্মমুক্তির সাধনাপেক্ষায় যদি কেহ রমণ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাকে বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না, কিন্তু সে যদি সাধুর সমাজকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে অপরের নিরপেক্ষ হইয়া নিজের মুক্তির চেষ্টাটাও তাহার সাধুত্বের বিরোধী হইবে। সাধুর লক্ষ্য জগদ্ধিতে আত্মমুক্তি; সহজ কর্ম্মের ইহাট চরম পরিসমাপ্তি। এই লক্ষ্য অন্তরে জাগ্রত থাকিলে সাধু হইয়া সকল দায় এড়াইয়াছি, এট মনোভাব কিছুতেই

আসিতে পারে না। আমার যোগ্যতাকে  
আছে—এই দীন ভাব নিয়েও দায় এড়ানো  
যায় না কেননা যেখানে সমাজ, সেখানে এ  
যুক্তি একবারেই অচল। সেবার অধিকার  
নিতান্ত অযোগ্যও আছে; বরং যে যত  
অভিমানবাজিত, তার সেবা কারবার আকুলতা  
ও সামর্থ্য তত বেশী হইবে। সহজ কর্মে  
সাধু অর্জনের প্রচেষ্টা একমাত্র সেবাবৃত্তির  
ভিতর দিয়া উন্মোচিত হইতে পারে। সুতরাং  
সাধু হইয়া দায় এড়াইয়াছি—এ কথা সাধুর  
সমাজে নিন্দিতই অচল। যদি কোনও সাধকের  
মনে এই ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে  
হইবে, সে আত্মপ্রবন্ধনা করিতেছে, নতুনা  
ক্লীষের উপাসনাকে সাধু বলিয়া ভুল  
বুঝিতেছে।

এই সামাজিক দায়বদ্ধতা হইতেই  
আবার এক শ্রেণীর সাধকের মনে একটা  
গভীর নিশ্চেষ্টতা আসিয়া পড়ে “বাহ-দাহ  
কঁাসী বাজাই”—হহাই তাহাদের কাছে  
সাধুদের আদর্শ। যে সমস্ত সাধক রমতা  
হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের চক্ষু অনেক  
সময় আহার চক্ষুর উর্কে উঠে না দেখতে  
পাঠ; কিন্তু তবুও আহার-সংস্থানের চেষ্টা-  
তেও তাহাদিগকে কতকটা সজীব রাখে।  
কিন্তু সাধুর সমাজে সহজে যে সাধক নিশ্চল  
হইয়া যায়, তাহার নিজীবতার আর তুলনা  
নাই। এই শ্রেণীর সাধক নিশ্চেষ্টতাকেই  
আত্মসমর্পণ বলিয়া ভুল করে। সমাজ আশ্রয়  
করিয়া নিশ্চেষ্ট রাহিয়াছে, অথচ তাহান চিন্তে  
কীৰ্শা, পরনিন্দা, কটুবুদ্ধি ইত্যাদি নীচবৃত্ত  
প্রবেশ লাভ করে নাহ, এরূপ সাধক বেশী  
দোষযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আত্মসমর্পণ যে  
নিশ্চেষ্টতা নয়, ইহাই তাহাব প্রাণ। সাধুর

সমাজে কর্ম্মশ্যাগের অধিকার নিজে জুটাইয়া  
আনা যায় না; সমাজের মঞ্জুরিতে, সাধুর  
কৃপায় সাধকের কর্ম্ম দেহের এলাকা হইতে  
মনের এলাকায় চালান হইতে পারে মাত্র।  
কিন্তু তাহারও দায়িত্ব বড় ভীষণ। সর্বদা  
হিসমির না থাকিলে আত্মপ্রবন্ধনার হাত  
হইতে সে অবস্থায় নিজের পাওয়া বড়  
কঠিন।

ভাবোচ্ছ্বাস-প্রণোদিত সাধুতা অনেক  
সময় নিছক ভাবুকতার পরিণত হয়। দাঙ্গালী  
জাতি স্বভাবতঃ ভাব-প্রাণ; কর্ম্ম অনাস্থা  
তাহার মজ্জাগত। সাধকের মাঝে ভাবুকতার  
অতিশয়ে কর্ম্ম এড়াইয়া চালবার চেষ্টা  
অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা  
সোজা-সোজা আত্মপ্রবন্ধনা করে, তাহাদের ফাঁকি  
অনেক সময়ে ধরা যায়, কিন্তু ভাবকের ফাঁকি  
ধরা বড় কঠিন—কেননা সে নিজেই নিজের  
কাছে স্পষ্ট নয়। সাধনার একটা অবস্থায়  
এই ভাবুকতা যেন ভূতের মত সাধকের খাড়ে  
চাপিয়া বসে। অলক্ষ্যে তাহা সাধককে  
তামসিকতার পথে টানিয়া নেয়, অথচ সাধক  
মনে করে, আমি বুদ্ধি দিন দিন উন্নতর পথে  
অগ্রসর হইতেছি। সাধকদের ভাবুকতা সত্য  
না মিথ্যা, তাহার পরীক্ষা হয় ভাবুকতাকে  
আঘাত করিয়া। ভাবুকতায় আঘাত পড়িলে  
যে সাধকের অনৈবৃত্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে,  
তাকে বাল, এই সেলা সাবধান—তুমি  
সয়তানের পাল্লায় পড়িয়াছ। যে ভাবুকতার  
মধ্যে সত্যের বীজ নিহত রাহিয়াছে, আঘাতে  
তাহার শিল্পি পূট হয়। আর সব চেয়ে বড়  
কথা যে কোন কর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিতে  
জানে না, তাহা ভক্তিমীরই কাছাকাছি। সাধক  
এই দুটা লক্ষণ মলাইয়া নিজের ভাবুকতাকে  
বাচাই করণ পণ চলিবে?

সাধুই অর্থে সবলে আত্মপ্ৰসারণ। দোর  
কর্ষ ও পরম নিশ্চলি, এতে চুটোরন সামঞ্জস্য  
বেধানে, সেখানেই যথার্থ সাধুই ফুটিয়া  
উঠিয়াছে। যিনি করুণাক্তে সত্যসানীর সাননি,  
অগচ স্বয়ং নলিণি তিনিই সাধুন আদর্শ।  
এই সাধনার সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে  
সর্বতোভাবে পার্শ্বের পদাঙ্কাত্তসরণ করিতে  
হইবে। অর্জুনের ঐকান্তিক লক্ষ্য নিষ্ঠা,  
স্বকঠোর তপশ্চর্যা অগচ আত্মপ্রাণের অত্যা-  
জ্ঞানার্শের প্রতি পরম প্রোণ্য ভাব, ইত্যাদি  
সাধু সাধকের নৈকীয়া।

তবে সত্য কথা বলিতে গেলে এক কথা  
নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, বাস্তবজীবনে  
আমরা যাহাকে সাধু বা অসাধু সংজ্ঞায় অভি-  
হিত করি, তাহা মনের ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই  
নহে। যেমন জগতের মিথ্যাস্ব ভাঙার  
নাস্তিহকে প্রমাণিত করে না, শুধু দৃষ্টির  
বিকল্পিত সত্যাসত্যের নিরূপক, তেমনি  
কোনও বাবহার দ্বারা প্রকৃত সাধুই নিরূপিত  
হইতে পারে না। তবে এ কথাটা সাধকের  
জানিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই, কেননা  
সাধকের পক্ষে কপাস্বের সিদ্ধিই প্রথম কাম্য।  
এই জন্ত অদ্যাত্মজ্ঞানের গোড়ার আইন  
পাপ-পরিত্যাজ। ন পুণ্যং ন পাপং—এ কথা  
কঠোর সত্য হইলেও অগ্রবুদ্ধ সাধকের উচা

আলাচ্য নাই। অসত্য বর্জন করিয়া সত্যের  
আভাস না পাইলে উচ্য প্রসার বা প্রতিষ্ঠাই  
বা হইবে কি করিয়া? আর সত্যের প্রসার  
না হইলে অসত্যকে কুফিগত করিবেই বা  
কে? এই জন্ত স্বরূপাবস্থা স্বয়ং-সিদ্ধ অত্যা-  
অসাধ্য হইলেও সাধনার প্রয়োজনীয়তায়  
অধিকারভেদে চিরকাল বর্তমান থাকে।

সাধু হইলেই নিয়তি এড়ানো যায় না,  
কেননা উচা এড়াইবার প্রয়োজনও থাকে না।  
এই জন্ত বড় বড় সাধু মহাপুরুষদের জীবনেও  
আমরা এমন ঘটনা সংস্থানের সমাবেশ দেখি,  
যাহা সাধুই সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একান্ত  
বিপরীত। সাধারণ মানুষ কর্তৃক দেখিয়া বাতির  
দেখিয়া সাধুন পিচার কবে। কিন্তু কল্যাণ  
বাহার নিশ্চয় লক্ষণ, অস্তলক্ষ্যই বাহ্যিক  
বৈশিষ্ট্য, তাহার পারচয় কি এই উপায়ে  
কখনও মিলিতে পারে? প্রারব্ধ বা নিয়ত  
যাহাই হউক না কেন, তাহার রূপান্তর  
ঘটায়ের প্রচেষ্টাকে সাধুই বলে না। সাধুন  
কাচারই সহিত বিরোধ নাই—নিয়তির সঙ্গেও  
না। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অবোধের মত  
অদৃষ্টের সঙ্গেই লড়াই করিয়া মরিতেছে। এই  
জন্তই সাধু অসাধুকে বুঝিতে পারিলেও অসাধু  
কখনো সাধুকে বুঝিতে পারে না। তাই কথায়  
আছে, সাধু না হইলে সাধু চেনা যায় না।



## শ্রুতস্মৃতি

—\*—

হিন্দু বৈদ্য পতাক এবং জাগ্রৎ; এবং মত মধুর আর কিছুই নাট। বৈদ্য জ্ঞান চাইলে প্রকৃত পেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের পতি অণু পরমাণুতে তার অভ্যুত্থি হয়। বৈদ্যাস্থিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যাব বিশ্ব কিছু জানলাম না, বললাম না শুধু শুধু কি তার উপর তেমনি টান হয়? তা হয় না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

\*

নিজের কতটুকু জানেনের অধিকারী হতেছে, চিন্তে কতটুকু শাস্তি এসেছে, তা বিচার করে পরের উন্নতি করতে যাওয়া উচিত।

\*

নিজকে যে পরের জগৎ বিলিয়ে দিতে পারে, সেট ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের মত ত্যাগী কে?

\*

ব্রহ্মবিদ শুক গাংক্য বৈদ্যস্বরূপ; শুক বাক্যকেই বৈদ্য বাক্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। শঙ্কর ভগবদ্রূপ, কেননা তিনি বৈদ্য-স্তের ঘনীভূত বিগ্রহ। “ব্রহ্ম বৈদ, ব্রহ্ম এব ভবতি।”

\*

সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হলে, তবে বৈদ্যস্ব শোনবার অধিকার জন্মে। বই পড়ে কেউ

বৈদ্যস্ব শিখতে পারেন না। প্রথমতঃ শুক যথেষ্ট শ্রাব, তার পর মনন ও নির্দিষ্টাঙ্গন করতে হয়। নিজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করব, কিন্তু মুক্ত হব এও বাসনা। চিন্তকে একেবারে নিস্তব্ধ করতে হবে। একমাত্র আত্মা নিত্য আর সমস্ত অনিত্য, এই ভাবে বিচার করে বিবেক কাণ্ড করতে হবে।

\*

জনক রাজা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য অষ্টাবক্রের কাছে গেলে, অষ্টাবক্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুমি কি করেছ যে জ্ঞানের অধিকারী হবে?” জনক বলিলেন, “প্রথম আমি কর্ম হতে বিরত হয়েছি, তার পর বাক্য হতে বিরত হয়েছি, অবশেষে চিন্তা হতে বিরত হয়ে অবস্থান করছি।” এই অবস্থায় জনকের মন বাসনা-মুক্ত হয়ে নিরালস্য ছিল। সুতরাং জনকই প্রকৃত বৈদ্যস্ব অধিকারী।

\*

ভগবানের দেহ তত্ত্বময় এবং জ্ঞানময়। ভগবানের দেহ আর দেহীতে উপাদানগত কোনও পার্থক্য থাকতে পারে না, সেখানে দেহ দেহী এক। ভগবানের দেহে স্থলধাতুর কোনও উপাদান আদৌ থাকে না—তার স্বরূপ ও দেহ একই সচ্চিদানন্দময় অবস্থা। যেমন জলে এক খণ্ড বরফের সৃষ্টি হল, বরফে আর জলে উপাদানগত কোনও পার্থক্যই নাট—যাবার উচ্চাষাত্র বরফ সেট জলেই পরিণত হতে পারে। ভগবানের দেহেরও তেমনি স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই।

তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়; তবে আনন্দ মত তত্ত্বময়, জ্ঞানময়, বিদ্যা ভাবময় দেহ ধারণ করে থাকেন।

\*

জীবাশ্মর আকার একটা জ্যোতিঃকণার মত। পরমাশ্মাকে চন্দ্র গোলক কল্পনা করলে জীবাশ্মা যেন তারই একটা ধূলিকণা। পরমাশ্মা এক ব্রহ্মাণ্ডের কণ্টা। চকু টেনে ধরলে যে একটু জ্যোতিঃকণার আভাস পাওয়া যায়, তাই জীবাশ্মার আভাস।

\*

শাস্ত্র ভাব আত্মজ্ঞানীর বা যোগীর ভাব। দান্ত, সখা, বাৎসল্য দ্বৈত ভাব। দ্বৈত ভাব হলেও একে অপরের সাহিত্য একপ্রাণ, একে, সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ, এমানতর বেশামেশি ভাব। দ্বৈতভাবের মাঝে বাৎসল্য ভাব সবার পড়। তার মাঝে কোনও কামনা নাই। ছেলের কাছ থেকে কিছুই চায় না অথচ প্রাণপণে ছেলের সেবা করছে, ছেলের সুখ-দুঃখে একেবারে আত্মহারা—এই হল বাৎসল্য। বাৎসল্যভাবই সাধনার চরম অবস্থা। মধুরভাব সিদ্ধাপ্রাপ্ত, তাই হল অদ্বৈত ভাব, তাতে আপন, সত্তা একেবারে লোপ হয়ে যায়। বাৎসল্যভাবে সাধনার চরম হলেই মধুরভাব বা সিদ্ধাপ্রাপ্তি আপন-আসনে। মধুরভাবে পূর্বের চার ভাবেরই সমাবেশ আছে। মধুর ভাব বেদান্তের অপরোক্ষ ভাব অর্থাৎ আমিই সেই—এই জানে মধুর ভাব পর্যবাসিত।

\*

পক্ষ ভ্রাম হতেও গোপী ভাব শ্রেষ্ঠ। তা

বেদান্তের “সাক্ষী চেতা নিরুপদ্রব” এই ভাব। গোপীর নিজের কোনও কামনাট নাই, সে চায় কৃষ্ণকে এনে রাখার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে সেই যুগলমিলন দেখবে। তার নিজের সুখনাশ্র। নাই, রাখাকৃষ্ণের মিলনানন্দেই তার আনন্দ তাই গোপীই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের অধিকারী; যুগলমিলনের সমষ্টিগত আনন্দট সাক্ষিভাবে গোপী অমুভব করে থাকে, অথচ সে নির্লিপ্ত। এই চেতা বেদান্তের চরম সিদ্ধ। জীবাশ্মাকে পরমাশ্মায় মিলানো বিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ—এই সবই রাখাকৃষ্ণের যুগলমিলন। এই মিলন দেখাই গোপী ভাব বা সাক্ষী ভাব। বেদান্তের দ্বারা বৈষ্ণবের ভাব পথ ঠিক করে নিলেই সব চেয়ে মধুর হয়, তখন তার কোনও ভুল থাকতে পারে না।

\*

কামট নিরুপদ্রে গেলে প্রেম হয়। কামটা খাপ্পাপ জিনিষ নয়, ও-ই প্রেমের উপাদান। যৌবনেই কামের পূর্ণত্ব; এই জন্তু ধুবকদেরই উৎসাহ, উত্তম এবং আনন্দের ভাব এই সময়েই বেশী দেখা যায়। বৃদ্ধকালে কাম শিথিল হয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌বুদ্ধিগুলিও ক্রিয়া শিথিল হয়ে যায়। কামতত্ত্ব অতি নিগূঢ়। সাংসারিক লোক এ তত্ত্ব জানিলে উপকার হত। যত্ন জানবার তাদের অপর কোথায়? সংযম ছাড়া তত্ত্ব জানা যায় না। সংসারী সাধারণতঃ পশুর মত রমণীতে আসক্ত, তত্ত্বাত্মসন্ধান করবে আর কখন?

\*

দেহতত্ত্ব জানা থাকলে আখ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ সুস্থ ও কারণ দগতের তত্ত্ব সহজে

বোধগম্য হয়। কেননা স্থলেই তো হৃদয় ও কারণের চরম বিকাশ হয়েছে। তাই স্থূল বিকাশ ধরে হৃদয় ও কারণ গিয়ে আবার সেই কারণ ও হৃদয় কি করে স্থূল প্রকাশ হয়েছে তা দর্শন করলে তবে জ্ঞানের পূর্ণতা হয়।

✱

বৈষ্ণবের ভাব সাধন বড়ই মধুর, কারণ এগুলি জগতের স্বাভাবিক উপাদান। নিত্য যা চোখের সামনে ঘটছে, তা থেকেই ভাব-গুলো নেওয়া হয়েছে। তাই ভাবের সাধনে বিকল্পাচরণ আদৌ নাই—সভাবের অন্তর্কলেই জ্ঞান সাধনা। সন্ন্যাসাদি কঠোর সাধনাতত্ত্ব স্বভাববিরুদ্ধ নিয়ম সংঘম করতে হয়, কিন্তু ভাবের সাধন স্বভাবানুযায়ী। জগতে যত রকম ভাবের বিকাশ আছে, সব নিয়েই বৈষ্ণব এক একটা সাধন পথ তৈরী করেছেন। বিশেষতঃ ভাবগুলি ভগবানের নিত্য-জগতের জিনিষ, তাই এত মধুর। উৎকৃষ্টতা, বিশুদ্ধতা সব তো এই জগতেরই স্বাভাবিক অংশ। এই স্বাভাবিক ভাবগুলি ভগবানে আবেশ করতে পারলে অর্থাৎ ভগবানের চিত্র এমনি সজ্জভাবে সাধনা করতে পারলেই জীবন সার্থক।

✱

বেদান্ত স্থূল ব্রহ্ম ও সৃষ্টিতে আদৌ আদৌ নি কিছা খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানও ধরেনি। জীবাত্মা কূটস্থ চৈতন্য বা আত্মার অংশ এ-ও স্বীকার করেনি। অর্থাৎ বেদান্ত ব্যাপ্তি ভাব আদৌ ধরেনি, একেবারে মূল ও সমষ্টি ভাব ধরেছে। প্রত্যেকেই সগুণ ব্রহ্ম, গুণ গুরিত্যাগ করলেই স্বরূপ বা আত্মিক প্রকাশিত হবে।

এই সর্বোচ্চ ভাবই বেদান্তের শিক্ষা।

✱

স্বপ্ন দেখাও ককট সৃষ্টির মত। জাগীর হয় এই স্বপ্নাবস্থা আদৌ চলা না, কিছা স্বপ্ন-সৃষ্টির সঙ্গে নিজের জ্ঞান বজায় রেখে তা থেকে তিনি অনিন্দ প্রাপ্ত করেন। তিনি যেন নিজেকে বাব সাজলেন, নিজেকেই ভয় দেখা-গেন আবার নিজেকে দর্শক হলেন।

✱

কূটস্থ-চৈতন্য বা আত্মা এক ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থলেই সমভাবে বিদ্যমান। তাপাশি স্থূল পদমাণ্ডে যে অংশ পড়েছে, তাই স্থূল দ্বারা অধ্যাসিত হয়ে জীব-চৈতন্যের সমষ্টি ভাব হয়ে দাঁড়ায়। এর ব্যাপ্তি ভাবই জীবাত্মা।

✱

পরমাত্মা আর আত্মা একই, তবে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা বা বিচার করতে গিয়ে পরমাত্মা বলা হয়। অর্থাৎ আত্মাতে জীব যেমন একটা বিশেষণ, পরমাত্মাও তেমনি একটা বিশেষণ। যোগশাস্ত্রে পরমাত্মার উল্লেখ দেখা যায়, নটনে সাংখ্য মতে আত্মা বলা হয়েছে।

✱

স্থূল, হৃদয় ও কারণ বেদান্তের সমষ্টি জ্ঞানে এক বৃকম; জীবাত্মার সাংখ্য মতে অর্থাৎ ব্যাপ্তি ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল হৃদয় কারণ পৃথক। মুণ্ডে সূক্ষ্মতম সমষ্টি কারণ হতেই উৎপন্ন হয়েছে, তবে স্তবধে কণ্ঠ ও ক্রমশঃ বিকার প্রাপ্ত হয়েছে হৃদয় ও স্থূলেরও ক্রমশঃ বিকার হয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেরও বিভিন্ন হৃদয় ও কারণ রয়েছে। সমষ্টি কারণকে বৈকানিক কারণ বলা যায়; ব্যাপ্তি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হৈমস; স্থূলের কারণ ভৌতিক। বেদান্ত



মতে সমষ্টি ব্রহ্মের কারণাবস্থা—মহাকারণ  
সম্পূর্ণ ভাব; সমষ্টি ব্রহ্মের সূক্ষ্মাবস্থা—মহত্ত্ব,  
অচ্যুতত্ব, পঞ্চতত্ত্বাত্মক ত্ব; সমষ্টি ব্রহ্মের  
স্থূলাবস্থা—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বের মিশ্রিতা-  
বস্থা অর্থাৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান।  
বেদান্ত সৃষ্টির এই উপাদান পর্য্যন্তই নিচর  
করেছে; অবশিষ্টগুলি স্বতঃসিদ্ধ, তাই তার  
আর নিচর করে নি। সাংখ্য কিন্তু এই স্থান  
হতেই আরম্ভ করেছে। কিন্তু সাংখ্যের নিচর্য্য  
বাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের কার-  
ণেরই নিকারযুক্ত কারণাবস্থা। সূক্ষ্ম ও স্থূলেও  
তাই।

\*

ঐগৌরঙ্গ নিকলক আদর্শ। গৌরঙ্গ  
অবতারে ভগবান্ জনকে ত্যাগ পৈরাগ্য ও  
শ্রমের আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন, একাধারে জ্ঞান  
ও শ্রমের খেলা দেখিয়েছেন। যে দিক দিয়েই  
হউক, কেউ তাঁর কোনও দোষ বেন করতে  
পারেন না। তিনি বাংলার একমাত্র অবতার  
—বাঙ্গালী জাতির গৌরব-স্বরূপ।

\*

জ্ঞানবাদীর দুটি বিশেষ কর্তব্য—(১)  
নিচর দ্বারা ত্ব বোঝা, (২) সেই সব অবস্থা  
উপেক্ষার জন্য ব্যাকুলতা।

\*

উপাসনার উদ্দেশ্যই স্বাক্ষর লাভ করা।  
যে যার উপাসনা করবে, ক্রমশঃ তার মন  
তদাকারকারিত হয়ে তৎস্বরূপ লাভ কববে।  
নচেৎ ভগবান্ স্তুতি মিনতি বা খোসামোদে  
ভেঙেন না, তার কাছে “শালা”ও বা,  
“বান”ও তা। তবে তাঁর গুণাবলীর আলো

চনাতে জীবেরই মঙ্গল হয় অর্থাৎ সর্বদা ভগবৎ  
প্রসঙ্গ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।

\*

শ্রীণ, মনন, নির্দিধাসন—জ্ঞান, কন্ম,  
ভক্তি—ব্রহ্মসত্ত্ব, ধ্যান, বাহু পূজা—এইগুলি  
সাধনার স্তর। মনন হতে মন্ত্রের উদ্ভব। স্তরঃ  
মন্ত্রও কন্মের অন্তর্গত। গুরু মুখে জ্ঞান  
কথা শ্রবণ মাত্র সে ভাব গে গ্রহণ করতে  
পারে, সেই উত্তম অধিকারী। ব্রহ্মের সং  
ভাবে পাকা অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত্বতে সর্বদা  
অবস্থানই তার পথ।

\*

মৃত্যু হটলেও জীবাত্মার পরিবর্তন হয় না।  
মরণের পূর্বে তার যে গুণকর্মের স্খাবরণ ছিল,  
তাঁই নিয়েই সে বেরিয়ে যায়, শুধু অল্পময়-  
কোষটা ছাড়ে মাত্র। ইচ্ছা হলে আবার এই  
অল্পময় দেহের আকারে আকারিত হয়ে সে  
দেখা দিতে পারে। তখন সে দেহ ক্ষতি  
তত্ত্বের উপাদানে গঠিত, তাতে রক্ত-মাংস  
আদি সাতটি ধাতুর অস্তিত্ব থাকে না। দেখতে  
তা স্থলদেহের মত হলেও কার্য্যঃ তা নয়।

\*

মৃত্যুর পর ভোগান্তে জীবের যখন আবার  
জন্মের সময় হয়, তখন প্রথমতঃ ঐ জন্মলোকে  
যায়। যেখানে হতে শিশির বিন্দুর সঙ্গে মিশে  
পৃথিবীতে পড়ে এবং কোনও গাছ বা ওষধির  
সঙ্গে মিশে যায়। দেশ, কাল, পাত্রানুসারে  
এমনি সৃষ্টিতে সে মাটিতে পড়ে যে যার  
ওরসে সে জন্মগ্রহণ করবে, সেই পুরুষই তাকে  
উদরস্থ করতে পারে। পুরুষের খাতের সঙ্গে  
উদরস্থ হয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে গেরস,  
রক্ত, মজ্জা ও অবশেষে শুক্রেণ মাঝে জীবগু-

রূপে অবস্থান করে। তার পর যথা সময়ে মাতৃ আধারে নীজরূপে শোণিতের সঙ্গে মিশে যায়। সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে এবং জীবাশ্মের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী, দেহ তৈরী হতে থাকে। এই দেহ প্রস্তুত করাও জীবের স্বৈচ্ছাধীন। মানুষের নিজ কর্ম ও গুণ অনুযায়ী দেশ-কাল-পাত্রানুসারে দেহ প্রস্তুত হয়ে থাকে। যার যে কর্মের জন্য দেহ প্রস্তুত হয়েছে, সে নিশ্চয়ই সে কর্ম সাধন করবে। রোগ-শোকের নিয়তি থাকলে তাও ভোগ করতে হবে, কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নাই। মানুষ বোঝে না বলেই প্রারম্ভিক কর্ম এড়াবার দরুণ মানসিক ও দেহত্যাগ পূজা করে থাকে। কিন্তু তাদের এতে আরও অনিষ্টই হয়। কাহ্ন এতে প্রারম্ভিক তে খণ্ডন হয়ই নাই, এবং নূতন কর্ম সঞ্চয়ে আরও জালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

✱

বেদান্তেরমতে সাধনপথ নাই। শুধু শ্রবণ, মনন, নিদিধাসন দ্বারা যা হয়, তা ছাড়া অন্য কোনও সাধনপথ নাই। এই জন্য শঙ্করের পরবর্তী কালে অতি অল্প লোকেরই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান হত, বরং অধিকাংশস্থলে বিপরীত ফলই ফলিত। সাধনপথ লোকেও গৌহং বলতে আর নিজকে শিব মনে করে অবাদে, পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। লোকে হয়ত ভগবানের ভয়েও পাপ করতে সাহস পায় না। কিন্তু তখনকার বেদান্তবাদীরা বেশীর ভাগই যখন শিব হয়ে গেল, তখন আর ভয় করবে কাকে? কাজেই পাপের মাত্রা যোলের আনার জায়গার আঠার আনা হয়ে গেল। এমন সময় শ্রীগোরাঙ্গের আবির্ভাব হল। তিনি বেদান্তের

সাধনপথ দেখিয়ে দিলেন। সাধনা দ্বারা যাতে জীব অনায়াসে বেদান্তজ্ঞানে পৌছাতে পারে, তিনি সেই পথ ধরিয়ে দিলেন, অগচ্ছিন্ন অধিকারীকেও বঞ্চিত করেনি না। শঙ্করের মত আর গোরাঙ্গের পণ, এই হয়ে সামঞ্জস্য করে নিতে পারলেই বেদান্তজ্ঞান সহজলভ্য হয়ে যায়। অবস্থান্তরে গোরাঙ্গদেবকে অবৈতন্যবাদের বিরুদ্ধেও বলতে হয়েছে, কারণ পুরাতন সংস্কার দূব না করে দিলে নূতন কিছু পতন করা কঠিন হয়ে পড়ে। গানের একটা সুরে সংস্কার জন্মে গেলে তার পর সেই গানেরই আর একটা ভাল সুর শুনলেও তা আরম্ভ হতে চায় না, আগের সুরটাই ফুটে ওঠে। এই জন্য প্রত্যেক অবতারণকে নিজ মত প্রচার করবার জন্য পূর্ব মতের নিন্দা করতে হয়েছে। বুদ্ধদেবও বেদের কয়কাণ্ডের নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ বেদবিহিত কাম্যকর্মে মানুষের সংস্কার তখন ঐতর্য প্রবল হয়েছিল যে নিকাম কর্ম করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। তাই বুদ্ধদেবকে একেবারে কর্মভাগের ব্যাবস্থা করতে হয়েছিল। আগার শঙ্করাচার্যকেও বৌদ্ধ শ্রুতবাদ খণ্ডন করে তাকে নির্বাসিত করতে হয়েছিল। তাও লোকের সংস্কার দূব করবার জন্য, নষ্টলে শ্রুতবাদ অধ্যাত্মকণ্ঠের বিরোধী নয়, জ্ঞানের পূর্বাবস্থা মাত্র। শঙ্করাচার্য যদিও খাঁটি অবৈতজ্ঞান প্রচার করেছিলেন, তবুও নিম্নাধিকারীকে তিনি অবহেলা করেনি। তাদের দরুণ নানা দেবদেবীর স্তব ও বাহু পূজার ব্যাবস্থা করে গিয়েছিলেন। তেমনি গোরাঙ্গদেবও অবৈত ও বৈত মতের দুই আদর্শই জীবকে দিয়ে গিয়েছেন। যখনই যে অবতার এসেছেন,

তিনিই নূতন বিরাট পন্থার মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথগুলিও অবগাহিত্ত করে রেখে গিয়েছেন।

#

যাব প্রত্যেক কিছুই দর্শন হয় নি, তবে কি না চারদিক বেঁধে দৃঢ় হয়ে উঠছে, সেই শ্রেষ্ঠ। তার যে উন্নতি হচ্ছে, এ কথাই সৈ নিশ্চয়ই বুঝতে পাবে। আবার যে ভক্তিপথে সামান্য একটু আনন্দ পেয়ে, তাতেই মত্ত হয়েছ, তাই পক্ষে উন্নতি হওয়া কঠিন, কারণ ভাল যত পথই তাকে দেখাও, সে সব অগ্রাহ্য করবে, যে একটু আনন্দ সে উপলব্ধি করেছে, তা কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। কক্ষের উপর এই সমস্ত লোকের খুব অশ্রদ্ধা আসে। একটু আনন্দ পেয়ে, তাই ধরে থাকলে ক্রমে প্রতিষ্ঠার ভাব এসে পড়ে, লোকে আমাদের খুব ধার্মিক কি ভাল মনে করুক, এই দিকে তখন দৃষ্টি যায় এবং তাতে অহং-এর আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়। যিনি নিজেকে ভক্ত মনে করেন, আব যিনি জ্ঞান পথে সামান্য উন্নতি লাভ করেই নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন—এই দুজনেই আত্মপ্রত্যাবক। কাবণ ভক্ত আদৌ মনে করতে পারে না যে

তার ভক্তি এসেছে, যতই ভক্তির অধিকারী হবে, ততই সে আরও কান্দাল হয়ে যাবে, ততই নিজেকে দীন-চীন মনে করবে। এমন লোক কাগজে-কলমে ভক্তি প্রকাশ কবে না বা দলাদলিতেও মেশে না—সে তখন চূপ হয়ে যায়। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিতে সমান দৃষ্টি রেখে ক্রমশ উন্নত হওয়াট খাঁটি। নচেৎ গোঁড়াবীতে কিছু হবার নয়।

#

যোগীরও নাদ শ্রবণ বা জ্যোতিঃদর্শনের পর ওই পথেই মন পড়ে যায়, উচ্চতর সুধনার প্রবৃত্তি তখন আর আসে না। কারণ বর্তমানে সে যে আনন্দ পেয়েছে, তা ছাড়তে তার ইচ্ছা হয় না, কাজেই উন্নতির রাস্তা পথ দিকে খোলা থাকলেও সে দিকে সে যেতে চায় না। ক্রমে অহংকার এসে পড়ে, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। শেষে সামান্য অসুভূতিই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অহংকার খুব বেড়ে যায়—এমনি করে সেও আত্মপ্রত্যাবক শুরু করে। কাজেই সাধন পথে অতি সতর্কতার সহিত চলতে হয়। (ক্রমশঃ)



## তিনের মায়ী

—{#}—

তিনি যে কিসে থাকেন, বুঝ না। এটাতে আছেন, ওটাতে নাই—এ কথা বললে তাঁকে পক্ষপাতী বলা হয়। না বলেও তো পার না—কেননা বুঝ না। অথবা তিনি কি, তাহা চিনি না—নিজের আনন্দটুকুকেই তিনি বলে মনে করি। সে মনে করায় ভুল হ'ব কোথায়?—তিনি তো সর্বময়।

দুটি কথা, বচায়ে পাওয়া যায় না, কেননা তিনি শুধু 'ব্যষ্টির যোগফল নন, পরস্তু সমষ্টির রসস্বরূপ।' ব্যষ্টিতে চাহলে ভুল হয় না বটে, কিন্তু ব্যষ্টি ভুলিয়ে দিতে পারে। সম্ভাব্যতাশক্তি, সঞ্চিত ও সংহত রয়েছে বলে জড়জ্ঞানে অবহেলা করা যায় না।

দেখাচ্ছ, রঙ: বা তমে থাকলে ইন্দ্রিয় বান্ধাণ হয়ে পড়ে, মনে বিকার আসে, বুদ্ধি তরল হয়ে থাকে; অথচ সাদৃশ্যকরতার তাঁর বিপরীত। এগুণ ছাড়া তো জগৎ নাই; এখন কোথায় বলব তাঁর আবাসস্থল? কাকে বলব তিনি?—

কাউকেই তিনি বলবার প্রয়োজন নাই। তিনি এ সবচেতন আছেন, কিন্তু কোনটিতেই তাঁর সম্পূর্ণ-ধারণা হয় না। তিনি এসবের চেয়ে বড়—প্রভু আমার গুণাতিষ্ঠা, নিগূর্ণ হয়েও গুণাধার—এক বণেই সকলে তাঁকে বলে। এর পর আর ধারণা হয় না। বুকে টেনে নিলেন যখন, তখন আর সন্দেহ কেন?

রজস্বম: যখন স্বপ্রধান, তখনই তার বন্ধন। কিন্তু তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে যখন তারা আসে, তখন আর বাঁধতে পারে

না। কেউ যে কেবল বাঁধে, তা নয়; এক লক্ষ্য ধরে অটল থাকলে যা বাঁধে, মুক্তির আনন্দও তার মাঝে থেকেই অনুভব করা যায়। সত্ত্বের রজস্বম: আছে—নিগূর্ণ হয়ে, বলীভূত হয়ে। সব সংশোধনের চরম ফল, তাই সর্বশুদ্ধ হলে খাটী জ্ঞানসংচেদনা যায়। আর রজস্বম: মোহ বা মলিনতায়ুক্ত থাকায় ভাঙে খাটীধের আবদ্ধ মিলে না।

একটি একটি করে আত্মকর্ম কল্পে হবে। প্রথমে তম:। এর মত-মতে চললে শরীরটি এক আবেশজ্ঞানার আশ্রয় হয়ে ওঠে। তাঁই তামসিকতায় অজ্ঞান, প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা—এগুলো জন্মায়। ফলে মানুষকে দেহ-সংস্রব, ইচ্ছা-সংস্রব হয়ে পড়তে হয়। তম: যেমন প্রভুকে ভুলিয়ে দিতে পারে, এমন আর কেউ নয়। কেননা সে গোয়ে না, সে ছেলেমানুষ। ভুল ছেলে নয়—ছুট্ট ছেলে। কাগমলে একে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কাজেই সংসম মানে দেহের পীড়ন নয়—প্রবৃত্তির শাসন। শাসনের বর্তমান শাস্তি হলোও ভাবিষ্ঠা—শাস্তি।

তাঁর পর হচ্ছে রজ:। এর দেওয়া ফল হচ্ছে কাম, ক্রোধ, উত্তেজনা, আসক্তি, অহঙ্কার ইত্যাদি। এ-ও প্রভুর আবাস। এ প্রভুর সঙ্গে সমানে যা ফেলে চলতে চায়। যেবারেই এর স্বভাব। এ বলে আমিই প্রভু—আমাকেই মান। এর বাক্যের আড়ম্বর বেশী। কিছু যুক্তিতর্কও জানে। তর্কে জিতে গেলেই মনে করে, আমি জিতে গেলাম। কিন্তু শুধু তর্কে

জিৎলেট তো নিরপেক্ষ বিচারকল বা যথার্থ মীমাংসা লাভ হয় না। তাই রকোণ্ডের কাছে গায়ের জোরে চারশেও আমবা আপন-খুসীতে তার বশ-হতে পারি না—তর্কে হেরেও মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে। মনে হয়, এর চেয়ে উদার কেউ আছেন, যিনি সন্তুষ্ট করতে পারেন—উভয় পক্ষের উপরই যার সমান প্রভাব।

ইনিই হচ্ছেন সত্য। ইনি প্রভুর শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ। কাকেরে এর প্রভাবকে যখন আমরা আশ্রয় করি, তখন ইনি নিঃশ্রেয়সপক্ষ অবলম্বনের অভিজ্ঞতা আমাদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ইনি জ্ঞাননিষ্ঠ, সদাশুচি জ্ঞানবান—তাঁই এর সহবাসে জ্ঞান জন্মে। প্রভুর যথার্থ অস্তিত্ব এর সাহায্যেই উপলব্ধ হয়।

সাধনপথে তিন অঙ্গচর—সত্য, রজঃ তমঃ। রজস্তমকে ছাড়িয়ে সত্ত্বের সঙ্গে যে আলাপচাণী করতে পারে, সেট বৈকুণ্ঠধামে সহজে প্রবেশাধিকার লাভ কবে। রজস্তমের অল্প বয়স—এখনো মতি স্থির হয় নি, তাই পথিককে নিয়ে তারা খেলাধুলাতে পাশায় দ্বন্দ্বায় মত্ত রাখতে চায়। যে বিশ্বাসী, সে এদের কপায় ভুলবে না। যে প্রভুকে চায়, সে প্রভুকেই পাবে—খেলাধুলা আমোদ প্রমোদ তার ভালট লাগবে না।

এখন মতিস্থির কর—প্রভুকে চাও, না ভবঘুরে হতে চাও। তাঁর কারণে, উপর পক্ষপাত নাই—যে যা চায়, তাঁকে তাই দেন। তিনি সত্ত্বেরও নন, রজঃেরও নন, তমেরও নন। তবে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত-বর্গে বজ্রবতঃই তাতে তাঁর আবেশ।

সব দিকেই পথ খোলা—কাউকে তিনি ঠেকিয়ে রাখেন না। বাস্তবিক আমরা এত প্রচণ্ডভাবে স্বাধীন যে তা আমাদের সব সময় বুধে ওঠি অসম্ভব। ভাল-মঙ্গল যা চাও, তাই পাবে—তবে জীর্ণ করা চাই। যখন জীর্ণ

করতে পারলে না, তখনই তো ঠেকে গেলে। ঠেকাই শিক্ষা। এক জীবনের ঠেকায় আর এক জীবনের শিক্ষা হয়। সব ঠেকে শিখবে—একটা জীবনের পক্ষে এ বহু ব্যবসায়পেক্ষ ব্যাপার। তাই আমরা লাগুনাকা আশ্রয় করি। যারা তাঁকে অপেক্ষেছেন, তাঁদের কাছ থেকে পাবার পথ কেনে নেওয়া—এ হচ্ছে স্বয়ং বায়ে ভূরি লাভ। সহজে কে ন' চায়? কিন্তু আমাদের মনবদ্ধি এমনি মজার, রজস্তমের অস্তিত্বকে যে অহংএর বশত, তাকেই সহজ ভেবে আঁকড়ে থাকি। পরে আঘাতে, যখন অজ্ঞানের গোমর ভেঙ্গে যায়, তখন দেখি, লুটিয়ে পড়তেই যথার্থ স্বাধীনতা!—তাঁকে পাবার এই-ই সহজ পথ। সবুজুড় চিত্তের ধর্মই আত্মনিবেদন—ফলে যেখানে চৈতন্য-চাক্ষুর বিরতি, সেখানেই অতীন্দ্রিয় আনন্দের ক্ষুণ্ণ।

আনন্দ ছাড়া কে কি চায়? আনন্দ বা আশ্রয় খুসী, এই জগতের সারসর্ক। আমরাও চলছি খুসীর প্রেরণাতে। এই খুসীকে ঠিক পথে চালিয়ে নেওয়া—এই হচ্ছে সবার সেরা কোশলের কাজ। খুসী যত দিন রজ আন ততোতে জড়িয়ে থাকে, তত দিন খুসী কিছুতেই মিটে ন'—এটা থেকে সেটার ঠোঁকর খেয়ে খেয়ে মানুষ কেবল চলতে থাকে, চলতে থাকে। তার পর তাঁর কৃপায় সত্ত্ব যখন বৈকুণ্ঠ লাভ হয়, তখনই আমার ক্ষুদ্র খুসী তখন তাঁর খুসীতে পরিণত ও পরিপুষ্ট হতে থাকে। তখনই আমরা প্রস্তুতি ও যথার্থ স্বাধীন হই। সত্ত্বের দান—এই গুণগুলি তখন জীবনে ফুটে উঠে—অলৌকিক না, অলৌকিক বলি না; ক্ষতিতে ক্ষোভ, লাভে বাস্তবতা থাকে না; আলো ছাড়া আদার কার মাঝে দেখি না; জগন্ময় সর্বত্র এক ভাব, এক জ্যোতিঃ, এক অমৃতকে অমৃত্যু করি।

# উড়ে চিঠি

—:~:—

একটা সুখের নিয়ে এসেছি তোমার কাছে—আমি ভাল আছি। আমার কাছে এখনও খবরটার কোনও মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কাছে যে এর মূল্য কতখানি, তা কি আমি জানি না ঠাকুর? আমি তোমাকে চাই বা না চাই, সে বিচার করবার, অবসর আমার হয় না; কিন্তু তুমি যে আমাকে চাও, দিনে মাঝে নানা ভাবে এই কথাটা যখন মনে পড়ে, তখন ভিতরের বাধনগুলো যেন সব এঁিয়ে পড়ে। তাই সে দিন আমাকে আমার কাছে সুন্দর মনে হয়, সে দিন তোমার চোখে যে কি অপূর্ণ হাসি ফুটে উঠবে, তাই ভেবে আমার মন মাতাল হয়ে ওঠে—মনের মাঝে এই কথাটাই কেবল গুণ্ গুণ্ করে ফিরে—আজু রজনী হাম ভাগে পোচায়নু!—এই জন্মে তো বলছিলাম, আমি ভাল আছি—এ যে তোমার কাছে একটা মস্ত সুখের!

কাঠিগাবাবার তিনটা উপদেশ সে 'দন' আমার শুনিয়েছিলে—(১) চার প্রহরমে জাগনা, (২) ভিতরসে কাম করনা, (৩) সদাসে, গুরু রচনা। কথা তিনটা ভারী মনে ধরেছে। বিশেষতঃ ওই দ্বিতীয় উপদেশটা। আজ সারাটা দিন আমার কাছে মধুময় হয়েছিল—ওই কথাটা স্মরণে রেখে। শুনে তুমি খুসী হবে নিশ্চয়ই!

ব্রাহ্মবিক আমাদের তো সব মাটা হয়ে যায়, শুধু ছটফটানিতে। তোমার কাছে কথাগুলো শুনেছিলাম বলে না গোড়ার কথাটা এতদিনে তলিয়ে বুঝলাম। সারাটা দন

চরকীর পাকের মত পাক, খেয়ে ফিরেছি—কিন্তু কোথায় শ্রদ্ধা, কোথায় অবসাদ!—বেশ বুঝেছি, এই তো আমাদের সাধনা—এই তো তপস্যা; প্রাণায়াম নয়, পূজা অর্চনা নয়, পেচনী শাস্ত্রবী নয়—ওহু! এই তো আমাদের সাধনা। দেহের শক্তি আর কতটুকু? দেহ তো শক্তির বাহনমাত্র। ওর জোর আসে মন থেকে। মন তাকে যা করতে হুকুম করবে, ও তাই করবে, করতে বাধ্য। আবার মনও শক্তি পাবে সত্য ভাব থেকে। এসব কথা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না, কেননা বিশ্বাসী ভাবনায় সংস্কার পাকা হয়ে আছে কি না। চলতে ফিরতে প্রথমেই দেহটা হাতে আসে, কাজেই তার দিকে তাকিয়ে কাজের যাচাই করিম ভাবি, ওই তো দেহ—তাতে এতটুকুই হবে কি বড় জোর ওইটুকু হবে। কিন্তু গিঞ্জাসা কবি, দেহের সঙ্গে এতটুকু ইওয়া-না-হওয়ার সম্পর্ক কি? পেশী শ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রান্তির নিদান কি? স্থূল কিছু কি? তা তো দেখছি না। অদৃশ্য রাজ্য থেকে উৎসাহ আসে, আবার অবসাদও আসে। তাহলে আর অদৃষ্টকে বিশ্বাস করব না কেন? স্মরণ থেকে শক্তির স্রোত এসে যে নীচটাকে সজীব করে তুলবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? উপরের শাসনে নীচটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এতটুকু বুঝতে পারা, আর বুঝে কাজে ফলিয়ে তোলা, এই আধ্যাত্মিক সাধনার সার কথা। তোমার দেহ বলছে, না খেলে পারব না, না খুঁতলে চলবে না, কিন্তু দেহকে খেতে

না দিয়ে যুঝতে না দিয়েও তো মানুষ বেঁচে থাকার সাধনা করেছে। তাতেই মনে হয়, উপদেষ্টার শাসনেই নৌচটা চলছে। নইলে এ কখনো সম্ভব হত না।

খুব বজ্রতা করছি, না? তুমি হেসো না। ও সব কথা একা আমার নয়, ও তোমারও কথা। তুমি পেরণা জাগিয়ে দিয়েছ বলেই না ওগুলো ফুটুগো, আর তাতেই না অন্যান্য আনন্দ পেলাম।

আর একটা মনে হয়, তুমি যে আমাদের দিয়ে সব করচ্ছ, এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসাধনা নয় কি? তুমি বলেছিলে বিশ্বাস করতে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’। ‘আবার তুমিই বলেছিলে, ‘সেই তিনটি এই হয়েছেন।’ সানাদিনের কাজের মাঝে এই ছোটো কথাই সামঞ্জস্য বিচিত্র হয়ে আমায় মাঝে ফুটে ওঠে, ভাবি, আমরাও ব্রহ্মের সত্য সর্বভূতে, সর্বভাবে, সর্বক্ষেত্রে চাড়িয়ে পড়ছি—তোমার সেবাকে উপলক্ষ্য করে। তোমার সেবার তো অভ্যাস রাখার জো রাখ নি। আমিই ব্রাহ্মণ, আমিই শূদ্র, আমিই কেরানী, চাষী, মজুর, মিস্ত্রী, ধোপা, নীপিত—সবই সাজছি। কেশ্বরের ফেরে দিনের মাঝে কতবার রূপ বদলাতে শুধু—কোনটা যে আমি, তা ঠিক করে বলবার জো নাই। অথচ আমি যে তোমার, এ কথাটা প্রাণের মূলে গাঁথা রয়েছে। তাই তোমার কাছে নিজেকে নড়ে দিয়ে মুহূর্তে ‘মুহূর্তে অনুভব করছি—‘সেই আমি—বহু হয়েছি!’ এর চেয়ে সহজ আর প্রত্যক্ষ বোধাত্মক শিক্ষা কোথায় মিলত?

দেশ-কলি মানতে হয় প্রথম সাধনায়। আমি মাথার ওপুর—এমন একটা ভাবনায়

ফল আছে। কাজ করছি আর নিজেকে রাখতে চাইছি—‘শিরসি সহস্রারে’—দেখি। যেহেতু চলছে যেন কলের মত। বাস্তবিক রাজার মত কাজ করবার অধিকার আমাদের দিয়ে রেখেছ। কিন্তু আমরা তা ব্যবহায়ে লাগাই না। তোমার অন্তরের দন হয়েও আমরা ভয়ের দাস, কামনার দাস—ধূলোয় পড়ে চটকট করি শুধু!

সব কান্ডেই তাড়াতাড়ি করি—আর তাতেই তো মরণ ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক স্থির হয়ে যদি ভাবতে যাই, তাহলে দেখি এই ‘সে শত-মুহূর্তে বাসনার বিক্ষোভ, এর মাঝে কোনটা আমার আয়ত্তে? ইচ্ছা করলেই তো আমি অপরকে চেততে পারি না; সুতরাং সে ক্ষেত্রে ফলকামনায় বিন্দুমাত্র লাভ আছে কি? আমায় ওপর আমার ইচ্ছা করুকটা খাটে বটে; কিন্তু তাও থাকে নিরোধের বেলায়, স্থিতির বেলায় তো নয়। অথচ আমার স্থিতিটা উদ্ভ্রাম বেগে চলুক, এটাই সর্বদা চাইছি। তার চেয়ে বলা ভাল, প্রলয়টা প্রচণ্ড বেগে হোক—আমার প্রলয়—আমার অমিত্র প্রলয়—তাহলেই পিনাশের নির্মল নীল ভূমিকায় স্বপ্নের আলোকে তুমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

ভাবি, তুমি আমার কি? আমি বলতে তো শুধু এই খাঁচাটা; ‘এ ছাড়া আর যা কিছু এর সাথে জড়িয়ে আছে, সবই তো তুমি—শুধু একলা তুমি নও—আমার তুমি! তোমার কথা ভাবতে ভাবতে তাই তুমিই হয়ে যাই! মনে হয়, এ তো আমি কাজ করছি, না—করছ তুমি! এই যে শুচি-স্নেহ মন, এই সে ললিত তনু-ভঙ্গী, এই যে আনন্দের

ঘনীভূত প্রগ্রহ—এই তো তুমি—এই তো তুমি!—আমি কোথায়? তোমাতে সে মিশে রয়েছে—শুধে নিয়েছ তাকে!

তাড়াহুড়ো করি কাজ, এগুবে না ভয়ে তো! কিন্তু ওতেই কাজ আরও পিঁড়িয়ে যায়। মানে সব জিনিষ বাড়বার একটা কায়দা আছে, সময় আছে। গাঁছের গোড়ায় খুব করে জল ঢাললেই গাছ তাড়াহুড়ি বড় হয় না—বরং ওতেই গোড়া পচে যায়। দেখেছি। তাড়াহুড়ো করিনি যে কাজটাতে, সেটাটাই সুডোল, সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখনই শেষে দেখতে পেয়েছি—তোমার হাসিমুখা সপ্রেম দৃষ্টিখানি! অথচ হয়ে তাই ভাবি—সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকো এত সহজ—অথচ এষ্ট সহজটাকেই আমরা ভুলে থাকি কি করে!

শ্রেম যেখানে থাকে, সেখানেই সেবার আগ্রহ জন্মায়। তোমায় ভালবাসি, এ কথাটা যদি সত্য হত, তাহলে তোমার কাজে ক্রিয়াদেবী কাঁড়াকাড়ি পড়ে যেত—কাজ পড়ে থাকত না। কিন্তু আমরা সবাই গা বাঁচিয়ে চলতে চাই, অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সেখানেই আনামভঙ্গের আশঙ্কা হয়, সেখানেই চ্যাচামিচি শুরু করে দিই। যখন এই কথাটা মনে পড়ে, কি যে লজ্জা হয়, তার আর কি বলব।

তোমার পায়ে আমার এত মিনতি শুধু—বিরামহীন-কাজের সঙ্গে আমার চির-বিরামকে তুমি মিলিয়ে দাও। কাজের তারিফ যেন আমার পোড়ো না বসে। খাস খাভাবিকই বইছে—সেটা তাড়াহুড়ি, বইছে কি আস্তে আস্তে বইছে—তার হিসাব করে

তো কোনও ফল নাই। তবে দেখি, যে প্রাণ-বস্তু বলে পরিচয় দিতে জোরে জোরে খাস ফেলে, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মরণ তার ঘানয়ে আসে। তাই বলি স্বচ্ছন্দ বঁধু—এই আমার স্বভাব হোক। তাতে আমারও স্বস্তি, তোমারও আনন্দ!

ব্যাস্তবিক বাসনা ত্যাগই তো আনন্দ—সেই তো তোমার রূপ। অটুট, সত্য সঙ্কল্প তুমি—চঞ্চল পক্ষিগণ বাসনা আমি! ভিঃ ছিঃ—আকাশ পাতাল ফলাং ফলে তোমার সঙ্গে নিলবো কি করে? যা হবার তা হবে কেনে সর্বনাশের মাঝেও ঝাঁপিয়ে পড়বার মত বুকের পাটা করা এই তো আনন্দ। তার সঙ্কট কি? তুমিই বলেছিলে উচ্চাস নয়, উদ্বেগন নয়—বৃহৎ সঙ্কল্প ও নিষ্ফল প্রয়াস নয়—দীর্ঘ স্থির প্রশান্তভাবে অনিশ্চিত পদক্ষেপে লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাওয়া—এই তো মহত্ব। তোমার কর্মের পরিচয় তোমার জগৎ! মেলা কাজ বলে একটা দিনও এক মিনিট বড় হতে দেখলাম না। সব শান্ত—অথচ সব অনিশ্চিত। তাই তো দেখি ষড়-ঋতুর আবর্তনে পরিত্যক্ত অঙ্গে অঙ্গে লাগব্য আর ধরে না! এষ্ট সহজ জ্বরে জীবন বাঁধা কি চলে না?

স্বপ্নের আবরণ তোমায় পাই—কিন্তু আশা ভাঙে মিটেছে না।—আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠ!—স্বপ্নে নয়, সে তো পাচ্ছিই; আমার সূক্ষ্মতম আনন্দানুভূতিতে অহরহ যে তোমায় আমি চাই!





## আরণ্যক

“যজ্ঞেন বাচঃ পদনীয়মায়ন্ তামস্বদিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥”

— ঋগ্বেদংহিতা—৩২৮

থাকে ভালবাসি, তাঁর জন্ত সব করতে পারি, কিন্তু নিজের অস্তিত্বটুকু মুছেও মুছেও পারি না। তাই একে ধরে কখনও আমরা নিচের দিকে—মান-অভিমানের দিকে বুকের পড়ি, আবার কখনও এটো আমিকে উপরের দিকে তুলে নিয়ে চির তরে তাঁর করে রাখতে চাই। এটো যে “আমি” বোধ, এটো জ্ঞানের বীজ; তাকে যে অপর আর একজনের করে দিতে চাই, তাই প্রেম বা ভালবাসার বীজ। প্রেমের জায় জ্ঞানও মানুষের স্বাভাবিক। এর উভয়েই স্বতঃস্ফূর্ত। আপাতদৃষ্টিতে একটিকে আর একটিকে পৃথক বোধ হলেও যে রাস্তা দিয়েই যাও না কেন, একটার সঙ্গে আর একটা এক জায়গায় গিয়ে মিলবেই।

\*

যতক্ষণ আমাকে খাটো করে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-স্থলের কামনায় কিছু চাইছি, ততক্ষণই পাচ্ছি না বলে ছুটছুটি করি। কিন্তু আপন বিরাট সম্ভাব্যত্বভিত্তিতে ভগ্ন হলে কোমলও কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে হয় না। মূল উপাদান ও তার বিচিত্র বিকাশ ভঙ্গী দেখে এক অপূর্ণ আনন্দ সকল কামনার পূরণ করে।

\*

কোনও গুণের আদর্শ নিয়ে নয়, কেবলমাত্র আত্মস্বরূপ—এটো আদর্শকে সকলকে আপন বলে জানি। আরও উপর, বিশিষ্ট ভাব রেখা

না—সকলেই আমার এটো দেহটার মতো আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না একীভূত। এই দেহটার চেয়েও সবাই আপন। কেননা, দেহের কথা ভাবত কখন কখনও ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আমার অস্তিত্ব সব সময়ে থাকেই। এটো অস্তিত্বের সংস্কার সকলকে নিয়ে হোঁক। চেতন অচেতন সকলকে বাধ্য করে “আমি” কেন্দ্রগত হয়ে আছি।

\*

প্রথমতঃ শুধু নামরূপ বর্জনেই নয়—নামরূপ দিয়ে প্রতিপন্ন বস্তুও সঙ্গে মিশ্রিত, বিশিষ্ট ভাবকেও ভুলতে হবে। তাদের মূল সম্ভার সঙ্গে আপন সম্ভার একত্ব জেনে তার প্রকাশের বিচিত্র লীলা দেখে আনন্দ কর। তাহলেই জগৎও আপনার ফুটে উঠবে। এমনকি করে নামরূপ বাদ দিয়ে একবার জগৎকে লীন করে আপনার তার লীলা দেখতে শখাই সাধনা ও সিদ্ধির সম্ভব।

\*

স্বার্থ খুঁজতে জানলে, ঠিক ঠিক স্ব-বস্তুকে চিনে নিয়ে তার অর্থে জীবন পাটালে, তা সকলের অর্থেই পর্যাবসিত হয়। স্বার্থ বলতে ক্ষুদ্র স্বার্থকেই আমরা আগে চিনে নিয়ে তাই আগলে বসি, আর ও দিকে বৃহৎ স্বার্থ সেই অঙ্গনে তারিয়ে গাই। ভগবান্ দেখে চাহেন মাত্র। শতকরা নিরনব্বুটো জন আমরা এই কবি, আর অপরকে স্বার্থপর বলে গাল

দেই। আমাকে ক্ষুদ্র করে ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মজে যাও আর ও দিকে বিরাট বিষয় বা স্বীয় সম্পত্তি ব্রহ্মবস্ত্র হারিয়ে পাস। গোকা ছেলে বাজে জিনিস দিয়ে পেট ভরে মিষ্টান্নের বেলায় উঠে যায়।

\*

প্রত্যক কিছু দান করতে হবে, এট হল ঋষিদের নিয়ম, তাই তাঁরা পঞ্চ মহাযাগ করে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মভূতিতে সকল ঋণের পনিশোধ হয় এবং সকল দানের পর্যাবসান ঘটে। তাই সন্ন্যাসী বা পরমহংসের কোনও বিশিষ্ট যাগ করতে হয় না। স্থলে যেমন এমনি, স্বপ্নেও আপনাক তেমনি তিনি যেখানে যান, বুদ্ধগতা পর্যাস্ত সেখানে পরিপুষ্ট হয়। তিনি যেন প্রদীপের মত, যেমন ঘরেই তাঁকে নিয়ে যাও, সে আবেষ্টনেই তাঁকে আবদ্ধ কর না কেন, দেহে মনে প্রাণে বহুজন হিতায় আত্মোৎসর্গ করে সেই স্থানকে তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন। এট সন্ন্যাস জীবনে চতুরাশ্রমের অবদর্শ; তাই শীর্ষপ্রদেশে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে। জীবনে চাই এট ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর আদর্শ।

\*

ভাল-মন্দ উভয় বীজট মাস্তুষ্টে মাঝে রয়েছে। মূলগত বীজগুলি সম্পূর্ণরূপে, এ জীবনে নষ্ট হয় না। কিন্তু তার গুণের পরিবর্তন করা খুবই চলে। আমার জাঁটি থেকে কাঁঠাল গাছ উদ্ভব হয় না সত্য, কিন্তু চেষ্টার বিশেষত্বে ভাল আম উৎপাদন করা অসম্ভব নয়। যিনি যেমন প্রকৃতির মাস্তুষ্ট, তাঁর সেই ধাত সংশোধন করতে হবে। একেবারে পরিবর্তন হবেও না, তার তেমন

বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কেবলমাত্র সংশোধিত হয়ে সেই ধাতেই সিদ্ধ লাভ ঘটে। এ না হলে প্রত্যেক মহাপুরুষের মাঝে বিশেষত্ব থাকতো না।

\*

ভাব বা সংস্কারশুদ্ধির পরীক্ষা হয় স্বপ্নের মাঝে। জাগ্রতের সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে হয়ত আমার স্বপ্নপক্ষে অগণ রাখতে, চেষ্টা করছি, কিন্তু যত দূর সফল হয়েছে, সংস্কার যতটুকু নিশুদ্ধ হচ্ছে, নিজের কাছে তা এক মান স্বপ্ন দিয়ে পরীক্ষা হয়। সেখানেও যাতে দ্রষ্টব্য বজায় থাকে, তার জগ্ন সর্বদা শুদ্ধ সত্য চিন্তা ব্যবহার দ্বারা আহ্বান-বিহারে ও বাক্যের মাঝে আপন ভাব বজায় রাখতে হয়।

\*

কথা আসে আবেগ হতে। আবেগ আসে চিন্তের অনিচ্ছক অবস্থা থেকে। কিন্তু যদি মূলে এমন কোনও মধুময় ভাব ভিতরে থাকে যে, যার তুলনায় সব তুচ্ছ মনে হয়, তবে বাইরের কথা না বলেও ভিতরে দেবতার সঙ্গে মধুর আলাপে মহানন্দে তৃপ্ত থাকা যায়। হৃদয়ের প্রত্যেকটি অক্ষর যদি সমান উঁচু হয়ে, একে-বঁেকে না যায়, তাহলে যেমন সমগ্র পংক্তিতে সোজা হয়, তেমনি প্রত্যেকটি ভাব যদি সুসম্বন্ধ দ্বারা ধরে অন্তর দেবতার সম্পর্শে শান্ত ও সুন্দর হয়, তবে বাইরের প্রত্যেকটি কথাবার্তা ও চাল-চলনের ভিতর দিয়াও মাস্তুষ্টের একটী মহান স্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠে।

\*

আমাকে বাদ দিয়ে অগতে আমার কিছু নাই। যা কিছু দেখছি, বা আমার সংস্পর্শে আসছে, আমি তার মাঝে না-চুকলে তাদের

শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে পারি না। 'আমি' দ্বারা ব্যাপ্ত করে বা আমার বোধ তার মাঝে অনু-স্মৃত করে তবে অপর বস্তুর রস গ্রহণ করি। নতুবা সে আমার বোধগম্য হয় না। আবার আমি না থাকলে বুঝবে কে? দ্রষ্টা না হলে দৃষ্টকে দেখবেই বা কে? কাজেই জলে-স্থলে, দ্রুত্রে-অদ্রুত্রে সর্বত্র আমি ব্যাপ্ত হয়ে আছি; রূপে রূপে যে বৈচিত্র্য, তার সমস্ত শুধু আমার ব্যাপ্তিতে। এট আমার খণ্ডিত করে অভ্রব সৃষ্টি করি বলেই ছঃখ আসে, আর এট অজ্ঞাননাশট মায়ার তিরোধান বা ছঃখের নিবৃত্তি।

\*

আমাকে সকলে ভয় করে চলুক, এ আদর্শ ধরো না। কেননা বনের বাঘকেও তো সকলে ভয় করে চলে। বরং সকলে

ভালবাসুক এই ভাব অনেকটা ভাল। কেননা ভালবাসা গেতে হলে, ভালবাসা দিতেও হয়। তার জন্ত নিজকে অপরের মাঝে বিস্তার করে দিয়ে অপরের করে তুলতে হয়। তার উপায় অন্তরে ও বাহিরে সকল অবস্থায় পনের প্রয়োজনে বা সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখা। ক্রমশঃ আত্মভ্যাগে আত্মার বিস্তৃতি ঘটে। আমি ভালবেসে সেবা করে যাই, কিন্তু কারও সেবা বা ভালবাসার পাত্র তলাম কি না, সে বিষয়ে মন একেবারে ক্রক্ষেপশূন্য। যিনি এইরূপে আদর্শ সেবক হয়ে সানন্দে আপনাকে বিলিয়ে দেন, সকলে তাঁকে না ভালবেসে থাকতে পারে না। আমার দিক দিয়ে যদি আমি সকলের সংযোগ-সূত্রটিকে আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে সকলে আমার না হয়ে যায় না।

\*—

## দানপ্রাপ্তি

—\*—

নিহারী (পাটনা)

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—

আর এন্ গুপ্ত নরেন্দ্রকুমার, মুখার্জি বিনয়কুমার পাণ্ডে প্রফুল্লচন্দ্র দে সতীশচন্দ্র বসু মিহিরলাল সিনা যোগেন্দ্রনাথ চাটার্জি হৃদিকেশ বানার্জি হেডমাস্টার এস্ সি গুহ জে কে দত্ত উকিল জে এন্ মুখার্জি অবনীভূষণ

মুখার্জি উকিল গজেন্দ্রপ্রসাদ দাস উকিল ইন্দ্রভূষণ দত্ত এম্ পি সেন পি এন্ মজুমদার কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বিশোরীমোহন ঘোষ রামচন্দ্র রায় গৌরীকান্ত বিশ্বাস পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য সত্যেন্দ্রলাল বসু জি পি হাজারী প্রফেসার বি এন্ কলেজ রথুবন সহাট মোক্তার রায় বাহাদুর বিষ্ণুস্বরূপ শ্রামবিহারী শর্মা মোক্তার মনোহরলাল ব্যারিষ্টার বিহারী-কিশোর শরণ উকিল নিরঞ্জন নারায়ণ সংহ

উকিল রামানন্দ সিনা উকিল কেশো দয়াল প্রফেচার পটনা কলেজ বলদেব সহচর উকিল গোপী বল্লভ সহাই ডাক্তার রামাশ্রয় সহচর উকিল লছমী নারায়ণ সিংহ উকিল হরেশ্বর প্রসাদ সিনা উকিল রামজী দাস গুপ্ত প্রফেচার ইঞ্জিঃ কলেজ শিবনন্দন রায় উকিল বি এন সিংহ ভূবেন্দ্রনাথ প্রসাদ বম্বা এন কে সিনা যোগেশ্বর নাথ কে এম নারায়ণ এস পি বম্বা ব্যারিষ্টার গোপাল প্রসাদ ব্যারিষ্টার রায় ত্রিভূন সহচর উকিল কে পি এম চৌধুরী রাম নন্দন সহচর রাম প্রসাদ চৌধুরী এডভকট ব্রাহ্মসংসদ পোষ্টেল মেছ প্রভাত কুটিব মেছ বনৈক চিষ্টা সংগৃহীত ৮১২

### হাজারিবাগ

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মিত্র উকিল ৫১, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বানার্জি ২১, শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার উকিল ৩১, শ্রীযুক্ত রামচরণ মুখার্জি ২১, শ্রীযুক্ত বগনৌকান্ত রায় উকিল ২১, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত ২১, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ সরকার ডাক্তার ২১, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কল ২১, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর মুখার্জি ২১, শ্রীযুক্ত কলাণ সিংহ ২১, শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ রায় উকিল ২১, হেলথ অফিসার ২১।

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত—শৈলেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত উকিল, নিবারণচন্দ্র বানার্জি উকিল গোপীমোহন মল্লিক উকিল কে এন্ সরকার উকিল যতীন্দ্রনাথ ঘোষ উকিল বীরেন্দ্রপ্রসাদ সরকার উকিল ভূদেবচন্দ্র সরকার উকিল নরেন্দ্র সেন কদ্রিাজ এ সি বানার্জি ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রফেসর শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রফেসর, চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রফেসর শিশিরকুমার

বহু প্রফেসর কে এন্ ঘোষ প্রফেসর হেমচন্দ্র মুখার্জি প্রফেসর নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রফেসর ফের্নান্দো লাহড়ী প্রফেসর সি বানার্জী প্রফেসর ভট্টাচার্য ডাক্তার এ টি এন্ গয়ানাথ সেনগুপ্ত বাঘাধর ঘোষাল মহীতোষ বানার্জি এন্ পি সেন নলিনীকান্ত দত্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ এন্ গুপ্ত জানকীনাথ গুপ্ত মম্বথনাথ গুপ্ত সপ্তরঞ্জিটার রমণীমোহন সেন জি এন্ বানার্জি পুলানবিহারী ঘোষ ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত এন্ কে বহু নরেন্দ্রকান্ত মতিলাল ডাক্তার বৈজ্ঞাল বহু পি পি সিনা প্রফেসর রঘুনন্দন প্রসাদ মুন্সেফ রঘুনন্দন সহচর উকিল ছত্রকধারী প্রসাদ উকিল নলকিশোর প্রসাদ উকিল যদুনাথ সহাই উকিল জহরলাল রামানন্দ সিংহ মূলজি কাজিচরণ জানকীরাম কৃষ্ণকিঙ্কব নিয়োগী এম এন্ বকসী আট সি এন্ জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লেডি ডাঃ বিন্দুপাসিনী দত্ত সরোজিনী দাসী লেডি ডাঃ লেডি ডাঃ আই এন্ পেরিস জিলা স্কুল বোর্ডিং ৪১০ কমলবাগ কলেজ হোষ্টেল ১২১০ সংগৃহীত ৩৩০।

### পুরুলিহা (মানভূম)

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সিভিল সার্জেন ৫১, শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষাল মুন্সেফ ২১০, শ্রীকালীপদ গাঙ্গুলী কন্স্ট্রাক্টর ২১, শ্রীমুন্সেফ মোহন মুখার্জি ২১ ডাক্তার ২১, এম এন্ মুখার্জি লালা দামোদরপ্রসাদ জগৎ ২১, ষ্টেশন মাষ্টার ২১, শ্রীমণীন্দ্রনাথ বানার্জি উকিল ১০।

একটাকা করিয়া—

### শ্রীযুক্ত—

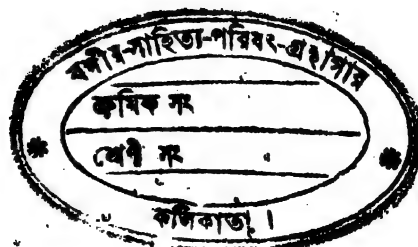
মতীশ চন্দ্র দে উকিল বীদেবচন্দ্রসিংহ মহাজ উকিল বৈষ্ণবনাথ মুখার্জি উকিল যতীন্দ্র মোহন

দত্ত উকিল হুশেচন্দ্র সরকার উকিল ব্রজেন্দ্র মোহন দাস দীপান চন্দ্র পাল পূর্ণচন্দ্র মিত্র  
নাথ মজুমদার উকিল মানগোবিন্দ সরকার যোগেন্দ্র নাথ সরকার এসু আই এস চক্রবর্তী  
রাধানাথ সৈয়দী উকিল সর্বানন্দ সরকার এম সিংহ আর্টি পি প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস উকিল  
উকিল গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকিল শশধর এম কে রায় চেমচন্দ্র গুহ জে সি দা  
গাঙ্গুলি উকিল জগদীশচন্দ্র মুখার্জি উকিল চন্দ্র শেখর পট্টনায়ক সত্যনারায়ণ সিংহ ডিপ  
নীলকণ্ঠ চাটার্জি উকিল কালীপদ মুখার্জি ম্যাজিস্ট্রেট ভুবনেশ্বরী শরণ বন্দ্য ডিপ্টি ম্যা  
মোক্তার যতীন্দ্রনাথ রায় মোক্তার প্রমথনাথ ষ্ট্রেট জাহ্নবী প্রসাদ সিংহ এস ডিঃ একচন্দ্র  
দাস মোক্তার কেশবলাল ঘোষ মোক্তার চাটার্জি কণ্টা ঠাকুর জগদাহার কণ্টা  
রাধাগোবিন্দ মিত্র ডাক্তার নন্দকিশোর চৌধুরী নেহরি শরণ দয়্য কণ্টা ঠাকুর অর্জুন লাদু  
মুক্তেন্দ্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সেরেন্তাদার জজ কণ্টা ঠাকুর ভগবান কারা কণ্টা ঠাকুর মনজি রাঘব  
কোর্ট হরিপদ ঘোষ জ্ঞানানন্দ চক্রবর্তী শ্রীকণ্ঠ কণ্টা ঠাকুর ঘনশ্যাম দাস কণ্টা ঠাকুর বালাদীন কণ্টা  
সেন আশুতোষ সরকার নগেন্দ্র নাথ ঘোষ স্বপ্ন ভেটারিনারী হাসপাতাল জিলা স্কুল ৫০  
রামদত্ত ভট্টাচার্য্য অনন্তকুমার সেন গুপ্ত হরি- সংগৃহীত ৩৬০। (ক্রমশঃ)

## সংবাদ ও মন্তব্য

গত ১৫ই চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ শশিষ্য কুন্তলো উপলক্ষ্যে হরিষার যাত্রা করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার ৪ঠা মাঘ আসাম-বঙ্গীয় কৌকিলামুখ সারস্বতমঠের শাখা আশ্রম বগুরীপুরীতে স্থানীয় ভক্তসম্মিলনীর সভা হইয়াছিল। সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে দোণারি চা বাগানের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন সভাপতি হইয়াছিলেন। গ্রামস্থ ভক্তগণ এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত প্রজা সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।



শু ৩২ সং



# কবিতা

১২-১১-১৯০৮ } চৈত্র { দ্বিতীয় ভাগ  
 সমষ্টি সং ২০৪ }  
 নবম সংখ্যা

## আনন্দ-লহরী

[ শ্রীমচ্ছরারচার্য্য ],

কিরীটং বৈরিষং পশ্চিম পুরঃ বৈষ্ণবভিঃ  
 কঠোরে কোটীরে স্থলসি জহি জঙ্ঘারিমুকুটং ।  
 প্রনম্নেমেতেষু প্রসভমুপজাতাভ্যা ভবনং  
 ভবন্যাভ্যুত্থানে তব পরিজনোক্ত বিজয়তে ॥

“বিরিক্কারিট ওই মুকুট রয়েছে সমুখে,  
 হরি-ইন্দ্র-মুকুটও যে—দেখো যেন চরণ না থেকে —  
 প্রণত আছেন এরা”—শত্ৰু যবে প্রবেশে ভবন  
 সাবধানি—বলিহারি ।—ফুকারে মা তব পরিজন !

চতুঃষষ্ঠ্য তত্রৈঃ সকলমভিসম্ভাষ্য ভুবনং  
 স্থিতস্তত্ত্বং সিক্কিপ্রসবপন্নতন্ত্রঃ পশুপতিঃ ।  
 পুনশ্চন্নির্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকমটনা  
 স্ততস্ত্বং তে তত্ত্বং ক্ষিতিতলমবাতিতরুদিদম ॥

চতুঃষষ্টি তন্ত্রদৃষ্টি মেলি শিব জেনেছে ভুবন,  
 ব্যাকুল মহেশ এবে সফলিতে সে সব সাধন ;—  
 তোর সাধ, সম্মানে মা যাহা চায় পায় এক ঠাই—  
 স্ততস্ত্ব এ কুলতন্ত্র মহাদেব প্রচারিল তাই ।

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ  
 অংরা হংসঃ শক্রসুদনু চ পরামারহরয়ঃ ।  
 অমী হুল্লোখাভিস্তিস্থিতিরবসানেষু ঘটিতা  
 ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জনানি নামাবয়বতাম ॥

শিব, শক্তি, কাম, হরি,—ধরি পুনঃ শক্তি, কাম, হরি—  
 রবি, শলী, কাম, হংস বাসবেরে নিই এক করি ;—  
 এ তিন কুটের শেষে জুড়ি দিই যদি মা হ্রীংকার—  
 উঠে তায় মা গো তোর সুললিত নামের বঙ্কার !

স্মক্কে যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদ্যে তব  
 মনো  
 নিধাত্মৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ ।  
 রূপস্তি জ্ঞাং চিন্তামনিগুণনিবন্ধাক্ষরলয়াঃ  
 শিবাত্মো জুহুস্তঃ সুরভিহৃতধারাহুতিশতৈঃ ॥

কাম, যোনি, লক্ষ্মী—তিনে জুড়ি কেহ হয়ে একমন  
 ভূপে তোরে নিরবধি—মহাভোগী রসিক সে জন ।  
 সুরভি স্বতের ধারে কুলানলে শত হোম করে—  
 কামকলাগুণে গাঁথা অক্ষরের কুহরে বিহরে ।

তবাধারে মূলে সহসময়স্বা লাস্যপরস্বা ,  
 শিবান্ধানং বন্দে নবরসমহাতাণ্ডবনটম ।  
 উভাভ্যামেতাভ্যামুভয়বিধিমুদ্দিশ্য দয়স্বা  
 সনাথাভ্যং জতে জনকজননীমজ্জগদ্বিদম্ ॥

লাস্যপরা বাগীশ্বরী মূলাধারে রয়েছে প্রকট,  
 তাঁর সাথে আছে শিব, নবরস-তাণ্ডবের নট !  
 প্রেমরসে মগ্ন দৌহে করুণায় সজ্জিল জগৎ—  
 জনক-জননীরূপে তুমি তারা—লহ দণ্ডবৎ !

তব আধিষ্ঠানে হতবহমধিষ্ঠাস্ব নিয়তং  
 ক্রমীড়ে সংবর্ত্তং জননি জননীং তাঞ্চ সমস্বাম্,  
 ষদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ত্রোশ-  
 কলিলে  
 দয়াদ্রাভিদুর্গতিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি ॥

আধিষ্ঠান-হতশনে আছে মা গো যাঁর অধিষ্ঠান,  
 সেই রুদ্রদেবে আর জননীকে করি মা প্রণাম !  
 মহারোষে দীপ্ত তাঁর দৃষ্টি যবে দহে চরাচরে—  
 করুণায় স্নিগ্ধ ছুটি আঁখি তোর সে তাপ সংহরে ।

তড়িদ্ভক্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপস্থিস্থুরনস্বা  
 স্ফুরন্তান্না রত্নভরণ পল্লিনাক্ষেন্দ্রধনুষম্ ।  
 তমঃশ্যামং মেঘং কম্পাণ মণিপূরৈকশরণম্,  
 নিমেষে বর্ষন্তং হরমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্ ॥

নিবিড় শ্যামল মেঘে মণিপূর রয়েছে মা ছেয়ে,  
 রত্নসাজে ইন্দ্রধনু—বুকে তার, অপকৃপা মেয়ে ;  
 ভড়িতের লেখা যেন, তনু তার ঘুচায় তিমির—  
 নমি তারে , আবরে যে বিশ্বদাহী মহেশমিহির !



## জন্মান্তর

—:—

[ শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ ]

—:—

—:— নুবনরীক্ষণী আশ্চর্য্য!

তারতর্ষে এক ধনী বণিক তার স্বনগর-বাগী সকলকে একটা বড় ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। বড় বড় ভোজে সাধারণতঃ বাটনাচের ব্যবস্থা করা হয়। আজ কাল এ প্রথা উঠে যাচ্ছে বটে, কিন্তু রাম মখনকার কথা বলছেন, তখন তাঁর খুব চল ছিল।

একটা মেয়ে নাচতে আর গাঠতে শুরু করল। সে যে গানটা গাইল, সেটা অত্যন্ত কুৎসিৎ। কেউ সে গান শুনে খুসী হত না—কিন্তু তবুও তখনকার মত সবার কাণে সে গানটা যেন মধু ঢেলে 'দিলে। তার কারণ কি? তোমরা বোধ হয় জান, ওদেশে শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় এ সব অসভ্য আমোদের একান্ত বিরোধী; কিন্তু তবুও ওই গানটার মাঝে এমন কি বাছ ছিল যে সবাই শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গেল। এর পর মাসের পর মাস ধরে শিক্ষিত, সমাজিকদের দেখা গিয়েছে রাস্তায় চলতে চলতে তারা গুণ-গুণ করে ওই গানটা গাইছে। যারা এতবার সে গান শুনেছে, তাঁরাই আর তা ভুলতে পারে নি, গানখানা যেন তাদের প্রাণে একেবারে গেঁথে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন এ, এই গানটার মাঝে রস ছিল কোথায়? যারা গানখানি শুনেছিল, তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ওটা তাদের 'এত ভাল লাগল কেন? যাই কগরে, গানখানি ভারি সুন্দর,

ভাবী মিষ্টি, মনটাকে যেন কোপায় নিয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবিক তো তা নয়। মেয়েটা গানখানি গাঠবার আগে তারা ওর পদগুলি অঙ্গীল বলেই জানত, কিন্তু এখন সেই গানই তাদের ভাল লাগছে। এটা একটা ভুল। আগল 'মিষ্ট' ছিল গানের ধরণে, স্বরে, মেয়েটির হাব-ভাব, রূপে। আসলে মেয়েটিতে সৌন্দর্য ছিল, সেই সৌন্দর্য্য গানে উপচরিত হয়েছে মাত্র।

জগতে এই ব্যাপারট ঘটে থাকে। লোক শিক্ষা দিতে এক জন বলেন,—ভারী মিষ্টি তাঁর দুখখানি—চোখ দুটো যেন স্বপ্নময়। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কথা বলবার সময় একবার এ দিকে তুলে পড়েন, একবার ও দিকে। বাই বলেন, 'তাঁর সুন্দর, তাঁর মনোহর। একেবারে মধুরূপী হয় যেন। এইখানে জগতে ভুল হবে। মতাকে কেউ বাজিয়ে দেখতে চায় না। গানটার কথা কেউ ভাবে না। কথা বলবার ভঙ্গী, বোঝাবার কাহদা, বাইরের ছোঁড়ল মোঠাব—এতগুলি লোকের কাছে বক্তার বক্তৃতাকে মনোরম করে তোলে।

সে দিন রামেরও এক জন অগ্রগত ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু এক জন সাধুর কথা বলেছিলেন—স্বামী বৈবেকানন্দেয় কথা। রামকে দ্বিজ্ঞাস করলেন, তাঁর নাক চোখের গড়ন ভারী সুন্দর, না? বলি বক্তৃতা শুনে

গিয়েছিলে, না নাক চোখের গড়ন দেখতে গিয়েছিলে ?

এই হচ্ছে জগন্নাথের ধার। অনেক বক্তার মাঝে আগল মাধুর্য্য থাকে গলার সুরে বা বলবার ভঙ্গীতে, কিন্তু সে মাধুর্য্যকেই বক্তৃতাতে আবেগ করা হয়। একটা জিনিষের নিষ্ঠা ওজন কি, তাই দেখ না। বক্তাকে দেখ, তার রূপের দিকে তত নজর দিও না।, এই কথাগুলো কর্কশ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু গেনো, রাম কাউকে রেয়াৎ করে চলেন না। রাম শ্রদ্ধা করেন তোমার আত্মস্বরূপকে, সংস্কারপক্ষে। সত্যই তোমার স্বরূপ; আর সেই সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে রাম তোমায় শ্রদ্ধা করেন। দলবার ভঙ্গীটা তোমাদের পছন্দ না হতে পারে, রামের বোঝাবার কায়দাটা তোমাদের দুরন্ত না ঠেকতে পারে, কিন্তু রাম তোমাদের বলছেন, তাঁর আত্মস্বরূপকে বলছেন, যদি সত্যকার স্মরণ শাফি চাই, তাহলে রামের কথা শুনতেই হবে, এই সব বক্তৃতায় উপস্থিত হতেই হবে। এতে আনন্দ পাবে। কথাগুলো যে আত্মত্ব পরখ কর। যা শোন, তা ভাব, তাতে তন্ময় হয়ে যাও। বড়ী গিয়ে আবার সেগুলো স্মরণ করে কার্যো পরিণত করতে চেষ্টা কর।

রাম বেদান্তের ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এত সব প্রশ্ন এসে জড়ো হয়েছে। এই সব প্রশ্ন পাঠান হয়েছে রামের কাছে জীবন মিলবে বলে, যদি কোনও প্রশ্ন নাও আসত, তবু রাম একটা বিষয়ের পর একটা বিষয় ধরে এ সব কথা বুঝিয়ে ফেলত। সময় মতে সব কথা এই অবস্থামিলবে; কিন্তু কেউ কেউ চায়, তার সমস্যার অবস্থাটা

আগে হোক। আর্জ্জকার রাতে সে সব প্রশ্নের জবাব হতে পারে, তা বলতে পারি না। এক এক রাতে এক একটা প্রশ্নের উত্তর হবে; এক একটা প্রশ্ন এক এক রাতের খোরাক হবে। এই প্রশ্নটিই আগে হয়েছিল, তাই এটার আলোচনাট আগের স্মরণ করলাম।

আগে বাঁবেল, কোরাণ, বেদ ও গীতার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। এই সব বই মানুষকে অকপটে বিশ্বাস করে, কারণ তাঁদের মনোমত লোকের লেখা এগুলি কি না। খৃষ্ট ভাবী ভাল মানুষ ছিলেন, কত লোক তাঁর শরণ নিয়েছে—কাজেই তাঁর মুখ দিয়ে কত শাস্ত্র কথা বের করা গেল;—এখন সেগুলো আমাদের মানতেই হবে। কৃষ্ণও ভারী সংলোক, গীতা তাঁর মুখের বাণী, কাজেই আমাদের অবিকল তা মেনে নিতে হবে। বুদ্ধও ভাল মানুষ, অমুক বই তাঁর লেখা, অন্ততঃ তাঁর রচনা বলে প্রসিদ্ধ—অতএব অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাদের তা বিশ্বাস করতে হবে—আর ভাবনা-চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই। আর ধ্যান-ধারণা করতে হবে না—সত্য লাভ করেছি বলে নিশ্চিত হতে হবে—যেহেতু অমুক বর্ণেছেন। বাক্সীর গান শুনে লোকের যেমন ভুল হয়েছিল বলেছিলাম, এটাও ঠিক সেই ধরনের ভুল নয় কি? ঠিক একটু ভুল! উপদেশ এফ, চরিত্র ও জীবন আর। অনেক সময় এমন হয়, মানুষটা সে যুগের দেয়া মানুষ, কিন্তু তাঁর শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এই ভুল ধারণা হতে জগতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়। ধর্ম নিয়ে যত বগিড়া, মারামারি স্ফার মূল হচ্ছে এই কথা।

ওলিভার গোল্ডস্মিথের কথা বোধ হয়

তোমরা জান; ডাক্তার জনসন বলবেন, লোক-টার লেখার অমৃত ক্ষরে। নিজে এক জন এম্ ডি। গোল্ডস্মিথ দিবা খেতো, কথা বলতো, কিন্তু কি করে খেতো আর কি করে কথা বলতো তা বোঝাতে গিয়ে বলত, নীচের চোয়াল আমি কখনো নাড়ি না—আমার ওপরের চোয়ালটাই নড়ে, নীচেরটা ঠিকই থাকে। এট নিয়ে অঙ্গনের সঙ্গে তার মহা ঝগড়া। ভুলটাও সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল। সবাই জানে, আমরা যখন পাঠ না কথা বলি, তখন নীচের চোয়ালটাটাই নড়ে, ওপরেরটা ঠিকই থাকে। অবশ্য সমস্তটা মাথা নাড়লে ওপরের চোয়ালটাটাই নড়ে, কিন্তু তবু গোল্ডস্মিথের ধারণা যে ওপরের 'চোয়ালটা'ই নড়ে, নীচেরটা নয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কারবার, ততক্ষণ গোল্ডস্মিথের কোথাও ভুল-চুক নাহি—কিন্তু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বা জীবন ও কর্মের কথা বলতে গিয়েই সব গোল হয়ে যেত। 'জানি' তো, কাজ করা এক কথা, আর কোন দিক্তানের উপর আমাদের কাজের ভিত্তি, তা বুঝতে পারা আর এক কথা। ইংরাজী সপাঠ বল, কিন্তু ইংরাজী ব্যাকরণ জান 'কয়জন? যুক্তিতর্ক এক রকম না এক রকম, সবাই কর, কায়-দর্শনের হুজ জান কয়জন? তেমনি 'একটা আদর্শ ধরে জীবনযাপন 'করা এক কথা, আর সেই আদর্শের তত্ত্ব প্রচার করা, যুক্তি দেখানো সম্পূর্ণ আলাদা চিজ। এট খানেট লোকে ভুল করে। তারা আচার্য্যের দেহধর্ম বা ব্যক্তিত্বকে তাঁর উপদেশে আরোপ করে, করে নির্দিষ্টারে দাস বন্দে ধায়। রাম বলেন, গোবধান, 'সামু' সাবধান।

খুঁটির আর করণা পুঁপি পড়া ছিল? তবুও কত বি, এ, এম্, এ, বাউনেলে কি লেখা আছে তার খবর করতে গিয়ে মাথা ঘুলিয়ে ফেলে। মহানন্দ ভারী সুন্দর উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁর প্রেরণা ও ক্ষানেন মূল ছিল কোথায়? সে জ্ঞান আর প্রেরণা সরাসরি যেখান থেকে আসত, সে উৎস তো তোমার মাঝেই আছে!

মমুর যুগে এত পুণিপত্র ছিল না, তবুও হিন্দুদের আইন-কানুনগুলো তিনি কেমন সুন্দর বেঁধে দিয়েছেন। তোমাদের লেখাপড়া আর কি জানা ছিল, তবুও তাঁর ইলিয়ড আর ওডিস এমন ধরণের কাব্য, যে আজ সব ভাষায় তার অনুবাদ হচ্ছে। 'আরস্তোতল এম্ এ ও পাশ করেন নি, ডক্টর উপাধিও পান নি, তবুও উপাধিওয়ালাদের তাঁর পড়তে হয়।

খুঁটি আর কৃষ্ণ প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? ভিতর থেকে। তাঁরা যদি নিজের মাঝেই ভাবের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তুমি পেতে পার না কি? নিশ্চয়ই পার। যে উৎস হতে তাঁদের ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, সে উৎস তোমার মাঝেই আছে। তাঁরা যা করেছেন, তুমি তা করতে পার না কি? নিশ্চয়ই পার। তাই যদি হয় তাহলে যে জল আজ হাজার হাজার বছর ধরে জমে জমে পড়ে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে, সেই জলের জন্ত এত পিপাসা কেন? তোমার মাঝে ডুব দিয়ে একেবারে অমৃতের পাত্র চুমুক দাও না কেন? অমৃতের উৎস যে তোমার মাঝেই!

রাম বলছেন, "ভাই আত্মবিশ্লেষণ, সে সব লোক ছিলেন সে যুগের। তুমি এই যুগের;

ভাজার পছন্দের পুরোণো মশী হয়ে লাভ আছে কি ? মড়ার হাতে প্রাণ সঁপে দিও না। অমৃত রয়েছে তোমার মাঝে। যখন প্রাচীন-দেব গ্রন্থ চাতে নাও, তখন এমন সঙ্কলন করো না যে তার মাঝে যা কিছু লেখা আছে তার কাছের আশ্রয়িত্ব করতে হবে। নিজে ভাণ, ধ্যান চড়াও। যদি সত্য অনুভূতি না লাগে, যা বোঝা তা ব্যর্থতারে না লাগাতে পার, জীবন দিয়ে যদি সত্যের যাচাই না করতে পার, তাহলে খ্রীষ্ট কি বলেছেন, বুঝতে পারবে না, বৈদ্যার্হ তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না, গীতা বা নাইবেলের বাণী বুঝতে পারবে না। এটো যে কথাই বলে, মিল্টন বুঝতে চাইলে মিল্টন হওয়া চাই, তেমনি খ্রীষ্ট বুঝতে হলে খ্রীষ্ট বন্ডে হবে। খ্রীষ্টকে বুঝতে হলে খ্রীষ্টকে হতে হবে, বুদ্ধ হয়ে তবে বুদ্ধকে জানা যাবে। “হওয়ার” মানে কি ? বুদ্ধ হতে হলে তোমায় কি ভারতবর্ষে গিয়ে জন্মাতে হবে ? তা কেন ? খ্রীষ্ট হতে হলে প্যালেস্টাইনে জন্মাতে হবে কেন ? মহম্মদ হতে কি আরবদেশে জন্মাতে হবে ? তা নয়। তবে কেমন করে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ হওয়া যাবে ? একটা গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে।

একটা লোক প্রেমের কবিতা পড়ছিল — লয়লা-মজনু প্রেমের কাহিনী — ভদ্রী চমৎকার কিন্তু। নারক মজনুর চরিত্র তাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তার মজনু হতে সখ গেল। তাকে এক জন একটা ছবি দেখিয়ে বলেছিল, এইটা লয়লার ছবি। মজনু সাধক করলে কি, সেই ছবিখানা নিয়ে বুদ্ধ রাখল, চুমো খেল, চোখের জলে ভাইয়ে দিল — বসতে লাগল, আর কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না।

কিন্তু কৃত্রিম প্রেম, তো বেশী দিন টেকে না। এই তো কৃত্রিম ভালবাসা। যথার্থ ভালবাসার নকল হয় না, আর এই লোকটা চাইছে সেই ভালবাসারই নকল করতে।

লোকে এসে, তাঁকে বলল, কি করছ ভদ্রা ? এই কি মজনু হবার ফিকির ? মজনু হতে গেলে তার লয়লাটিকে কেড়ে আনতে হবে না — মজনুর যে অগাধ প্রেম, হৃদয়ে তারই সাধনা করতে হবে। প্রেমের সেই পাকীটির প্রয়োজন নয় — মজনুর মত প্রেমের গভীরতা প্রয়োজন। তোমারো কেউ প্রেমপাত্রী থাকতে পারে, বা তুমি অপর কাউকে, লয়লার জায়গায় অভিযুক্ত করতে পার। কিন্তু মজনুর মত বৃত্তভরা প্রেমের আবেগ থাকা চাই। এটো হচ্ছে খাঁটা মজনু হবার সঙ্কেত।

রামও তাই বলেছেন, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ বা কৃষ্ণ হতে গেলে তাঁরা কি করেছিলেন, কি ভাবে চলতেন, তা নকল, করবার তো প্রয়োজন নাই, তাঁদের কর্ম আর বচনের কাছে দাসত্ব লিখে দিতে হবে না, তাঁদের চরিত্রবল অর্জন করতে হবে, ভাবের গভীরতা আশ্রয় করতে হবে, যে অনুভূতি, প্রেরণা ও শক্তিতে তাঁরা সিদ্ধ ছিলেন, তার সাধনা করতে হবে। জীবনে যদি সেই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটতে পার, তাহলে এখন যে পারিপার্শ্বিকের মাঝে আছ, নিশ্চয়ই তার পরিবর্তন হবে। খ্রীষ্ট যদি এটো দণ্ডে এসে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে কি করতেন ? তিনি কি আবার এসে ক্রুশে চড়ে বসতেন ? তা নয়। তুমি ক্রুশে না চড়েও জীবন্তে খ্রীষ্ট হতে পার। খ্রীষ্ট তাঁর অনুভূতিকে সার্থক করবার জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন; আর

শোপেনহাউস তাঁর ক্ষুভভূতির সফলতা খুঁজেছিলেন জীবনের অভিব্যক্তিতে। নিজের বিশ্বাস ও অন্তর্ভূতিকে মনে বজায় রাখার চেয়ে জীবনে তাদের ফুটিয়ে তোলা অনেক সময় বেশী কঠিন।

এটাই হল আমার ভূমিকা। সার কথা এটাই, প্রত্যেক জিনিষকে স্বরূপে বিচার করা। অবতারণার বাস্তবিক জীবনকে তাঁর উপদেশের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলো না। জীবন ও শিক্ষা পৃথক ভাবে আলোচ্য।

প্রথম প্রশ্ন এটা, পুনর্জন্ম যদি সত্য হয়, তাহলে পারিবারিক বন্ধন তাতে ছিন্ন হয়ে যায় না কি? আর এটা প্রশ্নবৎ আর একটা দিক, এ জীবনে যারা এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে, মরলে পরে তারা এক ঠাঁই গিয়ে মিলবে না কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি কিন্তু। প্রশ্নটার এক-একটির অংশের জবাব দিচ্ছি। “পুনর্জন্ম যদি সত্য হয়, তাহলে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় না কি?”

রাম শুধু এই কথাটাটাই জ্ঞানে চাটছেন, পারিবারিক বন্ধন বলে জগতে কিছু আছে কি না। তোমার কোনও পারিবারিক বন্ধন আছে কি? একজনের ছেলে হল; যতদিন ছেলে না সাবালক হবে, ততদিন সে বাপের সঙ্গে থাকবে। ছেলে ক্রমে বড় হ'ল, বড় একটা কাজ পেল, তখন থেকে বাপকে এড়িয়ে চলল। ছেলে যে টাকা উপায় করে, তার ভাগ বাপে পাবে কেন? তখনি তো বাধন ছিড়ে যায়। ছেলের নিজের সংসার

হল। ছেলে হয়ত কি জামানী কি অল্প কোনও দেশে গেল; বাপও নিদেশে গেল। পারিবারিক বন্ধন থাকল কোথায়?

হাঁ, তবে বন্ধন আছে বটে, শুধু নামের বন্ধন। আমি জর্জস্ স্মাগারসন, আমার বাপ জন স্মাগারসন। শুধু একটা নাম—তা ছাড়া আর কি? নামে আছে কি চাই? দেখা যাক, যোগসূত্র কোথায়ও পায় যায় কি না।

এ দেশে একটা ছেলে হল, আর এক দেশে হল একটা মেয়ে। ছেলেটির বাড়ী আমেরিকায়, মেয়েটির বাড়ী জার্মানিতে; তখনেব গিয়ে হল। ছেলের পরিবারসূত্র ছিল এক মুহূর্তে, মেয়ের ছিল আর এক মুহূর্তে; এখন তারা স্বামী স্ত্রী। পুরাতন বন্ধন তাহলে কি হল? তারা নতুন বন্ধনে গড়েছে। আবার যদি বিবাহচ্ছেদের সময় আসে, তখন দুজনেই নতুন করে গিয়ে করবে। বন্ধন তাহলে গেছে কোথায়? বাধনটা এক জায়গায় টিকিয়ে রাখতে পারবে কি? ভাই বোন এক পিতা মাতা হতে জন্মেছে, মেলেবেলায় এক বাড়ীতে এক সঙ্গে খেলাধুলো করেছে। ছুঁয়ে পারিবারিক বন্ধন একটা আছে বটে। মেলেটা গেল অষ্ট্রেলিয়া, সেখানে গিয়ে নতুন করে সংসার পাতল। মেয়েটা গেল ফ্রান্সে, গিয়ে কর্মসী মেয়ে হল। বন্ধন এতল কোথায়?

এখন প্রশ্নটা ধর, পুনর্জন্ম যদি সত্য হয়, তাহলে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় না কি? এ জগতে পারিবারিক বন্ধন বলে কিছু নাই—তা আবার ভাববে কি? তাই পুনর্জন্মে বন্ধন ছেড়ে না—কেননা বন্ধন যে মোটেই নাই।

যদি ধরা যায় আত্মীয়তার বন্ধন বলে একটা কিছু আছে, আর এ জীবন কিছু দিন পর্যন্ত তা বজায় রাখতেও পারা যায়; তাহলেও কিন্তু পুনর্জন্ম সে বন্ধনকে শিথিল করে না। ধর, তোমার অনেকগুলি ছেলে পুত্রের রয়েছে। তার একটা মরল। পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে চাও বটে, কিন্তু একটিকে যমে কেড়ে নিল। এ জগতেও তাহলে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, পরলোকে তা গিয়ে 'জ্যেড়া লাগবে। যদি তাই সম্ভব হয়, আর যদি তোমারও এমন সাধ হয় যে এখানকার ছিন্ন সূত্র আর কোথায়ও গিয়ে জোড়া লাগুক; তাহলে একটা কাল্পনিক স্বর্গের সন্তা স্বীকার করার প্রয়োজন কি? ভূগোলে তেমন স্বর্গের সন্ধানও দিতে পারবে না, বিজ্ঞানেও তার ঠিকানা বলতে পারবে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন আরও কিছু কাল বজায় থাকুক—এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে জন্মান্তরের আইন অনুযায়ী সে সম্বন্ধ মৃত্যুর পর আর অনুসৃত হতে তো পারে না। কেন পারে না? কারণ মানুষ নিজেই যে তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। তোমার ব্যক্তিগত প্রীতি-মমতার বন্ধনগুলি যে তুমি নিজে সৃষ্টি করেছ। মরবার সময় কার প্রতি বিশেষ একটা আসক্তি পোষণ করে মর, তাহলে পরের জন্মে সেট মানুষই অপর কোনও দেহে জন্মগ্রহণ করে তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েই দেখতে পাবে। এ জন্মে যদি তাকে না চেয়ে থাক, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে থাক, তাহলে পরের জন্মেও তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। জন্মান্তর আইনে এমন কথা বলে না যে এ জন্মের যারা তোমার শত্রু মিত্র ছিল, যাদের সঙ্গে পরিহার করেছ বা যাদের একান্ত ভাবে

চেয়েছ, মৃত্যুর পর তাদের যে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে এমন কিছু নয়। বেদান্ত এমন বলে না যে যার মুখ দর্শন করতে চাও না, যার সঙ্গে ভীষণাদপি ভীষণ বলে মনে হয়, সে-ও এসে তোমার ঘাড়ে চাপবে। একটা মেয়ে যদি স্বামী ত্যাগ করে, স্বামীর মুখ আর না দেখতে চায়, তাহলে কর্ণাদি, অনুযায়ী স্বামীও স্মার তাকে উত্থাপন করবে না। যাদের দেখতে চায়, যাদের আপন করে রাখতে চায়, পরজন্মেও আবার সে তাদেরই দেখা পাবে।

এ বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা আছে। একটা একটা করে তার বিচার করা যাবে। ইউরোপে আর আমেরিকায় পরলোক সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ভুল ধারণা প্রচলিত, আগে তারই আলোচনা করব। তোমার স্বর্গকে কি খৃষ্টীয়ানের স্বর্গ বলব, না চার্লসের স্বর্গ বলব? স্বর্গের ধারণায় একটা স্বতন্ত্রাধিকার রয়েছে নয় কি? স্বর্গ বলতে লোকে এমন একটা ঠাঁই বোঝে, যেখানে সবাই জড় হয়ে আছে। রাম বলছেন কি, একটু ভেবে দেখ না কেন! অন্ততঃ সত্যের খাতিরে একটু ভাববে না কি? যেখানে তোমার চারদিকে বেড়া, সেখানে বাস্তবিক সুখ পেতে পার কি? সঙ্কোচে সুখ আছে কি? অসম্ভব—একবারেই অসম্ভব। স্বর্গে গিয়েও যদি সেট 'ভোক্তা' ভাবে থেকে যায় যারা কোন-যুগে মরবে, বা কোন-যুগে মরবে, বা ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা বা অন্য কোথায়ও যারা ধন আজ মরবে, তারা সবাই যদি সেখানে জড়িত হয়, তাহলে সুখ হবে কি?

আলেকজান্ডার সেলকার্ক বলেছিল, আমি

চরাসরের রাজা, আমার আশ্রয়কার খরচ করবে কে? যখন গাড়ীতে চাপ, তখন মন বলে গোটা গাড়ীটাই যদি আমার হত! আর কেউ যদি গাড়ীতে চুকতে চায়, তুমি বিরক্ত হও। ঘরে বসে আছ, কেউ দেখা করতে এল; চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাও, বলগে বাড়ী নিই!

তোমার শ্বশুর-দোর সবই আছে, অপরেরও তেমন দর-দোর আছে; কিন্তু বেদে তার বাইবেলে যত বচনই থাক না কেন, তবুও কিন্তু তোমার ইচ্ছা হয়, প্রতিবেশীর চেয়ে যদি, তোমার বেশী খন থাকত! - সে যদি তোমার সমানে সমান না হয়ে অধীন হত! এমন ধার! কত খ্রীষ্টান রয়েছে—তাদের খ্রীষ্টান বল্য ঠিক নয়, বাস্তবিক তারা অখ্রীষ্টান—যদি জাহাজে যেতে কোনও বৌদ্ধ, মুসলমান বা হিন্দু সঙ্গীর সঙ্গে তাদের মিশতে হয়, তাহলে গায়ে জালা ধরে যেন। এমন গ্যাপার রাম স্বচক্ষে দেখেছেন। তাদের স্মৃণ শান্তি এতে নষ্ট হয়ে যায়। আর স্বর্গে গিয়ে যদি সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়—যাহা তোমার চেয়ে ঢের উন্নত, এমন লোকের সঙ্গে থাকতে হয়, খুষ্ট-বুজের সঙ্গে এক ঘরে দিন কাটাতে হয়, তাহলে তাতে তোমার স্মৃণ হবে কি? মনে শান্তি থাকবে কি? কথটা একটুখান ভেবে দেখো দেখি।

যেখানে ভেদ জ্ঞান, সেখানে কিছুতেই স্মৃণ শান্তি থাকতে পারে না। অসম্ভব—একবারেই অসম্ভব। তোমার মুখের হাসি ঝিলঙ্গ যায় কেন? পরের মুখের পানে চেয়ে। সবাই একলাটা থাকতে চায়। সবাই চায়, একচ্ছত্র, প্রতিরক্ষহীন হতে। বাইবেলে

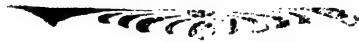
যে স্বর্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে স্বর্গ তোমরা ভুল বুঝে—সেখানে গিয়ে কিছুতেই তোমাদের স্মৃণ হতে পারে না।

আচ্ছা, তাহলে বাইবেলকে কেমন করে ব্যাখ্যা করলে পর তার মাঝে সত্যের সন্ধান মিলতে পারে, বল দেখ? বাইবেলে আছে—স্বর্গে গিয়ে আমাদের মিলন হবে। স্বর্গে সবার সঙ্গেই দেখা হয়; বন্ধুদেরও দেখা। কিন্তু সে দেখার অর্থ কি? ঠিক ঠিক কথাটা তালয়ে বোঝা দেখি—ভাব তো, তার অর্থটা কি হতে পারে। যে বাইবেলে লিখেছে, স্বর্গে আমাদের মিলন হবে, সেই বাইবেলে এমন কথা আছে নাকি—স্বর্গ রাজ্য তোমার মাঝে। ভগবানের অধিষ্ঠান, স্বর্গের সম্পদ তোমার মাঝে—তোমার বাইরে তো নয়। স্বর্গ বাইরে আছে বলে কল্পনা করছ কেন? আকাশের দিকে চেয়ে নক্ষত্রের মাঝে স্বর্গ খুঁজছ কেন? ভগবানের উপর একটু কল্পনা কর! যেন। বেচারী যদি মেঘের রাজ্যে বাস করেন, তাহলে ঠাণ্ডা লেগে তার সন্দী হবে যে। স্বর্গ তোমার মাঝে, ভগবান তোমার মাঝে!—এইটা দেখ।

ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে যাও, গভীর মননে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাও, আশ্রয়ের নিকরান ঘটুক—পরমানন্দময় সে ভাব পেলে, তুমি আর স্বর্গে কেন, তুমিই যে স্বর্গ তখন! বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে তুমি তখন যুক্ত। যারা ক্রীড়িত, কি মৃত, কি জন্মাবে, তাদের সকলের সঙ্গে এক হয়ে আছ সেখানে। স্বর্গ তোমার মাঝেই—আর এই হুত্রে স্বর্গে আমাদের সঙ্গে মিলন হয়। যিনি জীবমুক্ত, দেহভ্যাগের পূর্বেই যিনি মুক্তি লাভ করেছেন, তিনি

নিরন্তর স্বর্গবাসী জীবিত-মৃত সকলের সঙ্গেই তিনি যুক্ত। যারা জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাদের সঙ্গেও যুক্ত। এত অশ্রুভিত্তি তিনি লাভ করেন, গ্রহ-নক্ষত্র খীব জন্তু সবই

তঁার আত্মস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ - দ্রাবজের নিন্দ্য সত্তা। তিনি সর্বময়, তাই তিনি সর্বের আদিকারী - তাই স্বর্গ রাক্ষসে সবার সঙ্গে তাঁর মিলন সম্ভবপর হয়। (ক্রমশঃ)



## সংঘ-সাধনা



একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাঠ - “সংঘশক্তি: কলৌ যুগে।” কিন্তু কপাটিকে স্বভাব হিসাবে না আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া, তাহাট চটল সমস্ত। আমাদের দেশে দেখি, সংঘ-একটা আদর্শ, কেননা বিচ্ছিন্ন থাকাই চটল আমাদের স্বভাব। অনেকট পলেন, এত জঞ্জল আমবা ঢুকল, পরপদদলিত - স্পর্শপেব সেট যাঁড়ের খরটোও আমাদের স্তন্যদায় দেন। বিদেশের দিকে চাতিয়া দেখি, সংঘবদ্ধ চটল বা দলবঁধা সেখানে একটা স্বভাব। সোসাইটি, এসো শিরেসন, লিগে এক একটা দেশ একেবারে ভাইয়া ফেলিয়াছে। শুনিতে পাঠ, এমনি করিয়া তাহার নাকি বেশ স্পষ্টে স্বচ্ছন্দে আছে; অন্ততঃ আমাদের তনু-মন-ধনের রাজ্য যে তাহারাই। ইহা ত স্পষ্টই দেখিতে পাঠ। ফোভে আত্মতার চটল তাহাদের অল্পকরণে দল বাধিতে যাই, কিন্তু পারি না। ফোভটা তখন আরও বেশী হয়, স্বাভাতি নিন্দায় রসনা আরও মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের এত অসামর্থ্যের নিদানে কোনও তৈরিক সত্তা নিহিত আছে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। শুনি, এখন কলির সন্ধা।

কিন্তু এত কলিই অল্প ফুল হইয়া ফুটল আর আমাদের ভাগো তাহার কলহার্ঘ্যটিই সার্থক হইয়া উঠিল কেন, তাহা ভাবিবার বিষয় পড়ে।

সংঘের কল্পনায় চিত্র উদ্বেজিত হইয়া উঠে। এক কথা সত্য। সংঘশক্তির সুন্দর একটা উদাহরণ আছে - চণ্ডীতে। দেবতার অস্ত্রের তাড়া খাইয়া ছুটাছুটি করিতেছিলেন, চণ্ডী তাহাদের ক্রি সুবুদ্ধি উদয় হইল, সবাই এক ঠাঁই আসিয়া জুটিয়া পড়িলেন। গরম গরম হই চারিটা বকুতা হইল, সবাই রক্ত তাতিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া আশ্রুণের ফুলিক বাতির হইতে লাগিল; আর ‘অমনি গৌ তেজ এক জায়গায় পিণ্ডীভূত হইয়া পাক্কিরণিণী এক নারী মুক্তি গ্রহণ করিল। দেবতার তাহার স্তব করিলেন; শুধু স্তব পড়িয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বার যেমন মাংস্যা তেমন আভরণ, গ্রহরণ, তদাদি জুগাইতে লাগিলেন। উপসংহারে মা-অস্ত্র নিধন করিয়া দেবশক্তিকে পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ করিলেন।

এখানে সংঘশক্তির মাহিমা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিতে



হটেবে। প্রথম কথা, অর্জনের বা চূড়ারের  
তাড়নার সংঘের উৎপত্তি হইয়াছে। স্তবরাং  
বলিতে পারি—এই উপাখ্যান সংঘের  
negative দিক। ঠিক, এইরূপ দশা আমা-  
দেরও উপস্থিত হইয়াছে। ঠান্ডিক হইতে  
প্রতিকূল শক্তির তাড়া খাইয়া আমরা কেবলই  
দানা বাঁধিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি ;  
কিন্তু দানা বাঁধিতে পারিতেছি'না কেন ?  
তাঁহার উত্তর উপাখ্যানের দ্বিতীয় ভাগেই  
রহিয়াছে। দশজন উৎপীড়িত ব্যক্তি একত্র  
হইলেই সেখানে মায়ের আবির্ভাব হয় সত্য।  
—কিন্তু সে মা মত শক্তি হইয়াও নিরস্ত্র এবং  
নিরাভরণ। অতএব নিষ্ক্রিয়া এবং অসুন্দরী।  
মাকে সাজাইতে হইবে, শুধু অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া  
নয়, দিব্যভরণ ও ফুলের মালাও দিতে হইবে।  
এই কর্তৃত্বের ভাব ও শিল্পনৈপুণ্যটুকু  
আমাদের এখনও অগোচর হয় না—তাঁই  
আমরা সংঘে মায়ের আবাহন করিয়াও কিছু  
করিতে পারি না। মা মা করিয়া তারহণে  
চীৎকার করি ; মা ও হয়ত, আসেন বটে ;  
কিন্তু অসত্যের সঙ্গে লড়াই করিবার অস্ত্রটাই যে  
আমাদেরকেই জুগাইতে হইবে, শুধু চীৎকার  
আর অশ্রুপাতেই যে কর্তব্য শেষ হয় না—  
এ কথাটা তো আমাদের খেয়ালে আসে  
না। তাঁই আমরা তাড়া খাইয়া দল বাঁধিয়াও  
বাঁধিতে পারি না।

কিন্তু বলিয়াছি, এটাও সংঘের negative  
দিক। তাড়না, উত্তেজনা ইহার নিদান  
—বিশাশ বা বিশ্লোপ সাধন ইহার ফল।  
সংঘের এই মূর্তি সঙ্গায়োজন বটে, কিন্তু ইহার  
আর এক মূর্তিও আছে, তাহারও সেবা  
প্রয়োজন। শুধু ভাদিবার ব্রত গ্রহণ করি-

লেই হইবে না—গড়িতেও হইবে, রক্ষাও  
করিতে হইবে। যে সংঘে রক্ষণ ও সৃজন  
শক্তির ক্রিয়া নাই, আঁচে শুধু প্রলয় শক্তির  
তাণ্ডব, সে সংঘ লক্ষ্যব্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়  
মাত্র।

চতুর্থে আমরা সংঘের প্রায়স্করী মূর্তি  
দেখিয়াছি। সংঘের শিবকরী মূর্তি দেখিতে  
পাট বেদে ও উপনিষদে। বেদে সভা ও সমি-  
তির স্তুতি আছে ; ঋক্ সংহিতা সমাপন  
কালে জগন্ম ভাষায় সংহতি কামনার কথা  
আছে ; উপনিষদে আছে ঋষি-সংঘের কথা।  
ঐগুলি সমস্তই সংঘের শিবময় রূপ। ইহার  
নিদান কি ? ঋষি বলিতেছেন, সঙ্গতি, সংবাদ,  
সংজ্ঞান—ইহাই সংহতির নিদান। “সমান  
চল, সমান বল, সমান জ্ঞান। মন্ত্রণা সমান  
হোক, সামতি সমান হোক, মন সমান হোক,  
চিত্ত সমান হোক, হবিঃ সমান হোক, আকৃতি  
সমান হোক, হৃদয় সমান হোক”—সংঘ-  
গঠনের ইহাই অঙ্গজ্য নির্দেশ। ইহার মাঝে  
কোনও মতলব প্রচ্ছন্ন না—শুধু প্রাণের  
টানে, প্রেমের দ্বারে এক হওয়া—যজ্ঞবেদিতে  
উৎসর্গের দেবতা অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া এই  
ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করা।

আবার দেখি, উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিদ্যা  
ঋষিসংঘজুগী। যে পরমার্থ লাভ হইয়াছে, সংঘ  
মধ্যে তাহা রক্ষা করিতেছেন, উপযুক্ত অধি-  
কারী দেখিয়া তাহা বিতরণ করিতেছেন।  
সংঘ যখন আত্মরক্ষাতেই পর্যাবসিত না হইয়া  
আত্মদানের ব্রতও গ্রহণ করে, তখনই উচ্চ  
সার্থক।

এই তো দেখি সংঘের অধ্যাত্ম প্রতিকল্প  
ইহার মাঝে কোথাও বিন্দুমাত্র উত্তাপ সঞ্চিত

নাই, প্রাণের উদারতা বিশ্বব্যাপী হইয়া দেখা  
দিয়াছে বলিয়া তীব্র প্রাণন চেষ্টাও কোথায়ও  
নাই; অথচ এই সংঘট সকলের প্রাণাধার  
—ইতার বাহ্য প্রচেষ্টাচীন প্রাণনকে জড়ত্ব  
বলিয়া ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই, কেননা  
কৃষ্ণ প্রাণ শক্তি ইতার আশ্রয় পাইয়াই শাস্ত ও  
সমাহিত হইতেছে, দেখিতে পাই।

কিন্তু সংঘকে এমনি তুরীয়ভূমিতে রাখিলে  
সংসারে কাজ চলে না। তাই সংঘের লৌকিক  
প্রতিকূপও আছে। জৈবিক প্রেরণাতে উচ্চ  
সহজ মূর্তিতেই দেখা দেয়। Herd instinct  
বলিয়া একটা কথা আছে; পাণিনি বলেন  
পশুর “সমক্ৰ।” মানুষের হটলেই তাহাতে  
একটা আঁকার বেশী দিয়া “সমাজ” গড়িয়া  
তোলা হয়। পশুর বেলাতেই হটক, আর  
মানুষের বেলাতেই হটক, সংঘের সামাজিক  
রূপকে স্বীকার না করিয়া জীবনপথে অণুসর  
হওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণিজগতে আরার  
এমনও আছে, যাহারা নখদন্তের জোরে  
একলাই টিকিয়া থাকে। তবে তাহারা সমষ্টি-  
জগতের বিবর্তনের সত্যিকার কিনা, সে বিষয়ে  
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহা হইলেও কিন্তু  
শ্লেষ করিয়া ইঙ্গিত করা হয়, যাহারা শম্প-  
ভোজী, অতএব নিরামিষাণী, সংঘ তাহাদেরই  
আশ্রয়; এমন কি মানুষের বেলাতেও নাকি  
এই লক্ষণটা থাকে।

কিন্তু মানুষ আমিষাণী না নিরামিষাণী, সে  
তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নাই। সুযোগ  
বুঝিয়া বোধ হয় সে ডইট হয়। তাই তাহার  
সমাজে সংঘের মহিমা ও নখদন্তের আঁকাগন  
সমানভাবে আধিপত্য করিয়া থাকে। ইহাদের  
এক পক্ষকে উচ্ছেদ করিবার কল্পনা অনেকে

করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহ সফলকাম  
হইয়াছেন কিনা, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ  
নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজ একটা “রক্ষা”  
করিয়াছিল। রক্ষাটা সর্ব্বাংশে স্থলের না  
হোক, স্থতির বে হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ  
নাই। হিন্দু বুঝিয়াছিল, আমিম্বভোজী আর  
নিরামিম্বভোজীর লড়াইটা চিরকালটী থাকিবে;  
কাহাকেও তাড়াইবার দরকার নাই বা চাপ  
দিয়া রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন নাই।  
উভয়ের এলাকা নিরূপিত করিয়া দেওয়া  
হটক, মীমাংসা আপনা হইতেই হইয়া  
যাইবে।

গীতীয় গুণকর্মবিভাগে সমাজ ব্যবস্থার  
কথা আছে। ইহাই রক্ষার মূলমন্ত্র। সমস্তটা  
সমাজ একটা সংঘ; সংঘের আধ্যাত্মিক  
নিয়মানুযায়ী তাহার একটা সম্মান আকৃতি  
পাকা সম্ভব বটে, কিন্তু সকলের কাছে তো  
তাহা সুস্পষ্ট নহে। ভোজ্যবস্তু লইয়া বিবাদে  
সুত্রপাত হইতখন হটতেই হয়। গুণ কর্মে  
বিতর্ক সমাজ, বিবাদকে অস্বীকার করে না,  
কিন্তু তাহার বিসর্পণকে নিয়ন্ত্রিত করে। বড়  
হইতে কে না চায়? কিন্তু সবাই বড় হইতে  
গেলে সমাজের গতি বদলি থাকে না। তাই  
কোথায়ও কোথায়ও আকাজ্জককে থর্ক  
করিতে হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আশাকে  
জীয়াইয়া রাখা দরকার। হিন্দুর জন্মান্তরবাদে  
ইহা সূত্র হইয়াছে। হিন্দু, সমাজে বড়  
হইবার আকাজ্জকটাকে পরজন্মের দিকে  
ঠেলিয়া দিয়াও কতকটা স্বস্তিতে থাকে।  
জীবনের এই বিচ্ছিন্নতার ক্ষয়ভীতিতে হিন্দু-  
সমাজের আরও কিছু না হটক, পরমায়ু  
বাড়িয়াছে নিশ্চয়ই।

সমাজ-তত্ত্ববিদগণের মুখে গ্রামীণ তত্ত্ব, পিতৃ-তত্ত্ব প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। তারতন্যীয় আর্থিকস্থানের চর্চাও একটা বশেষত্ব। আজও ইহার ধ্বংসাবশেষ হিন্দুর সমাজে ও পরিবারে দেখা যায়। Herd-in-stinct-এর ইহা একটা ফলোপধায়ক রূপ নশ্চয়ই। সংঘ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য এইখানে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণ 'মাত্রায় বজায় রাখিয়া সংঘ হইতে পারে কিনা, ইহা একটা সমস্যার কথা। আজকাল গণতন্ত্রের ধূরা উঠিয়াছে। ইতরলোকের দিকে সবাই 'বুঁকিয়া পড়িয়াছে, নিষ্পেষিতদের প্রতি করুণা একেবারে কুস্তিরের অশ্রুপাতের মত উৎখায়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসলে দেখিতেছি, গণ-স্বাতন্ত্র্য কোথায়ও বজায় রাখা যাউতেছে না—সর্বত্রই প্রভুতন্ত্রের আসর। অথচ প্রাচীন সমাজতন্ত্রে গুরু-লবণ মুখে যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিনিময় দেখা যাউত, স্বাতন্ত্র্যের লোলুপতায় তাহার সপিভীকরণ হইয়াছে। কষ্ট মোটের উপর তাহাতে সমাজের সুখ বাড়িয়াছে কিনা বলা কঠিন। নানা দিক বিচার করিয়া এট রায়ই দিতে হয়, পরিবারে যেমন গৃহপতি থাকি প্রয়োজন, সমাজে তেমন সমাজপতি, রাষ্ট্রে তেমন রাষ্ট্রপতির একটা বিধিদত্ত গৌরবের আসন বজায় রাখাট ভাল। সমরোপযোগী পরিবর্তন হউক, 'তারফতে আপত্তি নাই, কিন্তু সংস্কারকর্ত্তে গিয়া সমূলে সংহার না করা হয়। বহু নৃপতির শাসনে আমরা পতিত হইয়াছি, না পতিহীন বলিয়াই পাতিত্যের দিকে দিন দিন গড়াইয়া চলিতেছি—তারফা একটা দৃষ্টান্ত বিষয়।

নেতার অধীনে দল বাঁধিয়া থাকা—ইহা মানবের আদিম যৌথ-সংস্কার। সংঘের স্থল

প্রাণীক যে একাল্লবর্তী পরিবার, চাতুর্কর্ণের সমাজ, রাষ্ট্রে মণ্ডলাধীশের আধিপত্য—এগুলি এট প্রাণি-স্থলত যৌথসংস্কারেরই স্বাভাবিক পরিণতি। 'এখানে সংহতি ঠিক স্বাতন্ত্র্যের সংহতি নয় বহুলপরিমাণে গণতন্ত্রের সংহতি। নয়া রোশনাইর দেমাকে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু এট মশলা না হইলে নূতন কিছু গড়িতেও পারিব না। তাই দেখি, "অন্ধ অন্ধুগতা ছাড়, slave mentality ছাড়" বলিয়া বাঁহারা আজকাল চীৎকার করেন, তাহার কতগুলি অন্ধ ও দাস অন্ধুর লইয়া দল পাকাইতে পারিলেই নিজকে কৃতী মনে করেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ এটে!

এই জন্তই বলিতেছিলাম, 'সংঘের স্থল-প্রাণীক, উপনিষদের ভাষায় "পুরুষবিধ"; তাহার একটা মাথা চাই, বুক, হাত, পা থাকা চাই। বেদের পুরুষমুক্তে আর্য্য-সমাজকে এমনি একটা মাথা ওয়ালা সংস্কারপেট দাঁড় করান হইয়াছে—বহুচরণবিশিষ্ট কনজেক্ট পূজ্যকেই সংঘ-দেবতার পূজা বলিয়া চালানো হয় নাই। এখন আর্থোরা পরাধীন: তাই স্বাধীন হইবার পাতিকটা বোধ হয় কিছু বেশী। কিন্তু স্বাধীন আর্থাদের করুণা আংশিক পরাধীনতাকেই সংঘের সার্থকতা দেখিতে পাউয়াছিল।

এইখানে একটা দার্শনিক পরিভাষার কথা তুলিয়া সংঘতত্ত্বটা হিন্দুর মস্তকে কি ভাবে খেলাইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিষ্ট। সংঘ, সংঘাত, সংহতি একই কথা। স্বেপানেই সংঘাত সেখানই মূলে আছে পারার্থ্য, এটা সাংখ্যের একটা প্রসিদ্ধ বচন। সকলেই জানেন, সংহতির ভাবটা সাংখ্যকারকে এমনি পাইয়া বাঁসাছিল যে তিনি গোটা প্রকৃতিটাই

একটা অগুণ্ড সংঘাতরূপে নিরূপণ করিয়াছেন—কোণায়ও ছেদ নাই, ভেদ নাই—একটা বিরাট সুষম (Homogeneous) স্তব্ধশক্তি এই প্রকৃতি। সংঘের idiosyncrasy এর চেয়ে কি আর বিরাট হইতে পারে? কিন্তু এত সংঘরূপা প্রকৃতির স্ফূর্তির কারণ সাংখ্যিকার নিরূপণ করিবেন, পারার্থ্য বা পর প্রয়োজন। এই পর কে? পুরুষ। পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির এই সংঘ-প্রচেষ্টা; বিশ্ব রেণু রেণু হইয়া থাকিলেই বা কি ক্ষতি ছিল? দানা বাঁধিল কেন? এত পারার্থ্যের প্রেরণায়, পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের আকাঙ্ক্ষায়। তাই যেখানেই সংঘ, সেখানেই পারার্থ্য বা পরানুগত্য একান্ত প্রয়োজন। স্তূল সংঘাত এই দেহ পারার্থ্যের একটা জীবন্ত উদাহরণ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি পরিধির বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এক কেন্দ্রে আত্মসমর্পণ করে, তাহেই চক্র চলে। জীবাণুবিদ বলেন, অতি ক্ষুদ্র জীবাণুকেষেরও এমন একটা কেন্দ্রপুরুষ বা nucleus বসিয়াছে। জড়ানুজ্ঞান বলে, পরমাণুর দেহগত তাড়িত-কণা একটা নিগুণ বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া ঘুরণাক খাইতেছে। যে নিয়মে একটা তাড়িতকোষ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেট নিয়মেই প্রকৃতি সৌরজগৎটা চলিতেছে—ব্রহ্মাণ্ডটাও বুঝি চলিতেছে।

এই তো দেখি, দর্শনের, বিজ্ঞানের, জীব-তত্ত্বের, জ্যোতিষতত্ত্বের রায়ে সংঘতত্ত্বের একই ধারা কুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটা কথা মনে পড়িল। মনস্তত্ত্বের একটা ফাঁকি আছে—mob-consciousness এ ও এক বিচ্ছিন্ন রহস্য। আমি একা থাকিলে হাসি পায় না; কিন্তু বাজার আসরে বসিয়া একটা ভাঁড়ের

সামান্য মুখভঙ্গীতে হাসিয়া কুটীপাটা হেঁট। একা একা থাকিলে হয়ত অমন হাস্য হাস্য ভ্যাক্সানোতেও মুখের একটা পেশী শিথিল হইত না। সভায় গিয়া শুনিলাম—“বন্দে-মাতরং” গলং ফাটাইয়া আম ও চাঁৎকার কবিতা “বন্দেমাতরং” বাড়ীতে আসিয়া একা পড়িলে কিন্তু উত্তেজনা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কীর্তনে “প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ” বলিয়া দশায় পড়িয়াছি, কিন্তু ঘরের কোণে একমুখে বসিয়া গুপে মন নিবিষ্ট কারতে পারি নাই। অনেক সময় মনে হয়, “ঐশ্বর্যের সংকীর্ণন বা সংঘাপাসনার গণভাবটা চেতাঁইয়া তোলে, তাহাতে লাভ না ক্ষতি? খুঁটান বা ব্রাহ্মের চাচ্চী উৎপাদনা, মুসলমানের নমাজ, ঐশ্বর্যের সংকীর্ণন—ধর্মজগতে সপ্রয়োজন বটে, কিন্তু আদর্শ হিসাবে কতখানি উচু? mob-consciousness এর একটা সুন্দর উদাহরণ মেসোপটারের জুলিয়াস সিকার—ক্রেটাস ও আর্টনীর বক্তৃতায়। শুধু গণভাবটাকে চেতাঁইয়া তুলিয়া এটনীর ক্রেটাসের এতদিনকার প্রতিজ্ঞিত, স্বকল্পিত কাণ্ডটাকে একেবারে মাটি করিয়া দিল।

এই সব উদাহরণ হইতে সাংখ্যের তত্ত্বটাই জোর করিয়া মনকে দখল করে। সংঘাত মানেই কণ্ঠস্ব জড়ত্ব; অতএব তাহার পারার্থ্য প্রয়োজন। পূর্বের উদাহরণগুলিতেই দেখিতেছি, সংঘাতে গণচেতনা উদ্বুদ্ধ হইলেও তাহার কার্য্যকরী কোনও মূল্য থাকিতেছে না—যে পর্য্যন্ত নাকি একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ আসিয়া মাথায় না দাঁড়াইতেছেন; আবার সংঘের পাল্লায় পড়িয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিও ফিকে হইয়া যাইতেছে। এই দুইটাকে বিলা-ইয়া ইহাই সিদ্ধান্ত—তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বাত্ম্য ও

নিছক জড়ত্ব—হৃয়ের মাঝামাঝি সংঘ। সংঘে পূর্বেটাকে নিশ্চয় করে ও পরেরটাকে চেতা-ইয়া তুলে। যাচাদের চেতন সবে কিনিষ ভোট হইয়া দেখা দেয়, সংঘের উপাসনা ছাড়া তাহাদের গতি নাই। কিন্তু যাহারা প্রধানতঃই বড় সংঘকে প্রত্যাখ্যান করাই তাহাদের পৌরুষের সার্থকতা। ইহাই সাংখ্যাকারের বিবেক।

অধ্যাত্মজগতে এট প্রত্যাখ্যান শক্তিটা থাকা এক হিসাবে ভারী দরকার। টিউশের many-too-many and the superfluousর প্রতি অবজ্ঞার মূলে এই সংঘাতকে প্রত্যাখ্যান। সর্বাংশে ইহাকে ভাল বলি না—কেননা ইহা একদেশ-দর্শিতা। বেদান্ত এই বিরোধের সমন্বয় করিয়াছে। সে কথা পরে বলি। (ক্রমশঃ)

\*

## হরিদ্বারে কুন্তযোগ

ছেলেদের নিয়ে এমন আটকে পড়েছি, তার উপর আগুনপুজার ভার কাহার উপর দিয়ে যাব এটা খুব সমস্তার বিষয় হওয়ায় এবারে যে আমার কুন্তে যাওয়া হবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত, যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ গত ভক্তগান্ধলনীতে বয়সহিসাবে কুন্তে যাওয়ার আমার দাবীত অধিক প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

এবার তিনি হালিসহরে এসে আমাকে বলেন যে, ভুবনের খুব ইচ্ছা যে কুন্তে যাব, তার পর তোমাদের দুজনের একসঙ্গে কুন্তে যাওয়া চলিতে পারে না, অথচ জ্বিষ্মতে তোমার কুন্তে যাওয়া অপেক্ষা করাও চলে না। অতএব তোমাদের উভয়ের কুন্তে যাওয়া সম্বন্ধে খুব সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে। আমি দেখিলাম, ইহার একটা সহজ মীমাংসা হয় যদি আমি কুন্তে না যাইতে চাই। আমি সেইরূপই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, “তুমি এক কাজ করিতে পার, কুন্ত-মানের সময় আমি ভুবনকে লইয়া কুন্তে যাইব,

তুমি বরঞ্চ এক দিনের মধ্যে হরিদ্বার ভ্রমণ করে ফিরে এস, তুমি ২৯শে মার্চ নাগাদ সেগান থেকে ফিরে এসো, তার পর ভুবন ২৯শে তারিখে আমার সঙ্গে যাবে, আর যে আমার সঙ্গে গেলে সেবার সাহায্য হইবে।” আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। আমাকে এক দিন পরেই রওনা হইতে হইবে। উতিপূর্বেই হিন্দী ব্রহ্মচর্য-সাধন ছাপা হইয়াছে। খান দশেক বই ও অস্ত্রান্ত্র প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রাদি লইয়া ২০শে ফাল্গুন রওনা হইলাম।

বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ আমাকে জয়দেবপুর হইয়া যাইতে হইল। তথাকার কাজ শেষ করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িলাম।

একবারে হরিদ্বার পর্যন্ত টিকিট পাইলাম না, মৈমনসিংহ টিকিট পাইলাম। বেলা শেষে মৈমনসিংহ পৌছিলাম। তথা হইতে হরিদ্বারের টিকিট কিনিলাম। ভাড়া ১৪৮/০ আনা। রাতে কাওনিয়া জংশনে পৌছিলাম তথায় গাড়ী বদল করিতে হইবে। কিন্তু গাড়ীতে এত

ভিড় যে পর পর ছুখানি ট্রেন ভাগ করিতে  
হইল । • পর দিন বেলা ৯টার সময় তৃতীয়  
ট্রেন ধরিয়া রওনা হইলাম । গাড়ীতে এমন  
ভিড় যে বেঞ্চিতে স্থান পাইলাম না । নীচে  
নিজের বিছানার গাটটো উপর বসিয়া  
পড়িলাম । পরক্ষণেই একদল বাঙ্গালী বৃন্দাবন  
যাত্রী ঐ গাড়ীতে প্রবেশ করিল ও ভাড়াদার  
পৌটল-পৌটলী আমার নিকটেই স্থাপিত  
করিল । ভাড়া সংগ্রহ ও পরিমাণে এক বেশী  
দেয়জন পর দেয় স্থানটুকু ছিল তাহা ভুক্তি  
হইয়া আমার মাথা চাপাইয়া উঠিল, ঐগুলি  
ক্রমশঃ গাড়ীর ঝিকনে বিশৃঙ্খল হইয়া আমার  
বাড়ে আসিয়া চাপিল । আমি গতান্বয় না  
দেখিয়া ভাচার চাপ সহ করিয়াই চলিতে  
লাগিলাম । যাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই  
জীলোক । ভাচার মধ্যে একটা আবার বৃদ্ধা ।  
তিনি এত মুখরা ও কোন্দলপরায়ণ যে গাড়ীর  
মধ্যে কোন্দলের দোষের না পাঠিয়া আমার  
উপরই বাস্তবাবণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।  
আমার দোষ এই যে আমি ভাচার পৌটলার  
উপর ভর দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার দ্রব্যাদি  
নষ্ট হইবার কথ' । তাহার পৌটলার যে  
আমার উপর ভর দিয়াছে ভাচার এ বিষয়  
ভাবিয়া উঠা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব ছিল ।  
কাণপুর পর্যন্ত সারারাত্ৰি তাঁহার বাক্যবাণ  
সহ করিয়া যাঁতে লাগিলাম । লক্ষ্যে আমার  
উভয়েই গাড়ী বদল করিতে যাঁতেই এমন  
সময়ে, সেট বৃদ্ধা আমার গিছানার উপর যথেষ্ট  
পরিমাণ থুথু ফেলিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ  
করিলেন ।

এবারে অল্প গাড়ীতে একটু বসবার স্থান  
করিয়া গেললাম । কিন্তু সর্বত্রই লোকের

ভিড় । এ গাড়ীতেও এত ভিড় যে অনেকেই  
দাঁড়াইয়া যাঁতেছে । ভাচার উপর আমার  
২৪ জন টিকিট না কিনিয়াই উঠিয়াছে । যখন  
টিকিটচেকার গাড়ীর এক দিকে টিকিট চেক  
করিতে লাগিল, তখন ভাচার অল্প দিকে  
লুকাইয়া রহিল । আমার অল্প দিক যখন চেক  
করিতে চলিল, তখন ভাচার আবার স্থানে  
গিয়া নিঃস্বপ্নে বসিয়া রহিল । এক ব্যক্তি  
চরিত্রদের এইরূপ অসাধুতার বিষয় প্রকাশ  
করিলেও অত ভিড়ের মধ্যে তত্বে ভাচারিগকে  
বাচন করা টিকিটচেকারদের সাধ্য হইল না ।  
তিনি গম্ভীরভাবে গাড়ী পুনর্ভাগ করিয়া  
চলিয়া গেলেন ।

• লাক্ষ্মীরে গাড়ী বদল করিয়া ছোট  
গাড়ীতে উঠিতে হইল । তখন রাত্রি প্রায়  
১০টা । ঐ গাড়ীতে উঠিয়া একখানি বেক  
পাইয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম । রাত্তির  
কয়েকদিন শরীফটাকে লম্বা করিবারও সুযোগ  
পাই নাই । আজ এই সুযোগ পাইয়া গাড়ীর  
নিজায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম । যখন  
জাগিলাম, দেখিলাম গাড়ীতে বেশী লোক  
নাই । শুনিলাম যে হরিদ্বার ছাড়িয়া আরও  
হট্টা ট্রেন আসিয়া পড়িয়াছে । তাড়াতাড়ি  
উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম । সেট  
ট্রেনেই সত্কাণী ট্রেন মাঠার মধ্যায় আমার  
হৃদিশায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাকে  
একখানি ট্রেনে শুইতে দিলেন । সকালে  
১০টার গাড়ীতে হরিদ্বার পৌছিলাম । তথায়  
নামিয়া কোথায় যাঁত স্থির করিতে পারিলাম  
না । যাঁত হউক একটা কুণ্ডী সঙ্গে করিয়া  
সহরের দিকে রওনা হইলাম । রাত্তির একটা  
অন্ধার ঘন্টালা দেখিয়া তথায় উঠিবার আশায়

গিয়া শুনিলাম, ধর্মশালায় বরু পাওয়া যায় বটে কিন্তু দ্রব্যাদি যেন বাণিয়া অত্রান্ত গেলো অগণে তাহা ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি অপচরন করে। দাবোজনটী স্বতঃপরতঃ আমাকে উলদেশ দিল—“আপনি ভোলাগিরির আশ্রমে যান, তুলায় অনেক বাজালী আছে।” আমায় চব্বিশের দশকে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহাও পরামর্শমত ও বাজালী আরও এত আশ্বাসসূচক বাক্যে ভোলাগিরির আশ্রম অভিযুগে চলিলাম। রাস্তায় “শুকধাম” বলিয়া বাজালা ক্ষুব্ধে একটি দালানের নীচে থোদিত দেখিয়া উঠা অবস্থা বাজালীর বাড়ী হইবে ভাবিয়া তাহার মধ্যে পবেশ করিলাম। সম্মুখেই কয়েকটী বাজালী বাবুকে পায়চারী করিতে দেখিলাম, বলিলাম তাঁহারা এ বাড়ীর কেহ নহে, অতিথি, কুস্তমানে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ উত্তর পাইলাম না। পরে একটি ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মলোককে দেখিয়া সশিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই বাটন মালিক। আমি যতক্ষণ না আমাদের লোকের ঘোঁষা পাঠিততক্ষণের জন্ত তাঁহার বাড়ীতে আমান জিনিষ পত্র রাখিবার অনুমতি পাইলাম। কুলীটিকে বিদায় দিয়া আমি ‘স্নানাদি সানিয়া আমাদের লোকের ঘোঁষা জন্ত ব্রহ্মকুণ্ডের কিনারে চলিলাম। পূর্বে শুনিয়াছিলুম আমাদেব ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারের থাকিবার জন্ত স্থান লওয়া হইয়াছে। পুল পার হইয়া ওপারে গিয়াই দেখি কুমারানন্দজী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং অধিক খোঁজ-খবর করিতে হইল না বলিয়া আনন্দিত হইলাম। দেখিলাম কুমারানন্দজী আমাদের জন্ত গৃহীত ১০৬০২ বর্গফুট জমীর এক অংশ

একখানি কুটার নির্মাণ করিয়া দুজনে বাস করিতেছেন। কুস্তকমিটী হইতে তখনও বিশেষ কোন শ্রদ্ধাবস্ত হয় নাহি, তাঁহারা চিন্তায় পড়িয়াছেন, এখন কি করা যাইবে, এমন সময়ে তাঁহারা আমাকে পাঠিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। আমার জিনিষপত্র শুকধাম হইতে তখনই নিজের স্থানে আনিয়া লইলাম। আর ভোলাগিরিজীব আশ্রমে যাইতে হইল না। আমরা তিন জনে সেট কুটার মধ্যে আনন্দে কালাযাপন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ কুস্তকমিটী হইতে গৃহাদি নির্মাণের প্লান, টাকাকড়ি, লোকজন আসিয়া পড়িতে লাগিল; আমরা বেশ দলে-বলে পুরু হইয়া আমাদেব প্রবাসের নূতন আবাসে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। গৃহাদি নির্মাণ হইতে থাকিল। দ্রব্যাদি চরিত্বারে ক্রমশঃ মহার্ঘ হইয়া উঠায় নিকটবর্তী টেশন জালাপুর হইতে খড় বাঁশ ইত্যাদি গৃহ নিষ্কাণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইতে লাগিল। ৮১০ দিন মধ্যে ১১১২ খানি খড়ের ঘর একটি আগন ঘর (মন্দির) অফিস ও ডিস্পেন্সারী ঘর তোলা হইল। সুবেদার সাহেব শ্রীযুক্ত নীরঞ্জনপ সেন মহাশয় কর্মকর্তারূপে কমিটী হইতে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের ও কুলীদের উপরও সুবেদারী করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার পরিচালনা নৈসর্গ্যে শীঘ্রই প্রবাসে আমাদেব সকল অভাব অনুরোধ দূর হইতে লাগিল। তিনি কখনও বা কুলীদের লইয়া গৃহ নির্মাণের কাজে বাস্তব, কখন বা জালাপুর জিনিষপত্র আনিবার বন্দোবস্ত করিতে ছুটিতেছেন, কখন বা সমাগত লোকদেব সহিত বাফালাপ করিতেছেন। সকল হইতে রাজি পর্য্যন্ত তাঁহার কাজের অন্ত নাহি। আবার

সকলে যখন শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি মধ্য রাত্রে পর্যন্ত কমিটিতে রিপোর্ট দবার জন্য পত্র লিখিতে বাস্তব আবার অপর কালে তাঁহার প্রবাস কান্নিনী, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আমাদের কাছে এমন ভাবে বলিতেন যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের স্থায় তাহা শুনিতে থাকিতাম। তাঁহার “চটক্সে খেঁচো” গল্পটী চারদিন মনে থাকিবে। যখন তিনি বাঙ্গালী পণ্টনে ছিলেন, তখন প্রথম প্রথম তাঁহার সামাজ্যমাত্র মাহিনা পাঠ্যেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাল করিয়া খাওয়া হইত না। একমাসে তাঁহার খাওয়ার জন্য মাহিনার অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপরওয়াল সাহেব এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়ার তিনি ততদ্বন্দ্বে বলিয়াছিলেন, “আমরা বাঙ্গালী জাতি, আমরা শারীরিক দুর্বল, আমরা যদি একটু ভাল করে না খাও তাহা হইলে কিরূপে আমাদের বন্দুক ‘চটক্সে খেঁচিতে’ পারিব ?” এই কথায় সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলেন এবং দীবেনবাবুর উপর প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। সে মাসের বাঙ্গালী পণ্টনের অতিরিক্ত খরচ সামরিক বিভাগ হইতেই প্রদত্ত হয়। “চটক্সে খেঁচো” এই কথাটা সাহেবের একচেটে ছিল। যখনই তিনি বাঙ্গালী পণ্টনকে প্যাগেড্ করাইতেন, তখন ঐ কথাটাচ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেন। পণ্টনের ছেলেরা বন্দুক অতি ক্ষিপ্ততার ও যোগাতার সহিত উঠা-নামা করিলেও, সাহেবের “চটক্সে খেঁচো” এ বুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ একটা বাচ (mania) ছিল। দীবেনবাবুর অবস্থা ইংরাজী না যোগানোতেই এই কথা মুখ দিয়া দৈবাৎ বাহির হইয়া যায়, কিন্তু সাহেব তাঁহার

এই বিশেষ কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া যোবার খরচের দায়ে রেজাট দিয়াছিলেন। অল্প এক জন সাহেব, কর্মচারী দীবেনবাবু যেটুকু কথা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “Your wits have saved you.”

এইরূপ যুদ্ধ ও দেশ সশ্রমে নানা অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমাদের বিশ্রামকাল প্রায়ই আনন্দে কাটিতে লাগিল। আমরা যে প্রবাসে আছি তাহা মুহূর্তের ভগ্নেও মনে হইত না। তার পর তৎশিগদার মহাশয়, যিনি মেগার জন্ম বিশেষ ভাবে সর্গকানী কর্মচারিরূপে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি আমাদের সঙ্গে প্রকারে সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেছেন। তিনি আমাদের প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে আপনারা স্কুলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্লট পাঠ্যছেন। ফণীবাবুকে তিনি Mr. Funny বলিতেন। ফণীবাবু তাঁহার নিকট জমী সশ্রমে বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফণীবাবুর কথায় ও ব্যবহারে এতটুকু পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে মদ্যে মধ্যে তাঁহার কথা বলিতেন ও তাঁহার খোঁজ লইতেন। যখন তিনি শুনিলেন যে ফণীবাবুও কুন্তে আসিতেছেন, তখন বলিলেন, “Tell Mr. Funny to bring এসগোল্লা চম্ চম্ and শীতলপাটী.” কারণ বাঙ্গালার এই জিনিষগুলি তাঁহার খুব প্রিয়। তিনি আমাদের ঘরের সম্মুখে অগ্নি নির্বাপনের জন্য জলের কলসীর বন্দোবস্ত দেখিয়া এমন পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালীজাতির ঘে-গবেকবুদ্ধ আছে তাহা পশ্চিমভারতীয় লোকের নাট।” তিনি প্রথমটুকু আমাদের দেখিয়া দাঁড়তেন ও নান্য বিষয়ে পরামর্শ দিয়া আমাদের বন্ধু কার্য্য করিতেন।



এখানে আমাদের “কুস্তু কমিটি” সম্বন্ধ কিছু বলা উচিত। তৎপূর্ব্ব খড়কুমার আশ্রমে গরু পোষ্য মাসে ভক্তসম্মিলনীতে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর ভিতর একটি প্রস্তাব উত্থিত হয় যে এনার সমিতিয়্য ত্রীতীঠাকুর মহারাজকে কুস্তে গমন করিতে হইবে। তাহাতে ত্রীতীঠাকুর মহারাজ বলেন, “আমাকে যদি যাতেই হইক তাহা হইলে একরূপ বন্দোবস্ত কর। তাহাতে আমরা যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে যাতেই হইক, তাহাব মর্যাদা রক্ষা হয়। ২৫ জন ভক্ত শিষ্য বইয়া আমি যাতেই আমার যাওয়া হইবে না। তোমরা সকলে গেলে আমি যদি নাও যাই তবুও আমার যাওয়া হইবে। সেখানে আমরা যে কয় দিন থাকিব, আমাদের আসাম মঠকে যেন সেট ক’দিনের জন্য তথায় উঠাইয়া আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হইবে। সেইরূপ দৈনন্দিন পূজা আরাতি স্তোত্রাদি পাঠ হইবে।” তরিনাম সংকীর্তন হইবে ও সাধুদিগের ভক্তে ভক্তে গিয়া নগর সংকীর্তন করিয়া আসিতে হইবে। বাঙ্গালী যে কেহ সেখানে প্রসাদ পাঠেব বলিয়া আসিলে যেন ফিরিয়া না যায়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।”

এ বিষয়ে কি পরিমাণ খরচ পত্র হইবে জিজ্ঞাসা করার তিনি আত্মানন্দ হুই সচেষ্ট টাকার কথা বলেন। স্থির হয় যে এষ্ট প্রস্তাব পরামর্শান্তে পুনরায় উপাধন করা হইলে, কিন্তু অর্থ সমস্তা থাকায় এ প্রস্তাব দাম্যচাপা পড়িয়া যায়।

ত্রীতীঠাকুর মহারাজ উক্ত ভক্ত-সম্মিলনীতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার

জীবনে তিনটি সাধ ছিল, তার মধ্যে সমিতিয়্য কুস্তে যাওয়া একটি। কুস্তম্নানের প্রায় এক মাস পূর্ব্ব চিদানন্দজীর মনে ত্রীতীঠাকুরের এই সাধটী অস্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এ ভাবনা এতট প্রবল হইয়াছিল যে তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, গুরুভাইগণের নিকট সান্নিধ্যক অমুখোদ জ্ঞানাইয়া পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহার পত্রের এমনট প্রস্তাব যে তাহাতে কেহই উদ্বুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার ফলে, ত্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া কুস্ত কমিটি খাড়া করা হইল। তাহার চিরাবপত্র ও ঝাট কিছু চিদানন্দজীর উপরই হস্ত হইল। তিনি এই সব অলৌকিক ক্রমে সহ্য করিয়া রাত্রি আগিয়া হিসাব পত্র তত্ত্বাদি ব্যাপারে লিপ্ত রহিলেন। তাঁহার নির্দেশেই ধীরেনবাবুর ছায় উপযুক্ত কম্মী সেবক হরিদ্বারে প্রেরিত হইয়াছিল। যে দুই হাজার টাকা ভক্তসম্মিলনীর প্রস্তাবে সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে ততোধিক টাকা অবাধেই সংগৃহীত হইল। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ওপারে ঠিক যেখানে সাঁকো দুইটি শেষ হইয়াছে সেট গঙ্গা ও নৌদ্বারার মধ্যবর্তী “রোয়া” নামক দীপের সম্মুখভাগের ত্রিকোণভূমির এক অংশে প্রায় ১০০০ বর্গ ফুট স্থান ৩০০ তিন শত টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর চতুর্দিকে গৃহাদ নির্মাণ করিয়া মধ্যভাগে আসন ঘর (মন্দির) ও ত্রীতীঠাকুর মহারাজের থাকিবার জন্য তাম্বুর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সম্মুখে রাস্তার উপর একটি

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গোট করিয়া বাজালা, চিন্তী ও  
টংরাঙ্গী ভাষায় “আসাম বঙ্গীয় সাবশ্রুত মঠ,  
ঝোরি ক্যাম্প” বলিয়া নিজ্ঞাপিত করা  
হইয়াছে। উক্ত প্রবেশদ্বারের অপর পার্শ্বে  
অফিস গৃহ ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত  
হইয়াছে। সমাগত রোগিণীকে বিনামূল্যে  
ঔষধ বিতরণ করা হইতেছে ও সেবার ব্যয়ভা  
করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকুর মহারাজের অভিপায় মত  
যেন মঠই সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সেই  
নিজ্ঞান, বালুর চণ এখন পবিত্র দেবভূমিতে  
পরিণত হইয়াছে। সেবক-ভক্তগণের কলরবে  
স্থানটা মুগ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। সকালে  
সন্ধ্যায় নাম সংকীৰ্ত্তন, স্তোত্রপাঠাদিতে ও  
মন্ত্র, শঙ্খ, ঝংগর, ঘণ্টা নাদে স্থানটা  
অপূৰ্ণ দেব-আয়তনরূপে বিরাজ করিতেছে।  
দিগারাজি দীপ্ততাং ভূজাভাং নব উঠিয়াছে।

নিকটে গঙ্গা ও নীলধারা অপূৰ্ণ কলতানে  
প্রাণবেগে আবশ্রুত গতিতে ছুটিয়াছে।  
তাহার স্বচ্ছ ও সুশীতল জল প্রাণ এং  
শিতরসিত বায়ু প্রাণ মন ও দেহের আনন্দ-  
বর্দ্ধন করিতেছে। উভয় পারে অসংখ্য সাধু  
ও ভক্ত সমাগম বাস্তবিকই অপূৰ্ণ! এত

কুম্ভমেলা উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের এমন  
প্রদেশ নাট যাহা হইতে লোক সমাগম না  
হইয়াছে। কুম্ভ যে কেবলমাত্র সাধু-সম্মিলনী  
ভাণ্ডা নহে। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় শ্রেষ্ঠ,  
উন্নত, জ্ঞানী, ধনী ও ব্যবসায়ীর সমাগম  
হওয়ার উক্ত স্থান অপূৰ্ণ মিলনক্ষেত্রে পরিণত  
হইয়াছে। সমগ্র ভারতকে দেখিবার ও চিনি-  
বার তত্ৰ অপূৰ্ণ সুযোগ। ভারতের যেখানে  
যাহা বিচিত্র ও অপূৰ্ণ তাহা এখানে সমাগত।  
নানা দেশের নানা ব্যবসায়ী বিচিত্র খাদ্য ও  
অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্যাদি সাজাইয়া দোকান খুলিয়া  
বসিয়াছে। কেহ না গানে, বক্তৃতায়, দৃষ্টে  
সৰ্ব্ব প্রকারে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে  
যাকুল। কোথাও প্রদর্শনী বসিয়াছে, কোথাও  
ধর্মগ্রন্থ বিক্রীত হইতেছে, কোথাও ধর্ম সম্বন্ধে  
বক্তৃতা হইতেছে, কোথাও মিছিল চলিয়াছে।  
কোথায় বা সাধুর পজত বসিয়াছে, কোথায়  
না ছাউনী বসিয়াছে। কোথায় কুটীর নির্মাণ,  
কোথায় বা তাবু সমাবেশ। একরূপে লচমন  
ঝোলা হইতে কনখল পর্য্যন্ত গঙ্গার তপারে  
প্রায় ২০২৫ মাইল স্থান কেবল লোক  
সমাবেশ। ক্ষুদ্র হরিদ্বার সহর লোকে লোকা-  
রণা, রাস্তাঘাট যানবাহনে পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

## শ্রুতিস্মৃতি

—:—

পশুত্বভাগে প্রথমতঃ মনুষ্য লাভ, তার পর  
দেবত্বলাভ, তার পর ঈশ্বরত্ব আর অবশেষে  
ব্রহ্ম লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। যিনি এট  
ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁকে আর  
ভগবানে কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহা-  
পুরুষের জগতে অভাবও নাই। সুতরাং যাতে  
এই চারটি আদর্শই প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁকেই  
আদর্শ করে প্রীত্যোক্তের জীবন গঠন করাই  
একান্ত কর্তব্য।

\*

চিত্তভঙ্গি না হলে রসতত্ত্বের আদৌ অধি-  
কারী হওয়া যায় না। গোপীভাব, সন্তোগ  
ইত্যাদি ভাবাশ্রয় কামকামনামুক্ত লোকের  
পক্ষে যে কি ভীষণ, তা বলবার নয়। মোহত-  
বাদী সন্ন্যাসীদের পতন অপেক্ষাও এই রসতত্ত্ব-  
সাধকদের পতনের আশঙ্কা। দেশী এবং এত  
আরও বেশী অনিষ্ট হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা  
স্বয়ং সাধারণ লোক কিছুই বোঝে না—তার  
গুধু হুল লীলার অনুকরণ করে। জ্ঞান ছাড়া  
রসতত্ত্ব বোঝার উপায় নাই।

\*

জ্ঞানীর যে কি আনন্দ, তা মুখ ফুটে বল-  
বার নয়। জ্ঞানীও কাছে রাধাকৃষ্ণের মিলনের  
আনন্দের মত জগতের সকল মিলনের আনন্দই  
ফুটে ওঠে, আর তিনি দর্শকরূপে সেট সমষ্টি  
আনন্দ ভোগ করেন। বৈষ্ণবের রসতত্ত্ব সাধনে  
বিকার আসতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী নির্বিকার।  
ঈশ্বর সন্মুখে অবস্থ মিলনের খেলা চলছে, কিন্তু

আমিত্র না থাকায় তাঁর কোনও বিকার নাই।  
তাই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

\*

ফুলকে আদর্শ কর। ফুল আপনি ফোটে  
আবার আপনিই ঝরে পড়ে—দেবসেবার  
দিলেও আপত্তি নাই, আবার নারকীয় সেবার  
দিলেও আপত্তি নাই। সেলাই তার ধর্ম।  
রূপের উৎকর্ষ ফুলে রয়েছে, তবুও তার স্বভাব  
পরকে আনন্দ দেওয়া—নিজের কিছু কিছু  
নাই—নীরবে ফুটেছে, নীরবেই ঝরে পড়ছে।  
তোমরাও ফুলের আদর্শ নাও—ফুলের মত  
সকলকে অবিচারে আনন্দ দাও—সেবা কর,  
নিজের জন্ত কিছুই রেখো না—সবই পরের  
জন্ত বিলিয়ে দাও।

\*

আত্মবিশ্বাস আর নির্ভরতা—এই দুটি  
সাধনপথের সহায়।

\*

জীবনের লক্ষ্য স্থির না করে কোনও  
কাজই সফল হয় না। সংসারীট হও, আর  
সন্ন্যাসীট হও, লক্ষ্য স্থির না হলে কিছুতেই  
উন্নতি হবে না। প্রত্যেক কাজেই লক্ষ্য স্থির  
রাখা উচিত। ‘নচেৎ উড়ো উড়ো হয়ে সংসার  
ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেও কিছু হবে  
না—কর্ণেও কিছু হবে না। জীবনের লক্ষ্য  
স্থির করে সংসারীট কর আর সন্ন্যাসীট কর  
—সব কিছু ঠিক হবে। তখন সমস্ত জগৎ

বিরুদ্ধ হলেও লক্ষ্য পথ থেকে নড়াতে পারবে না। শুধু যে সাধন দিয়েছেন, তাতে গিঠা রেখে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে হবে—“মস্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” এই কণাটী ধারণা করতে হবে। সাফল্য হোক বা না হোক সে দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখবে না। জীবন পর্য্যাপ্ত পথ করে কর্ম্য করবে। আজ এটা, কাল ওটা এমনভাবে কাজ করলে কোনটাতেই ফল হইবে না।

\*

সে সত্যকে আশ্রয় করেছি, তাই ভুল থাকলেও ক্রমে ভুল দূর হয়ে তার সত্য লাভ হবে। কঠি সে যে পথ ধরতে থাকে, সত্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ থাকলে নিশ্চয়ই সে সত্যোপৌত্তম্যে। অসত্যগুলি শরীরের ময়লায় মত ন্যবে পড়ে যাবে। থাকবে শুধু গাটী ভাবটুকু।

\*

বাকসংযম না হলে চিত্তসংযম হয় না। বাকসংযমই চিত্তসংযমের পূর্বসংকল্প। সত্যবাক্যে বলাতে খুব সাবধান ও সংযত হওয়া কর্তব্য।

\*

ভালবাসার লোক হবে থাকলেও আনন্দ—তার স্মৃতিতে বা চিন্তাতেই কত আনন্দ। সত্যী জীবির খামি বিদ্রোহে থাকলেও তার কণা মনে ওপড়েই তার বকখানা ফুলে উঠে। আশে পাশে কত পুরুষ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কার দিকে তো তার মন যায় না। ভগবানকে তেমনি ভাল না বাসতে পারলে তাঁকে দেখলেও হেমন্ত আনন্দ পাবে না। আর তাঁকে

ভালবাসতে পারিলে তাঁর দেখা না পেলেও তাঁর স্মৃতিতেই আনন্দ পাবে। টান ক্রমে বেশী হলে অবশেষে ভগবান দেখা দেবেন। তিনি সহজে ধরা দিতে চান না—ভক্তকে গাটী করে তার পর আসেন।

\*

হিন্দুদের বীজমন্ত্রগুলি যুগ্মাঙ্ক। “ওরি” এবং “হ্রীং” মূল একই দাঁড়ায়। হ ( শিব ) + ব ( মিলন ) + তে ( শক্তি ) = ওরি ; আবার হ ( শিব ) + ( র ) মিলন + জে ( শক্তি ) = হ্রী ; হ্রী + ং ( নামনিম্ন ) = হ্রীং।

\*

বঙ্গবিকাশে অন্ধকার আপনা হতে দূর হয়ে যায়, যেমন বহুদিনের অন্ধকার ঘবে আলো জালা মাত্র সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সাধক তখন আত্মজ্ঞান তরৈ সমস্ত বস্তুট আলাতে উদ্ভাসিত দেখে আর অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আর তার রিপু বা প্রবৃত্তি জোর করে দমন করতে হয় না—ও সব আপনা হতেই দমন হয়ে যায়।

\*

লোকে বলে অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু তা আদৌ ভুল না। বিশ্বাস কখনও অন্ধ নয়, সর্বদাই চক্ষুমান। যার বিশ্বাস এসেছে, তাইও যে-ঠাং এসেছে, তা নয়। কত জন্মমৃত্যুস্তর কত বিচার, কত তর্ক করে তার পর তার বিশ্বাস এসেছে। তাই দেখা যায়, একটা বালকের হস্ত অগাধ ভক্তিবিশ্বাস, আর একটা বৃদ্ধের একেবারে তার বিপরীত। আবার বিচার করে দেখ, বিশ্বাস করতে লোকে, ঋষি

ବାକ୍ୟ ବା ଶୁଣିବାକୋଟି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଥାଏ । ସୁତରାଂ ବିଶ୍ୱାସ କଥନଓ ଅନ୍ଧ ହୁଏ ପାରେ ନା । ସାର ବିଶ୍ୱାସ ଏମେହି, ତାର ତୋ କୋନଓ ଚିନ୍ତାଟି ନାହିଁ । ସାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେନି, ବିଶ୍ୱାସ ଆନବାର ଉକ୍ତ ତାଙ୍କେ ସାଧ୍ୟାସାଧନା କରନ୍ତେ ହୁଏ । ବିଶ୍ୱା-  
ସେର ମତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆର କିଛି ନାହିଁ ।

\*

ନିରାଶ୍ୱରେଟ ସତ ଭେଦ । ସତ ଓ ଉଚ୍ଚତେ ଉଠିବେ, ତତଟ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଦୂର ହେବେ ଦାବେ—ସମ ଅଧ୍ୟାସ ବଳେ ଜ୍ଞାନ ହବେ ।

\*

ଆମି ଦେହ ହତେ ପୃଥକ—ଏହିଟି ଉପଲବ୍ଧି ହଲେଟ ସ୍ୱତ୍ୱାଞ୍ଜୟ ହଓୟା ସାର । କେନନା ଜୀବେର ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ଥାଏକେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତ୍ୱା ନାହିଁ । ସାର ସ୍ୱତ୍ୱା ହେବେ, ତାର ଆବାର ଜନ୍ମ ହେବେ—ଏଟା ମୃତ୍ୟୁର ଭଗବାନେବ କଥା । ସୁତରାଂ ଆମାର ସାର, ସ୍ୱତ୍ୱା ହେବେ, ତାହାଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବାର ଜନ୍ମଓ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଆମି କୋନଓ ଦିନ ଜନ୍ମାହି ନି, କିସା କୋନା ଦିନ ମରିଓ ନି କି ମରବଓ ନା । ଆମାର ମରେ କୋଥାୟଓ ସେତେବେଳେ ନା, କାରଣ ସାଓୟା ଥାଏକେ ଆବାର ଆସାଓ ଆଛେ । ଆମାର ସାଓୟା-ଆସା ନାହିଁ ; ଆମି ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତ ; ଏଥାନେହି ଆମି ଶବ ଉପଲବ୍ଧି କରବ । ଏହ ହେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀର କଥା ।

\*

ସାଧାରଣତଃ ଏକଟା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ମୋହତ ହେବେ ସାର । ଆର ସାର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୁଗପତ୍ନୀ ତାର ଚୋଖେର ସାମନେ ତେସେ ଓଢ଼ି, ତାହାଲେ ସେ ଡୋ ଆସ୍ତହାରୀ ହେବେ ସାବେ । ତଥନ କି ନିଜେର ଭାବନା ଥାଏକେ ପାରେ ? ନିଜେର ମନେ ତଥନ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏକେ ନା । ଏହିଟୁକୁ

ଦୃଷ୍ଟିର ନିସ୍ତାର ହଲେହି ଏମନ ହେବ, ଆର ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଓ ଦର୍ଶନ କରଲେ ତଥନ ତୋ ଆମି କଥାଟି ନାହିଁ ।

\*

ମହାପୁରୁଷ ଛାଡ଼ା କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଚିନ୍ତେ ପାରେ ନା । ତୋମାର ସତଟୁକୁ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ତତଟୁକୁ ଚିନ୍ତେବ । ସାଧାରଣତଃ ସାର ସେମନ ସଂସ୍କାର, ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଥା ଏଲେଟ ଲୋକେ ସାଧୁ ମନେ କରବେ ; ଆବାର ପିପରୀତ କଥା ଏଲେଟ ସେ ହେବେ ସାବେ ଅସାଧୁ । ନିଜେର ମନ-ବୁଦ୍ଧି ଦିଶେ ଲୋକେ ସାଧୁ ଦେଖେ । ସୁତରାଂ ନିଜେ ସାଧୁ ନା ହେବେ କିସା ସାଧୁର କୃପା ଛାଡ଼ା କେଉଁ ସାଧୁ ଚିନ୍ତେ ପାରେ ନା । ଧୂଳି ଭଜ୍ତ ହଲେଓ ସେ ସାଧୁ ଚିନ୍ତେ ପାରା ସାର, ତା ନୟ ; ତବେ କିଛି କିଛି ଗୋରା ସାଧୁ ମାଜ । ଭଜ୍ତ ସେ ଦିନ ଶୁକ୍ରତେ ଲୟ ହେବେ ସାବେ, ସେଟ ଦିନ ସାଧୁକେ ଚିନ୍ତେ ପାରେବ ।

\*

ସାବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ମୋମାର ଅଧିକାର ପେରେବେ, ଜ୍ଞାନେ, ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିତେ ତାହାର ଶ୍ରୋତାକେ ଉନ୍ନତି ଦରାତ ରହେବେ । ତାହେବେ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତତ ମାଜାନୋ ରହେବେ, ଶୁଦ୍ଧ ସମୟ ମାପେକ । ଚିନ୍ତା-ଶକ୍ତି ହେବେ ତାହେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଖୁଲେ ସାବେ ।

\*

ଭଗବାନଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଚାଓୟାଓ ଏକଟା କାମନା । ଦେଖିଲେ ଚାଓୟାହି ତାନି ଦେଖା ଦେବେନ ନା ; କାରଣ କାମନା ଧୂଳିତେ କଥନଓ ଭଗବାନଙ୍କେ ପାଓୟା ସାଧୁ ନା । ଏକମାତ୍ର ଓ ତାର ଓପର ନିର୍ଭର ଛାଡ଼ା—ତାର କୃପା ଛାଡ଼ା କେଉଁ ଭଗବାନେର ଦର୍ଶନ ପାରି ନା । ନିଜାମ ହେବେ, ଚିନ୍ତା-ଶକ୍ତି ହେବେ ତାନି ଆତ୍ମା ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ।

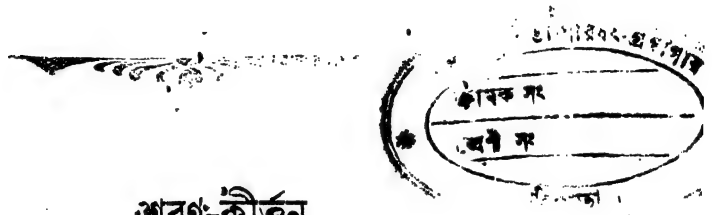
\*

উঁচর ইচ্ছা ছাড়া চোখের পলক পড়ে না—গাছের পাতা নড়ে না—অন্ত কাজ তো দুয়ের কথা । এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এটা উপলব্ধির বিষয় । সাধারণ জীবকে এ কথা শোনালে চলবে না । অহং নাশ না হলে এ সত্য কেউ বুঝতে পারে না ।

✽ .

শ্রী-পুরুষ ভাই-বন্ধু এ সব বাবহারিক-অগতির কথা । মূলে সবাই এক 'আত্মা,

কোনও লিঙ্গভেদ বা সঙ্কল্পভেদ নাই । আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী শ্রী, মা বোন ভৈরবীদি সম্পর্ক আটো নাই ; সুতরাং পূর্বজন্মের মা এটো জন্মে শ্রী কি অল্প আত্মীয় হয়ে জন্ম নিতে পারে । যে মা ছিল, সে কখনও শ্রী হতে পারে না, এমন একটা কথা চলতি আছে—সেটা ঠিক নয় । কষ্টের সংযোগবশতঃ জন্ম হয়, মিলন হয়—এই মাঝে সম্পর্ক বিচার কি আছে ?



## শ্রবণ-কীর্তন

—❧—

আসক্তি-ত্যাগ ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না, উহা পূর্বে বলা হইয়াছে । সেট প্রসঙ্গে এট কথাও বলা হইয়াছে যে আসক্তিত্যাগকে সহজ-সাধ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য বিষয়ত্যাগও প্রয়োজন । তবে কিনা বিষয়ত্যাগকে ত্যাগের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা সাধকের পক্ষেই আদর্শ । যাহার বসিক ও সিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে নিশ্চয় ত্যাগই স্বাভাবিক ।

উহার পর দেবর্ষি অব্যাবৃত্ত ভজনের উপদেশ দিয়াছিলেন । পূর্বেই বলিয়াছি, মহামেনেরা উহাকে অব্যবৃত্তকালভ্রম ভাবায় নায়ে অভিজিত করিয়াছেন । অব্যবৃত্তকালভ্রম বিবৃতিও সেই সঙ্গে করা হইয়াছে । তাঁহার প্রসঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্তও, যেন বুঝা না যায়, ইহাই তাঁহার নিমুঠার্থ ।

এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, শরীরষাড়া নির্বাহকল্পে যে সমস্ত কার্য অত্যাশঙ্কক, তাহার সম্পাদন কালে তো সাধককে ভজন হইতে বিরত হইতে হইবে ? ভজন বলিতে যদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বুঝি, তাহা হইলেই এই কথাটা উঠিতে পারে । কিন্তু তাহা ভজনের 'হুল' অর্থ । অশাস্ত্র নিয়মিকারীর পক্ষে অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন, না হইলে তাহার চিত্তে নিষ্ঠা উৎপন্ন হয় না । কিন্তু ভজন বলিতে অন্তরের মাঝে ভাবের ফোয়ারা উৎসারিত করিয়া তোলা—এ কথা কোন ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নহে । কি করিয়া উহা সম্ভব হইতে পারে, উহা প্রবর্ত্ত অধিকারীর পক্ষে একটা সমস্তা নটে । এককল-মাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নির্মাণাকর্ত্তে গৈলে অনেক সময় চিত্তের গতি, ইন্দ্রিয়-মূল্যায়ন

শৈথিল্য আসিয়া 'পতন ঘটায়, ইহাও দেখা গিয়াছে। আবার অতিরিক্ত 'অনুষ্ঠানের আড়-ম্বরে আসল বস্তু চাপা পড়িয়া যায়, ভগবন্তজন ও সংসারকর্ম পদ্ব্যপ্তির বিরোধী হইয়া উঠে, ইহাও নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। এই দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য করা কঠিন হইলেও ইহা ছাড়া আর শুক্তিলাতের অত্র কোনও পন্থা নাই।

“যং কনোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্” অব্যাবৃত্তভজনের ইহা আদর্শ বটে। ভজন আর তখন কোনও সংসারবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ নহে, উহা অন্তর হইতে অভিব্যক্ত সহজ কর্মেই আত্মপ্রকাশ করিয়া সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু জগন্মাতাকে অন্তরে সর্বদা অনুভব না করিলে কর্মমাত্রই যে তাঁহার পূজা, এ কথা তো সহজে ধারণা হয় না। কতকগুলি জৈব ভাবের মাঝে আমরা অব্যাবৃত্তভজনের সুন্দর উদাহরণ পাই। সন্তঃপ্রসূত সন্তানের জন্ম মায়ের ব্যাকুলতা, পতিমোভাগ্যবতী নারীর স্বামীর প্রতি ভালবাসা—এইগুলিতে দেখা যায়, ভাব আর কর্মে কেমন সুন্দর সন্ধি হইয়াছে। ঠিক ভগবানের প্রতি এইরূপ স্বাভাবিক ঐতি উৎসারিত হইলেই অব্যাবৃত্তভজনের সার্থকতা ঘটিতে পারে।

কিন্তু ইহার পক্ষে প্রথম বাধাই এই যে ভগবান আমাদের কাছে শূন্য-ধরূপ। মা ছেলেকে বুকে চাপিয়া আনন্দ পায়, স্ত্রী স্বামীকে দিনান্তে কাছে, পাওয়ার গরবে বিভোর থাকিতে পারে—কিন্তু ভগবানকে এমন করিয়া আমরা কোথায় পাইব? আপনাত্মক মনোমত তাঁহার কল্পমূর্তি গড়িয়া তুলিয়াও যেক প্রাণে তৃপ্তি হয় না—একান্ত সন্নিকর্ষের অভাব চিত্তকে পীড়িত করিয়া রাখে। মনে

হয়, স্ত্রী-পুত্র যেমন সত্য, এত ভগবান কি তেমনি সত্য? এ-ও তো কল্পনা! যাহারা একটু বিচারশীল, তাহাদের এত অস্বাভাবিকতা আলা। আবার যাহারা বিচার না করিয়া ভগবান মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তাহারাও সাম্প্রদায়িক কোনও প্রতীকে চিত্ত আবদ্ধ করিয়া কণাঞ্চল তৃপ্তি পাইতে চায়। হৃদয়ভাণ্ডে বিচার করিলে তাহাদের এত ভাবও কল্পনার মোহ ছাড়া কিছুই নয় বটে, কালে তাহাতে গোঁড়ামী ও অন্ধতা আসিয়া উন্নততর ভজনের পথ অরুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু তথাপি চিত্তের এই ক্ষণিক তৃপ্তি একান্ত উপেক্ষার জিনিষ নয়। তবুও স্থূল উপাসনা হইতে চিত্তকে হৃদয়ভিগ্নী করিবার জন্য একটা বিশেষ চেষ্টা রাখা প্রয়োজন।

স্থূল ও হৃদয়ের সন্ধিতে নামজগের আশ্রয় লইলে সব দিক দিয়া মীমাংসা হয়। অজপা-জপ বা শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ একটা সুন্দর পন্থা। ইহাতে সংসার-কর্তব্যে কোনও ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা নাই, আবার অব্যাবৃত্তভজনেও কোনও বাধা নাই। এইরূপে স্মৃতি এত দৃঢ়মূল হইবে যে নাম শ্বাসের সঙ্গে গাঁথা হইয়া যাইবে এবং অস্থকালে তাহা সাধককে মৃত্যু-গহন প্রদেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

অব্যাবৃত্ত ভজনকে সহজ করিবার জন্য দেবর্ষি আরও একটা উপায় বলিয়াছেন—লোকেশ্বরি ভগবদ্ভক্তি-শ্রবণ-কীর্তন—সংসারে চলিতে ফিরিতে যতক্ষণ শ্রবণ, ভগবানের গুণ শ্রবণ কীর্তন কর। কীর্তন অপেক্ষা শ্রবণ সহজসহ্য, তাই দেবর্ষি শ্রবণের কথাই আগে উল্লেখ করিলেন। লীলাশ্রবণকে সার্থক করিতে

হইলে প্রতিবেশীকেও আগে অভ্যস্ত করিয়া নিতে হয়। তার অন্তঃকরণে শুনিব না শুনিব, তাহার বাছাই করিতে হয়। বেদে আছে, “ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়ামঃ”—যাহা শুভ, কাণে দিয়া তাহাই শুনিব। ইহারই নৈতিমূলক দিক, পাপ-প্রসঙ্গ কখনও শুনিব না, যেখানে সে প্রসঙ্গ হয়, সেখানে থাকিব না। পাপালাচনা শুনিতে শুনিতেও অবশেষে স্নান নষ্ট হইয়া যায়, কুকাণ্ড তখন আর কাণে বোধে না। ইহা নৈতিক দৃষ্টিতে বই কি? তাই কুপ্রসঙ্গ শ্রবণ হইতে বিরত হইয়া কর্ণকে শুদ্ধ করা প্রথমতঃ প্রয়োজন। তার পর সংপ্রসঙ্গ শ্রবণে তাহাকে অভ্যস্ত করা।

আজকালি মুদ্রাস্ফোরণ কল্যাণে শ্রবণটা চরিত্রব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। যাহার যাহা বক্তব্য, সে তাহা ছাপাইয়া দেয়, আমরা চোখ দিয়া সেগুলো শুনি। সুতরাং আজকালকার উপযোগী ব্যাপার করিতে হইলে স্থিতিবাহিত শ্রবণকে অধ্যয়নেরও উপলক্ষস্বরূপ ধরিতে হইবে। হরিকথা শুনিইবে, এমন লোক আজকাল কোথায়? কিন্তু কলি প্রভাবে কুগ্রন্থের অভাব কোথায়ও হইতেছে না, বরং তাহার প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলেতেছে। এইগুলিকে সমস্তে বর্জন করিয়া দূর উচিত। তার পর সদগ্রন্থ অধ্যয়ন। শ্রবণের অনুকূলে ইহা দ্বারাই আজকাল চিত্ত শুদ্ধি করিতে হইবে। অশ্লীল বস্তু রাখা ভাল, জীবন্ত মানুষের মুখের কথা আর মরা পুথির পাতার আঁচড়ে অনেক তফাৎ। কিন্তু কেন জানি না, কুগ্রন্থের বেলায় আমরা এই নিয়মটা খাটে না—সেখানে মানুষ মুখ ফুটিয়া ঘান্না বলিতে পারিত, কলমের আগায় অনায়াসে তাহা

বাহির করিয়া দেয়। এইখানে মানুষ সাবধান।

এই ভোগ্য সাধারণ ভাবে শ্রবণের কথা। শ্রবণের মাঝে একটা মাধুর্য্যও আছে, যাহার আনন্দন ভোগ্যমান হইতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। ছেলে যখন প্রথম বাপ, ডাকিতে শিখে, তখন ছেলের মুখে সেই ডাক শুনিয়া মায়ের মনে যে হৃৎ ও লজ্জামিশ্রিত পরমানন্দের উৎপত্তি হয়, শ্রবণজনিত সেই সুখ বাস্তবিকই অতি দুর্লভ। মা শিশুমুখে শ্রবণজনক ডাকে না, কিন্তু শ্রবণের মুখে সেই ডাক শুনিয়া আনন্দিত হইয়া যায়। ভগবানের কথাও তেমনি ভক্তের মুখে শুনিতে পাঠলে শ্রবণের প্রাণ পুলকে এগাইয়া পড়ে। এটি শ্রবণ শুধু সাধকের কাম্য নয়, সিদ্ধেরও বিলাস বটে। মরমী পাঠক অনুভবে তাহা বুঝিয়া লইবেন। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা বহু সৌভাগ্যের ফল বলিতে হইবে।

শ্রবণ-কীর্তন পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গ-ভাবে যুক্ত বটে, কিন্তু সাধনাদি হিসাবে বিচার করিলে শ্রবণের পর কীর্তনের স্থান। ভিত্তরে ভিত্তরে আবেশ না হইলে, কীর্তনে ক্রাচ হয় না। মহাজনেরা এই অভাবহীন নাম দিয়াছেন—নামগানে সদাকটিঃ। “আসক্ত-শ্রবণগাথানে”—ইহাকেও কীর্তনাদি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

কীর্তন শব্দে অদিক বলা বাহুল্য মজি। বাঙ্গালীজাতির প্রাচীন মহাপ্রভুর চৈতন্য এক অপূর্ণ দান। কীর্তনের লোকান্তরিত্য শ্রবণ অলৌকিক। সর্বদেশে সর্বকালেই প্রাথমিক সাধনাদি হিসাবে কীর্তনের সম্মান যথেষ্ট



হইয়াছে। কিন্তু বাজালা দেশে কি ভাবো-  
দগারে, কি লোকসংগ্রহে, কি শিল্প-নৈপুণ্যে  
ইতার যেরূপ উৎকর্ষসাধন হইয়াছে, অত্র  
কোথায়ও সে রূপ হইয়াছে কিনা জানি না।  
তবে সংযোগার্মনা হিসাবে কীর্তনের স্থান  
নিরূপণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।  
ব্যক্তিগত সাধন হিসাবে কীর্তনের উপ-  
যোগতাট আমাদের বিচার্য।

কীর্তনের আভ্যন্তরীণ রূপ অজপারপের  
কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চৈঃস্বরে  
নাম জপ করাও কীর্তনের অঙ্গ এবং উহা,  
সহজসাধ্য বটে, উষায় ও সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত  
বা পারিবারিক ভাবে একত্র হইয়া ভগবানের  
গুণ কীর্তন করা ভক্তদাউটার এক অতি সুগম  
পন্থা। সন্ধি-সময়গুলির প্রভাব গতি সুস্পষ্ট।  
প্রাতঃসন্ধ্যায় কীর্তনে চিত্তপ্রসাদ ও সাংসকার  
কীর্তনে আত্মসমর্পণের ভাব জাগাইয়া তুলবে।  
এই দুইটার অন্তরালে মানুষের সংসারকর্ম ও  
বিশ্রামের সময়। যদি আদি ও অন্তে ভগবানের  
সহিত সংযোগ থাকে, তাহা হইলে কর্ম ও  
বিশ্রাম উভয়েরই পুষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ  
কর্মই সহজে গুণকর হয়।

এইরূপ সাময়িক কীর্তন ছাড়া সমস্ত দিন-  
রাত্রির অবকাশ মধ্যে ভগবানের কোনও  
বিশিষ্ট নাম উচ্চারণ অভ্যাগত করিয়া লইতে  
পারিলে বিশেষ উপকার দেখা যায়। মানুষের  
মন সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। এই  
আন্দোলনের মাত্রা অধিক হইলেই উহা  
স্বতঃই ভাষা ও কর্মে ফুটিয়া উঠে। এই জন্ত

দেখা যায়, মনের অববেগে মানুষ অজ্ঞাতসারেও  
নিজ নিজ অভ্যাসানুযায়ী “মা গো”—কি এমন  
একটা কিছু বুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। এই  
বোলগুলি যদি ইষ্টের বাচক হয়, তাহা হইলে  
উপকার বেশী হইবে। আপনা হইতেই তখন  
আবেগের সহিত ভগবানকে স্মরণ ও তাঁহাতে  
সমস্ত সমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিলে।

উহা ছাড়া কীর্তনের আর এক রূপ আছে,  
ইষ্টগোষ্ঠী করা। যাহাদেব সঙ্গে প্রীতির বন্ধন  
রহিয়াছে, তাহাদের প্রীতির মূল নিদান যদি  
গুরু বা ভগবান হন, তাহা হইলে তাহাদের  
সচিত্ত সময় সময় একত্র হইয়া ইষ্ট প্রসঙ্গ  
করিলে যেরূপ অনুপম আনন্দ পাওয়া যায়,  
সে রূপ উপকারও হয়। দশজনে ‘মলিয়া গল্প-  
গুজল করা মানুষের একটা স্বভাব। কিন্তু এটি  
আলাপ-আলোচনা যথা সম্ভব ইষ্ট বিষয় লইয়াই  
হয়, তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি অগতঃ  
প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সাধক  
মৌল্যে তাহার মোড় ফিরাইয়া দিয়া অপর  
ইষ্ট কথাতেই পর্যবাসিত করিতে শিক্ষা  
করিলেন।

সংসারের কাজ কর্ম ইত্যাদি করিতে  
করিতেও যতটুকু শ্রম-কীর্তন সম্বন্ধে করা  
যাইতে পারে, তাহারই কয়েকটা সুপরিচিত  
উপায় যাত্রা এখানে উল্লেখ করা হইল। শ্রমণ  
কীর্তনের ইহা অপেক্ষা উন্নততর রূপ অবশ্যই  
বর্তমান। প্রয়োজনক্রমে তাহা সাধকজীবনে  
স্বতঃই আবিস্কৃত হইবে।

## দেশের ও দেশের কথা

৭২সর আসে, ৭২সর চলিয়া যায়—আমরা শুধু উদাসীনতার মত তাতার দিকে চাতিয়া থাকি। পুরাতন ৭২সরই বা আমাদের কি নিয়া যায়, নব বর্ষই বা কি দিয়া যায়? যে জাতি দিন দিন কোপীনমাত্রিকসম্বল হইয়া পড়িতেছে, পুরাতনের বিদ্যায় বা নূতনের অভিনন্দনে তাহার কিছু মাথা-বাণী আছে কি? দিন গুণিয়া বছরের হিসাব রাখিয়া মুখ হয়, যদি দেখি, জাতীয় জীবনের একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে, একটা বিশিষ্ট সাধনা আছে। সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা তখন চিত্তে বিচিত্র রঙে আশার ফুল ফুটাইতে থাকে, ভাবের অঞ্জলি চোখে রাখিয়া নূতনকে বরণ করিয়া নিতে তখন সাধ যায়। কিন্তু যে জাতির সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমান হইয়া নৈকশ্রী সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহার মাঝে রস কোথায় যে সে বরণডালা সাজাইয়া বসিবে? বাস্তবিক ব্যক্তিগত জীবনের উদাসীনতাকে হয়ত সহ্য যায়, কেননা গাছের এতগুলি সবুজ পাতার মাঝে হঠাৎ একটার যদি হলদে রং ধরে, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না—হলদে পাতাটা বরিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সবুজের কুশী দেখা দেয়। কিন্তু যদি ঠাৎ সমস্তটা গাছই হলদে হইয়া উঠে, তাহা হইলে প্রবল বৈরাগ্য-সাধনাকে প্রাণ-ঘাতক বলিয়া ভয় না করিয়া তো চলে না। আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনটাই যেন এমনই একটা প্রচণ্ড স্থবিরত্বের, কালগ্রাসে ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতেছে। প্রাচীনের বুকে নবীনকে আবাধন করিয়া আনিবে, সে

শক্তি সে মাদকতা কোথায়? তাই “উদাসীন-বদাসীনঃ” হইয়া বলিতে, ঈশ—বহর আসে, বছর যায়, আমাদের তাহাতে কি?

\*

বছর ভরিয়াই হিন্দুকে লড়াই করিতে হইয়াছে। তাহাতে জয় লাভ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিল কি? বছরের গোড়াতেই দেখি হিন্দু-মুগলমানের প্রচণ্ড বিক্ষোভ। কে বলিবে, আজ সাত শত বছর ধরিয়া ইহারা এক সঙ্গে ধর করিতেছে, একই দেশের অন্ন-জলে স্নান হইতেছে—তাহাদের এক আশা, এক ভাষা—ঝুমুনির ধরণটাও এক, ভূভিক্ষে ম্যালেরিয়ায় নির্বিন্যাসে উৎসন্ন হইয়া যাওয়ার কার্যদাটাও এক! এক জন আছেন পর-পারের পাথের সন্ধানে একান্ত ব্যস্ত, অথচ ইহকালের গোনা দিন কয়টা কাটিতেছে—শুধু বুজুফাক্স লাগুসায়, পরের গোলাবীতে। আর একজনের সিরতাজ কবে গিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ক্রমের বাদশাহীর স্বপন দেখিয়া যুগের ঘোরে “কেয়াবাং” বলিয়া উঠিবার অভ্যাসটা মনে নাই! পেটের জালায় হিন্দু আজ আমেরিকায়, আফ্রিকায় গিয়া গোরাক্ষেত্রে হয়ারে মাথা কুঁটিয়া মরিতেছে—পেট ভরিতেছে না; মুসলমান গোসা করিয়া ইস্তাযুলের এলাকায় ঘর বাধিতে ছুটিতেছে—পুঁতা খাইয়া আব্বার ফিরিয়া আসিতেও হইতেছে। অথচ ঘরে আসিয়া এ ইহার দাড়ি উপড়াইতেছে, ও উহার টিকি ছাড়িতেছে—বলিতেছে, দেশ আমার ধর্মকে যদি বড় না বলিবে, তাহা—

বিধাতা এ কি নিদারুণ প্রহসন রচনা করিয়াছেন!

✱

হিন্দু মুসলমানের রাতারাতি মিলন ঘটাইবার জন্য নৈজারা কত চেষ্টা করিলেন। হিন্দু খিলাফতের চাঁদা আদায় করিল, মুসলমানকে এক সঙ্গে লইয়া খান খাওয়া, চাকরীর বথরা দশ-আনা ছ'আনা করিল—কিন্তু হারিলে, সন্তুলি বৃথাই! একবার রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, মহাত্মা মারাঠক সরলতার বশে হিন্দুদের মুসলমানের হাতে তুলিয়া দিলেন—ইহার ফল ভাল হইবে না। হিন্দু-মুসলমানের তখন অমুসলমানের গাঙে নুতন জোয়ার আসিয়াছে—হুই দলই এ কথা শুনিয়া মহা খাপ্পা। কিন্তু আজ চালাকীর মিলনের ফল চারিদিকেই দেখা দিয়াছে। দুর্বলে সবলে কখনও মৈত্রী হয়—“ভেড়িয়া-ভেড়ে” সাক্ষি হয়? কাগজে-কলমে হিন্দু চিরকাল বলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ধর্ম-প্রাণতার তুলনা কোথায়ও মিলিলে না। আজ মুসলমানও বড় গলায় সেই কথাই বলিতেছে। অথচ এক জন ধর্মের নামে অপরের দু'টি চাপিয়া ধরিতেছে, আর এক জন শালগ্রামশিলা ফেলিয়া পিতৃপুরুষের নাম এইয়া উদ্ধ্বাসে ছুটিয়া পালাইতেছে। ধর্মের জন্য উভয়তঃ! মন্দিরে কে ঢুকিতে পারিবে না পারিবে, তা' নিরাশ কামীর পণ্ডিতেরা প্রকাণ্ড সভা করিলেন, অনেক অমুসলমান বিসর্গের শ্রাব্য হইল—অস্পৃশ্য হিন্দুকে দেহের অস্পৃশ্য অঙ্গের সহিত তুলনা করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী উদারতা ও ম্লীলতার পরাক্রান্ত দেখাইলেন। কিন্তু আজ যখন দেবমন্দির কলুষিত হইতেছে বসিয়া চারিদিক

হইতে সন্ধান আসিতেছে, তখন অস্পৃশ্যতা সমস্তার মীমাংসা করিবার জন্য একটা পণ্ডিতেরও টিক দেখা যাউতেছে না কেন? তারেকেরের শুদ্ধির সময় বহু আড়ম্বর করিয়া সভাগ্রহ চলিল, হিন্দু নিজের জয়ঢাক নিজেই বাজাইল (আজ আবার কেলেঙ্কারীর কথা শুনিতে পাইতেছি)—কিন্তু এখন দেবতার মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য একটা ছোটখাট সমিতিও গড়িয়া উঠিতেছে না কেন? আসল কথাটা হইতেছে—আমরা “গেহেন্দো”র জাত; ভাইকে ঠেঙ্গাইয়া আত্মকলচ করিয়া নীরসের পরিচয় দিই। পরের বেলায় বলি—“ক্ষমাই সর্ধুর লক্ষণ!”

✱

মুসলমানকে রুটীর ভাগ বেশী করিয়া দিয়া হিন্দু তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে চাহিয়াছিল, আজ সে জেদ ধরিয়াছে, রুটীর ভাগও যেমন লইবে, যেটীর ভাগও তেমনি লইবে। হিন্দুর দেশে সুস্বাদু ছিল অতিথি; তখন অতিথি সংকারের কি রেওয়াজ চলিত ছিল, ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। আজও সেই সনাতন অতিথিবৎসল জাতি রুটী-বেটীর ভাগ হইতে অতিথিকে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে বঝি। হিন্দু নারীর সতীত্ব গৌরবের ঈজন্য; এর প্রতি রাজনৈতিক হিসাবে একটু কটাক্ষ করিয়া বাংলার লাট পর্য্যন্ত এই সে দিন বাংলার বিশ্বকবিরা কাছে বড় গালটাই খাইলেন। কিন্তু সতীর মর্যাদা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাগজে কলমে রক্ষা করা চলে, ততক্ষণই ভাল, কেননা তাতে পিঠটা মাখাটা নিরাপদে থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার ভার যৈবের উপর ছাড়িয়া দিলে

তো পরমা খরচ নাট! নারীকে সতী-সাব্বী  
বানাইবার বয়েদ আওড়াইতে হিন্দু খুব  
মজবুত; তার পর নিজের বহু আশ্রমে  
গড়া “সবলা অবলা” গৃহলক্ষ্মীদের দুর্ভিক্ষের  
হাতে ছাড়িয়া দিয়া পলাইতেও তাহার দক্ষতা  
অসামর্থ্য; আবার তাহার বিশেষ সদ্দি-  
বেটনার পরিচয় পাই, যখন হিন্দু সমাজপতি  
সাক্ষিয়া নারীত্বের চির অনুমাননার দুঃখ  
অভাগিনীদের মাথায় চাপাইয়া তাহাদের  
খেদাইয়া দেয়। সর্বত্রই দেখিতেছি, এক  
নীতি — “বল পরীক্ষাটা দুর্বলের উপর করিও;  
আর ধর্ম রক্ষাটা করিও বিনা খরচে।” ধর্মিতা  
নারীদের নিয়া খ্রীষ্টান মিশনারী উদ্ধার আশ্রম  
খুলিতে পারে, আর হিন্দু পাপ বিদায় করিয়া  
সমাজকে শুদ্ধ রাখিয়াই নিজের কর্তব্য শেষ  
হটল মনে করে! এমন সমাজ যদি বিধাতার  
হাতে মাঝ না পায়, তবে মার খাইবে কে?

\*

• নারীর প্রতি অত্যাচারের কথঞ্চিৎ প্রতি  
শোষণ সেদিন লইল খড়্গ সিংহ বাহাদুর।  
বাজালার শিক্ষিত নারীদের পক্ষ হইতে তাহার  
প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নানা প্রকার চেষ্টা  
চলিতেছে, ভালই। সকলেই বলেন, “যদিও  
তাহার হত্যার সমর্থন কিছুতেই করিতে পারি  
পারি না, তথাপি তাহাকে বীর বলিও।”  
আমরাও বলি, নিঃসম্পর্কীয়া রাজকুমারীর  
প্রতি অত্যাচারকে সমগ্র নারীজাতির প্রতি  
এবং স্বজাতির প্রতি অবমাননা মনে করিয়া  
সে যে প্রতীকারকল্পে বঙ্গপন্থিক হইয়াছিল  
— তহা তাহার বাহাদুরী বটে। তাহার এই  
মহাপ্রাণতা আমাদের চোখে এমনই অনভ্যস্ত  
ঠেকে যে তাহাকে হিন্দু বলিয়া আপনাদের

দলে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইবে।  
— নেপালী বলিয়া তাহাকে দূরে রাখিয়া  
বিস্ফারিত লোচনে তাহার বীরত্বের তারিফ  
করিতেই ভাল লাগে। হত্যাকে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি  
বলিয়া অনুমোদনের দৃষ্টিতে দেখাটাও বর্তমান  
গীতাপছীদের পক্ষে কতখানি সুপরিণত হয়,  
বলিতে পারি না। এক্ষণ ক্ষেত্রে আঘাত না  
করিয়া অত্যাচারীর পিঠে হাত বুলাইয়া বা  
ধর্মের কাহিনী শোনাইয়া তাহার মর্ত্যগতি  
শোধরানো সম্ভব পর কিনা, তাহাও সন্দেহের  
বিষয়। খড়্গ সিংহ নারীর অপমানকারীর প্রতি  
যে দণ্ড বিধান করিয়াছে, তাহা হিন্দু ক্ষাত্র-  
নীতি অনুযায়ী গুরুতর বা অসীমতর বলা চলে  
না—নজীর কৌচক বধ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে  
খড়্গ সিংহকে আমরা হিন্দু সমাজের গণ্ডিতে  
আনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি, সে  
ক্ষেত্রে হিন্দুর ক্ষাত্র নীতির তরফ হইতেই  
আমরা বালতে পারি, তাহার বিধিত দণ্ড  
উপযুক্ত হইলেও সুপ্রযুক্ত হয় নাই; অত্যা-  
চারীকে অতিক্রমে আক্রমণ করাটা বীর  
নীতির বিরুদ্ধ। এত বড় মহাপ্রাণতার কাজ-  
টার মধ্যেও খড়্গ সিংহের জাতিমূলত মনোবৃত্তি  
কিরূপ ভাবে ক্রিয়া করিয়া তাহার বীরত্বের  
মাঝেও কাপুরুষতার ছাপ মারিয়া দিয়াছে,  
তাহাও বিচার করিতে হইবে।

\*

হিন্দুর প্রাণের উপর, তাহার প্রাণাধিক  
প্রিয় ও রক্ষণীয় মা-বোনের উপর আঘাতের  
পর আঘাত আসিয়া পাড়তেছে। এক্ষণ স্থলে  
অর্জুন-বিষাদ যোগের পুনরাবনয় করাটা  
নিতান্তই অসম্ভব ও অকৌতুকীয় কীর্ত্তব্য। কিন্তু  
হিন্দু করিবে কি? অগরের প্রাণ হরণ

করিবে, না পরের ঘরের মেয়ে কাড়িয়া আনিবে ? হিন্দু তাহা করিতে পারেন না ; আজ সর্ব্বল বলিয়াই যে পারেন না, তাহা নয়, সবল হইলেও পারিত না ; কেননা তাহা তাহার প্রকৃতি ও শিক্ষার বিরুদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া সবল হইয়া আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা-টুকুও যে অসম্মানিত যুগকাণ্ডে বলিদান করিতে হইবে, তাহা বা কোন্ শাস্ত্রে বলিবে ? আত্মরক্ষার অধিকার ও প্রাচেষ্টা সকলেরই আছে ; হিন্দুরও যে নাই, তাহা বলিতেছি না ;—তবে কিনা বর্তমান তাহার নীতিটা হইতেছে—“আত্মানং সততং রক্ষণং দৃষ্টবৈয়পি ধনৈরপি !” দেবভাষায় এট মনোবৃত্তি নিবদ্ধ করিয়া যে কুলদ্বার দেবভাষাকে “কলঙ্কিত” করিয়াছিল, সে বোধ হয় করনাও করে নাই, এক দিন এই নীতিকেই হিন্দু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবে। আত্মরক্ষার এমন কদর্যা অর্থকরণে হিন্দু অভ্যস্ত হইয়াছে যে আজ এই বিপ্লবের দিনে যদি কেহ আত্মরক্ষার কোনও উপায় খুঁড়িয়া বাতির করিতে ওঠায়, অমনি পণ্ডিতমণ্ডলী সমাতন ধর্ম্মের গায়ে ঠেগাতে কতটুকু আঁচড় লাগিল তাহার গবেষণায় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বর্তমান শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছারও কাছারও মনোভাব এমনট উৎকট যে তাহা দেখিয়া হাসিব কি কাঁদিব, তাহা স্থির করিতে পারি না। শুদ্ধি ও সংগঠন তো মানব ধর্ম্ম নয়; যেহেতু সমাতন ধর্ম্মের পার্শ্বিকমালারা যে এখনও তাহার পার্শ্ব দেন নাই।

\*

কাফেরকে মারিয়া বেহেতু হইবে, এই তালিয়া অবহেলনসিদ্ধি ছাপ করিয়া বুদ্ধ, ক্রম,

পরম সাধু শ্রদ্ধানন্দজীর বৃক্কে গুলি মাগিল ; আবার বিচারালয়ে গিয়া কৃতকর্ম্মের ফল এড়াইবার জন্য পাগলামীর ভাণ্ড করিল ! যে দেশের শোক ছলনা দ্বারা, গুপ্তবাত দ্বারা, কাপুরুষতা দ্বারা ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দেয়, সে দেশকে আধ্যাত্মিক না বলিয়া উপায় নাই। শ্রদ্ধানন্দজীর মৃত্যুতেও যে হিন্দু সমাজের কোনও চেতনা হইবে, তাহাও নয় ; বিশেষতঃ তিনি কাঁটায় কাঁটায় হিন্দু ছিলেন কিনা, সে নিয়াও একটা তর্ক উঠিয়াছে। এই একটা ব্যাপারেই প্রমাণ হয়, পার্থ-সারথীর কর্ম্ম ভূমিতে আজ কি পরম শান্তিময় ক্রীতদেবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে আর হিন্দু মুসলমান বাহিবার উপায় নাই। ধর্ম্ম নিয়া ঝগড়া একটা বাজে কথা মাত্র—সর্ব্বত্রই দেখি জাতীয় স্বভাবট প্রবল। কুরুক্ষেত্রের পর কোরবপক্ষ মরিয়া হইয়া উশূল নীতি অলঙ্ঘন করিয়াছিল, পঞ্চ পাণ্ডবকুমারের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিল। এ দেশের লোকের পক্ষে এখন তাহাই নজীর হইয়াছে—ইহাতে আর হিন্দু মুসলমান ভেদ করিবার নাই। মুসলমান আঁড়াল হইতে চিম্টি কাটিতেছে, হিন্দু শুধু চাঁচাচটয়া মরিতেছে—উভয়ত্রই সমান পৌরুষের পরিচয়। এক মাকসুদইনী মরিয়া সে দেশে প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল ; এ দেশে এখনও গান্ধীজীর চৌদ্ধ বছর নিরস্ত্র উপবাসেও কিছু হইবে না—দশ বিংশ জন শ্রদ্ধানন্দের শোণিত-জলিতেও কিছু হুটবে না। ছ দিন ষাঁই রৈ তার পর সব চুপ।

\*

বিলাতী ফুড্‌গুলির বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর যতই থাকুক না কেন, যে ছেলেকে মাতুলত্ব

হঠাতে বঞ্চিত হইয়া শুধু ফুঁড় গিলিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহার প্রাণশক্তি কিছুতেই সব দিক দিয়া ক্ষুধি পাঠিতে পারে না। আমাদের দেশে শিক্ষানীতিতে কর্তার উচ্চায় নিলাভী ফুঁড়ের ব্যবস্থাটি চৌদ্দ আনা। এক আনা বাংলা আর এক আনা সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল। তাও মাতৃস্তম্ভকে শোধন করিয়াও জ্ঞান বিষ সাহেব একবার রোমান হইয়া চালাইয়া ফিকির করিয়াছিলেন। দেশের দুর্ভাগ্য, এমন সাধু উদ্দেশ্যটা ধোপে টিকিল না। এতবার বর্ষ-বিছালয়ের কর্তারা একটা অনুকল্পের ব্যবস্থা করিতেছেন। সংস্কৃত চিরকাল উপভাষার আগনে থাকিয়াও কোনও রকমে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া টিকিয়া ছিল। এতবার প্রস্তাব হইয়াছে, ছেলেদের কোমল মস্তিষ্কে অনুশ্রাব-বিসর্গের দাণ্ডাগুলি চালাইয়া উহাদের মাথা জখম করা কেন, ও ফালাদি হঠাতে উহাদিগকে রেহাই দিলে বেচারারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। আমরা কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির তারিক না করিয়া পারি না। সংস্কৃতকে তাঁহার গ্রীক লাতিনের কোঠায় ফেলিয়াই এই মতলব বাতির করিয়াছেন। স্পেন্সার কার্য্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির খাড়া করিতে গিয়া classical language উপর একটোট ঝাল ঝাড়িয়াছেন—সেইটাই আমাদের দেশেও নজীর হইবে, তহুটি তাঁহাদের মনোভাব। কিন্তু এই কয়টা কথা কি তাঁহার বিচার করিয়া দেখেন না যে, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বাহা কিছু দাঁটার ছিল, Renaissance-এর যুগে ইউরোপ তাহা একেবারে ভাষিয়া নিয়াছে; গ্রীক রোমান সভ্যতার মায়ে যে ইউরোপীয় সভ্যতার পরগাছা গজাইয়াছিল, আজ তাহা পুরাতন গাছটাকে

একেবারে নির্মূল ভাবে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে—তাঁহার কাছ হইতে নতুন কিছু পাইবার অদর আশা নাই। তাই প্রাচীন সভ্যতা আজ নবীন ইউরোপের কাছে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। তার পর যে কোনও ইউরোপীয় ভাষায় মারফতে গ্রীক রোমান সাহিত্য আয়ত্ত করিয়াও দেশে কঠিন নয়। এলিতে গেলে সমস্তটা প্রাচীন সাহিত্যই তাহার নিজেদের জাতীয় সাহিত্যে অবিকল তুলিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃতেও বেণাতেও কি তাই হইয়াছে? যে মুষ্টিমেয় জ্বালোক প্রাপ্ত শিক্ষিতেরা সাগরপারে পিতৃপুরুষের পণ্ডনান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সংস্কৃতের সহিত তাঁহাদের কবরবার না রাখিলেও চলে।—তাঁহার Bibliotheca Indica য অনুবাদ পড়িয়া খুসী থাকিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুমানীর গর্ভটা এখনও কোনও রকমে বাহার জীয়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে? এখনও যে হিন্দুকে পিতৃপুরুষের দোহাট দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। হিন্দু সভ্যতার প্রাণপুরুষ যে এখনও দেবভাষার মমতা ছাড়িয়া বিজাতীয় বুলি কপটাত্তে শিখেন নাট। জাতীয় জাগরণের দিনে আজ কোণায় বিশেষ করিয়া দেবভাষারই অনুশীলন চালাবে, সংস্কৃত ছাড়াও আলি-প্রাকৃতের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইবে, প্রাচীন গৌরবের অধ্যায়গুলি উদ্ঘাটিত হইবে—তাহা না করিয়া কর্তাদের এ কি বিভীষণ লীলা! তা ও বদ বৃত্তিভাম, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কৃত শিক্ষার দরুণ কর্তাদের অর্থব্যয় শক্তিমায় করিয়া শেষকালটায় হাল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে! এক তৌ মেটিক পর্য্যন্ত সংস্কৃতের ব্যবস্থা—তাঁও আশ্চর্য্য ত্রিভা-

পূদেশ পঞ্চতন্ত্রের সোয়া পাঁচ আনা বকমের  
বিজ্ঞা—তাহে বার টাকা মাইনের একটা জীর্ণ  
শীর্ণ গোবেরী পাণ্ডিত সংস্কৃতের কপালে  
এত সুখে বুঝি কর্তাদের চোপ টাটায়!

\*

\*

“যে বহু দুর্জল, তার ভিতর বিদ্রোহবুদ্ধি  
তত প্রবল। এত বিদ্রোহবুদ্ধি যখন আবার  
স্বদেশ-হিতৈষণার মুখোশ পড়িয়া উপাস্থত হয়,  
তখন তাহার তুল্য শত্রু আর হতে পারে  
পারে না। আসামে বাঙ্গালী বিদ্রোহ অতি  
প্রবল;—হয় কি আমরা সাধু বনিয়া,  
বহুধৈব কুটুম্বক নীতির দোহাই দিয়াও ছোবল  
হইতে রেহাই পাই না। কিছু দিন হইল, আমরা  
আমাদের কৃষি বিভাগের তরফ হইতে একটা  
নৈশবিভাগের পত্তন করিয়াছিলাম। ইতিপূর্বে  
কয়েকবার অনুরূপ চেষ্টা করিয়াও আমরা  
সফলকাম হইতে পারি নাই। এইবার কিন্তু  
কতকগুলি প্রবাসী হিন্দুস্থানী ছেলেরা  
আগ্রায়ে বিভাগটী টিকিয়া যায়। তাহাদের  
দেখাদেখি কয়েকটা আসামী জেলেও বিভাগে  
আসিতে থাকে। কিন্তু কয়েক দিন  
পরেই ছেলেরা স্কুলে যাতায়াত বন্ধ করে।  
কারণ অহুসঙ্কান করিয়া জানা গেল, এক জন  
স্বদেশ-হিতৈষী প্রবীণ ব্যক্তি এই “মঞ্চে” অভি  
ভাবকদের উপর এক ফড়িয়া জারী  
করিয়াছেন যে, “ইহার বিদেশী, ছেলের  
বাঙ্গালী বানাইয়া ভাটীতে চালান দিবে  
—খবরদার, ইহাদের ওখানে ছেলে পাঠাইতে  
পারিবি না।” অথচ এই স্বদেশী লোকটী  
এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক। এ দেশে কৃষিই  
লোকসংখ্যাবিকাশ—ছেলেকদের দিনে পড়া  
স্তান স্ববিধা হয় না। নৈশবিভাগে দূর

দূরান্তর হইতেও ছেলেরা দল বাঁধিয়া আসিতে  
চায়—কিন্তু স্বদেশীধানার বিড়ম্বনা! এমনি দার  
স্বজাতি-বৎসলতা না থাকিলে কি দেশের  
উন্নতি হয়?

বৎসরের মাঝামাঝি কোলাচাৰ্য্য শ্রীমৎ  
রামদাস পরমহংস স্বাক্ষরিত কয়েকখানি পত্র  
ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আমাদের হস্তগত হয়।  
পাঠে অবগত হইলাম, মহাকাল পশুপতিনাথের  
আদেশে ইনি ব্রহ্ম-গায়ত্রী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া  
গৃহস্থাস্রমের উদ্ধার ও সাধু-সন্ন্যাসী সংহার  
করিবার জন্য হিমালয় হইতে নিম্নভূমিতে  
অবতীর্ণ হইয়াছেন। পত্রগুলি একরূপ অসম্বদ্ধ  
প্রাণোপেক্ষিতে পরিপূর্ণ যে তাহা পাঠ করিয়া  
হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ  
রহস্য এই, আমাদের দেশেরই কয়েকজন  
খাতনামা পণ্ডিত পরমহংসজী যে এক জন  
সাধু-পুরুষ, সে বিষয়ে লম্বা সার্টিফিকেট  
দিয়াছেন। এত খানেই আমরা একটা ধাঁধায়  
পড়িয়াছি। এ দেশে অবতাব হওয়ার একটা  
নাতিক আছে; কিন্তু এত পর্য্যন্ত সমস্ত  
অবতারকেই আমরা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা বা দেবাদিষ্ট  
দেখিয়া আসিয়াছি এখন ভিতরে যাহাই  
থাকুক না কেন। কিন্তু পণ্ডিতের সার্টিফিকেট  
লইয়া পরমহংসাবতার—এত্ববারে নয়। চিৎ,  
হহা বলিতেই হইবে। আমরা জানি সাধু-  
পরমহংসের পায় কল গণ্ডায় গণ্ডায় শত্ৰু  
পণ্ডিত গড়াগড়ি যায়; কিন্তু বলি কি  
আশ্চর্য্য প্রভাব, মহাকাল পশুপতিনাথকেও  
তো সে রেহাই দেয় নাই। নহিলে আজ  
ঠাৎ তাহার আত্ম-অবস্থাস এত প্রবল হইবে

কেন যে তাঁহার “পরগণকে” হুকুমনামা এমন অবতার দিয়া ভারতোদ্ধার হইবে বলিয়া দিয়া আঠাইয়াও তাঁহার ভরসা হয় নাট যদি মহাকাশ আশা করিয়া থাকেন, তাহা—পেছনে আবার গোটাকতক পণ্ডিতের হইলে সম্প্রতি তিনি গীতার মাত্রা চড়াইয়া সার্টিফিকেট আঠা দিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন! দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য.

বিগত পৌষমাসের ভক্তসম্মিলনীতে মঠাধিপতি শ্রীমৎ পরমহংসদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন, “নানা কারণে আমি পরিশ্রান্ত ও অসুস্থ; সুতরাং আমি বাকী জীবন বিশ্রাম গ্রহণ করিব। সেবক ও সদস্যগণকে মঠ ও আশ্রম পরিচালনের ভার দিলাম। অতঃপর কেহ আমাকে কোনও পত্রাদি লিখিতে পারিবে না। যখন মঠে অথবা বাঙ্গালার কোনও আশ্রমে থাকিব, তখন শিষ্য-ভক্তগণ আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে। সাধারণকে আর পুস্তকের লিখিতমত কোনও জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তরও দিতে পারিব না। আমি এ জীবনের মত কৰ্মক্ষেত্রে হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। মঠ ও আশ্রমসমূহ ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালিত হইবে,

সে সম্বন্ধে আগামী মঠের সম্মিলনীতে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া দিব।”

সমাগত ভক্তসম্মিলনী তাঁহার এই নির্দেশ মানিয়া লইয়াছেন। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা পত্রিকাতেও ইহা বিজ্ঞাপিত করিলাম। অতঃপর যদি কাহারও কোনও বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তিনি তাহা মঠে অথবা বিভাগীয় আশ্রমসমূহে পত্র লিখিয়া কিম্বা উপস্থিত হইয়া জানিয়া বুঝিয়া লইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের পুরীধামে অবস্থান কালে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া, কিম্বা, তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন না, সকলের নিকট আমরা ইহাই আশা করিতেছি।



## সংবাদ ও মন্তব্য

—:।#):—

### আশ্রম-সংবাদ

ত্রিঐশীকুর মঠারাজের বৈশাখের প্রথম  
হাঙ্গুট হরিদার কুম্ভ হটেতে প্রত্যাভর্তন  
কনিবার কথা। হরিদার হটেতে আসিয়া তিনি  
পুরীধামেই অবস্থিতি করিবেন।

আগামী ২১শে বৈশাখ হটেতে ২৩শে  
বৈশাখ পর্যন্ত দিবসত্রয় অত্রাণ সানস্বতমঠের  
বিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করা-  
চার্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হটেবে। আমরা  
সাধু, ভক্ত ও আধ্যাত্মগণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক  
ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এষ্ট উৎসবে  
যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান  
করিতেছি।

হেড্ অফিসে টেলিগ্রাফ করিয়াও প্রায় তিন  
গণ্ডা কাল টিকিট না পাঠিয়া আমরা ফাস্তুন  
মাসের পত্রিকা ছাপাঠিয়া রাখিয়াও যথা  
নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাট।  
এ সংবাদ গ্রাহকগণকে জানাটবারও কোনও  
উপায় ছিল না। বর্তমান সংখ্যায় আধ্যা-  
ত্মগণের উনবিংশ বর্ষ শেষ হটল। আগামী-  
বর্ষের পত্রিকা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য  
আছে, তাহা অত্র ছাপা হইয়াছে। আমরা  
তাঁহার প্রতি গ্রাহকগণের মনোযোগ আকর্ষণ  
করিতেছি।

—\*—

### পুস্তক পরিচয়

বৈষ্ণবদাসের নিবেদন  
প্রথম খণ্ড, ত্রিগ্রামগোবিন্দ মহাস্ত কর্তৃক

সংগৃহীত ও নিরচিত, মূল্য ১/০। “গ্রাম চল  
পুর, পোঃ লাল, জেলা কাচাড়” এষ্ট  
ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।  
প্রথম খণ্ডের ক্রেতাগণ দ্বিতীয় খণ্ড অর্দ্ধ মূল্যে  
পাঠিবেন।

অধুনাতন বৈষ্ণব সমাজে যে প্রবল ব্যক্তি-  
চারের শ্রোত বহিতেছে, তাহার তীব্র  
প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থকার এষ্ট পুস্তকখানি  
লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতের পরিপোষক  
স্বরূপ সাধু ও গোষ্ঠামিগণের উক্তিও ইহাতে  
সংগৃহীত হইয়াছে। সমাজের যে কোনও  
দুষ্ট ব্যক্তির প্রতীকারকল্পে যিনিই কোনও  
মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করেন, তিনিই আমাদের  
খন্ডবাদী। প্রেম ও কামে যে “বহুত অন্তর”,  
গ্রন্থকার আবেগময়ী ভাষায় তাহা বুঝাই-  
য়াছেন। গ্রন্থকারের অধিকাংশ কথাই সাধ-  
কের প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু কোন কোনও  
বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত নহি।  
“বিশুদ্ধ” ভজন প্রথাকে প্রচারিত করিতে গিয়া  
সহাজরা পন্থাকে নির্বিকারে ব্যক্তিরূপে  
প্রতিপন্ন করা, রাগাশ্রিত্য পদাবলীর সঙ্কে-  
তিত অর্থ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক পক্ষে  
তাঁহার ব্যাখ্যা করা, ৯ পঞ্চ রসিকের সাধন  
পন্থার রূপক ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি আমরা  
সমীচীন বোধ করি না। সহজ সাধনের মূলে যে  
গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা রহিয়াছে, তাহার  
অপলাপ করা সত্যসই অপলাপ এবং বাঙ্গা-  
লীঃ-গৌরবহানি বলিয়াই আমরা মনে করি।  
অধিকারভেদে দ্বারা সাধনপন্থাগুলিকে নিষ্কলুষ

রাপিতেই চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু বাস্তবিক নিবারণ কল্পে সত্যের মূলোচ্ছেদ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

**মহারাজা সীতারাম** (ঐতিহাসিক নাটক)—শ্রীমহেন্দ্রজি মজুমদার প্রণীত, “পোঃ কুরাণাট, গোরক্ষপুত্র” এই ঠিকানায় গ্রন্থ-কারের “নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ১৮ এক টাকা।

বঙ্গিমচন্দ্রের সীতারামকে ভিত্তি করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সম্বন্ধে নূতন নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া এবং উপজীব্য চরিত্রসমূহে অভিনব ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিয়া গ্রন্থকার অনেক স্থলে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে সর্বত্র সংযম, শুচিতা ও স্বদেশপ্রাণতার একটা একটানা স্রোত প্রবাহিত। বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনী এইরূপ ভাবে যতই আলোচিত হয়, ততই মঙ্গল। আমরা গ্রন্থকারকে সাহিত্যক্ষেত্রে গাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

**স্বাস্থ্য ধর্ম গ্রন্থ-পঞ্জিকা** - ১৩০৪ সাল, ত্রীমাসিক ১ম বসু ও শ্রীমুপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত ও কলিকাতা, ৪৫ আমহাষ্ট্রীট স্বাস্থ্যধর্ম সংঘ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১/০ আনা মাত্র।

এই পঞ্জিকাখানির নূতন 'করিয়া পরিচয় দেওয়া নিম্নয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা যেরূপ ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিচিত্র বিষয়-সম্ভারে (শুধু বিজ্ঞাপন-মুদ্রায় নয়) পূর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে যেরূপ বিরাট আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত। গৃহ পঞ্জিকা বলিতে কি বুঝায়, তাহা এই পঞ্জিকাখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে আছে—অভিনব হর পার্কতীর সংবাদ (স্বাস্থ্য ও সদাচার সম্পর্কে স্থলণিত পঞ্চ নিবন্ধ), মানবের দশদশা, গো রোপের চিকিৎসা, ক্রুয, ডার্নহাভের ব্যাপার, সহজ মুষ্টিযোগ, বিস-মার্কের তিনটা বোমা, শরীর চর্কা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা, চিত্রনীথী, বাংলা ও বাঙ্গালীর স্বরূপ, কলিকাতা কর্পোরেশন, প্রসিদ্ধ রেল-ওয়ে সমূহের মাসুলের পূর্ণ তালিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রচলিত পঞ্জিকাতে এই সমস্ত বিষয় নাই—অথচ উহাতে বাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই সুবিস্তৃত আকারে ইহাতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকাকে কিরূপে বদশ-সেবার উপকরণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, স্বাস্থ্যধর্ম-সংঘ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইহার বহুল প্রাণ ও অীরুদ্ধ কার্য্যনা করি।

—\*\*\*—

## দানপ্রাপ্তি

**পূর্ব বাঙ্গালা ময়নামতী**

আশ্রমে—

**ত্রীমুখ—**

ব্রজনাথ দত্ত ৫, হরিপদ বিশ্বাস ৫, মনোজনাথ বসু ৫, স্বধীরকুমার রায় চৌধুরী

২১, স্বধীরকুমার সরকার ১০, ললিতমোহন দে ২১, প্রবীরচন্দ্র দে ৩, সতীশচন্দ্র সরকার বিশ্বভূষণ চৌর ১১, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাস ২১, গোপী প্রামাণিক ৩১, নীলেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ১১, হরগোবিন্দ সাহ ১১, শ্যামচন্দ্র শীল

২১, এস, এন, শম্মা ১১, এস, সি, ঘোষ ১১, এস, এম, পাল ১১, কে, সি, চাটার্জি ১১, কে, সি, ঘোষাল ১০, জি, গোপাল রাও ১১, সারদাশঙ্কর ঈক্ষুদার ১১, যতীন্দ্রমোহন সরকার ১১, এটচ, মণ্ডল ১১, শ্রীমতী মল্লিকানন্দারী ১১, ডাঃ জে, সি, চক্রবর্তী ৫১, ডাঃ কে, বি চাটার্জি ৫১, ডাঃ ডি, এন, চৌধুরী ৪১, রামজনম সিংহ ৮১, বলদেব সিংহ ৫১, ডি, ধারী ১১, পরেশচন্দ্র রায় ১১, কে, জি, সরকার ১১, এস, এন, সিংহ ২১, কে, এস, এম, আচার্য্য ২১, ফণীভূষণ সরকার ১১, অক্ষয়চন্দ্র সিংহ ১১, রাধাচরণ দাস ১১, শরৎচন্দ্র মিত্র ১০, এ, কে, ঘোষ, ১০, ডি, পি, বিশ্বাস ১০, আর, এন, খাসনবিশ ১১, টেউ, সি, চক্রবর্তী ১০, মন্মথনাথ বস্তু ১০, বসন্তকুমার দাস ১১, ডাঃ কে, সি, দত্ত ১১, প্রমোদরঞ্জন ১০, আর, জি, বিশ্বাস ১১, এম, সি, বসু ১০, জে, সি, দত্ত ১১, এ, কে, নাগ ১১, এস, সি, সরকার ২১, এ, সি, সাহা ১১, এল, গিরি ১০, টেউ, এন, দাস গুপ্ত ২১, হীরালাল বিশ্বাস ১০, চান্দুচন্দ্র বসু ১১, জে, এম, ঘোষ ১১, পি, সি, সরকার ৩১, দি বেঙ্গল এজেন্সী ১১, ঘোষ ব্রাদার্স ১০, শ্রীমাদ চক্রবর্তী ১০, ভোলা মহারাজ ১১, আশুতোষ দাস ১১, জি, এম, মুখার্জি ২১, এ, আর, মুখার্জি ১১, আর গুপ্ত ২১, বি, সি, রায় ১১, জে, ক্রসাক ১১, এ, এন, রায় ১১, এন, ডি, চক্রবর্তী ১০, পি, সি, লোধ ১০, দিজেন্দ্রনাথ ৫১, আর, বি, ভট্টাচার্য্য ১১, জে, এন, বসু ১০, টেউ, এন, ভট্টাচার্য্য ১০, সি, ভি, রাও ১১, হলধর ১০, এম, বাগচী ১১, জে, সি, দে ১০, এল, এম, দে ১০, পি, সি, সিংহ ১১, এ, সি, দত্ত ১১, এস, পি, গুপ্ত ২১, এ, সি, রায় ১১, এস, এন, চাটার্জি ১১, এ, কে, বানার্জি ১০, এস, সি, দাস ২১, যতীন্দ্রমোহন বসু ১১, ১১ নং পি রোড ২১, (সাধারণ হইতে প্রাপ্ত) ১৩৬০।

পশ্চিম বাঙ্গালা খড়কুশমা  
আশ্রমে—

### শ্রীমন্ত—

হরিপক বন্দ্যোপাধ্যায় ভদ্রকালী মেদিনীপুর ১০, শ্রীমতী নিস্তারিনী দেবী বাসুদেবপুর মেদিনীপুর ২১০, ভূতনাথ চক্রবর্তী ১১, হারাধন দলাই ১০, রাখালচন্দ্র পাল কোতাইগড় মেদিনীপুর ১১০/১০, মথুরানীথ সিং ঐ ১১, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাস কোতাইগড় মেদিনীপুর ১০, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল কোতাইগড় মেদিনীপুর ১১, মাধবচন্দ্র সংপতি ঐ মেদিনীপুর ১০, পুলিনবিহারী মাইতি ঐ ঐ ২১, ভুবনচন্দ্র অষ্টা কোতাইগড় মেদিনীপুর ১০, নিত্যানন্দ নন্দী বারকপুর গাওড়া ১১, রাজেন্দ্রনাথ পাল ধর্মপুর মেদিনীপুর ১১, সুরেন্দ্রনাথ পাল ঐ মেদিনীপুর ১১০, বাপিনাবহারী দাস বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১০, শ্রীমতী গাঙ্গারী দাসী বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১১, যতুনাথ দে বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১১, রাখালচন্দ্র মাস্তা বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১০, বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ঐ মেদিনীপুর ১১, ভুবনচন্দ্র মাইতি বড়কলঙ্কট ঐ ১০, জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র বসু বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১১, গুণধর সামন্ত সরগেড় ঐ ১১, কিশোরীমোহন দাস বড়কলঙ্কট ঐ ১০, শ্রীমতী কুমুমকুমারী দাসী বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১০, জানকীনাথ মাইতি ঐ মেদিনীপুর ১১, দীনবন্ধু নন্দী বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১০, পিয়ারীলাল মাইতি বড়কলঙ্কট ঐ ১০, ফকিরচন্দ্র মাইতি বড়কলঙ্কট মেদিনীপুর ১১, জমিদার রাসবিহারী পাল কোতাইগড় মেদিনীপুর ১১, পি, সি, মুখার্জি গিরিডি হাজারিবাগ ১১, এম, এন, বেনার্জি ঐ হাজারিবাগ ১১, নির্মলনাথ সরকার ১১, এককড়ি মুখার্জি ১১, গগনচন্দ্র মুখার্জি ১১, আর, সি, শূর ১১, অক্ষয়কুমার সাহা ১১, বিমলাকঙ্কর সাহানা ১১, যতীন্দ্রনাথ রায় ১১, কে, কে, মিত্র ২১, এন, এন, মুখার্জি ১১, জে, এস, মল ২১, প্রমোদকুমার দত্ত ১০,

মণিমোহন কুণ্ড ১০, অনিলকুমার সরকার ১০, এস. কে. সেন ১০, খগেন্দ্রনাথ সান্না ১০, জগদীশচন্দ্র চৌধুরী ১০, বেনিয়ার্ড অফিস ষ্টাফ ১২, হেমচন্দ্র চৌধুরী ধানবাদ ২, উকীল বাবু ২১০, বিনোদলাল মণ্ডল ডাঃ মতুলচন্দ্র রায় কুলটা বর্দ্ধমান ২, মাইার ষ্টাফ কুলটা (এইচ. ই. স্কুল) ২, কালীপদ ঘোষ ১, গোষ্ঠিনিহারী পান ১, ধুন্দাবাদ ভক্ত-বন্দ ধুন্দাবাদ ১০৬০, ষ্টেশন ষ্টাফ সিতারাম-পুর ৬১০, বড়ধেমো কলিয়ারি অফিস ৪, সত্যাকঙ্কর চাটার্জি ধেমো মেন কলিয়ারি ১, কণ্ট্রাক্টার অফিস ১০, হেমচন্দ্র মুখার্জি বেঙ্গলি কলিয়ারি বর্দ্ধমান ১, ডাঃ পি মুখার্জি ১০, নিউ বীরভূম কলিয়ারি অফিস ১১০, ডাঃ পি বেনার্জি মিহিলায় সাঁওতাল পরগণা ১, নবকৃষ্ণমণ্ডল সিউলীবাড়ী এই ১১০, কিরণচন্দ্র বসু আসানসোল বর্দ্ধমান ২, প্রফুল্লকুমার আচার্য্য এই বর্দ্ধমান ১, সোমনাথ বেনার্জি আসানসোল এই ১, হরিদাস বেনার্জি আসানসোল এই ১, হুরেন্দ্রনাথ সেন ডিষ্ট্রিক্টারি এই বর্দ্ধমান ১, হেরম্বনাথ চক্রবর্তী ডিষ্ট্রিক্টারি আসানসোল ১, (এক্সাইজ সাব ইন্স্পেক্টর কালীবাৰু ও নগেন বাবু) ২, মুন্সেফ বাবু ১, মাঃ পশুপতি চক্রবর্তী লোকেশ পোড় ২, গিরিশচন্দ্র মণ্ডল কোর্ট আসানসোল বর্দ্ধমান ১, মাঃ এক্সাইজ হেড ক্লার্ক উদয় বাবু ৫১০, দক্ষিণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যাল হেড ক্লার্ক আসানসোল বর্দ্ধমান ১, পোষ্ট মাস্টার আসানসোল বর্দ্ধমান ১০, চরিশচন্দ্র সেন এঃ সার্জন ১, অনোন্মোহন রায় আম্বুনসোল বর্দ্ধমান ১০, মণীন্দ্রনাথ বসু আসানসোল বর্দ্ধমান ১০, মাঃ নিহাররঞ্জন নন্দী ২১০, অতিরিক্ত আদায় র/০, পুণ্ডর ফাণ্ড বার্ণপুর ১০, এম. ই. স্কুল এম. এন্. রায় বার্ণপুর বর্দ্ধমান ১০, এল. এম. স্বরস্বতী বার্ণপুর বর্দ্ধমান ১০, বি. বি. ঘোষাল বার্ণপুর বর্দ্ধমান ১০, রামকৃষ্ণ চট্টো-পুদ্রায় এই ১০, নকুলচন্দ্র মণ্ডল ভোরা বর্দ্ধমান ১, অতিরিক্ত আদায় বার্ণপুর ১১০।

## বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীগুরুদেব কৃপায় “আর্য্য-দর্পণের” ১৯শ বর্ষ শেষ হইল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্য-দর্পণ ২০শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। বর্তমান বৎসরের পত্রিকা বর্ষশেষ হইবার ষষ্ঠ পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আনুকূল্যে “আর্য্যদর্পণ” ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—ইহা শ্রীগুরুদেব কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল। আগামী বর্ষের পত্রিকা আমরা আরও অধিক সংখ্যায় মুদ্রিত করিব, স্থির করিয়াছি। বাহারা এ বৎসর গ্রাহক থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মপ্রচারে আম-দিগের সহায়তা করিয়াছেন, আশা করি,

উাহারা আগামী বর্ষেও গ্রাহক থাকিয়া আমাদের উৎসাহিত করিবেন। সম্বন্ধিত ভক্ত-শিষ্যগণও পত্রিকার প্রচারকরে অধিকতর উৎসাহী ও মনোযোগী হইবেন, ইহাও আশা করিতেছি।

বর্তমানে পত্রিকার আকার নয়াল অক্টোভো; আগামী বর্ষ হইতে আমরা ইহাকে ডবল ক্রাউন প্রসেক্ট-ভোতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে পত্রিকার স্বায়ত্তন বৃদ্ধি পাইবে—কিন্তু সর্ব সাধারণের সন্তুষ্টির নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া আমরা ইহার ইচ্ছা বৃদ্ধি করিলাম না।

এ বৎসরের শেষ কর্তৃক মাসে নানা  
 প্রকাশিত-আমরা যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশ  
 করিতে পারি না। সে জন্য আমরা দুঃখিত।  
 আগামী বর্ষের পত্রিকা যাহাতে যথা নির্দিষ্ট  
 সময়ে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহার আয়োজন  
 করিতেছি। কিন্তু মফঃস্বল হইতে, বিশেষতঃ  
 আমাদের মফঃস্বল হইতে পত্রিকা প্রকাশ  
 করা কিরণ দুর্লভ কার্য, তাহা ভুক্তভোগী  
 ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। এই জন্য কোনও  
 প্রকারেই হ্রাসনিষ্ঠ হইয়া কোনও মন্তব্য  
 প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। আগামী বর্ষ  
 হইতে কোনও মাসের পত্রিকা নিরূপিত  
 সময়ের পরে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা  
 ঘটিলে তাহার পূর্ববর্তী মাসেই আমরা তাহা  
 বিজ্ঞাপিত করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে  
 গ্রাহকবর্গ পত্রিকার অপ্ৰাপ্তির দরুণ উৎকণ্ঠা  
 হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিবেন বলিয়া  
 আশা করি।

পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু জানাইতে হইলে  
 অনেকেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেন না।  
 গ্রাহক নম্বর না দিলে আমাদের তথ্যনির্ণয়ে  
 বড়ই অসুবিধা হয় এবং সে জন্য সর্বদা ক্ষেত্রে  
 আমরা সময়মত পোষ্টাল তদন্তও করিতে পারি  
 না। এ বিষয়ে গ্রাহকগণ অবহিত হইলে  
 বাধিত হইব।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লই-  
 বেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডরযোগে  
 মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ  
 পিঃতে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইবে  
 এবং খরচও বেশী পড়িবে। ২০শে  
 বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা  
 নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী  
 বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের চতুর্থ সপ্তাহে  
 গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত  
 হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক  
 থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক  
 ২০শে বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে  
 জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে  
 ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে তাঁহাদিগের  
 কোনও ক্ষতিই হয় না; কিন্তু আমা-  
 দিগকে নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত  
 হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও  
 নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনব-  
 ধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমা-  
 দিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে  
 হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক  
 গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ববর্তী  
 একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে  
 পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা  
 আছে, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত  
 হইবে না।







